আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি

শ্রী সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত
শ্রী রমণী রঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী · কলিকাতা, ঢাকা

আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি

বাণীপুর পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত এম. এ., বি. টি.
ও
রংপুর নর্মাল স্কুলের ভূতপূর্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,
শিক্ষা, আধুনিক বিশেষ-পদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা
শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম. এ., বি. টি.-
প্রণীত

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মূল্য ১০·০০ টাকা

Rs. 10·00

Published by A. C. Ghosh, M.A., Presidency Library, 15 College Square, Calcutta-12.
Printed by D. K. Bose from Sree Jagadish Press, 41 Gariahat Road, Calcutta-19

পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকা

বিভিন্ন নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণের অনুরোধে আমি আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি পুস্তকে কিছু কিছু নূতন বিষয় সংযোগ করিয়াছি। তাঁহারা পুস্তক পরিবর্ধনের ধারার ইঙ্গিত দিয়াছেন। এ জন্য আমি তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। তাহা ছাড়া আমি বিভিন্ন বিষয়ের পদ্ধতিগুলিও আরও উচ্চতর শিক্ষণের উপযুক্ত করিয়া লিখিয়াছি। এই বিষয়ে আমাকে বাণীপুর স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীভগবানদাস গাঙ্গুলী, শ্রীতারাপদ ভৌমিক, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, শ্রীকমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা শ্রীমতী মায়া মুখার্জি আমাকে নানা ভাবে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। গবেষণা-বিভাগের আমাদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী শ্রীমতী প্রতিভা দাশগুপ্ত, শ্রীমতী নমিতা দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রভাতরঞ্জন গোস্বামী, শ্রীঅজিত দত্ত আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমি সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বাণীপুর নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী ও অধ্যক্ষা শ্রীমতী কণা সেনগুপ্তা আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমি উভয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বাণীপুর
জন্মাষ্টমী
১২ই আগষ্ট, ১৯৬৩।

শ্রীসুবোধ কুমার সেনগুপ্ত

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'আধুনিক বিশেষ পদ্ধতি' নামক পুস্তকখানি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার জন্য আমি প্রকাশক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। শ্রদ্ধেয় রমণীবাবু বহু কাল বাংলা দেশের বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া যে বহুল পরিমাণ শিক্ষণ-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহা অমূল্য। তাঁহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত লেখার পরিবর্তন করার মত বিশেষ কিছুই নাই। শুধু বর্তমানে যে নূতন শিক্ষার ভাবধারা প্রচলিত হইয়াছে, সেই দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার লেখার সামান্য কিছু অদল-বদল করা হইয়াছে মাত্র।

পুস্তকটির পূর্বের নাম বদলাইয়া নূতন নামকরণ করা হইয়াছে 'আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি'। পুস্তকটিকে শুধু বিশেষ পদ্ধতিগুলির মধ্যে নিবদ্ধ না রাখিয়া সাধারণ পদ্ধতিগুলিও ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইলে এবং সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে হইলে শুধু পদ্ধতি জানিলেই চলিবে না, শিক্ষা সম্বন্ধীয় আদর্শ, ঐতিহ্য এবং শিশু—ইহাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকার প্রয়োজন আছে। সেই দিক হইতে বিচার করিয়া আমি শিক্ষার নূতন ভাবধারাকে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শিল্প ও কর্মের মাধ্যমে যে ভাবে সাঙ্গীকত শিক্ষা (Integrated Teaching) সম্ভব সে সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

পুস্তকটি প্রণয়ন করিতে আমি আমার সহকর্মী বন্ধুগণ হইতে বিশেষভাবে সাহায্য পাইয়াছি। বাণীপুর ১নং বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রের লেকচারার শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী মহাশয় আমাকে পুস্তক প্রণয়ন ব্যাপারে সর্বদা পরামর্শ দিয়াছেন। ঐ কেন্দ্রেরই অধ্যক্ষা শ্রীকণা সেনগুপ্তা এবং বানীপুর শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক শ্রীভগবানদাস গাঙ্গুলী, লেকচারার শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, লেকচারার শ্রীঅনিলরঞ্জন গুহ, লেকচারার শ্রীপরেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণ সকলে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। 'উজ্জ্বল ভারতের' সহ-সম্পাদিকা শ্রীরেণু মিত্র প্রুফ দেখিয়া ও অন্যান্য ভাবে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমি সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পুস্তকটির প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়াছেন সোদরপ্রতিম শ্রীপ্রণবকুমার গাঙ্গুলী। আমি তাহাকে আমার প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি।

বাণীপুর, ২৭-৮-৫৪ শ্রীসুবোধকুমার সেনগু

সূচীপত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি

वी

আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা

শুধু কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের শিক্ষাদান-পদ্ধতির জ্ঞান শিক্ষাদান-পদ্ধতিকে সমগ্রভাবে জানিবার পক্ষে সম্পূর্ণ সহায়ক হয় না। কারণ, যে সকল মূলসূত্রের সঙ্গে বিশেষ বিষয়গুলির শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রথিত, তাহা শিক্ষকের জানা না থাকিলে শিক্ষক শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করিতে পারেন না। শুধু তাহাই নয়, শিক্ষকের শিক্ষাদান সম্পর্কিত ধারণা তাঁহার নিজের দিক হইতেও দানা বাঁধিয়া উঠে না। একটি সাধারণ উদাহরণের সাহায্যে কথাটার যাথার্থ্য বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। একটি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ুর কথা মুখস্থ করিতে বলা হইল। সে হয়ত মুখস্থ করিয়া বিষয়টি উদ্গীরণ করিতে পারিবে। কিন্তু জলবায়ু কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহা সম্যক বুঝাইয়া না দিলে, শুধু মানচিত্র দেখিয়া অন্যান্য দেশের জলবায়ু কিরূপে আংশিক ভাবে বুঝিতে পারা যায়, তাহা সে ধারণা করিতে পারিবে না। এমন কি, যে দেশের জলবায়ুর কথা সে মুখস্থ করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিল তাহাও সে ক্রমশঃ ভুলিয়া যায়। তাই মূল বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের অভাবই প্রধান ত্রুটি। কোন বিষয়ের মূলসূত্রটি জানা থাকিলে তবেই ঐ বিষয়-সংশ্লিষ্ট সমস্ত জ্ঞানের ধারা যতই সমস্যামূলক হউক না কেন, উহার গতি অনুসরণ করিয়া বিষয়টি আয়ত্ত করা আয়াস-সাধ্য বলিয়া মনে হইবে। মূলসূত্রটি অবগত হইতে পারিলেই বিষয় সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ভিত্তি জন্মিবে। পক্ষান্তরে অংশকে লইয়া নিবদ্ধ থাকিলে সমগ্রতার খোঁজ ত পাওয়া যাইবেই না, অংশকেও হারাইতে হইবে। শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা যাইতে পারে।

শিক্ষককে আদর্শ শিক্ষক হিসাবে পাঠদান করিতে হইলে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু শুধু মনস্তত্ত্বের জ্ঞানের সাহায্যেই কি শিক্ষাদান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে? একটু ভাবিবার বিষয় বটে। শিশুদের প্রয়োজন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ-ভালবাসা, রাগ, অভিমান, শক্তি, সামর্থ্য ইত্যাদির খোঁজ রাখিলেই শিক্ষাদান-সমস্যার মীমাংসা হয় না। মাত্র শিশু-জীবনের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়াই শিক্ষাদান-পদ্ধতি রচিত হইয়াছে, একথা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ পদ্ধতি সম্পর্কে শিশু-জীবনের চাহিদাকে যেমন স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, তেমনি শিক্ষার যে দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকেও একেবারে অস্বীকার করা হয় নাই। শিক্ষার আদর্শ এবং উদ্দেশ্য যে শিক্ষাদান-পদ্ধতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব বিভিন্ন প্রভাবের ফলেই শিক্ষাদান-পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে।

যে যে প্রভাব শিক্ষাদান-পদ্ধতির উদ্ভাবনে সাহায্য করিয়াছে, সে সমস্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। কারণ, পদ্ধতিকে মানিয়া লইতে হইলে পদ্ধতির গোড়ার কথাগুলিকেও মানিয়া লইতে হয়। না মানিলে যে সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত পূর্বেই করা হইয়াছে। প্রভাবগুলিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—(ক) **শিক্ষার দর্শন ও ঐতিহ্য**, (খ) **শিশু-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য**, (গ) **শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য**।

(ক) শিক্ষার দর্শন ও ঐতিহ্য

শিক্ষার দর্শন জীবনদর্শনের উপর নির্ভর করে। মানবসমাজ ও মানব-জীবনের দর্শন শিক্ষা-দর্শনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তবে যাহাকে আমরা শিক্ষা-দর্শন বলিতে চাই, তাহা মানুষের জীবনদর্শনের ভিত্তিগত হইলেও সকল শিক্ষাবিদের নিকট উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্যগত স্বীকৃতি আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, শিক্ষার যে একটা দর্শন আছে, একথা সকল শিক্ষাবিদ্ স্বীকার করিলেও শিক্ষা-দর্শনের মূল সম্বন্ধে তাঁহাদের মতভেদ রহিয়াছে। কাজেই সাধারণভাবে যে যে

বিষয়ে প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্‌ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একমত, সেই সব বিষয়েই আলোচনা নিবদ্ধ রাখা হইল।

প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্‌ই বোধ হয় একমত যে জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে এবং প্রতি মানবই এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয়তঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি হইতে ভিন্ন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার ক্ষমতা অনুসারে সামাজিক তথা জাগতিক উন্নতির ক্ষেত্রে কিছু না কিছু দান করিয়া যাইতে হয়। তৃতীয়তঃ মানুষের দান করার এই দায়িত্বকে স্বীকার করিয়া লইলে, তাহার শক্তির বিকাশ যাহাতে সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, তাহার মঙ্গলামঙ্গলের সমস্ত দায়িত্বও সমাজের। সমাজের উন্নতির জন্য ব্যক্তিবিশেষের উপর শুধু ভার ও দায়িত্ব চাপাইয়া দিলেই চলিবে না, সমাজেরও এ বিষয়ে যথাকর্তব্য পালন করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, মানুষের বুদ্ধি, শক্তি ও সামর্থ্য যে স্তরেরই হউক না কেন, সে যাহাতে **উন্নত ও সুন্দর জীবন** যাপন করিতে পারে সমাজ তাহার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করিবে।

উন্নত ও সুন্দর জীবন বলিতে কি বুঝায় তাহা লইয়াও শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ আছে। বস্তুতঃ সমাজ-জীবনের মানের উপরই ইহার সংজ্ঞা নির্ভর করিতেছে। গতিশীল মানব-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অর্থেরও যে পরিবর্তন ঘটিবে, ইহাতে আশ্চর্য কি? তবু একটি সংজ্ঞা বর্তমানকালে সকল শিক্ষাবিদেরই অনুমোদন লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেই জীবনই সুন্দর ও উন্নত—যে জীবনে সত্য, শিব ও সুন্দরকে লাভ করিবার বিশেষ প্রচেষ্টা বর্তমান। বলা বাহুল্য এই প্রচেষ্টার মধ্যে সুখের চেয়ে আনন্দ নিহিত রহিয়াছে বেশী। "সুখ" শব্দটির মধ্যে সাময়িক ভাবের রেশ পাওয়া যায়, কিন্তু "আনন্দ" শব্দটির মধ্যে রহিয়াছে স্থায়িত্বের ভাব। এই আনন্দ-ঘন জীবনই মানুষের কাম্য। (উন্নত ও সুন্দর জীবনের অধিকারী যে হইবে, তাহাকে সহনশীল এবং উদারচিত্ত হইতে হইবে। অপর মানব বা মানবসম্প্রদায়কে নিরঙ্কুশভাবে ভালবাসিবার, সেবা, দান ও গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সে অর্জন করিবে। ঐ জীবন লাভ করিতে হইলে চাই সাহস, সরস মনোভাব, নির্জন পরিবেশে থাকিবার ক্ষমতা ও বহুর মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া অপরের অনুভূতিকে উপলব্ধি করিবার উৎসাহ।) এই উন্নত জীবনের অধিকারীদের সৃজনাত্মক কর্ম সম্পাদন ও তন্নিহিত

সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষমতা থাকা দরকার। তাহা ছাড়া, যাহারা এই জীবনলাভের অভিলাষী, তাহাদের পক্ষে শুধু মানবসমাজ লইয়া থাকিলেই চলিবে না, প্রাণী-জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ ও জড়-জগতের সমস্ত বিষয়ের উপর তাহাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, মানব-জীবনের ক্রমোন্নতিতে মনুষ্যসমাজের দান প্রচুর হইলেও প্রাণী ও জড়-জগতের দানও যে অকিঞ্চিৎকর নয়, একথাও স্বীকার্য। কর্মময় জগতের বাহিরে অনুভূতির ক্ষেত্রেও সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসকদের মন সজাগ থাকিবে, প্রকৃতির সৌন্দর্য তাহাদের মনে আনন্দ সঞ্চার করিবে। সর্বোপরি সুন্দর ও উন্নত জীবনের অধিকারীকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একটা সুসমঞ্জস ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলার ছন্দ আয়ত্ত করিতে হইবে।

'উন্নত ও সুন্দর জীবন' সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হইল। এই উন্নত জীবন লাভের জন্য সকল দিক হইতে সমস্ত গুণগুলিকে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সমাহৃত ও সমন্বিত করিতে হয়। তবেই উন্নত ও সুন্দর জীবন লাভ করিতে পারা যায়। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই শিশু-শিক্ষার বিচার করা বাঞ্ছনীয়। তখন দেখা যাইবে যে, কতকগুলি হস্ত-কৌশল আয়ত্ত করা ও কতকগুলি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাই শিশু-শিক্ষার আদ্যন্ত নয়, তাহার বাহিরেও কিছু আছে। শিক্ষা বলিতে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সমগ্র শিশুর সামগ্রিক কথা। শিশুর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিবৃদ্ধি, তাহার অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গী, তাহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সকলই তখন শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইবে। শুধু তাহাই নয়, শিশুর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর সুষ্ঠু প্রকাশ এবং শিশুর সঙ্গে সমাজ-সম্পর্কের **স্বাঙ্গীকরণ**ও শিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু। অতএব শিক্ষার মধ্য দিয়া এই সর্বাঙ্গীন ও সর্বাত্মক প্রকর্ষ সাধনের ইঙ্গিতই উন্নত ও সুন্দর জীবন লাভের সহায়ক, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

শিশুর সামগ্রিক উন্নতিই তাহা হইলে আমাদের কাম্য। কিন্তু শিশুর সামগ্রিক উন্নতির পরিকল্পনা করা কি বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব? বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ই হইতেছে শিক্ষা **বিকীরণের** কেন্দ্র, অতএব শিশুর সামগ্রিক প্রকর্ষ-সাধনের দায়িত্ব শুধু বিদ্যালয়েরই, একথা হয়ত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপকতার কথা আমরা কিছু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সে বিষয়ে সন্দিহান না হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, জন্মের পর

হইতেই শিশু প্রতি মুহূর্তে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছে। অথচ শিশু বিদ্যালয়ে আসিয়া প্রবেশ করে অনেক পরে। অন্তর্বর্তী কালে শিশু যে নানারূপ অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহা কি শিক্ষা নয়? শিক্ষা যদি সমগ্র শিশুকে কেন্দ্র করিয়াই হয়, তাহা হইলে **গৃহ, বিদ্যালয় ও পরিবেশ** যেখান হইতেই সংগৃহীত হউক, শিশুর সমস্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতা গোটা শিশুর সর্বাত্মক উন্নতি সাধনে সাহায্য করিতেছে। অতএব প্রকৃত শিক্ষা শিশুর সর্বাত্মক উন্নতি ও পরিপোষণের সঙ্গে যুক্ত। শিশুর স্বাভাবিক উন্নতি যাহাতে শিশুর **দেহ, মন ও আত্মা** এই তিনটিকেই একসঙ্গে লইয়া বিকশিত হইয়া উঠে—প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হইবে তাহাই। বিশেষ করিয়া শিশু যাহাতে জীব ও জগৎকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য লইয়া উহার একজন বলিয়া দাবী করিতে পারে, সেদিকেও প্রকৃত শিক্ষার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। আবার শিশু যেন অতীতের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইয়া সমাজ ও সংসারের প্রতি স্বীয় কর্তব্য উদ্‌যাপন করিতে পারে, প্রকৃত শিক্ষার দিক হইতে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে বর্তমান যুগের অভিমত অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল। এবার অতীতের শিক্ষাদর্শনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারিলে এ বিষয়ে আমাদের ধারণা আরও সুস্পষ্ট দানা বাঁধিয়া উঠিবে। অতীতের শিক্ষাবিদ্‌গণের শিক্ষাসম্বন্ধীয় নীতি ও কার্যকরী অভিজ্ঞতাই কিরূপে বর্তমান শিক্ষাদর্শনে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহা আমাদের একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য। কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে আজ যে শিক্ষাদর্শন আমরা রচনা করিতে যাইতেছি, উহার সর্বশেষ কথা নয়। কারণ, অতীতের পটভূমিকায় আজ যাহা রচিত হইতেছে, ভবিষ্যতে শিক্ষাদান রচনায় আমাদের সেই বর্তমান অভিমতও তেমনি একটি কার্যকরী অংশ গ্রহণ করিবে। সে যাহা হউক, আমরা এখন অতীতে শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। অতীতে শিক্ষাবিদ্‌গণ কোন্ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি হইতে শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলিকে দেখিয়াছেন, তাহাই আমাদের আজ লক্ষ্য করিতে হইবে।

বর্তমান শিক্ষার ধারা প্রবাহিত হইতেছে ষোড়শ শতাব্দীর **কমেনিয়াসের** সময় হইতে। তাহার পূর্বে শিক্ষার আদর্শ ছিল **প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন**

সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া। কমেনিয়াসই প্রথমে শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্র, উদ্দেশ্য ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করেন, অতএব কমেনিয়াস হইতেই শিক্ষাবিষয়ক ক্রমোন্নতির পর্যালোচনা প্রয়োজন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

কমেনিয়াস ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁহার 'স্কুল অব ইনফ্যান্সি' (The School of Infancy) নামক পুস্তকে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন।—

(ক) **বিশ্বাস ও ধর্মপরায়ণতা**, (খ) **নীতি-বিষয়ক ন্যায়পরায়ণতা** এবং (গ) **ভাষা ও চারুশিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞান**।

শিশুর শিক্ষা উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া হইবে, ইহাই ছিল কমেনিয়াসের নির্দেশ। উদ্দেশ্যগুলিকে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় তিনি শিশুর জীবনের নৈতিক মান বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনিই প্রথম সার্বজনীন শিক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধনী, নির্ধন, ছেলে, মেয়ে সকলেই শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত। অতএব যদি সার্বজনীন শিক্ষাই প্রচলিত হয়, তবে উপরের উদ্দেশ্য অবলম্বনে শিক্ষাদান করা হইলে সর্বস্তরের শিশুদের নৈতিক মান উন্নত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি!

রুশো জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিপ্লবী ছিলেন, কাজেই শিক্ষাব্যাপারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি কমেনিয়াসের 'শিক্ষার সার্বজনীনতা'কে স্বীকার করেন না, প্রকৃতির কোলে শিক্ষাই তিনি অনুমোদন করেন। অতএব দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই, ইহাই তাঁহার অভিমত। কারণ, দরিদ্র শিশুকে ধনী শিশুর মত কৃত্রিম জীবন যাপন করিতে হয় না, প্রকৃতির দপ্তরেই তাহাকে বড় হইতে হয়, অতএব শিক্ষা তাহার নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষার প্রয়োজন শুধু ধনী শিশুদের—যাহারা কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে পালিত। রুশোর মতে জীবনধারণের কলাকৌশলকে আয়ত্ত করার জন্যই শিক্ষা আবশ্যক, পূর্ববর্তী শিক্ষা পরবর্তী কালের শিক্ষার প্রস্তুতি নয়।

পেস্তালজির মতে শিক্ষার মূলগত উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ের মাপকাঠিতে পারদর্শিতা অর্জন নয়, জীবনের জন্য উপযুক্ত হওয়া। তিনি শিশুদের শক্তির উপর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, শিশু তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী

নিজ শক্তি ও কর্মের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতে পারে। পেস্তালজির শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মূল নীতি ছিল—জীবনই শিক্ষা দান করে, অর্থাৎ জীবন-যাপনের মধ্য দিয়া শিশুরা স্বয়ং কর্মের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতে পারে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতি ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা পরিপুষ্ট। শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিচারে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়া তিনি কিছুটা দুর্বোধ্য হইয়াছেন বটে, তবুও স্বীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে ঐকান্তিকতা প্রকাশে আদৌ দ্বিধা করেন নাই। তাহা না হইলে ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতিসংযুক্ত **কিণ্ডারগার্টেন** মানব-সমাজে এতটা সমাদৃত হইতে পারিত না। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, যে-কোন উপায়েই শিক্ষা দেওয়া হউক না কেন. মানুষের চেতন প্রদেশে এই উপলব্ধিটুকু জন্মাইয়া দিতে এবং এই ধারণাকে জীবনে বদ্ধমূল করিতে হইবে যে মানুষ ও প্রকৃতি দুইই ভগবান হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁহার মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে উল্লিখিত জ্ঞান দান। ঐ ফ্রয়েবেল-নির্ধারিত জ্ঞান জীবনে স্থিতি লাভ করিলে জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকগুলি আপনা হইতে সুনিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ব্যখ্যা করিতে যাইয়া ইংরেজ দার্শনিক **হার্বার্ট স্পেন্সার** বলিয়াছেন যে, কি ভাবে জীবন-ধারণ করিতে হইবে তাহাই মানব-জীবনের বিরাট সমস্যা। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া জীবন-ধারণ নয়, ব্যাপকতর ক্ষেত্রে জীবনের রূপ ও ছন্দ কি হইবে ইহাই জীবন-ধারণের সমস্যা। শিক্ষা আমাদের পূর্ণ জীবন-যাপনে সহায়তা করিবে, ইহাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আমেরিকাতে **ডিউই** বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষাকে দেখিয়াছেন। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদ্গণের অভিমত গ্রহণ না করিয়া শিশুদের ব্যবহারিক জীবনকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিক্ষা-পদ্ধতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে একপক্ষে অপরিপক্ক ও অপরিণত মানব-শিশু, অপর পক্ষে বয়স্কদের পার্থিব অভিজ্ঞতা-প্রসূত সামাজিক উদ্দেশ্য। শিক্ষা-পদ্ধতি এই উভয়ের প্রভাবের উপরই নির্ভর করে। তিনি বলেন, শিশুরা সমস্যামূলক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করিবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঠিক পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদ্গণের মতো অত স্পষ্ট করিয়া তিনি কিছু বলেন নাই। তবে তাঁহার মতে শিক্ষার মোটামুটি উদ্দেশ্য হইতেছে **জীবন-যাপন এবং তাহার মধ্য দিয়া পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি।**

ডিউইর মতো ডাঃ **মন্তেসরিও** বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে শিশুর শিক্ষাকে দেখিয়াছেন। তিনি প্রথমে সাধারণ হইতে নীচু স্তরের শিশুদিগকে লইয়া কাজ আরম্ভ করেন। উহাদের লইয়া সাফল্য অর্জন করার ফলে তিনি পরে সাধারণ শিশুদের শিক্ষাদানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, বহু শিশুর প্রগতি তাহাদের পিতামাতা বা অভিকাবকের অজ্ঞতার জন্য মনস্তাত্ত্বিক কারণে বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। তিনি তাঁহার The Secret of Childhood নামক পুস্তকে বলেন যে, অনেক সময়ে শিশুদের মধ্যে তাহাদের সুপ্ত ব্যক্তিত্বকে লুক্কায়িত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য এই সুপ্ত এবং অবহেলিত ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিবার জন্যই ডাঃ মন্তেসরি শিশুকে একটি সাজান পরিবেশে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদ্‌গণের যে সব মত আলোচনা করা হইল, তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহারা সকলেই শিশুদের জীবনকে উন্নত করিবার জন্য নিজ নিজ মতানুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন। তৎকালীন সময় ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে সেই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। বর্তমানে সেই সকল উদ্দেশ্য শিশু-জীবনে কতটা কার্যকরী হয় আমরা তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

শৈশবের শিক্ষা

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদগণ কিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন তাহা আমরা মোটামুটি জানিয়াছি। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে **শিশুর শিক্ষারম্ভের সময়।** পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শিশু তাহার জন্মের পর হইতেই অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে থাকে, অতএব তাহার শিক্ষা তখন হইতেই আরম্ভ হয়। মনোবিদেরাও বলিয়া থাকেন যে, শিশুর মনে যদি কোন অভ্যাস দানা বাধিয়া যায়, তবে সে অভ্যাস পরিবর্তন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, এমন কি দুঃসাধ্য বলিয়াও অনেকে মনে করিয়া থাকেন। কাজেই অতি শৈশব অবস্থা হইতেই শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ হওয়া উচিত। এ বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই।

এই ব্যবস্থা বর্তমানে গৃহীত হইলেও পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদ্‌গণও কিন্তু এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। **কমেনিয়াসই** প্রথমে শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁহার The School of Infancy নামক পুস্তকে মাতার প্রতি উপদেশ, শিশুর শিক্ষা ও অভ্যাস গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, শিশু ৬ বৎসর পর্যন্ত মায়ের কাছেই ভাল রকম শিক্ষা পাইবে। শিশুকালে শিক্ষার আরম্ভ সম্বন্ধে **রুশোর** অভিমতও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি শিশুর শিক্ষার একটি স্তরকে ০—২ বলিয়া 'এমিলিতে' বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি এই বয়সের শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শিশু এই স্তরে ধাত্রী বা মায়ের কাছে থাকিবে এবং শিশুর মধ্যে যাহাতে দোষ প্রবেশ করিতে না পারে, সে জন্য মা ও ধাত্রীকে তিনি বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেন। **পেস্তালজিও** কমেনিয়াস এবং রুশোর মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে শিশুদের শিক্ষা আরম্ভ হয় জন্মগ্রহণের পর হইতেই। How Gertrude Teaches Her Children নামক পুস্তকে পেস্তালজি অল্পবয়সের শিশুর শিক্ষাসংক্রান্ত কতকগুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। **ফ্রয়েবেলও** তাঁহার The Education of Man নামক গ্রন্থে একই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি

পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদ্‌গণ প্রায় সকলেই একমত যে, শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয় ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে। অতএব যে অবস্থায় শিশু কথা বুঝিতে পারে না, সেই অবস্থায় শিশুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের একমাত্র পথ হইতেছে **ইন্দ্রিয়ের সাহায্য**। কে না লক্ষ্য করিয়াছে যে, ক্রন্দনরত শিশু মাতৃপদধ্বনি শুনিবামাত্র ক্রন্দন বন্ধ করে? কেহ কি শিশুকে বলিয়া দেয় যে, মা তাহার কাছে আসিতেছেন? কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই শিশু জানিতে পারিয়াছে যে, মা ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহারই নিকটে আসিবেন। আরও একটু বেশী বয়সের শিশুকে শিক্ষা দিবার সম্পর্কে কমেনিয়াস বলিয়াছেন যে, মা যেন প্রতি বস্তুর সঙ্গে শিশুর দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া শিশুকে বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। দুইটি ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ে যদি শিক্ষাদান করা যায় তবে তাহাতে শিশুর শিক্ষা অধিকতর স্থায়ী হয়। রুশোর অভিমতও এ বিষয়ে বিশেষভাবে গ্রহণীয়। তিনি বলেন যে, শিশুর স্মৃতি ও কল্পনাশক্তি যখন

কার্যকরী হয় নাই, তখন শিশু শুধু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই শিক্ষা পাইয়া থাকে। শিশু এই অবস্থায় সমস্ত কিছু **ধরিয়া ও ছুঁইয়া** দেখিতে চায়। শিশুর এইরূপ কার্যে বাধা প্রদান করিলে সে জ্ঞানার্জন হইতে বঞ্চিত হইবে। রুশোর মতে কোন উদ্দেশ্যমূলক কর্মকে অবলম্বন করিয়া যদি ইন্দ্রিয়গুলি কর্মানুগ হয়, তাহা হইলে শিশুর কর্মে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহা হইতেই শিশুর যুক্তি-প্রয়োগ ও বিচারের ক্ষমতা জন্মিবে। পেস্তালজিও রুশোর মতামতকে সম্প্রসারণ করিয়া শিশুর ভাষা ও অঙ্ক শিক্ষা কি রকম ভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত, তাহা দেখাইয়াছেন।

The Education of Man নামক পুস্তকে ফ্রয়েবেলও একই চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কথা বলাও ইন্দ্রিয়ানুভূতি-প্রসূত। ডাঃ মন্তেসরি এ বিষয়ে নানা রকম পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নানারূপ শিক্ষণীয় উপকরণের মধ্য দিয়া শিশুর বিচার-শক্তিও জাগ্রত করা যায়।

শিক্ষার প্রেরণা

বর্তমান সময়ে সকল শিক্ষাবিদেরই ধারণা যে, শিশুরা আপনা হইতেই শিক্ষা করিবার প্রেরণা অনুভব করে এবং নিজ নিজ গতিতে ও প্রচেষ্টায় শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় বিষয় আহরণের বিশেষ একটা সময় আছে। যে বিষয়ের জ্ঞান যখন পাওয়া উচিত তখন তাহা না পাইলে এবং যথাসময়ের পূর্বে তাহা দান করিবার চেষ্টা করিলে শিশুরা যে সেই জ্ঞানলাভ হইতে বিশেষ উপকৃত হয় না ইহা বলাই বাহুল্য। The Great Didactic নামক গ্রন্থে কমেনিয়াস বলিয়াছেন যে শিশুর উপর শিক্ষণীয় বিষয় অধিক পরিমাণে চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে। বয়স অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে শিশু যাহা শিখিতে চাহে, তাহাই শিখিবার সুযোগ তাহাকে দিতে হইবে। **রুশোও** এ বিষয়ে একই মত পোষণ করেন। এ বিষয়ে তাঁহার মতামত তিনি 'এমিলি' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি তাহার নিজস্ব ধারায় শিশুর পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং জোর করিয়া উহার ব্যতিক্রম করা অনুচিত। শিশু যখন দৌড়াইতে চায়, তখন তাহাকে জোর করিয়া আটকাইয়া রাখা যেমন অবাঞ্ছনীয়, তেমনি যখন সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চায় তখনও তাহাকে জোর করিয়া কাজে ব্যাপৃত করা অনুচিত। পেস্তালজি বলেন, মানুষের

অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির মধ্যে কর্মপ্রবণতা বর্তমান; এই কর্মপ্রবণতাকে এমনভাবে পরিচালিত করা প্রয়োজন যাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি আরও পটু হইয়া উঠিতে পারে। ফ্রয়েবেলের মতে শিশুর উন্নতি তাহার শক্তি অর্জনের উপর নির্ভর করে। তিনি তাঁহার The Education of Man নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আমরা বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য নানা অবস্থার মুখ চাহিয়া থাকি, অথচ জীবন্ত শিশুকে এক তাল মোম বা মাটি মনে করিয়া তাহাকে যে কোন ভাবে আকার দানের চেষ্টা করি। এই প্রচেষ্টার ফলে শিশুর অনিষ্টই করা হয়। শিশুর শিক্ষা তাহার ক্ষমতা বা শক্তি অনুসারে হওয়া উচিত। ডিউই এবিষয়ে তাঁহার নিজস্ব বিদ্যালয়ে পরীক্ষাকার্য পরিচালনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং তাঁহার The School and the Child নামক পুস্তকে তাঁহার মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শিশুর উপর চাপাইয়া দেওয়া শিক্ষা এবং শিশুর নিজস্ব শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ সম্বন্ধে তিনি ও তাঁহার অনুবর্তীরা বিশেষ সন্দিহান। তাঁহারা মনে করেন যে, দুইয়ের একটি পথই কার্যকরী। কিন্তু ডিউইর মতে বৃদ্ধি একটি বিশেষ গতি এবং সেই গতি একটি বিশেষ নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিয়া থাকে। উহা পরিপুষ্ট ও সাফল্যমণ্ডিত হয় তখনই যখন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। উপযুক্ত অবস্থা বা পরিবেশ সৃষ্ট হইলে শিশুর শিক্ষা করিবার আগ্রহ আপনা হইতেই দেখা দিবে, স্বাভাবিক নিয়মে আগ্রহ সঞ্চারের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। ডাঃ মন্তেসরিও **পরিবেশ সৃষ্টি** করিয়া শিশুর **আগ্রহের উদ্রেক** করিয়াছেন। পরিবেশ সৃষ্টির ফলে শিশু নিজে বাছিয়া তাহার কর্ম স্থির করিবে এবং ঐ কর্মে স্বাধীনতা থাকার ফলে কোনও বস্তু ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, নানাভাবে দেখিয়া শিক্ষালাভ করিবে। অতএব শিশু তাহার নিজের পছন্দমত জিনিষকে কেন্দ্র করিয়াই পরিণতি লাভ করিবে।

খেলা

নানাদিকে নানা কাজে শিশুদের আগ্রহ, নানারকম কাজ করিবার প্রেরণা তাহারা অনুভব করে। তাহারা অনুকরণ করে, অভিনয় করে, পরিকল্পনা করে, তৈয়ার করে, অনুসন্ধান করে ও আবিষ্কার করে। শিশুর এই সমস্ত কাজগুলিকেই আমরা তাহার খেলা বলিয়া থাকি। শিশুদের এই খেলাগুলিকে আমরা কর্মভুক্ত করি না। তাহার কারণ এই যে বয়স্কের

দৃষ্টিকোণ হইতে ওগুলি ঠিক কর্ম নয়; কিন্তু শিশুর পক্ষে ও শিশুর দৃষ্টিভঙ্গিতে উহারা কর্ম। আমরা যদি উহাদের নানারকম খেলাকে অনুসরণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, ঐ সমস্ত খেলাতে শিশুরা যথেষ্ট চিন্তা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিতেছে। এ জাতীয় খেলাকে কর্ম হিসাবেই গণ্য করা প্রয়োজন, যদিও সেই কর্মের কোনও অর্থকরী মূল্য নাই। শিশুরা এই সমস্ত খেলার সাহায্যে কাজ করিতে এবং কাজে মনোযোগ দিতে শিক্ষা করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়, এই সকল খেলার মাধ্যমে শিশুরা পরিবেশ ও সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করে, দেহ ও মনের পটুতা অর্জন করে এবং আত্মপ্রকাশের ধারা খুঁজিয়া পায়। খেলার মধ্য দিয়া এই যে কর্ম করিবার ক্ষমতা অর্জন, ইহাকেই মূলধন করিয়া শিক্ষাবিদেরা শিশুর খেলাকে অতি উচ্চে স্থান দিয়াছেন। খেলা সম্বন্ধে অতীতের শিক্ষাবিদ্‌দের বিভিন্ন মতামত লইয়া এখানে আলোচনা করা হইল।

The School of Infancy নামক পুস্তকে কমেনিয়াস বলিয়াছেন যে, অলস হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা খেলা করা অনেক ভাল। কারণ খেলার সময় মন কোন একটি জিনিষে কেন্দ্রস্থ হইয়া ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। ফলে শিশুর দৈহিক ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এইরূপ কর্মময় জীবনের প্রতি শিশুরা স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হইলে পরবর্তী জীবনে শিশুদের কর্মানুরাগ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে।

রুশো খেলার মধ্য দিয়া শিশুদের আনন্দদানের কথা তাঁহার 'এমিলি' নামক পুস্তকে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফ্রয়েবেলই প্রথমে খেলার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া বলিয়াছিলেন যে, শিশু-জীবনের খেলা সামান্য কথা নয়, ইহার স্বরূপ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁহার The Education of Man-এ বলিয়াছেন, যে-শিশু অবসাদগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত খেলায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে এবং তাহাতে অধ্যবসায় ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয়, তাহার জীবনে সকল কার্যে দৃঢ়প্রত্যয় ও নিখুঁত জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায় এবং সে সমাজের কল্যাণে আত্মবিসর্জন করিতেও সক্ষম হয়। ফ্রয়েবেলের মতে অতি শিশু বয়স হইতে খেলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরম্ভ হইবে এবং সেই খেলায় অনেক সময় মাতাপিতা ও শিশু অংশ গ্রহণ করিবে। কথা বলা এবং ক্রীড়াসূচক কর্ম একই সাথে বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তাহার পূর্বে শিশু গলার স্বর ও অঙ্গভঙ্গী বুঝিতে পারে। কাজেই শিশু যদি খেলার দর্শক রূপেও

থাকে তাহা হইলেও শিশু মনোরাজ্যে খেলার প্রস্তুতি লাভ করে। পরবর্তী অবস্থার জন্য অবশ্য ফ্রয়েবেল 'Gifts', অঙ্কের খেলা, ছন্দানুভঙ্গী, নাচ, গান ইত্যাদি নানারকম ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিশুদের আরও একটু বেশী বয়সের জন্য তিনি নানারকম সমস্যামূলক ও জটিল খেলার কথা উল্লেখ করেন। মোট কথা, ফ্রয়েবেল নানাপ্রকার রূপকের সাহায্যে ক্রীড়াকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া উহাকে শিশুর জীবনে অতি উচ্চে স্থান দিয়াছেন।

ডিউই শিশু সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও মনস্তত্ত্বের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া খেলা সম্বন্ধে অভিমত দিয়াছেন। The School and the Child নামক পুস্তকে ডিউই বলিয়াছেন যে, শিশুর যে কোন কার্যের বাহ্য অনুষ্ঠান দেখিয়াই তাহাকে ক্রীড়া নামে অভিহিত করা উচিত নয়। শিশুর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই উহা নির্ণীত হইবে। খেলার নঙর্থক দিক হইতেছে অর্থকরী চাপ হইতে মুক্তি, অর্থাৎ খেলাদ্বারা শিশু বয়স্কদের মত অর্থকরী কিছু উপার্জন করিতে সক্ষম হইবে না। ইহার সদর্থক দিক হইতেছে যে, ক্রীড়ার ফলে শিশু পূর্ণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ক্রীড়া সম্বন্ধে পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদ্‌গণের নানামতের মধ্যে এই ঐক্য আছে যে, ক্রীড়া সকল শিশুর জীবনে একটি মূল্যবান স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু ডাঃ মন্তেসরি ক্রীড়াকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়া শিশুর জীবন হইতে উহাকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। হয়ত তাঁহার বিশেষ ধরণের পরিবেশ এবং শিক্ষোপকরণের জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে। The Secret of Childhood নামক পুস্তকে ডাঃ মন্তেসরি তাঁহার প্রথম বিদ্যালয় ক্যাসা ডি ব্যাম্বিনী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর খেলনা থাকা সত্ত্বেও শিশুরা সে সমস্ত খেলনা পছন্দ করিয়া গ্রহণ করে নাই। এই কারণেই তিনি ধারণা করিয়াছেন যে, খেলা শিশু-জীবনে একটি নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

সমগ্র শিশু

শিশুর শিক্ষার বিভিন্ন দিক আমরা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। শিশুর কোন একটি দিকের বৃদ্ধি বা পরিপুষ্টিই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। ভাগ ভাগ করিয়া শিশুর বৃদ্ধির আংশিক পরিমাপ করা চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে গোটা শিশুর পরিচয় পাওয়া যায় না। আর শুধু তাহাই নয়,

সমস্ত অংশগুলির বা অবস্থা বিশেষের সুসমঞ্জস বৃদ্ধি যদি না হয় তবে শিক্ষাদ্বারা শিশু বিশেষ লাভবান হইয়াছে একথা বলা চলে না। **সমগ্র শিশুর বৃদ্ধিই শিক্ষার উদ্দেশ্য**। ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিশুর শিক্ষাকে পূর্ববর্তী কালে ভালভাবে বিচার করিয়া দেখা হয় নাই। তবুও এসম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের নানা মত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রুশো তাঁহার 'এমিলি' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, শিশুকে জীবন উপলব্ধি করিয়া জীবনযাপন করিতে হইবে। **মৃত্যুকে** এড়াইবার কুশলতা অর্জন জীবন-যাপন নয়—এ বিষয়ে রুশো সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীবন-ধারণ শুধু বাঁচিয়া থাকাই নয়, ইহার কর্মময় দিককে উপলব্ধি করাও বটে। পেস্তালজিও সমগ্র শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। যে জাতীয় শিক্ষা শিশুকে সমগ্রভাবে উন্নত করিতে সাহায্য করে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষা শিশুর একটি মাত্র অংশকে, যথা,—মস্তিষ্ককেই বৃদ্ধির পথে লইয়া যাইবে না ; শিশুর সামগ্রিক বৃদ্ধির সহায়ক হইবে—দৈহিক, মানসিক ইত্যাদি সকল প্রকার বৃদ্ধিকেই সাহায্য করিবে।

ফ্রয়েবেলও এই সম্পর্কে তাঁহার পূর্ববর্তিগণের সঙ্গে একমত। তাঁহার মতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই, তাহার সর্বরকম বৃদ্ধি, তাহার সামগ্রিক বিকাশ সম্বন্ধে সচেষ্ট হইতে হইবে। অপরাপর গুণের বিনিময়ে একটি বিশেষ গুণের বৃদ্ধি কখনও শিশু-জীবনে স্থান পাইবে না।

ডিউই শিশু-জীবনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে, শিশুর জীবন একটি অবিচ্ছেদ্য সমগ্র জীবন। বস্তুতঃ, শিশু যে-বিষয় লইয়া হঠাৎ ব্যাপৃত হয়, সে-বিষয়ে শিশুর আগ্রহ শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের তাগিদেই হয় না, তাহার সমাজগত আগ্রহও তাহার কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব শিশুর সমগ্র জীবনের বৃদ্ধিই হইতেছে শিশু-শিক্ষার উদ্দেশ্য, এ-বিষয়ে কেহ নিশ্চয়ই সন্দিহান নহেন। তাহা হইলে আমাদের বর্তমান শিক্ষা-দর্শন অতীত দর্শনের পটভূমিকায় বিচার করিলে দেখা যায় যে, আমরা বর্তমানে অতীতের ধ্যানধারণা হইতে খুব বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই।

তবে শিক্ষার একটি ক্ষেত্র সম্পর্কে বোধ হয় বর্তমান শিক্ষাবিদেরা নূতনত্বের দাবী করিতে পারে। এতদিন পর্যন্ত সকল শিক্ষাবিদই শিশুর পরিবারগত

বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু **সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর বিকাশকে কোন দিন বিচার করিয়া দেখা হয় নাই**। অতীতে শিশুর পরিবারগত বৃদ্ধির উপরে কেন এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শিশুরা যে সামাজিক জীব এবং সমাজেও যে তাহার একটি বিশেষ স্থান আছে, এবিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তখনও কোন শিক্ষাবিদের হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, কমেনিয়াস ব্যতীত তৎকালীন প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্ই সমাজের একটি বিশেষ স্তরের শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন, বর্তমানের সার্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাঁহারা পোষণ করিতে সক্ষম হন নাই।

অবশ্য কমেনিয়াস এক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষাবিদ্গণ হইতে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারও কারণ আছে। তিনিই প্রথমে ৬ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক শিশুদের সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই বয়সের সর্বস্তরের শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা যদি বিদ্যালয়কে করিতে হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন স্তরের শিশুদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ইত্যাদিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাই কমেনিয়াস মূলতঃ যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে **সমাজ-বোধ** জাগ্রত হওয়ার ব্যবস্থা আপনা-আপনিই সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু কমেনিয়াসের **সার্বজনীন শিক্ষার** পরিকল্পনা সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে নাই; যতটুকু রূপলাভ করিয়াছে, তাহাও তৎকালীন আরোপিত শিক্ষার নীতি অনুযায়ী শিশু-জীবনে তেমন করিয়া সমাজ-বোধের দানা বাঁধাইতে সক্ষম হয় নাই। তাহা ছাড়া বর্তমানে সমাজ-বোধ জাগ্রত করিবার প্রচেষ্টাকে যে দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা দেখিতেছি, সে বিষয়ে কোন আংশিক প্রচেষ্টাও কোন পূর্ববর্তী কালের শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তৎকালীন কোন কোন শিশু-বিদ্যালয়ে অবশ্য **কর্মপ্রচেষ্টা** দেখা যায়, কিন্তু সে সমস্ত কর্ম **নামে মাত্রই কর্ম**, আসলে সেগুলি কর্মের ছায়া। একটি 'গ্যালারি'-সংযুক্ত মস্তবড় শ্রেণীতে বহু শিশু সমাবেশের মধ্যে আরোপিত শিক্ষা চলিতে পারে, কিন্তু কর্মমাধ্যমে বা কর্মসংযুক্ত কোন শিক্ষাই চলিতে পারে না। অতএব বিভিন্ন স্তরের শিশুদের মধ্যে যে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কর্মহীনতার জন্য তাহা ছিন্ন হইয়া যায়।

সমাজ-বোধ সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলা হইল, তাহা বিশেষ করিয়া ফ্রয়েবেলের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

ডাঃ মন্তেসরিও তাঁহার নার্সারি শিশু-বিদ্যালয়সমূহে শিশুদের শিক্ষার জন্য যে-সব শিক্ষোপকরণ তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহাও সব **ব্যক্তিগত শিক্ষার উদ্দেশ্যে**, সমাজ-বোধ যে তাহাতে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা মনে হয় না।

এবিষয়ে **ডিউই** বর্তমান শতাব্দীতে **শিশুর সমাজ-বোধ সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিদান করিয়াছেন**। ডিউই আমেরিকার চিকাগোতে একটি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। দুইটি দিক হইতে এ-বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-কার্য চলিতেছিল। প্রথমতঃ শিক্ষা-পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে গবেষণা চলিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়কে একটি সমাজরূপে কিরূপে গড়িয়া তোলা যায় সে বিষয়েও ডিউই চেষ্টা করিতেছিলেন। ডিউইয়ের মতে অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্য আরম্ভ হয় কোন সমস্যা উদ্ভবের ফলে। বিদ্যালয় ও সমাজের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূচক প্রতিযোগিতার ফলেই উহাদের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন ডিউইয়ের কাছে অনুভূত হয়। তিনি তাঁহার School and the Society নামক পুস্তকে শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে শিক্ষাব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথার উল্লেখ করেন। তিনি বিদ্যালয়কে একটি ক্ষুদ্র সমাজ বলিয়া পরিকল্পনা করেন, যে সমাজের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের বিশেষ যোগাযোগ বর্তমান থাকিবে। তাহা হইলে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে আর কোনরূপ দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকিবে না। দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা যতই হ্রাস পাইবে শিশু-জীবনের সামগ্রিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা ততই বৃদ্ধি পাইবে। অতীতের শিক্ষাবিদ্‌গণ শিশুর ব্যক্তিগত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণে কোনই ত্রুটি দর্শান নাই। কিন্তু সমাজের সঙ্গে শিশুর যোগাযোগ স্থাপনা তাঁহারা করেন নাই। সমাজকে শিশুর জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত না করার দরুণ শিশুর সামগ্রিক জীবন-গঠনে যে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি তাঁহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে ডিউইর শিক্ষাদর্শনে।

(খ) শিশু-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

অধ্যায়ের প্রথম দিকেই শিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা হিসাবে, আমরা তিনটি বিষয় আলোচনা করিতে চাহিয়াছি। প্রথমে **শিক্ষার দর্শন ও**

ঐতিহ্য সম্বন্ধে এবং উহার নানা দিক সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইয়াছে। শিক্ষার পদ্ধতি কোন্ খাতে প্রবাহিত হইতে পারে তাহার ধারাও আলোচিত হইয়াছে। এখন আলোচনার দ্বিতীয় স্তরে আমরা প্রবেশ করিয়াছি। প্রশ্ন হইতেছে, **কোন্ বয়সের শিশুদের আমরা শিক্ষাদান করিতে চাহিতেছে?** নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে শিক্ষার পদ্ধতি **৬-১১ বৎসর** শিশুদের জন্যই রচিত হইবে। যাহাদের জন্য শিক্ষা-পদ্ধতি রচিত হইবে, তাহাদের দৈহিক ও মনস্তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য আমাদের জানা বিশেষ করিয়া প্রয়োজন, কারণ তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্যের সীমা জানা থাকিলেই তাহাদের জন্য পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও শিক্ষা-পদ্ধতি রচিত হইতে পারিবে। পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও শিক্ষা-পদ্ধতি রচনা অন্যান্য নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করিলেও, শিশুর শারীরিক ও মনস্তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। এই স্থানে আমরা শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে এইটুকু বলিতে পারি যে, শিশুর গ্রহণ করার শক্তি ও শিক্ষকের শিক্ষা দিবার ছন্দ পরস্পর নির্ভরশীল। সেই কারণে শিশু-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যে-ভাবে আলোচনা করিতেছি তাহা শরীর-বিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের অধীন হইলেও পদ্ধতি রচনার পূর্বাভাস হিসাবে তাহার আলোচনা এইস্থানে সন্নিবেশিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। সেই জন্য অতি সংক্ষেপে ৬-১১ বৎসরের শিশুদের দৈহিক ও মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা এখানে করা হইতেছে।

৬-১১ বৎসর বয়স-সীমার মধ্যে সকল শিশুর বিশেষত্ব বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে যে, শিশুদের মধ্যে অবয়বে, চেহারার বৈশিষ্ট্যে, মানসিক শক্তিতে, আগ্রহ প্রকাশে, কর্মক্ষমতায়, মনোবৃত্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে ইহাও দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে নানা বিষয়ে অন্তর্নিহিত ঐক্যও বর্তমান এবং একটি বিশেষ বয়সের শিশুদের মধ্যে একটি বিশেষ ছন্দ ও পদ্ধতিও বর্তমান রহিয়াছে।

শিশুদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য

প্রথমতঃ এই বয়স-সীমার অর্থাৎ ৬-১১ বৎসরের শিশুদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কথাই ধরা যাউক। শিশুরা এই বয়স-সীমার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং ৬ বৎসর বয়সে সে যত তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, ৮ বৎসর বয়সে তাহার বৃদ্ধির গতিতে কিছুটা ভাটা পড়ে। এই বয়স-সীমার মধ্যে সাধারণ

স্বাস্থ্যবান শিশু জীবনীশক্তি ও প্রাণশক্তিতে বিশেষভাবে পরিপূর্ণ, আভ্যন্তরীণ কার্যশক্তি তাহাদের মধ্যে একটু বেশী পরিমাণেই আছে বলিয়া মনে হয়। দেখা যায় যে, শিশু তাহার জীবনীশক্তির পূর্ণ উদ্‌যাপনে স্বয়ংক্রিয়। অবশ্য ইহার মধ্যেও কথা আছে। শিশুর জীবনীশক্তির প্রাচুর্য থাকিলেও শিশুকে যদি কোন একটি কাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া করিতে হয়, তাহা হইলে সে একটু অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে; শক্তি অনুযায়ী কর্মের আনুপাতিক পরিমাণ কম হইলেও সেক্ষেত্রে শিশুর ক্লান্তি আসা অসম্ভব নয়। জোরজবরদস্তিসূচক আরোপিত কর্মে শিশুর ক্লান্তি থাকে, কিন্তু শিশু যদি স্বেচ্ছায় কোন কর্মে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দর্শায়, তাহা হইলে তাহার ঐ কর্মে অবসাদ ও ক্লান্তি আসিতে যথেষ্ট দেরী হইবে। ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীকরণের জন্য নিদ্রা একান্ত প্রয়োজনীয়। ৬।৭ বৎসরের শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়িত শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন ৯।১০ ঘণ্টা নিদ্রা। তাহা ছাড়া নির্দিষ্ট বয়স-সীমার প্রথম দিকে শিশুদের সংক্রামক রোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে বেশী, তার কারণ দেহের দ্রুত বৃদ্ধির কালে রোগ-আক্রমণ রোধে ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং দ্বিতীয়তঃ যখন শিশু প্রথমে বিদ্যালয়ে আসে তখন গৃহের বাহিরে জনসমাজের মধ্যে আসার পূর্ব পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিজ নিজ দেহে জন্মাইতে পারে নাই বলিয়াই শিশু অধিকতর তাড়াতাড়ি সংক্রামক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। যতই শিশুর বয়স বৃদ্ধি পায়, ততই তাহার রোগ-আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাহার নিজের দেহে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

৬ বৎসরের মধ্যেই শিশুর শরীরের বৃহৎ মাংসপেশীর উপর কর্তৃত্ব জন্মায়। এই ক্ষমতা বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৃহৎ মাংসপেশী হইতে ক্রমে বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা শিশুর জন্মিতে আরম্ভ করে। আরও একটু সহজ করিয়া বলিতে গেলে বলা যায় যে, এই নির্দিষ্ট বয়স-সীমার প্রথম দিকে আঙ্গুলের মাংসপেশীর শক্তি ও নিপুণতা বাহুর মাংসপেশীর শক্তি ও নিপুণতা হইতে অনেক কম। অর্থাৎ সূচীকর্ম অপেক্ষা হাতুড়ী চালনায় শিশুরা এই বয়সে অধিকতর নিপুণ। ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু ক্ষুদ্র মাংসপেশী সংক্রান্ত সকল কাজ করিতে সক্ষম হয়। নার্সারী শ্রেণীতে থাকাকালীন শিশুরা যে সব কার্য করিতে সক্ষম ছিল না, এই বয়স-সীমার মধ্যে আসার ফলে শিশুরা ধীরে ধীরে সেইগুলিতে দক্ষতা অর্জন করিতে থাকে। শিশুরা অধিকতর দ্রুত দৌড়াইতে পারে, শরীরের ভারসাম্য

রক্ষা করিবার কৌশল আয়ত্ত করে। কোন উঁচু স্থানে উঠিতে হইলেও তাহারা অধিকতর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্বীয় কার্য সম্পাদন করে। ছুরি, কাঁচি, পেন্সিল, ব্রাস, তুলি, হাতুড়ি, করাত, দা, কোদাল ইত্যাদি শিশুরা অনেক বেশী দক্ষতার সঙ্গে চালনা করিয়া থাকে। স্বীয় দৈহিক শক্তির উপর অপেক্ষাকৃত বেশী আত্ম-বিশ্বাসের ফলে শিশু স্বীয় শক্তি অনুযায়ী কর্মসম্পাদন করিয়া আনন্দ লাভ করে।

এই সময়ে শিশুর প্রথম দাঁত পড়িয়া যায় ও নূতন দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে। ফলে স্থায়ী দাঁতের আকৃতি ও আয়তনের ফলে শিশুর মুখের ছাঁচ ভাঙ্গিয়া যায় এবং শিশুর মুখাবয়বের ধারার পরিবর্তন দেখা যায়। সেই পরিবর্তিত আকৃতির মধ্যে শিশুর পরিবারগত আকৃতির ছাঁচ দেখা যাইতে আরম্ভ করে। বিশেষ করিয়া এই সময়ে স্থায়ী দাঁত ওঠার জন্য সামান্য মানসিক দৌর্বল্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সেদিকে যদি অন্য কেহ বিশেষ দৃষ্টি দান না করে, তাহা হইলে তাহার ঐ দৌর্বল্য আর বেশীদিন স্থায়ী হয় না, ঢাকিয়া যায়। এই বয়স-সীমার অন্তর্গত শিশুদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিও এই বয়স-সীমায় অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং দ্রুত বৃদ্ধির ফলে নানা বিপদের সম্ভাবনাও থাকিয়া যায় এবং সেই জন্যই এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষ প্রয়োজন।

শিশুর মনস্তত্ত্বসম্মত বৈশিষ্ট্য

শিশুর মনস্তত্ত্বসম্মত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার পূর্বেই বলা যাইতে পারে যে, শিশুর শারীরিক বিশেষত্ব যেমন এই নির্দিষ্ট বয়স-সীমার মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট, প্রথম অবস্থায় শিশুর মানসিক ও প্রক্ষোভজনিত বিশেষত্ব এবং তাহার সামাজিক বৃদ্ধির ধারা ততটা পরিস্ফুট নয়। কিন্তু যতই শিশুর বয়স বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই কর্ম এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রতি তাহার মনোযোগের পরিবর্তন হইতে থাকে। নার্সারী শ্রেণীতে থাকাকালীন শিশুর যে দ্রুত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, এই বয়স-সীমার মধ্যে শিশুর মনোভাবের সেইরূপ পরিবর্তন বা বৃদ্ধি তত দ্রুত হইতে দেখা যায় না। প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা শিশুমনে স্থিত হইয়া শিশুর মনস্তত্ত্বগত বৃদ্ধিকে সহায়তা করে বলিয়াই শিশুর বৃদ্ধি অতি ধীরগতিসম্পন্ন। ৬—১১ **এই বয়স-সীমার মধ্যে** শিশুর স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাহার বস্তু ও জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয় প্রচুর পরিমাণে। শিশুর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় এবং মনোযোগের

স্থায়িত্বও অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া থাকে। শিশু স্বয়ং কর্মের মধ্য দিয়া কাজের পরিকল্পনা করিতে শিখিয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় শিশুর বিচার ও যুক্তি বাস্তব জিনিষকে অবলম্বন করিয়াই হয়, তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে ভাবকে অবলম্বন করিয়াও শিশুর বিচার ও যুক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।

মানসিক স্থৈর্য শিশু যতই অর্জন করে, ততই শিশুর লিখিতে ও পড়িতে শিখিবার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং ফলে শিশুর জ্ঞানের পরিধিও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শিশু এই বয়স-সীমার মধ্যে নূতন জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং সে শুধু নিজেও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই শিক্ষা পায় না, অপরের অভিজ্ঞতার অংশও সে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। এই সময়ে বিভিন্ন বস্তুতে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আগ্রহ কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টির উপর নির্ভর করে। যে পরিবেশে বহু মনোমুগ্ধকর বস্তুর সমাবেশ, সেই পরিবেশে শিশুর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিবদ্ধ হইবে বেশী। সেই হিসাবে সাধারণ অবস্থায় গ্রামের পরিবেশ হইতে শহরের পরিবেশ নানাভাবে সমৃদ্ধ এবং শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের খোরাকও সেইখানে বেশী।

কিন্তু বয়স-সীমার প্রথম দিকে বস্তুনির্বিশেষে শিশুর আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয় এবং প্রায় সকল বস্তুর প্রতিই শিশু তাহার ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। এই বয়স-সীমার শেষের দিকে, বিভিন্ন বস্তু হইতে, বালক-বালিকার মনোভাব অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বস্তুতে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য কেন্দ্রীভূত হয়। পক্ষান্তরে হস্ত ও অঙ্গুলীর মাংসপেশীসমূহ নিয়ন্ত্রিত হইবার ফলে তাহাদের সূক্ষ্ম কাজ করিবার শক্তি প্রকাশ পাইতে থাকে। ফলে পূর্বাবস্থায় শিশু যতটা সৃজনাত্মক কর্ম করিতে উদ্বুদ্ধ হইত, তাহা হইতে জটিলতার কাজ করিতে সে ইচ্ছা প্রকাশ করে। নার্সারীতে কিংবা এই নির্দিষ্ট বয়স-সীমার প্রথম দিকে কোনও সৃজনাত্মক কর্মসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের পর সেই কর্ম সম্বন্ধে তাহার খুব বেশী কৌতূহল থাকে না, কিন্তু এই বয়স-সীমার মধ্য বা শেষ ভাগে বালক-বালিকারা অতিশয় যত্ন-সহকারে কর্ম-সম্পাদন করে এবং সেই সব সম্পাদিত কর্মের প্রতি তাহাদের অনুরাগ বহু দিন পর্যন্ত রক্ষিত থাকে। এই বয়স-সীমার মধ্যে শিশুদের **বুদ্ধিগত বৈষম্য** অতিশয় প্রকট হয়। এই অবস্থায় বুদ্ধিগত **ব্যবধানের মাত্রা** থাকে অল্প, কিন্তু শেষের দিকে ঐ ব্যবধান বিরাট আকারে প্রকাশিত হয়। শিশুর আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইয়া

যায় বলিয়াই ব্যবধানের মাত্রা হয় বেশী। শিশু প্রথম অবস্থায় স্বয়ংকেন্দ্রিক হইয়া বস্তু-জগতের মাঝে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই ভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে করিতে সে ভাবরাজ্যের সম্মুখীন হয় এবং তাহার ফলে যাহাদের গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে বেশী, তাহাদের মধ্যে মানসিক উৎকর্ষ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, আর যাহারা সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা বুদ্ধির দিকে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এই কারণেই শিশুদের মধ্যে এই বয়স-সীমার মধ্যে বুদ্ধিগত প্রার্থক্য প্রচুর।

শিশুর প্রক্ষোভময় জীবন এই সময়ে বহুলাংশে প্রকাশ পায় না এবং তাহার জীবনে দ্বন্দ্বের আভাস খুব কম দেখা যায়। শিশু খুশীমনে যে-কোন ব্যবস্থা, বা অপরের আদেশ-নির্দেশ গ্রহণ করিয়া লয়। অকৃতকার্যতা, হতাশা, নিরাশা ইত্যাদি তাহার জীবনে খুবই কম প্রভাব বিস্তার করে। আপাতদৃষ্টিতে শিশু-জীবনে প্রক্ষোভের প্রভাব খুব স্বল্প দেখা গেলেও হতাশা, নিরাশা ইত্যাদি যে শিশুর জীবনে অবচেতন স্তরে যাইয়া চাপা রহিল না তাহারই বা বিশ্বাস কি? এইরূপ বিপদ যে আছে, তাহা শিক্ষক-শিক্ষিকারা সর্বদা মনে রাখিবেন; অতএব যাহাতে শিশুরা সত্যিকার জটিলতা ও সমস্যার সম্মুখীন হইয়া উহাদের আসল রূপকে বুঝিতে পারে, তাহার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা যত্নবান হইবেন। শিশুদের প্রথম অবস্থায় প্রক্ষোভময় জীবন তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ না করিলেও সাবধানতার প্রয়োজন বিশেষ আছে। কিন্তু এই বয়স-সীমার শেষের দিকে বালক-বালিকাদের মনে দ্বন্দ্বের আভাষ পরিলক্ষিত হয়, এ অবস্থায় যে আরও সাবধানতার প্রয়োজন হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি!

সামাজিকতার দিক হইতে বন্ধুত্ব এই বয়সের বিশেষত্ব। শিশু যেমন ভালবাসে, তেমন সে ঘৃণাও করে। দুইই ঐকান্তিক। তাহাছাড়া শিশুরা দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে ভালবাসে। দল তাহাদের পরিচালক ঠিক করিয়া লয় এবং পরিচালকের কথানুসারে তাহারা চলে। দলগত কাজ যে সকল সময়ে শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইবে, এমন কোন কথা নাই, অতএব অনেক সময় দলগত কাজ অনিষ্ট সাধনই করে। বলা বাহুল্য এরূপ কাজ অসামাজিক কিন্তু ইহার আরও একটা দিক বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। শিশুরা তাহাদের দলের নায়ক বা পরিচালককে মানিয়া চলিতে শিখিয়া থাকে। ইহারও একটা সুদূরপ্রসারী ফল আছে। দলগতভাবে বাস করিতে হইলে

বা কাজ করিতে হইলে কতকগুলি আইন-কানুন মানিয়া চলার প্রয়োজন হয়। সেই শিক্ষাই শিশুদের এই অবস্থায় হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া শিশুদের দলগত আচরণ শিশু-জীবনের প্রথম গণতান্ত্রিকতার প্রভাব দৃষ্ট হয়। শিশুদের অনিষ্টকারী অসামাজিক কাজকে উত্তম খাতে প্রবাহিত করিবার জন্য শিশুদের ইঙ্গিত দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু কোন দল যদি কোনরূপ অসামাজিক কাজ করিয়া বসে, তাহা হইলে সমস্ত দলগুলির উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিয়া সেই দলকে ভাঙ্গিয়া দিলে শিশুদের প্রতি অবিচারই করা হইবে বেশী।

এই বয়স-সীমার প্রথম দিকে শিশুরা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে খেলা করিতে ভালবাসে। বালক বালকদের সঙ্গে খেলা করে, বালিকা করে বালিকাদের সঙ্গে। তাহাদের একে অপর সম্প্রদায়ের প্রতি একটু সমালোচনাশীল বলিয়া দৃষ্ট হয়। পুর্বেই বলা হইয়াছে, বালক-বালিকাদের মধ্যে খেলা অত্যন্ত প্রিয়। খেলা তাহাদের মধ্যে বিভিন্নমুখী। বালিকাদের খেলার গণ্ডী অতিশয় ক্ষুদ্র, ছোট ছোট ভাব ও কর্মকে অবলম্বন করিয়া উহা রচিত, কিন্তু বালকদের খেলার বৈশিষ্ট্য ভিন্নরূপ। তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দুঃসাহসিকতাপুর্ণ কার্যকে অবলম্বন করিয়া খেলা রচনা করে। উভয় সম্প্রদায়ের খেলার মধ্যেই নিজেদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিযোগিতার ভাব দৃষ্ট হয়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে যে বালক বা বালিকা খেলায় দুর্বল, অর্থাৎ সকলের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদের নিয়াই হয় সব চেয়ে বেশী বিপদ। তাহাদিগকে অপটুতার জন্য মাঝে মাঝে সকলের বিদ্রূপও সহ্য করিতে হয়; এমন কি অনেক সময় দুর্বল বালক-বালিকাকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের খেলা বা কর্ম হইতে বহিষ্কৃত হইবার দুর্ভাগ্যকেও বরণ করিয়া লইতে হয়। এ-সময়ে বালক-বালিকারা নিজেদের খেলা নিজেরাই পরিচালনা করে এবং পরিচালনার আইন-কানুন লইয়া তাহাদের মধ্যে বিশেষ দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় আসল খেলা হইতে খেলার নিয়ম-কানুনগুলিই বুঝি শ্রেষ্ঠ। সে যাহা হউক, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক-বালিকাদের মনোগত ভাবেরও উন্নতি দেখা যায়। তাহাদের খেলার মধ্যে অপেক্ষাকৃত গঠনমূলক মনোভাব দেখা যায়।

এই **বয়স-সীমার** শিশুদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৪০ হইতে ৫০ জন কোনও-রূপ বিশেষ ভয় দ্বারা আক্রান্ত। সাধারণতঃ তাহাদের কোনও অজানিত পশু কিংবা অচেনা লোক, বজ্রপাত, ভীষণ শব্দ, অন্ধকার কিংবা

গভীর জল, এইরূপ জিনিসের প্রতি ভীতি থাকে। এই বয়সে শিশুদের ঠাট্টা-চাতুরীতে যতটা না ক্রোধ জাগ্রত হয়, দৈহিক হস্তক্ষেপে তাহাদের চেয়ে বেশী ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলেও উহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, ক্রোধের উদ্রেকও হয় যেমন তাড়াতাড়ি, তাহার উপশমও হয় তাড়াতাড়ি।

এই বয়স-সীমায় শিশুদের মধ্যে হিংসার ভাব দেখা যায়। নিজের জিনিষ ছাড়িয়া শিশুরা অন্যের জিনিষের প্রতি লোভ করে। অন্যের কোনও জিনিষ না থাকুক ইহাই তাহাদের মনোগত ইচ্ছা।

এই বয়স-সীমায় শিশুর যৌন-প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় না এবং যৌনানুভূতিও ভালভাবে শিশুমনে কেন্দ্রীভূত হয় না। নিজের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সম্বন্ধে নানারূপ তথ্য জানিবার আকাঙ্ক্ষা কিংবা অন্য শিশুদের জন্মসংক্রান্ত বিষয় জানিবার ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে দেখা গেলেও উহা শিশুর যৌনাকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক নহে। ইহা সাধারণ খবর সংগ্রহ করিবার মনোভাব হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

৬—১১ বৎসর এই বয়স-সীমার অন্তর্গত বালক-বালিকাদের শারীরিক ও মনস্তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হইল। এই আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে শিশুদের শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। কারণ তাহাদের সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধির ভার, সম্পূর্ণ না হইলেও, আংশিকভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপরই ন্যস্ত। এখন আরও একটি বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষক সম্প্রদায়কে বুঝিতে হইবে। তাহা হইতেছে, শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য। জনসমাজের চাহিদা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার আদর্শকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে শিক্ষাদানের পদ্ধতি কোন্ ধারায় প্রবাহিত হইতে পারে তাহার সম্ভাবনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব হইতে পারে।

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে শিক্ষার দর্শন, শিশু-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিলে শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষিকা একটা ধারা অবলম্বন করিতে পারিবেন। শিক্ষার দর্শন ও শিশু-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে, এখন

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি হইবে সে বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে গত দুই শত বৎসরে শিক্ষা যে গতি লাভ করিয়াছে, সেই গতিতে আজ ছেদ টানিয়া দিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, কারণ যে শিক্ষা পরাধীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহা আজ যুদ্ধোত্তর ও স্বাধীন ভারতবর্ষে অচল। পূর্বে ছিল আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া শিক্ষার আদর্শ, সেই শিক্ষাদানে লাভবান হইয়াছে বিশেষ শ্রেণী, জনসাধারণ তাহা হইতে কোন সুযোগ সুবিধা পায় নাই। বিশেষ শ্রেণীর জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে শিক্ষা বদ্ধ জলাশয়ের জলের মতই একটি নির্দিষ্ট স্থানে আটকাইয়া গিয়াছিল, জলাশয়কে উপ্ছাইয়া জল আসিয়া সমতলভূমিকে সিক্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু বিস্তীর্ণ ভূমির শুষ্ক মৃত্তিকা যেমন ক্ষুদ্র আবদ্ধ জলাশয়ের জলদ্বারা সিক্ত হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি বিশেষ শ্রেণীর জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থাও অগণিত জনসাধারণের অশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করিতে পারে না। তাহা হইলে পথ কোথায়? পথ হইতেছে বিপ্লবের পথ। পূর্বে ছিল শিক্ষার ব্যবস্থা উপর হইতে নীচের দিকে, এখন নূতন ভারতে, স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যাপ্তি লাভ করিবে সম্পূর্ণভাবে তলদেশ হইতে। অগণিত ভারতীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা, প্রয়োজন, সমস্যা, দুঃখ দারিদ্র্য সমস্ত কিছুকে পর্যবেক্ষণ করিয়া শিক্ষাদ্বারা সেই দুঃখভাবকে কতটা লাঘব করা যায়, প্রয়োজনকে কতদূর মিটাইতে পারা যায় তাহা দেখিবার সময় আজ আমাদের আসিয়াছে। শিক্ষাদান যদি এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করা যায়, তাহা হইলে আমাদের প্রথমে ব্যবস্থা করিতে হইবে অগণিত জনসাধরণের জন্য শিক্ষা। প্রতি সুদূর গ্রামে প্রত্যেকটি নিরক্ষর লোক যেন প্রকৃত শিক্ষা পাইতে পারে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, **শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষার পদ্ধতিও আমাদের এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণের প্রয়োজনই শুধু মিটিবে না, তাহাদের জীবনের আদর্শও তাহাদ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিবে।** মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্য কি?—এই প্রশ্ন যদি করা যায়, তাহা হইলে সকলেই বোধ হয় একমত হইবেন যে, মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে '**কর্ম**'। কিন্তু এই কর্ম উদ্দেশ্যহীন হইলেই চলিবে না, কর্মের পিছনে একটা ব্যাপক উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে। তাহা হইলে শিক্ষাকে যদি মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিতে হয়, তবে কর্মের মাধ্যমেই

তাহাকে যুক্ত করিতে হইবে। মানুষের কর্ম-জীবনকে যদি এমনই একটি স্তরে উন্নীত করা যায়, যে স্তরে মানুষের জীবনের প্রয়োজন, আত্মিক উন্নতি ও ব্যক্তিত্ব সমস্তই পরিপুষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম মানুষের শিক্ষার মাধ্যম হইবে না কেন? তাই **শিক্ষায় নূতন আদর্শ হইবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত উৎপাদনাত্মক, সৃজনাত্মক ও উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মসমূহ বুদ্ধি বিবেচনার সহিত সম্পাদন এবং এইরূপ কর্ম বর্তমান নূতন শিক্ষা পরিকল্পনায় বিশেষভাবে স্থান পাইবে।** দ্বিতীয়তঃ গত দুই শতাব্দীর বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, পাঠদান-পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, বিদ্যালয়-পরিচালন, শাসন ইত্যাদির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, ফলে দেখা দিয়াছে শোষণ ও প্রতিযোগিতা এবং শিশু হইয়াছে আত্মকেন্দ্রিক। নূতন এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ-ব্যবস্থায় উন্নত মনোভাবাপন্ন মানব সৃষ্টি করাই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সেই পরিস্থিতি লাভের জন্য গোটা শিক্ষাব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। শোষণকে পরিণত করিতে হইবে সেবায়, এবং প্রতিযোগিতাকে পরিবর্তন করিয়া সহযোগিতা ও সমবায়ের স্তরে আনিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিতে হইলে আবশ্যক **শিশুদের মধ্যে সৃজনাত্মক মনোভাব সঞ্চার করা। জীবনকে যদি পূর্ণভাবে যাপন করা যায়, প্রতি স্তরের উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়া যদি জীবনে অগ্রসর হওয়া যায়, তবেই সেই মনোভাব সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।** এই মনোভাব সৃষ্টি হইলে শিশুরা পূর্বপুরুষদের শোষণ-নীতি হইতে বিরত হইবে, প্রতিযোগিতা না করিয়া করিবে সহযোগিতা, আর করিতে শিখিবে সেবা।

তৃতীয়তঃ আমাদের দেশের কৃষ্টিগত ও নীতিগত যে বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে, তাহার উপর শিক্ষার মারফত শিশুমনে মর্যাদার ভাব সৃষ্টি করিতে হইবে। অর্থাৎ শিক্ষার ফলে শিশুর মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে হইবে। কিন্তু দেশপ্রেম যেমন সকল বাঞ্ছিত বস্তু বা ভাবকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিবে, তেমনি শিশু যেন দেশীয় সকল অবাঞ্ছিত বস্তু বা ভাবকেও পরিহার করিতে শিক্ষা করে, ইহাই হইবে দেশপ্রেমের মূল কথা। 'যেহেতু আমার দেশের বস্তু, অতএব ইহা ভাল' এইরূপ মনোভাব যেন শিশুমনে কথনও না গড়িয়া উঠে সেই-দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পক্ষান্তরে অপর দেশের সকল বাঞ্ছিত ভাবধারাকেও সে যেন গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ উদার মনোভাবাপন্নও যেন সে হয়।

দেশপ্রেমের সঙ্গে আর একটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ভারতবর্ষের বিরাটত্ব, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, অগণিত মানব, বিভিন্ন সংস্থা একদিন ভারতবর্ষকে বিদেশের কবলে আনিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের এত বৈপরীত্যের মধ্যেও একটি কৃষ্টিগত একত্ববোধ আছে, যাহা আমাদের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভাগকে একই যোগসূত্রে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তবে যোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও ইহা কেন বিদেশী দ্বারা কবলিত হইয়াছিল? প্রশ্ন স্বাভাবিক। ভারতবর্ষ বিদেশী দ্বারা কবলিত হইয়াছিল কেন, ইহার উত্তর এই যে, ভারতবর্ষের সাধনা ছিল অজড়ের। জড়ের ক্ষেত্রে, জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার সাধনা সে করে নাই। জড়ীয় সভ্যতার দান সংহতি ও সঙ্ঘবদ্ধতা—অজড়ীয় সভ্যতায় সঙ্ঘ নাই, সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই জগতের বুকে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টাও নাই। উহা ব্যক্তিগত মুক্তির, বিচ্ছিন্নতার সাধনা। তাই ঐ সংহতিগুণবর্জিত অজড়ীয় সভ্যতা জড়ীয় সভ্যতার সঙ্ঘবদ্ধতার কাছে পরাজিত হইল। আমাদের বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়াই বিভিন্ন জড়বাদী সভ্যতা ঢুকিতে পারিয়াছিল, এবং সেইজন্যই আমাদের পরাজিত করিতে পারিয়াছে। এই পরাজয়ের শিক্ষা এই যে, আমাদের অজড়ীয় সভ্যতার দানকে আমরা জড়ের ক্ষেত্রে, জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া জড়ের ধর্ম ঐ সঙ্ঘবদ্ধতাকে আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে ফুটাইয়া তুলিব। ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে বহু ধারা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, ভারতীয় কৃষ্টিকে প্রত্যেকেই নিজস্ব দান দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছে। ভারত বিভিন্ন ভাবধারার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে বটে, এবং সমৃদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব দান লইয়া দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা কিন্তু এই বিভিন্নতার বিরোধকে মিটাইয়া ফেলিয়া সকলের বৈপরীত্যের মধ্যে যে শক্ত যোগসূত্র আছে তাহাকে মর্যাদা দান করিবে। কি ভাবে তাহা হইবে? **শিক্ষাদানের ফলে মানুষ হইবে ব্যাপকতর ও গভীরতর, অপরের দৃষ্টিকোণকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অর্জন করিবে—ইহাই হইবে প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ।**

যে সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল, সে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে একটি বিরাট সম্ভাবনা বর্তমান রহিয়াছে। আজ যদি শিশু নিজের দেশের কৃষ্টিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়া নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া,

অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া অপরের যাহা উত্তম সম্পদ আছে তাহা গ্রহণ করিয়া ও তাহাকে নিজ সম্পদ মনে করিয়া জীবনে বৃদ্ধি পাইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সে পরিপূর্ণভাবে জীবন-যাপন করিতে পারিল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রকে মর্যাদা দান করিলেই পরিপূর্ণ জীবন-যাপন করা যায়, এবং তাহা সম্ভব যদি প্রকৃত শিক্ষার ফলে কেহ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের সমন্বয় সাধন করিতে পারে। জীবনের প্রতি ক্ষণকে যদি পরিপাক করিয়া, উপলব্ধি করিয়া এবং পরিচর্যা করিয়া জীবন-যাপন করা যায়, তবে মানুষ আনন্দঘন জীবন-যাপন করিতে সক্ষম হইবে, সার্থক হইবে তাহার জীবন। বার্নার্ড-শ' কোন এক প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবন তিনি এমন অভিনিবেশ সহকারে ও পরিপূর্ণভাবে যাপন করিবেন যে, শুধু তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত আসিলেই তাঁহার সমস্ত ক্ষমতার যেন পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহার দ্বারা তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, মানুষের সকল ক্ষমতা ও শক্তি যেন সমাজ তথা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয়। এই মনোবৃত্তি খুব অল্প লোকের পক্ষেই প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের পক্ষেই শিক্ষাসাপেক্ষ। প্রকৃত শিক্ষার দ্বারাই শিশুর সামগ্রিক বৃদ্ধি সম্ভব এবং সামগ্রিক বৃদ্ধিকে আদর্শ ধরিয়াই শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা আমাদের করিতে হইবে।

শিক্ষার মূল আদর্শের কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইল, এবারে আরও একটু বাস্তব ও ব্যবহারিক দিক হইতে শিক্ষার আদর্শকে আমরা পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে পারি। আমরা শিশুকে কি হইতে দেখিতে চাই? শিক্ষার দ্বারা আমরা তাহাকে কোন্ পর্যায়ে আনিয়া ফেলিতে চাই?

১। **প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে স্বাস্থ্যরক্ষা ও দেহের শ্রীবৃদ্ধি।** দুই শত বৎসর পূর্বে ইংরেজ দার্শনিক লক বলিয়াছিলেন যে, সুস্থ মনের জন্য সুস্থ দেহের প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে শিক্ষাবিদ্‌গণ ঠিক একই মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, শিশুর ব্যক্তিত্ব অর্জনে, তাহার প্রক্ষোভময় ও সমাজ-জীবনে মনোভাবের স্থৈর্যের জন্য স্বাস্থ্যের উন্নতির একান্ত প্রয়োজন। পূর্বে বিদ্যালয়ে দেহের শ্রীবৃদ্ধির দিকে একেবারেই দৃষ্টি দেওয়া হইত না, গুরুত্ব আরোপ করা হইত মস্তিষ্কের পরিচালনার উপর। টারমেন তাঁহার The Hygiene of the School Child নামক পুস্তকে শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি কর্তৃপক্ষের উদাসীন মনোভাবের কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ

মনোভাবের ফলে শিশুর সামগ্রিক জীবনের বহু ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। বর্তমানে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই সজাগ হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিম্ন-বুনিয়াদী স্তরের পাঠ্যসূচীতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কার্যকরী জ্ঞান সকলের উচ্চে স্থান পাইয়াছে। এমন কি এমন নির্দেশও সেখানে দেওয়া হইয়াছে যে, শিশু যদি অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ে খুব ভাল ফল দর্শায় অথচ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন হয়, তাহা হইলে তাহাকে বৎসরান্তে পরবর্তী উচ্চশ্রেণীতে উঠিতে দেওয়া হইবে না। বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এইরূপ দৃঢ় মনোভাব খুবই প্রশংসনীয়।

২। **শারীরিক স্বাস্থ্যের পরই মানসিক স্বাস্থ্যের স্থান**। নানা কারণে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতে পারে। ভয়, দুর্ভাবনা, হীনমন্যতা ইত্যাদি শিশুর মনে জন্মানর ফলে শিশুর জীবন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহা যাহাতে না হইতে পারে, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য যাতে অটুট থাকে, সেইদিকে দৃষ্টিদান করা একান্তই কর্তব্য। আমরা চাই শিশু হইবে জীবনে সুখী, কর্মে কৃতকার্য ও সকল পরিস্থিতিতে আত্মবিশ্বাসী। শিশুর শক্তি ও কর্মক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ যাহাতে হয় সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকিবে। শিশুর শক্তির অপ্রয়োগের ফলে শিশু শারীরিক, মানসিক ও সমাজ-জীবনে দমিত হইয়া যাইবে, ফলে তাহার মানসিক স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং পক্ষান্তরে সে সমাজের কোন স্তরের সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবে না। শিশুর পরিপ্লুত শক্তি যেন কর্মের মধ্য দিয়া সার্থকভাবে বাহির হইয়া আসিবার পথ পায় এবং কোনভাবেই তাহা রুদ্ধ না হইয়া যায়, সেই আদর্শে শিশুকে শিক্ষাদান করিয়া তাহার মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। **তৃতীয়তঃ শিশুকে সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে শিক্ষা দিতে হইবে**। শিশু বাড়ীর ক্ষুদ্র পরিবেশ ছাড়িয়া বিদ্যালয়ে বৃহত্তর সমাজে সবেমাত্র প্রবেশ করিয়াছে। দুই পরিস্থিতির ব্যবধান শিশুর নিকট বৃহৎ। এই বৃহৎ ব্যবধানকে যতদূর সম্ভব ছোট করিয়া আনিতে না পারিলে শিশুর পক্ষে সেই পরিস্থিতি বিশেষভাবে অমঙ্গলজনক হইবে। অতএব শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা এমন ভাবে করিতে হইবে যে, শিশু যেন বিদ্যালয়ের বৃহৎ সামাজিক পরিবেশে আসিয়া নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। শিক্ষায় সামাজিকতাবোধ যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, সে বিষয়ে ডিউই যথেষ্ট স্পষ্ট

ভাবে তাঁহার Democracy and Education নামক পুস্তকে নির্দেশ দিয়াছেন। শিশুরা পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে কর্ম বা ক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকিলে তাহারা একইরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হইবে এবং তাহাদের মধ্যে সামাজিকতা-বোধ বৃদ্ধি পাইবে।

৪। **শিশুর শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আবশ্যক।** পূর্বে জীবনের সঙ্গে সংযোগ বিরহিত পুঁথিগত শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের যে পরিবেশ উপযুক্ত ছিল, সেই পরিবেশ আজ নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় একান্তই অনুপযুক্ত ও অচল। পুঁথির পাতার উপর শিশুর বৃদ্ধি যেখানে নির্ভর করিত, সেইস্থানে আজ শিশুর আগ্রহ, পরিবেশ ও কর্ম হইয়াছে শিশুর বৃদ্ধির পরিপোষক। অতএব বিদ্যালয়ে পরিবেশ সৃষ্টির গুরুত্ব আজ অত্যন্ত বেশী। উপযুক্ত পরিবেশ যদি বিদ্যালয়ে সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধিও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমনই সাজান থাকিবে যাহাতে শিশুরা স্বাধীনভাবে ভাবিতে, আলোচনা করিতে এবং নিজ নিজ যুক্তি ও বিচার দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। তাহা ছাড়া শিশুদের তাহাদের আবেষ্টনীতে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে ও বিচার করিতে সুযোগ দিতে হইবে, এবং তাহাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য যাহাতে চরিতার্থ হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু কথায়, আলোচনায়, সৃজনাত্মক লেখায় শিশুরা তাহাদের আত্মপ্রকাশ নিবদ্ধ রাখিবে না, প্রকৃত বস্তুর পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ ও পর্যালোচনার ফলে শিশুরা বস্তুগত সমস্ত জ্ঞান আহরণ করিতে সমর্থ হইবে। সুষ্ঠু পরিবেশ রচনা করিলে শিশুর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টি হইবেই। কিন্তু অনেক শিক্ষাবিদ্ আছেন, যাঁহারা নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, শৈশব অবস্থা গঠনের সময়; সেই সময় অযথা নানাদিকে শিশুমন বিক্ষিপ্ত হইবার মত পরিবেশ রচনা করা শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পরিপন্থী। কিন্তু আগ্রহ সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহের নিরসন কর্তব্য। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সত্যিকার আগ্রহ সৃষ্টি করিবার মত বস্তুসম্ভার রহিয়াছে, সেখানে মনোযোগের অভাব ঘটে নাই এবং তাহা হইতে অভিজ্ঞতা আহরণেরও কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। ডিউই বলেন যে, যখন শিক্ষক বা পিতামাতা শিশুর মনোযোগ সম্বন্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন, তখন বুঝিতে হইবে যে শিশুকে যে বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইতেছে, সেই বিষয়

শিশুর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই অর্থাৎ এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয় নাই যাহাতে শিশু গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত বোধ করে।

৫। আমরা শিশুদের শারীরিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত বিশেষত্বগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বিশেষ বয়স-সীমার অন্তর্গত শিশুদের বিশেষত্বের গ. সা. গু. দেখিয়াছি। কিন্তু শিশু-জীবনের বিশেষত্বই শিক্ষকের কাছে একমাত্র সত্য বস্তু নয়। কাল্পনিক 'সাধারণ' শিশুকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষক এতদিন পর্যন্ত যে শিক্ষাদান করিয়াছেন, তাহা বিফলে পর্যবসিত হইয়াছে, তাহার কারণ একটা গোটা শ্রেণীর বেশীর ভাগ বালক-বালিকাকে সমপর্যায়ে ফেলিয়া অর্থাৎ 'সাধারণ' ছাপ মারিয়া শিক্ষক যখন শিক্ষাদান করিয়াছেন, তখন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে অবহেলা করিয়াছেন, ফলে শিশুরা ভাল করিয়া শিখিতে পারে নাই। তাই শিশু-চরিত্রের বিশেষত্বগুলির গ. সা. গু. জানিলেই শিক্ষকের চলিবে না, ঐ বয়স-সীমার শিশুদের শারীরিক ও মনস্তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের ল. সা. গু.ই হইতেছে ঐ শিশুদের পরিচয় এবং প্রতি শিশুর গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে জানিয়া তবে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষককে করিতে হইবে। শিশু শিক্ষা-ক্ষেত্রে স্বীয় গতির উপর নির্ভর করিয়া চলিবে। শিশুর নিজস্ব ইচ্ছা, আগ্রহ, ঔৎসুক্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদিকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হইবে।

৬। শিক্ষার আদর্শ হিসাবে শিশুর জীবনে সু-অভ্যাস ও সু-মনোভাব গঠনের সুযোগ দিতে হইবে। শুধু শারীরিক অভ্যাস নয়, কতকগুলি সামাজিক ও নৈতিক অভ্যাসও গঠিত হওয়া প্রয়োজন ; দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শিশু সত্য কথা বলিবে, বিশ্বাসী হইবে, দায়িত্ব গ্রহণ করিতে শিখিবে, তৎপর হইবে, নিয়মতান্ত্রিক হইবে, আত্মসংযমী হইবে, কথা রক্ষা করিতে শিখিবে, ইত্যাদি। শিশুমনে এই সমস্ত অভ্যাস দানা বাঁধিয়া উঠিবে, অর্থাৎ শিশু হইবে প্রকৃত নাগরিক।

শিশুকে প্রকৃত নাগরিক হইতে হইলে তাহাকে গণতান্ত্রিক জীবন যাপন করিতে দিতে হইবে। শিশুকে দিয়া গণতান্ত্রিক জীবন যাপন করাইতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে সেইরূপ জীবন যাপন করা, যাহাতে শিশুরা দৃষ্টান্তদ্বারা সেইরূপ জীবন যাপন করিতে প্রেরণা বোধ করে।

৭। শিশুর জীবনে অবসর সময় যাপনের প্রশ্ন অতিশয় জটিলতাপূর্ণ। শিশু যদি অবসর সময়টুকু উপযুক্ত ভাবে ব্যয় করিতে না শিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার অন্যান্য সদ্‌গুণ অন্য ক্ষেত্রে দেখা দিলেও, তাহা নষ্ট

হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। ভাল কাজের নেশা আছে, কিন্তু খারাপ কাজের নেশা ততোধিক। শিশু যদি তাহার অবসরটুকু শুধু সিনেমা দেখিয়া কাটায় এবং সেই সিনেমার ছবি যদি তাহার বয়সের উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে সে অবসর যাপনের ফল ত পাইলই না, পক্ষান্তরে সিনেমা দেখার নেশার প্রভাবে তাহার অন্যান্য সদ্‌গুণাবলীও আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। অতএব শিশু যাহাতে অবসর সময় যাপন করিবার ছন্দটুকুও আয়ত্ত করিতে পারে, সেদিকেও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৮। সর্বশেষ শিশুকে কতকগুলি বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন করিতে হইবে। বিষয়গুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম হইতেছে শিশুর প্রাথমিক প্রয়োজন হিসাবে পড়া, লেখা ও অঙ্ক কষার বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন। জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার যে প্রয়োজন কত বেশী তাহা সকলেই জানেন। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি যন্ত্র-চালনাকারী শক্তি আয়ত্ত করা। বিদ্যালয়ে হাতের কাজের নৈপুণ্যের অর্জনের কথাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। শিশু পেন্সিল, রঙ্গীন চক, তুলি ইত্যাদি ব্যবহার করিতে শিখিবে, এবং শিখিবে কাগজ ছবি ইত্যাদি কাটিতে, সেলাই করিতে ও মাপিতে। অর্থাৎ যে সমস্ত কাজে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা-জীবন ব্যাপৃত থাকিবে, সেই সমস্ত কাজে নৈপুণ্য অর্জন করা শিক্ষাদানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। তৃতীয়তঃ শিশু কথায় আত্মপ্রকাশ করিতে শিখিবে। পূর্বে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, শিশু স্বষ্ঠুভাবে কথা দ্বারা নিজের ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না। অভিব্যক্তি শিক্ষাদানের অঙ্গ হিসাবেই গণ্য ছিল না, তখন শুধু শেখান হইয়াছে ভাষার অঙ্গ হিসাবে পড়া ও লেখা। বর্তমানে শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে যুক্ত রাখিয়া শিশুর অভিব্যক্তির বিকাশ একান্ত প্রয়োজন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনটি বিষয় পদ্ধতির গোড়ার কথা হিসাবে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে। এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা ভিত্তি হিসাবে শিক্ষক-শিক্ষিকার মনে দানা বাঁধিয়া থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ পদ্ধতির জন্য অপেক্ষমান হইয়া থাকিতে হইবে না, নিজেরাই শিক্ষাদানের ধারাকে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। তবে শুধু শিক্ষাদানের ধারাকে বুঝিতে পারিলেই শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিক্ষাদান-কার্যে সফলতা অর্জন করিতে পারিবেন, তাহা নয়। তাহার কারণ সমগ্র বিষয়টি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হইলেও তাহাকে কার্যে পরিণত করা যায় না যতক্ষণ

পর্যন্ত না আরও বিস্তৃতভাবে কতকগুলি শিক্ষাদানের কৌশল আয়ত্ত করা যায়। আমরা পরে শিক্ষাদান-পদ্ধতি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

References

1. Education through Experience in the Infant School Years by Enda Mellor.
2. Theory and Practice in the Elementary School by W. A. Saucier
3. Teaching in small Schools by Kate V. Woodford.
4. The Activities curriculum in the Primary grades by M.P. Stevens.
5. Activity in the Primary School by M. V. Daniel.
6. Problems of Educational Reconstruction by K. G. Saiyadain.
7. One step forward—Hindusthan Talimi Sangha.
8. শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি—শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী
9. আধুনিক শিক্ষা-তত্ত্ব—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য
10. শিক্ষা বিজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব—শ্রীঅরুণ ঘোষ
11. Groundwork of Educational Theory—Ross.

শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষার লক্ষ্য যুগে যুগে পরিবর্তিত হইতেছে। বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিরা শিক্ষার লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যের বিভিন্ন যুগে কি প্রকার পরিবর্তন দেখা গিয়াছে, তাহা আমরা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

প্রাচীন ভারতে—প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মার মুক্তি। "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে" অর্থাৎ সেই হইতেছে বিদ্যা যাহা মানুষের আত্মার মুক্তি সাধন করে। ভগবানকে জানিতে পারিলেই এই পৃথিবীর বন্ধন হইতে মুক্তি, এই কথা প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ মনে করিতেন। শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—'অপরা জ্ঞান' ও 'পরা জ্ঞান'। 'অপরা' জ্ঞান ছিল নিকৃষ্ট অর্থাৎ জাগতিক বিষয় সম্বন্ধীয় এবং 'পরা' জ্ঞান ছিল ঈশ্বরকে লাভ করা সম্বন্ধীয়। পরাজ্ঞানই ছিল উৎকৃষ্ট জ্ঞান। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার এই লক্ষ্য অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, কারণ যে শিক্ষা মানব-জীবনকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে না, সেই শিক্ষার সার্থকতা কোথায়? বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও বৌদ্ধগণ সংসার-বিমুখতাকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন গ্রীসে—প্রাচীনত্বের দিক দিয়া প্রাচীন ভারতের পরই প্রাচীন গ্রীসের স্থান। গ্রীসের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং ঐ যুগের শিক্ষাব্যবস্থা তখনকার দিনের শিক্ষার লক্ষ্যের উপর যথেষ্ট আলোক সম্পাত করে।

(১) **সোফিষ্ট** (Sophist)—প্রাচীন গ্রীসে এক দল শিক্ষক ছিলেন, তাঁহারা সোফিষ্ট নামে পরিচিত। তাঁহারা সকলেই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সকলের উর্ধ্বে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার উগ্র সমর্থক ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁহাদের মতে মানুষের নিজস্ব বিচার-বিবেচনাই সবচেয়ে উঁচুতে, অতএব মানুষকে বাধামুক্ত করিয়া তাহাকে পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা শিক্ষার লক্ষ্য। মানুষ নিজেই সৎ-অসৎ বুঝিতে পারে। মানুষের

নিজস্বতাকে কোন কিছুই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে না। ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য এই কথা সোফিষ্টরা মনে করিতেন।

এথেন্স—সোফিষ্টদের পরে আমরা এথেন্সে **সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিষ্টটল** প্রভৃতি মনীষীদের দেখিতে পাই। তাঁহারাই এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তাঁহারা ব্যক্তিসত্বার অবাধ বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেও তাঁহারা শিক্ষার এক সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্যের কথা বলেন। তাঁহারা সোফিষ্টদের মত উগ্রভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমর্থন করেন নাই। উপরোক্ত মনীষীদের প্রভাবে এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থায় আনন্দ এবং সৌন্দর্যপ্রিয়তা স্থান পাইয়াছিল। ব্যক্তির শক্তি, রুচি এবং প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষের জীবন বিকশিত হইয়া উঠিবে, ইহাই ছিল এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। শিক্ষাব্যবস্থা সরকারের অধীন ছিল না, এথেন্সবাসীরা নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী সাহিত্য, দর্শন ও ললিতকলার সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। এথেন্সের শিক্ষার বিশেষ কথা ছিল সুন্দর দেহে সুন্দর মন। এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থায় বাহ্য-জীবন হইতে আধ্যাত্মিক জীবনের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইত। এই শিক্ষার লক্ষ্য পূর্ববর্তীদের শিক্ষার লক্ষ্য হইতে উন্নত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও ত্রুটীহীন একথাও বলা চলে না। ব্যক্তির উৎকর্ষ এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সমাজ-জীবনকে একেবারে এই শিক্ষাব্যবস্থায় উপেক্ষা করা হয়। ফলে এথেন্সে সমাজ ভালভাবে দানা বাঁধিয়া উঠে না। ইহারই ফলে সমাজবদ্ধ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আক্রমণের ফলে এথেন্সের পতন ঘটে।

স্পার্টা—আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই পাশাপাশি রাষ্ট্রদ্বয় এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে কোন বিষয়েই মিল ছিল না। শিক্ষা-ব্যাপারেও তাহাদের মধ্যে বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্পার্টার শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্পার্টার প্রত্যেকটি লোক রাষ্ট্রের জন্যই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। তাহার স্বতন্ত্র সত্বা কিছু নাই। সবল রাষ্ট্রজীবন গঠন করাই ছিল স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য। স্পার্টাবাসী রাজ্যের একটি অংশ, তাহার কোনই স্বতন্ত্র সত্বা নাই। এই কারণেই প্রত্যেক স্পার্টাবাসীকে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য হইতে হইত। রাষ্ট্রের সেবাই একমাত্র উদ্দেশ্য, এই জন্য শিশুকে প্রথম অবস্থা হইতে শিক্ষা-শিবিরে প্রেরণ করা হইত। শিশু ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি। দুর্বল ও বিকলাঙ্গ

শিশুকে মারিয়া ফেলা হইত, কারণ উহারা বাঁচিয়া থাকিলে রাষ্ট্র ও সমাজের ভারস্বরূপ হইয়া থাকিবে। অতএব উহাদিগকে বিদায় করাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া রাষ্ট্র মনে করিত। সাহিত্য চারুকলা, দর্শন ইত্যাদি স্পার্টাবাসীর শিক্ষা-জীবনের বহির্ভূত ছিল।

পরবর্তী যুগে—গ্রীক এবং রোমান সভ্যতা লুপ্ত হইলে পরে ইউরোপের শিক্ষা-ব্যবস্থা খ্রীষ্টধর্মের অনুশাসন অনুসারে চলিতে থাকে। ইহার ফলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে শিক্ষার নানা রকম সঙ্কীর্ণ লক্ষ্য দেখা যায় এবং শিক্ষার যে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী তাহা লোপ পাইয়া যায়। শিক্ষায় যথেষ্ট কৃত্রিমতা দেখা যাইতে থাকে। ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে দুইটি আন্দোলন দেখা যায়। প্রথমটি **মানবতাবাদ** এবং পরবর্তী যুগে **প্রকৃতিবাদ**। মানবতাবাদকে ইংরেজীতে বলা হয় Humanism, এবং প্রকৃতিবাদকে বলা হয় Naturalism। ক্রমে এই দুইটি মতবাদ উত্তর কালে সর্বদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

মানবতাবাদ—নবজাগরণের (Renaissanceএর) প্রথম দিকে মানবতাবাদিগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি প্রবর্তন করেন। তাঁহারা বলেন যে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকিবে মানুষ নিজে, অন্য কিছু এইখানে থাকিতে পারে না। তাঁহাদের মতে শিক্ষার উপাদান হইল মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। মানবতাবাদিগণের মূল উদ্দেশ্যও ছিল নবজাগরণের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের মত। নবজাগরণের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের চিন্তাধারার পুনঃপ্রবর্তন। মানবতাবাদিগণও ইহাই চাহিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছিল শিশু নিজে। ব্যক্তিত্বের বিকাশই ছিল সে যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানবতাবাদিগণও সেই কথাই বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন মানসিক বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য, কোন ধর্মগত বা অতীন্দ্রিয় কোন বিষয়বস্তু শিক্ষার উপাদান নয়। এই সময়ে ইউরোপ মহাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্যাকালটি সাইকোলজির (Faculty Psychology) বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্যাকালটি সাইকোলজি অনুযায়ী মনে করা হয় যে মানুষের বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি, স্মরণশক্তি ইত্যাদি কতকগুলি ক্ষমতা মানুষের মনে রহিয়াছে। মানবতাবাদিগণ এই সমস্ত গুণাবলীর বিকাশকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছিলেন।

প্রকৃতিবাদ—মানবসমাজে শিক্ষার পরিবেশ কৃত্রিম। এই কৃত্রিম পরিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ফরাসী দার্শনিক **রুশো** (Rousseau)। তিনি বলেন যে শিশুর শিক্ষা হইবে শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী। শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। শিশু শিক্ষা পাইবে তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মানবতাবাদিগণ শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের কার্যক্রমে একটু ত্রুটি ছিল। মানবতাবাদিগণ মানসিক ক্ষমতা বিকাশের অজুহাতে ল্যাটিন, গ্রীক সাহিত্য ও ব্যাকরণ ইত্যাদি ছাত্রের উপর চাপাইয়া দেন। ফলে ছাত্রের বিকাশ সেই দিক দিয়া হয় না, যদিও তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল সাধু। রুশো কিন্তু শিশুকে তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন। তিনি তাঁহার **'এমিল'** নামক গ্রন্থে তাঁহার মত অনুযায়ী আদর্শ শিক্ষার সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এমিলের জীবন শিক্ষার ভিতর দিয়া যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে, আমরা তাহা হইতেই রুশোর শিক্ষা সম্বন্ধীয় মতবাদ বুঝিতে পারি। তাঁহার মতে শিশুর শিক্ষা হইবে তাহার সামর্থ্য এবং আগ্রহ ও চাহিদা অনুযায়ী। মানুষ যে শিক্ষা দেয় তাহা কৃত্রিম, অতএব তাহা শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর। রুশোর মতে শিশুর জন্মের পর হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত শিশুকে কোন **ইতিবাচক শিক্ষা** (Positive Education) দেওয়া হইবে না। এই সময় শিশু **নেতিবাচক শিক্ষা** (Negative Education) লাভ করিবে। শিশুকে যদি প্রকৃতির কাছে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি হইতেই শিশু যথেষ্ট লাভ করিবে। প্রকৃতি হইতে আপনা আপনি শিশু যে শিক্ষা লাভ করিবে, তাহাই হইবে শিশুর শিক্ষার বুনিয়াদ। তাহার পর শিশুর বয়স ১২ বৎসর হইলে তখন সে পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিতে পারিবে। কিন্তু রুশো পুস্তক পাঠ হইতে আহরিত জ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তিনি পুস্তক পাঠের উপর প্রাধান্য দিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই স্তরে অর্থাৎ ১২ হইতে ১৫ বৎসরের সময় রুশো একটি মাত্র পুস্তকের কথা এমিলির পাঠ্য হিসাবে অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা হইতেছে রবিনসন ক্রুসো (Robinson Crusoe). কিন্তু প্রকৃতি হইতে লব্ধ জ্ঞানকে মনে যাহাতে ছাত্রের আরও ভাল করিয়া থিতাইয়া যায়, তাহার জন্য তিনি পুস্তকের সাহায্য লইতে বলিয়াছেন। শিশু অভ্যাসের দাস হইবে না, কারণ শিশুর যদি একেবারে অভ্যাস গঠিত হইয়া যায়, তাহা হইলে শিশুর স্বতন্ত্র

ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইবে না। রুশো মনে করিতেন, শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের কোন স্থান নাই। বিদ্যালয়কে তিনি অত্যন্ত কৃত্রিম আবেষ্টনী বলিয়া মনে করিতেন। রুশো **প্রত্যক্ষ শিক্ষা** বা formal education পছন্দ করিতেন না। কিন্তু তিনি বিদ্যালয় বা প্রত্যক্ষ শিক্ষাকে সমর্থন না করিলেও গৃহশিক্ষকের সাহায্য লওয়া সমর্থন করিতেন। গৃহশিক্ষক প্রত্যক্ষ শিক্ষা দিবেন না। তিনি শিক্ষার জন্য পরিবেশ রচনা করিবেন। রুশো **স্ত্রী-শিক্ষা** কিরূপ হইবে, তাহাও 'এমিল' বইটিতে নারী-ভূমিকা 'সোফিয়া'র চরিত্রের মধ্যে দিয়া পরিস্ফুট করিয়াছেন। পুরুষের শিক্ষা হইতে মেয়েদের শিক্ষা পৃথক। মেয়েদের শিক্ষা হইবে পুরুষের উপযুক্ত স্ত্রী হইতে পারা। পুরুষের শিক্ষা থাকিবে প্রকৃতির হাতে, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা হইবে সামাজিক অনুশাসন মত। লক্ষণীয় যে রুশো মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে গতানুগতিক ধারার উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় সম্পর্কে দর্শনশাস্ত্র

জীবনের লক্ষ্য কি তাহা প্রথমে স্থির করিয়া তবে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে। জীবনের লক্ষ্য একরূপ ও শিক্ষার লক্ষ্য অন্যরূপ এইরূপ হইতে পারে না, কারণ জীবনের লক্ষ্য-বস্তুতে পৌঁছাইতে হইলে যে শিক্ষার সাহায্য প্রয়োজন, সেই শিক্ষা সূচিত হইবে শিক্ষার লক্ষ্য দ্বারা।

মানুষ এবং তাহার জগৎ সম্বন্ধে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কয়েকটি দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সমস্ত দার্শনিক মতবাদকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাকেই Educational Philosophy বা **শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন** বলা হইয়া থাকে।

নিম্নে কয়েকটি মুখ্য মতবাদ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

ভাববাদ

জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে মতবাদগুলির মধ্যে ভাববাদ (Idealism) সবচেয়ে প্রাচীন। ভাববাদের মতে মানসিক বা অধ্যাত্ম জগৎ জড়জগৎ হইতে অনেক বেশী সত্য। মানুষের অন্তরস্থ আত্মা ভগবানের প্রকাশ। মানুষের আত্মা পরমাত্মার উপর নির্ভর করে এবং পরমাত্মা সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতীক বলিয়া মনে করা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মানুষের মধ্যে

যে প্রাণ আমরা পাই তাহা পরমাত্মার অংশ। সুতরাং জীবনের লক্ষ্য হইল জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অভেদত্ব উপলব্ধি করা।

জীবনের লক্ষ্য যদি জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অভেদত্ব হয়, তাহা হইলে শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য কি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য হইল **আত্মবিকাশ** বা self-development. শিশুর মধ্যে যে প্রাণ-অঙ্কুর অ-বিকশিত হইয়া আছে, তাহাকে বিকশিত করিয়া তোলাই হইতেছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভাববাদীদের মত, শিক্ষা শিশুকে নূতন কিছু দান করিতে পারে না, শুধু শিশুর মধ্যে যাহা আছে তাহাই শিক্ষার প্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠে। মালী যেমন হাজার চেষ্টা করিলেও আম গাছ হইতে জাম ফলাইতে পারে না, সেইরূপ ভাববাদীদের মতে শিশুর মধ্যে যাহা আছে, শিক্ষা তাহা বিকশিত করিতে পারে মাত্র, তাহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না।

ভাববাদীদের এই মতবাদ অনুযায়ীই শিশুর বিকাশকে চারা গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। একটি ছোট বীজের মধ্যে এক বিরাট বৃক্ষের ভবিষ্যৎ লুকাইয়া আছে, সেইরূপ একটি ছোট শিশুর মধ্যে পরমাত্মা বিরাজমান। শিক্ষার কাজ হইতেছে শিশুর মধ্যে যাহা অবিকশিত রহিয়াছে তাহা বিকশিত করা। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ **ফ্রয়েবেল** ভাববাদী ছিলেন এবং তিনি তাঁহার মতবাদ তাঁহার **কিণ্ডারগার্টেন** (Kindergarten) শিক্ষা-পদ্ধতিতে রূপায়িত করিয়াছেন। কিণ্ডারগার্টেন শব্দটির অর্থ হইতেছে **শিশুদের বাগান।** এই বাগানে গাছদের মতই শিশুরা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাও এই ভাববাদী মতবাদ দ্বারা পুষ্ট হইয়াছিল। শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—পরা ও অপরা। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, পরাজ্ঞান লক্ষ্য করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইত।

জড়বাদ

ভাববাদের পরে জড়বাদ বা Materialismএর কথা বলিতে হয়। এই মত অনুসারে পরমসত্তাকে স্বীকার করা হয় না। যাহা কিছু আমরা দেখি, সেই জড় জগৎকেই আমরা একমাত্র স্বীকৃতি দেই। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রাকৃতিক নিয়মগুলি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে বলিয়া দেখা গেল এবং মানুষও যখন তাহাদের উপর নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে

লাগিল, তখন হইতেই জড়বাদী দর্শনের সৃষ্টি হইল। সর্বশক্তিমান পরমাত্মা ঈশ্বরের শক্তির প্রতি মানুষের সন্দেহ দেখা গেল। বিশ্বজগৎ কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে চলিতেছে, কোনও পরমসত্বার ইহার উপর কোন হাত নাই। আমাদের এই জীবনই একমাত্র জীবন। এই জীবনের পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমাদের কোন আধ্যাত্মিক জগতে স্থান নাই, কোন পারলৌকিক জীবনকে জড়বাদীরা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিলেন। সুতরাং আমাদের এই বর্তমান ক্ষণস্থায়ী জীবনকে যতটা সুন্দর করিয়া যাপন করা যায় তাহাই হইল শিক্ষার কাজ। জড়বাদীরা তাই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করিবার সময় **ইহলৌকিক প্রয়োজন-বোধকে** সর্বাগ্রে রাখিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। প্রাচীনকালে ভারতে জড়বাদের প্রচার করেন চার্বাক। জীবনে সুখে বাস করাই হইতেছে এই জীবনের লক্ষ্য, মৃত্যুর পরে আত্মার পারলৌকিক কাল্পনিক অস্তিত্বকে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। এদিকে বর্তমানে বিজ্ঞানের জয়-যাত্রার ফলে পূর্বে যাহা নৈসর্গিক বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ তাহা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনে বাস করে এবং সে যে সমাজে আছে সেই সমাজের প্রয়োজনে বাস করে। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই হইতেছে শিক্ষার কাজ। ভাববাদীদের কাছে শিক্ষায় পরিবেশের গুরুত্ব অল্প, কারণ শিক্ষা কেবলমাত্র মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ বিকশিত করিতে পারে, উহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। কিন্তু **জড়বাদীদের কাছে শিক্ষার পরিবেশের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।** জড়বাদীদের মতে শিক্ষা মানুষের মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন সংঘটন করিতে পারে। শিক্ষা জড়বাদীদের মতে বুদ্ধি শাণিত করিতে পারে, মানুষের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে, তাহার নৈতিক ও সামাজিক বোধ জাগ্রত করিতে পারে, ইত্যাদি। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মনোবিজ্ঞানে **ব্যবহারবাদ** (Behaviourism) মূলতঃ জড়বাদী দর্শন হইতে উদ্ভূত।

কম্যুনিষ্টগণ জড়বাদী। তাহারা শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতির একটি প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

প্রকৃতিবাদ

জড়বাদের অন্তর্গত দুইটি দার্শনিক মতবাদের মধ্যে **প্রকৃতিবাদ** মতবাদ অন্যতম। প্রকৃতিবাদকে সম্পূর্ণ দার্শনিক মতবাদ বলা চলে না। ইহাকে

জড়বাদের অনুসিদ্ধান্ত বলা যায় এই কারণে যে প্রকৃতিবাদ প্রকৃতি ছাড়া অন্য কোন অপার্থিব সত্ত্বাকে কোন কিছুর কার্যকারণ বলিয়া স্বীকার করে না। প্রকৃতির উপরই ইহা একান্তভাবে নির্ভরশীল। প্রকৃতি শব্দটি এইখানে দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম অর্থে প্রকৃতির অর্থ বহিঃপ্রকৃতি, এবং দ্বিতীয় অর্থে শিক্ষার্থীর অন্তঃপ্রকৃতি। প্রথম অর্থ অনুযায়ী শিক্ষা বহিঃপ্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চলিবে, আর দ্বিতীয় অর্থে ছাত্রের যাহা অন্তর্নিহিত প্রকৃতি, সেই অনুযায়ী তাহার শিক্ষালাভ হইবে। অর্থাৎ ছাত্র তাহার চাহিদা অভিলাষ, রুচি অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করিবে। গতানুগতিক পদ্ধতি-অনুযায়ী সামাজিক নিয়ম-কানুন অনুযায়ী যে শিক্ষাব্যবস্থা তাহাতে ছাত্রের চাহিদা, রুচি, আগ্রহ, শক্তি, ইত্যাদির উপর কোনই গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। প্রকৃতিবাদ ঐ বিষয়ের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানায়।

প্রকৃতিবাদের প্রভাবের ফলে শিক্ষা ধীরে ধীরে মনস্তত্ত্বসম্মত হইতে থাকে। অনেক শিক্ষাবিদই শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে স্বীকার করে, অতএব তাঁহারা প্রকৃতিবাদের সমর্থক। এইরূপ সমর্থকদের মধ্যে **ফ্রয়েড, ম্যাকডুগাল** প্রমুখ শিক্ষাবিদদের নাম করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রুশো প্রমুখ বহু মনীষী প্রকৃতিবাদের সমর্থক। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ছাড়া শিশুর উপরই এই মতবাদে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ **শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার** (Child-centred education) **আরম্ভ প্রকৃতিবাদ হইতেই**। শিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদের অবদান খুব বেশী।

প্রয়োগবাদ

জীবন-দর্শনের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে শেষ অবদান হইল **প্রয়োগবাদ**। প্রয়োগবাদকে ইংরেজীতে Pragmatism বলা হয়। এই মতবাদের প্রথম প্রচারক ছিলেন **উইলিয়ম জেমস্**। উইলিয়ম জেমস্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা পরমসত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ মতবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক **জন ডিউই** ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি এবং এই মতবাদের অন্যান্য পৃষ্ঠপোষক সকলেই জড়বাদী। তাঁহারা জড়জগৎকেই মানিয়া লইয়াছেন।

প্রয়োগবাদের সঙ্গে প্রকৃতিবাদের যথেষ্ট **মিল** আছে। শিক্ষার্থীরা তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা পাইবে, এই কথা প্রয়োগবাদীরা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতিবাদের সঙ্গে প্রয়োগবাদের অন্য এক ক্ষেত্রে যথেষ্ট **অমিল** রহিয়াছে। প্রকৃতিবাদ ব্যক্তির বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়াছে, কিন্তু সমাজের উন্নতির দিকে প্রকৃতিবাদের বিশেষ লক্ষ্য নাই। প্রয়োগবাদে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই মতবাদের ভিত্তিস্বরূপ হইতেছে দুইটি জিনিষ—**গতিশীলতা** (Dynamism) এবং **আপেক্ষিকতা** (Relativity)। জীবন পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। আজ যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, কাল তাহা সত্য বলিয়া মনে নাও হইতে পারে। **জন ডিউইর** মত অনুসারে জীবনের লক্ষ্য তথা শিক্ষার লক্ষ্য পূর্বাহ্নে স্থির করিয়া রাখা সম্ভব নয়। তাঁহার মতে জীবনের পথে চলিতে চলিতে জীবনের লক্ষ্য স্পষ্টতর হইবে এবং শিক্ষা গ্রহণ করিবার সময়ই শিক্ষার লক্ষ্য প্রতিভাত হইবে। জন ডিউই বলেন যে শিক্ষা একটা প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন একটি জিনিসের লক্ষ্যের কথা বলা হইলে সত্যই মনে হয় যে লক্ষ্য বস্তুটি ঐ বস্তুর সীমানার বাহিরে অবস্থিত। ঐ লক্ষ্য বস্তুতে পৌছানই উদ্দেশ্য। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, যে কোন বস্তুর লক্ষ্যবস্তু ঐ বস্তুর সীমানার বাহিরে অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু শিক্ষা হইল একটি প্রক্রিয়া। ইহা শিশুর বৃদ্ধির সঙ্গে একই অর্থবোধক। অতএব কোন একটি প্রক্রিয়ার সীমানার বাহিরে কোন লক্ষ্যবস্তু অবস্থিত থাকিতে পারে না। কর্ম এবং লক্ষ্যকে পৃথক করা সম্ভব নয়। কোন কর্মের লক্ষ্য ঐ কর্মেরই অন্তর্গত। যেমন 'খাওয়া'-রূপ কর্মের লক্ষ্য হইল 'আরও খাওয়া' অর্থাৎ 'খাওয়া'রূপ কর্মেরই উহা অন্তর্গত। এই কারণেই বলা যাইতে পারে যে শিক্ষারূপ কর্মের লক্ষ্য হইল আরও শিক্ষা। গতিশীল জীবনে শিক্ষার নানা দিক দেখা দিবে। তাই ডিউইর মতে শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নাই। তিনি বলেন যে প্রতি স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য আরও শিক্ষার দিকে পরিচালিত করিবে। আপেক্ষিকতা সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে আজ যাহা সত্য কাল তাহা সত্য নাও হইতে পারে, অতএব কোন কিছুকেই দেশ-কাল-পাত্রনিরপেক্ষ বলিয়া বলা চলে না। আজ যাহা একজনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কাল তাহার প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে। অতএব

প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক সমাজের পক্ষে যদি শিক্ষার লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় তাহা হইলে বলার কিছু থাকে না। এই জন্য ডিউইর মতে শিক্ষার সার্বজনীন লক্ষ্য থাকিতে পারে না।

ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা

ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বহু প্রাচীনকাল হইতে শিক্ষার লক্ষ্য এবং সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। আমরা শিক্ষার লক্ষ্য বিশ্লেষণ করিবার সময় এই দুই ভাবধারার প্রভাব সম্বন্ধে বলিয়াছি, কিন্তু উহাদিগের বিষয়ে স্পষ্টতঃ আলোচনা করা হয় নাই। এইখানে আমরা দুইটি মতবাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিব।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রথম ও মূল কথা হইতেছে, ব্যক্তি-জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ব্যক্তি-জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া এই মতবাদের আর অন্য কোন লক্ষ্য নাই। মানুষ একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সত্বা এবং সমাজ সংসারে যেখানেই সে বাস করুক না কেন তাহার আপন সত্বা সর্বোচ্চ। প্রত্যেকটি মানুষ অপর মানুষ হইতে পৃথক অবস্থায় রহিয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তি কতকগুলি বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ঐগুলি তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। এইগুলি বিকশিত করিয়া তোলাই হইতেছে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্টগণও এই ধারণার মতাবলম্বী ছিলেন। প্রাচীন ভারতেও দেখা যায়, ব্যক্তির উন্নতিসাধন ও ভগবানকে লাভ করা ছিল জীবনের উদ্দেশ্য। স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথও ব্যক্তির জীবনকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ **নান্** সাহেবও বলেন, স্বাধীন কাজ করিবার সুযোগ লাভ করিলে মানুষ ভাল কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিবে। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা প্রয়োজন বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। অতএব রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল প্রত্যেকটি মানুষকে তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আদর্শবাদী জীবন-দর্শন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে

করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন আদর্শ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই আদর্শকে রূপায়িত করাই জীবনের আসল উদ্দেশ্য। তাহার জীবনপথ হইতে তাহাকে সরাইয়া আনিয়া অন্য পথে চালিত করিবার কোন ক্ষমতা সমাজ বা রাষ্ট্রের নাই। **রুশো** ও **জন লক** এই যুগে শিক্ষার এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিশেষ সমর্থক।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

যাঁহারা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের উল্টা কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাহার অস্তিত্ব সমাজে। সমাজের মঙ্গলেই তাহাকে পরিচালিত হইতে হইবে। পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এককভাবে কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, এবং পূর্বেও পারে নাই বলিয়াই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়াছে। অতএব সমাজকে যদি বাঁচাইয়া রাখা যায় তবেই ব্যক্তিবিশেষ বাঁচিয়া থাকিবে। সমাজের স্বার্থের জন্য ব্যক্তির স্বার্থ খর্ব করিতে হইবে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে যদি গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে শিক্ষাও ঐ মতবাদ দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইবে, এই কথা বলাই বাহুল্য। এই মতবাদ অনুসারে শিক্ষার উদ্দেশ্যই হইল যে শিক্ষা যেন মানুষকে **সমাজের সেবার জন্য উপযুক্ত** করিয়া তুলিতে পারে। সামাজিক কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়াই মানুষ তাহার জীবনে তৃপ্তি লাভ করিবে, ব্যক্তির চাহিদা হিসাবে নয়। সমাজের চাহিদা হিসাবেই ব্যক্তির শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইবে। সমাজের যাহা চাহিদা তাহা বেশীর ভাগ লোকের চাহিদা সূচিত করে। অতএব যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা সমাজের চাহিদার বিপরীত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সমাজের চাহিদার স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে হইবে। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে যদি ব্যক্তির চাহিদা মিটাইতে যাওয়া হয়, তবে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির চাহিদা ক্ষুণ্ণ করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তির চাহিদা সমাজের চাহিদার পরিপন্থী, সে ব্যক্তিও সমাজের জন্য স্বার্থ বিসর্জন দিয়া উপকৃত হইবে। কারণ সে সমাজেরই অন্যতম সভ্য।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করিয়া নানা ভাবে উপকৃত হইতেছে। সে শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্ত, শিক্ষা ইত্যাদি নানা প্রকার সামাজিক সুবিধা ভোগ

করিতেছে। যতই আমরা সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছি, ততই আমাদের জীবনে জটিলতা প্রবেশ করিতেছে। এই জটিলতা ব্যক্তির দ্বারা সমাধান সম্ভব নয়, সমাজই এই জটিলতার সমাধান করিতে সক্ষম। ইহার ফলেই আমরা সমাজের উপর বেশী নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছি। সমাজের বাহিরে যাইয়া এককভাবে বাস করিবার কল্পনা আমরা করিতে পারি না, কারণ তাহা সম্ভব নয়। এই জন্যই সমাজকে শক্তিশালী করিয়া তোলার দিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

এদিকে সমাজতন্ত্রবাদী সমাজকে বহু উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে এই মতবাদের উগ্র সমর্থক বলা যাইতে পারে। তাঁহারা সমাজকে তুলনা করিয়াছেন একটি জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গে এবং ব্যক্তিকে তুলনা করিয়াছেন দেহের কোষের সঙ্গে। তাঁহারা বলেন যে দেহের কোষগুলির যেমন স্বকীয় অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ তাহাদিগকে যদি বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে যেমন কোষটি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ সমাজের বাহিরে গিয়া ব্যক্তিরও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ যে একটি প্রাচীন মতবাদ ইহা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন গ্রীসে **স্পার্টাতে** এই মতবাদের পরিচয় আমরা পাই। শিক্ষাক্ষেত্রে স্পার্টানগণ এই মতের সমর্থক ছিল। গ্রীসের অপর দেশ এথেন্স ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী ছিল কিন্তু স্পার্টা অনুসরণ করিত সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে। স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্পার্টার প্রত্যেক ছাত্র রাষ্ট্রের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করিত। যে সব শিশু বিকলাঙ্গ এবং রাষ্ট্রের সেবা করিতে অসমর্থ, সেই সব শিশুকে মারিয়া ফেলা হইত। জীবনের সার্থকতা রাষ্ট্রের সেবায়, এই কথা স্পার্টাবাসীরা মনে করিত। শিশু ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি। রাষ্ট্রের সেবার জন্য শিশু যে কোন ভাবে ব্যবহৃত হইত। স্পার্টান শিশুরা সাধারণতঃ সৈনিকবৃত্তি শিক্ষা করিত, কারণ শত্রু-পরিবৃত স্পার্টাকে রক্ষা করাই ছিল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

প্রাচীন যুগে স্পার্টা ব্যতীত অন্য কোন দেশে শিক্ষায় সমাজতান্ত্রিক মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের প্রসার হইয়াছে এবং সাথে সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রভাবও দেখা যাইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে **সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা** পরিচালিত হইতেছে। কমিউনিষ্ট দেশসমূহে আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের

জন্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শে শিক্ষা-ব্যবস্থা চলিতেছে। আমাদের দেশ ভাববাদের দেশ। এইখানে এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় নাই। **গান্ধীজী** ছিলেন সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাবিদ্। তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষায় আদর্শ সমাজ-জীবন রচনার কথা বলা হইয়াছে। ভারত সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক অবস্থায় জাতীয় 'প্যাটার্ন' হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কার্যতঃ ইহা ভালভাবে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে আমরা দুইটি মতবাদ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। মানুষের দ্বারা সমাজ প্রভাবান্বিত আবার সমাজের প্রভাবও মানুষের উপর রহিয়াছে। দুই দলই নিজ নিজ আদর্শকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করিতে আগ্রহী। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারে সকলেই যে একমত পোষণ করিবে ইহাও উচিত নয়। বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ, এই যুগে সকলে এক ছাঁচে গড়িয়া উঠিবে ইহা বাঞ্ছনীয় নয়। অথচ শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে একই প্রতিষ্ঠানে যদি বিভিন্ন মত পোষণ করা হয়, তাহা হইলে সুষ্ঠু ভাবে কাজ সম্পাদনও হইবে না। কিন্তু একথাও সত্যি যে **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ** এবং **সমাজতন্ত্রবাদ কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়।** উভয়েই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশিষ্টতার দাবী করিতে পারে। অতএব **উভয়ের মধ্যে যতটা সামঞ্জস্য বিধান করা যায়** তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। উভয়ের বৈশিষ্ট্যই যাহাতে থাকে, অথচ তাহাদের মধ্যে কোন সংঘাতের সৃষ্টি না হয়, তাহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

ব্যক্তি সমাজদ্বারা প্রভাবান্বিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও সে স্বতন্ত্র। তাহার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আশা, নিরাশা, সুখ-দুঃখ সমাজের সাথে অনেকাংশে এক, কিন্তু তাহা হইলেও ভিন্ন। প্রত্যেক মানুষ নিজের বিশিষ্টতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। উহাকে প্রত্যাখ্যান করা সমাজের পক্ষে উচিত নহে। সে সমাজের উর্ধ্বে উঠিয়া সমাজকে উন্নত করিতে সক্ষম হয়।

পক্ষান্তরে সমাজকে কয়েক জন ব্যক্তির সমষ্টি মনে করা হইলে ভুলকে পোষণ করা হইবে। ব্যক্তি কোনও কারণে অপসৃত হইলে সমাজের কোন পরিবর্তন হয় না। সমাজ স্বকীয় নিয়মে বিকাশ লাভ করে এবং

সমাজের দ্বারা ব্যক্তি প্রভাবান্বিত হয় তাহা আমরা দেখিয়াছি। ব্যক্তি সমাজের মধ্যে তাহার সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়া থাকে।

ব্যক্তি ও সমাজের গুরুত্ব আমরা মোটেই অস্বীকার করিতে পারি না। উভয়ই সত্য। কোনটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। এককে বাদ দিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থাও করা সম্ভব নয়। যেহেতু উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীল সেই হেতু শিক্ষা-ব্যবস্থাও উভয়ের বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করিতে হইবে। একের উপর অন্যের প্রাধান্য দেওয়া উচিত হইবে না। উভয়ের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিলে সমাজ ব্যক্তিদ্বারাই সমৃদ্ধ হইবে। সমাজের মধ্যে অবস্থান করার ফলে ব্যক্তির যদি পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহা হইলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইল।

শিক্ষায় গণতন্ত্র

জন ডিউইর মত অনুসারে **আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা** হইতেছে **গণতন্ত্র**। ঐরূপ আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের একটা সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। জন ডিউইর মতে ত্রুটিপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার ফলেই ব্যক্তিতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে সমাজ ও ব্যক্তির চাহিদা এক। একে অপরের দ্বারা পরিপুষ্ট। সেইখানে বিরোধ কোথায়।

জন ডিউইর মতে আদর্শ গণতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে **শিক্ষা-ব্যবস্থারও গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ** করিয়া চলিতে হইবে। তাহা না হইলে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বসিয়া পড়িবে। আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পিছনে রহিয়াছে প্রত্যেক নাগরিকের গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা। প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা সুসম্পন্ন হইলেই আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজস্ব স্বার্থ-চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠিয়া সমষ্টির কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইবে, তাহা হইলে আদর্শ-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, নিজেরও ব্যক্তিত্ব অর্জনে কোনও রূপ বাধা থাকিবে না।

References

1. Groundwork of Educational Theory—Ross.
2. শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি—শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী
3. আধুনিক শিক্ষা-তত্ত্ব—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য
4. শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব—শ্রীঅরুণ ঘোষ

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষার প্রণালী

সৃষ্টির পর হইতেই মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিয়া আসিতেছে। সেই প্রচেষ্টায় মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ফলে মানুষ পাইয়াছে শিক্ষা। মানুষ পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন করিতে পারিয়াছে বলিয়াই সে শিক্ষালাভ করিয়াছে। মানুষ পুরাতন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া নূতন জ্ঞান লাভ করিতেছে।

মানুষের জীবনধারা অব্যাহত রহিয়াছে। মানুষ তাহার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাহার বংশধরদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া যাইতেছে। অবশ্য এই উত্তরাধিকারও সে তাহার পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাও আমরা জানি। পূর্বপুরুষদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উত্তরপুরুষদের মধ্যে **সহজাত প্রবৃত্তি** বা Instinctরূপে বর্তমান রহিয়াছে। জীবমাত্রেই জীবন যাপনের মধ্য দিয়া কতকগুলি **অভিজ্ঞতা** সঞ্চয় করে, এবং অভিজ্ঞতা-গুলির মধ্যে যেগুলি জীবনে চলার পথের জন্য বিশেষ প্রয়োজন, সেগুলি সে সঞ্চয় করিয়া রাখে মনের মধ্যে। এক দিকে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং পক্ষান্তরে সে পরবর্তী বংশধরদের জন্য অর্জিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই ভাবে অভিজ্ঞতা ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

মানুষের মনের জগতেও এইরূপ অর্জন ও সঞ্চয় চলিতেছে। মানুষের মনের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে মানুষ যখন কাজ করে, তখন সে তাহার পুরাতন অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। মনে প্রতিক্ষণ এইরূপ অর্জন ও সঞ্চয়ের কাজ চলিতেছে। মন হইতেছে রক্ষণশীল। জীব এবং মানুষের পূর্ববর্তীদের বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে বংশধরদের মধ্যে নিঃসৃত হয়। শুধু স্মৃতি অবশিষ্ট থাকে। এই স্মৃতিধারা মনের একটি বিশেষ উপাদান। একটি উদাহরণের সাহায্য লইলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। আজ যদি কারও চড়ুইভাতির কথা মনে পড়ে, তাহা হইলে সেই চড়ুইভাতির অভিজ্ঞতা তাহার মনের দৃশ্যপটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এই অভিজ্ঞতাটি তাহার মনে সঞ্চিত

রহিয়াছে বলিয়াই আজ তাহার চড়ুইভাতির কথা মনে করা সম্ভব হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যতটুকু তাহার মনে পড়িতেছে তাহা তাহার স্মৃতি-ভাণ্ডারের সামান্য অংশ মাত্র। মনের গোপন ভাণ্ডারে মানুষের যে স্মৃতিধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ স্যর **পার্‌সি নান্** নাম দিয়াছেন **Mneme.**

মানুষের মত সর্বরকম জীবদের মনের নিম্নস্তরে সমস্ত জাতির ইতিহাস বিন্যস্ত রহিয়াছে। তা যদি না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের আচরণের মধ্যে বৈষম্য দেখা যাইত। ইহাও স্মৃতিরক্ষা করিবার বিষয়। কুকুর শুইবার পূর্বে সে জায়গাটার চারিদিকে ঘুরপাক খায়, বাবুই পাখী একই রকমের বাসা নির্মাণ করে, তিমি জাতীয় মাছ আটলান্টিক সাগরের একটি বিশেষ অংশে যাইয়া ডিম পাড়িয়া থাকে। অতএব মানুষ ও নিম্নস্তরের প্রাণীর মনের এই **রক্ষণশীলতা** অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার। মানুষ বা পশু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সেগুলি আসলে স্মৃতিধারা নয়। অভিজ্ঞতা মনের ভাণ্ডার হইতে ফিরিয়া আসে না, আসে তাহার ফল। শারীর-শাস্ত্র অনুযায়ী বলিতে পারা যায় যে, প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা লাভের ফল হিসাবে মস্তিষ্কের ভিতরে পরিবর্তন ঘটে এবং কাজের মধ্যে তাহা প্রকাশ পায়। এই ভাবে স্মৃতিরক্ষার প্রকৃতিকে স্যার পার্‌সি নানের ভাষায় বলা হয় Engram বা **মনের স্মৃতি-সংরক্ষণী শক্তি**।

মনের আর একটি ধর্ম আছে। তাহাকে বলা হয় **স্বাভাবিক প্রেরণা**। নান্ সাহেবের মতে মানুষ এবং উচ্চশ্রেণীর পশুরা এই প্রেরণার শক্তিতে চলে। পক্ষান্তরে নিম্নশ্রেণীর পশুরা চেতনাতীত কোন এক শক্তির সাহায্যে কাজ করে। স্যার পার্‌সি নান্ এই বৃত্তির নামকরণ করিয়াছেন Horme অর্থাৎ **'এষণা'**। এষণা প্রেরণা হইতে ব্যাপক এবং ইহার মূলে রহিয়াছে **প্রাণশক্তি**।

স্মৃতিধারা অর্থাৎ mneme এবং প্রাণশক্তি বা horme মনের দুইটি উপাদান হইলেও শিক্ষা ব্যাপারে উহারা যুক্তভাবে কাজ করে। দুইয়ের পরস্পর সহযোগিতা না থাকিলে শিক্ষার কাজ চলিতে পারে না। শিক্ষা-ব্যাপারে রহিয়াছে দৈহিক ক্রিয়ার পিছনে মন এবং মনের বিকাশ হয় দেহের মধ্য দিয়া। সুতরাং শিক্ষা-ব্যাপারে দেহ ও মনের সুসমঞ্জস অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি।

শিক্ষাবিদ্ **জেম্‌স্** বলিয়াছেন মানুষের যে, **স্মৃতিশক্তি** আছে তাহা একটিমাত্র নয়। নূতন অবস্থায় ও নূতন পরিবেশে নূতন অভিজ্ঞতাগুলির চাপে স্মৃতিশক্তির স্তরে বহু বুদ্‌বুদ ভাসিয়া উঠে। এই সময় কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া মানুষের সজাগ মনে কতকগুলি পুঞ্জীকৃত ভাবের সৃষ্টি হয়। এই **স্মারক-সমবায়**কে ইংরেজীতে **Association of Ideas** বলা হয়। এই স্মারক-সমবায় যাহার যত বেশী, স্মৃতিশক্তি তাহার তত নিখুঁত। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা যায়। একটি ছাত্র হয়ত পড়াশুনায় মোটেই ভাল নয়, কিন্তু সিনেমা বিষয়ে সব কিছু তাহার নখদর্পণে। কোন আর্টিষ্ট কি রকম, সে কি রকমভাবে চলা-ফেরা করে, কোন্ ছবিতে সেই আর্টিষ্ট অভিনয় করিয়াছে, ইত্যাদি সব কিছুই তাহার মুখস্থ। ইহার কারণ সেই ছাত্রটি অবিরত সে-সব বিষয় লইয়া আলোচনা করে। সে পৃথকভাবে ঐ সব লইয়া আলোচনা করে না, সূত্র-নিবদ্ধভাবে আলোচনা করে। জেমসের পরবর্তী শিক্ষাবিদ্‌রা বলেন যে এই স্মারক-সমবায় বা **Association of Ideas** বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেকটি খণ্ডিত অভিজ্ঞতার অবশেষ সমীকৃত হইয়া মনের ভিতরে সঞ্চিত হয়। দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ **হার্বার্ট** (Herbart) এই সমীকৃত **স্মারক-পিণ্ডের** নাম দিয়াছেন **Apperception masses**। শিক্ষাবিদ্ নান্ ইহার নাম দিয়াছেন **প্রত্যভিজ্ঞা-সমবায়** বা **Engram Complexes**. উদাহরণ দিয়া বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এক বাড়ীতে প্রতিদিন একজন দইওয়ালা দই বিক্রয় করিতে আসে। বাড়ীর কুকুরটা দইওয়ালার সঙ্গে ভাব জমাইতে যায়। কিন্তু দইওয়ালা লাঠি দিয়া কুকুরকে মারে। সেই সময় হইতে কুকুরটি বাড়ীর এককোণে ভয়ে বা ক্রোধে লুকাইয়া থাকে। কুকুরের মনে বিশ্বাস দইওয়ালার চেহারা, তাহার কণ্ঠস্বর, নিজের শরীরের লাঠিপ্রহার-জনিত ব্যথা, রাগ, ভয় ইত্যাদি একত্র সমীকৃত হইয়াছে। ইহার পর দইওয়ালার শুধু কণ্ঠস্বর কিংবা ঐ বাড়ীতে আসাতেই কুকুরের মনে ভয় বা ক্রোধের সঞ্চার করিত। সমস্ত অবস্থা এবং স্মারক ঘটনাগুলি একত্র হইবার প্রয়োজন ছিল না। ইতিমধ্যেই কুকুরের মনে প্রত্যভিজ্ঞা-সমবায় সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহার নিজের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিকে জাগাইয়াছে। অধ্যাপক **Stout** বলিয়াছেন যে এই প্রত্যভিজ্ঞা-সমবায়ের মূল কতকগুলি ঘটনার পারস্পরিক সম্বন্ধ নয়। কোন

ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থবোধের অভিঘাত। শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার কতখানি প্রভাব তাহা এইবার দেখা যাইতে পারে। প্রথমে কুকুরটির ইচ্ছা ছিল সে দই-ওয়ালার সঙ্গে ভাব করে, কিন্তু পরে তাহার প্রাথমিক প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটিল। খেলার প্রবৃত্তির স্থলে জাগিল হিংসা-প্রবৃত্তি। সে এখন দইওয়ালাকে কামড়াইতে চায়। তাহার স্বার্থবোধের ভিন্নরূপ অর্থ ধারণ করিল। এই-ভাবে শিক্ষা চলিতে থাকে। **সমীকরণ প্রবৃত্তি** শিক্ষা-ব্যাপারে অদ্ভুতভাবে দেখা যায়। হাতের কাজে বা মানসিক কাজে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে যদি শিক্ষার্থী বিশ্রাম লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ের সমীকরণে সাহায্য পাইয়া থাকে। মনের মধ্যে পঠিত বিষয় বা হাতের কাজের দক্ষতা থিতাইয়া যায়, ফলে হয় শিক্ষা। শিক্ষার্থীর বিশ্রাম সময়ে এমন কি নিদ্রার মধ্যেও কোন কোন সময় জটিল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে "We learn to skate in summer and swim in winter." অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে আমরা বরফের উপর চাকি খেলা শিখি, আর শীতকালে শিখি সাঁতার। অনেক সময় দেখা যায় একজন গানের শিক্ষার্থী একটি গান গলায় তুলিয়া লইল, কিন্তু কিছু পরে সে সব স্বর ভুলিয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল সে গানটি সুন্দরভাবে গাহিতে পারে। কেন? ইহার অন্তর্নিহিত কারণ এই যে, অবসর সময়ে পূর্ব আহরিত জ্ঞানের উপর নূতন আলোকপাত হয়, ফলে উহা আমরা আয়ত্ত করিয়া ফেলি। অর্থাৎ নির্জ্ঞান মনের স্তরে শিক্ষার কাজটা চলিতে থাকে বলিয়া আমরা অবসর সময়েও শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। **ডক্টর ব্যালার্ড** পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যদি মুখস্থ করা একটি কবিতা টাটকা যতটা মনে না রাখা যায়, দুই তিন দিন পরে সেই কবিতাটি আরও ভাল মুখস্থ হয়। অধ্যাপক **রস্** (Ross) এক স্থানে বলিয়াছেন যে একটি ছাত্র অঙ্কের একটি জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতে না পারিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। তাঁহার ঘুমের মধ্যেই সে অঙ্কের প্রশ্নের সমাধান পাইয়া যায় এবং তারপর তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। রস্ সাহেব এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, অঙ্কবিষয়-সম্পৃক্ত স্মৃত্যাবিশেষগুলি খুবই সক্রিয় ছিল, ফলে উহারা আত্মপ্রকাশের জন্য খুবই উন্মুখ হইয়া উঠে এবং ছাত্রের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। অধ্যাপক শিক্ষাবিদ্ রস্ আরও বলিয়াছেন যে, অনেক সময় নূতন শিক্ষক তাঁহার ছাত্রদের ভালভাবে পড়াইয়াও ভাল ফল

পান না। এক্ষেত্রে নূতন শিক্ষকেরা হতাশ হইয়া পড়েন। কিন্তু শিক্ষকের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। ছাত্রদের কিছুটা সময় দেওয়া যাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষকেরা শিক্ষাদান সম্পর্কিত বিষয়গুলির **'স্মৃত্যু-স্থাপন'** হইয়া যায়। ফলে যাহারা প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রথমে পারে নাই, তাহারা সমস্যার সমাধান করিতে পারে। মনের সংরক্ষণী-বৃত্তি ও সঞ্চয়ী-বৃত্তির জন্যই এইরূপ শিক্ষা সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা বারংবার লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাই। মনের এই বিভিন্ন বৃত্তির খেলা আমরা অধ্যাপক **থর্নডাইকের** (Thorndyke) বিড়ালকে খাঁচায় পুরিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাই। একটি খাঁচায় একটি বিড়ালকে আবদ্ধ করিয়া খাঁচার ঠিক বাহিরে বিড়ালের জন্য কিছু খাবার রাখা হয়। খাঁচা হইতে বাহির হইবার পথ ছিল। কিন্তু সেই বাহির হইবার পথের ইঙ্গিতটি পাইতে বিড়ালকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। বিড়ালটি প্রথমে গোঙরায় এবং লেজ ফুলাইয়া খাঁচার ভিতর ঘুরিতে থাকে। অনেক চেষ্টা এবং অনেক ভ্রান্তির পথ পার হইয়া বিড়াল খাঁচার বাহিরে আসিতে পারে। খাদ্য-খাওয়া বিড়ালের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। ঐ বিড়ালটি লইয়া বারে বারে একইরূপ পরীক্ষা করা হয়। বিড়ালটি এইবার গর্জায় না। পূর্বের ভ্রান্ত সংস্কারগুলি সে বর্জন করে এবং একটু চেষ্টার পর বিড়ালটি খাঁচার দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিতে থাকে। বিড়ালের প্রচেষ্টায়, তাহার অভ্যাসে বর্জনযোগ্য অংশগুলি ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়ে। বাকীগুলি সুসংবদ্ধ হইয়া যায়। বিড়ালের প্রচেষ্টার মধ্যে কতকগুলি ছিল সার্থক, কতকগুলি ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে বিড়ালের সমৃদ্ধির মধ্যে একটি ছাপ পড়ে। বিড়াল মনের সংরক্ষণী বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ব্যর্থ প্রচেষ্টা বাদ দিয়া উপার্জনী বৃত্তির সাহায্যে সার্থক প্রচেষ্টার অনুশীলন করে। এইভাবে **মনের জ্ঞান অর্জন ও সংরক্ষণের প্রকৃতির যৌথ চেষ্টায় আমাদের শিক্ষার কাজ চলিয়া থাকে।**

পুরাতন সঞ্চয়ের সাহায্য না পাইলে নূতন সৃষ্টি সম্ভবই হয় না। এই কারণে বলা চলে যে, **সৃষ্টি এবং সঞ্চয় পরস্পর বিরোধী নয়,** একে অন্যের হইতে পৃথক নয়, বরং উহারা **একের উপর অন্যে নির্ভরশীল।**

References :

1. Education ; Its Data and First Principles—P. Nunn.
2. History of Infant Education—Rusk.
3. শিক্ষা-বিজ্ঞান—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নূতন শিক্ষাব্রতী

মামুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা

আজ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্প্রদায়কে যদি বলা যায় যে তাঁহারা বর্তমানে নূতন শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকতার জন্য উপযুক্ত নহেন, তাঁহাদের নূতন করিয়া শিক্ষকতা সম্পর্কিত নূতন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে, তাহা হইলে হয়ত অনেকেই কথাটাকে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিয়া লইবেন না। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই এই উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। প্রত্যেক শিক্ষার বা শিক্ষণেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। যাহারা পূর্বে মামুলি শিক্ষণ বিদ্যালয়ে এক বৎসর পাঠ সমাপ্ত করিয়া শিক্ষকতা কার্যে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া সেখানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তাঁহারা তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই জানিয়াছেন, শিখিয়াছেন। সেই সময়কার আদর্শ অনুযায়ী তাঁহারা শিখিয়াছেন শিক্ষকের স্থান সকলের উচ্চে, তাহার পর পুস্তকের বা প্যাঠ্যসূচীর স্থান, আর সর্বশেষে রহিয়াছে শিশু। শিক্ষাদান-ব্যবস্থার এই ক্রমের মধ্যে শিক্ষক নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছেন—মনস্তত্ত্বের দিক হইতে, শিক্ষানীতির দিক হইতে আর বিদ্যালয় সংস্থা ও পরিচালনার দিক হইতেও। কিন্তু এই মনোভাব বর্তমান নূতন শিক্ষার একান্ত পরিপন্থী নয় কি? পূর্বে শিশু ছিল বৃত্তের পরিধিতে, আজ শিশু কেন্দ্রে; অতএব এই দুই অবস্থায় শিশু শিক্ষার দ্বারা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম ইহা খুবই স্পষ্ট। তাহা হইলে বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে যে আবার নূতন করিয়া ট্রেনিং লইতে হইবে এই উক্তি একেবারে অযৌক্তিক, একথা আর জোর করিয়া বলা চলে না। মামুলি শিক্ষাদানের আওতায় বর্ধিত হইয়া প্রকৃত শিক্ষা বলিতে তাঁহারা পঠিতব্য বিষয়বস্তু মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় পাশ করাই শিক্ষার মূল কথা বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছেন। অতএব শিক্ষকতা কার্যে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকিলেও নূতন শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহারা নূতন

শিক্ষাব্রতী। পুরাতন অবস্থা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া আনিয়া নূতনের সাথে সাঙ্গীকরণ সহজ কথা নয়। অতএব পুরাতন অভিজ্ঞ শিক্ষককেও আজ নূতন শিক্ষক বলিয়া শিক্ষাকার্যের নূতন নূতন বিষয়বস্তু ও ভাবধারাকে আয়ত্ত করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

মামুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ট্রেনিং-বিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকা

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে স্পেশাল কেডারের স্কুল সহ প্রায় ১৮ হাজার ৭ শত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়গুলি প্রায় সকলই জেলা স্কুল বোর্ডের অধীন এবং ঐ সংস্থা দ্বারাই পরিচালিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ৫৩ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন। তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন মাত্র ট্রেনিং-প্রাপ্ত এবং বাকী সব ট্রেনিং-প্রাপ্ত নহেন। ট্রেনিং-প্রাপ্ত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও কি করিয়া আবার নূতন ব্যবস্থায় নূতন শিক্ষাব্রতী, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যাঁহারা ট্রেনিং-প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা ত নূতন শিক্ষাব্রতী বটেই। তবে ইঁহাদের পক্ষে একটি কথা বলিবার আছে। ইঁহারা যেহেতু কোন ট্রেনিংই প্রাপ্ত হন নাই, সেই হেতু পুরাতন ও নূতনের টানা পোড়েনে তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত কম অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। তাঁহারা ট্রেনিং-প্রাপ্তগণ অপেক্ষা খানিকটা বেশী খোলা মন লইয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন। ১৯৫০ সন হইতে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যসূচী সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে চালু করা হইয়াছে, অথচ যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সেই পাঠ্যসূচী রচিত হইয়াছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে উপযুক্ত মর্যাদা দিবার মত কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। পুরাতন ট্রেনিং-প্রাপ্ত এবং ট্রেনিং-প্রাপ্ত নহেন এমন সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার উপর ঐ পাঠ্যসূচী চালু করিবার ভার হঠাৎ দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যাকারী ও সাহায্যকারী হিসাবে, তাঁহাদের হাতে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত "শিক্ষণব্যবহারিকা" দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ব্যবস্থা মন্দের ভাল সন্দেহ নাই, কারণ অতগুলি শিক্ষককে হঠাৎ কোনরূপ ট্রেনিং দিবার কোন ব্যবস্থাই সহসা করিয়া উঠা সম্ভব নয়। কিন্তু কার্য্যকরী জ্ঞান লাভের জন্য কার্য্যকরী আবহাওয়া সৃষ্টি করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। উত্তরপ্রদেশে এই সমস্যা সমাধানের জন্য এক উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করিয়া নূতন বুনিয়াদী ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিযুক্ত করা হইয়াছে, তিনি প্রধান শিক্ষক বা

শিক্ষিকার কাজ করিতেছেন, আর তাঁহাদের সঙ্গে ট্রেনিং-প্রাপ্ত নহেন, এমন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রয়োজন অনুযায়ী যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যবস্থা ভাল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে ইহাও ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষের 'সর্দার পোড়ো', আর ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষা-ব্যবস্থায় Monitorial System যেমন প্রকৃত শিক্ষাদানে কার্যকরী হয় নাই, সেইরূপ উত্তরপ্রদেশের ঐরূপ ব্যবস্থাও বিশেষ কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। বুনিয়াদী ট্রেনিং-কেন্দ্র হইতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যতটুকু গ্রহণ করিলেন, তাহা সম্যকরূপে দান করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই, সেই কারণেই সহযোগী শিক্ষক-শিক্ষিকা ভিন্ন ধারায় শিক্ষালাভ করিতে যাইয়া নূতন শিক্ষার আসল রূপটিকে হারাইয়া ফেলিবে। সে যাহা হউক, সে প্রশ্ন যখন আমাদের রাজ্য সম্পর্কিত নয়, তখন সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ট্রেনিং-বিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নূতন শিক্ষার জন্য কি ভাবে প্রস্তুত করা যায়, আমাদের প্রশ্ন তাহাই। নূতন শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং তাঁহাদের দিতে হইবে। তবে যতদিন পর্যন্ত সুযোগ তাঁহাদের না দেওয়া যাইবে, ততদিন পর্যন্ত কতকগুলি ব্যবস্থা তাঁহারা মানিয়া লইয়া কাজ করিতে পারেন। সেই সকল ব্যবস্থার ইঙ্গিতই এই অধ্যায়ে দেওয়া হইবে।

বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা

বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩½ হাজার স্পেশাল কেডার স্কুলে প্রায় ৮½ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। শিক্ষাদান সম্পর্কে তাঁহাদের কোন ধারণাই, এ বিষয়ে তাঁহারা চিন্তাও করেন নাই। বস্তুতঃ পক্ষে বেশীর ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাই হঠাৎ আসিয়া শিক্ষাদান কার্যে রত হইয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের নিকট হইতে কোন কিছুই আশা করা নিরর্থক। তবে ইহাদের মধ্যে নূতন ধরণের শিক্ষাদান সম্পর্কিত মনোভাব গড়িয়া তোলাও তাড়াতাড়ি সম্ভব, কারণ বেশীদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা না করার ফলে নেতিবাচক মনোভাব গড়িয়া উঠার কোনরূপ সম্ভাবনাই তাঁহাদের মনে জন্মে নাই। নূতন শিক্ষার মূল বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহাদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু তাহা এতই অল্পকালীন হইবে যে, নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ শিক্ষার ধারক ও বাহক হইবার পরিকল্পনা কতদূর কার্যকরী হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়।

বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্র হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা

বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্র হইতে যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে চাকুরী করিতেছেন, এইরূপ শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অতিশয় অল্প। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৮ সন হইতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে স্থাপিত ১২টি ট্রেনিং স্কুল হইতে প্রায় ৩২শত শিক্ষক-শিক্ষিকা ট্রেনিং প্রাপ্ত হইয়া বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা হয় শিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন আর না হয় এমন কোন স্থানে শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত আছেন যাহার খবর শিক্ষাদপ্তরে নাই। অপর দুই-তৃতীয়াংশ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারাও নূতন পরিবেশে নূতন শিক্ষক বলিয়াই দাবী জানাইতে পারেন। তাহার সবচেয়ে বড় কারণ হইতেছে নূতন শিক্ষার সীমাহীন সম্ভাবনা। নূতন শিক্ষা যেখানে শিশুর জীবনকে কেন্দ্র করিয়াছে, সেখানে নিত্য নূতন সমস্যা দেখিতে পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রচুর। অতএব তাঁহাদের পক্ষেও নূতনকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সেই হিসাবে তাঁহারাও নূতন শিক্ষাব্রতী।

চারি জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষাদান সমস্যা লইয়া আমরা বর্তমানে ব্যাপৃত। শিক্ষক-শিক্ষিকার স্তরভেদে সমস্যার গুরুত্ব কম বেশী হইতে পারে, কিন্তু সমস্যা বিভিন্ন রূপ লইয়া সেখানে আছেই। যাঁহারা বুনিয়াদী শিক্ষণ কেন্দ্র হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পাঠদান-পদ্ধতি সম্পর্কীয় সমস্যা কম হইলেও সমগ্র বুনিয়াদী শিক্ষার পরিচালনার দিক হইতে তাঁহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সমস্যা আছে। পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যেখানে পদ্ধতি ও পরিচালনা, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের সমস্যা সকলই ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান, সেখানে সকল সমস্যার সমাধানকল্পে শুধু নির্দেশদান দ্বারাই সমস্যার সমাধান হইবে না, সমাধান হইতে পারে শুধু সমস্ত বিভাগগুলির সমবেত প্রচেষ্টায়। তবে শিশুদের শিক্ষাদান ও তাহার পরিচালনা সম্পর্কে যদি একটি সর্বনিম্ন নমনীয় এবং পরিবর্তন-সাপেক্ষ ধারার নির্দেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে হয়ত শিক্ষাদান পরিকল্পনা ও তাহার পরিচালনা সহজ হইবে। বলা বাহুল্য ইহা দ্বারা শিক্ষা-পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ রাখা হইতেছে না, শুধু বিভিন্ন জাতীয় শিক্ষক-সম্প্রদায়ের বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত

পরিচালনার মনোভাবের **একীকরণের** প্রচেষ্টা হইতেছে মাত্র। যেখানে সীমাহীন সম্ভাবনা, সেইখানে এইরূপ নির্দিষ্ট কাঠামো সম্বন্ধে নির্দেশ দানের উপযোগিতা আছে কি না, সে বিষয়ে অনেকে হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন। কিন্তু সমগ্র শিক্ষক-সমাজের ধারণা যখন নূতন শিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্ট নয়, তখন এইরূপ ব্যবস্থা করা ছাড়া আর উপায় কি ?

শিশুদের শিক্ষা ও তাহার পরিচালনা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষিকা অবহিত হইতে পারেন।

(১) **শিশুর সঙ্গে পরিচয় ও গৃহ পর্যবেক্ষণ**। শিশুর সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবকের সঙ্গে পরিচয়ও প্রয়োজন। শিশুর সঙ্গে পরিচয় তাহার পরিবারগত ভাবধারার ভিত্তিতে হইলে শিক্ষকের পক্ষে সামগ্রিক বিকাশ সম্পর্কে সাহায্য করা সহজ হয়।

(২) **বিভিন্ন বয়সের শিশুর প্রয়োজন, ক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া প্রতি সপ্তাহের জন্য শিক্ষার পরিকল্পনা তৈরী**। মাস বা বৎসরের একাংশের জন্য পরিকল্পনা তৈরী না করিয়া অল্প সময়ের **একটি ক্ষুদ্র ইউনিটের** জন্য কেন পরিকল্পনা তৈরী করা হইবে, সে বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শিশুর লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়াই যেখানে পরীক্ষামূলক পাঠ্যসূচীর ক্রম স্থির করিতে হইবে, সেখানে অল্পকালীন পরিকল্পনাই কার্যকরী হইবে। বহুদিন ব্যাপী পরিকল্পনা সুফলপ্রসূ হইবে না। পাঠ্য-ক্রমের সহিত সঙ্গতি রাখার জন্য সমগ্র বৎসরের পাঠ্য-বিষয়কে কয়েকটি অংশে (term-এ) ভাগ করিয়া এক একটির (term-এর) জন্যে এক একটি পরিকল্পনার ছক কাটা থাকিতে পারে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া ক্ষুদ্রতম ইউনিটের পরিকল্পনা করা যায়।

(৩) **শিশুর সুসমঞ্জস বৃদ্ধির জন্য পরিবেশের সমস্ত বিষয়বস্তুর সাহায্য গ্রহণ বাঞ্ছনীয়**। শিশুকে এক কথায় পূর্ণ নাগরিকে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষাদান। শিশু যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বা বাস করিতেছে, সেই সমাজের সঙ্গে আর সেই সঙ্গে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় এবং তাহার প্রতি তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধ স্পষ্ট হইলেই শিশু পূর্ণ নাগরিক হইতে প্রয়াস পাইবে। তাহা ছাড়া, শিশুর ক্ষুদ্র জগতের মধ্যেও প্রকৃতির যে ভাণ্ডার রহিয়াছে তাহারও সঙ্গে শিশুর পরিচয় একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। অতএব শিক্ষকের প্রয়োজন, সমাজের ক্ষুদ্র পরিবেশে যাহা বর্তমান আছে, তাহাকে

অবলম্বন করিয়াই শিশুর জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করান। শিশুর মনে ভিত্তিগত জ্ঞান দৃঢ় হইয়া থিতিয়া বসিলেই শিশুর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

(৪) বিদ্যালয়ে প্রতিদিনের কাজ-কর্ম এমনভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন যাহাতে শিশুদের পক্ষে **প্রতি বস্তু শিক্ষণীয় ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়।** প্রতি অবস্থা হইতে যেন শিশুরা কিছু কিছু শিক্ষা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজনীয়। কোনরূপ কুশিক্ষামূলক কর্ম সম্পাদনের সুযোগ যাহাতে বিদ্যালয়ে না হয়, সেদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকার দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৫) যে অবস্থায় **শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ সহজ ও সুষ্ঠু হয়** সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে করিতে হইবে।

(৬) শুধু অবস্থার সৃষ্টি নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা **সক্রিয় ভাবে শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযোগ** রাখিয়া শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকিবেন।

বর্তমান শিক্ষা-সমস্যা পরিপূরণের পথ কোন্ দিকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে। প্রথম কথা হইতেছে যে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রতিটি শিশুর বিশেষ একটি স্থান আছে। বস্তুতঃ পক্ষে **শিশুকেই সমস্ত শিক্ষা-পরিকল্পনার কেন্দ্রে স্থাপন করা হইয়াছে।** অর্থাৎ যে কোন পরিকল্পনা বা সমস্যার সমাধান কল্পে অঙ্কিত ছক শিশুর সামগ্রিক বৃদ্ধির পরিপোষক, তাহাই শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণ ভাবে বিবেচ্য। নূতন শিক্ষাব্রতীকে এই শিশুকেন্দ্রিক নীতিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং তাহার ফলে তাঁহাকে শিশুর প্রয়োজন, ক্ষমতা, শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। যদি শিশুর ব্যক্তিগত জীবনটাকে গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা করা যায় তাহা হইলে শিক্ষা-প্রক্রিয়া শিশুকে অবলম্বন করিয়াই হইবে এবং শিশুর পরিচালনের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। ইহা সম্ভব যদি শিশু সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রবণতার উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে পরিচালনা করিতে শিক্ষক সমর্থ হন। নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষককে তাহাই করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ **শিক্ষককে যথাযথ পরিকল্পনা করিয়া শিক্ষাদান-কর্মে অগ্রসর হইতে হইবে।** পূর্বে ছিল, সর্বক্ষেত্রে পুস্তকের প্রাধান্য। পুস্তককে অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিলেই চলিত। বর্তমান কালে হাতে কলমে অভিজ্ঞতার দ্বারা শিশুকে পুঁথিগত বিদ্যাকে যাচাই করিয়া লইতে হইতেছে। অতএব হাতে-কলমে অভিজ্ঞতার জন্য প্রয়োজন হয় কর্ম-পরিকল্পনার। কর্ম-পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে রচিত না হইলে কর্মও সুসম্পাদিত হইবে না, কর্মলব্ধ অভিজ্ঞতাও

শিশুমনে ভাল করিয়া দানা বাঁধে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বহু দিনের জন্য পরিকল্পনা করার অসুবিধা আছে। কিন্তু বহু দিনের জন্য অর্থাৎ বৎসরের একটি term বা অংশের জন্যও একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনার ছক কাটিয়া রাখা যাইতে পারে, এবং তাহার সঙ্গে যুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে ছোট ছোট ইউনিটে শিশুর লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। ছোট ছোট ইউনিটগুলি হয়ত বহু দিনব্যাপী পরিকল্পনার পরিপূরক হইবে না, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ নির্দিষ্ট সীমা কেন অনতিক্রমণীয় রহিয়া গেল বা কেন ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া শিক্ষা-পরিকল্পনা অগ্রসর হইয়া গেল, তাহারও একটা হিসাব মিলিতে পারে। বেশীদিন ব্যাপী পরিকল্পনা হইতে সপ্তাহব্যাপী পরিকল্পনা বা পাক্ষিক পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী হইবে। দৈনিক কার্যের পরিকল্পনাও শিক্ষককে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে যেন উহাদের যোগাযোগ রক্ষিত হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ **বর্তমান যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার প্রভাব**। শিশুকে দিয়া গণতান্ত্রিক জীবন যাপন করাইতে হইলে শিশুকে কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে লইয়া যাইতে হয়। পূর্বে শিক্ষাদান-কার্যে দান করিবার দায়িত্ব ছিল শিক্ষকের, গ্রহণ করিবার কর্তব্য ছিল শিশুর। পুঁথিগত নির্দেশ দিয়াই শিক্ষক তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতেন, আর শিশুও ব্যক্তব্যের সারমর্ম ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উহার তাৎপর্য সম্যক্ বুঝিতে পারিত না। আজ নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব পরিবেশ সৃষ্টির উপরই বিশেষভাবে নিবদ্ধ। শিশুকে সৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হয় এবং সেই অভিজ্ঞতাকে জীবনের ক্ষেত্রে ব্যবহারও করিতে হয়। অতএব এই ব্যবস্থায় শিক্ষকের পক্ষেও দায়িত্ব অবহেলা করিলেও চলে না, জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, এই অজুহাতে শিশুও কর্তব্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিতেছে না।

চতুর্থতঃ পূর্বে শিক্ষাদান-কার্যে শিক্ষকই ছিলেন মুখ্য, শিশু ও শিক্ষণীয় বিষয় ছিল গৌণ। বর্তমানে কোন বিষয়ে শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে শিশুদের সঙ্গে শিক্ষকের সহযোগিতামূলক আলোচনা, কার্যপরিকল্পনা ইত্যাদি করিতে হয়। তাহা ছাড়া শিশুকে **সৃজনাত্মক কর্মও** করিতে হয়। বলা বাহুল্য, এই সকল ক্ষেত্রে **শিশুর স্থান মুখ্য**, শিক্ষক গৌণ; তিনি শিশুকে পরিচালনা করেন মাত্র, শিশুর পক্ষ হইতে কোন কর্ম সম্পাদন করেন না।

পঞ্চমতঃ বর্তমানে বিদ্যালয়ে সমস্ত দিনটিই শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র। মামুলি শিক্ষা-ব্যবস্থায় অবস্থা কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, শিক্ষকের সান্নিধ্য ব্যতীত শিক্ষালাভের কোন উপায় ছিল না। বর্তমানে বিদ্যালয়ে পরিকল্পনাপ্রসূত কর্মগুলি এমনিই ভাবে পরিচালিত হয় যে, প্রতি কর্মই শিশুর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে সাহায্য করে।

সর্বশেষে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুকে একটি সমগ্র শিশু হিসাবে পরিগণিত করিয়া তাহার সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করা হয়। শিশুকে সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মানসিক উন্নতির দিকেই কেবল লক্ষ্য করা হয় না। শিশুর ব্যক্তিত্ব যাহাতে যথেষ্ট মর্যাদা পাইয়া বিকশিত হয় সেদিকেও যেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়, তেমনি শিশুর মানসিক ও শারীরিক উন্নতির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। সর্বোপরি শিশু সমাজের একটি অংশ হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার ফলে সে সমাজকে কতটা সমৃদ্ধ করিল তাহার প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বর্তমানে নূতন বিদ্যালয়ে শিশুকে কি ভাবে গৃহে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে চলিতে হয়, সে সম্বন্ধে কার্যকরী শিক্ষা দেওয়া হয়; শুধু তাহাই নয়, শিশু-সম্প্রদায়কে সমাজের উন্নতিকল্পে সাহায্য করিতে উৎসাহিত করা হয়।

উপরে যে সকল শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বর্তমান নূতন শিক্ষাব্রতীকে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। মামুলি শিক্ষায় শিক্ষককে শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিগত উন্নতি সম্পর্কে সজাগ থাকিতে হইত এবং তাহার জন্য শিক্ষককে শুধু পুঁথিসংক্রান্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ব্যাপৃত থাকিলেই তাঁহার শিক্ষাদানের দায়িত্বের অবসান ঘটিত। কিন্তু বর্তমান কালে শিশুর সামগ্রিক জীবনের পরিচালক শিক্ষক। শিশু নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আপন জীবনের কর্ম ও আচরণের মধ্য দিয়াই তৈয়ারী করিবে, কিন্তু কোন্ ধারা বা পথ অবলম্বন করিয়া শিশু অগ্রসর হইবে, তাহার নির্দেশ দিবেন বা অবস্থার সৃষ্টি করিবেন শিক্ষক। এই পথ সৃষ্টির কোনরূপ নির্দিষ্ট সূত্র বা প্রণালী নাই, অবস্থাবিশেষে তাহার কৌশল আবিষ্কার করিতে হয়। কিন্তু পথের আভাষ পাওয়া যাইবে উপরোক্ত ধারাগুলি অনুসৃত হইলে। শিক্ষণক্ষেত্রে নূতন প্রবিষ্ট শিক্ষক বা শিক্ষিকার মনোবৃত্তি আছে, কিন্তু মনোভাব সৃষ্টি হইতে পারে নাই; তাহার কারণ বহুবিধ এবং সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও হইয়াছে। অন্ততঃপক্ষে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের নিজস্ব ত্রুটির জন্য মনোভাব সৃষ্টির বিলম্ব ঘটিতেছে না, বিলম্ব ঘটিতেছে তাহাদের পরিচালনার অভাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষায় গণতান্ত্রিকতা

অবিন্যস্ত বিশৃঙ্খল এবং পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে শিশুকে তাহার সমগ্র জীবনের জন্য শিক্ষাদানই হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন্ নীতি অবলম্বন করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে? এক কথায় গণতান্ত্রিকতার আদর্শ ই একমাত্র অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে একটা শান্ত ও সুবিন্যস্ত ভাবের আমদানী করিয়া শিশুকে জীবনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান করিতে সমর্থ। শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্র, কথা, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা-পদ্ধতি, শিক্ষার ফল নিরূপণ, শিক্ষা-পরিচালন ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিকতার প্রভাব অসাধারণ।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্র কিভাবে গণতান্ত্রিক মতে পরিচালিত হইতে পারে, সে বিষয়ে আলোচিত হইবার পুর্বে গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হওয়া প্রয়োজন। ইহাকে নানা দিক হইতে বিচার করিতে গেলে পুস্তকের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে, তাই ইহা সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করা হইল। গণতন্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা পাইতে হইলে গণতান্ত্রিক সমাজ কিরূপ তাহা আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হয়। এই জাতীয় সমাজের যথার্থ রূপ বিচার করিবার জন্য ডিউই **দুইটি মানদণ্ডের** নির্দেশ আমাদের দিয়াছেন। প্রথমটি হইল দলীয় সকল লোকের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়গত সমবেত স্বার্থ বর্তমান আছে কিনা; আর দ্বিতীয়টি হইল বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন পারস্পরিক যোগাযোগ আছে কিনা। তাহার অর্থই হইতেছে যে, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষে মানুষে এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর আদর্শগত সমতা আছে। ডিউই এবং অটো গণতন্ত্রের মূল আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্রের মূল আদর্শ **তিনটি**। প্রথম **সমাজের সংগে সংযোগের ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ** করা। দ্বিতীয়, একত্র বসবাসের ফলে সকলে **সহযোগিতার মনোবৃত্তি লইয়া একত্র বাস করা** এবং প্রতিযোগিতা পরিহার করিয়া **সমবায়ের নীতিতে সমস্ত সমস্যার মীমাংসা** করা। তৃতীয়

আদর্শ হইতেছে, **সহজ মেলামেশা এবং ভাবধারার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করা**। গণতন্ত্রের এই তিনটি আদর্শ **পরস্পর নির্ভরশীল**। একটির বিশেষ ব্যাখ্যা করিতে গেলে অপর দুইটি আদর্শও ঐ ব্যাখ্যার মধ্যে আসিয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তিত্বের আদর্শ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—কোন একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব তখনই বিকশিত হয় যখন সে অপরের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারা স্বীয় বুদ্ধি পরিচালন করিয়া নিজের কর্মপন্থা বাছিয়া লয়। সে যাহা হউক, ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাই হইতেছে গণতান্ত্রিক দর্শনের বা জীবনে চলার ছন্দের মূলকথা। ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার অর্থ কিন্তু কয়েকজন বিশেষ ভাগ্যবানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নহে, সমাজের প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধাই হইতেছে ঐ কথার অর্থ। পক্ষান্তরে সুন্দর ও সুষ্ঠু জীবন লাভের জন্য মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও ব্যক্তিগত কর্মের সঙ্গে পার্থক্য যথেষ্ট। গণতান্ত্রিক জীবন-যাপনে স্বেচ্ছাচারপূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনের কোন স্থান নাই। ব্যক্তিগত জীবন অপরের ব্যক্তিত্বকে কিংবা অপরের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা দলিত করিয়া যেখানে বৃদ্ধি পায়, সেখানে মানুষ মানুষের কাছে মর্যাদা পায় না, ফলে গণতান্ত্রিক জীবনও যাপন করা সম্ভব হয় না। গণতন্ত্রের আদর্শ যেমন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সূচিত করে, তেমনই সহযোগিতামূলক জীবনযাত্রা এবং দলগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সংরক্ষণও গণতান্ত্রিক আদর্শ। গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষ অপর সকলের স্বার্থ রক্ষার্থে দলগত ভাবে কাজ করে এবং সেই কাজ দলের কতটুকু মঙ্গল সাধন করিল তাহাও তাহারা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। তাহা ছাড়া এইরূপভাবে স্বকীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়া দলগত স্বার্থের খাতিরে কাজ করিলে কিরূপ দক্ষতা অর্জন ও সুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে পারে। গণতন্ত্রবিরোধী সমাজের কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ব্যক্তিবিশেষ সকলের স্বার্থে কাজ করে না, করে নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির স্বার্থের জন্য। ব্যক্তি সত্তাই ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। গণতন্ত্রের তৃতীয় আদর্শ হইতেছে মানবগোষ্ঠির মধ্যে পরস্পর সম্পর্কজনিত যে সমস্যা, তাহার সমাধানে বুদ্ধি-বৃত্তির সহজ ও স্বাধীন পরিচালন-ক্ষমতার বিকাশ। বুদ্ধিকে সমাজের প্রয়োজনে লাগাইবার প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা হইলেই উদ্ভূত এবং এই গণতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে বুদ্ধিকেও সেই স্তরেই রাখিতে

হইবে। স্বাধীনভাবে মানুষে ও মানুষে, মানুষে ও দলের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি, অনুদারতা ও কুসংস্কার দূরীভূত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে সদিচ্ছা, সহনশীলতা ও অপরের দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধিকে যদি সমাজগত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই বুদ্ধি আর স্বকীয় স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়াইবে না, ফলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে উহার রূপ হইবে মহান্ ও উদার।

শিক্ষায় গণতান্ত্রিক নীতি

গণতন্ত্র যে মানুষের জীবন যাপনের ছন্দকে নূতন ভাবে সৃষ্টি করিতে পারে, একথা পূর্বে অনেক শিক্ষাবিদই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ফলে বিদ্যালয়েও গণতান্ত্রিক নীতি অনুসৃত হইবার সুযোগ ঘটে নাই। তাহার বদলে পূর্বের মামুলি নীতি অনুযায়ীই বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের আরোপিত নীতি দ্বারাই বিদ্যালয়-পরিচালন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তাহার মর্ম এই যে, শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক এবং শিক্ষক ও শিশুর মধ্যে রাজা এবং প্রজা, প্রভু এবং ভৃত্যের সম্পর্কের মতই সম্পর্ক বর্তমান রহিয়াছে। কোন কোন শিক্ষাবিদ্ অবশ্য শিক্ষার এই আত্মক্ষয়ী নীতিতে বিশ্বাসী নহেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নেতাগণ অনেকেই গণতান্ত্রিক মতবাদকে শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচকের দল কিছুতেই এই আদর্শে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। জন ডিউই তাঁহার সমস্ত লেখাতে গণতন্ত্রকে সমস্ত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গণতন্ত্র এবং বিদ্যালয় পরিচালন

বিদ্যালয় পরিচালনে গণতান্ত্রিক আদর্শ আজ পর্যন্ত বিশেষ কার্যকরী রূপ লইতে পারে নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সৈন্য-সংস্থা এবং শিল্প-সংস্থাতে যেমন শক্তি ও ক্ষমতার বিভিন্ন স্তর দেখা যায়, শিক্ষা-ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সৈন্য-সংস্থায় কমাণ্ডার হইতে কর্পোরাল পর্যন্ত পর পর কর্মচারীরা আছে, আর সর্বনিম্নে আছেন সাধারণ সৈনিকেরা। সৈনিকদের জন্য যে কোন আদেশ কমাণ্ডারের দপ্তর হইতে বাহির হইয়া একে একে কর্মচারীদের মারফত সৈনিকদের উপর আসিয়া প্রযোজ্য হয়। শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও তেমনি। শিক্ষা-দপ্তরের সর্বোচ্চ কর্মচারী হইতে শিক্ষার পরিকল্পনা বা নীতি স্থিরীকৃত হয়, এবং পরে উহা

শিক্ষাবিভাগের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের মারফত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে আসিয়া পৌঁছায়; শিক্ষক সেই পরিকল্পনা কার্যে করিণত করেন। নীতির দিক হইতে ইহা গণতন্ত্র-বিরোধী।

বিদ্যালয় পরিচালনে গণতন্ত্রের স্থান কোথায়? বিদ্যালয় পরিচালনের নীতি ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করণের দায়িত্ব যখন শিক্ষকদের উপর আসিয়া বর্তাইবে, তখনই বুঝিতে হইবে গণতন্ত্রের প্রভাব বিদ্যালয় পরিচালনে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে সেইরূপ কোন অধিকারই অন্ততঃপক্ষে ভারতবর্ষের কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই দেওয়া হয় নাই। বর্তমানে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ শিক্ষা-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, কোন্ পথ ধরিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থাকে চালু করা হইবে, তাহা কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এদিকে গান্ধীজী-প্রবর্তিত বুনিয়াদী-শিক্ষা পরিকল্পনাও শিক্ষানীতির দিক হইতে যুগান্তকারী। যুদ্ধান্তে এবং স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া শিক্ষা সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইবে, সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন রাজ্য গভীর ভাবে চিন্তা করে। কোন কোন রাজ্য কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির নির্দেশকে গ্রহণ করে, আবার কোন কোন রাজ্য ওয়ার্ধা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে চেষ্টিত হয়। নীতি হিসাবে যে কোন এক পরিকল্পনাকে গ্রহণ করতঃ রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর ঐ নীতিকে ব্যাখ্যা করিয়া, পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করিয়া, পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়গুলির শিক্ষাদান সম্পর্কে নির্দেশ দিয়া বিভিন্ন দপ্তর মারফত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট প্রেরণ করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষকবর্গ তখন পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে দায়িত্ব শিক্ষা-বিভাগের, কিন্তু বিদ্যালয় পরিচালনের অন্যান্য দিক রহিয়াছে জেলা স্কুল বোর্ডের উপর। অতএব শিক্ষকমণ্ডলী নানাবিধ নির্দেশে নির্দেশে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। নির্দেশগুলি অনেক সময় ছাত্র ভর্তি, প্রমোশন, শিশুদের অনিয়মিত স্কুলে আসা, শিশুদের স্বাস্থ্য মনস্তত্বগত বৃদ্ধি ইত্যাদির রেকর্ড রাখা সংক্রান্ত হইয়া থাকে। নির্দেশগুলির স্বপক্ষে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, রাজ্যে শিক্ষার নীতি যেখানে এক, তখন সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান এবং বৃদ্ধির গতিও একই দিকে হওয়া উচিত। এই হিসাবে এই সকল নির্দেশগুলির বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু গণতান্ত্রিকতার দিক হইতে এই ব্যবস্থার মূল্য অতিশয় কম।

আমেরিকার কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ গণতান্ত্রিকতার দিক হইতে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া শিশুদের জন্য পাঠ্যক্রম তৈয়ারী করিয়া শিক্ষা-বিভাগে দাখিল করিয়াছেন। অনেক সময়ে শিক্ষা-বিভাগের উপরস্থ কর্মচারিগণ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী তৈয়ারী করিয়া শিক্ষক সম্প্রদায়ের কাছে উহা গ্রহণযোগ্য কি না বিচার করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন। শিক্ষক সম্প্রদায়ও উহার উপযুক্ততা ভালভাবে বিচার না করিয়াই উহা গ্রহণীয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু যে পাঠ্যক্রম রচনার কথা উল্লেখ করা হইল, উহা সেই ধরণের নয়, সেই পাঠ্যক্রম অত্যন্ত স্বাধীন মনোভাব লইয়া রচিত। নিজেদের আগ্রহে এইরূপ পাঠ্যক্রম তৈয়ারী শিক্ষাক্ষেত্রে সত্যকার দান বলিয়া মনে হয়।

যদি শিক্ষক সম্প্রদায়কে শ্রেণী-পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে শিক্ষায় গণতন্ত্রের প্রভাব আরও বেশী স্বীকৃত হইবে। বলা বাহুল্য সেইরূপ স্বাধীনতা বর্তমান সময়ে বিরল। অনেক শিক্ষক পরিদর্শকমণ্ডলীকে দোষারোপ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা নিজেদের চেষ্টায় যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মধ্যে কোনরূপ নূতনত্ব আমদানী করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহারা পরিদর্শকমণ্ডলীর বিরোধিতার জন্য ঐরূপ প্রচেষ্টায় ব্যর্থকাম হন; অতএব তাঁহারা সেদিকে দৃষ্টিদানের সার্থকতা আছে বলিয়া মনে করেন না। অবশ্য কোনও কোনও শিক্ষক নিজেদের অলসতাকে ঢাকিবার জন্য অন্যের উপর দোষারোপ যে না করেন তাহা নয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শিক্ষকের যে কোন নূতন প্রচেষ্টাকে পরিদর্শকবৃন্দ বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া দেখিয়া থাকেন। অতএব শিক্ষকদের প্রচেষ্টা এমনি করিয়া অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক নীতিকে অনেক শিক্ষকই সমর্থন করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন এক রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি বিশেষ মান আবশ্যক বলিয়াই তাহারা মনে করেন। বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া যদি বিদ্যালয়গুলি আপন আপন পাঠ্যক্রম রচনা করিয়া তাহাকে চালু করে তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বিদ্যালয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিতেছে। যাহারা এককেন্দ্রিক নীতিতে বিশ্বাসী, তাহাদের যুক্তি হইতেছে যে আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলি মূল সামাজিক ভাবধারা সকলকেই শিক্ষা করিতে হইবে। অতএব একটি নির্দিষ্ট মানকে উদ্দেশ্য

করিয়াই আমাদের চলিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁহারা গণতান্ত্রিকতার বিরোধী তাঁহাদের মতে প্রচলিত ব্যবস্থায় শিশুরা অপেক্ষাকৃত তৎপর হয় এবং উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু তাহার লক্ষণ কি? প্রথমতঃ এই ব্যবস্থাতে সামাজিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে শিশুরা সমৃদ্ধ হয় এবং বিদ্যালয়ের অবস্থা থাকে শান্ত ও সহজ এবং সমাজের ব্যবস্থাও থাকে অপরিবর্তিত। কিন্তু মামুলি পদ্ধতিতে উপযুক্ত বিচার-বিবেচনা ছাড়াই যদি সামাজিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে শিশুরা অবহিত হয়, তাহা হইলে ঐ গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত হওয়ার ফলদায়িকা শক্তি কতটুকু হইবে তাহাই বিচার্য। অতীত সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব গণতান্ত্রিক মতেই, কারণ ইহা দ্বারা তাহারা বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে অতীতের পটভূমিকায় বিচার করিতে শিখে এবং খোলা মন লইয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়। তাহা ছাড়া এই সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য এই যে, আমরা একটা স্থিতিশীল (static) অবস্থাকে বজায় রাখার জন্যই শিক্ষাদান করিতে পারি না। এমন শিক্ষা শিশুদের দেওয়া প্রয়োজন যাহাতে শিশুরা নিজেরাই পরিবেশের সমস্ত সমস্যা নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সমর্থ হয় ও অনাগত ভবিষ্যৎকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করার শিক্ষা লাভ করে।

অন্য একটি কারণেও শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র-বিরোধী মনোভাব দেখা যায়। বিরোধী দলের মত যে, অনুপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর পক্ষে শিক্ষার নীতি উদ্ভাবন করিয়া বিদ্যালয় পরিচালন সম্ভব নয়। হইতে পারে যে, খুব বেশী সংখ্যক শিক্ষকই এই কাজের উপযুক্ত নয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি ভবিষ্যতে কোন দিনই তাঁহারা উপযুক্ত হইবেন না? নিত্য নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইতেছেন। এই নূতন শিক্ষকদের নিযুক্ত করিবার পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি আছে কিনা এবং শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের স্পষ্ট ধারণা বর্তমান কিনা তাহা যদি যাচাই করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী শিক্ষকদের উপর অনেকখানি দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া যায়। তাহা ছাড়াও কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে আরও উদার মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত। যাঁহারা শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের দ্বারা কিছু কাজই হইবে না, এরূপ মনোভাব পরিহার করা কর্তব্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিক্ষকেরা যে শিক্ষা-বিষয়ক পরিকল্পনার মৌলিকতার দাবী করিতে পারিতেছেন না, তাহার কারণই হইতেছে সুযোগ ও স্বাধীনতার অভাব। সুযোগ ও স্বাধীনতা

পাইলে বর্তমান শিক্ষকেরাও নানা ভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করিতে পারিতেন। বস্তুতঃপক্ষে বর্তমানে ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা হইতেছে যে, কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের আদেশ পালনের ক্ষমতা আছে কিনা এই দৃষ্টি দ্বারা শিক্ষকের উপযুক্ততা বিচার করিতেছেন। শিক্ষাদান ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারায় মৌলিকত্ব আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য করিতেছেন না।

বিদ্যালয় সুষ্ঠু পরিচালনের দায়িত্ব শিক্ষা-বিভাগের কেন্দ্রীয় কর্মচারীর, অতএব শিক্ষকদের উপর সে দায়িত্বভার অর্পণ করা যায় না, ইহাও বিরোধী দলের অভিমত। শিক্ষা-বিভাগের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের দায়িত্ব থাকিবে সন্দেহ নাই, তবে যদি শিক্ষকের সঙ্গে যৌথ দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় শিক্ষার গতির ক্ষেত্রে উহা কার্যকরী বেশী হয়।

গণতন্ত্র ও বিদ্যালয় পরিদর্শন

বিদ্যালয় পরিদর্শনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পরিদর্শক গতানুগতিক ভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আগমন করেন এবং শিক্ষকের ভুল-ত্রুটির ফিরিস্তি করিয়া এক লম্বা পরিদর্শন-মন্তব্য লিখিয়া যান। কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী পরিদর্শকের বিদ্যালয় পরিদর্শনের ধারা ভিন্নমুখী হইবে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হইবে শিক্ষকের শিক্ষাদান-সংক্রান্ত মূল বিষয়কে সাহায্য করা। শিক্ষকের সাথে তিনি হইবেন সমকর্মী ও সহকর্মী। তিনি শিক্ষকের কাজের বিচারক হইয়া থাকিবেন না। শিক্ষাদান সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষকের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কাজ করিয়া সমস্যা সমাধানে শিক্ষককে সাহায্য করিবেন। তাহা হইলে বিদ্যালয় পরিদর্শনের ক্ষেত্রে কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত? পরিদর্শক কি বিদ্যালয় পরিদর্শনের খবর শিক্ষকমণ্ডলীকে পূর্বাহ্নে দিয়া তারপর বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিবেন? ইহার অসুবিধা এই যে, পরিদর্শকের আগমন সংবাদে বিদ্যালয়ে একটি কৃত্রিম আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় এবং সেই দিনকার নিয়মিত কাজ ব্যাহত হয় এবং বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ছবি পরিদর্শকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। পক্ষান্তরে পরিদর্শক যদি পূর্বাহ্নে না জানাইয়া বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন, তাহা হইলে তিনি বিদ্যালয়ের আসল রূপকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ইহারও ভিন্ন দিক আছে। শিক্ষককে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরিবার মনোবৃত্তি পরিদর্শকের মনে মনে জাগ্রত হওয়া সম্ভব হয়, অপর পক্ষে শিক্ষকও পরিদর্শকের এইরূপ পরিদর্শন-নীতির উপর বৈরীভাব পোষণ করিতে পারেন। গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়

পরিদর্শিত হইলে এই মনোভাবের নিরসন হইলেও আর একটি বিশেষ অসুবিধা থাকিয়া যায়। পরিদর্শক আসেন জটিল সমস্যাসমূহে শিক্ষককে সাহায্য করিতে, কিন্তু যদি পরিদর্শক পূর্বাহ্নে না জানাইয়া আসেন তবে হয়ত যে জটিল সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী পরিদর্শকের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সব জটিল সমস্যা বিশেষ পটভূমিকায় পর্যবেক্ষণ করা পরিদর্শকের সৌভাগ্য হইয়া উঠিল না, ফলে হয়ত বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিই ফাঁকে পড়িয়া গেল। তাহা হইলে বিদ্যালয় পরিদর্শন কোন্ প্রথা অবলম্বন করিয়া হইবে? দুই-এর মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করিলে বোধ করি ভাল হয়। রোগ হইলে যেমন চিকিৎসককে ডাকিয়া আনা হয় রোগের চিকিৎসার জন্য, সেইরূপ যখন কোন বিদ্যালয়ে কোন জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়, এবং সেই জটিলতা নিরসন শিক্ষকমণ্ডলী করিয়া উঠিতে পারেন না, তখন পরিদর্শককে ডাকিয়া আনিলে কিরূপ হয়? এই ব্যবস্থা মন্দ নয়, ভালই, কিন্তু এই ব্যবস্থারও ত্রুটি আছে। শিক্ষকের দৃষ্টিতে যেগুলি সমস্যা সেইগুলি ছাড়াও পরিদর্শককে অন্যান্য দিকে সহযোগিতামূলক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে ভাবেই বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্য সম্পন্ন হউক না কেন, পরিদর্শন দ্বারা যেন উভয় পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিদর্শক উভয়েরই বিদ্যালয় সম্বন্ধে দায়িত্ব আছে। সেই কারণেই বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর পরিদর্শক অতি অবশ্য শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে একত্র হইয়া গোটা বিদ্যালয়ের পরিচালন ও পাঠদান নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। পরিদর্শকের দৃষ্টিতে বিদ্যালয়ের যে বিষয়টি ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ, তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া সেই বিষয়-সংক্রান্ত শিক্ষকের যুক্তিও পরিদর্শক মন দিয়া শ্রবণ করিবেন এবং শিক্ষক যদি তাঁহার নিজস্ব বিষয়টির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে পারেন তাহা হইলে পরিদর্শক নিশ্চয়ই তাঁহার অভিমতও পরিবর্তন করিবেন। এই আলোচনা সভার পর প্রয়োজন হইলে পরিদর্শক প্রতি শিক্ষকের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার নিজস্ব সমস্যা আলোচনা করিতে পারেন।

গণতন্ত্র ও শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-প্রণালী

গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালন ও বিদ্যালয় পরিদর্শন বিদ্যালয়ের আবহাওয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। ইহার

ছোঁয়াচ যে শ্রেণীকক্ষের শিশুরা না পাইয়াছে তাহা নয়। কারণ যাহা কিছুর পরিবর্তন হইয়াছে, সকলই হইয়াছে শিশুর উন্নতির উদ্দেশ্যেই। সে যাহা হউক, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী শ্রেণী পরিচালনার আভাষ আমরা কোথায় দেখিতে পাই? আমরা দেখি যে, প্রতি কার্য পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিশু যৌথভাবে পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ব্যস্ত। কার্য সম্পাদনে শিক্ষকের আদেশ নাই, বলপ্রয়োগ নাই, আছে সহানুভূতিসম্পন্ন সাহায্যদানের মনোভাব, শিক্ষাদানে আছে পূর্ণ উপলব্ধি, অন্তর্দৃষ্টি, বস্তুর ভাল ও মন্দ লক্ষ্য, গবেষণা, বিচার, সহযোগিতা, সাহায্য দান ইত্যাদি। কোনও বিষয় না বুঝিয়া প্রচার করা, মুখস্থ করা, যান্ত্রিকভাবে কোন কিছু শিক্ষা করায় কোন সুবিধাই নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় নাই। শিক্ষা-সংক্রান্ত কোন কিছু আয়ত্ত করিতে হইলে তাহাকে দেখিয়া শুনিয়া, পর্যবেক্ষণ করিয়া যাচাই করিয়া তবে আয়ত্ত করিতে হয়। সামাজিক চাহিদা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুবন্দোবস্তও বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষেই বর্তমান। প্রতিটি শ্রেণী একটি গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী গঠিত সমাজ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন কিছু পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে শিশু ও শিক্ষক উভয়পক্ষই ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে নানা ভাবে চেষ্টিত হন। ঐ সম্বন্ধে তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া আলোচনা করেন, শিশুরা কি করিতে চায়, কি তাহাদের ক্ষমতা, কি তাহাদের করা উচিত সমস্ত বিষয় লইয়াই আলোচনা সেখানে হইয়া থাকে। এই আলোচনা শিশুদের খেয়াল ও মর্জি প্রতিপালনের জন্য নয়, ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে শিশুদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার শিক্ষা দিতে এবং উহা কার্যকরী করিতে যে চিন্তা ও বিশ্লেষণ শক্তির প্রয়োজন তাহা নিজস্ব ধারায় বৃদ্ধি করিতে।

নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় পড়ালেখা সহ বিদ্যালয়ের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়গুলিই হইতেছে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র। গণতান্ত্রিক নীতিতে শিক্ষক ও শিশুকে যখন বিদ্যালয় পরিচালন ক্ষেত্রে যৌথ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, তখন শিশু নিজের দায়িত্ব পালন করিতে যাইয়া এমন কিছু করিয়া বসিবে না যাহা বিদ্যালয়ের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়। যদি সেইরূপ কিছু করেও, তাহা হইলেও সেই মনোবৃত্তিকে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থাও সেইখানেই আছে। ইহাকে আরও একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা চলে। প্রতি শ্রেণীর মত সমগ্র

বিদ্যালয়ও একটি গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত সমাজ। এই সমাজের যত কাজ সমস্তই শিক্ষক ও শিশু মিলিয়া সম্পাদন করেন। ইহা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বলিয়া শিক্ষক শিশুকে সকল কাজ করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ শিশুরাই করে। তাহারা পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে, বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, বাগানের কাজ করে, বিদ্যালয়ের যাবতীয় জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখে, বিদ্যালয়ের পত্রিকা সম্পাদন করে, লাইব্রেরীর কাজ পরিচালনা করে, বিদ্যালয়ের টিফিন বা জলখাবার বিতরণ করে, সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনা করে ইত্যাদি। এই সমস্ত কার্য পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ের সকল শিশুরা মিলিয়া একটি পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদে তাহারা ভোটের সাহায্যে বিভিন্ন কার্য দপ্তরের নেতা হিসাবে নির্বাচিত হয়। সাধারণত প্রধান নেতা, শ্রেণী নেতা, কৃষি নেতা, স্বাস্থ্য ও সাফাই নেতা, লাইব্রেরীর নেতা, টিফিন নেতা, সমবায় ভাণ্ডার নেতা, এই রকম কয়েকজন নেতার সাহায্যে শিশুরা বিদ্যালয়ে যাবতীয় কার্য করিয়া থাকে। এই সকল কাজ সম্পাদন দ্বারা শিশুরা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়, পূর্ণ নাগরিক হইবার জন্য যে সমস্ত গুণাবলী জীবনে অর্জন প্রয়োজন, তাহা তাহারা প্রথম হইতে অর্জন করিতে শিক্ষা করে।

প্রতি মাসের জন্য পরিষদ সভা হইতে নেতা নির্বাচিত হয় এবং নেতারা সেই মাসের জন্য বিদ্যালয়-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ অন্যান্য শিশুদের সাহায্য লইয়া করিয়া থাকে। নির্বাচনের সময় শিশুরা নির্বাচন প্রথা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আর পরিষদ সভায় পরিষদের সভ্যেরা মাসান্তে নেতাদের কার্যের সমালোচনা করে। সমালোচনা যাহাতে গঠনমূলক হয় সেইদিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখেন, শুধু তাহাই নয়, পরবর্তী নেতাগণ বর্তমান মাসের জন্য কোন্ নীতি অবলম্বন করিবে, এবং কি ভাবে পরিকল্পনা করিয়া বিদ্যালয়-সমাজের উন্নতি সাধনা করিবে, সেই সম্বন্ধেও আলোচনা চলে। শিশুরা গণতান্ত্রিক সমাজে গরিষ্ঠ সংখ্যক সভ্যদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিতে শিক্ষা করে, অথচ লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেও অসম্মান করে না।

শিক্ষা-ব্যবস্থার সমস্ত ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক মনোভাব সমস্ত ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শিক্ষার সমস্ত ধারাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন

করিয়া দিয়াছে, শিক্ষার আদর্শকে বদলাইয়াছে, এবং শিশুর জীবনকে বিপ্লবময়-জীবনে পরিণত করিয়াছে।

শিক্ষার এই বৈপ্লবিক অবস্থাকে শিক্ষকগণ যদি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন, কি জাতীয় পরিকল্পনা তাঁহারা রচনা করিবেন, এবং কি জাতীয় পদ্ধতির উদ্ভব হইলে শিশুদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহার জন্য তাঁহাদের আর চিন্তা করিতে হইবে না, সমস্ত ব্যবস্থার সমস্যা আপনা আপনিই জটিলতা-মুক্ত হইয়া আসিয়া শিক্ষকের কাছে ধরা দিবে।

References

1. Theory and Practice in the Elementary School. W. A. Saucier.
2. Activity in the Primary School. M. V. Daniel.
3. The Art of Teaching. Gilbert Hignet.
4. Teaching in Small Schools. Kate V. Wofford.
5. Democracy & Education. John Dewey.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিশু-পর্যবেক্ষণ

শিশু-পর্যবেক্ষণের সমস্যা

বর্তমান নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুর স্থান কোথায় তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। পূর্বে ছিল শিশু বৃত্তের পরিধিতে, আজ শিশু দাঁড়াইয়াছে বৃত্তের কেন্দ্রে। অর্থাৎ শিশুর শিক্ষাই যখন আমাদের উদ্দেশ্য, তখন শিশুর ইচ্ছা, অনিচ্ছা আশা, আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ, অপছন্দ, প্রয়োজন, অপ্রয়োজন সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করিয়া তবে শিশুর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্‌গণ, যথা,—পেষ্টালজি, ফ্রোয়েবেল এবং তাঁহাদের বর্তমান যুগের শিষ্যবর্গ সকলেই শিশু-পর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন যে, শিশুর শিক্ষা নির্ভর করিবে শিশু-পর্যবেক্ষণের উপরে। উন্নত ধরণের শিক্ষাদানের মূলে হইতেছে শিশু সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন। শিশুকে ভাল ভাবে বুঝিতে হইলে শিক্ষককে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শিশুকে এককভাবে ও দলগতভাবে এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। শিশু-পর্যবেক্ষণের ধারাবাহিক পর্যায় আছে এবং পর্যায়গুলি হইতেছে **শিশুকে দেখা,** তাহাকে **পরীক্ষা করা,** তাহার সম্বন্ধে **খবর সংগ্রহ করা** এবং এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের ফলে, তাহার সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে শিক্ষক উপনীত হইবেন, **সেই সিদ্ধান্তকে** শিশুর কল্যাণের জন্য, তাহার সুপরিচালনার জন্য **প্রয়োগ করা।** শিক্ষক বারংবার বিভিন্ন শিশুদের পর্যবেক্ষণ করিয়া সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, তাহাতে শিক্ষকের অভিজ্ঞতা পুষ্ট হইবেই, তাহা ছাড়াও শিক্ষক শিশু-বিশেষজ্ঞদের শিশু-পর্যবেক্ষণের রিপোর্টগুলি পাঠে শিশুর বিভিন্ন অবস্থার প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণের ধারা লক্ষ্য করিয়া স্বীয় ধারণাকে আরও স্পষ্টতর করিয়া লইবেন। শিশু-পর্যবেক্ষণ সহজ কাজ নহে, নানা কারণে ইহা জটিল। প্রথমত, শিশুর বর্তমান জীবন বহু প্রভাবের ফল। শিশু বহু শত পূর্বগামীদের বংশধর, বিশেষ করিয়া বিবর্তনের ফলে তাহার অবস্থা বংশের অন্য সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা ছাড়া যে পরিবেশে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং অবস্থান করিতেছে, তাহার প্রভাবও শিশুর জীবনে কম নয়, এমন কি শিশুর বংশগত উত্তরাধিকার পর্যন্ত পরিবেশ দ্বারা

প্রভাবান্বিত হইতেছে। শিশু-পর্যবেক্ষণের বিশেষজ্ঞগণের অভিমত এই যে, পরিবেশের কার্যকরী শক্তি এত বেশী যে, বৌদ্ধিক শক্তি, যাহা অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তনীয় বলিয়া বিবেচিত, তাহার উন্নতি পর্যন্ত পরিবেশের প্রভাব দ্বারা সম্ভব। বংশানুগতি ও পরিবেশের প্রভাব শিশু-পর্যবেক্ষণের এমনই জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। অবস্থা আরও জটিল হইয়াছে শিশু-পর্যবেক্ষণ সময় লইয়া। শিশুকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে তাহাকে দিবারাত্র সকল সময় পর্যবেক্ষণ করিতে হয়, কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অবস্থান করে, ততক্ষণ শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাহিরে শিশু যে ভাবে চলাফেরা ও আচার-ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হইতেও শিশুর জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব শিশু-পর্যবেক্ষণের সমস্যা অনেক। প্রত্যেক শিক্ষক শিশুর বৃদ্ধির ক্রম অনুযায়ী প্রতি বয়সে শিশুর যে সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, সে সমস্ত সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। পুস্তকলব্ধ জ্ঞান বিশেষ শিশুর পর্যবেক্ষণে প্রভূতভাবে সাহায্য করিবে। শিশুর প্রক্ষোভময় জীবনকে পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে প্রথমে কি করা উচিত তাহা এক সমস্যা। প্রথমতঃ শিশু প্রক্ষোভসংক্রান্ত যে সমস্ত ব্যবহার করে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন। শিশু-বয়সে দেখা যায়, সে থাকে মনে প্রাণে শিশু, অর্থাৎ সে যখন খুসী থাকে তখন সে হাসে, যখন রাগান্বিত হয় তখন সে কাঁদে, যখন সে বিরক্তি অনুভব করে, তখন সে হাত-পা ছোঁড়ে ইত্যাদি। নিজের মনের আবেগকে লুকাইবার ক্ষমতা সে তখনও অর্জন করে নাই। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে তাহার মধ্যে ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাইতে থাকে। ভাষা শিক্ষার পর হইতেই তাহার আদিম মনোভাবে পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ ভাষার আবরণে ঐ মনোভাব কিয়ৎপরিমাণে লুকায়িত থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রক্ষোভ যে একেবারে অপ্রকাশিত থাকে তাহা নয়। বয়স আরও বৃদ্ধি পাইলে সে তাহার অন্তর্জীবনে প্রবেশ করিয়া প্রক্ষোভকে একেবারে চাপা দিতে শিক্ষা করে। ফলে যিনি শিশুর প্রক্ষোভকে পর্যবেক্ষণ করিতে চান, তাঁহার অসুবিধার অন্ত থাকে না। শিশু যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া নিজেকে প্রকাশ না করে তবে তাহার অন্তর্জীবনের সন্ধান পাওয়া মুশকিল হয়। শিক্ষকের যদি পুস্তকলব্ধ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তবেই তিনি শিশুর সহযোগিতা লাভের পথ করিয়া লইতে

পারেন এবং তাহার অন্তর্জীবনের জটিলতাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে উপযুক্তভাবে পরিচালনা করিতে সমর্থ হন।

শারীরিক বৃদ্ধির হিসাব রাখা শিক্ষক বা গবেষকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। প্রক্ষোভজনিত ব্যবহারের মধ্যে যে জটিলতা ও সমস্যা থাকে, শারীরিক বৃদ্ধি-সংক্রান্ত ব্যাপারে সেরূপ জটিলতা দেখা যায় না। শারীরিক বৃদ্ধির ধারাকে লক্ষ্য করা যায়, পরিমাপ করা যায় এবং পরীক্ষা করিয়া দেখাও যায়। তাহা ছাড়া এ সমস্ত বিষয়ে এত গবেষণা হইয়াছে যে, শারীরিক বৃদ্ধির প্রতি স্তরের জন্য বিভিন্ন দেশে **মাধ্যমিক মান** (norm) পর্যন্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে ; অতএব শিশুর বৃদ্ধিকে যদি মাধ্যমিক মানের পটভূমিকার পরিমাপ করা যায়, তাহা হইলে আর কোন অসুবিধাই থাকে না। তাই শারীরিক বৃদ্ধির পর্যবেক্ষণ তেমন কিছু সমস্যামূলক নয়।

শিশুর মানসিক বুদ্ধিকে বুঝিতে চেষ্টা করা সহজসাধ্য নয়, বরং কঠিনই বলা যাইতে পারে। কারণ সাধারণ মানসিক ক্ষমতাকে পরিমাপ করিবার যন্ত্র সম্বন্ধে এবং এ যন্ত্রের সঠিক সিদ্ধান্তে আসিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের মধ্যে মতভেদ আছে। বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা-সমূহ শিশুর বুদ্ধির হিসাব সূক্ষ্মভাবে দিতে সক্ষম নয়, ইহা শুধু শিশুর মানসিক অবস্থার একটা সাধারণ মোটামুটি পরিচয় দিতে সক্ষম। তাহা ছাড়া বিশেষ বুদ্ধ্যঙ্কের সীমার মধ্যেও বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা স্থূলবুদ্ধির নিজস্ব স্তরের বিভিন্নতা সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, শিশুর মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, বিচার ও যুক্তির শক্তি, ইন্দ্রিয়ানুভূতিজনিত বিভেদ জ্ঞান এবং অন্যান্য মানসিক শক্তি, যেগুলির দ্বারা শিশুর শিক্ষালাভের ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়, সে সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এই সকল শক্তির পরিমাপ করা সহজ নয়, অতএব শিক্ষকের পক্ষে শিশুর মানসিক শক্তির পরিমাপ করা সুকঠিন সন্দেহ নাই। শিশুর মানসিক ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য যে অসুবিধার ফিরিস্তি দেওয়া হইল, তাহাতে মনে হইতে পারে যে, শিশুর মানসিক ক্ষমতার পর্যবেক্ষণ বুঝি শুধু বিশেষজ্ঞের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা যদি সকল শিশুকে পর্যবেক্ষণ করেন, তবে ভাল কথা, কিন্তু তাহারও সম্ভাবনা নাই। অতএব শিক্ষকদের সাহায্যেই শিশু-পর্যবেক্ষণ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া সমস্যা যত কঠিনই হউক না কেন, বারংবার বিভিন্ন শিশুকে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের

পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, এবং শিক্ষকের দৃষ্টিতে জটিলতা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইবে। সর্বোপরি শিশুকে পরিচালনা করাই যখন শিক্ষকের প্রকৃত লক্ষ্য, তখন তাঁহার পক্ষেই শিশুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

শিশুবিশেষের পর্যবেক্ষণের পর তাহার সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য সংগৃহীত হইল, তাহার সাহায্যে সকল শিশুকে বিচার করা চলে না, একথা সকলেই জানেন। প্রতি শিশু অপর শিশু হইতে পৃথক এবং প্রতি শিশুর পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হইলে পর শিক্ষক গোটা শ্রেণীর শিশুদের সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করিতে পারিবেন। শিশুর প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেই তবে তাহার পরিচালনার প্রশ্ন উঠে, তাহার পূর্বে নয়। অতএব শিক্ষককে যথাসম্ভব শীঘ্র শ্রেণীর সকল শিশুদের পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত করিতে হইবে। কিন্তু শিশু-পর্যবেক্ষণ ত যান্ত্রিক উপায়ে চলিতে পারে না যে যন্ত্রের গতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া সময় কমাইয়া দেওয়া যাইবে। অতএব কি ভাবে শ্রেণীর সকল শিশুর পর্যবেক্ষণ কার্য শেষ করা যায় তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। শিশুদের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি কমবেশী সকল শিশু-জীবনেই দেখিতে পাওয়া যায়।—শিক্ষক যদি একসাথে মাত্র দুইটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করিতে সুরু করেন এবং শিশু দুইটির বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করেন এবং সাথে সাথে শ্রেণীর সকল শিশুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাহা হইলে, পর্যবেক্ষণের কাজ অতিশয় দ্রুত সম্পন্ন হয়। দুইটি শিশুকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে ২০।২৫ দিনের বেশী সময় লাগা উচিত নয়। প্রতি ২০।২৫ দিনে দুইটি করিয়া শিশুর পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হইলে অতি অল্প সময়েই শ্রেণীর সমস্ত শিশুর বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষকের জানা হইয়া যাইবে। এদিকে শ্রেণীর সমস্ত শিশুদের সাধারণ (common) বৈশিষ্টগুলি শিক্ষকের প্রতিদিন লক্ষ্য করিয়া যাইতেছেন। শ্রেণীর সকল শিশুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে শিক্ষক বিশেষভাবে অবহিত হইলে, পরবর্তী সময়ে শিক্ষকের পক্ষে দুইটি করিয়া শিশু-পর্যবেক্ষণের কাজও সহজ হইয়া আসিবে এবং ২০।২৫ দিন সময়ের বদলে উহার অর্ধেক সময়ে বিশেষ শিশু দুইটির সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হইবে। অতএব শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণীর সমস্ত শিশুর পরিচয় লাভ অতি শীঘ্রই হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। এই সম্পর্কে একটি বিশেষ কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। যে সকল শিশুদের বিশেষ ভাবে পরিচালনের

প্রয়োজন তাহাদের পূর্বাহ্লেই পর্যবেক্ষণ করা উচিত, কারণ শিক্ষকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের সুপরিচালনার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করিতে হইবে। এই ত গেল শিক্ষকের দিক হইতে শিশু-পর্যবেক্ষণ করিবার ব্যবস্থার কথা। কিন্তু শিশু-পর্যবেক্ষণ কি করিয়া শিক্ষা করিতে হয়, তাহাই যদি শিশু-পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে যে-শিশুর মধ্যে নানা বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা আছে এমন শিশুকে গ্রহণ করিলে বোধ হয় ভাল হয়, কারণ ঐ শিশুর জীবনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়াগুলি শিক্ষার্থীর মনে প্রথমেই আসিয়া ছাপ দিতে চেষ্টা করিবে, পর্যবেক্ষণ সহজ হইবে।

শিশু-জীবনে লক্ষ্য করিবার মত বিষয়

শিক্ষক শিশু-পর্যবেক্ষণ কালে শিশু-সম্বন্ধীয় কি কি বিষয় লক্ষ্য করিবেন তাহা তাঁহার জানা প্রয়োজন। সমগ্র শিশুকে লক্ষ্য করিবার কথা আমরা বলিয়া থাকি। কিন্তু সমগ্র শিশুর বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতে হইলে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সেই অভিজ্ঞতা প্রথম-শিক্ষাব্রতীর নাই। অতএব শিশুর বিশেষ বিশেষ দিক্‌গুলি যদি বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করেন, তবেই শিক্ষকের পক্ষে শিশু-পর্যবেক্ষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা আছে। শিক্ষক শিশুর মধ্যে কি কি বিষয় দেখিবেন? শিক্ষক দেখিবেন, শিশুর শারীরিক বিকাশ, বৌদ্ধিক বিকাশ, প্রক্ষোভজনিত বিকাশ এবং সামাজিক বিকাশ। শিশুর জীবনে এই সব বিকাশগুলি লক্ষ্য করিতে হইলে যে সমস্ত অবস্থায় শিশুর জীবনে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তাহা শিক্ষকের লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। শিশু হইতেছে সমগ্র শিশু, তাহাকে ভাঙ্গিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতে এবং পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে পরস্পর নির্ভরশীল সমস্ত ব্যবস্থাগুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত। পর্যবেক্ষণ কার্য সুরু হইবার পূর্বে শিক্ষককে আরও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ করিতে হইবে। শিক্ষক যাহাদের পর্যবেক্ষণ করিবেন, তাহাদের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হইবেন। তাহাদের সঙ্গে সহজ সরলভাবে মেলামেশা, গল্প, খেলা ইত্যাদি করিলে শিশুদের জড়তা সম্পূর্ণ ভাবে কাটিয়া যাইবে, তখন শিক্ষকের পক্ষে শিশুদের সহজ অবস্থা এবং বিভিন্ন বস্তুজনিত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা সম্ভব হইবে। শিশুর জীবনে বিভিন্ন বিকাশ নিম্নলিখিত ধারা অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে।

শিশুর শারীরিক বিকাশ

শিশুর জন্মের পূর্বে যদি মাতা উপযুক্ত খাদ্য না পাইয়া থাকে, তবে শিশুর মস্তিষ্কের নিয়মিত বৃদ্ধি হয় না। শিশুও যদি অতি শৈশবে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় কিংবা বেশী রকম জটিল কোনরূপ রোগে ভুগিয়া থাকে অথবা উপযুক্ত খাদ্য না পায় তাহা হইলে শিশুর মস্তিষ্কের বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়। যত অল্প বয়সে শিশুর মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ততই তাহার ফল শিশু-জীবনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। অতএব শিশুর মস্তিষ্কের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য মাতা-পিতাই বেশী পরিমাণে দায়ী। সযত্নে শিশুকে পালন করিলে এবং শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মাতার প্রতি উপযুক্ত যত্ন নিলে শিশু অন্ততঃ-পক্ষে সাধারণের পর্যায়ে থাকিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। শিশুর দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি একই হারে বৃদ্ধি পায় না। দেহের যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বৃহৎ মাংসপেশী-যুক্ত, সেই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ক্ষুদ্র মাংসপেশী-যুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে অনেক বেশী। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শিশুর বাহু এবং দেহের নিম্নভাগ ক্ষুদ্র মাংসপেশী-যুক্ত চোখ বা হাত হইতে অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম দুইটি শ্রেণীতে সূক্ষ্ম কাজের কোন স্থানই নাই।

সাধারণতঃ যে সব শিশুর দেহের বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয়, বৌদ্ধিক বৃদ্ধিও তাহাদের অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে। যে সমস্ত শিশু বয়সের অনুপাতে উচ্চতায় ও ওজনে বেশী, তাহারা বুদ্ধির ক্ষেত্রেও সাধারণের একটু উপরে। পক্ষান্তরে যাহারা বুদ্ধিতে নিম্নস্তরের, তাহারা শারীরিক বৃদ্ধিতেও সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না। অবশ্য এইরূপ ভাবে সামান্য করণ উচিত নয়, কারণ বিপরীত অবস্থাও অনেক সময়েই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও এই উক্তির যে একেবারে কোন মূল্য নাই তাহাও নয়। যদি শিক্ষক সময়বয়স্ক একদল শিশুকে অপেক্ষাকৃত বেশী দৈর্ঘ্য ও ওজন হিসাবে দুইটি দলে বিভক্ত করিয়া নানাবিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখেন তবে দেখা যাইবে, যে দল লম্বায় বড় ও ওজনে বেশী সেই দল অন্য দল অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। শিক্ষক বালক ও বালিকার ক্ষেত্রে ভিন্ন রকমের শারীরিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বালিকারা বালকদের হইতে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে বালিকারা শারীরিক পরিপক্বতার দিক হইতে বালকদের হইতে পাঁচ-ছয় মাস অগ্রবর্তী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-

সমাপনের সময়ে দেখা যায় বালিকারা শারীরিক বৃদ্ধিতে বালকদের হইতে অন্ততঃপক্ষে এক বৎরের বড়। শারীরিক পরিপক্কতার হার বালিকাদের বেশী বলিয়া উহারা মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত অগ্রবর্তিনী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা উভয় দলের প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উভয় দলের মানসিক বয়স ও বুদ্ধ্যঙ্ক সমান্তরাল।

শিশু-পর্যবেক্ষণের সময় শিক্ষক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, শ্রেণীতে এক-তৃতীয়াংশ শিশুমাত্র সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন, অপর দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ সাধারণ রোগে ভুগিয়া থাকে এবং অপর এক-তৃতীয়াংশ শিশু কঠিন রোগে ভোগে। অতএব শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে এমন কয়েক জন শিশু পান যাহাদের শারীরিক বৃদ্ধি রুদ্ধ হওয়ার ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাহাদের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হইতেছে না এবং উপযুক্ত রকম ব্যক্তিত্বের অধিকারীও তাহারা হইতে পারিতেছে না। শারীরিক সাধারণ ত্রুটিগুলির কারণ হইতেছে উপযুক্ত খাদ্যাভাব, টনসিল ও এডিনয়েড মাংসগ্রন্থির রোগ, খারাপ দাঁত এবং স্বল্প দৃষ্টিশক্তি ও কাণের ব্যাধি। ভারতবর্ষের শতকরা প্রায় ৯০ জন শিশুই উপযুক্ত খাদ্যাভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের খুব যে কিছু করণীয় আছে তাহা মনে হয় না; কারণ ঐরূপ সমস্যার সমাধান শিক্ষকের শক্তি ও গণ্ডীর বাহিরে। তবে শিক্ষক শিশুর পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে শিশুর জন্য সুসম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারেন মাত্র, আর কিছু নয়। শিক্ষক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, শ্রেণীতে চোখে কম দেখা ও কাণে কম শোনার শিশুর দল একান্ত কম নয়। স্বল্প দৃষ্টিশক্তি ও কাণে স্বল্প শোনার জন্য শিশুর বৃদ্ধি নানা দিক হইতে স্থগিত থাকে। যে অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হইল তাহা দূরীকরণের চেষ্টা অতিশয় সহজসাধ্য না হইলেও, একেবারে দুঃসাধ্য নয়। শিশু-পর্যবেক্ষণেও শিক্ষক স্থানীয় চিকিৎসকের সহযোগিতায় শিশুর দৃষ্টির ও কাণে কম শোনার অসুবিধা দূর করিতে চেষ্টা করিতে পারেন।

শিশুর বুদ্ধির বিকাশ

শিশু-পর্যবেক্ষণের কালে শিক্ষক শিশুর বুদ্ধিশক্তির স্তর নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিবেন। পূর্বে শিশুর বুদ্ধির বিচার করা হইত শিশুর আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা এবং কোন বস্তু-সম্পর্কে শিশুর মনের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া, কিন্তু বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার আবিষ্কারের পর হইতে শিশু-বুদ্ধির নির্দিষ্ট,

অবস্থা জানিবার কিছুটা সুবিধা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরীক্ষার ফলাফল যেরূপ ত্রুটিশূন্য হয়, সেইরূপ ত্রুটিশূন্য ফল এই বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা হইতে পাওয়া সম্ভব নয়, তাহা হইলেও এইরূপ পরীক্ষা শিশুর বুদ্ধির স্তর সম্পর্কে কিছুটা নির্দেশ দিতে পারে। অতএব শিক্ষক শ্রেণীর প্রত্যেক শিশুর জন্য বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া শিশুর বুদ্ধির স্তর কি তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করিবেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই জাতীয় পরীক্ষার ফলাফল ত্রুটীহীন নয়, শুধু নির্দেশক মাত্র। অতএব পরীক্ষান্তে শিশুর বুদ্ধির স্তর যদি শিশুর ব্যবহারিক জীবনের নানা অবস্থার সঙ্গে খাপ না খায় তাহা হইলে শিক্ষক তাহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে মন্তব্য করিয়া রাখিবেন, যাহাতে ভবিষ্যতে তিনি আরও গভীরভাবে ঐরূপ বৈপরীত্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে পারেন। শুধু বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফলে শিশুর মনের সমস্ত অবস্থাকে শিক্ষক অনুধাবন করিতে পারেন না, ইহার সাহায্যে শুধু শিশুর বৌদ্ধিক শক্তি কোন স্তরে আছে তাহা সাধারণভাবে বুঝিতে পারা যায়; শিশুর আগ্রহ, ঔৎসুক্য, আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি ও চরিত্র সম্বন্ধে কোনই ধারণা করা যায় না। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য বিভিন্ন বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যে শিশু লিখিতে ও পড়িতে পারে না এবং কথাবার্তায়ও অতি লাজুক প্রকৃতির তাহার জন্য শুধু 'কর্ম-সম্পাদন-সংক্রান্ত পরীক্ষা'র (Performance Test) বন্দোবস্ত করা হইবে। শুধু একবার একজাতীয় Performance Test দিয়া শিশুর বুদ্ধি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়, কারণ শিশু আন্দাজে কোন কাজ করিয়া ফেলিয়া হঠাৎ হয়ত কাজে সাফল্য লাভ করিতে পারে। অতএব শিশুকে কয়েক রকম Performance Test দেওয়ার পর ফল যদি একই পাওয়া যায়, তবে তাহার বুদ্ধির স্তরকে গ্রহণ করা যায়। শিশুর বুদ্ধির প্রকৃত স্তর বাহির করিলেই চলিবে না। বিভিন্ন অবস্থায় শিশু তাহার বুদ্ধিশক্তিকে কি ভাবে প্রয়োগ করিতেছে তাহাও শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন।

শিশুর বুদ্ধি ও পিতামাতা

শিক্ষক শিশুর গৃহের পরিবেশের পটভূমিকায় শিশুর বুদ্ধির পরীক্ষা করিবেন। পিতামাতা শিশুর বুদ্ধি বিকাশে কতটা সাহায্য করিয়াছেন, কিংবা তাহার বুদ্ধির বিকাশের পক্ষে কতটা বাঁধা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা শিক্ষককে বাহির করিতে হইবে।

শিশুর শারীরিক অবস্থা ও বুদ্ধি

শিশুর শারীরিক অবস্থা তাহার বুদ্ধিশক্তির সঙ্গে কি ভাবে যুক্ত তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। শিক্ষক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, শিশুর বৌদ্ধিক অবস্থা তাহার শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা কোন ভাবে ব্যাহত হইতেছে কিনা।

সামাজিক পরিবেশ ও বুদ্ধি

সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে শিশুর বুদ্ধি কতটা স্ফুরিত হয় তাহা শিক্ষক লক্ষ্য করিবেন। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার Iowaতে যে গবেষণ করা হয় তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েকটি শিশুকে অপেক্ষাকৃত নীচু সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর হইতে লওয়া হইল। তাহাদের শিক্ষার স্তরও নীচুই ছিল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহাদের মাতাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮৭, অর্থাৎ সাধারণ হইতে অল্প নীচু। তাহাদের পিতাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল এবং তাহাদের বেশীর ভাগই দিনমজুরের বা ঐ জাতীয় কাজ করিত। শিশুদের যখন বয়স ছয় মাস মাত্র, তখন তাহাদের নিজস্ব গৃহের পরিবেশ হইতে লইয়া পালক পিতামাতার গৃহে রাখা হইল। বলা বাহুল্য, এই পালক পিতামাতাদের সামাজিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের ছিল। কয়েক বৎসর সেখানে রাখার পর দেখা গেল যে, শিশুদের গড়পড়তা বুদ্ধ্যঙ্ক হইতেছে ১১৫.৪। শিশুদের মধ্যে শতকরা ৯৬জন সাধারণ বা সাধারণের উপর এবং মাত্র শতকরা ৪ জন শিশু সাধারণের নীচে বলিয়া দেখা গেল। এই গবেষণা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশে শিশুর বুদ্ধির স্ফুরণ ভাল ভাবেই হয়। নূতন শিক্ষাব্রতিগণও বিদ্যালয়ের শ্রেণীর শিশুগণকে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, বেশীর ভাগ শিশুরই অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক পরিবেশ অত্যন্ত নীচু স্তরের এবং তাহাদের বুদ্ধির অবস্থাও তাহাদের পরিবেশকে অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। গৃহে নূতন পরিবেশ সৃষ্টির যখন কোন উপায় নাই, তখন বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য নূতন সামাজিক পরিবেশ রচনা করিয়া তাহাদের বুদ্ধির বিকাশে যতটা সম্ভব সহায়তা করিবার সুযোগের সৃষ্টি করিতে হইবে।

শিশুর প্রক্ষোভজনিত বিকাশ

শিক্ষক শিশুর শারীরিক বৌদ্ধিক বিকাশ লক্ষ্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রক্ষোভজনিত বিকাশ লক্ষ্য করিবেন। প্রক্ষোভজনিত বিকাশের

প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ছোট শিশুর ব্যবহারে কোন রকম বিশেষ প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া প্রায় দেখাই যায় না। প্রক্ষোভজনিত প্রতিক্রিয়াগুলিকে শিশুর জীবন হইতে পৃথক করিয়া ফেলা সম্ভব নয়, ঐরূপ অবস্থাকে 'উত্তেজনার' ভাব বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। বহু মনোবিদের মতে ভালবাসা, ক্রোধ এবং ভয় এই তিনটি প্রাথমিক প্রক্ষোভও শিশুর জন্মের সময় দেখা যায় না। শিশুর দেহ ও মন যতই পরিপক্বতা লাভ করে এবং শিশু বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করে, ততই তাহার জীবনে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হইতে থাকে। প্রক্ষোভ সৃষ্টির গোড়ার কথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু বংশানুক্রমের কোন প্রভাবই প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে দেখা যায় না, সেই হেতু শিক্ষক শিশুর প্রক্ষোভকে বিভিন্ন সৃষ্ট পরিবেশে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করিতে সমর্থ। তাহার পুর্বে শিশুর প্রক্ষোভের প্যাটার্নগুলি জানা শিক্ষকের অতি বড় কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষক নানাভাবে নানা অবস্থার মধ্যে শিশুর আবেগজনিত বাধার যথাসম্ভব খবর সংগ্রহ করিবেন। তারপর প্রয়োজনমত তিনি শিশুর প্রক্ষোভকে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

শিশুর সামাজিক বিকাশ

প্রক্ষোভের মত সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ইহা শিশুর বংশগত নহে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের প্রভাবেই শিশুর সামাজিকতা-বোধ বৃদ্ধি পায়। তবে শিশুর দৈহিক গঠন যে তাহার সামাজিক পরিস্থিতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত না করে তাহা নয়। যে শিশুর গঠন বলিষ্ঠ তাহাকে শিশু-সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যায়। সে যাহা হউক, মনোবিদগণ ও সমাজবিজ্ঞানীরা উভয়েই একমত যে, শিশুদের ভাবধারা সামাজিক পরিবেশদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে শিশুদের সামাজিক বিকাশ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করা অতিশয় দুরূহ, কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে বয়সে শিশুরা থাকে, সেই বয়সেই শিশুদের মধ্যে সামাজিক ও অসামাজিক মনোবৃত্তির বিশেষ বিকাশ হইতে দেখা যায়। অতএব এই সময়টা শিক্ষকের পক্ষে পর্যবেক্ষণেরও যেমন দায়িত্ব, তেমনি সুপরিচালনেরও দায়িত্ব খুব বেশী। শিশুদের সামাজিকতা-বোধ কিরূপ এবং কতটা জাগ্রত, তাহার পরিমাপ করা শিক্ষকের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর। অতিশয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে শিক্ষক

শিশুদের মধ্যে অসামাজিক প্রবণতাগুলি ধরিতে পারিবেন না। শিশুদের অসামাজিক মনোবৃত্তিগুলি শিশুদের নানারূপ ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শিশুদের মধ্যে দেখা দেয় স্নায়ুদৌর্বল্য, আত্মকেন্দ্রিকতা, লজ্জা, ক্রোধ, দিবাস্বপ্ন, অবাধ্যতা, অশ্লীলতার প্রতি আসক্তি, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ইত্যাদি। এই সমস্ত অসামাজিক মনোবৃত্তিগুলির মূলে হইতেছে স্বাস্থ্যহীনতা, অন্যান্য শারীরিক ত্রুটি এবং গৃহ, সমাজ ও বিদ্যালয়ের অনিষ্টকর পরিবেশ। শিক্ষক শিশু-পর্যবেক্ষণ কালে অতিশয় যত্নের সঙ্গে শিশুর বিভিন্ন অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং শিশুর সামাজিকতা-বোধ বৃদ্ধি করিবার জন্য যে-সব ব্যবস্থা আছে তাহার প্রয়োগ করিয়া দেখিবেন। সাধারণতঃ ঐরূপ বোধ বৃদ্ধির জন্য গৃহ সহায়তা করিতে পারে সব চেয়ে বেশী, শিক্ষক পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া শিশুর সামাজিক গুণ বৃদ্ধির সম্পর্কে তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে পারেন। খেলার মধ্য দিয়া অসামাজিক মনোবৃত্তির হ্রাস পাইয়া থাকে, শিক্ষক শিশুকে দলগত খেলার মধ্যে আনিয়া তাহাকে দলগত খেলার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিলে সে হয়ত সামাজিক জীবে পরিণত হইবে। তৃতীয় উপায় হইতেছে সিনেমার ছবি। শিশুরা চলচ্চিত্র দেখিতে খুব ভালবাসে। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র শিশুদের দেখাইলে তাহাদের মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন সম্ভব হইতে পারে বলিয়া মনোবিদেরা বিশ্বাস করেন।

শিশু-পর্যবেক্ষণের কৌশল

শিশুকে পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য কোন রকম বিশেষ নিয়মের নির্দেশ দেওয়া চলে না। তবে পর্যবেক্ষণ কালে যে যে বিষয়ের উপর শিক্ষকের লক্ষ্য রাখিতে হয়, সে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া চলে মাত্র।

১। শিশুর পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করিবার পূর্বে, তাহার অতীত সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, সে খবর সংগ্রহ করা দরকার। সমগ্র শিশু সম্বন্ধে সাধারণ খবর অনেক সময় শিক্ষককে নির্দিষ্ট সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। এই কারণে শিশুর অতীতের কোন কোন ঘটনা জানা থাকিলে কিংবা উহা সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

২। শিশুর পরিবারগত সমস্ত খবর সংগ্রহ করা উচিত। পিতামাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা-

দীক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষককে অবহিত হইতে হইবে। শুধু তাহাই নয় শিশুর ভাই-বোনের সংখ্যা এবং তাহাদের মধ্যে শিশুর স্থান ; ভাই-বোনদের সঙ্গে তাহার প্রক্ষোভজনিত সম্পর্ক ; পিতামাতার শিশুর প্রতি ব্যবহার, শিশুর পিতামাতার প্রতি ব্যবহার—ইত্যাদিও শিক্ষকের লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বস্তুতঃ পক্ষে শিশু তাহার গৃহের পরিবেশকে ভিত্তি করিয়াই আচরণ করে। অতএব শিক্ষকের পক্ষে শিশুকে প্রকৃতভাবে জানিতে হইলে তাহার গৃহের পরিবেশ তাঁহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে।

৩। গৃহের পরিবেশ যেমন শিশুর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে, সেইরূপ শিশুর প্রতিবেশও শিশুর জীবনের উপর একটি নির্দিষ্ট ছাপ মারিয়া দেয়। শিশুর প্রতিবেশী ও বন্ধুর দল শিশুর কার্যাবলীকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব শিক্ষকের পক্ষে পর্যবেক্ষণ-কার্যে প্রতিবেশও লক্ষ্য করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

৪। শিশুর বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হিসাব শিক্ষককে রাখিতে হইবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হিসাব করিতে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। How to study the Behaviour of Children নামক পুস্তকে Gertrude Driscoll নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রক্ষোভজনিত বিকাশের হিসাব রাখিতে ইঙ্গিত দিয়াছেন—

(ক) শারীরিক বৃদ্ধি নির্ধারণ সম্পর্কিত সূত্রের ইঙ্গিত :—

(১) বয়স ও ওজনের অনুপাতে দৈর্ঘ্য, (২) নিজস্ব বস্তুসমূহ সযত্নে রাখিবার কৌশল কতদূর আয়ত্ত করিয়াছে।

(খ) মানসিক বিকাশ নির্ধারণে ইঙ্গিত :—

(১) নির্দেশ অনুসরণ করিবার শক্তি (২) বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে অর্জিত বিদ্যার-সম্পর্ক (৩) আগ্রহের বিকাশ (৪) অবাস্তব বিষয়-সম্পর্কিত চিন্তার (abstract thinking) ক্ষমতা (৫) সিদ্ধান্ত দানে ক্ষমতা (৬) বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান (৭) স্বীয় মত ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা (৮) স্মৃতিশক্তি।

(গ) প্রক্ষোভজনিত বিকাশ নির্ধারণের সূত্রের ইঙ্গিত :—

(১) নিজস্ব অনুমোদনের উপর নির্ভর করা (২) প্রক্ষোভজনিত প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নরূপ মনোভাব প্রদর্শনের ক্ষমতা (৩) সমস্যাপূর্ণ অবস্থায় মনের প্রতিক্রিয়া (৪) বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ গ্রহণ (৫) সময়োচিত প্রয়োজনে মনোভাব প্রদর্শন (৬) আত্মকেন্দ্রিক ব্যবহারের গুরুত্ব।

(ঘ) **সামাজিক বিকাশ নির্ধারণে সূত্রের ইঙ্গিত ঃ—**

(১) সামাজিক আচরণ (২) দলীয় কর্মে শিশুর অবদান (৩) শিশুর আচরণ-সম্পর্কিত বিধি (৪) শিশুর নেতৃত্ব। (৫) দলের সঙ্গে শিশুর বন্ধন সুদৃঢ়। সে দলগত হইয়া খেলা কাজ ইত্যাদি করিতে খুব ভালবাসে। বিভিন্ন দলের সঙ্গে বিভিন্ন অবস্থায় শিশুর মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এই বিভিন্ন অবস্থায় শিশুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এবং শিশুর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিলে তাহার সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফলে শিক্ষকের পক্ষে শিশুকে বুঝিতে পারাও সহজ হইবে। বিভিন্ন অবস্থার কথা যাহা উল্লেখ করা হইল, তাহা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—**বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, পথঘাট** এবং **দলীয় আলোচনা**। এই চারিটি বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন দলের মধ্যে যদি শিশুকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে কি জাতীয় মনোভাব পরিলক্ষিত হয় তাহা শিক্ষক বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারেন।

শিশুর সম্বন্ধে যে সকল খবর সংগ্রহের ইঙ্গিত দেওয়া হইল, সেই সকল ইঙ্গিত শিক্ষক কি ভাবে অনুসরণ করিবেন তাহাই হইতেছে পরবর্তী প্রশ্ন। শিশুর গুণাগুণ কি ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইবে, এবং কি ভাবেই বা সেই কাজে শিক্ষক অগ্রসর হইবেন, তাহাই হইতেছে বিশেষ সমস্যা, কিন্তু সমস্যা হইলেও তাহা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে খুব জটিল হইবে না। যে যে কৌশল অবলম্বন করিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা পর্যবেক্ষণ-কার্য চালাইবেন তাহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শক্তি ও সামর্থ্যকে অবলম্বন করিয়াই রচিত। মনোবিদ্‌গণ এবং বিশেষ পরীক্ষক বা গবেষকগণ শিশুকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন, বিভিন্ন অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের নানারূপ মনোভাবের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন; পর্যবেক্ষণ-গৃহে শিশুকে আনয়ন করিয়া নানা ভাবে পরীক্ষা, পরিসংখ্যান বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ এবং অন্যান্য বহু ব্যবস্থার মধ্য দিয়া শিশুর পর্যবেক্ষণ তাঁহারা করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ শিশুদের জন্য ঐরূপ বিস্তৃত প্রণালী অবলম্বনের প্রয়োজন নাই, কারণ শিক্ষকের উপরই যখন শিশুর পরিচালনার ভার, তখন তাঁহাকেই যে করিয়া হউক শিশুর সমস্ত অবস্থাকে জানিতে হইবে। শুধু যে সকল শিশু কোন নির্দিষ্ট সমস্যার সৃষ্টি করে, তাহাদিগকে মনোবিদ্ ও গবেষকদের কাছে প্রেরণ করা যায়, নানাভাবে

ও বিস্তৃতভাবে পরীক্ষার জন্য। অতএব সাধারণ শিক্ষককে শিশু-পর্যবেক্ষণের জন্য অতি সহজ কৌশলের সন্ধান দিতে হইবে এবং সহজ কৌশল হইতেছে শিশুর জীবনের কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ (Anecdotal Records) করার মধ্য দিয়া শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা। এই ঘটনাগুলি অবশ্য এমন জাতীয় হইবে, যাহার মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্ব নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ঘটনাগুলি ঘটিলেই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। হয়ত কোন এক দিনে লিপিবদ্ধ করিবার মত বারংবার ঘটনা ঘটিল, আবার কোন দিন কিছুই ঘটিল না এমনও হইতে পারে। সাধারণতঃ এই ভাবে কাজ করিতে হইলে অনেকদিন পর্যন্ত এইরূপ ভাবে ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে হয়। এই জাতীয় পর্যবেক্ষণে সুবিধা এই যে, শিশুর সম্বন্ধে বহু ঘটনার সমাবেশ হয় এবং শিক্ষকের পক্ষে সিদ্ধান্তে আসা সহজ হয়।

ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করার পরই শিশু সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত নয়। সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া নানা পর্যায়ে প্রতিক্রিয়াগুলি বিভক্ত করিয়া উহাদিগকে নির্দিষ্ট পর্যায় অনুযায়ী সন্নিবেশিত করিলে শিশু-চরিত্রের একটা ধারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করা যাইবে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন এবং শিশুকেও পরিচালিত করিতে পারেন।

Anecdotal Record ছাড়াও শিক্ষক অন্যান্য প্রণালীতে শিশু-পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন। তিনি শুধু শিশুর বিভিন্ন প্রকাশের ক্ষেত্রে শিশুর গতি এবং বিভিন্ন কর্মের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া শিশুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া যাইতে পারেন। Anecdotal Record এবং এই জাতীয় পর্যবেক্ষণে পার্থক্য হইতেছে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মাত্র। Anecdotal Record-এর ক্ষেত্রে শিশুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়, আর এইখানে নানা পরিস্থিতিতে শিশুর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করা হয় মাত্র। Anecdotal Record-এর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে কিছুদিন শিশুর নানাবিধ ঘটনা লক্ষ্য এবং লিপিবদ্ধ করিয়া পরে ঐ ঘটনাগুলি শিশুর যে বিকাশ ইঙ্গিত করে, তাহা তালিকাভুক্ত করা হয়। যে কোন ভাবেই শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা হউক না কেন, পরবর্তী পৃষ্ঠা অনুযায়ী ছক কাটিয়া শিশুর গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। লিপিবদ্ধ করা শেষ হইলে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াগুলিকে বারবার পাঠ করিয়া এবং ঐসব সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া পরে উহাদের ব্যাখ্যা

চলিতে পারিবে। শুধু পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া শিশু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে কিঞ্চিৎ অসুবিধা দেখা যায়। প্রথমতঃ যেখানে শুধু দেখার উপর

তারিখ	শারীরিক বিকাশ	বৌদ্ধিক বিকাশ	প্রক্ষোভজনিত বিকাশ	সামাজিক বিকাশ	ব্যাখ্যা ও মন্তব্য

নির্ভর করিয়াই সিদ্ধান্তে আসিতে হয়, সেখানে দেখাটা যাহাতে কোন প্রকার দোষ-দুষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সময় ইহাতে প্রচুর ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু সাধারণতঃ সময়ের এত প্রাচুর্য শিক্ষকের থাকে না; তাই শিশুকে দেখার মধ্যে সামান্য একটু ভুল-ত্রুটী থাকিলে শিক্ষকের ব্যাখ্যা করাও ত্রুটিপূর্ণ হইবে।

সে যাহা হউক, শুধু পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করা ছাড়াও শিশুকে বুঝিতে পারার জন্য নানারূপ পরীক্ষা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তবে ঐ সকল পন্থা বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই অবলম্বিত হইলে ভাল হয়। সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে Anecdotal Record অনুযায়ী কাজ করাই সুবিধাজনক। কারণ বহু ঘটনার সমাবেশ শিক্ষকের মনে একটা বিশেষ মত (concept) সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়াও, মোটামুটিভাবে শিশুকে বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ-পত্রটির সাহায্যে শিশু-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়গুলি জানিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

শিশু-পর্যবেক্ষণ-পত্র

১। শিশুর নাম—বয়স—মেয়ে: ছেলে—ভাইবোনদের মধ্যে তাহার স্থান—পরিবারের অন্যান্য শিশুদের মধ্যে তাহার স্থান।

২। শিশুর বংশগত বৈশিষ্ট্য—পরিবারের সামাজিক বনাম অর্থনৈতিক অবস্থা—পরিবারের কৃষ্টিগত ভিত্তি।

৩। শিশুর স্বাস্থ্য—উচ্চতা—ওজন—তাহার দৈনিক বরাদ্দ খাদ্য—খাদ্য শারীরিক গঠনে সাহায্যকারী কিনা—যে যে অসুখে শিশু ভুগিয়াছে বা বর্তমানে ভুগিতেছে—দ্বিতীয় বার দাঁত উঠিবার সময়—কোন মাংস গ্রন্থির অসম্পূর্ণতা বা দোষ—দৃষ্টিশক্তি বা অন্য কোন শারীরিক অক্ষমতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—যে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা হইবে, তাহার পর্যবেক্ষণ কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বেই তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) শিশুর গৃহ ও তাহার গৃহ-জীবন।

(খ) শিশুর প্রতিবেশী ও আবেষ্টনী।

(গ) শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও সামাজিকতাবোধ বৃদ্ধি।

(ঘ) দলের মধ্যে শিশুর স্থান ও তাহার মনোভাবের প্রতিক্রিয়া।

প্রতি শিশুর পর্যবেক্ষণ-পত্রের মধ্যে উপরের নির্দেশ বা সূত্র অনুযায়ী খবর সংগ্রহ করিয়া উহা শিশুর বর্তমান অবস্থার বিবরণীর পাশে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। ইহার সুবিধা—দুই অবস্থার তুলনামূলক বিচার করিয়া সহজে সিদ্ধান্তে আসা।

উপরের বর্ণিত বিষয়গুলি পূর্ব-বুনিয়াদী বা নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর পক্ষেই প্রযোজ্য ; কিন্তু উভয় স্তরের শিশু সম্পর্কে যে যে বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, তাহা বিভিন্ন। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হইবে বলিয়া দুই স্তরের শিশু সম্পর্কেই পর্যবেক্ষণের সূত্র নির্দেশ দেওয়া হইল।

পূর্ব-বুনিয়াদী স্তরের শিশুর জন্য

১। **শিশুর খেলা**—সাধারণ খেলা—কর্মজ্ঞাপক খেলা—এককভাবে—দলগতভাবে (খেলার যে কোন অবস্থার জন্য মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা ও মন্তব্যের প্রয়োজন)।

২। **শিশুর ভাষার ব্যবহার**—কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া শিশুকে পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার প্রতি কথা লিপিবদ্ধ করা—শিশুর প্রতি বাক্য ও বাক্য-সংশ্লিষ্ট শব্দ লিখিয়া রাখা—শিশুর বাক্যের ধরণ লক্ষ্য করা—শিশু সম্পূর্ণ-বাক্য ব্যবহার করে, না অর্ধেক বাক্য দ্বারা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে প্রয়াস পায়?—যে-সব শব্দের অর্থবোধ হয় নাই, শুধু তাহা পূর্বে কোথায়ও শুনিয়া

ব্যবহার করিতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করা—বাক্যের পদসমূহের মধ্যে কোন্ জাতীয় পদ শিশু ব্যবহার করে ইত্যাদি।

৩। **শিশুর বুদ্ধির বিকাশ**--শিশুর **স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ, বিচার, যুক্তি** ইত্যাদি—শিশুকে কোন কর্ম সম্পাদনে রত অবস্থায় লক্ষ্য করিতে হইবে।—শিশু **কোন্ জাতীয় কর্ম** কত অল্প সময়ে সম্পাদন করিতে পারে, তাহা কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্মের মধ্য দিয়া সকল শিশুকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। শিশুর **পর্যবেক্ষণ-শক্তি** নিরূপণ করিতে হইলে শিশু যে বস্তু অতিশয় অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়াছে সেই বস্তুর বিবরণ দিতে বলা যাইতে পারে। —শিশুর **ঔৎসুক্য**—শিশুর ঔৎসুক্য বুঝাইবার জন্য নির্দিষ্ট অবস্থায় শিশুর ঔৎসুক্যের বিবরণ দিতে হইবে।

৪। **শিশুর সামাজিক বিকাশ**—পরিবারে অন্যান্য সকলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ—কাহাকে ভালবাসে, কাহাকে ভয় করে, কাহার কাছে বেশী থাকিতে চায় ইত্যাদি শিক্ষককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।—অপরিচিত লোকের সঙ্গে শিশুর ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া—সমবয়সী শিশুদের প্রতি শিশুর ব্যবহার ও মনোভাব—নিজের ছোট-ভাইবোনদের প্রতি তাহার ব্যবহার।

৫। **শিশুর প্রক্ষোভময় জীবন—ভয়**—যে যে অবস্থায় শিশু ভীতি প্রকাশ করে—**ক্রোধ, ঈর্ষা, প্রীতি, বিরক্তি, বিক্ষোভ—প্রথম বিপক্ষ আচরণ—বিষাদ-ক্রন্দন**—যে যে অবস্থায় শিশুতে পূর্বোক্ত প্রক্ষোভগুলি দৃষ্ট হয়—ঐ সব প্রক্ষোভগুলি একবার সৃষ্ট হইলে উহাদের স্থায়ী কাল ও পৌনঃপুন্য লক্ষ্য করিতে হইবে।—[শিশুকে দিয়া কতকগুলি ছবি আঁকাইতে হইবে। ছবি আঁকিবার জন্য কোন নির্দেশ দেওয়া হইবে না। শিশুর ইচ্ছামত ছবিগুলি অঙ্কিত হইলে ছবিতে শিশু কি আঁকিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষক ছবির অপর পৃষ্ঠায় তাহা লিখিয়া রাখিবেন। এইরূপ ১০।১২ খানা ছবির বিষয় হইতে শিক্ষক শিশুর প্রক্ষোভময় জীবনের ইঙ্গিত পাইবেন—শিক্ষক নিজস্ব ব্যাখ্যা দিবেন।]

পূর্ব-বুনিয়াদী বিভাগের অন্তর্গত শিশুদের পর্যবেক্ষণ পূর্বে উক্ত সূত্রগুলির দ্বারা করা সম্ভব হইবে। বস্তুতঃপক্ষে ঐ সূত্রগুলি পর্যবেক্ষণের ইঙ্গিত মাত্র, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুবিশেষে বিভিন্ন সমস্যার উদয় হইবে, শিক্ষক সেই দিক বিচার করিয়া শিশুকে সর্বদা একটা ফরমূলায় ফেলিয়া পর্যবেক্ষণ করিবেন না।

নিম্ন-বুনিয়াদী বিভাগের অন্তর্গত শিশু

১। **শিশুর শারীরিক বিকাশ**—খেলাধুলা ইত্যাদি।

২। **শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ**—বিভিন্ন অবস্থায় শিশুর মানসিক প্রতি-ক্রিয়া—বিভিন্ন বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার সাহায্যে শিশুর মানসিক বয়স ও বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়—ইত্যাদি।

৩। **শিশুর সামাজিক বিকাশ**—শিশুর একক জীবন—দলগত জীবন—দলগত জীবনে শিশুর স্থান—পরিচালনা শক্তি—আদেশ পালন—বন্ধুত্ব—স্বজনপ্রীতি—অপরিচিতের প্রতি ব্যবহার—পারিবারিক প্রয়োজনে শিশু—ইত্যাদি।

৪। **শিশুর প্রক্ষোভময় জীবন**—ক্রোধ—প্রীতি—দ্বন্দ্ব—বিষাদ—বিরক্তি—আনন্দ ইত্যাদি।

[শিশুর প্রতি অবস্থা বিভিন্ন পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া শিক্ষক নিজস্ব ব্যাখ্যা ও মন্তব্য সংযোগ করিয়া দিবেন।]

৫। শিশুকে পনের কিংবা কুড়ি দিন ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার প্রতিদিনকার কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং সেই সূত্রে শিশুর ভয়, ক্রোধ, আগ্রহ, ঔৎসুক্য, পড়া ও লেখায় সাফল্য বা অসাফল্য, তাহার আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা,—বুদ্ধিমান বা নির্বোধের মত ব্যবহার—অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী ব্যবহার—তাহার বিচার ও যুক্তির ক্ষমতা—তাহার মনোযোগ, অভিনিবেশ, তাহার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য—প্রত্যেকটি অবস্থা শিক্ষক লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন—পরে প্রত্যেকটি অবস্থার সম্পর্কে শিক্ষককে নিজস্ব ব্যাখ্যা ও মন্তব্য দিতে হইবে।

৬। শিশুদের কয়েকটি অনির্দেশিত অঙ্কিত চিত্র সংগ্রহ করিতে হইবে—শিক্ষক সেই সকল চিত্রের ব্যাখ্যা করিবেন। চিত্র ছাড়া, শিশুদের সৃজনাত্মক লেখা, হাতের লেখা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া শিক্ষককে তাহার উপর সমালোচনাসূচক মন্তব্য লিখিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—উপরের পর্যবেক্ষণ-পত্রটির সকল রকম উত্তর সংগ্রহ করিতে হইলে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে:—

(১) শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্য করিয়া দেখা এবং বস্তুসমূহের প্রতি তাহার প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা।

(২) প্রশ্নপত্রের সাহায্যে উত্তর সংগ্রহ করা।

(৩) প্রচলিত পরীক্ষামূলক প্রশ্নের (Standardised Tests) সাহায্যে তাহার মানসিক অবস্থা স্থির করা।

(৪) শিশুর সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান-পত্র তৈরী করা।

(৫) পর্যবেক্ষণ সময়ে শিশুর সমস্ত অবস্থাকে নিরীক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা।

পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা হইতে এটুকু বুঝা গেল যে, শিশু-পর্যবেক্ষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং শিক্ষককে তাহা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করিতে হইবে।

References

1. Teaching in Small Schools.—Kate V. Woodford.
2. Theory and Practice in the Elementary School.—W. A. Saucier.
3. The Educational Guidance of the School child.—Evans Brothers Ltd.
4. An Introduction to Teaching.—H. C. Barnard.
5. Educational Psychology—Gates, Jersild, Mc. Cornell & Challmans.

দলগঠন করিয়া তাহাদের শিক্ষাদান করিলে শিক্ষকের সুবিধা হয় এবং শিশুদের শিক্ষার গতিও অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পুস্তকের পৃষ্ঠাই শিক্ষার শেষ কথা নয়, শিক্ষার সঙ্গে আরও অনেক বিষয় সংশ্লিষ্ট। অতএব সে-সমস্ত বিষয়ের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিলে শিশুদের দলগঠন সার্থক হইল না বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

বুদ্ধ্যঙ্ক অনুযায়ী দল গঠন

অনেক শিক্ষক একই বুদ্ধ্যঙ্ক-সম্পন্ন শিশুদিগকে একই দলভুক্ত করিয়া শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, এবং অনেক শিক্ষাবিদের মতে এই প্রকার দলবিভাগই সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁহারা মনে করেন যে, যেহেতু শিশুরা বুদ্ধিতে সমপর্যায়ের, অতএব তাহাদের পক্ষে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে একই প্রকার দক্ষতা প্রদর্শন সম্ভব।

সাধারণতঃ বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা দ্বারা শ্রেণীর শিশুদিগকে বিভিন্ন দলভুক্ত করা হয়। দলগুলি ধরা যাক **ক', খ', গ'**। ক' দল হইতেছে **বিশেষ বুদ্ধি-সম্পন্ন**, খ'দল হইতেছে **সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন** এবং **গ'**দল হইতেছে সাধারণের নীচে **নির্বোধের** দল। এইরূপ দলবিভাগের কুফল শিক্ষাদানের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এইরূপ দলবিভাগ শিশুদের অভিভাবকেরা বিশেষ পছন্দ করেন না। ভাগ্যক্রমে যদি অভিভাবকের অধীনস্থ শিশু **ক'** দলে পড়ে, তাহা হইলে হয়ত অভিভাবক এবিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া চুপ করিয়া থাকেন, কিন্তু **খ'** ও **গ'** দলের শিশুর অভিভাবকেরা নিশ্চয়ই তাহাদের শিশুদের ঐরূপ **একটা মার্কা বা ছাপ** পছন্দ করিবেন না। অভিভাবকেরা তাহাদের শিশুদের জন্য নিজেরাই **হীন ও অপমানিত বোধ** করিতে থাকিবেন। বুদ্ধ্যঙ্কের উপর নির্ভর করিয়া দলবিভাগ করিলে শিশুদের ভবিষ্যতে দল পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে না, কারণ বৌদ্ধিক বিকাশের তারতম্য এমন কিছু হয় না যে, নির্বোধ শিশু হঠাৎ এক দিন অত্যন্ত বুদ্ধিমান হইয়া দাঁড়াইতে পারে। অতএব এইরূপ একটি ছাপ বা মার্কা শিশু-জীবনের প্রথম হইতেই যদি শিশুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে, তাহা হইলে **গ'**দলের শিশুর মনে যে **হীনমন্যতা** প্রথম হইতেই জাগ্রত হইবে, তাহাই নয়, যাহারা **ক'** দলীয়, তাহারা নিজেদের বুদ্ধির অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে থাকিবে, এবং তাহাদের এই মনোভাবই কর্মের দিক হইতে তাহাদের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। উদাহরণস্বরূপ এইখানে অভিজ্ঞতা হইতে

কয়েকটি পঞ্চম শ্রেণীর বালকের কথা উল্লেখ করিতেছি। বালকেরা বিশেষ বুদ্ধিমান। তাহাদের যে কোন কাজ করিতে দেওয়া যায়, তাহাই তাহারা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিয়া ফেলে। পড়ালেখায় তাহারা খুবই ভাল। তাহারা তীক্ষ্ণধী বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অপর বালকেরা তাহাদের তুলনায় হীন একথা তাহারা সকল সময়ই মনে রাখে এবং প্রয়োজন-বোধে তাহারা স্বেচ্ছায় শ্রেণীর অন্যান্য ছেলেমেয়েকে সাহায্য করিয়া থাকে। পরিবর্তন দেখা গেল কিছুদিন পর, যখন তাহারা নিজেদের বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়ের ন্যায় শিল্পকাজেও তাহারা বেশ ভাল, কাজ বোঝে তাড়াতাড়ি এবং কাজ করিতে আগ্রহও বেশী। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যাইতে লাগিল যে, তাহারা তাহাদের কাজের ইউনিটটুকু সবচেয়ে পরে করিতে আরম্ভ করে। প্রথমতঃ কাজ যখন বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তখন তাহারা ঠিকমতই কাজ বুঝিয়া লয়। যে সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করিয়া দিতে হইবে, সেই সময়টুকু তাহারা মনে করে অন্য বালকদের তুলনায় প্রচুর। অতএব তাহারা কাজ আরম্ভ করে অনেক পরে। ফলে দেখা গিয়াছে শশকের দ্রুতগতি কচ্ছপের ধীর গতির কাছে হার মানিয়া গিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, **গ'** দলের শিশুদের মধ্যে যেমন হীনমন্যতা জাগ্রত হয়, **ক'** দলের শিশুরাও তেমনি নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া আসল কর্মক্ষেত্রে আসিয়া অনেক সময় নিজেদের হারাইয়া ফেলে।

বুদ্ধ্যঙ্কের উপর নির্ভর করিয়া যে দলবিভাগ করা হয়, তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইল শিশুরা সমদলীয় থাকিলে তাহাদের শিক্ষার পথ সুগম হয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা বা উদাহরণ দ্বারা ইহা পূর্ণমাত্রায় সমর্থিত না হওয়ায়, এই ধারণাটাকে পুর্ণ মর্যাদা দেওয়া চলে না। বুদ্ধির প্রকার ও রূপ বহু এবং শিশুরা বিভিন্ন উপায়ে তাহাদের নিজেদের উন্নতি সাধন করে। বর্তমানে যে সমস্ত বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা প্রচলিত, তাহাতে শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ হয় শিশুর বাচনিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া। কিন্তু এমন শিশুও কি দেখা যায় না যে, বচন ক্ষমতায় ততটা দক্ষ নয়, অথচ সামাজিকতা-বোধের দিক হইতে এবং শারীরিক কর্মের ক্ষেত্রে সাধারণ শিশুর অনেক উপরে? তাহা ছাড়া যাহারা সাধারণের উপরে এবং বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া বুদ্ধ্যঙ্ক দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই দেখা যাইবে হস্তশিল্প বা কারুশিল্পে কোন রূপ নৈপুণ্য দর্শাইতে অক্ষম, তাহাদের প্রকৃতি অনেক সময়

লাজুক, অদ্ভুত এবং সামাজিকতাবোধ-বিরোধী। অতএব একই দলের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকৃতির শিশু থাকায় আবার দলের মধ্যে দল দেখা যায়। এই কারণেই বুদ্ধাঙ্কের সাহায্যে দল নির্ণয় বিশেষভাবে কার্যকরী হইতেছে না।

সমজাতীয় দল গঠনে অসুবিধা

শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজাতীয় দল গঠনের উপযুক্ততা অনেক শিক্ষাবিদ্‌ই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, শিশুদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমের গণ্ডী ছাড়া সমজাতীয়তা কোন ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। শুধু শিশুরা বয়সের ক্ষেত্রেই সমজাতীয়; কিন্তু **ক্ষমতায়, প্রয়োজনে, আগ্রহে, ঔৎসুক্যে, বিদ্যার্জনে বিভিন্ন**। এই শিক্ষাবিদ্‌গণ average বা সাধারণ গুণবিশিষ্ট শিশুর অস্তিত্বকে পর্যন্ত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে **মাধ্যমিক মানের** (Norm) সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোন শিশুর খাপ খায় না। অতএব 'সাধারণ' শিশু বলিয়া কোন কিছু নাই। কোন একটি গুণের ক্ষেত্রে কয়েকজনকে ধরিয়া একটি দল গঠন হয়ত করা যাইতে পারে, কিন্তু সেই নির্দিষ্ট গুণের মধ্যেও মনোবৃত্তির প্রভাব হেতু এমন বিভিন্নরূপে উহারা প্রতীয়মান হয় যে, মনে হয় যেন বাস্তবিকই বুঝি তাহারা বিভিন্ন। তাহা ছাড়া মানুষ বিভিন্ন দোষগুণের সমাবেশে গঠিত, অতএব শুধু একটি গুণ লইয়াই শিশুদের নিয়া দল গঠন করা যায় না। পক্ষান্তরে প্রত্যেক শিশু অন্য শিশু হইতে এতই বিভিন্ন যে সমজাতীয় দল গঠন একেবারেই সম্ভব নয়। এমন কি, একই বয়ঃক্রম ও একই বুদ্ধ্যঙ্ক থাকিলেও একথা জোর করিয়া বলা চলে না যে বিদ্যালয়ের নানা কাজে তাহারা একই রূপ পারদর্শিতা দেখাইতে সক্ষম হইবে, কিংবা তাহাদের মধ্যে একই রূপ সামাজিকতাবোধ বৃদ্ধি পাইবে অথবা একই রূপ দক্ষতার সহিত কাজ করিতে পারিবে। এই সমস্ত কারণেই সমজাতীয়করণের দোষগুলি যাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষাবিদেরা শিশুদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

গণতান্ত্রিক সমাজকে ভিত্তি করিয়া শ্রেণীর কার্যে দল গঠন সম্পর্কে বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। গণতান্ত্রিক সমাজ **পরস্পরের সহযোগিতা, মঙ্গলেচ্ছা, সহনশীলতা ইত্যাদির উপর ভিত্তিগত।** এইরূপ সমাজে সমস্ত স্তরের এবং বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতার অধিকারী লোক সকলেই তাহার নিজস্ব শক্তি অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইবে; বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও তাহাই। বিদ্যালয়েও প্রত্যেক শিশু তাহার শক্তি-প্রবণতা ও

আগ্রহ অনুযায়ী কর্ম করিবে ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে। এই অবস্থায় তাহাদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান যদি স্থাপন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের নিজস্ব শক্তি অনুযায়ী জ্ঞানার্জনের পথ রুদ্ধ হইবে, ফলে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি যতটুকুও বা ছিল তাহাও স্ফুরিত হইবে না। কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন কাজে ও বিভিন্ন প্রয়োজনে সাময়িকভাবে দল পরিবর্তন করা যাইতে পারে। নূতন শিক্ষার ধারায় ইহার প্রয়োজনও যথেষ্ট। কারণ আমরা যখন শিশুর প্রয়োজন, অপ্রয়োজন, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে মর্যাদা দিতে চাহিয়াছি এবং শিশুদের মধ্যেও গণতান্ত্রিক মনোভাবের সৃষ্টি করিতে চাহিতেছি, তখন তাহাদের আগ্রহ, ঔৎসুক্যের উপর নির্ভর করিয়া কোনও কোনও বিশেষ কর্মের ক্ষেত্রে দল গঠন একান্তই প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। তাহা ছাড়াও প্রত্যেকটি শিশুই যে একই গতিতে এবং একই হারে সমগ্র জিনিষটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিবে এমনও কোন কথা নাই। তাই অনেক সময়েই দেখা যায় যে, কোন কোন শিশু অন্যান্য শিশু হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে পিছাইয়া থাকে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া যায়। যাহারা অনগ্রসর তাহাদের জন্য ব্যক্তিগত বা দলগত শিক্ষারও প্রয়োজন হয়। এইরূপ দল সাময়িক প্রয়োজনে গঠিত। তাহা ছাড়াও কোন কোন সময়ে দেখা যায় একই শ্রেণীর শিশুরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রজেক্টের কাজ করিয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যায় শিশুরা শ্রেণীর বিভিন্ন কর্মের জন্যই নিজেরাই দলবিভাগ করিয়া কাজ করিতে প্রেরণা বোধ করে, এবং যেহেতু শ্রেণীর কর্মপরিকল্পনায় শিশুর বিশেষ দায়িত্ব আছে, সেই হেতু সে নিজে দল বাছিয়া দলে গিয়া কাজে যোগদান করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় এইরূপ দলবিভাগের মূল্য যথেষ্ট আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বিদ্যালয়ের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দল গঠন

শিক্ষাবিদেরা স্বীকার করেন যে, শ্রেণীতে অতি অল্পকালের জন্যও দলগঠনের প্রয়োজন আছে। দল গঠন করা হয় শিশুদের শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য। শিশুদের মনস্তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যকে যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে যত অল্পক্ষণ স্থায়ীই হউক না কেন দলগঠনের প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ দলগঠন শ্রেণীর কাজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া হইলেই ভাল হয়। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র আর বৌদ্ধিক ক্ষেত্র এক নয়। একটু চেষ্টা করিলেই যত সামান্যই হউক না

কেন অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, অতএব অভিজ্ঞতা কম থাকিলেও বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যেমন একটা চিরকালের ছাপ থাকে, কর্মের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সেইরূপ কোন ছাপ থাকে না। যে যতটা কর্ম করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া পরে কর্ম সম্পাদন করিতে সে অগ্রসর হইবে, ইহাতে হীনমন্যতার কোন প্রশ্নই আসে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে শিশুর দল পুতুল খেলা লইয়া ব্যস্ত, তাহাদের হঠাৎ বাগানের কাজে নিযুক্ত দলের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিলে তাহারা অতিশয় অসুবিধা ভোগ করিবে। অবশ্য যদি তাহারা ঐরূপ কাজ করিতে আগ্রহান্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সে কাজ দিতেই হইবে, কিন্তু সেখানে তাহাদের ভিন্ন দলে স্বল্প অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া কি করিয়া কাজ করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। কাজের জন্য সাময়িক ভাবে দল গঠিত হইলে কাজও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, প্রত্যেক শিশু কাজের অংশ গ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া কাজ করিতে **সাঙ্গীকৃত শিক্ষার** (Integrated Teaching) অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া যদি কেহ মনে করেন, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে কয়টি দল কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহারা সকলেই বিভিন্ন ইউনিটে কাজ করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেক দলের জন্যই শিক্ষক বা শিক্ষিকা সাঙ্গীকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। অতএব প্রকৃত পক্ষে কোন দলই কোন দল হইতেই পিছাইয়া পড়িয়া থাকে না, তাহা ছাড়া অনেক সময়ে বিভিন্ন দলগুলিকেও বিভিন্ন কর্মের মধ্যে ঘুরাইয়া আনা হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি প্রজেক্ট-এর জন্য শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন দল গঠিত হইয়া যায়। বুদ্ধাঙ্কে ··র নির্ভর করিয়া সমদলীয় করিতে হইলে যাহারা বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন শুধু তাহাদিগকেই প্রজেক্ট-সম্পর্কিত খবরাদি বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিতে বলা হইত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দলবিভাগে সেইরূপ ব্যবস্থা করা হয় না। প্রজেক্ট-সম্পর্কিত খবরাদি পুস্তক হইতে সংগ্রহ করার যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ প্রজেক্টের অন্যান্য বিভাগের কাজও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক দলই প্রতিদিন তাহাদের কাজের বিবরণী লিখিয়া রাখে। এই বিবরণী লেখার সময় দলের সকলকে বিশেষ ভাবে আলোচনায় যোগদান করিতে হয়। তারপর এক দিন সকল দলের রিপোর্ট পাঠ হয়, তাহার পর হয় সেই সমগ্র প্রজেক্টের সমালোচনা ও বিচার।

বলা বাহুল্য ইহার ফলে প্রত্যেক দলই প্রায় একই রূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া থাকে। প্রত্যেক দলই এক একটি বিষয়ে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে অথচ সাঙ্গীকৃত শিক্ষার দিক হইতে বিভিন্ন প্রকার আলোচনা সমালোচনা ও বিচার করিয়া প্রায় সমস্ত দলই সমভাবে শিক্ষালাভ করে। কর্ম সুপরিচালনার জন্য সাময়িক দল গঠিত হইয়াছে, অথচ অভিজ্ঞতা অর্জনে কেহই অনগ্রসর নহে। অতএব বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে যদি দল গঠন করিয়া কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে শিশুদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া দল গঠন করিলে ভাল হয়।

সামাজিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দল গঠন

অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে, সামাজিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রেণীতে দল গঠন করা শিশুদের পক্ষে বিশেষরূপে মঙ্গলজনক হইবে। তাঁহারা মনে করেন যে, যে শিশুর দল একত্র খেলা করে, কাজ করে, আনন্দ করে এবং অন্যান্য সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ, সেই শিশুর দল বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রেও বিশেষ আনন্দের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে এবং সমভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে। বয়সের সঙ্গে সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভের একটি বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান, অতএব ইহা বয়স অনুযায়ী দল গঠনেরই নামান্তর বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন। কিন্তু একটি বিষয়ে বিভেদ আছে বলিয়াই ইহার নূতন রূপটি সকলকে আকৃষ্ট করিতেছে। শিশুর বয়স বৃদ্ধিই সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জনের মাপকাঠি নয়। বেশী বা কম বয়সের শিশুদেরও সামাজিক অভিজ্ঞতা একই প্রকার হইতে পারে। শিশুদের সামাজিক অভিজ্ঞতা নিরূপণের উপায় কি? কতকগুলি উপায় আছে সত্য, কিন্তু কোনটিই স্থির নির্দেশক নয়। সে যাহা হউক, এই পন্থাগুলি যে শিক্ষকের পক্ষে সাহায্যকারী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। শিক্ষক প্রথমে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন কোন্ শিশু কাহার সঙ্গে খেলিতে বা কাজ করিতে ভালবাসে। বিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন শ্রেণীতেই শিশুদের মধ্যে এইরূপ জোট বাঁধিয়া থাকিতে দেখা যায় এবং বহু দিন পর্যন্ত এইরূপ বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়। অবশ্য **'খুব বন্ধুত্বের'ও** যে অবসান না ঘটে তা নয়। সে সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুদের সামাজিক-জীবনে চলার গতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাই তাহাদের মধ্যে ছেদ। অন্যান্য প্রকারেও শিশুদের মধ্যে একই প্রকার সামাজিকতা-বোধ জাগ্রত কিনা লক্ষ্য করা যায়। এক **প্রশ্নপত্রের** সাহায্যে

শিশুদের উত্তর সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে শিশুদের মধ্যে দলগঠন করা যায়। বস্তুতঃ পক্ষে উদ্দেশ্য হইতেছে শিশুরা বিদ্যালয়ে একত্র খেলা করিবে, কাজ করিবে ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে। সানন্দে ও সহযোগিতায় যদি শিশুদের কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা ভিত্তিগত প্রায় একইরূপ হইলে তাহাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ সুসমঞ্জস হইবে। সামাজিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিই সব চেয়ে বেশী কার্যকরী বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন। কিন্তু সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রেও দল গঠনের পরিকল্পনা এখনও পরীক্ষাধীন আছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহার যথার্থ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহা কতটা কার্যকরী হইবে তাহা এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

বিশেষ সূত্র অনুযায়ী দল গঠন

আমেরিকার কালিফোর্নিয়ার দুই জন শিক্ষাবিদ্ Beulah D. Bartlet এবং Blythe H. Monroe বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করিয়া দলগঠন সম্বন্ধে এক নূতন নীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শিশুর জীবন নানামুখী শক্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত, এদিকে বয়সের পরিপক্বতার প্রভাবও কম নয়। তাই তাঁহারা নানা দিক বিচার করিয়া দল গঠনের জন্য একটি বিশেষ সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

সূত্রটি হইল $\frac{\text{CA (Chronological Age)} + \text{MA (Mental Age)}}{2}$

$= \text{GA (Group Age)}$.

অর্থাৎ $\frac{\text{জন্মতারিখ অনুযায়ী বয়স} + \text{মানসিক বয়স}}{২} = \text{দলীয় বয়স}$।

একটি বালকের বয়স যদি ১১ হয় এবং তাহার মানসিক বয়স যদি ১৩ হয়, তাহা হইলে তাহার দলীয় বয়স হইবে $\frac{১১+১৩}{২} = ১২$। অঙ্কের ফরমূলাতে ফেলিয়া যদিও জীবনী-শক্তিতে ভরপুর শিশুদের দল গঠন করা যায় না, তবুও এই নূতন নীতিতে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয় মন্দ হয় না।

প্রথম শিক্ষার্থীদের মধ্যে দল গঠন

শিশুরা যখন প্রথমে শিক্ষার্থী হিসাবে বাড়ী হইতে আসিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখন দেখা যায় তাহাদের মধ্যে তিন রকম শিশু রহিয়াছে। এক দল বাড়ী হইতে পড়িতে শিখিয়া আসিয়াছে, আর এক দল অভিভাবকের সাহায্যেই আধাআধি পড়িতে শিখিয়াছে, আর এক দল একেবারেই পড়িতে পারে না।

অনির্দেশিত বা নির্দেশিত কর্মের ক্ষেত্রে উহাদের দলবিভাগ কর্মের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, কিংবা শিশুর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের ভিত্তিতেই হইবে, কিন্তু যখন কর্ম-সংশ্লিষ্ট পাঠের প্রশ্ন আসিবে, তখন তাহাদিগের পূর্বের পড়িতে পারা, না পারা ও অর্ধ পড়িতে পারার ভিত্তিতে শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই দলবিভাগ অত্যন্ত নমনীয় হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ একবার বিভাগ করার পরেই আবার নূতন আর এক ভিত্তিতে দল করার প্রয়োজন হইবে।

বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজনে দল গঠন

বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজনে দল গঠিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। শিশুদের মধ্যে অনেকে থাকে যাহারা অতিশয় শ্লথ গতিতে শিক্ষালাভ করে, আবার কেউ আছে যাহারা অতিশয় দ্রুত শিখিতে পারে। তাহা ছাড়াও অনেক শিশু আছে যাহারা অসুস্থতার দরুণ বিদ্যালয়ে অনেক দিন উপস্থিত হইতে পারে নাই এবং তাহার ফলে অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়া আছে। এসমস্ত ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত সাহায্য দানের প্রয়োজন আছে। যাহারা অতিশয় দ্রুত পড়িতে শিক্ষালাভ করে, তাহাদের জন্য বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন, কারণ তাহাদের পড়ালেখার খোরাক জুটাইতে না পারিলে ঐ দল অচিরে খারাপ হইয়া যাইবে। আর দ্বিতীয়তঃ যাহারা শ্লথ গতিতে চলে এবং বহু দিন অনুপস্থিত থাকার দরুণ অনগ্রসর হইতেছে, তাহাদের জন্যও বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন। গরিষ্ঠ সংখ্যক শিশু যাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ভাগ না হইলেও বেশীর ভাগ অংশ প্রত্যেক শিশুকে শিখিতে হইবে এবং সেদিক হইতে শিক্ষকের দায়িত্বও কম নয়। এই হিসাবে শিক্ষক বিশেষ সাহায্য দানের জন্য পূর্বোক্ত দুই রকম দল গঠন করিতে পারেন।

আগ্রহ, ঔৎসুক্য, প্রয়োজন ও শিক্ষাপটুতার উপর নির্ভর করিয়া দল গঠন

বিদ্যালয়ের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দল গঠনের ক্ষেত্রে শিশুদের আগ্রহ, ঔৎসুক্য, প্রয়োজন ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুদের ইচ্ছা অনিচ্ছা আগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া কর্মসম্পাদন করিতে হয় এবং সেই জন্য দলবিভাগেরও প্রয়োজন হয়। বলা বাহুল্য, শিক্ষক কর্মসম্পাদনের সময় শিশুদের দ্বারা ইচ্ছামত দল গঠন করাইয়া লইবেন। এ সমস্ত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে।

উপসংহারে শিক্ষাদান সম্পর্কীয় দল গঠন সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা বলার প্রয়োজন বোধ করা যাইতেছে। বর্তমানে প্রতি শ্রেণীতে শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শ্রেণীগত শিক্ষা আংশিকভাবে প্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থায় শিশুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করিয়া শিশুদিগকে উপরিউক্ত নীতি অনুযায়ী যেভাবে দল গঠন করিয়া শিক্ষাদান করিলে শিশুদের মঙ্গল হইবে, তাহাই করা বাঞ্ছনীয়।

References

1. Teaching in Small Schools by Woodford.
2. Theory and Practice in the Elementary Schools by W. A. Saucier.
3. Fundamentals of Public School Administrations. Vol II by Ward.
4. Education up to fifteen years by A. H. Whipple.
5. Learning & Teaching in the Junior School by Nancy Catty.

চতুর্থ অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি
(Froebel's Kindergarten Method)

জার্মান শিক্ষাবিদ্ ফ্রোয়েবেল ৩ হইতে ৭ বৎসর বয়স্ক শিশুগণের জন্য এক নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহার নাম দেন "**কিণ্ডারগার্টেন**" (Kindergarten) অর্থাৎ "**শিশুর বাগান**"। এই নাম হইতেই কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। ফ্রোয়েবেলের পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুকে কেবল পড়া, লেখা ও গণনা বা গণিত (Reading, Writing and Arithmetic —3 Rs) শিক্ষা দেওয়া হইত। তিনি কিণ্ডারগার্টেনগুলিতে নানা পুস্তক পাঠের পরিবর্তে নানা কাজ, খেলা, নৃত্য, গান, গল্প ইত্যাদির সাহায্যেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে শিশুগণ স্ফূর্তির সহিত খেলা-ধূলার মধ্য দিয়াই শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। শেষের দিকেই পড়া, লেখা ও গণনা শিক্ষা দিয়া এই স্তরের শিক্ষা শেষ করা হয়।

ফ্রোয়েবেল শিশুকে চারাগাছ এবং শিক্ষককে বাগানের মালীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিক্ষক মালীর ন্যায় যত্ন করিয়া শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির বিকাশ সাধনে সাহায্য করিতে পারেন, তাহাকে বাহির হইতে কোন নূতন শক্তি দান করিতে পারেন না। তাই তাহাদের বিদ্যালয়ের নাম দিয়াছেন "শিশুর বাগান"। শিক্ষকের পক্ষে শিশু-প্রকৃতির জ্ঞান অর্জন একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তিনি মনে করেন, কেননা শিশু-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা করিলেই তাহার দ্রুত বিকাশ হইবে।

ফ্রোয়েবেল 'কিণ্ডারগার্টেন' শিশুদের শিক্ষার যে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে ফ্রোয়েবেলের শিক্ষানীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে। ফ্রোয়েবেল যখন নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন এমন সময় জার্মানীর বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ Oberlinএর

কয়েকটি **শিশু বিদ্যালয়** দেখিবার তাঁহার সুযোগ ঘটে। প্রথম যখন স্কুলগুলি খোলা হয়, তখন শিশুদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের সুযোগ দিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা Oberlin করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়গুলি **প্রাচীনপন্থী বিদ্যালয়ে পরিণত** হইতে লাগিল। ফ্রোয়েবেল এই বিদ্যালয়-গুলি দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি তখন নিজেই শিশুদের উপযোগী কোনরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায় কিনা তাহার চিন্তা করিতে থাকেন। তিনি এমন সব ক্রমবর্ধমান কর্ম ও খেলার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যাহাদের সাহায্যে শিশুর **দেহ ও মন, অন্তর ও বাহির পর্যবেক্ষণশক্তি ও অবধান-ক্ষমতা, স্বয়ংক্রিয়তা ও আত্মপ্রকাশ সুষ্ঠুভাবে বর্ধিত হইতে পারে**। এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কাজ যেখানে চলিতে পারে সেইরূপ প্রতিষ্ঠানের নাম কি হইবে, সে বিষয়ে ফ্রোয়েবেল অনেক চিন্তা করেন। দুই-একটা নামও তাঁহার মনে হইল, কিন্তু কোনটাই তাঁহার পছন্দ হইল না। এক দিন তিনি পর্বতগাত্রে বেড়াইতে বেড়াইতে স্বপরিকল্পিত নূতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পেয়েছি, পেয়েছি, আমার স্কুলের নাম হবে কিণ্ডারগার্টেন"। ইহার পরেই ফ্রোয়েবেল তাঁহার শিশুদের প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখিলেন 'কিণ্ডারগার্টেন'।

ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেনের ক্রীড়াদ্রব্যের মধ্যে মুখ্য দ্রব্য হইতেছে তিনটি। একটি **গোলা** (Sphere), একটি **ঘনক্ষেত্র** (Cube) এবং একটি **নলাকৃতি** (Cylinder) **বস্তু**। এইগুলিকে Gifts বলা হয়। এইগুলি ছাড়াও কিণ্ডারগার্টেনে আরও অনেক Gifts আছে। সে যাহা হউক, গোলা লইয়া শিশুরা গড়াইয়া দিত বা ছুড়িয়া ফেলিত, ঘনাকৃতি বস্তু বা কিউব দ্বারা শিশুরা কোন কিছু তৈয়ারী করিত, আর নলাকৃতি বস্তু বা সিলিণ্ডার দ্বারা শিশুরা গড়াইয়া দিত বা দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করিত। এই তিনটি Giftsএর সঙ্গে পরে আরও অনেক জিনিষ যথা,—কাঠি, আংটি, ত্রিকোণাকৃতি বা চতুষ্কোণাকৃতি বস্তু প্রভৃতি যুক্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। Herbartian Psychology applied to Education পুস্তকে Adams বলিয়াছেন যে, ফ্রোয়েবেল প্রবর্তিত Kindergarten এবং তাঁহার শিক্ষানীতিমূলক পুস্তক The Education of Manএর মধ্যে কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু ভাল করিয়া

চিন্তা করিলে দেখা যায় The Education of Man, Kantএর দর্শনকে অবলম্বন করিয়া লিখিত, আর Kindergarten Giftsগুলি যথা,—গোলাকৃতি, ঘনাকৃতি ও নলাকৃতি বস্তুসমূহ Hegelএর Dialectical নীতির ধারাকে অবলম্বন করিয়া নির্বাচিত। এদিকে Hegelএর Dialectical নীতি Kantএর Critical Method হইতে উদ্ভূত। অতএব দেখা যাইতেছে The Education of Manএ বর্ণিত শিক্ষানীতি এবং Kindergartenএর Giftsগুলির **মূলসূত্র** একই। The Education of Manএ ফ্রোয়েবেল বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুতেই **ভগবানের প্রকাশ**। মানুষের যখন অনুভূতি হয় যে তাহার স্বীয় আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ভগবান হইতে উদ্ভূত, সে ভগবান হইতে এবং প্রকৃতপক্ষে এক সময়ে ভগবানের সঙ্গেই বিলীন হইয়াছিল, তখন সে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতে থাকে যে ভগবানই হইতেছেন পিতা এবং সে হইতেছে ভগবানের সন্তান এবং **ভগবানই পৃথিবীর সমস্ত জীব ও জড়কে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন**। The Education of Manএ ভগবানের সম্বন্ধে মানুষের এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে Kindergartenএর তিনটি মুখ্য Giftএর প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়ায়। পৃথিবীর বস্তুনিচয়ের মধ্যে শিশুর স্থান কোথায়? শিশুকে তিনটি দিক হইতে বিচার করিলেই তাহার ব্যক্তিত্বকে বুঝিতে পারা যাইবে— **শিশু হইতেছে ভগবানের সন্তান, সে প্রকৃতির সন্তান এবং সে একটি মানব শিশুও বটে**। তাহার তিনটি অস্তিত্বের সমন্বয় সাধন হইয়াছে একটি স্তরে যাইয়া যেখানে স্রষ্টা ভগবানের সঙ্গে রহিয়াছে তাহার একত্ব। Hegelএর Dialectical Processএর Thesis, Antithesis ও Synthesis (**প্রসঙ্গ, বিপরীত প্রসঙ্গ ও উহাদের সমবায়**)-এর সঙ্গে শিশুর জীবনের গতি ও শিক্ষার মূল ঐক্যকে মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে।

শিশু যাহা শিখিবে তাহার স্থায়িত্বের জন্য বৈপরীত্যের মধ্যে তাহাকে শিখিতে হইবে, তাহা হইলে মূল ঐক্যকে বুঝিতে কখনও সে ভুল করিবে না। তাই Kindergarten Giftsগুলির মধ্যে ফ্রোয়েবেল তিনটি মুখ্য বস্তু যথা,—গতি-সম্পন্ন গোলাকৃতি বস্তুর, তাহার বিপরীত স্থিতিসম্পন্ন ঘনক্ষেত্রের এবং দুইয়ের সমন্বিত গুণসম্পন্ন নলাকার বস্তুর শিশুদের ক্রীড়ার ক্ষেত্রে আমদানী করিয়াছেন। ক্রীড়নকগুলির রূপক শিশু-জীবনের বাস্তব বিশ্লেষণে সাহায্য করে অর্থাৎ **জীব ও জড়জগতের সমস্ত বৈপরীত্যগুলির সমাধান করিয়া**

ভগবানের একত্বকে উপলব্ধি করিতে শিশু ধীরে ধীরে সক্ষম হয়। অতএব দেখা যায় The Education of Man এবং The Pedagogies of Kindergartenএর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে দেখা গেলেও তাহাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য বিদ্যমান।

ফ্রোয়েবেল বলেন, "God creates and works productively in uninterrupted continuity." ভগবান হঠাৎ কোন কিছুই প্রবর্তন করেন না এবং অতি ক্ষুদ্র মৌলিক পদার্থকেও বৃদ্ধি করিয়া তোলেন। অতএব ফ্রোয়েবেল মানব জীবনকে একটি অবিচ্ছিন্ন ক্রমবর্ধমান অবস্থা বলিয়া মনে করেন। এই ধারণা হইতেই ফ্রোয়েবেল তাঁহার শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করেন। **তিনি বলেন,** Unity (**একত্ব**), Continuity (**অবিচ্ছিন্নতা**) **এবং** Development (**ক্রমবিকাশ**) **এই তিনটির সঙ্গে শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা বিজড়িত।**

Kindergartenএর মূলনীতি নির্ভর করিতেছে শিশুচরিত্র পর্যবেক্ষণের উপর। ফ্রোয়েবেল অবশ্য মনোবিদ্ ছিলেন না, কিন্তু তবুও তাঁহার নিজস্ব একটি মনোবিজ্ঞানের ধারা ছিল এবং সেই ধারাগুলি ছিল নিম্নরূপ—(১) **শিক্ষা মানব জীবনের স্বাভাবিক গতি**, (২) **শিশু সজীব বস্তু** এবং সে সৃজনাত্মক স্বয়ং কর্মের মাধ্যমে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়, (৩) **শিশু সমাজের সক্রিয় সভ্য।**

ফ্রোয়েবেলের প্রথম সিদ্ধান্তটিই যুগান্তকারী এবং তাহার জন্যই তিনি শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে অন্যতম বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন; দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিও শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার—মানুষ সৃজনাত্মক কর্মের মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধি করিবে। মানবজাতির ক্রমবর্ধমান গতির সঙ্গে প্রতি সজীব মানুষের যোগাযোগ রহিয়াছে এবং প্রত্যেকে বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়া তাহার নিজের মূল্য যাচাই করিয়া লইতেছে—এই হইতেছে প্রকৃত শিক্ষা। ফ্রোয়েবেলের মতে শিশু হইতেছে কর্মী এবং শিক্ষার স্থান হইতেছে কর্মের পরে। শিক্ষা হইবে নিশ্চয়ই, তবে কর্মান্তে। রুশো, পেস্তালজি ইন্দ্রিয়ানুভূতি-জনিত শিক্ষাদান সম্পর্কে যে মত পোষণ করিতেন, ফ্রোয়েবেল তাহা পরিহার করেন। তাঁহার মতে সৃজনাত্মক কাজে, স্বয়ং-কর্মের মধ্য দিয়াই ইন্দ্রিয়ানুভূতি-জনিত শিক্ষা হইয়া থাকে। ফ্রোয়েবেলের Giftগুলি সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হইল। শিশুর বিকাশে Giftগুলি যে ভাবে একটির পর একটি সাহায্য করে সেই ভাবে Giftগুলি সাজান রহিয়াছে।

প্রতিটি Gift ক্রমবর্ধিষ্ণু ও শিক্ষাপ্রদ। একটি নূতন Giftএর সঙ্গে একটি পুরাতন Gift মেশান হয় এবং তাহাতে শিশুর খেলা সহজ ও বুদ্ধিজনিত হয়। এই Giftগুলির সাহায্যে **শিশুর নৈতিক, শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক--সর্ব রকম বিকাশ হয়।** Giftগুলির ক্রম ও তাহাদের শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল।

গিফ্‌ট	বস্তু	শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য
১নং	৬টি কাঠের বল প্রত্যেকটির রং বিভিন্ন	যখন বলগুলিকে গড়াইয়া দেওয়া হয়, তখন বলের উপাদান, রং, আকৃতি, গতি, দিক ইত্যাদি সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান লাভ হয় এবং বল চালনার ফলে শিশুর মাংসপেশীসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
২নং	একটি বল, একটি ঘনক্ষেত্র ও একটি নলাকৃতি জিনিষ	গতিসম্পন্ন বল সম্বন্ধে শিশুর জানা আছে, অজানা স্থিতি-সম্পন্ন ঘনাকৃতি জিনিষ আনার দরুণ শিশু দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে। দুইয়ের সমন্বয় হইয়াছে নলাকৃতি জিনিষে, যাহার মধ্যে দুইয়ের বৈশিষ্ট্যই বর্তমান।
৩নং	একটি বড় কাঠের কিউব, আটটি কিউবে বিভক্ত	অংশের সঙ্গে পূর্ণের সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান। এই কিউবগুলির দ্বারা নানা রকম জিনিষ তৈয়ারী সম্ভব, যথা,—বাড়ী, সিঁড়ি, দরজা ইত্যাদি।
৪নং	আটটি লম্বা তিন পলা কাচ(Prism)	সংখ্যা গণনা, বিভিন্ন আকৃতি, একটির সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক। এই জিনিষগুলির সাহায্যে নানা জিনিষ তৈয়ারী সম্ভব হয়। ব্যবহারিক জ্যামিতি সম্বন্ধে শিশুদের সুস্পষ্ট ধারণা হয়।
৫নং	কিউব এবং Prism একসঙ্গে	
৬নং	১নং হইতে ৫নং পর্যন্ত সমস্ত গিফ্‌ট	
৭নং হইতে ৯নং	কাঠের টুকরা কাঠ, আংটি, দড়ি, গুটি	আয়তন, পরিধি, পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা বৃদ্ধি পায়।

পূর্ব-বর্ণিত Giftগুলি লইয়া শিশুরা খেলিবে। ঠিক কোন্ বয়সে শিশুরা Kindergartenএ আসিবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। ফ্রোয়েবেল শিশুদের তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম অবস্থা হইতেছে খুব ছোট শিশুদের জন্য—জন্মের পর হইতে তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই সময় শিশুরা বাড়ীতে থাকিবে, এবং নিজ নিজ প্রয়োজনে খেলিবে, সেই খেলার উদ্দেশ্য থাকুক আর নাই থাকুক। ফ্রোয়েবেলের মতে শিশুদের দ্বিতীয় অবস্থা হইতেছে ৩ বৎসর হইতে ৭ বৎসর পর্যন্ত। এই বয়সে শিশু কিণ্ডার-গার্টেনে থাকিবে এবং নানা খেলার মারফত প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাইবে। ৭ বৎসরের পরের অবস্থাকে ফ্রোয়েবেল বলিয়াছেন বাল্যকাল। এই সময়ে বালককে শিক্ষা **দেওয়া** হইবে। শিশুকালের **শিক্ষা পাওয়া** ও বাল্যকালের **শিক্ষা দেওয়ার** মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, **শিশুকালে** শিশু খেলার মারফত স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে শিক্ষার প্রয়োজন হইবে, সেই শিক্ষাই সে পাইবে; আর **বাল্যকালে** শিশুর উপর শিক্ষা চাপাইয়া দেওয়া হইবে। কিণ্ডারগার্টেনে শেষের দিকের শিশু এবং বাল্যকালের প্রথম দিকের শিশুদের লইয়া ফ্রোয়েবেল সংযোজককারী বিদ্যালয় বা connecting school খুলিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল দুই অবস্থার বৈপরীত্যের মধ্যে সহজ সমাধানের ব্যবস্থা করিয়া শিশুদের বাল্যাবস্থার জন্য তৈয়ারী করিয়া দিবেন।

ফ্রোয়েবেল কিণ্ডারগার্টেনে খেলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "Play is the highest achievement of child development at this stage, since it is the spontaneous expression, according to the necessity of its own nature of the child's inner being." শিশু খেলার ভিতর দিয়াই জীবন তৈয়ারী করিয়া নেয়—এই হইতেছে ফ্রোয়েবেলের মত। তাঁহার মতে খেলা ও শিক্ষণীয় কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, সমস্তই এক।

ফ্রোয়েবেল নিজে শিশু-প্রকৃতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার কিণ্ডারগার্টেনে শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন :—

(১) শিশু সর্বদা কোন না কোন কাজ করিতে ভালবাসে এবং সাধারণতঃ খেলার ভিতর দিয়াই তাহার কর্মপ্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। সুতরাং প্রধানতঃ নানা কাজের ও খেলার ভিতর দিয়াই শিশুকে

শিক্ষা দিতে হইবে। বস্তুতঃ কিণ্ডারগার্টেনগুলিতে এই দুইটিকেই সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

(২) **শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই নানা বিষয়ের জ্ঞান সংগ্রহ করে।** সুতরাং তাহাকে সকল বিষয় যতটা সম্ভব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকারেই শিক্ষা দিতে হইবে। শিশুকে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি কিণ্ডারগার্টেনে বস্তু-পাঠের ব্যবস্থা করেন।

(৩) **শিশু প্রকৃতির জীব** (a creature of nature) **এবং প্রকৃতির মধ্যেই থাকিতে ভালবাসে।** তাই ফ্রোয়েবেল তাহাকে মুক্ত প্রকৃতির ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়ার পক্ষপাতী।

(৪) শিশু প্রত্যেক **জিনিষ হাতে ধরিয়া পরীক্ষা করিতে ভালবাসে।** সুতরাং ফ্রোয়েবেল শিশুকে যতটা সম্ভব সকল জিনিষ নিজে হাতে লইয়া বা হাতে ধরিয়া দেখিতে দেওয়ার উপদেশ দিয়াছেন।

(৫) **শিশু ভাঙ্গাগড়া ভালবাসে,** তাই তাহাদিগকে ধূলা-বালি, কাঠের টুকরা ইত্যাদির সাহায্যে বা চিত্র আঁকিয়া নানা জিনিষ প্রস্তুত করিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ হয়।

(৬) **শিশুর অনুকরণপ্রবৃত্তি খুব প্রবল।** সুতরাং সর্বদা ভাল আদর্শ তাহার সামনে স্থাপন করিয়া শিশুকে তাহার অনুকরণ করিতে দিতে হইবে।

(৭) **শিশুর শাব্দিক স্মৃতি প্রবল,** কিন্তু চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তি ক্ষীণ। সুতরাং তাহার শিক্ষায় শাব্দিক স্মৃতির যথেষ্ট ব্যবহার করা যায়। (কিন্তু অর্থবোধহীন শাব্দিক স্মৃতির চর্চা করিতে দেওয়া উচিত নহে)।

(৮) **শিশু তাহার সমবয়স্কদের সঙ্গে থাকিতে ভালবাসে।** সুতরাং তাহাকে একা একা শিক্ষা না দিয়া তাহার সমবয়স্কদের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(৯) **শিশু গল্প শুনিতে ভালবাসে।** সুতরাং তাহাকে গল্পের ভিতর দিয়া নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়।

(১০) **শিশু সঙ্গীত ভালবাসে,** সুতরাং তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থায় সঙ্গীতকেও উপযুক্ত স্থান দিতে হইবে।

(১১) **শিশু স্বাধীনভাবে কাজ করিতে চাহে।** সুতরাং তাহাকে যতটা সম্ভব স্বচেষ্টায় স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে দিতে হইবে। তাহার কাজে অযথা হস্তক্ষেপ করা ভাল নহে। সে যদি কোন অন্যায় করে তবে তাহাকে

তাহার ভুল ও অন্যায়ের জন্য শাস্তি না দিয়া ঠিক কাজ দেখাইয়া বা ভাল বিষয়ে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াই তাহার সংশোধন করিতে হইবে এবং তাহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে হইবে। **এই ভাবে স্বাধীনতা (freedom) ও কর্তৃত্বের (control) মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করাই ফ্রোয়েবেলের আদর্শ।**

(১২) **পিতা ও অন্য পুরুষ হইতে শিশুর উপর তাহার মাতার প্রভাবই বেশী।** স্নতরাং তাহার মাতার উপর বা শিক্ষয়িত্রীর উপরেই তাহার শিক্ষার ভার দিলে তাহার শিক্ষা সহজ ও স্নষ্ঠু হইবে।

শিক্ষা-ব্যবস্থা

(১) **নানা উপহার বা বস্তুর সাহায্যে কাজ বা খেলা।** ছোট ছোট বাক্সে করিয়া শিশুগণকে নানা রংয়ের ও আকারের জিনিষ দেওয়া হয়। এই গুলিকে উপহার (Gift) নাম দেওয়া হইয়াছে। একটি বাক্সে বিভিন্ন রংয়ের পশমের গোলক (ball) থাকে। অন্য বাক্সগুলিতে বড়-ছোট কাঠের ঘনক্ষেত্র (cube), ত্রিভুজ, চক্র (ring), তক্তা, কাঠি এবং নানা রংয়ের স্নতা, ফিতা ইত্যাদি থাকে। **রঙ্গীন গোলকগুলির সাহায্যে শিশুগণকে নানা রংয়ের জ্ঞান দেওয়া হয়। নানা আকারের জিনিষগুলি সাজাইয়া শিশুকে নানা জিনিষ তৈয়ার করিতে দেওয়া হয়।** যথা,—দেওয়াল, রাস্তা, সিঁড়ি, স্তম্ভ, ঘর, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, পুল, তাঁবু, ফুল, বৃক্ষ, বাগান, বাজার, গোলাবাড়ী ইত্যাদি। Gifts ছাড়াও ফ্রোয়েবেল কতকগুলি কর্মসূচক খেলার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই কর্মসূচক খেলাগুলিকে বলা হইত Occupations. Gifts নিয়াও শিশুরা খেলা করিত, আর Occupations নিয়াও তাহারা ব্যস্ত থাকিত। ইহাদের মধ্যে তবে পার্থক্য কোথায়? Giftগুলিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলার বস্তু ছিল, যাহা বিভিন্ন ভাবে সাজাইয়া খেলা চলিত। কিন্তু Occupations-এর ক্ষেত্রে শিশুকে কাদামাটি, কাগজ, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি দ্বারা খেলা করিতে হইত। Giftগুলি হইতে Occupationsএর ক্ষেত্রে খেলাগুলি অনেকটা বেশী স্নজনাত্মক ছিল। ৩নং অনুচ্ছেদে **নানা প্রকার হাতের কাজ শিক্ষাদানের** ক্ষেত্রে শিশুরা আরও কি কি কাজ করিত তাহা বলা হইয়াছে।

(২) **চিত্রাঙ্কন।** প্রথমে শিশুকে একটা শ্লেট ও পেন্সিল দিয়া নানা রেখা ও ইচ্ছামত নানা ছবি আঁকিতে দেওয়া হয়। তাহার পর তৈয়ারী

জিনিষগুলি দেখিয়া শ্লেটে ছবি আঁকিতে দেওয়া হয়। পরে ক্রমশঃ পত্র, ফল, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতির ছবি আঁকিতে দেওয়া হয়। সর্বশেষে রংয়ের ব্যবহার করিয়া ছবি আঁকিতেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৩) **নানা প্রকার হাতের কাজ শিক্ষাদান**। যথা,—কাগজ মুড়িয়া, কাগজ কাটিয়া বা মাটী দিয়া নানা জিনিষ তৈয়ার করা; ইহা ছাড়া মাদুর বুনন, ঝুড়ি তৈয়ার করা, সেলাই, কাপড়ে ফুল তোলা ইত্যাদি কাজও শিশুরা করে।

পেস্তালজিই সর্বপ্রথম বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক হাতের কাজের প্রচলন করেন এবং ফ্রোয়েবেল ইহা কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রধান অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন। বস্তুতঃপক্ষে এই সকল কাজের দ্বারা শিশু সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করে এবং তাহার মানসিক বিকাশের যথেষ্ট সাহায্য হয়।

(৪) **প্রকৃতি-পাঠ ও বস্তুপাঠ। ফ্রোয়েবেলই প্রথম বিদ্যালয়ে প্রকৃতি-পাঠ ও বস্তুপাঠের প্রচলন করেন**। বস্তুপাঠে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে শিশুগণ নানা জ্ঞান অর্জন করে। প্রত্যেক কিণ্ডারগার্টেনের সঙ্গে একটা বাগান থাকে। শিশুগণ বাগানে ছোট ছোট নানা ফুলের গাছ ইত্যাদি জন্মাইয়া ও তাহাদের ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া যথেষ্ট শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করে। তাহাদিগকে নানা পশুপক্ষী পালন করিতে এবং তাহাদের জীবন-যাত্রাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৫) **ছবির সাহায্যে শিক্ষাদান**। একটা ছবি দেখাইয়া প্রশ্নের সাহায্যে ছবির নানা দিকে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এবং ছবিটি সম্বন্ধে জ্ঞানদান করা হয়।

(৬) **গল্পের সাহায্যে শিক্ষাদান**। যে কোন কাজ করার সময়ে বা যে কোন বিষয় শিক্ষার সময়ে নানা গল্প বলিয়া শিশুদের নিকট কাজ বা বিষয়টা আনন্দদায়ক করা হয় এবং গল্পের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষতঃ গল্পের সাহায্যে তাহাদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা হয় এবং তাহাদিগকে নৈতিক শিক্ষাও দেওয়া হয়।

(৭) **খেলা ও গান। শিশুদের শিক্ষাদান কার্যে ফ্রোয়েবেল খেলা ও গানকে খুব উচ্চ স্থান দিয়াছেন**ঃ—

(ক) **অভিনয়মূলক খেলা**—শিশুগণ বড়ই কল্পনাপ্রবণ এবং তাহাদের অনুকরণ-প্রবৃত্তি প্রবল। তাই কিণ্ডারগার্টেনে শিশুগণকে নানা পশু, পক্ষী, মানুষ, বৃক্ষলতা ইত্যাদি সাজিয়া খেলা করিতে দেওয়া হয়।

(খ) **নৃত্যসহ গান**—শিশুগণকে গানের সহিত নানা প্রকার নৃত্য করিতেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

(গ) **কর্ম্ম-সঙ্গীত**—শিশুগণকে গানের সঙ্গে সঙ্গে নানা কাজ করিতে দেওয়া হয়।

(ঘ) **গানের সহিত নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে গমন (March)** করিতেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

(ঙ) **গানের সহিত ব্যায়াম**—গান করিতে করিতে শিশুগণকে অঙ্গ-সঞ্চালন ও নানা সহজ ব্যায়াম করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ফ্রোয়েবেল তাঁহার কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের শিক্ষার জন্য তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথমটি Gift এবং Occupation, দ্বিতীয়টি খেলা এবং তৃতীয়টি গান। শিশু যদি এই তিনটিকে সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ অতিশয় দ্রুত হইবে বলিয়া ফ্রোয়েবেলের বিশ্বাস।

(৮) **নৈতিক শিক্ষাদান। ফ্রোয়েবেল ধর্মের ভিত্তিতেই শিশুগণকে নৈতিক শিক্ষাদানের পক্ষপাতী।** প্রত্যহ বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হওয়ার প্রথমে শিশুগণ সমবেত হইয়া ভগবানের বন্দনা আবৃত্তি করে। ভগবানের অতুল দান এবং অপরিসীম ভালবাসা বর্ণনা করিয়া বলা হয় যে, ভাল কাজ করিলে ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং মন্দ কাজ করিলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। সুতরাং ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সকলের ভাল কাজ করা উচিত ইহা শিশুগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্য, মহাপুরুষের জীবনী প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত গল্পের সাহায্যে নানা নৈতিক গুণ শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৯) **পঠন শিক্ষাদান।** বিভিন্ন অক্ষরগুলি যে যে জিনিষের বা প্রাণীর নামের প্রথম অক্ষর তাহাদের ছবির নীচে উজ্জল রংয়ে লিখিয়া দেওয়া হয় এবং অক্ষরগুলিকে ছবিগুলির নাম হিসাবে ব্যবহার করিয়া বার বার উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ভাবে কতকগুলি বর্ণ শিক্ষা হইলে শিক্ষক ২, ৩, ৪টি বর্ণের দ্বারা এক একটি শব্দ গঠন করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দেন এবং পাঠ করেন। শিশুগণ তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া শব্দগুলি পড়িতে শিক্ষা করে। ইহার পর শিক্ষক ঐ সকল শব্দের ব্যবহার করিয়া ছোট ছোট বাক্যের গঠন শুনাইয়া শিশুগণকেও তাহা পাঠ করিতে শিক্ষা দেন।

(১০) **লিখন শিক্ষাদান।** প্রথমে শিশুকে কাঠির বা বীচির সাহায্যে এক একটা অক্ষর তৈয়ার করিতে দেওয়া হয়, তাহার পর সাজানো অক্ষর দেখিয়া এবং বোর্ডে শিক্ষকের লেখার অনুকরণ করিয়া শিশুগণকে শ্লেটে অক্ষরগুলি লিখিতে দেওয়া হয়।

(১১) **গণনা শিক্ষাদান।** পূর্ববর্ণিত উপহারগুলি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে কিছু কিছু গণনাও শিক্ষা দেওয়া হয়; কতকগুলি জিনিষ ও প্রাণীর নাম বলিয়া ও তাহাদের সংখ্যার উল্লেখ করিয়া গল্পও বলা হয়; নানা খেলার ভিতর দিয়াও সংখ্যাগুলি শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহার পর কাঠি, বীচি প্রভৃতির সাহায্যে শিশুকে ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত গণনা, যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইহার পর বীচি সাজাইয়া অক্ষরের ন্যায় সংখ্যাগুলি তৈয়ার করিতে দেওয়া হয়, সর্বশেষে সাজানো সংখ্যাগুলি দেখিয়া শিশু পেন্সিল দিয়া শ্লেটে সংখ্যাগুলি লিখিতেও শিক্ষা করে।

ফ্রোয়েবেল ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা

কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্তমানকালে ভাল ভাবেই দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে এবং অনেকেই এইরূপ শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে আস্থাবান হইয়াছেন। কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে মর্যাদা পাইতে বহু বৎসর সময় ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। কর্মের সঙ্গে শিক্ষাকে খুব সামান্যভাবে যুক্ত করেন ষোড়শ শতাব্দীতে কমেনিয়াস। শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে সাহায্য করিতে শিশুর যতটুকু বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে হয়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কমেনিয়াস শিক্ষায় কর্মের কথা বলিয়াছেন। তারপর রুশো করেন নেতিবাচক শিক্ষায় কর্মের ইঙ্গিত। কমেনিয়াস ও রুশোর পর পেস্তালজি প্রত্যক্ষভাবে শিশুকে কর্মের সঙ্গে যুক্ত করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শিশু স্বয়ংকর্মের সাহায্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে থাকে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাসে পেস্তালজি কর্তৃক শিশুদের স্বয়ংকর্মের ব্যবস্থা যুগান্তকারী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মকে এইরূপ মর্যাদা দিতে পূর্বে কেহই পেস্তালজির মত সাহসী হন নাই। ফ্রোয়েবেলেও কর্মকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ স্থান দিয়াছেন। তবে দুই জনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল।

কর্ম সম্বন্ধে দুই জন শিক্ষাবিদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই শিশু-শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হয়। পেস্তালজির মতানুসারে শিশু প্রথম অবস্থায় থাকিবে মাতার কাছে। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার মতামত Leonard and Gertrude এবং How Gertrude teaches her children নামক পুস্তকদ্বয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শিশু মাতার কাছে থাকিলেও মাতা মনোবিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ অনুযায়ী শিশুকে পরিচালনা করিবেন। এইরূপ নির্দেশসমূহ উল্লিখিত পুস্তক দুইখানায় লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু ফ্রোয়েবেলের মতানুসারে শিশু পেস্তালজি নির্দেশিত বয়সের পূর্বেই বিদ্যালয়ে আসিবে, এবং গৃহে যেরূপ খেলাধূলা করে, সেই রূপ খেলাধূলাই নির্দিষ্ট খেলনা সাহায্যে করিবে। তাঁহার মতে শিশুদের অভ্যাস-গঠনের কালই হইতেছে শৈশব, অতএব শিশুর জীবনের সুঅভ্যাস জন্মাইবার জন্য শুধু মায়ের স্নেহের অনুশাসনেই শিশুকে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না, তাহাকে শিশু-সমাজের গণ্ডীর ভিতর আসিয়া শিক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে।

ফ্রোয়েবেলকে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তিনি তাঁহার শিক্ষাদর্শনের জন্য পেস্তালজির কাছে ঋণী। আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয়। ফ্রোয়েবেল দুই বার পেস্তালজির বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। শুধু পরিদর্শন করাই নয়, ফ্রোয়েবেল দ্বিতীয় বার তাহার কয়েক জন ছাত্র সমভিব্যাহারে পেস্তালজির কাছে যাইয়া তথায় কিছুদিনের জন্য অবস্থান করিয়া পেস্তালজির বিদ্যালয়ের কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন। এইখানেই তিনি পেস্তালজি প্রবর্তিত সঙ্গীত শিক্ষার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং সঙ্গীত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বলিয়া তিনি বুঝিতে পারেন। এই সব বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় ফ্রোয়েবেল পেস্তালজির কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। কিছুটা যে ঋণী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বগামী শিক্ষাবিদ্গণের অবদান পরবর্তী শিক্ষানীতিকে কিছু না কিছু সাহায্য করিয়াছে। সেই হিসাবে ফ্রোয়েবেল পেস্তালজির শিক্ষানীতির ভিত্তি ভালভাবে জানিয়া বুঝিয়া তাহার পর শিক্ষাসম্বন্ধীয় স্বীয় নীতি প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও ফ্রোয়েবেলের শিক্ষানীতি মৌলিকত্ব দাবী করিতে পারে। উভয়ের কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে ফ্রোয়েবেল নূতন শিক্ষাব্যাপারে মৌলিকত্ব দাবী করিতে পারেন কিনা।

পেস্তালজি কর্মকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করিলেও তিনি কর্মকে অবরোহী প্রণালী অনুযায়ী প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি পূর্বে রচনা করিয়াছেন স্বীয় মতামত, তারপর তাঁহার মতামতকে প্রমাণ করিবার জন্য শিশুদের দ্বারা কর্মকে অনুসরণ করিয়াছেন, এবং তাহার ফলাফল তাঁহার স্বীয় মতানুরূপ কিনা, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন। ফ্রোয়েবেল কিন্তু তাহা করেন নাই। তিনি আরোহী প্রণালী অনুয়ারী শিশুদের কর্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিশুরা কর্ম করিবে এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা লাভ করিবে। উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বয়ংকর্মে শিশুরা নিযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু পেস্তালজির শিশুরা অনুকরণের (Immitation) ক্ষেত্রে স্বয়ং-কর্ম করিয়াছে, আর ফ্রোয়েবেলের শিশুরা সৃজনাত্মক স্বয়ং-কর্ম করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় ফ্রোয়েবেলের দান অসীম। তিনি কর্মকে যত মর্যাদা দিয়াছেন, খেলাকে মর্যাদা দিয়াছেন তাহা অপেক্ষা বেশী। কর্ম ও খেলার সমন্বয়ে তিনি শিশু-জীবনকে যথেষ্টভাবে সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টাকরিয়াছেন।

ফ্রোয়েবেলের প্রভাব

ফ্রোয়েবেলের Gifts এবং Occupations তৎকালীন ইউরোপীয় দেশ-গুলির শিক্ষাদপ্তরসমূহকে যথেষ্টভাবে প্রভাবান্বিত করে; তাহার ফলে বহু বিদ্যালয়ে প্রতি শিশুর জন্য Gifts এবং Occupationsএর বন্দোবস্ত করা হয় এবং এই জাতীয় শিক্ষাদানের জন্য মহিলাগণ বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া বহু মহিলা কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষানীতিতে ট্রেনিং প্রাপ্ত হন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ফ্রোয়েবেলের শিক্ষানীতি ভাল করিয়া বুঝিতে না পারার দরুণ শিক্ষাদান কার্য অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে সম্পাদিত হয়। বলা বাহুল্য শিক্ষিকাদের আদেশের উপর নির্ভর করিয়াই শিশুরা Gifts লইয়া খেলা করিত, নিজেদের যে স্বাধীনতা আছে তাহা তাহারা বুঝিতেও পারিত না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে যে শিক্ষিকারা ফ্রোয়েবেলের শিক্ষানীতির যাথার্থ্য অনুধাবন করিয়া শিক্ষাদান কার্য যে না করিয়াছেন, তাহা নয়। এবং সেই ভাবে কাজ কিছুটা হইয়াছিল বলিয়াই ইউরোপের এবং প্রাচ্যে অনেক দেশে এইরূপ শিক্ষাধারা ছড়াইয়া পড়ে। শিশুদের কর্মে স্বাধীনতা এবং শিশু ও শিক্ষিকার মধ্যে স্নেহবন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার ফলে শিক্ষা হইয়া উঠে আনন্দপূর্ণ। কিন্তু ফ্রোয়েবেল তাঁহার Giftগুলির মধ্য দিয়া যে ভাবে রূপকের সাহায্যে শিশুজীবনে ভগবানের সম্বন্ধে একত্ব বোধ ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, তাহা ফ্রোয়েবেলের পরবর্তিগণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্তেসরী পদ্ধতি

(Montessari Method)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালী দেশীয় **ডাঃ মেরিয়া মন্তেসরী** (Dr. Maria Montessari M. D.) প্রথমে এক জন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ইতালী দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক এবং পরিশেষে শিক্ষাবিদ্ এডওয়ার্ড সেঁগুইয়ের ক্ষীণমেধা শিশুদের জন্য রচিত শিক্ষানীতি অবলম্বন করিয়া তাহাদের বিকাশের জন্য চেষ্টিত হন এবং সেই দিকে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি ক্ষীণমেধা শিশুদের লইয়া বহু গবেষণা করেন। তিনি ডাঃ সেঁগুইয়ের প্রদর্শিত পথেই যে শুধু তাঁহার গবেষণা কার্য নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি কয়েক ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া লেখা ও পড়ার ক্ষেত্রে স্বপরিকল্পিত গবেষণা দ্বারা নূতন নূতন সিদ্ধান্তে আসিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ডাঃ মন্তেসরী ক্ষীণমেধা শিশুদের দ্বারা 'পড়া ও লেখা' এমন ভাবে আয়ত্ত করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, তাহারা সাধারণমেধা শিশুদের সঙ্গে 'পড়া ও লেখা'য় প্রতিযোগিতা করিয়া বিশেষ সাফল্য লাভ পর্যন্ত করিতে পারিয়াছিল। বহু শিক্ষাবিদ্ ক্ষীণমেধা শিশুদের এইরূপ অদ্ভূত সাফল্য অর্জন করিতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন। ডাঃ মন্তেসরীর মতে ক্ষীণমেধা শিশুগণ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া পড়া ও লেখা শিক্ষা করিয়াছিল বলিয়া ঐ প্রকার সাফল্য অর্জন করে, অর্থাৎ ঐ শিশুদের মানসিক বিকাশে নানা ভাবে সাহায্য করা হয় বলিয়া ক্ষীণমেধা শিশুরা শিক্ষালাভ করিতে ঐরূপ তৎপর হয়, কিন্তু সাধারণমেধা শিশুদের প্রচলিত নিয়মে শিক্ষাদান করা হয় বলিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মানসিক বিকাশে ত সাহায্য করা হয়ই না, বরং শিক্ষাদানে প্রচলিত কঠোর নিয়ম অবলম্বন করায় তাহাদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে তাহারা ক্ষীণমেধাদের সঙ্গে পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না। নূতন ভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে ক্ষীণমেধাদের মধ্যে এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ডাঃ মন্তেসরী চিন্তা করিতে থাকেন যে, যদি সাধারণমেধা শিশুদের জন্য অনুরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে সাধারণ শিশুরা বিলক্ষণ উপকৃত হইবে এবং তাহারা ক্ষীণমেধা শিশুদের সমপর্যায়ে

আর দাঁড়াইবে না। তখন তিনি **সেই পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করিয়া তাহার সাহায্যে সাধারণমেধা শিশুগণকে শিক্ষাদানের জন্য "শিশু-নিকেতন"** (Children house) **নামে এক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করেন।** এই ক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। **এই বিদ্যালয়ে ৩ হইতে ৭ বৎসর বয়স্ক শিশুগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়।** এক জন পরিচালিকার (Directress) উপর এই বিদ্যালয় পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। তাঁহার সহকারীরূপে এক জন চিকিৎসক ও এক জন যত্নকারী (Care-taker) নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

মন্তেসরী শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা

শিশু-শিক্ষার ইতিহাসে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশু-শিক্ষার নীতি ও ধারা সম্বলিত ডাঃ মন্তেসরীর ইংরেজী ভাষায় প্রথম অনূদিত পুস্তক এই সময়ে প্রকাশিত হয়, এবং তাহা ছাড়া ডাঃ মন্তেসরীও নিজে তাঁহার শিক্ষানীতি সম্পর্কে প্রচার কার্যে বাহির হইয়া সমস্ত শিক্ষাজগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ডাঃ মন্তেসরী যে-শিক্ষানীতি উদ্ভাবন করেন, তাহা নূতনত্বের দাবী করিতে পারে না। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা আংশিকভাবে ফ্রোয়েবেল তাঁহার কিণ্ডার-গার্টেনের শিক্ষার ধারায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী শিশুর স্বয়ং-কর্মের কথা, তাহাও ফ্রোয়েবেলের শিক্ষানীতিতে স্থান পাইয়াছে। হাতে কলমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও উভয়ের মতামত একই। শিশুদের শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট আবেষ্টনের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া সম্বন্ধেও দুই শিক্ষাবিদের মধ্যে মতদ্বৈধতা নাই। মোটামুটি যখন দুই শিক্ষাবিদের শিক্ষার ধারা একই রূপ, তখন ফ্রোয়েবেলীয় পদ্ধতিকে গ্রহণ না করিয়া ডাঃ মন্তেসরী প্রবর্তিত শিক্ষার ধারাকে এত উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করিবার কারণই বা কি ? এই প্রশ্ন স্বাভাবিক।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ফ্রোয়েবেলীয় পদ্ধতি ও মন্তেসরী পদ্ধতি আবিষ্কারের মধ্যে সময়েরও বিরাট ব্যবধান। ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে যে বিপ্লবী শিক্ষা ধারা গ্রহণ করিবার মত মানুষের মন প্রস্তুত হয় নাই, সেই মানুষের মনই ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শিক্ষার ধারার পরিবর্তনকে মর্যাদা দিতে পারিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ শিশুর অধিকার

সম্পর্কে প্রশ্ন। শিশুকে উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা হইত বয়স্কদের দৃষ্টিকোণ হইতে। বয়স ভেদে শিশু-প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয়, তাহার চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রকম, সে কথা বয়স্কদের মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিলেও, তাঁহারা শিশুদের জীবনের চাহিদার কোন মর্যাদাই দিতে স্বীকৃত হন না, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বয়স্ক দৃষ্টিভঙ্গীকে পরাজিত করিয়া স্বীয় মর্যাদা স্থাপন করে, ফলে ডাঃ মন্তেসরী-প্রবর্তিত শিক্ষার ধারা শিশুদের প্রয়োজনের দিক হইতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। তৃতীয়তঃ ফ্রোয়েবেল্লের শিক্ষানীতি তাঁহার Gift ইত্যাদির মধ্যে পরাজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিষয় জড়িত থাকার দরুণ উহা সাধারণ মনে উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই। ডাঃ মন্তেসরী প্রবর্তিত শিক্ষোপকরণগুলিতে কোন প্রকার দুর্জ্ঞেয়ত্ব না থাকার দরুণ উহা সহজ সরল ভাবে ব্যক্তি ও শিশু উভয়কেই আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাও ডাঃ মন্তেসরীর আর একটি সাফল্যের কারণ। চতুর্থতঃ ডাঃ মন্তেসরী নিজে প্রচার-কার্যে বাহির হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যাইয়া কি করিয়া তাহার প্রবর্তিত শিক্ষা-ধারা অনুযায়ী শিক্ষাদান করিতে পারা যায় তাহা তিনি দর্শাইয়াছেন। ফলে শিক্ষক অভিভাবক ও শিশু সকলেই প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ফ্রোয়েবেলীয় সম্প্রদায় ফ্রোয়েবেলীয় প্রভাবকে ততটা স্পষ্ট ও জীবন্ত করিয়া সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। এই সমস্ত কারণেই দুই শিক্ষাবিদের শিক্ষানীতি প্রায় একই ধারায় গঠিত হইলেও, একটি শিক্ষার ধারা সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই, আর একটি ধারা প্রচুর সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই পরিচ্ছেদের শেষে ফ্রোয়েবেলীয় ও ডাঃ মন্তেসরীর শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কোথায় প্রভেদ, তাহা তুলনামূলক বিচার করিয়া দেখা যাইবে।

মন্তেসরী পদ্ধতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) শিশু স্বাধীনভাবে যে কাজ করিতে চায়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত ডাঃ মন্তে-সরী তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রোমের এক প্রসিদ্ধ বাগানে একটি ছোট শিশুকে লইয়া গিয়াছে তাহার ধাত্রী। শিশুটি তাহার ছোট ঠেলাগাড়ী হইতে নামিয়া খেলিতে খেলিতে কতকগুলি নুড়ি পাথর কুড়াইয়া তাহার ছোট বালতিতে ভরিতে লাগিল। ধাত্রী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নিজেই

কতকগুলি পাথরের নুড়ি সেই বালতিতে ভরিয়া দিল এবং মনে ভাবিল যে, শিশুর চাহিদাকে সে পূরণ করিয়াছে। কিন্তু শিশুটি ধাত্রীর এই কাজে সন্তুষ্ট ত হইলই না, বরং সে হাত পা ছুড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শিশুটি জানাইয়া দিল যে, শিশু নিজেই বালতিটি পাথরের নুড়ি দিয়া ভরতি করিবে। ধাত্রী আর কি করিবে, সে বালতি হইতে নুড়িগুলি ঢালিয়া ফেলিয়া দিল। শিশু মহানন্দে বালতিতে নুড়ি ভরিতে লাগিল। এই দৃশ্য ডাঃ মন্তেসরী নিজে দেখিয়াছিলেন এবং এই দৃশ্য তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শিশু যাহা করিতে চায়, তাহা সে স্বাধীনভাবেই করিতে চায়, অপরের হস্তক্ষেপ সে মোটেই পছন্দ করে না। ডাঃ মন্তেসরী তাঁহার শিক্ষানীতি সংক্রান্ত সমস্ত মূল তথ্য বিভিন্ন পুস্তকে বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, শিশুর জ্ঞানার্জন এবং তাহার অন্যান্য বিকাশ শিশুর স্বাধীনভাবে ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মধ্যে কাজ করিবার উপর নির্ভর করে।

শিশুদের স্বাধীনভাবে শিক্ষালাভ করিবার কথা অনেকে হয়ত সঠিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে পারিতেছে না। তাঁহারা মনে করেন যে, শিশুকে প্রচুর স্বাধীনতা দিলে শিশু সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিবে এবং স্বাধীনতা তখন যাইয়া দাঁড়াইবে স্বেচ্ছাচারিতায়। ভয় স্বাভাবিক, কিন্তু এমন ভাবে শিশুকে যদি পরিচালনা করা যায়, যে, শিশু যেমন স্বাধীনভাবে কাজ করিবে, সেইরূপ সে তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্যটুকু প্রতিপালন করিবে, তাহা হইলে ত আর স্বাধীনতার অপব্যবহার হইবে না। শিশুর স্বাধীনতা সমাজগত ভাল-মন্দের উপর সীমাবদ্ধ থাকিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। শিশুদের পরিচালিকা যেমন শিশুদের সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া শিশুর ক্ষমতা খর্ব করিবেন না, সেইরূপ তাঁহাকে শিশুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তাহার সমস্ত অসামাজিক ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, কর্ম মাধ্যমে শিশু যেন নিজেই সুঅভ্যাস গঠন করিতে সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, শিশুর সুঅভ্যাস গঠন শুধু বিদ্যালয়ের জন্য নয়, এই সুঅভ্যাস গঠন তাহার সমস্ত জীবনকে প্রভাবান্বিত করিবে। অতএব শিশুকে স্বাধীনভাবে কর্ম করাইয়া ঐ অভ্যাস অর্জন করাইতে হইবে, তবেই উহা বহু কাল স্থায়ী হইবে।

(২) **স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভই এই পদ্ধতির মূলনীতি।** প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সরঞ্জাম সরবরাহ করিয়া, তাহাদের সাহায্যে স্বাধীনভাবে এবং স্বচেষ্টায়

শিশুকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয়। **পরিচালিকা তাহার কার্য পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু যত দূর সম্ভব কোন হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত থাকেন।** 'কিণ্ডারগার্টেন' পদ্ধতিতে শিশুকে পরিচালনার ব্যবস্থা ইহা অপেক্ষা বেশী।

ডাঃ মন্তেসরী শিশুদের জন্য কতকগুলি শিক্ষোপকরণ বা খেলনা তৈয়ারী করিয়াছেন, যেগুলির সাহায্যে শিশুরা নিজেদের চেষ্টায় খেলা করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়। এমন ভাবে খেলনাগুলি তৈয়ারী যে শিশু যদি খেলিতে যাইয়া ভুল করে, তাহা হইলে নিজেই নিজের চেষ্টায় ভুল সংশোধন করিতে পারে। ইহাকেই ডাঃ মন্তেসরী স্বয়ংশিক্ষা বা Auto-education বলিয়াছেন। শিশুরা বিভিন্ন উপকরণ লইয়া স্বাধীনভাবে খেলা করে এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে।

এইখানে খেলার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। একটি কাঠের লম্বা টুকরার মধ্যে কতকগুলি সম ব্যাসের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের খুঁটি বসান আছে। শিশুকে খুঁটিগুলি খুলিয়া দেওয়া হইল। শিশু নিজেই লক্ষ্য করিয়া সেই খুঁটিগুলি গর্তে বসাইয়া গেল। যেখানে ভুল হইল শিশু তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল, কারণ খুঁটিটি ঠিকভাবে সেখানে বসিল না, হয় নীচে নামিয়া গেল, অথবা উপরে উঠিয়া রহিল। শিশু আবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া ঠিকমত বসাইয়া দিল। এর পর বিভিন্ন ব্যাসের সমদৈর্ঘ্যসম্পন্ন খুঁটি লইয়া খেলা। শিশু স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা খুঁটি বসাইয়া গেল। ভুল-ত্রুটি শিশু নিজেই বুঝিতে পারিয়া উহাদিগকে ওলট-পালট করিয়া পুনরায় ঠিক করিয়া বসাইল। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন ব্যাস ও বিভিন্ন দৈর্ঘ্যসম্পন্ন খুঁটি। ইহাও স্পর্শেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিশু ঠিক করিয়া বসাইতে পারিবে এবং ভুল-ত্রুটি হইলে শিশু নিজেই ঠিক করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া একটি কাঠের বড় পাতে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি-বিশিষ্ট কাঠের টুকরা বসান আছে। শিশু সেগুলি খুলিয়া নিজেই বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি-বিশিষ্ট কাঠের টুকরা বসাইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, এইরূপ স্বয়ং-শিক্ষার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এইরূপ খেলায় শিশুরা যখন সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না, তখন অবশ্য পরিচালিকা শিশুকে সাহায্য করিবেন।

(৩) 'কিণ্ডারগার্টেন' পদ্ধতির ন্যায় মন্তেসরী পদ্ধতিতেও শিশুকে তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির যত বেশী সম্ভব ব্যবহার করিয়া শিক্ষা

করিতে দেওয়া হয়। মন্তেসরী পদ্ধতির গোড়ার কথা হইল শিক্ষায় স্বাধীনতা, স্বয়ং-শিক্ষা ও ইন্দ্রিয় পরিচালনা শিক্ষা। ডাঃ মন্তেসরীর মতে শিশু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগতের বহু জিনিষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সক্ষম হয়। স্বাধীনভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের পরিচালনার দ্বারা শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়া শিশু তাহার কর্মের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করিতে পারে, ফলে শিশু সমস্ত কর্মে নিজেকে সংযত করিতে শিক্ষালাভ করে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা কি ভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারা যায়, সেই সম্পর্কেও তিনি কতকগুলি শিক্ষোপকরণ তৈয়ারী করিয়াছেন। এই শিক্ষোপকরণগুলির সাহায্যে শিশু নির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ডাঃ মন্তেসরী ইন্দ্রিয় পরিচালনা শিক্ষার উপর ফ্রোয়েবেল হইতে অধিকতর জোর দেন এবং উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রচুর ব্যবহারের দ্বারা শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে তীক্ষ্ণ ও সতেজ করিবার প্রয়াস পান।

(৪) **শিশুগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং তাহাদের শক্তি অনুযায়ী গতিতে শিক্ষা করে।** তাহারা যে কাজ যত ক্ষণ ইচ্ছা করিতে পারে। পরিচালিকাও ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের কার্য তত্ত্বাবধান করেন এবং একান্ত প্রয়োজনীয় অবস্থায় সাহায্য করেন। অতি অল্প বয়সের অনেক শিশুকে এক সঙ্গে অথচ ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ দান মন্তেসরী পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ডাঃ মন্তেসরীর মতে প্রত্যেক শিশু অন্য শিশু হইতে বিভিন্ন এবং একই শিশু বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নরূপ আচরণ করে ও চাহিদা জানায়। সেই হেতু ডাঃ মন্তেসরী শ্রেণীগত শিক্ষা হইতে ব্যক্তিগত শিক্ষাকেই উপরে স্থান দিয়াছেন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। এই বিষয়ে ইহা 'কিণ্ডারগার্টেন' পদ্ধতি হইতে শ্রেষ্ঠ।

(৫) **কিণ্ডারগার্টেনের ন্যায় মন্তেসরী পদ্ধতিতেও নানা কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষালাভের উপর খুব জোর দেওয়া হয়, এই উদ্দেশ্যে শিশুর জন্য নানা শিক্ষামূলক কাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।** মন্তেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষামূলক কাজগুলি অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত (Scientific) ও সুনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু 'কিণ্ডারগার্টেন' পদ্ধতিতে সৃজনাত্মক কাজের সংখ্যা অধিক।

(৬) **শিক্ষামূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে তাহার বাস্তব জীবনের কাজও শিক্ষা দিয়া** সামাজিক জীবনের উপযোগী করিয়া দেওয়া হয়। নানা রকম জীবনের জন্য প্রস্তুতিসূচক খেলনার মধ্য দিয়া শিশু শিক্ষা

লাভ করে। যেমন শিশু খেলার মধ্যে চা প্রস্তুত করে, চা পরিবেশন করে ইত্যাদি। 'কিণ্ডারগার্টেন' পদ্ধতিতে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই।

(৭) অল্পবয়সে শরীরের বিকাশ না হইলে মনের বিকাশ হইতে পারে না বলিয়া **ডাঃ মন্তেসরী শিশুর শারীরিক বিকাশের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে বলেন** এবং কিণ্ডারগার্টেন হইতে অধিকতর যত্নের সহিত এবং উন্নততর প্রণালীতে শিশুর শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিশুর শারীরিক বিকাশ যাহাতে যথেষ্ট ভাবে হইতে পারে, সেজন্য ডাঃ মন্তেসরী কতকগুলি দোলনা তৈয়ারী করেন। দোলনাগুলি এমন ভাবে তৈয়ারী করা হয় যে, শিশু তাহার দোলনার গতি বৃদ্ধি করিবার জন্য যেন পা দিয়া কোন কিছুকে ধাক্কা দিতে পারে। ইহাতে শিশুর পায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দোলনা চালনার ফলে শরীর চালনায়ও শরীরের মাংসপেশীসমূহ শক্ত হয়।

তিনি কতকগুলি বাঁশের বা কাঠের সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া সাধারণ উঁচু গাছের সঙ্গে লাগাইয়া রাখেন। শিশুরা সিঁড়ি বাহিয়া গাছের উপর উঠে এবং তাহাতে প্রচুর আনন্দ পায়। শরীর চালনার ফলে শিশুদের শারীরিক উন্নতি হয় তাহা বলাই বাহুল্য। শিশুদের উপযুক্ত সাধারণ উঁচু জায়গা হইতে শিশুদের লাফাইবার সুযোগও তিনি দিয়াছেন। কোন কোন "শিশু-নিকেতনে" ডাঃ মন্তেসরী শিশুদের সাঁতার দিবার জন্য ছোট ছোট জলাশয়ের বন্দোবস্ত করেন।

(৮) ডাঃ মন্তেসরী **৫ম বর্ষ বয়সেই শিশুকে লেখা ও পড়া শিক্ষা দিতে বলেন** এবং ইহার জন্য কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি হইতে উন্নততর প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন।

(৯) ফ্রোয়েবেলের ন্যায় **ডাঃ মন্তেসরীও শিশুর গৃহ-সংলগ্ন বাগান রাখা অপরিহার্য মনে করেন** এবং শিশুগণকে বাগান তৈয়ার করিতে ও নানা পশুপক্ষী পুষিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ফ্রোয়েবেলের ন্যায় তিনি ধারাবাহিক বস্তু পাঠের ব্যবস্থা করেন নাই।

(১০) **শাসন বিষয়ে ডাঃ মন্তেসরী ফ্রোয়েবেল হইতেও উদার এবং শিশুকে অধিকতর স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী।** তিনি **মনে করেন যে শিশুগণকে সর্বদা তাহাদের বয়সোপযোগী আনন্দদায়ক কাজে নিযুক্ত রাখাই বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।** যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুগণ স্ব স্ব কার্যে রত থাকে এবং অন্যের কাজের ব্যাঘাত না করে,

ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে তিনি সম্পূর্ণ নিষেধ করেন। একান্ত প্রয়োজন হইলে শিক্ষয়িত্রীর অসন্তোষ জ্ঞাপন এবং অন্যের কাজের ব্যাঘাতকারী শিশুকে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন শাস্তিদানের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী; অনুমোদন বা প্রশংসা ছাড়া অন্ত কোন পুরস্কার দানেরও তিনি পক্ষপাতী নহেন।

(১১) ডাঃ মন্তেসরীর মতে শিশুদের নীরবতা অভ্যাস করিতে হয়। শিশুদের যেমন গতি-নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, সেইরূপ সকল কাজ হইতে বিরত থাকিতেও শিশুদের শিক্ষালাভের প্রয়োজন আছে।

(১২) 'কিণ্ডারগার্টেনের' ন্যায় **মন্তেসরী পদ্ধতিতেও শিক্ষয়িত্রীর উপরেই শিশুর শিক্ষার ভার দেওয়া হয়।**

শিক্ষা-ব্যবস্থা

(১) **বাস্তব জীবনের কাজ শিক্ষাদান** (Exercises of practical life)। শিশুগণ বিদ্যালয়ে আসিলে প্রথমে তাহাদের শরীর ও পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কিনা দেখা হয় এবং তাহাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদিগকে নিজে হাত-মুখ ধুইতে, স্নান করিতে, কাপড় পরিতে ও খুলিয়া রাখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে তাহাদিগকে ক্রমশঃ টেবিল ও ঘর পরিষ্কার করা, শ্রেণী কামরার আসবাবপত্রগুলি সাজাইয়া রাখা, টেবিলে খাবার দেওয়া, বাসনপত্র পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজও করিতে দেওয়া হয়।

(২) **শারীরিক শিক্ষা**। (ক) **খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ**। শিশুকে কি কি পুষ্টিকর খাদ্য, কি পরিমাণ ও দিনে কয় বার দেওয়া প্রয়োজন, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া অভিভাবকগণকে জানাইয়া দেওয়া হয় এবং বিদ্যালয়েও শিশুকে দুই বার খাবার দেওয়া হয়।

(খ) **শরীর পরীক্ষা**। প্রত্যেক মাসে শিশুর উচ্চতা মাপা হয় এবং ওজন লওয়া হয় ও তাহা লিখিয়া রাখা হয়। কয়েক মাস অন্তর চিকিৎসক তাহার শরীর পরীক্ষা করেন এবং তাহার বিবরণ লিখিয়া রাখেন। শিশুর শরীর-গঠনের কোন দোষ থাকিলে বা কোন রোগ থাকিলে উপযুক্ত ব্যায়াম ও চিকিৎসার সাহায্যে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) **খেলা ও ব্যায়াম**। শ্রেণীবদ্ধ গমন, গানের সহিত নৃত্য, বল, চাকা, দড়ি প্রভৃতির সাহায্যে খেলা এবং শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের সহিত অঙ্গসঞ্চালক নানা ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হয়।

(৩) **জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপযুক্ত ব্যবহার শিক্ষাদান** (Sense Training)। **ডাঃ মন্তেসরী শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থায় তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলির উপযুক্ত ব্যবহার শিক্ষাদানকে প্রধান স্থান দিয়াছেন** এবং তাহার জন্য নানা উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। **তিনি শিশুকে যতটা সম্ভব তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া জ্ঞান সংগ্রহ করিতে দিয়া থাকেন**। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি প্রচুর ও যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য নানারূপ বিশেষ কাজেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন; যথা—নানা রংয়ের জিনিষ দেখিয়া বিভিন্ন রং সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং তাহাদের গাঢ়তার পার্থক্য নিরূপণ করা; নানা শব্দ শুনিয়া তাহাদের স্বরূপ এবং তাহাদের পার্থক্য নিরূপণ করা; হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া বিভিন্ন জিনিষের কর্কশতার বা মসৃণতার এবং তাপের তারতম্য নির্ণয় করা; হাতে লইয়া বিভিন্ন জিনিষের ওজন অনুমান করা ইত্যাদি। অনেক সময় এক এক ইন্দ্রিয়কে পৃথকভাবে ব্যবহার করিয়াও জ্ঞানলাভ করিতে দেওয়া হয়। যথা,—চোখ বাঁধিয়া কেবল কানে শুনিয়া কোন শব্দের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করা বা তাহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা; না দেখিয়া, কেবল হাতে স্পর্শ করিয়া কোন জিনিষের স্বরূপ নির্ণয় করা এবং বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে পার্থক্য স্থির করা ইত্যাদি।

যত বেশী সম্ভব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহার করিয়াও কোন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। যথা,—চোখে দেখিয়া, অঙ্গুলী চালনা করিয়া, কর্ণে শুনিয়া ও মুখে উচ্চারণ করিয়া পড়িতে শিক্ষা করা।

(৪) **শিক্ষামূলক কাজ**। কাজের ভিতর দিয়া শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য ডাঃ মন্তেসরী নিম্নলিখিত কাজের ব্যবস্থা করিয়াছেন:—

(ক) নানা রংয়ের জিনিষ তাহাদের রংয়ের পার্থক্যানুযায়ী সজ্জিত করা।

(খ) বিভিন্ন আকারের জিনিষ তাহাদের অনুরূপ আকারের ছেঁদায় পুরিয়া রাখা; তাহাদের সাজাইয়া দেওয়াল, স্তম্ভ, ঘর, পুল, সিঁড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করা।

(গ) কাপড়ে বোতাম আঁটিয়া দেওয়া ও ফিতা বাঁধা ইত্যাদি।

(ঘ) মাটির জিনিষ তৈয়ার করা (clay modelling) বিশেষভাবে নানা মাটির পাত্র তৈয়ার করা।

(ঙ) ইট কাটা, ইট পোড়ান, এবং তাহাদের দ্বারা দেওয়াল, ঘর ইত্যাদি নির্মাণ করা।

(৫) **চিত্রাঙ্কন**। প্রথমে শিশুকে একটা পেন্সিল ও এক ফর্দ কাগজ দিয়া যে কোন জিনিষের ছবি অাঁকিতে দেওয়া হয়; তাহার পর নানা জিনিষের রেখাচিত্র (out-line figure) দিয়া শিশুকে রঙ্গীন পেন্সিলের সাহায্যে তাহা পূর্ণ করিতে (to fill in) দেওয়া হয়। সর্বশেষে তুলি ও রংয়ের ব্যবহার করিয়া শিশুকে নানা জিনিষের ছবি অাঁকিতে দেওয়া হয়।

(৬) **বাগানের কাজ ও পশুপক্ষী পালন**। প্রত্যেক শিশু-নিকেতনে বাগান থাকে। শিশুগণ তথায় নানা ফুলের গাছ ইত্যাদি জন্মায়, এবং সার, জল ইত্যাদি দিয়া যত্ন করিয়া তাহাদের বিকাশ সাধন করে। ইহা ছাড়া তাহাদিগকে নানা শান্ত প্রকৃতির পশুপক্ষী পালন করিতেও দেওয়া হয়। **এই ভাবে তাহারা উদ্ভিদ-জীবন ও পশু-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে।**

(৭) **লেখা ও পড়া শিক্ষাদান**। ডাঃ মন্তেসরী শিশুকে লেখা ও পড়া শিক্ষাদানের জন্য এক অতি উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। **তিনি লেখা ও পড়া এক সঙ্গে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী।**

তিনি **প্রথমে শিশুকে ঠিক ভাবে কলম ধরিয়া হাত চালনা করিতে শিক্ষা দেন**। এই উদ্দেশ্যে নানা জ্যামিতিক আকারে কাঠের, ধাতুর বা কার্ড-বোর্ডের জিনিষ সাদা কাগজের উপর রাখিয়া শিশুকে তাহাদের রেখাচিত্র অাঁকিতে দেওয়া হয়। তাহার পর শিশু রঙ্গীন পেন্সিল কলমের আকারে ধরিয়া রেখা টানিয়া সেগুলি পূর্ণ করে।

ইহার পর মোটা কাগজের এক এক অক্ষর কাটা হয় এবং তাহার উপর শিরিষ (sand paper) কাগজ আটিয়া দেওয়া হয়। শিক্ষক এক এক অক্ষর সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন এবং **শিশুও এক এক অক্ষরের উপর অঙ্গুলী চালনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া অক্ষরটি উচ্চারণ করে**। শিরিষ কাগজের উপর অঙ্গুলী চালনার দরুণ শিশুর অঙ্গুলীতে অক্ষরের প্যাটার্ণের অনুভূতি জন্মে। কয়েকবার এই কাজের পুনরাবৃত্তি করাইবার পর শিক্ষক একটা অক্ষর উচ্চারণ করিয়া শিশুকে তাহা বাছিয়া

লইতে দেন। সর্বশেষে এক একটা অক্ষর দেখাইয়া শিশুকে তাহার নাম বলিতে দেওয়া হয়।

এই ভাবে অক্ষরগুলি পড়িতে শিক্ষা হইলে **এক এক শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলি স্বতন্ত্রভাবে শোনা যায় এবং এইভাবে উচ্চারণ করিয়া শিশুকে শব্দটির উপর অঙ্গুলী সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা উচ্চারণ করিতে দেওয়া হয়।** সর্বশেষে ছোট ছোট বাক্য বলিয়া শিশুকে তদনুযায়ী কাজ করিতে বলা হয়। ইহার পর শিশু নিজেই এক এক বাক্য পড়িতে পারে।

উপরি-উক্ত প্রণালীতে পড়িতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রেখাচিত্র পূর্ণ করার এবং অক্ষরের উপর অঙ্গুলী চালনার ফলে শিশুর রেখাও শিক্ষা হয়। তখন তাহাকে একটা পেন্সিল ও কাগজ দেওয়া হইলে সে দেখিয়া দেখিয়া লিখিতে পারে।

এই প্রণালীতে শিক্ষা দিলে ৪।৫ বৎসরের শিশু এক বা দেড় মাসের মধ্যে লিখিতে ও পড়িতে পারে।

(৮) গণনা শিক্ষাদান। ডাঃ মন্তেসরী **প্রথমে মুদ্রার সাহায্যেই শিশুকে গণনা শিক্ষা দিতে বলেন।** শিশুগণকে টাকা, আধুলী, সিকি, দুয়ানী প্রভৃতি দিয়া গণনা করিতে এবং বড় মুদ্রার পরিবর্তে ছোট মুদ্রা দিয়া শিক্ষা দিলে তাহারা বেশ আমোদ পায় এবং তাহাদের গণনা শিক্ষাও হয়।

তাহার পর ১ হইতে ১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ইঞ্চি দাগ দেওয়া ১০টি কাঠির সাহায্যে শিশুকে গণনা শিক্ষা দেওয়া হয়। কাঠিগুলি তাহাদের দৈর্ঘ্যানুযায়ী পাশাপাশি সাজাইয়া রাখিয়া শিশু তাহাদের ইঞ্চি দাগগুলি গণনা করিবে এবং তাহাদের সংখ্যানুযায়ী কাঠিগুলির ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক নাম দিবে। এই ভাবে কাঠিগুলির সাহায্যে ১ হইতে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইহার পর ১ হইতে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি কাগজে কাটিয়া তাহার উপর শিরিষ কাগজ লাগাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহাদের উপর অঙ্গুলী চালনা করিয়া ও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া শিশু সংখ্যাগুলি লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করে।

১০ পর্যন্ত শিক্ষার পর দশ সংখ্যার কাঠির সহিত অন্য কাঠি যোগ করিয়া ১০০ পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া যায়। তাহার পর কাঠি, গুলি, বীচি ইত্যাদির সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, পুরণ, ভাগ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াও এই চারি নিয়মের অঙ্ক করিতে দেওয়া হয়।

(৯) নাম শিক্ষাদান। নানা বস্তু, কাজ ও গুণ দেখাইয়া শিক্ষয়িত্রী কয়েক বার তাহাদের নাম বলেন এবং তাঁহার অনুকরণ করিয়া শিশুরাও তাহাদের নাম বলে। কিছু সময় পরে বস্তু, কাজ বা গুণ দেখাইয়া শিশুগণকে তাহাদের নাম বলিতে দেওয়া হয়। তাহার পর এক একটা নাম বলিয়া সেই বস্তু, কাজ বা গুণ দেখাইতে বলা হয়। পরিশেষে শিশুগণকে স্বাধীনভাবে সেই নামগুলি ব্যবহার করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইহার ফলে শিশুদের শব্দভাণ্ডার (vocabulary) পুষ্ট হয় ও ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

ডাঃ মন্তেসরীর শিক্ষানীতিতে ফ্রোয়েবেলের প্রভাব

ফ্রোয়েবেলের দ্বারা ডাঃ মন্তেসরী কতটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ফ্রোয়েবেলই প্রথম শিশুরা যে বয়সে বিদ্যালয়ে আসে, সেই বয়সের চেয়ে নীচু বয়সের শিশুদের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ডাঃ মন্তেসরীও ঐ বয়সে শিশুদের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয়তঃ ফ্রোয়েবেলই শিশুকে একটি চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করিয়া শিশুর মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে তাহা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। ডাঃ মন্তেসরীও ঐরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন এবং সেই হিসাবে ডাঃ মন্তেসরী ফ্রোয়েবেলের কাছে ঋণী। তৃতীয়তঃ ফ্রোয়েবেলের ন্যায় ডাঃ মন্তেসরীও শিশুর আত্মবিকাশের দিকে বিশেষ জোর দিয়াছেন। চতুর্থতঃ ফ্রোয়েবেলের ন্যায় ডাঃ মন্তেসরীও শিশুদের খেলার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে ফ্রোয়েবেলের খেলনাগুলির অন্তর্নিহিত রূপক এবং তৎসংশ্লিষ্ট দুর্বোধ্য ইঙ্গিতগুলি যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ খেলনাগুলি ডাঃ মন্তেসরীর খেলনা বলিয়াই পরিচিত হইতে পারিবে।

কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী স্কুলের মধ্যে শিক্ষাদানের পার্থক্য

কিণ্ডারগার্টেন স্কুল	মন্তেসরী স্কুল
১। কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষিকা সমগ্র শ্রেণীকে পরিচালনা করেন।	১। মন্তেসরী স্কুলের পরিচালিকা শ্রেণীকক্ষের একাংশে দাঁড়াইয়া শিশুদের কাজকে লক্ষ্য করেন।
২। শ্রেণীর শিশুরা দলগতভাবে নির্দেশিত কর্মে নিযুক্ত থাকে।	২। শিশুরা খেলনা সহযোগে ব্যক্তিগত ভাবে খেলে।

কিণ্ডারগার্টেন স্কুল	মন্তেসরী স্কুল
৩। শিক্ষিকা কোন কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ করিলে একটি দলকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলেন।	৩। পরিচালিকা একটি বা দুইটি শিশুর সঙ্গে একবারে কথা বলেন।
৪। শ্রেণীবিন্যাস—দলগত কার্যের জন্য টেবিল থাকে।	৪। ব্যক্তিগত কাজের জন্য টেবিল।
৫। শিক্ষিকা ঠিক করিয়া দেন, কোন্ কোন্ Gift লইয়া শিশু খেলা করিবে এবং কি Occupationএ নিযুক্ত থাকিবে।	৫। শিশু নিজেই তাহার খেলনা বাছিয়া লয়, এবং সে যদি খেলনা দ্বারা খেলিতে আগ্রহ বোধ না করে তবে সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে বা অন্য কিছু কাজ করিতে পারে।
৬। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ বা খেলা চলে।	৬। শিশু যতক্ষণ ইচ্ছা কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

ডাঃ মন্তেসরী-প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা

ডাঃ মন্তেসরী প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুদের শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, তাহা ধরিয়া লইলেও ইহার মধ্যে কয়েকটি ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়।

শিশুদের **আত্মপ্রকাশের সুযোগ বেশী দেওয়া হয় নাই,** কারণ যে সমস্ত নির্দিষ্ট উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন রূপের কর্মসম্ভাবনা কম।

২। **কল্পনাপ্রসূত এবং গঠনমূলক কাজের ব্যবস্থা কম।** নির্দিষ্ট উপকরণ ছাড়া খেলা করিবার সুযোগ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৩। **স্বয়ং-শিক্ষার ত্রুটি রহিয়াছে।** প্রতি উপকরণে একটি মাত্র সমস্যা-পূরণের সম্ভাবনা আছে, যথা—ঘুঁটিগুলি এমনি ভাবে তৈরী যে, মাত্র একভাবেই উহার সমস্যাপূরণ হইতে পারিবে। বেশী ক্ষণ ঐ একটি উপকরণ লইয়া খেলা চলে না।

৪। **জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।** কতকগুলি নির্দিষ্ট উপকরণের উপর শিক্ষা নিবদ্ধ না রাখিলেই ভাল হইত।

৫। ডাঃ মন্তেসরী **শিশুদের জন্য লেখাপড়া ও অঙ্ক শিক্ষার ব্যবস্থা অতিশয় তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন।** ছয় বৎসরের পূর্বেই লেখাপড়ার জন্য অতটা জোর দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ডল্টন লেবোরেটরী প্ল্যান

(Dalton Laboratory Plan)

মিস্ হেলেন পার্খাষ্ট (Miss Helen Parkhurst) ডল্টন লেবোরেটরী প্ল্যান নামে এক শিক্ষাদান-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত **ডল্টন** নামক সহরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিতে **শ্রেণী-কামরাগুলি লেবোরেটরীর ন্যায় ব্যবহৃত হয়।** এই দুই কারণেই ইহার নাম **"ডল্টন লেবোরেটরী প্ল্যান"** হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনেক শিক্ষাবিদ্ই মনে করিতে থাকেন যে, যদিও সকল সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী প্রায় একই প্রকারের, তবুও তাহাদের মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা গিয়া থাকে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই ডাঃ মন্তেসরী শিশুদের জন্য ব্যক্তিগত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মিস্ পার্খার্ষ্ট ডাঃ মন্তেসরীর মত ভাবিলেন যে, যাহারা ১২ বৎসরের উপরে তাহাদের মধ্যেও মানসিক অবস্থার বৈষম্য দেখা যায়, এবং তাহারাও ব্যক্তিগত শিক্ষা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। ফলে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়। এই প্ল্যান অনুযায়ী শিক্ষকের দায়িত্ব হ্রাস পাইয়াছে এবং ছাত্রের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছাত্রদের স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে প্রচুর ভাবে ফলে তাহাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষক হইয়াছেন পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী মাত্র।

Mr. John Adam ইহাকে **শ্রেণী-পাঠনার মৃত্যুঘণ্টা** (death-knell) বলিয়াছেন। **কেননা ইহাতে শ্রেণী-পাঠনার কোন ব্যবস্থা নাই।** অবশ্য ছাত্রগণকে এক এক শ্রেণী-হিসাবে দলবদ্ধ করা হয় এবং বিষয়-শিক্ষক সময় সময় তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া নির্দিষ্ট বিষয় কি ভাবে শিক্ষা লাভ করিবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং উপদেশ দেন। কিন্তু তিনি তাহা-দিগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে কোন পাঠ দেন না এবং তাহারা শ্রেণীবদ্ধভাবে কোন পাঠ শিক্ষাও করে না। **ছাত্রগণকে এক সঙ্গে এক মাসের কাজ** (Asignment) **নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে স্বচেষ্টায় তাহা শিক্ষা করিতে বলা হয়।**

সে যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে 'ডল্টন লেবোরেটরী প্ল্যানের' নীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া লইলে ভাল হয়।

১। যে ভাবে শিক্ষাদান করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে, সেই হিসাবে বলা যায় যে, **'স্বাধীনতাই'** হইতেছে এই প্ল্যানের মূল নীতি। বালক যখন কাজ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে কোনও ক্রমে বাধাদান করিবার যৌক্তিকতা নাই—কারণ যখন সে একবার কাজে মনোনিবেশ করিয়াছে, তখন সে তাহার চলার পথে যে-কোনও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে সক্ষম বলিয়া নিজের মনকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছনীয়।

২। দ্বিতীয় নীতি হইতেছে **সহযোগিতা**। এই প্ল্যান অনুযায়ী এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে বালক-বালিকারা একটা সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ হইয়া কাজ করিতে শিক্ষা করে। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যও হইতেছে পূর্ণ নাগরিক হওয়া। সেই হিসাবে এই 'প্ল্যান' সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ় করিতে সুযোগ দান করিয়া শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সফল করিতে সাহায্য করিতেছে।

শ্রেণী-কামরাগুলিকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য পরীক্ষাগারের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে বালক বা বালিকা শিক্ষকের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সে লিখিয়া দেয়:

আমি............. শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী....................অঙ্গীকার করিতেছি যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাকে দেওয়া লেখার কাজ আমি সম্পূর্ণ শেষ করিয়া দিব।

এক এক বিষয় শিক্ষার জন্য এক এক শ্রেণী-কামরা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং তথায় নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষার উপযোগী পুস্তক, চিত্র, শিক্ষা-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সাজাইয়া রাখা হয়। **বিদ্যালয়ে কোন সময়-পত্রিকা (Time table) থাকে না**। শিক্ষক নিজেও কোন রূপ সময়-পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। কিন্তু সময়-পত্রিকা না থাকিলেও দিনের সমগ্র সময়কে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়া প্রথম ভাগে মুখ্য বিষয়, যথা—মাতৃভাষা, ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে Assignment লিখিতে হয়। Assignment লেখা বা তাহার জন্য প্রস্তুতির কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রতি ছাত্র যে বিষয় লইয়া পড়াশুনা করিবে, সেই বিষয়ের শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহার কোন সংশয় থাকিলে তাহা মিটাইয়া

লইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা যাইতে পারে। যে বিষয়গুলির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে সেই বিষয়গুলি ছাত্র সমভাবে হয়ত জানে না। বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলিতে হয়ত সে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়, আবার কতকগুলিতে সে অনগ্রসর। এই অবস্থায় তাহার দিনের প্রথম ভাগ যে সময়ে মুখ্য বিষয়গুলি সে অনুসরণ করিবে সেই সময়টা সে তাহার নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করিতে পারে। সময়-পত্রিকা থাকিলে সে এইরূপ স্বাধীনতা পাইতে পারিত না। **তাহা ছাড়া ছাত্রগণ যখন যে বিষয় শিক্ষা করিবার ইচ্ছা করে বা প্রয়োজন বোধ করে তখন সেই বিষয়-শিক্ষার কামরায় গিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তাহা শিক্ষা করিতে পারে।** কাজেই প্রত্যেক শিশু আপন আপন রুচি, শক্তি ও বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ ও শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পায়। শিক্ষকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ বিষয়-শিক্ষার কামরায় উপস্থিত থাকেন; কিন্তু ছাত্রগণ কোন পরামর্শ বা সাহায্য না চাহিলে তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। **ছাত্রগণকে বিভিন্ন বিষয় পাঠ করিয়া তাহাদের সারমর্ম লিখিয়া ফেলিতে হয়।** শিক্ষকগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেক **ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠোন্নতির রেখাচিত্র (Graph) প্রস্তুত করেন। ডল্টন প্ল্যানে অন্য কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই।** কোন ছাত্র যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে সেই বিষয়ে নূতন কাজ দেওয়া হয় না। কিন্তু সে যদি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা মধ্যে তাহার চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারে, তখনই তাহাকে নূতন কাজ দেওয়া হয়, তাহার সহপাঠী অন্য ছাত্রদের জন্য তাহাকে অপেক্ষা করিতে হয় না।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উপকারিতা বা সুবিধা—

(১) শিক্ষকেরা প্রধানতঃ ছাত্রকে যত দূর সম্ভব স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিতে দেন। ডল্টন পদ্ধতিতে ছাত্রকে স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভ করিতে খুব বেশী সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়া হয়।

(২) ইহাতে ছাত্রগণ তাহাদের নিজ নিজ শক্তি ও জ্ঞানের উপযোগী পদক্ষেপে বা গতিতে জ্ঞানার্জনে ব্রতী হইতে পারে। মেধাবী ছাত্রকে অল্পমেধা ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না এবং শেষোক্ত ছাত্রকে প্রথমোক্ত ছাত্রের সহিত তালে তালে পা ফেলিবার চেষ্টা করিয়া জ্ঞানার্জনে হতাশ হইতে হয় না।

(৩) **বিভিন্ন পরীক্ষাগার (শ্রেণী-কামরা) গুলিতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।** ইহার ফলে ছাত্রগণ সেই সকল বিষয় শিক্ষায় অত্যধিক উৎসাহ পায়।

(৪) **ইহাতে ছাত্রেরা যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করে,** তাহাদের নিজ নিজ রুচি, প্রবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ করিতে পারে। **ফলে তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়,** তাহারা একই ছাঁচে গড়া বিদ্যালয়ের ছাপমারা (institutionalised) ছাত্র হয় না।

(৫) দলগত শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দানের সুযোগ-সুবিধা হয়।

(৬) **ছাত্রগণের আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা হয় এবং দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।**

(৭) পাঠোন্নতির রেখাচিত্র দেখিয়া ছাত্রগণ তাহাদের আপেক্ষিক পাঠোন্নতি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকে এবং **প্রতিযোগিতা করিতে উৎসাহ পায়।**

(৮) এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক এক জন শিক্ষকের পক্ষে সকল শ্রেণীর ছাত্রগণকে সেই সেই বিষয়ে পাঠে সাহায্য করা সম্ভব হয়।

অসুবিধা

উপরি-উক্ত সুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও কেবল **ডল্টন প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান সম্ভব নহে।** (১) কেননা **ইহা খুব নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের উপযোগী নহে।** শিক্ষকগণের সাহায্য না লইয়া তাহারা স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিতে পারে না। (২) শ্রেণী-পাঠনায় ছাত্রকে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা সাজানরূপ এক চরম ব্যবস্থার পরিবর্তে ডল্টন প্ল্যানে শিক্ষককে নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষক সাজানরূপ অন্য চরম ব্যবস্থা হইয়াছে। শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতার ফলেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয়। কিন্তু এখানে তাহার অভাব। (৩) ইহা সকল বিষয় শিক্ষার উপযোগী নহে। (৪) ইহাতে কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়। উপযুক্ত প্রদীপনের সাহায্যে শিক্ষকের বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দ্বারা কোন বিষয় যে রূপ সহজ বোধগম্য হইতে পারে, কেবল পুস্তক-পাঠে তাহা হয় না। (৫) কেবল ছাত্রের লেখা সারমর্ম পড়িয়াই তাহার পাঠোন্নতি সঠিকভাবে নির্ধারণ

করা যায় না, সে অন্যের সাহায্যেও সারমর্ম লিখিয়া রাখিতে পারে। (৬) সময়-পত্রিকা না থাকিলে বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতে পারে। (৭) ছাত্রের উপর খুবই বেশী দায়িত্ব চাপান হইয়াছে, অথচ শিক্ষকের দায়িত্ব নাই বলিলেই চলে। (৮) ডল্টন প্ল্যান মেধাবী ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত হইলেও কমবুদ্ধি-সম্পন্ন ছাত্রদের পক্ষে ততটা উপযুক্ত নয়। তাহার কারণ যাহাদের বুদ্ধি কম তাহারা ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সমগ্র বিষয়গুলিকে গ্রহণ করিবার মত স্বাভাবিক শক্তির অধিকারী নহে।

পরিবর্তিত ডল্টন প্ল্যান (Modified Dalton Plan)

কেবল ডল্টন প্ল্যান অনুযায়ী শিক্ষা না দিয়া শ্রেণী-পাঠনার অনুপূরকভাবে ইহার ব্যবহার করিলেই ছাত্রগণ ইহার দ্বারা খুব উপকৃত হইবে, অথচ ইহার কুফল ভোগ করিবে না। ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানে ডল্টন পদ্ধতিতে শিশুগণকে কেবল পঠিত বিষয়ের পুনরালোচনা এবং কিছু কিছু প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায়, স্বচেষ্টায় নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে দেওয়া যায় না। ৭ম মান হইতেই ছাত্রগণকে স্বচেষ্টায় ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করিতে দেওয়া যায় এবং উচ্চ শ্রেণীগুলিতে ক্রমশঃ ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়।

তবে শ্রেণী-পাঠনার অনুপূরকভাবেই এই শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ইহার জন্য প্রথমে ছাত্রগণকে প্রস্তুত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বৎসরের প্রথমে কিছু কাল প্রত্যেক বিষয়ে নিয়মিত শ্রেণী-পাঠনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহার পর যখন দেখা যাইবে যে, ছাত্রগণ তাহাদের নিজ নিজ স্তরের উপযোগী বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার পদ্ধতি আয়ত্ত করিয়াছে, তখন কেবল কঠিন অংশগুলি শ্রেণীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া সহজ সহজ অংশগুলি তাহাদিগকে স্বচেষ্টায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষা করিতে দেওয়া যায়। **এই উদ্দেশ্যে স্কুলের সময়টাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, প্রথম ভাগে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠ দিবেন, দ্বিতীয় ভাগে ছাত্রগণ স্বচেষ্টায় সেই সকল বিষয়ের নির্বাচিত অংশগুলি শিক্ষা করিবে।** ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রকৃতিপাঠ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কামরা থাকা বাঞ্ছনীয়, অন্য বিষয়গুলি শ্রেণী-কামরায় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ছাত্রগণ স্বচেষ্টায় শিক্ষা করার

সময়ে **বিষয়-শিক্ষকগণ** নিজ নিজ বিষয়-শিক্ষার কামরায় উপস্থিত থাকিবেন, **নিরপেক্ষ দর্শক না সাজিয়া ছাত্রদের কাজ তত্ত্বাবধান করিবেন ও তাহাদিগকে প্রয়োজনমত সাহায্য করিবেন। শ্রেণী পাঠনা ও ছাত্রদের স্বচেষ্টায় অধ্যয়নের সময় নির্দেশ করিয়া সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করিতে হইবে** এবং দ্বিতীয় ভাগে ছাত্রগণকে যে বিষয় যতক্ষণ ইচ্ছা শিক্ষা করিতে দেওয়া যাইবে। ছাত্রগণ স্বচেষ্টায় পঠিত বিষয়ের সারমর্ম লিখিবে। কিন্তু **তাহাদের পাঠোন্নতি নির্ধারণের জন্য স্বতন্ত্র মৌখিক বা লেখ্য পরীক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।** পরীক্ষার ফল দেখিয়াই বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রের পাঠোন্নতির রেখাচিত্র আঁকিতে হইবে। (১)

রেখাচিত্রের সাহায্যে শিক্ষার গতি স্থির করা

প্রথম যখন 'ডল্টন প্ল্যান' অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়, তখন 'এসাইনমেণ্ট' সম্পর্কে ছাত্রেরা কতটা কাজ দৈনিক শেষ করিতে পারিল তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য তাহাদিগকে দিনলিপি লিখিবার জন্য বলা হয়। কিন্তু দিনলিপি লিখিতে এতটা সময় ব্যয়িত হইতে লাগিল যে, উহার পরিবর্তে একটা সহজ উপায় বাহির করার প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল। এদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের নির্দিষ্ট 'এসাইনমেণ্ট' সম্পর্কে কতটা অগ্রসর হইতেছে, তাহার হিসাব রাখাও শিক্ষকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য কাজ। কিন্তু দিনলিপি দেখিয়া শিক্ষকের পক্ষে সকল ছেলের কাজের হিসাব বাহির করাও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই পরিশেষে অনেক চিন্তার পর মিস্ পার্খার্ষ্ট রেখাচিত্রের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের 'এসাইনমেণ্ট' শেষ করার গতি নির্ণয় করিবার জন্য এক পন্থা অবলম্বন করেন। **ইহাতে সময় ব্যয় হইবে কম, অথচ মুখ্য বিষয়গুলিতে**

---

(১) বঙ্গদেশের কতকগুলি সরকারী বিদ্যালয়ে কিছুদিন ডল্টন প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া তাহা পরিত্যক্ত হয়। তাই শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর J. M. Bottomley কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থকার শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত Modified Dalton Plan নামক একটা প্রবন্ধ লেখেন ও তাহা Teachers' Journalএ প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদেশের কয়েকটি সরকারী স্কুলে ডল্টন প্ল্যান প্রবর্তিত হইয়াও কেন পরিত্যক্ত হয় তাহার কারণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। শিক্ষকের সংখ্যা কম ছিল, কেননা শ্রেণী-পাঠনার ব্যবস্থা কোন কোন বিষয়ে থাকায় এবং শিক্ষকদের সংখ্যা না বাড়ানর ফলে, শিক্ষকদের পক্ষে উভয় দিক পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

২। লাইব্রেরীর ব্যবহার ঠিকমত হইতে পারার সম্ভাবনা ছিল না।

তাহারা কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহার হিসাব রাখাও শিক্ষকের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়াইবে। প্রথম রেখাচিত্রটি হইল শিক্ষকের লেবরেটরী গ্রাফ। এই রেখাচিত্রটি প্রতি লেবরেটরীর বিশেষ বিষয়ের শিক্ষকের নিকট রাখা হইত। রেখাচিত্রটির মধ্যে প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে পাঁচটি করিয়া ঘর আছে। সপ্তাহের-কাজের ৫টি ইউনিটের মধ্যে প্রতি শিশু কতটা শেষ করিতে পারিল সেই হিসাবে ছাত্র বা ছাত্রী এই প্রথম নম্বর রেখাচিত্রে দাগ দিয়া আসিবে। সপ্তাহ শেষে দেখা যাইবে 'ক' ছেলেটি সাহিত্যে বা ভূগোলে ৫টি ঘরের মধ্যে ৪টি ঘর পর্যন্ত সোজা দাগ দিয়াছে। অর্থাৎ ৫টি ইউনিটের মধ্যে ৫টি ইউনিট সে শেষ করিয়াছে। আবার ভূগোলে দেখা গেল যে, ৪টি ইউনিটই সে শেষ করিয়াছে।

এই প্রথম রেখাচিত্রটি দেখিয়া শিক্ষক এক দৃষ্টিতেই বলিতে পারেন **শিশু কতটা অগ্রসর হইয়াছে।** তাহা ছাড়া বিভিন্ন লেবরেটরীর বিভিন্ন রেখাচিত্র দেখিয়া সকল শিক্ষক অনায়াসে বুঝিতে পারেন, কোন্ বিষয়টি শিশুর কাছেও ভাল লাগে এবং কোন্ বিষয়টি লাগে না। পক্ষান্তরে ছাত্র-ছাত্রীর কাছেও ইহার মূল্য খুব বেশী। **রেখাচিত্র পূরণ করিতে গিয়াই তাহার মনে হয় কোন্ বিষয়ে সে বেশী অগ্রসর হইয়াছে ও কোন্ বিষয়ে সে পেছনে রহিয়াছে।** সে নিজেই তখন চিন্তা করিয়া বাহির করিতে পারে কোন্ বিষয়ে সে বেশী মনোযোগ দিবে এবং কোন্ বিষয়ে কম মনোযোগ দিবে। তৃতীয়তঃ রেখাচিত্র দেখিয়া শিক্ষকের কোন্ বিষয়ে **কোন্ ছাত্রকে কি ভাবে ব্যক্তিগত সাহায্য করিবেন,** তাহা স্থির করিতে পারেন।

দ্বিতীয়, রেখাচিত্র **ছাত্রদের চুক্তি সম্পর্কিত রেখাচিত্র।** ছাত্র নিজে বিভিন্ন বিষয়ে কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা সে এই রেখাচিত্রটিতে হিসাব রাখিতে পারে। পূর্বের রেখাচিত্রে প্রত্যেক লেবরেটরীতে তাহার প্রগতির হিসাব ছিল, দ্বিতীয় রেখাচিত্রে সে তাহার **সমস্ত মুখ্য বিষয়গুলির কাজের হিসাব দাগ দিয়া রাখে।** সেই হিসাবে ছাত্র এক দৃষ্টিতেই তাহার অবস্থা বুঝিয়া লইতে পারে। ছাত্রের হাতে যতটা সময় আছে তাহা এসাইনমেণ্ট-গুলির বাকী ইউনিটগুলির পক্ষে উপযুক্ত কিনা তাহা সে অনায়াসে দেখিতে ও বুঝিতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সে কাজের ব্যবস্থাও করিতে পারে।

তিন নম্বর রেখাচিত্রকে বলা হয় **শ্রেণীর রেখাচিত্র।** সমগ্র মাসের মধ্যে প্রতিটি বিষয়ের জন্য যে কতগুলি কাজের ইউনিট আছে তাহার জন্য প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর পাশে ঠিক অতগুলি ছোট ঘর দেওয়া হয়। **ছাত্র বা ছাত্রী যতগুলি ইউনিট শেষ করিবে সেই ইউনিট পর্যন্ত সে সরল রেখা টানিয়া যাইবে।** ফলে কারও বেশী বা কারও কম দেখা যাইবে। শিক্ষক এক দৃষ্টিতে সমস্ত শ্রেণীর লেখা-পড়ার উন্নতি লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উইনেটকা পদ্ধতি (Winnetka Technique)

এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি আমেরিকার উইনেটকা (Winnetka) নামক স্থানে প্রথম উদ্ভাবিত হয় বলিয়া এই শিক্ষা-পদ্ধতির নাম উইনেটকা পদ্ধতি রাখা হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ডল্টন প্ল্যানে যেমন ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উইনেটকা পদ্ধতিও সেই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। তবে উহাদের প্রকার ভিন্ন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়সমূহকে ব্যক্তিগত শিক্ষাধীন করিবার জন্য পাঠ্যক্রমকে পরিবর্তন করা হইয়াছে। পাঠ্যক্রমকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) প্রথম ভাগের বিষয়সমূহ সকলই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় এবং সেই সব প্রয়োজনীয় বিষয়লব্ধ জ্ঞান শিশুদের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। (২) দ্বিতীয় ভাগের বিষয়সমূহ হইতেছে দলগত কাজ এবং এই দলগত কাজগুলিকে 'সৃষ্টিমূলক', 'আত্মপ্রকাশমূলক', 'সামাজিকতাপূর্ণ' কাজ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রথম ভাগের মূল বিষয়গুলির কাজ হইতেছে সকলই ব্যক্তিগত কাজ। এই মূল বিষয়গুলিকে কতকগুলি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ইউনিটের জন্য এসাইনমেণ্ট ও পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রী নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিটের কাজ করিয়া যায়। যখন তাহার ইউনিটের কাজ সম্পূর্ণ হইয়া যায়, তখন সে শিক্ষক হইতে প্রাপ্ত ইউনিটের উত্তর-সম্বলিত কাগজখানির সঙ্গে নিজের উত্তর মিলাইয়া দেখে। যদি দেখে যে তাহার উত্তর ঠিকই হইয়াছে, তাহা হইলে সে ঐ ইউনিটেরই অন্য অংশের এসাইন-মেণ্ট আরম্ভ করে। আর যদি দেখে যে ইউনিটের ঐ অংশের উত্তর ঠিক হয় নাই, তাহা হইলে সে পুনরায় নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে উদ্যোগী হয়। যখন একটি ইউনিটের সমস্ত অংশ-ইউনিটগুলির কাজ তাহার শেষ হয়, তখন সে শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে পরীক্ষা দিতে অনুরোধ করে। যদি সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, আর যদি সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় তাহা হইলে নূতন ইউনিটের কাজ করিবার জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়

এবং তখন তাহাকে নূতন ইউনিটের কাজও দেওয়া হয়। প্রতি ইউনিটের পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীকে পুরা নম্বর রাখিতে হয়, তবেই সে পরীক্ষায় কৃতকার্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

দ্বিতীয় ভাগের কাজগুলি হইতেছে দলগত কাজ। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি দিন এই কাজ করিবার যাহাতে সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত কাজ নাচ-গান, সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন, অভিনয়, খেলা ইত্যাদি যাহা কিছু ছাত্র-ছাত্রীর সৃজনাত্মক মনোভাব গড়িয়া তোলে এবং তাহাদের সামাজিকতা-বোধ জাগ্রত করে, তাহাদের কেন্দ্র করিয়া সম্পন্ন হয়। এই সমস্ত কাজে, মূলগত বিষয়সমূহের জন্য যে পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে, সেইরূপ কোন পরীক্ষা বা নম্বর দানের ব্যবস্থা নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা এই সকল বিষয় শিখিয়াই আনন্দ পাইয়া থাকে।

সকল শিশু বা ছাত্র-ছাত্রী একই গতিতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে না বলিয়া ইউনেটকা পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় মূল বিষয়সমূহ শিশুর নিজ নিজ গতির হারে শিক্ষা লাভ করিবার বন্দোবস্ত আছে। মূল বিষয়সমূহ আয়ত্ত করা সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজন। কারণ তাহা না হইলে প্রত্যেকের পক্ষেই সমাজে সমস্ত কাজে অংশ গ্রহণ করা অসুবিধাজনক হইবে। এই কারণেই সকল ছাত্র-ছাত্রী নিজ সামর্থ্য ও শিক্ষার গতি অনুযায়ী মুখ্য বিষয়-গুলি ব্যক্তিগত চেষ্টায় আয়ত্ত করিয়া থাকে। শ্রেণীগত শিক্ষার ফলে সকলে একসাথে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ আয়ত্ত করিতে পারিবে না বলিয়াই ইউনেটকা পদ্ধতি শিক্ষার ব্যক্তিগত সমস্যাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতে পারিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রী ধাপে ধাপে স্তরে স্তরে শিক্ষালাভ করিয়া একটি অংশবিশেষ সম্পূর্ণ আয়ত্ত না করিতে পারিলে পরের সংযুক্ত অংশকে আয়ত্ত করিবার সুযোগই তাহাদিগকে দেওয়া হয় না। ইহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে সময় বেশী ব্যয়িত হইলেও শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ব জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া পরবর্তী জ্ঞান আহরণ করিতে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। মূল বিষয়সমূহ আয়ত্ত করিবার নানাবিধ সুযোগ ও সুবিধা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্র-ছাত্রী যাহাতে স্বচেষ্টায় শিখিতে পারে এমন সমস্ত শিক্ষার সূত্র ও নির্দেশ দেওয়া থাকে। ছাত্র-ছাত্রীর অগ্রগতি যাহাতে কোন রূপে ব্যাহত না হইতে পারে সেই দিকে পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রমোশনের বন্দোবস্ত আছে। এক বিষয়ের প্রমোশন অন্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে না।

একটি ছেলে হয়ত চতুর্থ শ্রেণীতে পঠন ও পঞ্চম শ্রেণীতে অঙ্ক শিখিতেছে, আবার তাহার পাশেই আর একটি মেয়ে পঞ্চম শ্রেণীর পঠন ও চতুর্থ শ্রেণীর অঙ্ক করিতেছে। এইরূপ কাজে কোনরূপ অসুবিধা দেখা যায় না। কারণ সময়-পত্রের কোন ধরা-বাঁধা নির্দেশ নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী কাজের বন্দোবস্ত করিবার স্বাধীনতা পাইয়া থাকে। কিন্তু যে সময়ে সকলে গঠনমূলক সৃজনাত্মক কাজ করে, সেই সময়ে সকলেই ঐসকল কাজেই নিযুক্ত থাকে, তখন আর কেহ মুখ্যবিষয়গুলিকে অনুসরণ করিতে যায় না।

উইনেটকা পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত শিক্ষার ফলে মূলগত বিষয়গুলির শিক্ষা বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এই পদ্ধতির গবেষকগণ স্বীকার করিয়াছেন। গঠনমূলক ও সৃজনাত্মক কাজগুলির উপর বিশেষ চাপ বর্তমানে নাই বলিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা ঐসব কাজে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া থাকে; ফলে তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত সামাজিকতা-বোধ বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যৌথ-পদ্ধতি

(The Co-operative Method)

এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়কে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ছাত্রকে এক এক ভাগ শিক্ষা করিতে দেওয়া হয়। তাহারা নানা পুস্তক পড়িয়া নিজ নিজ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এবং তাহার সারমর্ম লিখিয়া ফেলে। **নির্দিষ্ট সময়ের পর তাহারা একত্রিত হইয়া পরস্পরের অধীত বিষয় আলোচনা করে।** এক এক জন তাহার লেখার সারমর্ম পাঠ করে, অন্য ছাত্রেরা তাহা শুনিয়া ও আলোচনা করিয়া শিক্ষা করে। **এইরূপে সকল ছাত্র সমগ্র বিষয়টি অল্প সময়ে শিক্ষা করিতে পারে।** যথা,—আকবরের ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য এক এক জনকে আকবরের বাল্যজীবন ও সিংহাসন-লাভ, রাজ্য-বিস্তার ও সাম্রাজ্য-সীমা, শাসন-ব্যবস্থা, চরিত্র ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে দেওয়া যায়। উর্ধ্ব শ্রেণীতে এক এক ছাত্রকে এক এক জন রাজার

ইতিহাস শিক্ষা করিতেও দেওয়া যায়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ নিজ অংশ শিক্ষা করার পর সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পরের অধীত বিষয়ের বর্ণনা শ্রবণ করিবে ও আলোচনা করিবে। এইরূপে সকল ছাত্র আকবরের সম্পূর্ণ ইতিহাস বা কোন বংশের অনেক রাজার ইতিহাস পরস্পরের সহযোগিতায় অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা করিতে পারে।

এই প্রণালীতে শিক্ষাদানের সুবিধা এই যে, **ছাত্রগণ স্বচেষ্টায় শিক্ষা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের সাহায্যে বেশী শিক্ষা করিতে পারে এবং অন্যের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিতেও শিখে**। সহপাঠী অন্য ছাত্রদের সমক্ষে বর্ণনা ও আলোচনা করিতে হইবে বলিয়া সকলে নিজ নিজ অংশ উত্তমরূপে শিক্ষার দায়িত্ব উপলব্ধি করে এবং তাহা যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করে। **সর্বোপরি ইহাতে ছাত্রের সময় ও শক্তির মিতব্যয়িতা হয় এবং দ্রুত পাঠোন্নতি হয়**। তবে সকল ছাত্রের শিক্ষা করিবার শক্তি সমান নহে বলিয়া তাহাদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে অর্জিত বিভিন্ন অংশের জ্ঞান সমমূল্যের নাও হইতে পারে। কিন্তু **এক এক জনের পরিবর্তে এক এক দল ছাত্রকে এক এক অংশ শিক্ষা** করিতে ও তাহাদের অধীত বিষয় বর্ণনা করিতে **দেওয়া হইলে ইহার প্রতিকার হইবে**। ইহা ছাড়া, **আলোচনার সময়ে বিষয়-শিক্ষক উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রের বর্ণনা প্রয়োজনমত সংশোধন ও অনুপূরণ করিলে এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হইবে।**

পরিদর্শিত পাঠ

(Supervised Lesson)

সময় সময় ছাত্রগণকে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শ্রেণীতে বসিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিষয় পাঠ করিতে দেওয়া যায়। তাহারা নীরবে বিষয়টি পাঠ করিবে এবং স্বচেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করিবে। কিন্তু শিক্ষক কেবল নিষ্ক্রিয় শ্রোতা না সাজিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া ছাত্রদের কাজ তত্ত্বাবধান করিবেন এবং তাহাদিগকে প্রয়োজনমত সাহায্য করিবেন। নির্দিষ্ট সময়ের পর তিনি মৌখিক প্রশ্নের সাহায্যে অধীত বিষয়ে ছাত্রদের জ্ঞান পরীক্ষা করিবেন; ঊর্ধ্বশ্রেণীতে ছাত্রগণকে অধীত বিষয়ের সারমর্ম লিখিয়া ফেলিতেও বলা যায় এবং শিক্ষক তাহা পরীক্ষা করিতে পারেন।

এই প্রণালীতে ডল্টন প্ল্যানের ন্যায় ছাত্রকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না এবং এক সঙ্গে অনেক দিনের কাজ দেওয়া হয় না। শিক্ষককে ছাত্রের কাজ অধিকতর তত্ত্বাবধান করিতে হয়। ডল্টন প্ল্যান অনুযায়ী শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে প্রথমে পরিদর্শিত পাঠের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অভিনয়-পদ্ধতি

(Dramatic Method)

এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য ছাত্রগণকে নানা মানুষ, পশুপক্ষী বা গুণ সাজিয়া শিক্ষণীয় বিষয়ের অভিনয় করিতে দেওয়া হয়। তাহাদের কথোপকথনের আকারেই শিক্ষণীয় বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়। শিক্ষকের বর্ণনা শ্রবণ বা পুস্তক-পাঠের পরিবর্তে ছাত্রগণ শিক্ষণীয় বিষয়টির অভিনয় করিয়াই তাহা শিক্ষা করে। যথা,—বাবরের ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য এক একজন ছাত্র বাবর, ইব্রাহীম-লোদী, সংগ্রাম সিংহ, হুমায়ুন ইত্যাদি সাজিয়া অভিনয় করিতে পারে। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ভূগোল শিক্ষার জন্য এক একজন ছাত্র এক এক জেলা সাজিয়া ও তাহাদের বর্ণনা দিয়া অভিনয় করিতে পারে। সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া প্রভৃতি গুণ সাজিয়া অভিনয় করিয়া ছাত্রগণ নৈতিক শিক্ষা পাইতে পারে। আলো, বাতাস, খাদ্য, জল প্রভৃতি সাজিয়া অভিনয় করিয়া ছাত্রগণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারে।

অভিনয়-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে শিক্ষাকার্য ছাত্রের নিকট খুব আনন্দদায়ক হয় বলিয়া তাহারা উৎসাহের সহিত শিক্ষা করে। ইহাতে **বিষয়টি বাস্তব আকার ধারণ করে এবং সহজ-বোধগম্য** হয়। কোন বিষয় অভিনয়ের আকারে শিক্ষা করিলে তাহা ছাত্রের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং বেশী দিন স্মরণ থাকে। কিন্তু **ইহাতে দ্রুত পাঠোন্নতি হয় না** এবং অন্য শ্রেণীর কাজের ব্যাঘাত হয়। সকল বিষয় এই পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া যায় না। এই জন্য **কেবল এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে।** তবে সময় সময় ছাত্রগণকে কোন কোন্ বিষয় অভিনয়-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে শ্রেণী-পাঠনার একঘেয়েমী দূর হইবে এবং শিক্ষাকার্য অধিকতর আনন্দদায়ক হইবে।

সক্রেটিক পদ্ধতি

(Socratic Method)

গ্রীস দেশের **জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ সক্রেটিস** অন্য লোককে স্বমতে আনয়নের জন্য এক বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতেন। কোন লোক বিরুদ্ধ বা ভুল মত পোষণ করিলে তিনি প্রথমে তাহাকে চতুরতার সহিত প্রশ্ন করিয়া তাহার মতের অসারতা প্রদর্শন করিতেন। তাহার পর অন্য প্রকার প্রশ্ন করিয়া তাহাকে প্রকৃত সত্যে বা ঠিক সিদ্ধান্তে লইয়া যাইতেন। এই প্রণালীতে প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণকে কোন কোন বিষয় শিক্ষাও দেওয়া যায়। ছাত্রগণকে শিক্ষাদানের জন্য সকল সময় প্রথমোক্ত ভ্রম-প্রদর্শক প্রশ্নের ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। তবে কোন ছাত্র মিথ্যা গর্বে স্ফীত হইয়া শিক্ষকের প্রদত্ত জ্ঞান গ্রহণ করিতে বা তাঁহার উপদেশ মত কাজ করিতে অবহেলা করিলে এইরূপ প্রশ্নের সাহায্যে তাহার অজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রয়োজন হইতে পারে। **পথ-প্রদর্শক বা উত্তর-নির্দেশক** (Leading) **প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রের নিকট হইতে প্রকৃত সত্য বাহির করিয়া বা তাহাকে ঠিক সিদ্ধান্তে লইয়া গিয়াই কোন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় ইহাই সক্রেটিক পদ্ধতি।** এই পদ্ধতিতে বাহির হইতে কোন নূতন জ্ঞান দেওয়া যায় না। তবে **ধাত্রী যেমন মাতৃগর্ভ হইতে সন্তান বাহির করিয়া আনে, সেরূপ শিক্ষকও সক্রেটিক প্রণালীতে চতুরতার সহিত প্রশ্ন করিয়া ছাত্রের ভিতর হইতে প্রকৃত সত্য বাহির করে বলিয়া ইহাকে ধাত্রীর পদ্ধতি** (Midwife's Method বলে। যথা,—

শিক্ষক—(ছাত্রের জামা দেখাইয়া) এই সুন্দর জামাটি কাহার ?

ছাত্র—ইহা আমার।

শিক্ষক—এই বইটি কাহার ?

ছাত্র—ইহা আমার।

শিক্ষক—ইহা কিরূপে তোমার হইল ?

ছাত্র—আমার পিতা বা অভিভাবক আমাকে দিয়াছেন।

শিক্ষক—তোমাকে না বলিয়া অন্য কেহ এইগুলি লইয়া যাইতে পারে ?

ছাত্র—না।

শিক্ষক—কেহ তাহা করিলে তুমি কি মনে করিবে ?

ছাত্র—সে অন্যায় করিয়াছে মনে করিব।

শিক্ষক—না-বলিয়া অন্যের জিনিষ লইলে কি করিয়াছে বলে ?

ছাত্র—চুরি করিয়াছে বলে।

শিক্ষক—এখন বল চুরি করা ন্যায় কি অন্যায় ?

ছাত্র—চুরি করা অন্যায়।

এই প্রণালীতে কোন নূতন জ্ঞান দেওয়া যায় না বলিয়া **ইহা ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি তথ্যমূলক পাঠের উপযোগী নহে। প্রধানতঃ নৈতিক শিক্ষাদানের জন্যই এই পদ্ধতির ব্যবহার হয়।** তবে কতকগুলি জ্ঞাত বিষয় হইতে নূতন সত্যে বা সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়ার জন্য সকল বিষয়-শিক্ষায় ইহার ব্যবহার হইতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (Wardha Scheme)

আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন প্রচলিত পুঁথিগত এবং বুদ্ধি প্রধান শিক্ষার ধারাকে একেবারে সমূলে পরিবর্তিত করিয়া গান্ধীজী এক নূতন শিক্ষার ধারার কথা ১৯৩৭ সনে উল্লেখ করেন; আমাদের দেশে অবৈতনিক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথ সুগম করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। অনেক শিক্ষাবিদের সহিত আলোচনার পর ইহাকে শেষ আকার দেওয়া হয়।

গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষায়, তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা যে দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখিয়াছেন তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, বুনিয়াদী শিক্ষা জীবনের জন্য শিক্ষা এবং জীবনের মধ্য দিয়া শিক্ষা। এই শিক্ষার মাধ্যমে গান্ধীজী একটি শ্রেণীহীন,শোষণহীন ও অহিংস সমাজের প্রচেষ্টাকরণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।*

*"Basic Education is not a technique, it is a way of life. It aims at integrated all-round development of personality of the individual and also at building up of a Society on truth, justice and non-violence"—Gandhiji.

সেই সমাজটি সত্য এবং ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামকে গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। মুষ্টিমেয় সহরের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর নিকট শিক্ষা ছিল কুক্ষিগত অথচ ভারতের পল্লীর অগণিত জনসাধারণ শিক্ষার নিম্নতম ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত। ইহার ফলে সহর ও গ্রামের মধ্যে একটি বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। গান্ধীজী এই বিষাক্ত আবহাওয়া দূরীকরণের জন্যই গ্রামাঞ্চলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রাথমিক প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। গ্রাম ও সহরের মধ্যে এই বিরাট ব্যবধানকে অপসারণ করিবার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সামাজিক বিপ্লব আনিতে চাহিয়াছিলেন। শান্তিপূর্ণ সামাজিক বিপ্লব আনয়ন করিতে হইলে পুঁথিগত শিক্ষার পরিবর্তে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচলন আবশ্যক এবং কর্মের সাথে জ্ঞানের ও সমগ্র শিক্ষার সহিত বাস্তব জীবনের যে ব্যবধান ছিল তাহা দূরীকরণই ছিল গান্ধীজীর উদ্দেশ্য। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে।—

সপ্তবর্ষব্যাপী শিক্ষা-ব্যবস্থা। এই পরিকল্পনায় ৭ম হইতে ১৪শ বৎসর পর্যন্ত সপ্তবর্ষব্যাপী অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এই সময়ের মধ্যে ইংরেজী বাদ দিয়া অন্য সমস্ত বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার স্তরের সমান জ্ঞান দিতে হইবে। এই বয়সের পূর্বে শিশুগণকে শিক্ষাদানের ভার পিতামাতার উপর থাকিবে। বর্তমানে এই সপ্তবর্ষব্যাপী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করিয়া ৮ বৎসর ব্যাপী (৬—১৪ বৎসর) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

হস্তশিল্প শিক্ষাদান। এত দিন যে কেবল পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহার ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রকে এক একটা উৎপাদনাত্মক হস্তশিল্প শিক্ষাদানের এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাই ইহার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। শিল্প বা উৎপাদনাত্মক কাজ এইরূপ হইবে যাহার ভিতর শিক্ষাদান সম্পর্কীয় বিভিন্ন প্রকার সম্ভাব্যতা প্রচুর ভাবে বিদ্যমান থাকে। তাহা ছাড়া এই শিল্পকাজগুলির সঙ্গে মানুষের জীবনের সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ থাকিবে এবং সেই শিল্পকাজের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়সমূহ আয়ত্ত করা সম্ভব হইবে।

শুধু শ্রেষ্ঠ কারিগর বা মিস্ত্রি তৈয়ার করাই ইহার লক্ষ্য নহে। শিশুকে যন্ত্রের ন্যায় শিল্পটি শিক্ষা না দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বুদ্ধির সহিত তাহা শিক্ষা করিতে দিতে হইবে, যেন তাহার দ্বারা শিশুর মানসিক বিকাশেরও সাহায্য হয়।* ইহা ছাড়া, সেই হস্তশিল্পের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে। বস্তুতঃ, প্রথম হইতে এরূপ ভাবে একটা হস্তশিল্প শিক্ষা দান করিতে হইবে যেন পরে সে তাহা একটা বৃত্তি হিসাবেও অবলম্বন করিতে পারে। যতদূর সম্ভব শিল্পের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষাদানই এই পরিকল্পনার মেরুদণ্ড বলিয়া বলা যায়। তাই বিদ্যালয়ের সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তিন ঘণ্টার উপর হস্তশিল্প-শিক্ষাদানের (মূল শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ ও তৎসম্বন্ধিত জ্ঞান) জন্য ব্যয় করিতে বলা হইয়াছে। হস্তশিল্পের সম্পর্কে জাকির হোসেন কমিটি (১) সূতাকাটা ও তাঁতের কাজ, (২) কৃষি এবং (৩) কাঠ, কার্ড-বোর্ডের ও ধাতুর কাজের কথা উল্লেখ করেন। সূতাকাটা এবং তাঁতের কাজের মাধ্যমে স্কুলপাঠ্য অনেক কিছু বিষয় শিক্ষা করা যায় এবং কৃষির সঙ্গে সাধারণ মানুষের যথেষ্ট যোগাযোগ বর্তমান বলিয়া এই প্রধান শিল্প দুইটিকে বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঐ দুইটি শিল্প মানুষের দুইটি মৌলিক চাহিদার, যথা,—বস্ত্র ও অন্ন এবং দারুশিল্প কাজ আবাস রচনা ইঙ্গিত করে বলিয়া এই তিনটি শিল্পকেই পর পর বুনিয়াদী শিক্ষায় স্থান দেওয়া হইয়াছে।

স্বাবলম্বী শিক্ষা-ব্যবস্থা। ইহাকে দুই অর্থে স্বাবলম্বী শিক্ষা বলা যায়: (ক) শিশুদের দ্বারা এইরূপ শিল্পদ্রব্য তৈয়ার করাইতে হইবে যাহা বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ আয় করা যায়। তাহার দ্বারা বিদ্যালয়-পরিচালনার চলতি (recurring) খরচ, অন্ততঃ শিক্ষকের বেতন-দানের খরচ নির্বাহ করিতে হইবে। (খ) ইহা ছাড়া, শিশু পরে প্রয়োজন হইলে সেই হস্তশিল্পটিকে বৃত্তি হিসাবে অবলম্বন করিয়া নিজের জীবিকার্জন করিতেও পারে। ইহাই ইহার দ্বিতীয় প্রধান বিশেষত্ব।

---

* গান্ধীজী বলিয়াছেন: Every-handicraft has to be taught not merely mechanically as is done to-day but scientifically, that is to say, the child should learn the why and wherefore of every process.

বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শিক্ষাদান

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা থাকিতে পারে যে, উহা বুঝি শুধু শিল্পকাজের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। কিন্তু শিল্পের উপর যে গুরুত্ব রহিয়াছে তাহা শুধু সমগ্রের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। অপরাপর অংশগুলি হইতেছে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ। শিল্প, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ এই তিনের সমন্বয়ের ফলেই শিশুর শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হইতে পারে বলিয়া বুনিয়াদী শিক্ষার অনুগামিগণ মনে করেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিশুর শিক্ষার সঙ্গে এই তিনটি আগ্রহের কেন্দ্রকে যুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। ফলতঃ এই তিনটি আগ্রহের কেন্দ্রই শিশুর বাস্তব জীবনের মূল আবেষ্টনী। এই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে কোন কোন সময়ে এমন কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্যের ইঙ্গিত থাকিতে পারে যাহার সঙ্গে পূর্বোক্ত তিনটি আগ্রহের কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা দানের চেষ্টা না করিয়া অভিজ্ঞ শিক্ষক পূর্বতন শিক্ষা-পদ্ধতি অনুযায়ী ঐ বিষয়টিকে শিশুর নিকট পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। ইহাতে মাতৃভাষা শিক্ষার উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করা এবং ইহাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। মাতৃভাষাকে যেমন উচ্চে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তেমন ইংরেজী ভাষাকে একেবারে পাঠ্যক্রম হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অনেকেই ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষাসূচীর মধ্যে স্থান না দেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। গান্ধীজী স্বাধীন ভারতবর্ষের কথা মনে করিয়াই বিদেশী ভাষাকে পরিত্যাগ করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। কোন স্বাধীন দেশে বিদেশী ভাষাকে প্রচলিত ভাষা হিসাবে মুখ্য স্থান দেয় না, অতএব গান্ধীজীও এবিষয়ে ঠিকই করিয়াছেন।

অন্যান্য বিষয় শিক্ষাদান। মাতৃভাষা ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, প্রাথমিক বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে এক একটা হস্তশিল্পকে বা আবেষ্টনীকে কেন্দ্র করিয়া এবং যতদূর সম্ভব তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই এই বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে বলা হইয়াছে। তাহা

ছাড়া কৃষ্টিগত বিষয়, যথা,—সঙ্গীত, চারুকলা, নৃত্য ইত্যাদিরও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় রহিয়াছে। শিশুর ভাবগত জীবনের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়াও শিক্ষা সম্বন্ধিত হওয়ার সুযোগও ইহাতে রহিয়াছে। অর্থাৎ শিক্ষা শিশুর প্রকৃতি, শিক্ষা, সমাজ ও প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত।

সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং নৈতিক আবহাওয়ায় শিক্ষাদান

ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার বিদ্যালয়গুলিতে শিশুগণ সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং নৈতিক আবহাওয়ায় শিক্ষা পাইবে। ইহাতে শিক্ষক ও গুরুজনকে ভক্তি করিতে, সর্বদা সত্য কথা বলিতে, তাহাদের দৈনন্দিন কার্য নিজেরাই সম্পন্ন করিতে এবং সরল নৈতিক জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। সমবেতভাবে প্রার্থনা করিয়া বিদ্যালয়ের দৈনিক কাজ আরম্ভ ও শেষ করা হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোন ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইবে না।

প্রত্যক্ষ ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত না থাকিলেও সেবার মধ্য দিয়া ধর্মপালনের ব্যবস্থা নঙ্গ তালিমে আছে। এই সেবাধর্মের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ এক দিন সভ্যতার উচ্চশিখরে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল। আর সেবাধর্মের অভাবেই আজ ভারতবর্ষ এতটা নীচে নামিয়া আসিয়াছে। গান্ধীজী স্কুল ও গ্রামের সেবার মধ্য দিয়াই শিশুদের মধ্যে সেবাধর্মের বীজ বপন করিতে প্রয়াস পান।

অহিংসা ও বিশ্বপ্রেম শিক্ষাদান

বিদ্যালয়ে শিক্ষার কার্যসূচী এইরূপ ভাবে প্রযুক্ত হইবে যাহাতে শিশুরা অহিংসা-নীতি ও মৈত্রী শিক্ষা করিতে পারে। সকলের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে এবং মানুষমাত্রকে ভালবাসিতে শিশুরা কর্মপন্থার মধ্য দিয়াই শিখিতে পারিবে।

সমাজ গঠন

গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়া একটি সুন্দর সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। তিনি আশা করেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার ফলে সহরের সঙ্গে গ্রামের একটি সরল ও সুস্থ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সংঘর্ষ এবং বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে যে সংঘর্ষ তাহাও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। ফলে একটি শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গড়িয়া উঠিবে। গ্রাম যে ভাবে ধ্বংসের পথে চলিয়াছিল তাহা হইতে উহা রক্ষা পাইবে এবং ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এমন একটি সমাজের উদ্ভব

হইবে, যেখানে ধনী-নির্ধনের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না এবং যেখানে প্রত্যেকে বাঁচিয়া থাকিবার মত অর্থ সংগ্রহ করিতে ও স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে। এইরূপ একটি সমাজ-বিপ্লব রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর কিংবা বহু অর্থব্যয়ের পর সম্ভব হইবে না ; সম্ভব হইবে নীরবে, বুনিয়াদী শিক্ষার প্রভাবে। ইহাই বুনিয়াদী শিক্ষার সমাজদর্শন।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাফাই

গান্ধীজী শুধু লেখাপড়া শিক্ষাকে বুনিয়াদী শিক্ষার মুখ্যস্থান দেন নাই। শিক্ষিত হইতে হইলে বহু জিনিষ আয়ত্ত করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ারও একটি বিশেষ স্থান আছে। শিক্ষিত হইতে হইলে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সামাজিক স্বাস্থ্য এই দুইটি বিষয়েই শিশুকে অবহিত হইতে হইবে। এই কারণেই সাফাই কাজ বুনিয়াদী শিক্ষায় একটি মূল করণীয় বিষয় হইয়া আছে। নঈ তালিমের বড় কথাই হইতেছে সমাজগত শিক্ষাদ্বারা নূতন সমাজ গঠন। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি সেইরূপ হয়, তাহা হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা, সেবা, সাফাই ইত্যাদি কাজ শিশুর জীবনে অতিশয় সহজভাবে আসিয়া মিশ্রিত হইয়া যাইবে। সেবা ও স্বাস্থ্যরক্ষা, সহযোগিতা ও সাফাইয়ের মধ্য দিয়া শিশু পূর্ণ ও সার্থক সমাজ, অন্তর-দৃষ্টি দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া রুচিজ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ ও কলাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ সাধন হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার সমাজ-দর্শন আলোচনা করার ফলে দেখা যাইতেছে যে, শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার দিক দিয়াও ইহা সমৃদ্ধ। দেখা যাইতেছে যে শিশুর ইচ্ছা অনিচ্ছা উৎসুক্য প্রভৃতির দিকেও বুনিয়াদী শিক্ষায় যথেষ্টভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পরিস্ফুট যে বুনিয়াদী শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক। কর্মের মধ্যে শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে এবং উহার ফলে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের যথেষ্ট সুযোগও বর্তমান। বিদ্যালয় একটি ক্ষুদ্র সমাজ। এই ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে বাস করিয়া জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে যে সমস্ত গুণের বিকাশ সম্ভব, তাহা বিদ্যালয়ের সমাজ জীবনের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই জন্যই বুনিয়াদী শিক্ষা আধুনিক শিক্ষাসম্মত।

ইহার দোষগুণ

ইহার গুণ বা উপকারিতা

(১) বহু দিন ধরিয়া প্রাথমিক হইতে উচ্চস্তর পর্য্যন্ত আমাদের বিদ্যালয়-গুলিতে কেবল পুঁথিগত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। ইহার ফলে ছাত্রগণ সম্পূর্ণ অবাস্তব ও শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা প্রধানতঃ চাকুরিজীবী তৈয়ার হইতেছে। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় একটা হস্তশিল্পকে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত করিয়া এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা হস্তশিল্প-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই সর্বপ্রধান দোষের প্রতিকারের প্রস্তাব করা হইয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্প-কাজকে আমদানী করায় মামুলি শিক্ষার একঘেয়েমি নষ্ট হইয়াছে। এই শিক্ষায় অভিজ্ঞতার দুইটি দিক—বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক দিক—এই দুইয়েরই স্ব স্ব স্তরে স্বয়ংমূল্য দান করায় অভিজ্ঞতা অর্জন সুসমঞ্জস হইয়াছে। শিশু কেবল ইহাতে আক্ষরিক জ্ঞান লাভ করে না, সে তাহার কর্মকুশলতা ও বুদ্ধিকে গঠনমূলক কাজে প্রয়োগ করিয়া **প্রকৃত শিক্ষা** লাভ করে। **এই শিক্ষার ফলে ছাত্রছাত্রীগণ শ্রমের মূল্য দিতে শিক্ষা করিবে এবং বর্তমানে যে কায়িক ও মানসিক শ্রমকারীদের মধ্যে একটা ব্যবধান রহিয়াছে সেই ব্যবধান অন্তর্হিত হইবে।** তাহারা অধিকতর কাজের লোক হইবে, এবং শ্রমকে যথার্থ মর্যাদা দান করিতে শিক্ষা করিবে।

(২) যাহারা উচ্চ শিক্ষালাভের উপযুক্ত নহে, বা যাহাদের সে সুযোগ-সুবিধা নাই, তাহারা পরে এই হস্তশিল্পের সাহায্যে জীবিকার্জন করিতে পারিবে এবং ফলে আমাদের দেশের বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান হইলেও কম কথা নহে। **তাহা ছাড়া এইরূপ শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাকে যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিবেশন করার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মীবৃন্দের কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।** যাহাদের পক্ষে কোন হস্ত-শিল্পকে বৃত্তিহিসাবে অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না, তাহারাও ইহার দ্বারা অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৩) বিভিন্ন হস্তশিল্পে পারদর্শী, সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকগুলি কর্মী তৈয়ার হওয়ার ফলে দেশের নষ্ট শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার-কার্যে যথেষ্ট সাহায্য

হইবে এবং ইহার দ্বারা দেশে শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার এবং সাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে।

(৪) এত অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরা কোন বিক্রয়-যোগ্য শিল্পদ্রব্য তৈয়ার করিতে পারিবে কি না, সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু প্রথম ২।৩ বৎসর তাহা সম্ভব না হইলেও ১০।১১ বৎসরের পর ছেলে-মেয়েরা শিক্ষকের নেতৃত্বাধীনে ছোট ছোট বিক্রয়যোগ্য শিল্পদ্রব্য তৈয়ার করিতে পারিবে। অনেক মিশনারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ তাহা করিতেছে। ইহা বিক্রয় করিয়া যে আয় হয় তাহা হইতে বিদ্যালয়-পরিচালনার আংশিক খরচ নির্বাহ করিতে পারিলেও আমাদের দরিদ্র দেশে অবৈতনিক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-প্রচলনের পথ অনেকটা সুগম হইবে। তবে ছাত্রগণের স্বোপার্জিত এই অর্থ কেবল বিদ্যালয়-পরিচালনার জন্য খরচ না করিয়া, ইহার এক অংশ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে কোন পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার জন্য ব্যয় করিলে তাহাদের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইবে এবং তাহারা শিল্প-কাজে অধিকতর উৎসাহ পাইবে।

(৫) বাস্তব-জীবনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শিক্ষাদান এবং নাগরিক কর্তব্য শিক্ষাদান, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার আর দুইটি প্রধান অভাব দূর করিবে। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজে শিশুকে তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বুনিয়াদী শিক্ষাই শিশুর সেই চাহিদাকে মর্যাদা দিতে সক্ষম। এই শিক্ষার ফলেই শিশু সমাজ-সেবী হইয়া উঠিবে এবং কোন প্রকার কায়িক পরিশ্রমকে সে ঘৃণা করিবে না। পায়খানা পরিষ্কার করাকেও সে সম্মানজনক কাজ বলিয়া মনে করিবে।

(৬) বিদ্যালয়ের ভারতীয় ও নৈতিক আবহাওয়া ছাত্রগণের চরিত্র-গঠনে সাহায্য করিবে। এই শিক্ষার ফলে একটি শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ গড়িয়া উঠিবে।

ইহার কতকগুলি দোষ বা অভাব

(১) গ্রাম্য পিতামাতার উপর শিশুকে প্রথম ২।১ বৎসর শিক্ষাদানের ভারও দেওয়া যায় না। অতএব শিশুকে ৭ বৎসর পর্যান্ত পিতামাতার অধীন বাড়ীতে রাখা শিশুর পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না।

(২) শিক্ষা-জীবনের আরম্ভ হইতেই শিশুকে বৃত্তি হিসাবে কোন শিল্প-কাজ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে; ইহাতে কোন শিল্প-কাজ শিক্ষার অর্ধেক আনন্দ ও উপকারিতা নষ্ট হইবে। পক্ষান্তরে শিশু কোনরূপ

শিল্পকাজ করিতে আগ্রহ প্রকাশ নাও করিতে পারে। তাহা হইলে প্রথম ২।৩ বৎসর নানা শিক্ষামূলক হাতের কাজ শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহাদের মানসিক বিকাশের অধিকতর সাহায্য করা হইবে এবং পরে তাহারা প্রকৃত শিল্পকাজের জন্যও তৈয়ার হইবে।

গান্ধীজী ১৯৩৭ সনে বুনিয়াদী শিক্ষার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্তন তিনি ১৯৪৫ সনে করেন। তিনি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের জন্য শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন। তাঁহার পরিকল্পনা মত শিক্ষা-ব্যবস্থা নিম্নলিখিতরূপে হইবে।

১। বয়স্কদের শিক্ষা—সকল বয়সের বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য শিক্ষা।

২। ৭ বৎসরের নীচের শিশুদের জন্য পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা।

৩। ৭ হইতে ১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা।

৪। ১৪ বৎসরের উপরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা।

ইহার পরে পরবর্তী কালে গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পরিকল্পনাও করা হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৩৭ সনের পরিকল্পনার পর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিধি বিশেষ ভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং নূতন ভাবী সমাজ-ব্যবস্থাকে বাস্তবে পরিণত করিবার মতই শিক্ষা-পরিকল্পনাসমূহ রচিত হইয়াছে।

(৩) অনেক শিক্ষাবিদ্ বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার বয়স-সীমার অন্তর্গত শিশুরা শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনাত্মক কাজ করিয়া স্বাবলম্বী হইবে, এইরূপ আশা করা যায় না। তাহার প্রথম কারণ, শিশুদের উৎপাদন উচ্চ শ্রেণীর হইবে না, ফলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুদের উৎপাদিত জিনিষসমূহ ক্রেতার অভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু গান্ধীজী এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের শিশুরা অর্থাৎ **ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা তাহাদের প্রচেষ্টায় তাহাদের বিদ্যালয়ে যাহা কিছু উৎপাদন করিবে, তাহাই সরকার নির্দিষ্ট হারে কিনিয়া লইবে**।* তাহা যদি হয় তাহা হইলে স্বাবলম্বনের দিক্ হইতে কোন ত্রুটি থাকিবে না বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় কারণ, শিশুরা প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন করিতে পারিবে না। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রথম দিকে শিশুদের শিল্পকার্যে দক্ষতা অর্জন করিতেই সময় ব্যয়িত হয়, কিন্তু

* Every school can be make self-supporting the conditions being that the State takes over the manufactures of these schools (Harijan, 31 July 1937)

পরে শিশুদের বয়স যখন ১০।১১ হয়, তখন তাহারা অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে আরব্ধ কর্ম শেষ করে। তৃতীয় কারণ, বিদ্যালয়ের প্রথম কয়েকটি শ্রেণীতে শিশুসংখ্যা বেশী থাকে, এবং যে সময়ে ছাত্রছাত্রীরা শিল্পকার্যের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত হয়, তখনই তাহারা বিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া যায়, ফলে সমগ্র বিদ্যালয়ের দিক হইতে উৎপাদনের হার কমিয়া আসে। এ অভিযোগ অতিমাত্রায় সত্য এবং যত দিন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত এই অভিযোগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। চতুর্থ কারণ হইতেছে, সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা বুনিয়াদী শিক্ষায় ৭ বৎসর ধার্য হইয়াছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির সুপারিশে বুনিয়াদী শিক্ষা ৮ বৎসর ধরিয়া ব্যাপ্ত হয়। আট বৎসর কালের মধ্যেও দুইটি ভাগ দেখা যায়, ৬ হইতে ১১ এবং ১১ হইতে ১৪। সময়কে এইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত করার ফলে কার্যের ধারা পরিবর্তিত হয়, এবং নানা কারণে স্বাবলম্বন ব্যাহত হয়। কিন্তু যদি বুনিয়াদী শিক্ষায় ৭ বৎসর ব্যাপী অখণ্ডতা থাকে তাহা হইলে স্বাবলম্বনের দিক হইতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

(৪) কোন হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের প্রস্তাব সম্পূর্ণ শিক্ষা-বিজ্ঞানানুমোদিত হইলেও এই প্রণালীতে কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান-দান কার্যতঃ সম্ভব নহে। কোন শিল্পের সহিত বিভিন্ন বিষয়ের সম্পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, তাহা করিবার চেষ্টা করিলে শিক্ষাকার্য অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম হইয়া পড়িবে এবং সময়ের অপচয় হইবে। কোন শিল্পের সহিত বিভিন্ন বিষয়ের যতটুকু স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে এবং তাহা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন, সেই শিল্পশিক্ষার সময়ে তাহাদের ততটুকু জ্ঞান দিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহার অতিরিক্ত বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা-দানের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহা না করিলে, সেই সকল বিষয়ে ছাত্রের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

(৫) ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থার অভাব এই পরিকল্পনার আর একটা প্রধান দোষ বলিতে হইবে। প্রাচ্যের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের লোক তাহাদের ধর্মানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ। এই দেশে ঈশ্বরবিহীন শিক্ষাদানের ফল আজ আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। শিক্ষা-জীবনের প্রারম্ভেই কোমলমতি শিশুগণের হৃদয়ে ধর্মের বীজ বপন না করিলে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে আমাদের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ন্যায় ধর্মের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িবে

এবং দেশ হইতে দুর্নীতি, অনাচার কখনও দূর হইবে না। সুতরাং শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিশুগণকে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় যে সব মানবোচিত গুণের বিকাশের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতেই শিশুর মঙ্গল হইবে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধর্মমত না শিক্ষা দিবার ফলে শিশুর সামগ্রিক বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে না।

(৬) দৈনিক তিন ঘণ্টার উপরে শিল্পশিক্ষা শিশুদের পক্ষে অনুপযোগী বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু শিল্পশিক্ষা বলিতে শুধু শারীরিক পরিশ্রমই তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকে না। শিল্পশিক্ষার ভিত্তিতে যাহা কিছু শিক্ষা তাহা ঐ সময়ের মধ্যেই শিক্ষা দেওয়া হইবে। অতএব শিক্ষাদানের সময় শিল্পশিক্ষার জন্য অনুপযুক্ত নয়।

(৭) এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু জাকির হোসেন কমিটির মতে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার ফলে শিশুরা কর্মে অধিকতর দক্ষতা লাভ করিবে এবং তাহাতে দেশের শিল্পোন্নতি আরও অধিকতর পরিমাণে হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৮) বুনিয়াদি শিক্ষার সমালোচকগণ মনে করেন যে, এই শিক্ষার ফলে মেধাবী ছেলে বা মেয়ে তৈয়ারী হইবে না। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে এই ধারণা ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় শারীরিক ও মানসিক কাজের একটা সুগম সমন্বয়ের ব্যবস্থার ইঙ্গিত আছে। জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টে পরিষ্কার ভাবে লিখিত আছে যে, কৃষ্টিগত ও শিক্ষাগত উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করিয়া অর্থকরী উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা বুনিয়াদী শিক্ষায় কখনই করা হইবে না। অতএব এই শিক্ষার ফলে মেধাবী ছেলে বা মেয়ে তৈয়ারী হইবে না বলিয়া যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা ভুল।

বুনিয়াদী শিক্ষার সাম্প্রতিক পরিবর্ধন

(১) ভারতীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টকে মূলতঃ ভিত্তি করিয়া একটি সর্বভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা নির্ধারিত করিয়াছেন।

(২) অন্ন, বস্ত্র ও আবাস সম্পর্কিত শিল্প ছাড়াও যে কোন স্থানীয় শিল্প বুনিয়াদী শিক্ষায় মুখ্য শিল্পের মর্যাদা পাইবে।

(৩) গান্ধীজী প্রথমে গ্রামাঞ্চলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারে পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার সহরেও হইবে এবং প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয় সহরেও স্থাপিত হইবে।

(৪) মুদালিয়ার কমিশন অনুযায়ী বর্তমান সময়ে সকল স্তরের মাধ্যমিক শিক্ষা-বুনিয়াদী শিক্ষা অনুযায়ী পরিবর্তিত রূপ ধারণ করিতেছে।

(৫) কোন কোন রাজ্যে দুই বৎসরের জন্য উত্তর বুনিয়াদী এবং তিন বৎসরের উত্তম বুনিয়াদী (স্নাতক স্তরে) শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চস্তরের স্থানীয় পল্লী শিল্প, পল্লী সংস্কৃতি, পল্লী স্বাস্থ্য, মানবধর্ম প্রভৃতি শিক্ষা-সূচীর অন্তর্ভুক্ত।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য ই. মরগান ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন। এই গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সহরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাগত যোগসূত্র থাকিবে। পল্লী অধ্যুষিত ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রাম্য অর্থনীতি ও সংস্কৃতিগত চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার পাঠ্যসূচী তৈয়ারী করিবে।

(৭) ৬ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার পর শিক্ষার যে বিভিন্ন ধারা অবলম্বন করিবার প্রস্তাব ছিল, তাহা এক্ষণে পরিবর্তিত হইয়া প্রথমে আট বৎসর ব্যাপী শিক্ষা সমাপনের পর বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। উচ্চস্তরের মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা সার্বর্থসাধক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা সামর্থ্য অনুসারে যোগদান করিতে পারিবে।

(৮) কোন কোন স্থানে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র ভূদান-কর্মীদের সহিত গ্রামোন্নয়ন কার্যে ব্রতী হইয়াছেন।

নঈ তালিম

বুনিয়াদী শিক্ষা ক্রমে বিস্তৃততর অর্থে প্রকাশিত হয়। জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট বাহির হইবার পর ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী তদানীন্তন কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে (১৯৩৭ সনের নির্বাচনের পরে) অবশ্য বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, উড়িষ্যা, বোম্বাই ইত্যাদি প্রদেশে বহুসংখ্যক বুনিয়াদী বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকদের শিক্ষণকেন্দ্রও খোলা হইয়া থাকে। ইহার পর ভারতবর্ষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইবার পর বুনিয়াদী শিক্ষা বিভিন্ন প্রদেশে অবহেলিত হইতে থাকে। গান্ধীজী এবং অন্যান্য দেশনেতাগণকে জেলে প্রেরণ করা হয়। জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, শিক্ষা শুধু শিশুদের দিলে চলিবে না, শিক্ষা শিশুদের পিতামাতা অভিভাবকদের প্রতিও প্রসারিত হইবে, শিক্ষা প্রতি গৃহে অনুপ্রবেশ করিবে এবং শিক্ষা হইবে প্রকৃত পক্ষে জীবনের জন্য শিক্ষা।

এই সময় হইতেই বুনিয়াদী শিক্ষার পরিধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অর্থাৎ সকল স্তরের লোকই যাহাতে শিক্ষার সুবিধা লাভ করিতে পারে, সেই দিকে নঈ তালিমের লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হয়। ১৯৪৫ সনে সেবাগ্রামে গান্ধীজী কর্মীদের লইয়া এক শিক্ষা সম্বন্ধীয় সভা আহ্বান করেন এবং তিনি ঐ সভায় বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু ৭ হইতে ১৪ বৎসরের বালক-বালিকাদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে না, শিশুর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সকল স্তরেই বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। এই সভাতে জীবনের চারি স্তরের শিক্ষার পরিকল্পনা করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়; যথা—(১) বয়স্কদের জন্য শিক্ষা, (২) পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা, ৭ বৎসর বয়সের নিম্ন বয়স্ক শিশুদের জন্ত। (৩) বুনিয়াদী শিক্ষা ৭ হইতে ১৪ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য। (৪) উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা—বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক-বালিকাদের জন্য শিক্ষা এবং আমরা এইখানেই এই চারিটি স্তরের শিক্ষার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখিব।

বয়স্কদের জন্য শিক্ষা

নঈ তালিম শিক্ষায় শিক্ষা প্রসারিত হইবে নিরক্ষর বয়স্কদের জন্যও। নঈ তালিমের প্রথম স্তরই হইবে বয়স্কদের জন্য, যাহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া শিশুদের শিক্ষা দিবার তাৎপর্য বুঝিতে পারিবে। তাহারা শিক্ষালাভ করিয়া সুন্দর সমাজও গঠন করিতে সক্ষম হইবে।

পূর্ব-বুনিয়াদী—এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় ৭ বৎসরের নীচের শিশুরা পূর্ব-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আসিবে। শিশুরা বিদ্যালয়ে হাটিয়া আসিবার মত কর্মক্ষমতা লাভ করিলেই তাহারা গৃহ হইতে বিদ্যালয়ে আসিবে। বিদ্যালয়ে

শিক্ষিকার, গৃহের পিতামাতা অভিভাবকদের ও সমাজের সাহায্যে শিশুর ব্যক্তিগত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা—জাকির হোসেন কমিটি রচিত পাঠ্যসূচীর কিছুটা রদবদল করা হয়। সাত হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালক-বালিকাদের শিক্ষা পূর্ব-বুনিয়াদী স্তরের উপর ভিত্তি করিয়াই হইবে। নিম্নে এই স্তরের শিক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হইল।

(১) নিম্নলিখিত শিল্পগুলির মধ্যে একটি শিল্প শিক্ষা করিতে হইবে, যথা—(ক) কৃষিকাজ ও বাগান, (খ) কাঠের কাজ—গৃহ-নির্মাণ ও মেরামত কাজ এবং (গ) কাতাই ও বস্ত্র-বয়ন।

(২) অন্ন, বস্ত্র ও আবাসের সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের চেষ্টা।

(৩) সুনাগরিক হইবার জন্য ট্রেনিং—গৃহে, বিদ্যালয়ে, গ্রামে, দেশে এবং বিশ্বে। ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানদান।

(৪) পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের উপযোগী অভ্যাস গঠন, দক্ষতা অর্জন এবং মনোভাবাধিকারী করা।

(৫) সাধারণ বিজ্ঞান এবং অঙ্কশাস্ত্র

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন সমিতি Assesment Committee on Basic Education) পরে সুপারিশ করেন যে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে, কারণ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে, অতএব উহার সঙ্গে সমতা রক্ষার জন্য ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ইংরাজী শিক্ষাদান করা যুক্তিসঙ্গত। তাহা ছাড়া যেখানে হিন্দি ভাষা আঞ্চলিক ভাষা নয়, সেইখানে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে হিন্দি শিক্ষা আবশ্যিক করিতে হইবে। এই দুইটি সুপারিশ বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন সমিতি করিয়াছেন।

উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা—১৫ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত কিশোর কিশোরীরা উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করিবে। উত্তর-বুনিয়াদী-শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত রূপ গৃহীত হয়।

(১) উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে।

(২) উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য বুনিয়াদী শিক্ষার মতই হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুসম বিকাশ হইবে।

(৩) উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষার মতই শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে হইবে এই নীতি অনুসারে চলিবে।

(৪) উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষায় বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার সমাগম থাকিবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ধরণের বিষয়বস্তু অনুসারে শিক্ষার কাল নিরূপিত হইবে।

(৫) উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার কাজ এইরূপ ভাবে সংগঠিত হইবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীগণ শিক্ষা গ্রহণ কাজে তাহাদের পড়ালেখার জন্য যে টাকা খরচ হইবে তাহা উপার্জন করিতে পারে।

(৬) উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার মাধ্যম হইবে আঞ্চলিক ভাষা।

উত্তর-বুনিয়াদীর জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সেই সমিতি ১৪ প্রকার কাজের সম্পর্কে সুপারিশ করেন। এই গুলিতে ছাত্রছাত্রীগণ বিশিষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। বিভিন্ন ধরণের কাজগুলি হইতেছে, নিম্নরূপ যথা—কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং বাণিজ্য, বিদ্যুৎ, শিক্ষাদান, মুদ্রণ, সংবাদ পরিবেশন, চারুকলা, শিল্প, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ধাতুবিদ্যা, কারিগরীবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, ও যন্ত্রবিজ্ঞান। উত্তর-বুনিয়াদী ক্ষেত্রের উৎপাদনে স্বাবলম্বন, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের স্বাবলম্বনের মত নয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিল্প-শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বন লাভ, কিন্তু উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা স্বাবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষা। শ্রীবিনোবা ভাবে এইভাবে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়—বুনিয়াদী শিক্ষার সঙ্গে কালক্রমে গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত হইয়া পড়ে। ১৯৪৯ সনে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিবৃতি প্রকাশিত হয়। কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে গ্রাম্যবিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে Dr. Arthur E. Morgan বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত কর্মসূচী রচনা করেন। তিনি বলেন যে ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ গ্রামে বাস করে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাহাদের ছাত্র সংগ্রহ করে গ্রাম হইতে, কিন্তু সেই ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিয়া পুনরায় গ্রামের কর্মক্ষেত্রে ফেরৎ পাঠায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আসে গ্রাম হইতে, কিন্তু এই উপকারের প্রত্যুপকার হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন সাহায্যই গ্রামে যাইয়া পৌঁছায় না। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদেশী প্যাটার্ণে রচিত এবং স্বদেশ ভিত্তিকে নয়। ইহা অবশ্য কাম্য নয়, কিন্তু তবুও ইহার স্বপক্ষে এই কথা বলা যাইতে পারে যে সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা একত্ববোধ রহিয়াছে, অতএব বিদেশী

বলিয়া কিছু থাকিতে পারেনা কিন্তু একথাও ঠিক যে, যে পন্থা শিক্ষিত লোককে শতকরা ৮০।৮৫ জন লোকের সুখ সুবিধা অর্জনের দিকে, সুন্দর জীবন যাপনের দিকে বিমুখ করিয়া দেয় সেই পন্থা কোন ক্রমেই প্রশংসনীয় নয়। মানব সভ্যতার ইতিহাস পরিক্রমা করিলে দেখা যায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সভ্যতার অভ্যুদয় ও বিলোপ সাধন হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে যে শহরগুলি গ্রামগুলিকে নিঃশেষ করিয়া গ্রহণ করিয়াই গিয়াছে, কিন্তু গ্রামকে তাহার পরিবর্তে কিছু দেয় নাই। ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি ইহার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। যদি কুড়িটি ছাত্র গ্রাম হইতে শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, তবে একটি ছাত্রও তাহার মধ্যে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেনা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন সব ছাত্রকে গ্রামের জন্য অকেজো করিয়া দেয়।

আমাদের দেশে গ্রামের বর্তমান অবস্থা কি? গ্রামগুলির পটভূমিকা সুন্দর, কিন্তু বেশীর ভাগ গ্রামে মাটির ঘর, অপরিচ্ছন্ন মেঝে, ভগ্ন দেওয়াল, দরজা জানালার বালাই নাই আর বড় বড় উন্মুক্ত নালা। গ্রামে দারিদ্র্য, তাহার উপর আছে নানারকম রোগ। দরিদ্র গ্রামবাসীদের শোষণ করিবার জন্য আছে মহাজন এবং গ্রামের কতিপয় বর্দ্ধিষ্ণু লোক। গ্রামের শতকরা ১০ জন লোকের কম সাক্ষর, আর তাহা ছাড়া, গ্রামের যাহা গড়পড়তা উৎপাদন তাহা অন্যান্য দেশের গড়পড়তা উৎপাদনের তুলনায় দশভাগের একভাগ।

বর্তমান ভারতের গ্রামের তুলনায় একটি আদর্শ গ্রাম কিরূপ হইবে, তাহার ছবি একবার আমরা অঙ্কন করিতে পারি।

গ্রাম হইবে সমৃদ্ধিপূর্ণ। প্রাচীন কালের পদ্ধতি অনুসারে গ্রামে উৎপাদন চলিবে না। বর্তমান যান্ত্রিক পদ্ধতির সবটুকু সুবিধাই কৃষি কাজে প্রয়োগ করিতে হইবে। গ্রামের লোকরা শুধু কৃষি কাজই করিবে না. বহু প্রকারের উৎপাদনে তাহারা অংশ গ্রহণ করিবে। দেশের শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বিশেষ অংশ স্থাপিত হইবে গ্রামে। গ্রামে চলাচলের জন্য ভাল রাস্তা তৈয়ারী করিতে হইবে, এবং পরিবহন ব্যবস্থাও সুষ্ঠু হইবে, পানীয় জলের সরবরাহও উত্তমরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয় ময়লা নিষ্কাশনেরও উত্তম ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। পানীয় জলও মল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যদি ভালরূপ হয়, তাহা হইলে গ্রামে ম্যালেরিয়া, আমাশয়, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যধিগুলি

আর গ্রাম্যজীবনকে পর্যুদস্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু গ্রামের এইরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়া স্বাস্থ্য সম্মত ও অর্থনৈতিক উন্নতি আনয়ন করিতে হইলে, সাথে সাথে সভ্যতা, কৃষ্টি ও গ্রাম্য লোকদের চরিত্রেরও পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। অর্থনৈতিক, কৃষ্টিগত ও নৈতিক শিক্ষা পাশাপাশি চলিবে তবেই ঐরূপ গ্রাম্য জীবন লাভ করার সুফল পাইতে পারা যাইবে।

আর্থার মর্গান আরও বলেন যে ভারতের গ্রামগুলির উপযুক্ত স্তরে না উঠিবার কারণ গ্রাম্য লোকদের বুদ্ধির অভাব, কাঁচামালের অভাব বা বিদেশী শক্তির কুক্ষিগত হইয়া থাকা নয়, উহার কারণ হইতেছে মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও ভাবের অভাব। যদি গ্রামীন শিক্ষা প্রাথমিক স্তর লইতে মহাবিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত গ্রামীন প্রয়োজনেই লাগে, তাহা হইলেই তাহার ফলে আমরা আদর্শ গ্রাম্যজীবন লাভ করিতে পারিব।

নানা কারণে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না, যাহাতে গ্রামীন ব্যবস্থার উন্নতি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শহর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছে, গ্রামের দিকে দৃষ্টি নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভিত্তি বিজাতীয় কৃষ্টি, দেশীয় কৃষ্টির উপর উহা স্থাপিত নয়। আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গেলে যেমন পৃথিবীর কৃষ্টি ও সভ্যতার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, সেইরূপ নিজের দেশের ঐতিহ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ডিগ্রী দানের দিকেই লক্ষ্য, ছাত্রদের মধ্যে কর্মে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিতে সক্ষম হইতেছে না। হাতেকলমে কাজ করিবার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেয় না। পুস্তকভিত্তিক শিক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনুসরণ করিয়া থাকে।

আমরা কি উপায় অবলম্বন করিয়া ভারতের গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধ করিতে পারি, তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। গ্রাম হইতে মানুষ শহরে কেন যায়? মানুষ যায় জীবিকাসন্ধান ও আধুনিক জীবিকার সুখ সুবিধার সন্ধানের জন্য। যদি গ্রামকে শহরে না পরিণত করিয়া গ্রামগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুন্দর জীবন যাপনের উপযোগী করিয়া তোলা যায়, তবে আর মানুষ শহরমুখী হইবে না। শিক্ষার মাধ্যমেই ঐ লক্ষ্যবস্তুতে আমরা পৌঁছিতে পারি। নিম্নস্তরের শিক্ষা ও উচ্চস্তরের শিক্ষা উভয় শিক্ষার ব্যবস্থাই যদি গ্রামে থাকে তবে আর মানুষ শহরে যাইতে চাহিবে কেন। মানুষ সর্ব-

স্তরে গ্রামে যে শিক্ষা পাইবে, সেই শিক্ষাই নিয়োজিত হইবে গ্রামের কল্যাণে। বলা বাহুল্য গ্রাম সমৃদ্ধ হইবে, বাসোপযোগী হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই রাধাকৃষ্ণণ কমিশন একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। মর্গান সাহেব এই পরিকল্পনাটিকে বিশদ করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনাতে গ্রামীন শিক্ষার একটি সামগ্রিক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম আট বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষা, তার পরের তিন বৎসর উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা, বা মাধ্যমিক শিক্ষা, পরবর্তী তিন বৎসর কলেজীয় শিক্ষা এবং তাহার পরের দুই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা।

গ্রামীন উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে বিভিন্ন স্তরের বুনিয়াদী শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। গ্রামের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা কি নীতিতে চলিয়া থাকে তাহা আমরা জানি। আমরা এইখানে দেখিব কিভাবে গ্রামীন উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ভারতীয় গ্রামগুলি সমৃদ্ধপূর্ণ করিতে পারিবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইবে আবাসিক। ঐরূপ একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৫০ হইলে, ঐ বিদ্যালয়ে ৪০ হইতে ৬০ একর জমি থাকিবে। দশ পনের একর বিদ্যালয়গৃহ, খেলার মাঠ, ছাত্রাবাস শিক্ষকদের ঘরবাড়ী ইত্যাদির জন্য আলাদা করিয়া রাখিলেও বাকী জমি কৃষি, শিল্প, কারখানা, গোচারণ ভূমি ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। বিদ্যালয় অঞ্চলটি একটি আধুনিক গ্রামের আদর্শে রচনা করিতে হইবে। এই রচনা কার্যে ছাত্রগণই শিক্ষকের উপদেশ মত কার্য করিবে। শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই কার্য করিবেন। এ বিদ্যালয়—গ্রাম রচনার কালে ছাত্র শিক্ষক, যতদিন না উহা সংগঠিত হয়, ততদিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ের গ্রামে বাস করিতে পারিবেন।

বিদ্যালয়ের জীবন হইবে একটি উৎকৃষ্ট গ্রামে জীবন যাপনের আদর্শে। তবে তাহার মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম থাকিবে। বিদ্যালয় জীবনের অধিক সময় ব্যয়িত হইবে পঠনে এবং বাকী অর্ধেক সময় ব্যয়িত হইবে কৃষিতে, দারুশিল্পে, আসবাবপত্র তৈরীতে, গৃহ নির্মাণে, বয়নে, সাফাইতে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে। বর্তমান যুগের কারখানায় উৎপাদন সম্বন্ধেও ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিবে এবং বিক্রয়ের জন্য তাহারা উৎপাদনও করিবে।

উত্তর বুনিয়াদীর পরের স্তর গ্রামীন কলেজ। গ্রামীন কলেজ বা মহাবিদ্যালয় গ্রামকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবে। গ্রামগুলিতে যদি বহু

উত্তর বুনিয়াদী-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ঐখান হইতে যদি বহু ছাত্র পাঠ শেষ করে অর্থাৎ গ্রাম সংগঠনে দক্ষতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আরও উচ্চশিক্ষার স্তরে লওয়া যাইবার প্রয়োজন আছে। তাহাদের শিক্ষা যে উত্তর বুনিয়াদী স্তরেই শেষ হইয়া যাইবে এমন নহে। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক প্রয়োজন, গ্রামীন শিল্প-কারখানা ইত্যাদির জন্য পরিচালক প্রয়োজন, নানারকম কারিগরী কাজ করিবার জন্য দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন—এই সব পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? গ্রামীন কলেজ বা মহাবিদ্যালয়গুলি হইতে শিক্ষালাভ করিয়াই ছাত্রগণ গ্রামের নানা কাজের জন্য গড়িয়া উঠিবে। যেমন উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি, বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি হইতে ছাত্র সংগ্রহ করে, সেইরূপ গ্রামীন কলেজগুলি উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে ছাত্র সংগ্রহ করিবে। ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব বিষয়ে আরও বেশী জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ঔৎসুক্য মিটাইতে পারিবে ঐ কলেজ-গুলিতেই। কলেজের পাঠ্যক্রম হইবে ভারতের গ্রামের সমস্ত প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া। উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মত গ্রামীন কলেজের ছাত্রগণ অর্ধেক সময় পঠনে ব্যয় করিবে, আর বাকী অর্ধেক সময় ব্যয় করিবে নানাবিধ ব্যবহারমূলক কাজে।

গ্রামীন শিক্ষার উন্নতির জন্য একস্তরের শিক্ষার পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। যেমন উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য কলেজীয় শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, সেইরূপ কলেজীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। একটি গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের কলেজগুলিতে আড়াই হাজারের বেশী ছাত্র থাকিবে না। প্রত্যেক কলেজ তিন শতের অনধিক ছাত্র থাকিবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিগত শিক্ষাও ব্যবহারিক শিক্ষার সমান মর্যাদা দেওয়া হইবে। কতকগুলি মূল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে, আর তাহা ছাড়া গ্রামগুলির প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হইবে। মূল বিষয়গুলি হইবে, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, রসায়ণ, পদার্থ বিদ্যা, জীববিদ্যা, দেহ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান। শিল্প বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে যন্ত্র সমূহের উন্নতি সম্বন্ধে জানিতে হইবে। ছোট ছোট শিল্প প্রচেষ্টাগুলি কি করিয়া কাঁচামাল কিনিবে, বিক্রয় করিবে, শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা করিবে, ব্যবসা পরিচালনা করিবে,

টাকা পয়সার ব্যবস্থা করিবে ইত্যাদি সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামীন বিশ্ববিগ্রায়ের ছাত্রগণ প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষা কিভাবে পরিচালনা করিবে, তাহা শিক্ষা করিবে। কৃষিবিগ্রার ক্ষেত্রে ছাত্রগণ উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদি সম্বন্ধে শিখিবে। শিক্ষার ব্যবস্থা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম ও উপার্জনের ব্যবস্থা যদি গ্রামেই করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে গ্রাম সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বিশ্ববিগ্রালয় কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর সেবাগ্রামে গ্রামীন বিশ্ববিগ্রালয় স্থাপন সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়। একটি সমিতি স্থাপিত হয় এবং ঐ সমিতি সেবাগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য প্রাথমিক পরিকল্পনা করেন। ঐ সমিতি বিশ্ববিগ্রালয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সাতটি কর্মের ব্যবস্থা করেন, যথা কৃষি ও উগ্গান কর্ষণ বিগ্রা (Agriculture and Horticulture) পশুপালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন (Animal Husbandry and Dairying) গ্রামীন যন্ত্রাদি নির্মান বিষয়ক বিগ্রা (Rural Engineering), গ্রামীন শিল্প (Rural Industries), গ্রামীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (Rural Health and Nutrition) গ্রামীন শিল্প বিজ্ঞান (Rural Technology) এবং গ্রামীন শিক্ষা (Rural Education).

১৯৫২ সনে সেবাগ্রামে ১৮টি ছাত্র লইয়া গ্রামীন বিশ্ববিগ্রালয়ের কাজ শুরু হয়। কিছুদিন কাজ চালাবার পর আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান যজ্ঞে ঐ ছাত্র কয়জন নিজেদের নিয়োজিত করে। আচার্য বিনোবা ভাবের কাজকে একটি চলমান গ্রামীন বিশ্ববিগ্রালয়ের কাজ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ভূদান আন্দোলনে ছাত্রগণ অংশ গ্রহণ করিয়া গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছে। নঈ তালিমের তাৎপর্য সমগ্র দেশের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সার্জেণ্ট পরিকল্পনা (Sargent Scheme)

যখনই কোন দেশে কোন যুদ্ধ বা বিপ্লব দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মানুষ চিন্তা করে কেন এমন হইল। হিংসা, দ্বেষ, মারামারি, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি কিসের জন্য, কোন্ সুখ লাভের জন্য—এ প্রশ্ন তখন সকলেরই মনে জাগ্রত হয়। বৈরাগ্যের কথা নয়, কিন্তু যুদ্ধের জন্য যে বিপদের সৃষ্টি হয় তাহাতে কি জাতীয় জীবন পর্যুদস্ত হয় না? তাহা হইলে এইভাবে যুদ্ধের জন্য মানুষ মাতিয়া উঠে কেন? কে, এন, শ্রীবাস্তব বলেন, "It is a product of wrong education and a perverted outlook on life." শিক্ষা ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই ত্রুটি থাকে এবং সেই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া মানুষের জীবন গড়িয়া উঠে বলিয়াই এইরূপ দ্বন্দ্ব, হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি ইত্যাদি দেখা যায় তাই যখন যুদ্ধ দেখা দেয়, তখন শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি নিরসনের জন্য চেষ্টা হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পর, নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর, প্রথম মহাযুদ্ধের পর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্থানে স্থানে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়। জাতীয়তাবোধ হইতে আন্তর্জাতিকতা বোধ যাহাতে মানুষের মনে জাগ্রত হয়, সেই দিক হইতে নানা ভাবে চেষ্টা করা যায়। আমাদের দেশেও শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিবার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টের সেণ্ট্রাল এডভাইসারী বোর্ড অব এডুকেশান্ ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন।* ইহাই 'সার্জেণ্ট পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। সেণ্ট্রাল এডভাইসারী বোর্ড অব এডুকেশন বা কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির শিক্ষাবিদ্গণের প্রচেষ্টায়ই এই শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হয়। সার্জেণ্ট সাহেব ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ও পরে শিক্ষাসচিব ছিলেন। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব থাকার দরুণই. এই

Dr. Radhakrishnan says, "The world charter drawn up by the United Nations at San Francisco provides us with an instrument for peace but the machine cannot work successfully unless the spirit of co-operation is there. The best plan will fail if it has not the backing of social, political and spiritual forces of the people. For this modification of the human spirit for peace and world community, we look to the Educational agencies,"

পরিকল্পনাকে সংক্ষিপ্ততা ও সুবিধার জন্য সার্জেণ্ট পরিকল্পনা বলা হইয়া থাকে। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক শিক্ষার অংশটুকু ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মূল আদর্শ লইয়া রচিত এবং সেই কারণে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার নিকট ইহা বিশেষভাবে ঋণী। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহার পূর্বে ভারতে অনেক বার শিক্ষা-সংস্কার হইয়াছে, অনেকবার শিক্ষা-কামশন বসিয়াছে, কিন্তু শিক্ষা-কমিশনই ভারতের শিক্ষার এইরকম ব্যাপক অনুসন্ধান করিয়া সুপারিশ লিপিবদ্ধ করে নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সুপারিশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন সুপারিশ করেন নাই। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোন সুপারিশ করেন নাই। কিন্তু সার্জেণ্ট পরিকল্পনা প্রতি স্তরের শিক্ষার জন্য একটি সুন্দর পরিকল্পনা সুপারিশ করিয়াছিলেন। ইহাকে জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, কারণ ভারতের শিক্ষার সর্ব স্তরের জন্য এই পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছিল। নার্সারি শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া নিরক্ষর বড়দের শিক্ষা, জড়বুদ্ধিদের শিক্ষা এবং সর্বস্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় হইয়াছিল। সার্জেণ্ট পরিকল্পনার শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত জীবনের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা-ব্যবস্থা। ইহার প্রধান প্রধান বিশেষত্ব :—

নার্সারী বা শিশু-বিদ্যালয়—

৩ হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কতকগুলি শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইবে, কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সার্বজনীন বা বাধ্যতামূলক হইবে না। মেয়েদের উপরই এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ভার দেওয়া হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা (Basic Education)—

এই স্তরে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের জন্য আট বৎসরব্যাপী (ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় ৭ বৎসর) অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে। এই শিক্ষাস্তর পুনঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে। যথা—

(ক) নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা—৬ হইতে ১১ = ৫ বৎসর।

(খ) উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা—১১ হইতে ১৪ = ৩ বৎসর।

নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা (৬—১১)—৫ বৎসর

এই স্তরে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না এবং সমস্ত বিষয় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার ন্যায় ইহাতেও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এক একটী হস্তশিল্প-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু নিম্ন বুনিয়াদী স্তরে উহা বৃত্তি হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে না, কেবল কতকগুলি শিক্ষামূলক হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে। ছাত্রগণের তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া কোন আয় করার প্রস্তাবও সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এই স্তরে ছেলে-মেয়েরা একত্রে শিক্ষা পাইবে। শুধু ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যত বেশী সম্ভব শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের চেষ্টা করিতে হইবে।

এই স্তরের শেষে ছাত্র-ছাত্রীগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে। যাহারা উচ্চ শিক্ষালাভের উপযোগী (শতকরা ২০ জন পর্যন্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে) তাহাদিগকে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। অন্য ছাত্র-ছাত্রীগণ উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষালাভ করিবে।

উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা (১১—১৪)—৩ বৎসর

এই স্তরের শিক্ষার অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে ; মাতৃভাষা ছাড়া সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দিও শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারে। এই স্তরে বৃত্তি হিসাবেই এক একটা হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং ছাত্রদের তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া কিছু আয়ের চেষ্টাও করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে না। এই স্তরে ছেলে-মেয়েদের স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকাও স্বতন্ত্র হইবে। গভর্নমেণ্ট কোন ধর্ম-শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিবে না। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে তাহাদের ছেলেমেয়েদিগকে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারে।

বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপনান্তে বিদ্যালয়েই তাহাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে এবং পরীক্ষার ফল অনুযায়ী সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে।

এই স্তরের শেষে ছাত্রগণ এক একটা হস্তশিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জনের জন্য তৈয়ার হইবে। যাহারা উপযুক্ত বিবেচিত হইবে তাহারা নিম্ন শিল্প-বিদ্যালয়েও যোগ দিতে পারিবে।

উচ্চ বিদ্যালয় (১১—১৭)—৬ বৎসর

নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করার পর যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে কেবল তাহারাই এই বিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারিবে। তবে শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত থাকিলে অন্য ছাত্রকেও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হইবে না। কিন্তু গরীব-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বিনা বেতনে পড়াইবার এবং বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে, যেন অর্থাভাবে তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত না হয়। ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়েও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে; কিন্তু ইংরেজী শিক্ষাও বাধ্যতামূলক হইবে।

উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে। যথা,—জ্ঞানমুখী (Academic) বিদ্যালয় এবং শিল্পমুখী (Technical) বিদ্যালয়।

জ্ঞানমুখী বিদ্যালয়গুলি ছাত্র-ছাত্রীগণকে প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবে। শিল্পমুখী উচ্চ বিদ্যালয়গুলি ছাত্র-ছাত্রীগণকে নানা ব্যবসায় ও শিল্প-কাজের জন্য তৈয়ার করিবে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাহারা উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয়েও যোগ দিতে পারিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (১৭—২০)—৩ বৎসর

বর্তমান ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসর শিক্ষালাভের পর ছাত্র-ছাত্রীগণ ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে পারিবে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের উপযুক্ত, কেবল তাহারাই যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য অর্থসাহায্য করা হইবে।

শিল্প-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এই পরিকল্পনায় শিল্পশিক্ষার উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে এবং এতদুদ্দেশ্যে যথেষ্ট ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

নিম্ন শিল্প-বিদ্যালয় (১৪—১৬ বৎসর)—২ বৎসর। উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা শেষ করিয়াই ছাত্রগণ ইহাতে যোগ দিতে পারিবে এবং দুই বৎসর শিক্ষালাভ করিবে।

শিল্পমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (১১—১৭ বৎসর)—৬ বৎসর। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা শেষ করিয়া ছাত্রগণ উপযুক্ত বিবেচিত হইলে, এই বিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারিবে এবং ছয় বৎসর শিক্ষালাভ করিবে।

উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয় (১৭—২০ বৎসর)—৩ বৎসর। উচ্চ শিল্পমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারিবে এবং ৩ বৎসর শিক্ষালাভ করিবে এবং শিক্ষাশেষে ডিপ্লোমা পাইবে।

শিল্প-শিক্ষার কলেজ (২০—২২ বৎসর)—২ বৎসর। উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রগণ এই শিল্প-শিক্ষার কলেজে যোগ দিতে পারিবে এবং ২ বৎসর শিক্ষালাভ করিবে। শিক্ষাশেষে ছাত্রগণ উচ্চতর ডিপ্লোমা পাইবে।

ট্রেনিং স্কুল ও কলেজ। এই পরিকল্পনানুযায়ী নিম্নবুনিয়াদী স্তর হইতে উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষককে ট্রেনিং পাইতে হইবে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকগণকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং স্কুল ও একটি ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই শিক্ষা-পরিকল্পনাতে শিক্ষকদের জন্য পূর্বের অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষকদের বেতন ২৫৲ টাকা ধার্য হয়—শিক্ষকদের ত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া ঐ শিক্ষা পরিকল্পনা রচিত হয়। কিন্তু বিশেষ সময়কালীন ঐ ব্যবস্থা শিক্ষকদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইলেও ঐ ব্যবস্থা চিরকালের জন্য চলিতে পারে না বলিয়া সার্জেন্ট-পরিকল্পনা শিক্ষকদের বেতনের হার বর্ধিত করিয়াছেন এবং অন্যান্য সুখ-সুবিধারও বন্দোবস্ত করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ট্রেনিংপ্রাপ্ত সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য সর্বনিম্ন ৩০৲—৫০৲ * ও গ্রাজুয়েটদের জন্য ৭০৲—১৫০৲ * টাকার স্কেলে স্থির করা হয়। বাড়ীর বন্দোবস্ত কর্তৃপক্ষ করিবেন, যদি তাহার সংস্থান না করিতে পারেন তবে শিক্ষক

* যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধের পরবর্তীকালীন মুদ্রাস্ফীতির জন্য ঐ বেতনের হার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হার সামান্য কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষকদের বাড়ীভাড়া কিংবা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয় নাই।

শতকরা ১০৲ টাকা মাহিনা বেশী পাইবে। শহরে আহার ও বাসস্থানের খরচ বেশী, অতএব সেই স্থানে মাহিনার শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত আরও বেশী পাওয়া যাইতে পারিবে। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সুব্যবস্থা থাকিবে।

ক্ষীণমেধা ও বিকলাঙ্গ শিশুদের বিদ্যালয়

যে-সকল শিশুকে সাধারণতঃ সম্পূর্ণ বুদ্ধিহীন বা আধপাগলা বলা হয়, কিংবা যাহারা বিকলাঙ্গ—যথা, অন্ধ, বধির, মূক, খঞ্জ প্রভৃতি—তাহাদিগকে সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণ ছেলে-মেয়েদের সহিত শিক্ষা দেওয়া যায় না। তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ সরঞ্জামের সাহায্যে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হয়। তাই এই পরিকল্পনায় তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশেষ স্কুল স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে।

বয়স্ক লোকের শিক্ষা (Adult Education)

আমাদের দেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত না থাকায় শতকরা ৮০।৯০ জন বয়স্ক লোক নিরক্ষর রহিয়া গিয়াছে। তাই তাহাদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে, যেন অল্প সময়ের মধ্যে দেশ হইতে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূর করা যাইতে পারে।

শারীরিক শিক্ষা ও ছাত্রগণের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা

বালক-বালিকাগণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাহাদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি শিক্ষা দিতে, বিদ্যালয়ে কিছু পুষ্টিকর খাবার দিতে, মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ে ডাক্তার কর্তৃক তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতে এবং প্রয়োজনমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। অবশ্য প্রচুর খেলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

সমালোচনা

সার্জেন্ট পরিকল্পনানুযায়ী আট বৎসরব্যাপী অবৈতনিক সার্বজনীন বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অন্ততঃপক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শিক্ষাকে সম্বল করিয়া জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। বয়স্ক লোকদের শিক্ষাদানের প্রস্তাবও কাজে পরিণত করিলে এক পুরুষের মধ্যেই দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর হইবে।

ইহাও ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার ন্যায় প্রাথমিক স্তরে এক হস্তশিল্প-শিক্ষাদানের প্রস্তাব করিয়া বর্তমান পুঁথিগত শিক্ষার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধিকন্তু, শিল্প-শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর স্কুল ও কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া দেশে শিল্প-বাণিজ্য-বিস্তারের এবং তাহার ফলে বর্তমান আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানের কার্যকরী উপায় সরকার নির্ধারণ করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনায় যাহাতে সকল ছাত্রছাত্রী তাহাদের শক্তি ও প্রবৃত্তি প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষালাভ করিতে পারে এবং মেধাবী গরীব ছাত্র-ছাত্রীও অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষালাভে বঞ্চিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে যে সব অনুপযুক্ত ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভের প্রয়াস পাইয়া তাহাদের মূল্যবান সময়, কর্মশক্তি ও অর্থের অপব্যয় করিতেছে তাহা নিবারণের চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ জাতির সকল প্রকার প্রয়োজন এবং ছাত্র-ছাত্রীগণের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হইয়াছে. যেন শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর তাহাদিগকে জীবিকার্জনের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে না হয়। সুতরাং, ইহার ফলে দেশের বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে।

সর্বোপরি সুশিক্ষা দানের জন্য উপযুক্ত, সন্তুষ্টচিত্ত, আগ্রহশীল শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রাথমিক স্তর হইতে উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষককে ট্রেনিং দেওয়ার এবং উচ্চহারে বেতন-দানের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুতর দোষের প্রতিকারের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ইহার মাত্র দুইটি দোষ আছে যাহা ইহাকে শীঘ্র কার্যে পরিণত করার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবে।—

(১) ইহাতে প্রায় সকল ক্ষেত্রে একটু বেশী উচ্চহারে খরচের ব্যবস্থা করায়, এই পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে প্রায় চারি শত কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে এরূপ উচ্চ খরচ-ভার বহন করা কঠিন হইবে। কিন্তু তাহার জন্য এইরূপ একটা জাতির প্রভূত মঙ্গলকারী পরিকল্পনা ত্যাগ করা উচিত নহে। একদিকে কিছু কিছু কাটছাঁট করিয়া খরচ হ্রাস করা যাইবে, অপরদিকে প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের জন্য সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাকে কাজে পরিণত করিতে হইবে।

(২) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক তৈয়ার করার পরই এই পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। তাহা করিলে ইহা কাজে পরিণত করিতে অনেক বিলম্ব হইবে। কিন্তু আমাদের দেশে অবৈতনিক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করিতে এতই বিলম্ব হইয়াছে যে, এখন আর কিছুমাত্র সময় নষ্ট করা যায় না। সুতরাং যতগুলি ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক আছে এবং বহুসংখ্যক ট্রেনিং স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যতবেশী ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক তৈয়ার করা যায়, তাহাদের লইয়াই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে এবং পরে এক এক দল করিয়া সমস্ত শিক্ষককে ট্রেনিং দেওয়া হইবে।

এই দুইটি বাধা দূর করিয়া এই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করিতে পারিলে জাতির ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল আমাদের বালক-বালিকাগণ তাহাদের শক্তি ও প্রয়োজন মত শিক্ষা-লাভের সুযোগ পাইবে, অদূর ভবিষ্যতে দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর হইবে, যুবকগণের বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে, এবং দেশে শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের ফলে দেশ সমৃদ্ধ হইবে।

বস্তুতঃ সার্জেণ্ট পরিকল্পনার ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দর, স্বয়ংসম্পূর্ণ, জাতির অভাব দূরকারী ও প্রভূত হিতকারী শিক্ষা-পরিকল্পনা ইতিপূর্বে আর তৈয়ার হয় নাই। বিদেশী আমলে প্রস্তুত হইলেও ইহাকে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা বলা যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ ও শিশু-শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না—তিনি এমন একটি সমগ্র মানুষ ছিলেন যাঁহার অন্তর্দৃষ্টির কাছে জীবনের সকল সমস্যাই ধরা পড়িয়াছিল। কবি হইয়াও তাই তিনি শিক্ষাব্রতীও ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদর্শ তাঁহার জীবনাদর্শের সঙ্গে বিজড়িত। জীবনকে তিনি ছোট করিয়া দেখেন নাই। একদিকে তিনি ভারতবর্ষের ঔপনিষদীয় চিন্তাধারার অধিকারী, তেমনি আর একদিকে তিনি পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার গুণটুকুতে বিশ্বাসী। এই দুই চিন্তাধারার সমন্বয় তাঁহার আদর্শের মধ্যে পাওয়া যাইবে।

কাজেই রবীন্দ্রনাথ এমন শিক্ষার কথা বলিয়াছেন যে-শিক্ষা শুধু বিশেষ দেশের বা বিশেষ কালের নহে। তাঁহার শিক্ষা একটা সামগ্রিক শিক্ষা। 'বিশ্বকে বিশ্বাত্মাদ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা।' তাঁহার মতে সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা 'মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে।' সমগ্রতার সামঞ্জস্যকেই তিনি আদর্শ বলিয়া জানিতেন; তাই তাঁহার শিক্ষাদর্শও সমগ্রধর্মী। তিনি লিখিয়াছেন, 'প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবণতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে।'

শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বের লেখা—ইহা মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে। বিদেশে রবীন্দ্রনাথ অনেক দেখিয়াছেন, অনেক বিদেশী সাহিত্যও পড়িয়াছেন। কিন্তু যাহা কিছু তিনি বলিয়াছেন তাহা তাঁহার চিন্তাধারার মধ্য দিয়া আসিয়া ভারতীয়ই হইয়াছে। অথচ তাহাতে পাশ্চাত্যের ভালটুকু বাদ পড়ে নাই।

শিশুকে রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা ও পরম স্নেহের পাত্ররূপে দেখিয়াছেন। এজন্য শিশু-চরিত্রকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে একটি সনাতন শিশু ছিল যাহা কখনই মরিয়া যায় নাই। তাই শিশুর স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া কোন শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি শিশুদের জন্য দিতে পারেন নাই। যদিও তিনি স্পষ্টভাবে কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি দিয়া যান নাই, তথাপি শিশুর শিক্ষা কেমন হইবে সে সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাতে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর জন্য যে মর্যাদা বা স্থান দেওয়া হইয়াছে, সে স্থান সবখানি না হইলেও অনেকখানিই দেওয়া হইয়াছে। আবার শিশু-শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করার পিছনে কর্মের যে মর্যাদা শিক্ষায় স্থান পাইয়াছে—তাহারও অনেকখানিই রবীন্দ্র-চিন্তাধারায় আছে। শিশুর স্বভাবকে মানিয়া লইয়া তাহাকে কৃত্রিমতা হইতে মুক্তি দিবার জন্য তিনি বলিতেছেন, 'শিশু যে অ্যালজাব্রা না করিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেজন্য সে কি অপরাধী? তাই সে হতভাগাদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস, তাহাদের আনন্দ অবকাশ, সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে

হইবে? না জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না? আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতা বশতঃ জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দময় করিয়া না তুলিতে পারি, তবু চেষ্টা করিয়া ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দেই। শিশুদের জ্ঞান-শিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল—সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি, সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি।' আরও বলিতেছেন, 'ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরাম কেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। ...বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেওয়ালগুলোর বাইরে।' পড়া মুখস্থ করান রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল না, শিশুর ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতাদ্বারা কর্মে স্থিতি লাভ ঘটুক—ইহাই তিনি ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছেন। পড়া-শুনাদ্বারা মননশক্তিকে বাড়ানই তাঁহার বক্তব্য ছিল না—শিশুর কর্মশক্তি তথা জীবনী-শক্তিকে বাড়াইয়া 'আমি সব কিছু পারব'—শিশুকে এই পাবার সাধনায় নিযুক্ত করানোই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। শিক্ষার আমন্ত্রণ 'চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্য নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়, অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়।'

রবীন্দ্রনাথ একটা নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল শিখাইবার পাঠ্য-তালিকা প্রস্তুত করেন নাই। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সবটুকু কথা জানিলে দেখিব যে, শিশুশিক্ষায় কর্মকে উচ্চ স্থানই দিয়াছেন এবং শিশু সারাদিন ধরিয়া যাহা কিছু করে, খেলে বা কোন কাজ করে—তাহার মধ্য দিয়া শিশুকে অনেক কিছুই শিখান যায় বলিয়াও তিনি জানিতেন।

শিক্ষাকার্যে গুরুশিষ্যের সম্পর্কের উপরেই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। বলিতেছেন, 'শিক্ষা জিনিষটা জৈব, উহা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্য-প্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ

সর্বাগ্রে। ইনকুবেটার যন্ত্রটা সহজ নয় বলেই কৌশল এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে তার বিবরণ শুনতে খুব মস্ত, কিন্তু মুরগির জীবধর্মানুগত ডিম-পাড়াটা সহজ বলেই বেশি কথা জোড়ে না, তবু সেটাই অগ্রগণ্য।' এজন্য রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শকে স্মরণ করিয়াছেন। এখানে কর্তব্য-বোধের দায় নাই। 'গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মধ্যস্থ বলে জেনেছি।' 'শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন। ···উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।' আধুনিক কালে মনস্তত্ত্বসম্মত যত শিক্ষানীতির আমদানী হইতেছে, সেগুলির কোনটাকেই সার্থক করা যাইবে না যদি না যাঁহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহারা মানুষ হিসাবে হৃদয় ও বুদ্ধির সহযোগে পরিপূর্ণতার জীবনের অধিকারী হন, এবং শিশুর সঙ্গে যদি না তাঁহাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

শিক্ষাদাতা যেমন হৃদয় ও ধৈর্য সহযোগে পরিপূর্ণ মানুষ হইবার সাধনা নিবেন, তেমনি 'যে-গুরুর অন্তরে ছেলে মানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য।···যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁহার ভিতরকার আদিম ছেলেটা বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণ-ভরা হাসি।'

শিশুরা যে প্রকৃতির মুক্ত আবহাওয়াতেই অধিক স্ফূর্তি পাইবে, এ কথা যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তাই কবি হইয়াও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সহিত শুধু ভাবের সম্বন্ধই পাতাইতে বলেন নাই, কাজের সম্বন্ধও স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। লিখিতেছেন, 'বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক···অতএব আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। ··যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে.

বেড়া বাঁধিবে। এই ভাবে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের সম্পর্ক নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।'

কেবল ক্লাশের পাঠ্য বইটি বা বই কয়টি পড়িলেই পাঠ্য বই-ও আয়ত্ত হয় না। তাই লিখিতেছেন, আমরা 'কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষা-পুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে।'

শিক্ষার মাধ্যমের উপর রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী জোর দিয়াছেন। 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।' বাহির হইতে যাহা আহরণ করি তাহাকে 'আপন করবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়।' এই মাতৃভাষাকে আমাদের প্রাথমিক স্কুলে স্থাপন করিতে আমাদিগকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। এখনও বিদেশী ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পড়াইবার মোহ আমাদের অনেকের কাটে নাই; নিজের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত।.........আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল।' প্রকাশ করিবার ভাষাও মাতৃভাষা হওয়া প্রয়োজন। 'মনের চিন্তা ও ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য সাধনাই সুস্থ প্রাণের লক্ষণ।'

পরিপূর্ণতার সাধনাই যখন আমাদের শিক্ষার দর্শন, তখন রবীন্দ্রনাথের মতে এই সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ বস্তুকে পুঞ্জীভূত না করা। 'সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা। বহু আয়োজনের জটিলতা বর্বরতা; বস্তুতঃ তাহা গলদ্‌ঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলা জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না, বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে

উজ্জ্বল হয়—এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে—নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা।......আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিতে হইবে ’

শিশুর সঙ্গে পিতামাতার হৃদয়ের সম্পর্ক থাকায় পিতামাতাই শিশুকে শিক্ষাদানে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত—কিন্তু পিতামাতা হইলেই সে উপযুক্ততা সকল সময় থাকে না। অশিক্ষিত বা তথাকথিত শিক্ষা থাকিলেও তাহার সৌন্দর্যচ্যুত যাহারা, তেমন পিতামাতা যেমন শিক্ষাদানের অযোগ্য, তেমনি ধনীর ঘরেও শিশুর শিক্ষা স্বাভাবিক হয় না। সেখানে শিশু ‘সম্পূর্ণরূপে মানব-সন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে।’

শিশুদের শাসন-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মত সম্বন্ধে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখিতেছেন, ‘শিশুদের অপরাধের বিচার শিক্ষকেরা করিবেন না, করিবে শিশুরা নিজেরাই। তাহাদের নির্বাচিত ছেলেরাই গড়িয়া লইল বিচার-সভা। সেখানে শিশুরা ছেলেদের কোনো অন্যায় দেখিলে শিশুরাই অভিযোগ করে, শিশুরাই অপরাধীদের তলব করে এবং শিশু-বিচারকেরাই বিচার করে। কতো বড় স্বায়ত্তশাসন।’

শিশুর জীবনে শ্রদ্ধা আনিতে না পারিলে শিক্ষাদান সম্ভব নহে—তাহাও রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। আমরা যাহা কিছু প্রতিদিন ব্যবহার করি, যাহা লইয়া বাঁচিয়া আছি, সেই অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীকে শ্রদ্ধা করিতেও তিনি বলিয়াছেন। **জীবনের গোড়ায় এই শ্রদ্ধা না থাকিলে শিশুর শিক্ষার প্রতিও কোন শ্রদ্ধা থাকিবে না এবং ক্রমে সে বিপথে যাইতে বাধ্য হইবে।**

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ পুঁথির শিক্ষার কথা বলেন নাই, জ্ঞানের শিক্ষার কথাও বলেন নাই। **তিনি বোধের শিক্ষার কথা বলিয়াছেন—যাহা সম্পূর্ণতার শিক্ষা।** এজন্য তিনি কোন কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির ব্যবস্থা দিতে পারেন নাই, কিন্তু শিক্ষাতত্ত্বটুকু পুরাপুরিই বলিয়া গিয়াছেন। **তাঁহার সে তত্ত্ব মনস্তত্ত্বসম্মত তো বটেই, তাহা ভারতীয় সামগ্রিক জীবনবাদেরও প্রকাশক।**

References

1. History of Infant Education by Rusk.
2. History of Western Education by Good.
3. Discovery of the Child by Montessori.

4. Learning and Teaching in the Infant School—Hume.
5. Infant School Activities by E. R. Boyce.
6. The Activities Curriculum in the Primary Grades by M. P. Stevens.
7. Activity in the Primary School—M. V. Daniel.
8. Theory and Practice in the Elementary School by Saucier.
9. Basic National Education—Hindusthani Talimi Sangha.
10. Latest Fad—J. B. Kripalani.
11. Basic Education—The need of the day—Pattabhi Sitaramayya.
12. আধুনিক শিক্ষক—আব্দুল হাকিম।
13. Teaching in Small Schools—K. V. Woodford.
14. Modern Education in the Small Rural School—K. V. Woodford.
15. প্রাথমিক শিক্ষা—রেণু মিত্র।
16. শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
17. শিক্ষাব্রতী মাসিক পত্রিকা।
18. বুনিয়াদী শিক্ষার কথা—দ্বিতীয় ভাগ—অনিলমোহন গুপ্ত।
19. Teaching in Postwar School—Oxford University Press.
20. Kindergarten Guide By Lois & Bates.
21. Froebel's Educational Laws for all Teachers By James L. Hughes.
22. Montessori Method by Dr. Maria Montessori.
23. The Montessori System by Dr. Theodore L. Smith.
24. The Educational Movements & Methods by G. G. Harrap & Co.
25. Modern Developments in Educational Practice By J. Adams.
26. The Dalton Laboratory Plan By Miss Helen Parkhurst.
27. The Wardha Scheme By C. J. Varkey.
28. Sargent Report.
29 আমাদের শিক্ষা—By Principal K. D. Ghosh.

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষাদান-পদ্ধতি

ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিবার কথা আমরা বলিয়া থাকি, কিন্তু তাহাদিগকে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার বিষয়। প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে শিক্ষাদান কালে পাঠ-দান করিবার সময় গুরু বিষয়বস্তু বলিয়া যাইতেন, ছাত্রগণ তাহা পুনরাবৃত্তি করিত, তাহার পর গুরু পুনরায় বক্তব্য বিষয়টি ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন। ইহার পর ছাত্রগণ গুরুকে ঐ পাঠ সম্পর্কিত নানা রকম প্রশ্ন করিত এবং গুরু ও ছাত্রগণের মধ্যে আলোচনা চলিত। এই ছিল শিক্ষার পদ্ধতি। পরবর্তী কালে আমরা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও দেখিয়াছি, শিক্ষক পড়া কতটুকু হইবে, তাহা নির্ধারণ করিয়া দিতেন, ছাত্রগণ তাহা মুখস্থ করিয়া আসিত। শিক্ষক উহার উপর প্রশ্ন করিতেন, ছাত্রগণকে যথাসম্ভব মুখস্থ বিষয়টি উদ্‌গীরণ করিতে হইত। ছাত্র বিষয়টি বুঝিয়া নিজ ভাষায় তাহা বলিলেও শিক্ষক তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন না। কিন্তু এই প্রথা চলিলেও, শিক্ষাক্ষেত্রে অন্য একটি চিন্তাধারা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ ছাত্রগণ বিষয় বস্তুটি বুঝিতে পারিয়াছে কিনা জানিতে চাওয়া। বিষয়টি বুঝিতে পারিয়াছে কিনা তাহা জানিতে হইলে শিক্ষাপদ্ধতির ধারারও পরিবর্তন করিতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীদের মনস্তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়া শিক্ষাদান করিতে অগ্রসর হইতে হয়। ছাত্রছাত্রীরা কি ভাবে বুঝিতে পারিবে, কতটা সময় একটা বিষয়ের মনঃসংযোগ করিয়া রাখিতে পারিবে, কি ভাবে একটি জ্ঞানের সঙ্গে অন্য একটি জ্ঞানের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া নূতন জ্ঞান লাভ করা যায়, এই সমস্ত দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

সাধারণতঃ শিক্ষা তিন প্রকারে দেওয়া হইয়া থাকে। প্রথমতঃ **শ্রেণী পাঠনা**, দ্বিতীয় **দলীয় পাঠনা** এবং তৃতীয়তঃ **ব্যক্তিগত পাঠনা**। আমরা ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি পাঠনার সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হার্বার্টের পঞ্চসোপান-পদ্ধতি

শ্রেণী-পাঠনায় শুধু পড়া দিয়া শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করাইলে বিষয়টি বোধগম্য হয় না। বিষয়বস্তুটিকে বুঝাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। বিষয়-বস্তু বুঝিতে পারিলে বিষয়টি প্রকাশ করিতে ছাত্রছাত্রীগণ সহজেই সক্ষম হইবে।

মনীষী হার্বার্ট কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়া শিক্ষা দিবার কথা বলিয়াছেন। পেষ্টালজি শিক্ষাদানকে মনস্তত্ত্বসম্মত করিতে চাহিয়াছিলেন, হার্বার্ট শিক্ষাদানকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন। হার্বার্টও পেস্তালজির মত একটি বিশেষ ধারণা পোষণ করিতেন। তাহা হইতেছে এই যে, শিক্ষা শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করিবে। শিশু প্রকৃতি ও সমাজ হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া থাকে এবং এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলির মাধ্যমেই শিশুর মানসিক বিকাশ হইয়া থাকে। শিশুর মন স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্যে পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া থাকে এবং বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া থাকে। শিশুর পরিবেশে যাহা আছে তাহাই শিশুর জীবনে বিকাশ ঘটাইয়া থাকে। হার্বার্ট পরিবেশের উপকরণ-গুলিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রথমতঃ প্রকৃতিতে যে উপকরণগুলি আছে, তাহাতে শিশুর অভিজ্ঞতা অর্জন হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ শিশুর সমাজের মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে শিশুর মন সংবেদনশীল হয়। শিশুর মনে তাহা হইলে দুইটি শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—অভিজ্ঞতা ও সংবেদনশীলতা। হার্বার্ট মানুষের মনের সহজাত ক্ষমতাতে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন যে শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার কিছুই থাকে না, তাহার অবস্থা তখন শূন্য। ধীরে ধীরে সে প্রকৃতি হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করে, এবং মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে তাহার মন সংবেদনশীল হইয়া থাকে। শিশুর মনে দুইটি ক্ষমতার জন্ম হয়। একটি হইল ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা, এবং দ্বিতীয়তঃ এই উপলব্ধিগুলিকে নিজস্ব করিয়া লইবার ক্ষমতা। এই দুইটি

ক্ষমতা ছাড়া মনের আর কোন ক্ষমতা নাই। পুরাতন অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধিগুলির সাহায্যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব। ইহাকেই সমবেষণ বা Apperception বলা হয়। পুরাতনের সাহায্যে নূতনকে জানিবার নীতিই হইতেছে হার্বার্টের শিক্ষানীতি।

হার্বার্টের মতে ছাত্রছাত্রীগণের শিক্ষার কার্যকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়,—(১) **মনঃসংযোগ** এবং (২) **চিন্তন**। হার্বার্টের মতে শিশু মনঃসংযোগ দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু সে চিন্তা দ্বারা বিষয়টি বিশ্লেষণ করিয়া সুশৃঙ্খল করিয়া সিদ্ধান্তে আগমন করে। হার্বার্ট মনঃসংযোগ কার্যকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,যথা—**উপলব্ধি** ও **তুলনা**। উপলব্ধি কার্যকেও দুই ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, যথা—**প্রস্তুতি করণ ও জ্ঞানদান বা উপস্থাপন**। চিন্তন-কার্যকেও তাঁহার মতে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—**সিদ্ধান্ত করা** বা **সূত্রগঠন** করা ও তাহার **প্রয়োগ**।

এই ভাবে হার্বার্টের শিক্ষাক্ষেত্রে চিন্তাধারা অনুযায়ী পাঁচটি সোপানের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

(১) **প্রস্তুতিকরণ বা সূচনা** (Preparation or Introduction)

(২) **জ্ঞানদান বা উপস্থাপন** (Presentation).

(৩) **তুলনা** (Association).

(৪) **সিদ্ধান্ত বা সূত্রগঠন** (Generalisation).

(৫) **প্রয়োগ** (Application).

(১) প্রস্তুতিকরণ বা সূচনা (Preparation) : পাঠদানের প্রথম সোপানে ছাত্রদের মনকে পাঠের জন্য প্রস্তুত করিতে হয়। ছাত্রদের ঐ বিষয়ে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতে হয়। সামান্য জানা থাকিলেও উহাকে কেন্দ্র করিয়া নানা রূপ প্রশ্ন করিয়া ছাত্রদের মনকে নূতন পাঠ্যের জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন। শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা দরকার। আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া এবং সমবেক্ষণ-মণ্ডল জাগ্রত করিয়া নূতন জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। পূর্বে যে পাঠ শেষ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরের পাঠের সম্পর্ক থাকে। ঐরূপ অবস্থা হইলে পূর্বজ্ঞান

পরীক্ষা করা সহজ হয় এবং নূতন পাঠের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করাও খুব বেশী কষ্টসাধ্য হয় না। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ নূতন বিষয় অবতারণা করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্ট বিষয় পরিক্রমা করিয়া আগ্রহসৃষ্টিসূচক প্রশ্ন করিয়া নূতন পাঠে উপস্থিত হইতে হয়। প্রস্তুতিকরণ বা সূচনার শেষ ভাগে নূতন পাঠ ঘোষণা করা প্রয়োজন, উহাতে যোগসূত্র রক্ষিত হইবে। নূতন পাঠের সকল অংশের সহিত পূর্বজ্ঞান স্থাপন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারিলেই পাঠটি ছাত্রদের কাছে ধীরে ধীরে বোধগম্য হইবে। প্রস্তুতিকরণ খুব দীর্ঘায়িত করিবার প্রয়োজন নাই।

(২) **নূতন জ্ঞানদান বা উপস্থাপন** (Presentation)—পাঠদানের ইহাই দ্বিতীয় সোপান। এই সোপানে শিক্ষক ছাত্রগণকে নূতন জ্ঞান দান করিবেন। শিক্ষক বিষয়বস্তুটিকে কয়েকটি শীর্ষে বিভক্ত করিয়া ছাত্রদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিবেন। ছাত্রছাত্রীগণ যে শুধু নীরব শ্রোতা হইয়া শিক্ষকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে, তাহা নহে। তাহারা শিক্ষার পাঠদানে অংশ গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ শিক্ষক মহাশয় ব্যাখ্যা করিবার সময় মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করিবেন, ছাত্রছাত্রীগণ সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিবে। প্রশ্নগুলির মধ্যে পারম্পর্য থাকিবে, ইহা যেন শিক্ষক মহাশয় লক্ষ্য রাখেন। শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করিয়া দেখিবেন যে, ছাত্রছাত্রীগণ মনোযোগ সহকারে শিক্ষক মহাশয়ের কথাগুলি শ্রবণ করিতেছে কিনা। যদি শ্রেণীর অনেক ছাত্রছাত্রীই শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে হাত না তোলে, তাহা হইলে শিক্ষকমহাশয় ঐ শীর্ষটি বা শীর্ষের অংশটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। তিনি এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সহায়তাও লইতে পারেন। যে ছাত্র বা ছাত্রী ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, শিক্ষকমহাশয় তাহাকে দিয়া প্রশ্নের উত্তর বলাইয়া শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। ছাত্র বা ছাত্রীর প্রশ্নের উত্তর বলা হইলে শিক্ষকমহাশয় যে সব ছাত্রছাত্রী ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পূর্বে পারে নাই, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, ছাত্রছাত্রীগণ এই প্রক্রিয়ার ফলে তাড়াতাড়িই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইবে। এক এক শীর্ষ ভাল করিয়া বর্ণনা ও মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিবার পর সমগ্র শীর্ষটি আলোচনা করা চলে। এইরূপে সমস্ত বিষয়টির সবগুলি শীর্ষ আলোচনা করা উচিত। যে কোন বর্ণনামূলক পাঠে এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা চলে। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা এই সব বিষয় পাঠদান কালে উপরের নিয়ম অনুসরণ করা চলে।

তবে বর্ণনা করিবার সময় যে সব ম্যাপ, পোষ্টার, ছবি, নক্সা ইত্যাদি দেখাইবার প্রয়োজন তাহা দেখাইতে হইবে। শিক্ষক বোর্ডে মানচিত্র উপস্থাপিত করিলে, তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একটি করিয়া সীমারেখ মানচিত্র ছাত্রছাত্রীদিগকে দিবেন। শিক্ষক বোর্ডে সীমারেখ মানচিত্রে যে ভাবে কোন স্থান বা নদী ইত্যাদি অঙ্কন করিবেন, ছাত্রছাত্রীগণও তাহাদের শিক্ষককে অনুকরণ করিয়া ঐগুলি তাহাদের সীমারেখ মানচিত্রে অঙ্কন করিবে। শিক্ষক-মহাশয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবেন। কোন নক্সা বা ছবি দেখাইয়া ঐ ছবি বা নক্সার উপর প্রশ্ন করিয়া শিক্ষকমহাশয় জানিতে চেষ্টা করিবেন, ছাত্রছাত্রীগণ শিক্ষকের বক্তব্য ভাল ভাবে বুঝিতে পারিয়াছে কিনা।

ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের পাঠের পদ্ধতি ভিন্নরূপ হইবে। যথা, সাহিত্যের পাঠে, শিক্ষকমহাশয় আদর্শ পাঠ দিবেন। ছাত্রছাত্রীগণ ভাল করিয়া শিক্ষকমহাশয়ের পাঠ অনুসরণ করিবে, তারপর তাহারা নিজেরা পাঠ দিবে। শিক্ষকমহাশয় উচ্চারণ শোধরাইয়া দিবেন। বারে বারে পড়ার পর ছাত্রছাত্রীগণ পাঠের বিষয়বস্তুর কঠিন কঠিন শব্দগুলি সম্বন্ধে শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শিক্ষক মহাশয় এই ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদিগের নিকট হইতে শক্ত শব্দগুলি জানিতে চাহিবেন। ছাত্রছাত্রীরা বলিলে শিক্ষক মহাশয় তাহা বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। ছাত্রছাত্রীরাও সেই সব শব্দ ও অর্থ নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া লইবে। শিক্ষক মহাশয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবেন। শব্দার্থ লেখা হইলে শিক্ষক মহাশয় সাহিত্যের ঐ অংশটি আবার ছাত্রদের দিয়া পড়াইবেন। ইহার ফলে ঐ অংশ ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য হইতে পারে। তারপর তিনি ঐ শীর্ষ হইতে নানারূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। উহা না পারিলে শিক্ষকমহাশয় কঠিন কঠিন বাক্যগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিতে পারেন।

গণিতের পাঠের নূতন জ্ঞানদানের সময় শিক্ষকমহাশয় ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায় বোর্ডে কয়েকটি অঙ্ক কষিয়া দেখাইতে পারেন। ইত্যাদি।

(৩) **তুলনা** (Association)—এই সোপানে ছাত্রছাত্রীদের পূর্বে জানা হইয়াছে এইরূপ বিষয়ের সঙ্গে, যে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই সোপানে তুলনার কাজ ছাত্রছাত্রীরা করিবে। শিক্ষক মহাশয় দুই চারিটি প্রশ্নের মাধ্যমে দুইটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন।

(৪) সিদ্ধান্ত বা সূত্রগঠন (Generalisation)—এই সোপানে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞাত বিষয়ের উপর সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে বা সূত্র গঠন করিতে হইবে। সূত্রগঠন বা সিদ্ধান্তে-আসা ছাত্রছাত্রীদেরই কাজ, শিক্ষকমহাশয় শুধু পথ দেখাইয়া দিবেন। সূত্র-গঠন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাধারণতঃ সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, গণিত শিক্ষা দিবার কালে সিদ্ধান্ত বা সূত্র গঠন করিতে হয়।

(৫) প্রয়োগ (Application)

এই সোপানে ছাত্রছাত্রীরা প্রদত্ত জ্ঞান ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়, অর্থাৎ নূতন জ্ঞান প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। যে সূত্র গঠন করা হইয়াছে, বা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে কোন কাজ করিতে দিলেই নূতন জ্ঞানের প্রয়োগ হইবে। অতএব অঙ্ক, বিজ্ঞান ও ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সূত্র গঠন করিয়া তাহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ভূগোল শিক্ষাদান কালে ম্যাপ আঁকিতে দিয়া বা অঙ্কিত সীমারেখ মানচিত্রে কতকগুলি স্থান বা নদী বা অরণ্য ইত্যাদি বসাইতে দিয়া অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করা যায়। সাহিত্য, ইতিহাস সমাজবিদ্যা ইত্যাদি পাঠে পূর্বাপর পারম্পর্য রাখিয়া প্রশ্ন করা যাইতে পারে, কিংবা লিখিতে দিতে পারা যায়। নীচু শ্রেণীতে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় প্রদত্ত বিষয়টির সারাংশও বোর্ডে লিখিয়া দিতে পারেন। ছাত্রছাত্রীগণ উহা লিখিয়া লইবে।

হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতির সমালোচনা

শিশুর মানসিক কাজের উপর নির্ভর করিয়াই হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি রচিত হইয়াছে। ইহা পাঠদানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হইলেও ইহা সমালোচনার বিষয়বস্তু হইয়াছে।

১। হার্বার্টের মত অনুসারে শিশুর মন ফাঁকা, বাহির হইতে বা প্রকৃতিও ও পরিবেশ হইতে শিশু বিষয়বস্তু পায়, তাহাতেই তাহার মনের বিকাশ হইয়া থাকে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই পঞ্চ-সোপান পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে মনোবিজ্ঞানীরা বলিয়া

থাকেন যে, বংশগতির ফলেই শিশুরা তাহাদের মানসিক শক্তি লাভ করে। অতএব হার্বার্টের 'শিশুমন ফাঁকা বা শূন্য' এই তত্ত্ব ভুল বলিয়া স্থির হইয়াছে, শিশুকে শিক্ষাদানের দ্বারা তাহার মনের শক্তির বিকাশ করা যায় মাত্র, তাহাকে কোন নূতন শক্তির অধিকারী করা যায় না। কিন্তু এই তত্ত্ব দ্বারা হার্বার্টের শিক্ষাক্রমের মূল্য নষ্ট হয় না। ইহার কারণ এই যে শিশু যে শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহার সম্যক বিকাশ হওয়া প্রয়োজন, এবং বিকাশ না হইলে শিশুর সেই শক্তির কোন মূল্য নাই। শিক্ষালাভের ফলেই শিশুর সেই শক্তির বিকাশ হইবে।

২। হার্বার্টের পঞ্চসোপান এইরূপ ভাবে সাজান যে শিশুরা সেই ক্রম অনুযায়ী সকল সময়ে শিক্ষালাভ করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নূতন জ্ঞান লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু তাহার ঐ বিষয়ের পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিতে থাকে, তাহার জন্য অন্য একটি সোপানের মোটেই প্রয়োজন হয় না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে যখনই নূতন জ্ঞানের সঙ্গে পুরাতন জ্ঞানের তুলনার প্রয়োজন হইবে তখনই তুলনা করা হইবে, পরের সোপানের জন্য অপেক্ষা করা হইবে না। পুনরায় বিস্তারিত তুলনা করিবার জন্যই নূতন সোপানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভাল ভাবে ঐ সোপানে পুরাতন ও নূতন জ্ঞানের তুলনা হইলে নূতন জ্ঞান ভালভাবে মনের মধ্যে থিতাইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া নূতন জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তে আসা যায়, তুলনার জন্য অপেক্ষা না করিলেও চলে। কিন্তু পূর্ব জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াই নূতন জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা চলে, ইহাও আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বিষয়টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপলব্ধির পূর্বে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়াই ভাল।

৩। পঞ্চসোপান ক্রম অনুযায়ী সকল বিষয়ের পাঠ দেওয়া চলে না এবং তাহা ছাড়া প্রত্যেকটি পাঠে পাঁচটি সোপানও ব্যবহার করা চলে না। কিন্তু প্রথম সোপান সম্বন্ধে কাহারও দ্বিধা থাকিতে পারে না, উহা সকল সময়েই ব্যবহার করিতে হয়। বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপানের পরিবর্তন করা চলে। চতুর্থ ও পঞ্চম সোপানও প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা যায়। সমস্ত পাঠেই যে পাঁচটি সোপান ব্যবহৃত হইতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ পক্ষে বর্তমানে পাঁচটি

সোপানের মধ্যে তিনটি সোপান ব্যবহৃত হইতেছে; যথা—প্রস্তুতিকরণ বা সূচনা, জ্ঞানদান বা উপস্থাপন এবং প্রয়োগ। জ্ঞানদান বা উপস্থাপনের মধ্যে তুলনা আসিয়া সংযোজিত হইয়াছে, আর প্রয়োগের মধ্যে সিদ্ধান্ত বা সূত্র গঠন আসিয়া মিশিয়াছে। এই কারণে বর্তমানে পাঠদানে মোট তিনটি সোপানই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৪। অনেকে বলিয়া থাকেন যে পঞ্চবিধ সোপানে শিক্ষকের ও ছাত্রছাত্রীর কাজ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। কিন্তু সোপানগুলির যে ভাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় বিভিন্ন সোপানের মধ্যে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের কার্য বণ্টন অসুবিধাজনক নয়।

৫। হার্বার্টের পঞ্চবিধ ক্রমের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ সমালোচনা এই যে শিক্ষকের কার্য-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার ফলে শিক্ষকের স্বাধীনতা কমিয়া গিয়াছে এবং সব পাঠগুলিই যেন এক ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। কিন্তু এই পঞ্চবিধ ক্রম শুধু পাঠদানের কাঠামোটি নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। শিক্ষক ইচ্ছা করিলে ইহার মধ্যে নানা বিষয়ের পরিবর্তন পরিবর্ধন ইত্যাদি করিতে পারেন। অতএব শিক্ষকের স্বাধীনতা যে নষ্ট হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণ ভাবে বলা চলে না। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া লইলে পাঠগুলি যে এক ছাঁচে ঢালা তাহাও বলা চলে না।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি
(Analytic and Synthetic Method)

কোন বস্তু সম্বন্ধে শিশু প্রথমে অস্পষ্ট ধারণা করিয়া থাকে। এই অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য বিষয় বা বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করা এবং উহার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। ইহাতে অংশগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইলেও সমগ্র বস্তুটি সম্বন্ধে স্পষ্ট ও সঠিক ধারণা নাও হইতে পারে। এই কারণে ইহার পর বিভিন্ন অংশগুলির সঙ্গে সমগ্র বস্তুটির কি সম্পর্ক তাহার ধারণা দেওয়া এবং বিভিন্ন অংশগুলি একত্র করিলে সমগ্র বস্তুটির রূপ কি হইবে সেই সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া আবশ্যক। ইহা করা হইলে বিষয়টি সম্বন্ধে শিশুর ধারণা সুস্পষ্ট ও সঠিক হইবে। উদাহরণ স্বরূপ একটি বৃক্ষের কথা বলা যাইতে পারে। শিশুকে একটি বৃক্ষ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান দান করিতে হইলে বৃক্ষটিকে বিশ্লেষণ করিয়া বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পত্র,

মূল ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হইবে এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা দেখাইতে হইবে। ইহার পর তাহাদের সহিত সমগ্র বৃক্ষটির সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে এবং বৃক্ষের যথার্থ বর্ণনা দিয়া বৃক্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিতে হইবে। এইরূপ একটি বাক্য বুঝাইতে হইলেও বাক্যের বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ শব্দগুলির মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক এবং সেই শব্দগুলির সঙ্গে বাক্যের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বাক্য সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিতে হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি পাশাপাশি চলিতেছে। সংশ্লেষণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ পদ্ধতির অনুপূরক। বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কোন পাঠদান আরম্ভ করিলে সংশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহা সম্পূর্ণ বা শেষ করিতে হইবে। তাহা না হইলে শিশুর জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না।

আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি

(Inductive and Deductive Method)

কতকগুলি উদাহরণ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, সেই সমস্ত উদাহরণ হইতে যদি যুক্তির সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বা সূত্র গঠন করা যায়, তবে সেই প্রণালীকে **আরোহী প্রণালী** বা Inductive Method বলে। যথা—যদু মরিয়াছে; হরি মরিয়াছে; শ্যাম মরিয়াছে; অতএব সকল মানুষই মরিবে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এবং সূত্র গঠন করা যায় যে মানুষ মরণশীল। আরও একটি উদাহরণ লওয়া চলিতে পারে—আরবের মরুভূমিতে উট চলিতে পারে; ভারতের মরুভূমিতে উট চলিতে পারে, সাহারার মরুভূমিতে উট চলিতে পারে, ইত্যাদি উদাহরণ হইতে সিদ্ধান্তে আসা যাইতে পারে যে উট মরুভূমিতে চলিতে পারে, আর সূত্রগঠন করা চলে যে উট মরুভূমির জাহাজ।

আরোহী প্রণালী দ্বারা যদি কোন সিদ্ধান্তে আগমন করা যায়, তাহা হইলে সেই সিদ্ধান্তের বহুল প্রয়োগ করিয়াই নির্ভুল সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমরা পৃথিবীর বহু জায়গায় কাককে কালো বলিয়া জানি। কিন্তু যদি কোনও স্থানের কাক কালো না হইয়া সাদা কিংবা অন্য কোন রঙের হয়, তাহা হইলে 'কাক কালো' ইহা নির্ভুল সত্য হইবে না।

পক্ষান্তরে কোন সূত্রের প্রয়োগ করিয়া তাহা হইতে যে সত্য পাওয়া যায় তাহা নির্ধারণ করার প্রণালীকে **অবরোহী প্রণালী** বা Deductive

Method বলা হয়। যথা—"মানুষ মরণশীল" এই একটি সূত্র। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে রাম, যদু, মধু, ইত্যাদি সকলেই মানুষ, অতএব ইহারা মরিবে।

আরোহী ও অবরোহী প্রণালীর মধ্যে অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। আরোহী প্রণালীর সাহায্যে আমরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং সূত্র গঠন করি। আবার অবরোহী প্রণালীর সাহায্যে তাহা আমরা প্রয়োগ করিয়া উহার সত্যতা নির্ধারণ করিতে অগ্রসর হই। সুতরাং পাঠদানের ক্ষেত্রে যদি আমরা আরোহী প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোনও পাঠদানে অগ্রসর হই, তাহা হইলে অবরোহী প্রণালীর সাহায্য লইয়া আমাদের পাঠ সমাপ্ত করিতে হইবে।

গণিত, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান কালে আরোহী অবরোহী প্রণালী অবলম্বন করিয়া পাঠদান করাই যুক্তিসঙ্গত।

এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ইংলণ্ডের লর্ড বেকন। এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ধারা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যায়। এই পদ্ধতিতে গবেষণা করার ফলে বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি করা সম্ভবপর হইয়াছে।

আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি (Heuristic Method)

এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষক ছাত্রকে দিয়া আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করাইবেন। ছাত্র নিজে পরীক্ষা করিয়া এবং অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। এই জন্য এই পদ্ধতিকে আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি বা Heuristic Method বলা হয়।

ছাত্রকে তাপ দিবার জন্য একটি স্পিরিট ল্যাম্প, মাপিবার ফিতা এবং লোহার রড, কাচের টিউব, পাথর দণ্ড ইত্যাদি দেওয়া হইল। ছাত্র কাচের পাথরের ও লোহার রডের দৈর্ঘ্য মাপিবার ফিতা দিয়া মাপিয়া বাহির করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখিল। পরে স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনে ঐগুলি ভাল করিয়া উত্তপ্ত করিয়া পরে উহাদিগকে মাপিল। মাপিবার পর দেখা গেল প্রত্যেকটি রড প্রসারিত হইয়াছে। সুতরাং ছাত্র সিদ্ধান্ত করিল যে উত্তাপে সমস্ত জিনিস প্রসারিত হয়। ছাত্রকে আরোহী অবরোহী পদ্ধতিতে কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। ইহার পর ছাত্র আরও অনেক

জিনিস উত্তপ্ত করিয়া তাহার সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবে। ছাত্র বিষয়টি আবিষ্কার করিল। এই জন্য এই পদ্ধতিকে আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি বলা হয়।

আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উপকারিতা এই যে ছাত্র নিজে নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া সত্য আবিষ্কার করে এবং সেই সঙ্গে ছাত্রের উদ্ভাবনী শক্তি জাগরিত হয়। কিন্তু ইহার একটু অসুবিধা এই যে সকল ছাত্র এই পদ্ধতি দ্বারা উপকৃত হইতে পারে না, কারণ সকলের উদ্ভাবনী শক্তি সমান নহে, অতএব অনেকেই এই পদ্ধতি দ্বারা উপকৃত হয় না। তাহা ছাড়া যাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি আছে তাহারাও অনেক দেরীতে কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া কাজ করিলে সকলেই এই পদ্ধতি দ্বারা লাভবান হইতে পারে।

আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method)

এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদান করিবার সময় শিক্ষক শ্রেণীর নিকট একটি সমস্যা উপস্থিত করিতে পারেন এবং ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে বলিতে পারেন। শিক্ষাদানের কৌশল হিসাবে আলোচনা পদ্ধতির স্থান অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিলে শিক্ষকই শুধু কথা বলেন না, শ্রেণীর সমগ্র ছাত্রসম্প্রদায়কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। ছাত্রছাত্রীগণ এই সময় সক্রিয় হইয়া উঠে, শিক্ষকের কথা নীরব শ্রোতা হইয়া শ্রবণ করে না। শিক্ষাদানের কৌশল হিসাবে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের আলোচনার মধ্য দিয়া কথা বলিবার ত্রুটি, ছাত্রছাত্রীদের শব্দসম্পদ, ভাব ও ভাষাপ্রকাশের ক্ষমতা, সহযোগিতা, ভাবের আদান-প্রদান ইত্যাদির স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারেন। পক্ষান্তরে একটি কার্যক্রম হিসাবে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীগণ কি ভাবে অন্যের সাথে সহযোগিতা করিয়া নিজ বক্তব্য বলিতেছে তাহাও লক্ষ্য করিতে পারেন। শিক্ষক যদি আলোচনাকে একটি শিক্ষাদানের কৌশল হিসাবে প্রয়োগ করিতে চান তাহা হইলে তিনি নিম্নলিখিত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন। উহাতে ভাল ফল পাওয়া যাইবে আশা করি।

১। ছাত্রছাত্রীগণকে সংশ্লিষ্ট যে বিষয়ে আগ্রহ আছে, সেই বিষয়ে কথা বলিবার অবাধ স্বাধীনতা দিতে হইবে।

২। বক্তব্য বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলার জন্য শিক্ষক মাঝে মাঝে প্রেরণা দিবেন।

৩। প্রথমে ছাত্রছাত্রীদিগকে স্বাভাবিক ও সহজ ভাবে বলিতে দিতে হইবে। বিষয়টি সম্প্রসারণের উপযুক্ত বোধ করিলে শিক্ষক ছাত্র বা ছাত্রীকে নূতন কথা বলিবার সুযোগ করিয়া দিবেন।

৪। ছাত্র বা ছাত্রী যখন আলোচনা করিতেছে, তখন শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীকে নূতন উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য সাহায্য করিবেন।

আলোচনার বিষয়বস্তু কি হইবে তাহা শিক্ষক ঠিক করিয়া দিবেন এবং এই আলোচনায় শিক্ষক সভাপতির কাজ করিবেন। আলোচনার বিষয়বস্তু যাহাতে খুব সরল ও ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণকারী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদি যে কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া আলোচনা বলিতে পারে, কিন্তু বিষয়বস্তুটি সমস্যার আকারে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপস্থাপিত করিতে পারিলে আলোচনা সরল ও সুস্পষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠতালিকা ও পাঠটীকা

(Schemes of Lesson and Lesson Notes)

কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত একটি বিষয়ে পাঠদান শেষ করিতে হইলে তাহার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা প্রয়োজন। বস্তুতঃ বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যের জন্যই পূর্বপরিকল্পনার প্রয়োজন রহিয়াছে। পরিকল্পনা ছাড়া কার্য উপযুক্তরূপে শেষ করা যায় না। পরিকল্পনার অভাবে অনেক সময়ই কাজ পণ্ড হইয়া যায়। হয় পাঠদান সময়ের পূর্বেই শেষ হয়, কিংবা পাঠদান শেষ হইতে চায় না। এই জন্য বৎসরের প্রথম দিকেই যদি পরিকল্পনা করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে কাজের সুবিধা হয়। বৎসরে কত দিন বিদ্যালয় ছুটি থাকে তাহা শিক্ষকের

জানা থাকে, তাহা ছাড়া কোন সপ্তাহে কোন তারিখ ছুটি রহিয়াছে তাহা পূর্বেই ছুটির তালিকা হইতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া স্কুলের পরীক্ষা, তাহার জন্য প্রস্তুতি, স্পোর্টস, পরিভ্রমণ ইত্যাদির জন্যও অনেক দিন বাদ যাইয়া থাকে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া কত দিন মোট একটি বিষয় শিক্ষাদান কার্যের জন্য পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্বেই মোটামুটি বুঝা যায়। এই সময় বুঝিয়া যে শিক্ষক যে বিষয় পড়াইবেন কিংবা কর্ম পরিচালনা করিবেন কিংবা শিল্প কাজ করাইবেন, তাহার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী রুটিন করিয়া লইবেন। বৎসরে তিনটি ভাগ বা Term আছে। প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগেই পড়া ও কার্যের গুরুত্ব বেশী থাকে, কারণ শেষ ভাগ বা Termএ পরীক্ষাতে ও পরীক্ষার জন্য পুনরালোচনাতে বেশীর ভাগ সময় কাটিয়া যায়। অতএব বৎসরের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়টি শেষ করিয়া ফেলা বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের পৃষ্ঠা হিসাবে বিষয়টি ভাগ না করিয়া বিষয় একক (Subject unit) হিসাবে পাঠদান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিষয়বস্তুর কাঠিন্য অনুযায়ীও পাঠদান কমবেশী হইবে।

তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাসের জন্য বৎসরের প্রথম ভাগের জন্য একটি পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হইল। শিক্ষকগণ ইহা দেখিতে পারেন, তবে ইহাকেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষকগণ নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী ভাল করিয়া চিন্তাভাবনা করিয়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন।

জানুয়ারীতে শ্রেণীর কার্য আরম্ভ হইতে অনেক দেরী হইয়া যায়, ১৫ই জানুয়ারীর পূর্বে শ্রেণীর কার্য ভালভাবে আরম্ভ হয় না। তাহা ছাড়া জানুয়ারী মাসে ১৭ই, ২৩শে, ২৬শে, ৩০শে প্রভৃতি ছুটি আছে। সপ্তাহে দুই দিন করিয়া ইতিহাস পাঠের ব্যবস্থা থাকিলে মোট ৩টির বেশী শ্রেণীর কাজ মিলিবে না। ফেব্রুয়ারী মাসে সরস্বতী পূজার বন্ধ থাকে, তাহা ছাড়া প্রস্তুতির জন্যও ২।১ দিন শ্রেণীর কাজ বন্ধ থাকে। অতএব ফেব্রুয়ারী মাসে ৫ দিনের বেশী শ্রেণীর কাজ পাওয়া যাইবে না। মার্চমাসে ৪ সপ্তাহে ৮ দিন ইতিহাস পাঠদানের জন্য পাওয়া যাইবে। এপ্রিল মাসে গুডফ্রাইডে, চৈত্রসংক্রান্তি, বৎসরের প্রথম দিন ইত্যাদি ব্যাপারে ৪।৫ দিন বিদ্যালয় ছুটি থাকে। এপ্রিল মাসেও ইতিহাস

পাঠের জন্য ৬ দিনের বেশী পাওয়া যাইবে না। মে মাসে ১৫ই।১৬ই পর্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ হয়। ঐ মাসে প্রথম ভাগের পরীক্ষা থাকিলে ইতিহাস পাঠের সুযোগ থাকিবে না, থাকিলেও ১ দিনের বেশী পাওয়া যাইবে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বৎসরের প্রথম ভাগে মোট ইতিহাস পাঠের জন্য ৩+৫+৮+৬+১=২৩ দিন পাওয়া যাইবে। এই ২৩ দিনের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর কতটা অংশ শেষ করা যাইবে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ইতিহাসের পাঠতালিকা

শ্রেণী :—তৃতীয় মান ; সময় :—বৎসরের প্রথম ভাগ (জানুয়ারী হইতে মে)

সময়	বিষয়াংশ	পাঠ সংখ্যা
জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী	কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধ	৪
ফেব্রুয়ারী	বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশ	২
"	যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁহার উপদেশ	২
মার্চ	মহাকবি কালিদাস ও গুপ্তযুগ	২
"	হজরত মহম্মদ	২
"	অজন্তা ও ইলোরা	৩
মার্চ ও এপ্রিল	জগন্নাথদেবের মন্দির ও কোনারকের মন্দির	২
এপ্রিল	হর্ষবর্ধন	২
"	ধর্মপাল	১
"	বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন	২
মে	পুনরালোচনা	১
	মোট সংখ্যা	২৩

তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাসের বাকী অংশ এই ভাবে বৎসরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে পরিকল্পনা মত বণ্টন করিয়া লওয়া চলে।

পাঠ-টীকা (Lesson Notes)

পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা

কোন একটি কার্য ভাল ভাবে সম্পাদন করিতে হইলে ইহার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রয়োজন। শিক্ষাদান ক্ষেত্রেও তাই। যদি শিক্ষক শ্রেণী পাঠনায় উদ্যোগী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে রীতিমত প্রস্তুত হইয়া কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। কি ভাবে প্রস্তুত হইবেন? শিক্ষক পাঠ-টীকা রচনা করিবেন। খুব বিদ্বান শিক্ষক হইলেও পূর্ব পরিকল্পনার অভাবে অনেক সময় পাঠদান ভাল হয় না। অথচ একজন সাধারণ শিক্ষক ভালভাবে পরিকল্পনা করিয়া পাঠ-টীকা লিখিয়া লইয়া গিয়া পাঠদান করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইলেন। পাঠ-টীকাই কর্মসূচী। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পাঠ-টীকা প্রস্তুত না করিয়া পাঠদান করিতে গেলে পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া পূর্ব পরিকল্পনা না থাকিলে বিষয়ের এককটি পাঠদানের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট হইয়া আছে, সেই সময়ের মধ্যে শেষ নাও হইতে পারে, আবার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেও শেষ হইয়া যাইতে পারে। পাঠ-টীকা যদি পূর্বে প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে এই সব ত্রুটি না হইবারই সম্ভাবনা।

পাঠ-টীকা যদি পূর্বে প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে শিক্ষক ঐ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি বিচার করিয়া পূর্বেই দেখিবেন এবং কতটুকু নূতন জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদিগকে দেওয়া যাইবে তাহা নিজেই স্থির করিবেন। পাঠ-টীকার অভাবে পড়ানর ধারা কোন দিকে যাইবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শ্রেণীর পক্ষে শিক্ষকের সেই পাঠ অতি সহজ বা অতি কঠিন জিনিস বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে।

প্রত্যেক পাঠেরই একটি লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষক অগ্রসর হইতে থাকেন। পূর্ব পরিকল্পনা বা পাঠটীকার অভাবে শিক্ষক তাঁহার লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন।

পাঠ-টীকা পূর্বে প্রস্তুত না করিলে পাঠদান কালে শিক্ষক কোন কোন প্রদীপন ব্যবহার করিবেন তাহা স্থির করিয়া রাখেন না, ফলে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ছাত্রছাত্রীদের মনে ভাল করিয়া থিতাইয়া বসে না। বর্তমান সময়ে পাঠদানে প্রদীপনের গুরুত্ব খুব বেশী। পূর্বে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক বুঝাইবার ছলে শুধু বর্ণনা দিয়া যাইতেন। বর্ণনাকে আরও সুস্পষ্ট

করিয়া তুলিয়া ধরিবার জন্য যেসব অডিও-ভিস্থয়াল সাহায্যের দরকার, তাহার অত্যন্ত অভাব ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে পাঠদানে অডিও-ভিস্থয়াল জিনিসগুলির গুরুত্ব খুব বেশী।

পাঠ-টীকা পূর্বে রচনা না করিলে শিক্ষকের চিন্তার মধ্যে কোন প্রদীপনের কথা আসিবে না, ফলে পাঠদান অত্যন্ত নীরস হইয়া যাইবে এবং ছাত্র-ছাত্রীগণও পাঠটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে না। সেনাপতির কাছে যুদ্ধের জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা যেমন দরকার, সেইরূপ শিক্ষকের পক্ষে পাঠটীকার প্রয়োজন। অবশ্য শিক্ষকের অভিজ্ঞতার উপর পাঠ-টীকার দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। বহু দিনের অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে সাধারণ ভাবে পাঠ-টীকার নোট লিখিয়া লইলেই চলে, পক্ষান্তরে একজন নূতন শিক্ষকের কাছে পাঠ-টীকা পরিকল্পনা অনুযায়ী লিখিয়া লওয়া প্রয়োজন।

পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিবার প্রণালী

১। পাঠদানের বিষয়বস্তু কি হইবে তাহা পূর্বে স্থির করিতে হইবে।

২। পাঠের ঐ এককটির লক্ষ্য কি হইবে তাহা জানা দরকার। শিক্ষক সেই লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিবেন। কোন বিষয় পাঠদানের লক্ষ্য স্পষ্ট হইবে এবং ছাত্রছাত্রীরা কি শিখিতে যাইতেছে তাহা যেন তাহারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারে, এই ভাবে পাঠ-টীকা রচিত হইবে।

৩। শ্রেণীর পাঠদানের সময় কতটা তাহা জানিয়া শিক্ষক ঠিক ঐ সময়ের জন্য পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিবেন। সময়োপযোগী করিয়া বিষয়বস্তু শিক্ষক সাজাইয়া রাখিবেন।

৪। শিক্ষক কোন পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ দিবেন তাহা পূর্বাহ্ণে স্থির করিবেন। সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ প্রণালী, না আরোহী অবরোহী প্রণালী, না আলোচনা পদ্ধতি, না কর্মসমস্যা পদ্ধতি, ইত্যাদি কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদানে অগ্রসর হইবেন তাহা পাঠ-টীকায় ভাল করিয়া লিখিবেন। পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষক কর্মের ব্যবস্থাপনা করিবেন বা বিষয়টির বর্ণনা দিবেন।

(ক) ছাত্রছাত্রীদিগের কাছে পাঠ আকর্ষণীয় করিবার জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের মনে পাঠের বিষয়বস্তু গাঁথিয়া দিবার জন্য, কি কি শিক্ষাসরঞ্জাম ও প্রদীপন ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাও পূর্বাহ্ণে স্থির করিতে হইবে এবং ঐগুলি পাঠ-টীকার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

৫। পাঠদানের সময় ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে কর্মবিভাগ করিয়া লইতে হয়। ছাত্রছাত্রী শ্রেণীতে আজ আর নীরব শ্রোতা নয়। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের জন্যই শিক্ষক। আজ তাই ছাত্রছাত্রী শিক্ষার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আর তাহাদিগকে অবহেলা করিলে চলিবে না। এই কারণে শ্রেণীতে পাঠদানের সময় শিক্ষক কর্ম ভাগ করিয়া দিবেন, অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীরা স্বীয় বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারে বলিয়া শিক্ষক মনে করেন, সেইখানে শিক্ষক নিজেই সেই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিবেন না। কোন ছবি বা মানচিত্র বা চার্ট দেখাইয়া শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের দিয়া কোন প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর আদায় করিতে পারেন। ছাত্রছাত্রী হয়ত ভুল করিতে পারে, কিন্তু সেই ভুলও ছাত্রছাত্রীরা মানসিক শক্তি পরিচালনা দ্বারা করিয়াছে। শিক্ষক একটু সাহায্য করিলেই তাহারা পুনরায় ঠিক পথে অগ্রসর হইয়া সমস্যার সমাধান করিয়া লইতে পারিবে। শিক্ষক পাঠ-টীকার মধ্যে এই সকল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিবেন।

৬। পাঠ-টীকা আমরা বর্তমান সময়ে হার্বার্টের পঞ্চবিধ ক্রম অনুযায়ী করিতেছি না। পঞ্চবিধ ক্রমকে আমরা তিনটি সোপানে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছি। প্রত্যেক সোপানে প্রশ্ন ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হইবে। শিক্ষক বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন ভিন্ন ভিন্ন সোপানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিলে যথাসময়ে উহা ভুল হইয়া যাইতে পারে। তবে সব প্রশ্নই যে লিখিয়া রাখিতে হইবে এমন নহে। নমুনা প্রশ্ন লিখিয়া রাখিলে কাজের অনেকটা সুরাহা হইবে।

৭। ছাত্রছাত্রী যাহা শিক্ষা করিল তাহা যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রয়োগ করিয়া দেখা গেল ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণ হইল না। এই জন্য প্রত্যেক পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রী যাহাতে তাহাদের অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা হইবে।

পাঠ-টীকা ব্যবহারের সাবধানতা

১। শিক্ষক নিজের পাঠ-টীকা নিজেই রচনা করিবেন। অপর শিক্ষকের পাঠ-টীকা, তাহা যতই ভাল হউক না কেন কদাচ ব্যবহার করিবেন না। তাহার কারণ যে শিক্ষক যখন যে পাঠ-টীকা রচনা করেন, তখন তিনি

তাঁহার নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী তাহা রচনা করিয়া থাকেন। একের চিন্তাধারার সঙ্গে অপরের চিন্তাধারা খাপ খায় না। এই কারণে অপরের পাঠ-টীকা ব্যবহার করা কখনই উচিত নয়।

২। শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠদান করিবার সময় সর্বদা পাঠ-টীকার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না, এবং পাঠ-টীকাও অন্ধভাবে অনুসরণ করিবেন না। শিক্ষক পাঠ-টীকার কাঠামো অনুসারে চলিতে পারেন, কিন্তু শ্রেণীতে পাঠদান কালে যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি পাঠ-টীকার বহির্ভূত বিষয়ও পাঠের মধ্যে আনয়ন করিতে পারেন। প্রয়োজন বোধে শিক্ষককে তাহাই করিতে হইবে। পাঠ-টীকা না দেখিয়াই পাঠ দেওয়া উচিত। সংখ্যা, নাম, প্রয়োগের অঙ্ক শিক্ষক এক টুকরা কাগজে লিখিয়া লইয়া যাইতে পারেন এবং ঐ কাগজ দেখিয়া তিনি তাহা বোর্ডে লিখিয়া দিতে পারেন।

৩। পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিবার পর শিক্ষক দুই একবার পাঠ-টীকা পাঠ করিবেন, তাহার পর তিনি পাঠ দিবেন। পাঠ-টীকা কয়েকবার পাঠ করিলে পর শিক্ষকের মনে বিষয়বস্তু থিতাইয়া যাইবে। এই কারণেই পাঠ-টীকা তৈয়ারী করিয়া কয়েক বার পড়া প্রয়োজন।

৪। পাঠ-টীকার পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। সাধারণভাবে উহার বর্ণনা থাকিলেই চলিবে।

পাঠ-টীকার ছক

নিম্নে একটি পাঠটীকার ছক দেখান হইল। ইহা একটি সাধারণ ছক। বিভিন্ন ধরণের পাঠ এই ছকে ফেলিয়া দেখান চলে, কিন্তু পাঠদানের বিষয়-বস্তুর তারতম্যের ফলে পাঠটীকা বিভিন্ন আকার ধারণ করিবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

শিক্ষকের নাম...............................**বিদ্যালয়ের নাম**.....................

তারিখ ও সময়..................**শ্রেণী**....................**বিষয়**.....................

সাধারণ পাঠ—(বিষয়-একক)

বিশেষ পাঠ (নির্দিষ্ট পাঠে শিক্ষণীয় বিষয়—এককের অংশ)

উদ্দেশ্য—(ক) প্রত্যক্ষ (বিষয়গত)

(খ) পরোক্ষ (ছাত্রছাত্রীদের বিকাশ সম্বন্ধীয়)

উপকরণ..

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
১ম	(ক) প্রস্তুতিকরণ বা পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা—	শিক্ষক প্রথমে শ্রেণীর শৃঙ্খলা বিধান করিয়া প্রয়োজনবোধে শ্রেণী-বিন্যাস করিয়া গৃহকাজ সংগ্রহ করিবেন। তাহার পর পূর্বজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। নমুনা প্রশ্ন : (ক) (খ) ইত্যাদি। যদি নূতন পাঠের সঙ্গে পূর্বপাঠ সংশ্লিষ্ট না থাকে তাহা হইলে নূতন পাঠের জন্য শিক্ষক পূর্বের কোন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিবেন। (ক) (খ) ইত্যাদি
	(খ) নূতন পাঠ ঘোষণা	শিক্ষক নানাবিধ প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে নূতন জ্ঞান লাভের জন্য উৎসাহী করিবেন।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
২য়	উপস্থাপন— বিষয় শীর্ষভাগ এবং এক এক শীর্ষের বর্ণনা। (ক) (খ) (গ) **বিশেষ দ্রষ্টব্য**— [উপস্থাপন ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শীর্ষের সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার সময় ছাত্র-ছাত্রীগণ শিক্ষককে অনুসরণ করিতে পারিতেছে কিনা জানিবার জন্য প্রশ্ন করা যায়। আবার শীর্ষটির পরিপূর্ণভাবে বিবরণ দিয়া উহা বুঝিতে পারিয়াছে কিনা জানিবার জন্য তাহার উপরও প্রশ্ন করা যায়। শীর্ষ ছোট হইলে পরে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, আর শীর্ষ বড় হইলে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করার দরকার]	(ক) শিক্ষক প্রথম শীর্ষের অন্তর্গত বিষয়টি বর্ণনা করিবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ তাঁহার কথা ঠিকমত বুঝিতে পারিতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করিবেন। নমুনা প্রশ্নঃ ক, খ, ইত্যাদি। ছাত্র-ছাত্রী যদি কেহই কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে তাহা হইলে তিনি পুনরায় বর্ণনা করিবেন এবং সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যদি ২।৪ জন ছাত্র-ছাত্রীও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তবে তিনি যে পারে তাহাকে দিয়া প্রশ্নের উত্তর দেওয়াইয়া পরে যাহারা পারে নাই তাহাদের দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দেওয়াইতে পারেন। বর্ণনা কালে যদি কোন অডিও-ভিসুয়াল বা শিক্ষা সরঞ্জাম ছাত্র-ছাত্রীদের দেখান প্রয়োজন হয় তাহা দেখাইয়া ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা উহাদের বিবৃতি দেওয়াইতে পারা যায়। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিয়াও প্রয়োজন বোধে প্রশ্ন করা চলে। (খ) ২য় শীর্ষ পদ্ধতি পূর্ববৎ। (গ) ৩য় শীর্ষ পদ্ধতি পূর্ববৎ। প্রত্যেক শীর্ষের শেষে পুনরালোচনার জন্য প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৩য়	প্রয়োগ—সমগ্র পাঠটির পুনরালোচনা	এই সোপানে সমগ্র নির্দিষ্ট পাঠটি ছাত্রছাত্রীগণ পারম্পর্য রক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য শিক্ষক মহাশয় নির্দিষ্ট পাঠটীর উপর প্রশ্ন করিবেন। এই প্রশ্নগুলি উপস্থাপনের সোপানের প্রশ্ন হইতে একটু ব্যাপক হইবে। নমুনা প্রশ্ন: (ক); (খ) ইত্যাদি। প্রশ্নগুলির উত্তর ছাত্রছাত্রীরা না পারিলে প্রয়োজন বোধে শিক্ষক নিজে পুনরায় উহা বলিয়া দিবেন, কিংবা যে পারে তাহাকে দিয়া বলাইতে হইবে। নির্দিষ্ট বিষয়টির পুনরালোচনা হইয়া গেলে শিক্ষক প্রয়োজনবোধে ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় নির্দিষ্ট পাঠটীর সারাংশ বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। ছাত্রছাত্রীগণ লিখিয়া লইবে। শিক্ষক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবেন। গৃহকাজ—শিক্ষক গৃহকাজের জন্য ২।১টি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনিতে বলিবেন।

বর্তমান সময়ে তিনটি সোপানেই পাঠটীকা লেখা হইতেছে। যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তৃতীয় ও চতুর্থ সোপান অর্থাৎ তুলনা এবং সিদ্ধান্ত ও সূত্রগঠনের সোপানও দেওয়া যাইতে পারে।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৩য়	যে পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নূতন জ্ঞানের তুলনা করা যাইতে পারে তাহার সারাংশ।	যে প্রণালীতে তুলনা করা হইবে শিক্ষক তাহা লিখিবেন। নমুনা প্রশ্ন: (ক) (খ) ইত্যাদি।
৪র্থ	কোন নিয়ম বা সূত্র গঠন করিতে হইলে শিক্ষক এইখানে তাহা লিখিবেন	শিক্ষক সূত্রগঠনের প্রণালী বর্ণনা করিবেন। নমুনা প্রশ্ন: (ক) (খ) ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, তৃতীয় ও চতুর্থ সোপান পাঠটীকায় সন্নিবেশিত হইলে প্রথম ছকের তৃতীয় সোপান অর্থাৎ 'প্রয়োগ', ৫ম সোপানের অন্তর্গত হইবে।

পুনরায় শিক্ষকগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, যে পাঠ-টীকার ছক দেওয়া হইয়াছে তাহা কাঠামো মাত্র, বিষয় অনুযায়ী ইহার রদবদল হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষাদানের কৌশল

(Teaching Devices)

শিক্ষাদানের পদ্ধতি পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে এবং পরেও আলোচনা করা হইবে। কিন্তু পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও পাঠদানে কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। সেই সব কৌশল উপযুক্তভাবে অবলম্বিত না হইলে পাঠদান সাফল্যমণ্ডিত হয় না। কৌশলগুলি প্রয়োগ করিবার একটি ধারা আছে। সেই ধারা অনুযায়ী পাঠদান কৌশলগুলি প্রয়োগ করিতে হয়।

১। **বর্ণনা**—পাঠদানের একটি বিশেষ অংশ হইল বর্ণনা। বর্ণনা প্রায় প্রতি পাঠেই প্রয়োজন হয়। কোন পাঠে বেশী, কোন পাঠে কম হয়। গল্প বলা বর্ণনামূলক কাজ, কিন্তু শিক্ষাদানের দিক হইতে দেখিলে শিক্ষকেরা প্রথমে ভালভাবে গল্প বলিতে শিক্ষা করিবেন। গল্প বলা সাফল্যমণ্ডিত হইলে অন্য ধরণের বর্ণনা দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে সহজ হইয়া আসিবে। গল্প বলার পরিবেশে গল্পের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদিগকে আকর্ষণ করিবার বিষয়বস্তু থাকে, অতএব গল্প বলা সাধারণ উৎসাহী শিক্ষকের পক্ষে সহজ হইয়া আসে। গল্পের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায় বা climax থাকে, অতএব গল্প বলার মধ্যেই আকর্ষণীয় বস্তু থাকে, কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়া ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে বর্ণনার বিষয়বস্তুকে এমনভাবে বলিতে হইবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা শুনিয়া আরও জানিতে আগ্রহ বোধ করে। বর্ণনা যতই চিত্তাকর্ষক, সুন্দর ও জীবন্ত হইবে, পাঠ হইবে ততই হৃদয়গ্রাহী হইবে। এক জন হাতের কাজের শিক্ষককেও বিষয়বস্তু বর্ণনা করিতে হয়, ভূগোলের শিক্ষককেও হয়ত একটি ছবি দেখাইয়া কোন একটি জায়গার বর্ণনা দিতে হয়,—ইতিহাসের শিক্ষককেও অতীত-কালের কোন ঘটনার বিবরণ দিতে হয়, সমাজবিদ্যার শিক্ষককেও হয়ত কোন জিনিষের বর্ণনা দিয়া বুঝাইতে হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটি বিষয় সুস্পষ্ট। ছাত্রছাত্রীগণ শিক্ষকের বিবরণ শুনিয়া মনে মনে একটি ছবি অঙ্কন করিয়া লয়। অতএব শিক্ষক যখনই কোন বিষয়ের বর্ণনা করিবেন তখনই তিনি এমন একটি মৌখিক চিত্র ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলিয়া ধরিবেন

যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা উহা শুনিয়া আরও জানিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং যাহা তাহারা শিক্ষকের মুখ হইতে শুনিয়াছে তাহা তাহাদের বোধগম্য হয়।

আগ্রহ একরূপ অনুভূতি। শিক্ষক যাহা কিছু বলিবেন, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিবেন, তাহাতে ফল হইবে যে ছাত্রছাত্রীরাও ঐ বিষয়টি আগ্রহ সহকারেই শুনিবে। যেমন চিত্তাকর্ষক নহে এমন একটি গল্প বলার সার্থকতা কম, সেইরূপ যদি শিক্ষক কোন বিষয়বস্তু ভালভাবে বর্ণনা করিবার জন্য আগ্রহ বোধ না করেন, তবে বর্ণনা দেওয়াই অর্থহীন হইবে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ কিছুতেই আকর্ষণ করিতে পারিবেন না।

বর্ণনা শিক্ষাপ্রদ করিতে হইলে শিক্ষক নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন—

১। অজানা জিনিসকে জানিত জিনিষের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করিতে হইবে। জানিত জিনিসকেও খুব সাবধানতার সঙ্গে শিক্ষককে বাছিয়া লইতে হইবে। ছাত্রছাত্রীরা পূর্বজ্ঞানের স্তরে যাইয়া যদি নূতন জিনিস শিক্ষকের মুখ হইতে শ্রবণ করে তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীরা বুঝিতে পারিবে এবং মনোযোগ সহকারেও শ্রবণ করিবে।

২। শিক্ষককে বিষয়বস্তু বুঝাইতে অনেক কথা বলিতে হয়। শিক্ষক বেশী কথা না বলিয়া যদি বক্তব্য বিষয় বলিবার সময় ছবি, মানচিত্র, নক্সা ইত্যাদির সাহায্য লইয়া বর্ণনা দেন, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীরা সহজে ঐ সব কথাগুলি মনে রাখিতে পারিবে।

৩। শিক্ষকের স্বর প্রয়োজন মত উচ্চ নীচ হইবে এবং তিনি বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিবেন।

৪। বর্ণনার ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হইবে। তাহা ছাড়া শিক্ষক যে শ্রেণীতে পাঠ দান করিতেছেন, সেই শ্রেণীর উপযুক্ত করিয়া তাঁহার বিষয়বস্তুর বর্ণনা দান করিবেন।

৫। বর্ণনার ফলে বিষয়বস্তুটী যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের মানসপটে ফুটিয়া উঠে এমন ভাবে বর্ণনা হইবে।

৬। শিক্ষক আন্তরিক অনুরাগের সঙ্গে বর্ণনার বিষয়গুলির বিবরণ দিবেন। শিক্ষকের অনুরাগের অভাব থাকিলে উহা ছাত্রছাত্রীদের অন্তর স্পর্শ করিবে না।

৭। বিবরণের মধ্যে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কথার উপর শিক্ষক অধিকতর জোর দিবেন, তাহা না হইলে ছাত্রছাত্রীগণ প্রয়োজন অনুযায়ী মনোযোগ দিবে না এবং সেইগুলি মনে রাখিবারও চেষ্টা করিবে না।

৮। বর্ণনা একটানা দীর্ঘ হইবে না, তাহা হইলে বর্ণনা একঘেয়ে হইয়া দাঁড়াইবে। বর্ণনার সাথে সাথে প্রদীপন বা শিক্ষা সরঞ্জাম দেখাইয়া ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহল বর্ধিত করা প্রয়োজন।

৯। পাঠের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্ণনা দান করিতে হইবে এবং অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করিতে হইবে।

২। **ব্যাখ্যা**—ছাত্রছাত্রীগণ যে কোন বিষয়ের বর্ণনা শুনিয়াই সেই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবে, এমন নয়। অনেক সময় কোন বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াও ছাত্রছাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দিতে হয়। ভাষার কাঠিন্য দূর করিবার জন্যই যে শুধু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, এমন নহে, ভাবের কাঠিন্য দূর করিবার জন্যও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব শুধু সাহিত্যের পাঠে নয়, প্রায় সমস্ত বিষয় পাঠদানের ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে। ভাল ব্যাখ্যা বলিতে শব্দের পরিবর্তে শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তে বাক্য দিলেই হইবে না। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কঠিন ভাষার বদলে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করিতে হয় এবং বিষয়টি ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন হয়। ভাবের বিশ্লেষণও বিস্তৃত করিতে পারিলে বিষয়টি সহজ হইয়া আসিবে। সম্পর্কযুক্ত তথ্যও সাথে সাথে প্রকাশ করা চলে। উদাহরণ ও কার্য-প্রদর্শন (Demonstration) দ্বারাও ব্যাখ্যার কাজ সম্পন্ন হয়।

৩। **প্রশ্ন**—শিক্ষাদান-কৌশল বিভিন্ন রকমের আছে। ইহাদের মধ্যে প্রশ্নের স্থান সর্বোচ্চে। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নের সাহায্য ছাড়া পাঠদান কার্যে সম্পূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করা যায় না। কোন জিনিষ শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্রদের মানসিক সহযোগিতা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের মানসিক সহযোগিতা লাভে প্রশ্ন দ্বারাই সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য লাভ করা যায়। প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, তাহাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগরিত করা যায়, তাহাদিগকে চিন্তা করিতে এবং পাঠকে ভালভাবে বুঝিবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান পরীক্ষা করা হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে তাহা প্রয়োগ

করিবার সুবিধা প্রশ্নের সাহায্যেই করা হয়। এই সব কারণে প্রশ্ন শিক্ষাদান কার্যের সফলতা লাভে খুব বেশী সাহায্য করিয়া থাকে।

দক্ষতার সঙ্গে প্রশ্ন করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। দক্ষতার সঙ্গে প্রশ্ন করার মধ্যেই শিক্ষাদান কার্যের বীজ সম্পূর্ণভাবে নিহিত রহিয়াছে। প্রশ্ন ভাল না হইলে পাঠদান সাফল্যমণ্ডিত হয় না।

প্রশ্নকে শিক্ষাবিদগণ প্রথমে সাধারণ ভাবে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন— **স্বাভাবিক ও আনুষ্ঠানিক** (Natural and Formal)। স্বাভাবিক প্রশ্ন হইতেছে তাহা যাহা দ্বারা প্রশ্নকারী কোন কিছু জানিতে চায়। শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্নগুলি এই ধরণের। আনুষ্ঠানিক প্রশ্নগুলি হইল ছাত্রছাত্রীদের কতকগুলি উত্তর দিবার জন্য। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বিদ্যালয়ে অতীত কালে যে সব প্রশ্ন করা হইত সবই শিক্ষকের প্রশ্ন। ছাত্রছাত্রীর স্বাভাবিক প্রশ্ন সর্বদাই শিক্ষক ও অভিভাবকদের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া আসিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, তোমরা এত কথা জিজ্ঞাসা করিও না, তোমাদের প্রশ্নের জ্বালায় পাগল হইয়া যাইব, ইত্যাদি। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের বা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্ন যে শিক্ষাক্ষেত্রে কত বেশী শিক্ষামূলক তাহা আমরা বর্তমান সময়ে বুঝিতেছি। পূর্বে ছাত্রছাত্রীরা কেবল শিক্ষক যাহা বলিতেন, তাহা জানিত, শিক্ষকের সাথে তাহাদের সহযোগিতা ছিল না। বর্তমান সময়ে শিক্ষকের পাঠদানের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা রহিয়াছে, অতএব ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করিবার নানা ভাবে সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রশ্নের উদ্দেশ্য ও কাজ—প্রশ্নের অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্ব হইল ছাত্রছাত্রীদিগকে চিন্তা করিতে অনুপ্রাণিত করা। তাহা ছাড়া শিক্ষক অন্য একটি কারণেও প্রশ্নগুলিকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি প্রশ্নের সাহায্যে জানিতে চান, ছাত্রছাত্রীগণ তাহাদের অর্জিত বিদ্যা কতটুকু স্মরণ রাখিতে পারিয়াছে। পক্ষান্তরে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন দ্বারা এবং শিক্ষকের প্রশ্নের দ্বারাও বটে, শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের মনের চিন্তার ধারা বুঝিতে সক্ষম হন। ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন বা উত্তর হইতে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের প্রশ্নের বিষয়-বস্তু কতটা হজম করিতে পারিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে। ইহার ফলে শিক্ষকের পক্ষে সুবিধা হয়। তিনি পরবর্তী ক্ষেত্রে কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারেন।

শিক্ষক প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে পারেন যে কোন ছাত্রছাত্রী পাঠে খারাপ, প্রশ্নের ব্যাখ্যায় অসতর্ক, শব্দসম্পদে কম, ভাবকে সংগঠিত করিয়া বর্ণনা দিতে অক্ষম, তুলনামূলক কাজে অপটু, মূল্যায়ন করিতে অপারক। লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীদের এইসব ত্রুটি ধরা যায়ই। মৌখিক প্রশ্নের উত্তর শুনিয়াও শিক্ষক ছাত্রছাত্রী যে কোন স্তরের অন্তর্গত তাহা বাহির করিতে পারেন।

শিক্ষক যদি বুদ্ধি করিয়া ছাত্রছাত্রীদের কোন বিষয়ে আগ্রহ তাহা জানিতে চান, তাহা হইলে তিনি সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রশ্ন করিবেন। একটু সাবধানতা অবলম্বন করিয়া প্রশ্ন করিলেই ছাত্রছাত্রীরা তাহারা কোন জিনিসে আনন্দ পায় তাহা বলিয়া দিবে। অতএব প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ কোথায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করে এবং পক্ষান্তরে আগ্রহ যে শিক্ষার মূলে তাহাও সর্বজনবিদিত।

উত্তম প্রশ্নের লক্ষণ

১। শিক্ষক এমনভাবে প্রশ্ন রচনা করিবেন যাহাকে প্রশ্নটি কি তাহা ছাত্রছাত্রীরা ভালভাবে বুঝিতে পারে। ছাত্রছাত্রীগণ হয়ত প্রশ্নটির উত্তর কি তাহা জানে না, কিন্তু প্রশ্নটির ভাষা ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য হইবে এই ভাবে প্রশ্নটি রচিত হইবে।

২। প্রশ্নটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত হইবে। অনেক সময় এমন প্রশ্ন করা হয় যেগুলি যাহাদের নিকট উপস্থিত করা হইল, তাহাদের কাছে শক্ত। যেমন ভারতের রাষ্ট্রপতি কে? ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই প্রশ্ন সহজ। কিন্তু যদি তাহাদের কাছে প্রশ্ন করা হয় যে 'রাষ্ট্রপতি কি?' তাহা হইলে উহার ভাষা সহজ হইলেও, উহার অর্থ ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজ নয়। অতএব ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়া প্রশ্ন করিতে হইবে।

৩। একটি উত্তম প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীকে চিন্তা করিতে, তুলনা করিতে, মূল্যায়ন করিতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে প্রেরণা দান করিয়া থাকে। 'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীর নাম কর'—এই প্রশ্ন বিষয়গত এবং ছাত্রছাত্রীকে চিন্তা করিবার ও যুক্তিদ্বারা উত্তর বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হয় না। ইহা সম্পূর্ণ স্মৃতির ব্যাপার। এই জাতীয় প্রশ্নেরও প্রয়োজন আছে, কারণ ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের যে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা শ্রবণ

করিয়াছে, তাহা তাহাদের মনে আছে কিনা তাহা এই জাতীয় প্রশ্ন দ্বারা পরখ করিয়া দেখিতে হয়। কিন্তু উত্তম প্রশ্ন যদি ছাত্রছাত্রীর মানসিক শক্তিকে গতিশীল করিয়া তোলে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা হইলে এই রকম প্রশ্ন করা যায়, 'তোমরা কি মনে কর যে রাজধানী হইবার মত উপযুক্ত স্থানে দিল্লী অবস্থিত?' এই প্রশ্নে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তায় খোরাক মিলিবে, তাহারা যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্তে আসিতে চেষ্টা করিবে।

৪। প্রশ্নগুলি এমন ভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে যথাযথ উত্তর পাওয়া যায়, যাহার উত্তর অস্পষ্ট ও সাধারণ হয় না। যদি প্রশ্ন করা যায়, 'সাধারণ মানুষের সাধারণতঃ কি কি দোষত্রুটি দেখা যায়?' এই প্রশ্নের উত্তর সঠিক হইবে না, অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট হইবে। কিন্তু যদি বলা যায়, 'গত সপ্তাহে কি কি নূতন বই পড়িয়াছ?' এইখানে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক ও যথাযথ উত্তর দিবার মত বিষয়বস্তু রহিয়াছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদিগকে অভিজ্ঞতা হইতে সাধারণ সিদ্ধান্তে আসিতে শিক্ষা দিতে হইবে। ঐ অবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা মস্তিষ্ক খাটাইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যথা, 'চড়ুইভাতি তোমার ভাল লাগিল কেন?' এইরূপ প্রশ্নে ছাত্রছাত্রীরা মস্তিষ্ক খাটাইয়া উত্তর প্রদান করিবে।

৫। প্রশ্ন সাধারণতঃ এইরূপ হইবে যে তাহার উত্তর যেন মাত্র একটি হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কে ছিলেন এবং তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্য কি করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের মধ্যে দুইটি প্রশ্ন রহিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর করিতে ছাত্রছাত্রীরা অসুবিধা বোধ করিবে, কারণ ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহাদের মানসিক চিন্তার ধারার পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিতে হইবে।

৬। প্রশ্নের উত্তর যেন শিক্ষকের কথার পুনরাবৃত্তি না হয়, কিংবা প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' 'না' না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 'অশোক বলিতেন যে তিনি ধর্মপ্রচার দ্বারা সকলকে স্বীয় অধীনে আনয়ন করিবেন।' "অশোক কি বলিতেন?" এই প্রশ্ন হইতে শিক্ষক যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া ছাত্রছাত্রী তাহার উত্তর শেষ করিবে। ইহাতে ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিশক্তির বা চিন্তাধারার গতিবিধির কোন কিছুই পরীক্ষা করা হইল না।

৭। প্রশ্ন উত্তরনির্দেশক (leading) হওয়া উচিত নয়। "হুমায়ুন কি শের শাহ দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন?"—এইরূপ প্রশ্ন করা উচিত নয়।

৮। নানা প্রকারের প্রশ্ন হওয়া উচিত। এক রকম ভাষায় বা এক রকম আকারের প্রশ্ন করিলে প্রশ্নগুলি সব একঘেয়ে হইয়া যাইবে এবং ছাত্রছাত্রীগণ চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিতে চেষ্টা করিবে। 'হাঁ' 'না' উত্তর যে সব প্রশ্নগুলিতে আছে, সেইখানে ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় আন্দাজে উত্তর দিয়া থাকে। বইয়ের ভাষায় প্রশ্ন করা উচিত নয়।

৯। শিক্ষক সজীবভাবে উচ্চৈঃস্বরে সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে শ্রবণ করা সম্ভব এমন স্বরে প্রশ্ন করিবেন। ইতস্ততঃ করিয়া আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলে শ্রেণীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

১০। প্রশ্নগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত থাকে এই ভাবে প্রশ্ন করিলে ছাত্রছাত্রীগণ পাঠের গতি ভালভাবে বুঝিতে পারে।

১১। প্রশ্ন করিবার সময় শিক্ষক সমগ্র শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিবেন। তাহার পর একটু থামিয়া যাহারা হাত উঠাইয়াছে, কিংবা সোপান অনুযায়ী যাহারা হাত উঠায় নাই, তাহাদের মধ্যে একজনকে উত্তর দিতে বলিতে পারেন। একটি ছাত্রছাত্রীকে নির্দিষ্ট করিয়া প্রশ্ন করা উচিত নয়। পূর্বের পন্থামত প্রশ্ন করিলে সকলেই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া লয়। কিন্তু একজনকে নির্দিষ্ট করিয়া প্রশ্ন করা হইলে শ্রেণীর অপরাপর ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নের দিকে মন নাও দিতে পারে, উত্তরের জন্য প্রস্তুত হওয়া ত দূরের কথা।

উত্তম উত্তর ও তাহা গ্রহণ

১। উত্তর জিজ্ঞাস্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের পরিচয় দিবে ইহাই উত্তম উত্তরের মূল কথা।

২। উত্তর সম্পূর্ণ হইবে, প্রশ্নের ভিতর যাহা চাওয়া হইয়াছে, তাহার উত্তর যেন উত্তরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে থাকে, তাহা দেখিতে হইবে।

৩। উত্তর সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইবে।

৪। সংক্ষেপ ও সরল ভাষায় উত্তর দিতে হইবে।

৫। পুস্তকের ভাষা ব্যবহার না করিয়া ছাত্রছাত্রী নিজ ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিবে।

৬। সুস্পষ্টস্বরে ছাত্রছাত্রীরা উত্তর দিবে, যাহাতে শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রী শুনিতে পারে।

ছাত্রছাত্রী যদি শুদ্ধ উত্তর প্রদান করে তবে তাহা প্রশংসার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেও তাহাকে উৎসাহ দান করিতে হইবে। ভুল উত্তর দিলে তাহাকে ভৎর্সনা না করিয়া তাহাকে শুদ্ধ উত্তর দিবার জন্য সাহায্য করিতে হইবে।

ভুল উত্তর ও তাহার সংশোধন

১। ভুল উত্তর দিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে এবং শুদ্ধ উত্তর দিবার জন্য তাহাকে কিছু উত্তর বলিয়া শুদ্ধ উত্তরের পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

২। আংশিক শুদ্ধ উত্তর দিলে, শুদ্ধ উত্তরকে গ্রহণ করিয়া অশুদ্ধ উত্তরকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে এবং ঐ অংশের শুদ্ধ উত্তর দিবার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩। অনেক সময়ে ছাত্রছাত্রীরা আনুমানিক উত্তর দিয়া থাকে। এইরূপ উত্তর দিবার অভ্যাস অত্যন্ত খারাপ। ইহার কারণ এই যে ছাত্রছাত্রী যদি আনুমানিক উত্তরে অভ্যস্ত হয় তাহা হইলে সে কখনও চিন্তা করিয়া শুদ্ধ উত্তর দিতে পারিবে না। উত্তরের অসাবধানতা ছাত্রছাত্রীকে দেখাইয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রী নিজের আনুমানিক উত্তরের জন্য লজ্জিত হইয়া শুদ্ধ উত্তর দানের জন্য সচেষ্ট হইবে। অনেক সময় ছাত্রছাত্রীরা ভাল ভাবে প্রশ্নের চিন্তা না করিয়া অসতর্ক উত্তর দেয়। এই ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করিবেন এবং ছাত্রছাত্রীকে চিন্তা করিবার সুযোগ দিবেন।

৪। ছাত্রছাত্রীগণ অনেক সময় প্রশ্নের যতটা উত্তর হওয়া উচিত তাহার চেয়েও বেশী বলিয়া ফেলে। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীকে এই বিষয়ে সংযত করিবেন। তাহা ছাড়া অনেকে উত্তর খুব বেশী বানাইয়া বলে। এই ক্ষেত্রেও শিক্ষক ছাত্রছাত্রীকে সংক্ষেপে যথাযথ উত্তর দিতে নির্দেশ দান করিবেন।

৫। অনেক সময় ছাত্রছাত্রী নির্বুদ্ধিতার জন্য হাস্যকর উত্তর দেয়। শিক্ষক এই ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীকে শাস্তি না দিয়া প্রশ্নটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া সঠিক উত্তর আদায় করিবার চেষ্টা করিবেন।

৬। সকল ছাত্র এক সঙ্গে অনেক সময় উত্তর দিয়া থাকে। শিক্ষক এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হইবেন। এইরূপ উত্তর যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা না দেয়

তাহার জন্য শিক্ষক পূর্বেই উত্তর দানের রীতি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীকে বলিয়া দিবেন। শিক্ষক প্রশ্ন করিবেন সমগ্র শ্রেণীকে। যাহারা পারিবে, তাহারা হাত উঠাইবে। যাহারা হাত উঠাইবে তাহাদের মধ্য হইতে শিক্ষক একজনকে নির্দেশ দিবেন। সে উত্তর দিবে, অন্য কেহ বা সমবেতভাবে প্রশ্নের উত্তর দিলে চলিবে না।

৭। অনেক সময় দেখা যায় যে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীই উত্তর দানে অপারক হইল। ইহা দেখিতে পাইলে শিক্ষক মনে করিবেন যে তাঁহার শিক্ষাদানের মধ্যে কোন ত্রুটি রহিয়াছে। না হইলে সকল ছাত্রছাত্রী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না কেন? এই অবস্থায় শিক্ষক স্বীয় বক্তব্য বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের কাছে পুনরায় তুলিয়া ধরিবেন। ঐ বিষয়ে কাহারও কোন প্রশ্ন থাকিলে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি প্রশ্ন করিতে পারেন এবং যদি বিষয়টি খুব কঠিন হয় তাহা আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়াও প্রশ্ন করিয়া যাইতে পারেন। ইহাতে ফল ভাল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন

প্রশ্নকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে; যথা—(১) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (Testing Questions), (২) শিক্ষামূলক প্রশ্ন (Training Questions), এবং (৩) শাসনমূলক প্রশ্ন (Disciplinary Questions)।

১। **পরীক্ষামূলক প্রশ্ন**ঃ—ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য এই ধরণের প্রশ্ন করা হইয়া থাকে। এইরূপ প্রশ্নের দ্বারা ছাত্রছাত্রীর মনকে কিছুটা পিছনে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা স্মৃতির সাহায্যে যে জ্ঞান পূর্বে অর্জন করিয়াছে, তাহা চেতনার কেন্দ্রস্থলে পুনরায় আনয়ন করিয়া তাহা বর্ণনা করিবার জন্য ছাত্রছাত্রীকে বলা হয়। পাঠের বিভিন্ন সোপান আছে। বিভিন্ন সোপানে এইরূপ প্রশ্ন করা হইবে। যথা,—

(ক) **প্রস্তুতিকরণের জন্য প্রশ্ন** (Preparatory Questions)

পাঠের প্রথম অংশেই এই ধরণের প্রশ্ন করা হয়। পাঠের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার পরীক্ষা করা হয় এবং নূতন পাঠের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে ছাত্রছাত্রীদের সমবেক্ষণ মণ্ডল জাগরিত হয় এবং নূতন জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাহাদের মনে উৎসাহের সঞ্চার

হয়। আকবরের পাঠের পূর্বে হুমায়ুন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। তাহার পর 'হুমায়ুনের মৃত্যুর পর কে সম্রাট হইলেন'—জিজ্ঞাসা করিয়া নূতন পাঠ ঘোষণা করা যায়। এই ভাবে ছাত্রছাত্রীদের মন নূতন পাঠের জন্য প্রস্তুত হইবে।

(খ) পাঠানুসরণ পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন (Questions for testing pupil's comprehension).

পাঠ উপস্থাপন করা হইলে পাঠটিকে বিভিন্ন শীর্ষে ভাগ করা হয়। শিক্ষক যখন প্রথম শীর্ষের বর্ণনা দান করিতেছেন, তখন তাঁহাকে ছাত্রছাত্রীগণ ভাল ভাবে অনুসরণ করিতেছে কিনা বুঝিবার জন্য বর্ণনা কালে ছোট ছোট প্রশ্ন করা হয়। ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের পাঠদান অনুসরণ করিতেছে কিনা তাহা বুঝিতে পারা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যও এখানে সাধিত হয়। ইহাতে যেমন ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ ও বোধশক্তির পরীক্ষা হয়, তেমনই শিক্ষকের পাঠদানে কোনও ত্রুটি থাকিলে তাহাও ধরা পড়ে। যদি বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকের পাঠদানের অনুসরণ করিতে না পারে, তবে বুঝিতে হইবে যে শিক্ষকের পাঠদানে কোনও রূপ ত্রুটি বিদ্যমান। ঐরূপ ঘটিলে শিক্ষককে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া নিজের ত্রুটি বাহির করিতে হইবে এবং উহা সংশোধনও করিতে হইবে। এই স্তরের এইরূপ প্রশ্নে পাঠের একঘেয়েমি নষ্ট হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলিতে পারা যায় যে, এই স্তরের এইরূপ প্রশ্ন শিক্ষকের বর্ণনাকে বাধা দেয় এবং একটি অখণ্ড বিষয়কে গড়িয়া তুলিতে পারা যায় না। শিক্ষকের সমগ্র বর্ণনা ছাত্রছাত্রীদের মনে যতটা রেখাপাত করিবে, প্রশ্ন দ্বারা খণ্ডিত বর্ণনা অনেক সময়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে ততটা রেখাপাত করে না। অতএব বর্ণনার চিত্তাকর্ষক প্রভাব যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহাও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(গ) পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন (Recapitulatory Questions).

প্রত্যেক সোপানের শেষে এই জাতীয় প্রশ্ন করা যায়। ইহার সাহায্যে পাঠদান কিরূপ হইল তাহার ফল নিরূপণ করা যায়, প্রদত্ত জ্ঞান শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এবং পুনরাবৃত্তির জন্য ছাত্রছাত্রীরা ভাল ভাবে বিষয়বস্তু বুঝিতে সক্ষম হয়। উপস্থাপনের সোপানে প্রত্যেক শীর্ষের শেষে এইরূপ প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নগুলিকে সম্পর্কযুক্ত ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া সাজাইতে হইবে।

এই সময়ে উত্তরের দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে পাঠের সারাংশ প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রশ্নগুলি এইরূপ হইবে যে ছাত্রছাত্রী যেন শিক্ষকের কথার পুনরাবৃত্তি না করে, তাহারা যেন চিন্তা করিয়া গুছাইয়া কিছু বলার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে। প্রয়োগের (Application এর) ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রশ্ন বিশেষ আবশ্যক।

এইখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষক শ্রেণীর সম্মুখে প্রশ্ন করিবেন, এবং সকল সময়ে যে শুধু যে ছাত্রছাত্রীরা হাত উত্তোলন করিয়াছে, তাহাদের প্রশ্ন করিবেন এমন নয়, যাহারা হাত তুলিল না, তাহারা কেন হাত তুলিল না তাহা শিক্ষককে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী উত্তর করিতে না পারিলে তাহা শিক্ষকের ত্রুটিজনিত তাহা সন্দেহ নাই। সেখানে তিনি উত্তরটির পুনরালোচনা করিবেন। কিন্তু যদি অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে তাহা হইলে শিক্ষক যে ছাত্র উত্তর দিতে পারে, তাহাকে দিয়া বলাইয়া যাহারা পারে নাই, তাহাদের দ্বারা বলাইবেন।

(২) **শিক্ষামূলক প্রশ্ন** (Training Questions)

শিক্ষামূলক প্রশ্ন পরীক্ষামূলক প্রশ্নের বিপরীত। পরীক্ষামূলক প্রশ্নের দ্বারা আমরা ছাত্রছাত্রীর অধীত বিদ্যা যাচাই করিয়া দেখি, অতীতে সে কি জ্ঞান অর্জন করিয়াছে, তাহার হিসাব, অর্থাৎ এই জাতীয় প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদিগকে পিছন দিকে হটাইয়া দেয়। কিন্তু শিক্ষামূলক প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদিগকে পিছন দিকে হটাইয়া দেয় না, সম্মুখ দিকে চালিত করে, নূতন জ্ঞান আহরণ করার দিকে ঠেলিয়া দেয়। এই জাতীয় প্রশ্ন নূতন সত্যকে আবিষ্কার করিতে সাহায্য করে। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীর কাছে লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিতে থাকিবেন যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা অনুসন্ধানের পথ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাইয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীগণ তখন সেই পথ অবলম্বন করিয়া স্বীয় চেষ্টায় গন্তব্য স্থলে যাইয়া পৌছিতে পারে। শিক্ষক এই জাতীর প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীকে সঠিক ভাবে চিন্তা করিতে ও বিচার করিতে প্রবৃত্ত করিয়া নূতন সত্য খুঁজিয়া বাহির করিতে সাহায্য করিতে পারেন। যথা,—

প্রশ্ন—আমরা আকাশে কি ভাবে ভ্রমণ করি ?

উত্তর—আমরা এরোপ্লেনের সাহায্যে আকাশে ভ্রমণ করি।

প্রঃ—আকাশে আমরা যথা ইচ্ছা তথায় যাইতে পারি ?

উঃ—না, তাহা আমরা পারি না।

প্রঃ—কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারি ?

উঃ—যে স্তর পর্যন্ত বাতাস থাকে সেই স্তর পর্যন্ত যাইতে পারি।

প্রঃ—বাতাসের উপরের স্তরের স্থানকে কি বলে ?

উঃ—ঐ স্থানকে মহাশূন্য বলা হয়।

প্রঃ—মহাশূন্যে যাইতে হইলে আমরা কি ভাবে যাইতে পারি ?

উঃ—রকেটের সাহায্যে এ্যাটলাস বা স্পুটনিক করিয়া যাইতে পারি।

প্রঃ—পৃথিবীর আকর্ষণের বাহিরে কি রকেটের সাহায্যে যাওয়া যায় ?

উঃ—হ্যাঁ, যাওয়া যায়।

প্রঃ—গ্রহ ও উপগ্রহগুলি কোথায় রহিয়াছে ?

উঃ—মহাকাশে রহিয়াছে।

প্রঃ—এখন বল, গ্রহ ও উপগ্রহগুলিতে যাওয়া যাইতে পারে কি করিয়া ?

উঃ—রকেটের সাহায্যে যাওয়া যাইতে পারে।

প্রঃ—এখনও কেন যাওয়া যায় নাই ?

উঃ—মহাকাশ ভ্রমণে এখনও খুব দক্ষতা অর্জন করা হয় নাই।

যে সকল ছাত্রছাত্রীর বিচার-শক্তি বিকশিত হয় নাই, শিক্ষামূলক প্রশ্নের সাহায্যে ঐ সকল ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করিতে কিংবা কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন কি ভাবে করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। একটি গল্প বলার মধ্যে শিক্ষক থামিয়া গল্পের কোন ব্যক্তি কোন অবস্থায় কি করিবে তাহা অনুমান করিতে বলা যায়, কিংবা কোন একটি বিষয় অর্ধেক বলিয়া শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে সমাপ্তির দিকে লইয়া যাইতে পারেন।

শাসনমূলক প্রশ্ন (Disciplinary Questions)

এই জাতীয় প্রশ্ন পরীক্ষামূলক প্রশ্নের ন্যায়, কিন্তু ইহা ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান পরীক্ষার জন্যই প্রয়োগ হয় না, ইহা প্রয়োগ হয় শ্রেণীকে সুশাসনে রাখিবার জন্য। অনেক সময়ে ছাত্রছাত্রী পাঠে অমনোযোগী হয়। তাহাকে শ্রেণীর কাজে মনোযোগী করিবার জন্যই এই জাতীয় প্রশ্ন করিতে হয়। ঐরূপ প্রশ্ন করিলে সে লজ্জা পাইয়া পাঠে মনোযোগী হইবে। অনেক সময় দেখা যায় শ্রেণীতে গোলমাল হয়। গোলমাল কমাইবার জন্য কোনও রূপ শাসনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া শ্রেণীর কাছে একটি কঠিন প্রশ্ন রাখিলে শ্রেণীর গোলমাল বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। অনেক

সময় অনেক দাম্ভিক ছাত্রছাত্রী থাকে, শিক্ষক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কঠিন প্রশ্ন করিলে তাহার দাম্ভিকতা কমিবে এবং সে শ্রেণীতে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করিবে না এবং পাঠে মনোযোগী হইবে।

উত্তর গ্রহণে শিক্ষকের কয়েকটি ত্রুটি

(১) ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের অভীপ্সিত আকারে বা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই বলিয়া শিক্ষক অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের উত্তর অগ্রাহ্য করেন। ইহা করা কদাচ উচিত নয়। কারণ শিক্ষককে অন্ধভাবে অনুকরণই ইহাতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ছাত্রছাত্রী নিজে চিন্তা করিয়া চিন্তাধারার সামঞ্জস্য করিয়া উত্তর প্রদান করিতে শিক্ষালাভ করে না। নিজ ভাষায় ছাত্রছাত্রী যদি গুছাইয়া বলিতে পারে সেই দিকেই শিক্ষকের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

(২) অনেক সময় শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীগণ হইতে উত্তর লাভের ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু দেখা যায়। ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। সেই সময়টুকু ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া উচিত। অতএব অসহিষ্ণু হইয়া উত্তর চাহিলে শিক্ষক অন্যায় করিবেন। উহাতে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তাধারার ব্যাঘাত হয়, ইহা শিক্ষকের বুঝিতে পারা উচিত।

(৩) কয়েক জন ছাত্রছাত্রীকেই বার বার প্রশ্ন করা উচিত নয়। শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীকেই প্রশ্নের উত্তর দিবার সুযোগ দিতে হইবে। শিক্ষকের যদি কয়েকটি নির্দিষ্ট ছাত্রছাত্রী থাকে, যাহারা বরাবর প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহা হইলে অপরে আর শিক্ষকের পাঠ গ্রহণ করিবার জন্য বেশী উৎসাহ প্রকাশ করিবে না।

(৪) শিক্ষক অনেক সময় উত্তর গ্রহণে ও উত্তর সংশোধনে অধিক সময় ব্যয় করিয়া থাকেন। অনেক সময় তিনি উত্তর গ্রহণে ইতস্ততও করেন। ইহাতে শ্রেণীর মূল্যবান সময় নষ্ট হইয়া থাকে এবং ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের দুর্বলতার হদিশ পায়।

(৫) অনেক সময় দেখা যায় যে একজন ছাত্র বা ছাত্রী প্রশ্নের উত্তর দিতেছে, অন্য ছাত্রছাত্রীরা তাহাকে উত্তর দানে ইঙ্গিত দিতেছে বা সাহায্য করিতেছে। উত্তরে মৌখিক সাহায্যদান এবং পরীক্ষার হলে কাহাকেও সাহায্য করা একই অপরাধ। শিক্ষক অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে এই মন্দ অভ্যাস সংশোধন করিবেন। যে ছাত্র বা ছাত্রী ইঙ্গিত করিতেছে

তাহাকে শাসনমূলক প্রশ্ন করিয়া লজ্জা দিতে হইবে এবং পরে প্রয়োজন হইলে স্থানান্তরে বসিতে দিতে হইবে।

(৬) অনেক সময় দেখা যায় ছাত্র বা ছাত্রী প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরী করিলে শিক্ষক নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করেন। ইহা শিক্ষকের অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক। তিনি পূর্বে দেখিবেন, ছাত্রছাত্রীগণ কতটা বলিতে পারে, বিষয়গত অধিকার তাহার কতটা আছে তাহা পূর্বে দেখিতে হইবে, পরে যদি তিনি দেখিতে পান যে ছাত্রছাত্রী গুছাইয়া বলিতে পারিতেছে না, তখন তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন। যদি দেখিতে পান যে শ্রেণীর কোন ছাত্রছাত্রীই সে প্রশ্নের উত্তর বলিতে পারিল না, তখন তিনি বুঝিবেন যে পাঠদানে ভুল রহিয়াছে। তিনি ঐ সময় প্রশ্নটির উত্তর না দিয়া পাঠ্যাংশটি পুনরায় বুঝাইয়া দিবেন।

(৭) অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষক কোন ছাত্রছাত্রীর উত্তর অনুমোদনও করেন না, অগ্রাহ্যও করেন না এবং পরে তিনি অন্য কোন ছাত্রছাত্রীকে প্রশ্ন করেন। ইহাতে শুদ্ধ উত্তর সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের মনে সন্দেহ জাগ্রত হইতে পারে এবং তাহারা অশুদ্ধ উত্তরকেও শুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারে।

(৮) অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষক নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে বলিয়া ভুল উত্তর সংশোধন না করিয়া এড়াইয়া যান। শিক্ষক যাহাতে এইরূপ অবস্থায় না পড়েন তাহার জন্য তিনি পূর্বেই পাঠটি ভাল ভাবে প্রস্তুত করিয়া আসিবেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি শ্রেণীতে এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যাহা তিনি জানেন না, তাহা হইলেও তাঁহার পক্ষে এড়াইয়া যাওয়া কোনও ক্রমেই উচিত হইবে না। শ্রেণীতেই তিনি অভিধান বা Reference বই দেখিতে পারেন কিংবা পরের দিন সঠিক উত্তর দিবেন বলিয়া যাইতে পারেন। নিজের কোন ভুল-ত্রুটি হইলে শিক্ষকের পক্ষে তাহা স্বীকার করাই উচিত; ইহাতে শিক্ষকের মর্যাদা বাড়িবে বই কমিবে না, কারণ যদি ছাত্রছাত্রীরা একবার জানিতে পারে যে শিক্ষক যাহা পড়াইয়াছেন তাহা ভুল, তাহা হইলে তাহাদের শ্রদ্ধা যে শিক্ষকের উপর হইতে কমিয়া যাইবে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ। শিক্ষকের ভুল না হওয়াই চাই, কিন্তু যদি হয় তবে তাহা সরলভাবে স্বীকার করাই বাঞ্ছনীয়।

৩। অডিও-ভিস্যুয়াল শিক্ষা-সরঞ্জাম বা শ্রাব্য ও দৃশ্য শিক্ষা-সরঞ্জাম।

শিক্ষাক্ষেত্রে অডিও-ভিস্যুয়াল শিক্ষা-সরঞ্জাম উল্লেখ করিতে হইলে অডিও-ভিস্যুয়াল বলিতে কি বুঝিতে পারা যায় তাহা আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। চোখে দেখা ও কাণে শোনার শিক্ষা-সরঞ্জামের মধ্য দিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকে শ্রাব্য ও দৃশ্য বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা বলা হয়। আমাদের যত ইন্দ্রিয় আছে তাহার মধ্যে চোখ ও কাণ দুইটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটি ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা যাহা দেখি বা শুনি তাহা আমাদের মনে বেশী করিয়া গাঁথিয়া থাকে। যাহা আমরা চোখে দেখি তাহা আমরা তাড়াতাড়ি ভুলি না, যাহা আমরা কানে শুনি তাহাও আমরা সহজে বিস্মৃত হই না। এই কারণে শিক্ষা-বিদ্‌গণ এই দুইটির সাহায্য লইয়া শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। শিক্ষণীয় বস্তু সকলেরি সব সময়ে চোখে দেখা ও কাণে শোনা সম্ভবপর হয় না, তাই কৃত্রিম উপায়ে বাস্তব জিনিসের অনুরূপ শিক্ষাসরঞ্জাম উপস্থাপিত করিতে হয়। যেমন ভূগোল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের নিয়া দেশে বিদেশে ঘুরাইয়া শিক্ষাদান করা অসম্ভব। সে সকল স্থলে ভূগোল শিক্ষা দিতে হইলে প্রচুর ছবি ও মানচিত্রের ব্যবহার হইলে শিক্ষা অনেকটা বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিবে। নিছক বইয়ের লেখা ও শিক্ষকের কথা শুনিয়া শিক্ষালাভ করার চাইতে কিছু শিক্ষা-সরঞ্জামের সাহায্য লইলে পাঠ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে চিত্তাকর্ষক হইবে।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক শিক্ষাসরঞ্জাম তৈয়ারী হইয়াছে এবং অনেক নূতন নূতন শিক্ষা-সরঞ্জাম তৈয়ারী করিবার চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য প্রাচীন কালেও দৃশ্য বস্তুর সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল; যেমন বহু মন্দিরগাত্রে আজও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় উৎকীর্ণ দেখা যায়। কিন্তু ঐ সময় বর্তমানের মত উহা এত ব্যাপক ছিল না। গত ২৫।৩০ বৎসর যাবৎই পাশ্চাত্ত্য দেশ-সমূহে এই শিক্ষাসরঞ্জামের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। এই শিক্ষাসরঞ্জামগুলি হইতে আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির প্রায় সকল বিদ্যালয়েই এই শিক্ষা-সরঞ্জামগুলির প্রচুর ব্যবহার দেখা যাইতেছে।

আমাদের দেশেও শ্রাব্য ও দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলির প্রচলন কিছু দিন যাবৎ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যেখানেই ইহার প্রচলন হইয়াছে, সেখানেই উহার ভাল ফল দেখা গিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, শ্রাব্য ও দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলি শিক্ষাদানের মাধ্যম এবং ইহাদের সঠিক প্রয়োগ হইলে ইহার সুফল পাওয়া যাইবে।

শ্রাব্য ও দৃশ্য শিক্ষা-সরঞ্জামগুলির ব্যবহারের সুবিধা

১। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সকল ক্ষেত্রেই ভাল এবং তাহা আমরা সর্বদাই চোখ ও কানের সাহায্যে গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমরা সকল সময়ে লাভ করিতে পারি না এবং অনেক সময় উহা সহজলভ্যও নয়। যেমন, সহরে বসিয়া থাকিলে গ্রামের চাষবাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয় না। সেইরূপ গ্রামের ছেলেমেয়েরও সহরে আসিয়া সহরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয় না। এই সব ক্ষেত্রে কয়েকটি উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবকে যথেষ্ট পরিমাণে পূরণ করিতে পারিবে।

২। বহু জিনিস আছে যাহা চিত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে বোঝান যায় না। উদাহরণস্বরূপ কোন একটি জিনিসের ক্ষয় ও বৃদ্ধির কথা আনয়ন করা যাইতে পারে। চার্টের সাহায্য ছাড়া এই জাতীয় ক্ষয়বৃদ্ধি বোঝান মুস্কিল। গাছ কি ভাবে খাদ্য গ্রহণ করে? ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেওয়া মুস্কিল, কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে গাছের খাদ্য গ্রহণের পরীক্ষা দেখান অসম্ভব নয়। কোন দুইটি পর পর ঐতিহাসিক কাল সম্বন্ধে তুলনা, সামঞ্জস্য স্থাপন ইত্যাদি করিবার প্রকৃষ্ট উপায় মৌখিক বিবরণীর সাহায্যে নয়, কিন্তু উহা চিত্রিত সময়-রেখার সাহায্যে অনেকটা সহজবোধ্য করা যায়।

৩। শিক্ষার বিষয়বস্তু বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে ছাত্রছাত্রীদের অনেক বিষয় পাঠ করিতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়ার ভার লাঘব করিবার জন্য শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষা-সরঞ্জামগুলির সাহায্য লওয়া চলে। ইহাতে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার ভার কিছুটা লাঘব হয়। ধরুন, ছাত্রছাত্রীকে মিশর দেশ পড়িতে হইবে। শিক্ষক বার বার পড়াইতেছেন, ছাত্রছাত্রীও যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছে। এই অবস্থায় যদি মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচয় দিয়া একটি ফিল্ম দেখান হয়, তবে ছাত্রছাত্রীরা ঐ ফিল্ম দেখিয়া মিশর সম্বন্ধে অনেক কিছু

মনে রাখিতে পারে, পড়ার ভার লাঘব হয়, বিনোদনও হইয়া থাকে, শিক্ষককেও পুনরাবৃত্তি করিয়া পড়াইতে হয় না।

৪। ছাত্রছাত্রীরা যেখানে শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলি তৈয়ারী করে, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। ছাত্রছাত্রীগণ সক্রিয়ভাবে সব জিনিস শিক্ষালাভ করিতে পারে।

শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষা-সরঞ্জামগুলির উপকারিতা

১। শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কারণ এই শিক্ষাসরঞ্জামগুলি ছাত্রছাত্রীদিগকে জ্ঞান অর্জনে প্রেরণা যোগায়। তাহার কারণ শিক্ষাসরঞ্জামগুলি ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রথমতঃ নূতন; দ্বিতীয়তঃ ঐ সরঞ্জামগুলি উপস্থাপিত করার ফলে শ্রেণীর পরিবেশ পরিবর্তিত হয়; তৃতীয়তঃ ছাত্রছাত্রীরা ঐ সরঞ্জামগুলি দিয়া কিছু কাজ করিবার প্রয়াস পায়, এবং চতুর্থতঃ এই শিক্ষাসরঞ্জামগুলি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বুঝিতে পারাও সহজ।

২। শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষণীয় বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে। এই শিক্ষাসরঞ্জামগুলি বিষয়সমূহের শিক্ষার বাস্তব উপাদান, মৌখিক শিক্ষাদানে বিষয়বস্তুর বাস্তব দিকটা দেখা যায় না। অনেক সময়ই মৌখিক শিক্ষাদান দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয়টি ভালভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থাপিত করা যায় না, শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলির সাহায্যে উহা সহজবোধ্য হয়।

৩। শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলি বর্ণিত বিষয়ের মানসিক চিত্রগঠনে সাহায্য করে।

৪। এই শিক্ষাসরঞ্জামগুলি ছাত্রছাত্রীর মনে জ্ঞান গাঁথিয়া দেয় ও স্মরণ রাখার সাহায্য করে।

৫। এই শিক্ষাসরঞ্জামগুলি পর্যবেক্ষণশক্তি ও বোধশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জাম ব্যবহারে সতর্কতা

১। যে শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জাম কোন শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ব্যবহৃত হইবে, তাহা যেন শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হয়। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পার্শ্ববর্তী ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া যদি শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষা-

সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ঐ শিক্ষাসরঞ্জাম জ্ঞানার্জনে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে না।

২। শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জাম যেন শিশুর আবেষ্টনীর অন্তর্গত হয়, সেই দিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী যেন ঐ শিক্ষাসরঞ্জাম দেখিয়া উহাদিগকে সহজেই পরিচিত মাধ্যম বলিয়া চিনিতে পারে এইরূপ ভাবে শিক্ষাসরঞ্জামগুলি উপস্থাপিত করিতে হইবে।

৩। কোন একটি বিষয়বস্তু বুঝাইতে নানা প্রকারের অনেকগুলি শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জাম ব্যবহার না করাই ভাল। উহা করিলে ছাত্রছাত্রী শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই হারাইয়া ফেলিবে।

৪। শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলি ছাত্রছাত্রীদের বয়সের উপযোগী হইবে। যে শিক্ষাসরঞ্জাম চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত, তাহা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না।

৫। দামী ও জটিল শিক্ষোপকরণের চাইতে সস্তা সরল সহজ শিক্ষা-সরঞ্জাম শ্রেয়, যদি তাহা বেশী কার্যকরী হয়। অনেক সময় দেখা যায় দামী শিক্ষাসরঞ্জাম ব্যবহার করিয়া ছাত্রছাত্রীদের কোন বিষয় বুঝাইতে পারা যায় না, আবার সেই বিষয়ই সংশ্লিষ্ট সস্তা শিক্ষাসরঞ্জামের দ্বারাই বোঝান যায়।

বিভিন্ন প্রকারের শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জাম

আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশের মত আমাদের দেশেও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বুঝাইবার জন্য নানা ধরণের শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জাম ব্যবহার হইয়া থাকে। নিম্নে বিভিন্ন ধরণের শ্রাব্য-দৃশ্য সরঞ্জামগুলির তালিকা দেওয়া হইল :—

(১) ছবি, (২) ফটো, (৩) ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লানেল বোর্ড ও বুলেটিন বোর্ড, (৪) আদর্শ, (৫) ফ্ল্যাশ কার্ড বা ছবি সম্বলিত কার্ড, যাহা চোখের সম্মুখে ধরা যায়, (৬) ম্যাজিক ল্যান্টার্ন, (৭) এপিডায়োস্কোপ, (৮) গ্রামোফোন, (৯) সিনেমা, (১০) রেডিও, (১১) টেপরেকর্ডার, (১২) চার্ট, (১৩) ডায়াগ্রাম, (১৪) পোষ্টার, (১৫) মানচিত্র, (১৬) গ্লোব, (১৭) পুতুল নাচ, (১৮) অভিনয়, (১৯) পরিভ্রমণ ইত্যাদি।

আমরা মোটামুটি বিভিন্ন ধরণের শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলির বিভিন্ন বিভাগের কথা জানিতে পারিলাম, এখন আমরা এই সব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

১। **ছবি**—ছবির সাহায্যে শিক্ষাদান শিক্ষাদানের ধারায় একটি গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিতে পারা যায় না, তখন চিত্রের সাহায্যে শিক্ষণীয় বস্তুর শিক্ষাদান ছাত্রছাত্রীদের হৃদয় স্পর্শ করিবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। মৌখিক বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত জিনিষের ছবি দেখিতে পারিলে ছাত্রছাত্রীর ঐ বিষয়-বস্তু সহজে মনে রাখিতে পারিবে। ছাত্রছাত্রীরা স্বভাবতঃই ছবি দেখিতে ভালবাসে, সুতরাং ছবির সাহায্যে পাঠদান করিলে ছাত্রছাত্রীর নিকট উহা চিত্তাকর্ষক হয়। তাহা ছাড়া আর একটি বিষয় ছবি বা চিত্র সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে। অতীতের বিষয় অর্থাৎ ইতিহাস শিক্ষা দিবার ক্ষেত্রে ইহার চেয়ে ভাল শিক্ষাসরঞ্জাম আর হইতে পারে না। ছাত্রছাত্রীরা অতীতে বাস করে না, বাস করে বর্তমানে, অতএব তাহাদের চিন্তাক্রমের মধ্যে প্রাচীন যুগের কৃষ্টিধারার খুঁটিনাটি ধরা দেয় না। ছবি ছাত্রছাত্রীদের কাছে অতীত যুগের খুঁটিনাটি ধরাইয়া দেয়। অতএব শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলির মধ্যে ছবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

২। **ফটো**—ফটোগ্রাফ ও ছবি প্রায় একই পর্যায়ে পড়ে। ফটোগ্রাফ কোন জীবন্ত মানুষের বা পরিবেশের প্রতিকৃতি। ইহার সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষণীয় বস্তুবিশেষের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন। বলা বাহুল্য, ছাত্রছাত্রীগণ একটি ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিবে।

৩। ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্ল্যানেলবোর্ড ও বুলেটিন বোর্ড

ব্ল্যাকবোর্ড আমাদের বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষকের নিত্যসঙ্গী। ব্ল্যাকবোর্ডের সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের কাছে নানা বিষয়ের জ্ঞান দান করিতে পারেন। ব্ল্যাকবোর্ডে যে শুধু শিক্ষকই লিখিবেন এমন নহে। ছাত্রছাত্রীরাও তাহাদের ভাবধারা প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার করিবে। ছাত্রছাত্রীরা রঙীন চক ব্যবহার করিয়া নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে পারে। এই সুযোগ ছাত্রছাত্রীদিগকে দিলে ছাত্রছাত্রীরা উহা আনন্দের সঙ্গে করিবে। শিক্ষকের পক্ষে ব্ল্যাকবোর্ড হইতেছে একটি যন্ত্র যাহার সাহায্যে তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছে নানা বিষয় ব্যাখ্যা করিতে পারেন। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যদি শিক্ষকের নূতন কিছু তথ্য

পরিবেশন করিতে হয় এবং তাহা যদি তিনি রেখায় রূপায়িত করিতে পারেন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ব্ল্যাকবোর্ডে করিবেন। আলোচনা করিতে করিতে শিক্ষক যে সব কথা ছাত্রছাত্রীদের মনে বিশেষ করিয়া গাঁথিয়া দেওয়ার প্রয়োজন, সেইগুলি বোর্ডে লিখিয়া দিবেন।

ব্ল্যাকবোর্ড শিক্ষাদানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শ্রেণীতে পাঠ দিবার সময় যদি শিক্ষক বোর্ডে কিছু অঙ্কন করেন বা লিখেন, তাহা হইলে শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ সেই দিকে ধাবিত হইবে। ছাত্রছাত্রীরা উহা দেখিয়া বিশেষভাবে লাভবান হইবে।

ব্ল্যাকবোর্ডের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

১। ব্ল্যাকবোর্ডে যদি শিক্ষক লিখিয়া দেন তাহা হইলে বর্ণনার বিষয় ছাত্রছাত্রীদের দর্শনেন্দ্রিয় গোচর করা হয় এবং কানে শোনা ও চোখে দেখা এই দুই প্রক্রিয়ারই যুগপৎ ব্যবহারের ফলে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্য বিষয় সহজে স্মরণ রাখিতে পারে।

২। কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিলে তাহার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়।

৩। ব্ল্যাকবোর্ডে গণিতের অঙ্ক কষিয়া না দিলে ভাল অঙ্ক শেখান যায় না, তাহাতে ভাল শিক্ষা হয়।

৪। পাঠের সারাংশ লিখিয়া দিতে হইলে ব্ল্যাকবোর্ডের প্রয়োজন।

৫। ছাত্রছাত্রীগণের সহযোগিতায় শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ করিবেন।

৬। ছাত্রছাত্রীগণকে বোর্ডে কাজ করিতে দিলে তাহাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

৭। দুইটি বিষয়ের তুলনা ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষক যদি লিখিয়া দেন, তবে ছাত্রছাত্রীগণ উহা সহজে মনে রাখিতে পারিবে।

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারকালে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে:

১। ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু লিখিবার পূর্বে ডাষ্টার দিয়া ভাল করিয়া ব্ল্যাকবোর্ডটি পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। হাত কিংবা আঙ্গুল দিয়া ব্ল্যাকবোর্ড পরিষ্কার করা কখনও উচিত নয়।

২। ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিবার সময় ব্ল্যাকবোর্ডের একপাশে দাঁড়াইয়া লিখিতে হইবে। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা যেন দেহের কোন অংশ দ্বারা ঢাকা না পড়ে তাহা দেখিতে হইবে। শ্রেণীর দিকে পিছন ফিরিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা উচিত নয়। ঐরূপ ভাবে লিখিলে শিক্ষকের শ্রেণীর দিকে একেবারেই লক্ষ থাকিবে না, ফলে শ্রেণীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হইতে পারে।

৩। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা সুন্দর সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হইতে হইবে।

৪। ব্ল্যাকবোর্ডে একই সময়ে দুই বা বহু বিষয় লেখা উচিত হইবে না, কিংবা বহু জিনিসের ছবি অঙ্কন করা উচিত নয়। উহা করিলে ছাত্রছাত্রীদের মন বিক্ষিপ্ত হইবে।

৫। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখায় কোনও রূপ ভুল থাকিবে না। ভুল হইলে তাহা মারাত্মক অপরাধ, কারণ ছাত্রছাত্রীগণ দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভুলটা শিখিবে, এবং তাহা তাহাদের মনে গাঁথিয়া যাইবে।

৬। ব্ল্যাকবোর্ডে বিষয়টি বিস্তারিত করিয়া লেখা চলিবে না। লেখা সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে।

৭। ব্ল্যাকবোর্ডে যে কথা লিখিত হইল তাহা শেখান শেষ হইলে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। যদি উহা পুনরায় দেখান প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহা উল্টাইয়া রাখিতে হইবে, কেননা উহা যদি ছাত্রছাত্রীদের চোখের সম্মুখে থাকে, তবে নতুন বিষয় অবতারণা করা হইলে ছাত্রছাত্রীরা ব্ল্যাকবোর্ড হইতে মন উঠাইয়া লইয়া নূতন জিনিসে মন কেন্দ্রীভূত করিতে অসুবিধা বোধ করিবে।

৮। ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিবার সময় শিক্ষক ছাত্রছাত্রীগণকেও উহা দেখিয়া লিখিতে বলিবেন। ছাত্রছাত্রীগণ ঐ কার্য আরম্ভ করিলে শ্রেণীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

বুলেটিন বোর্ড

বুলেটিন বোর্ড শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামের মধ্যে অন্যতম। ব্ল্যাকবোর্ডের যেমন শিক্ষাগত গুরুত্ব রহিয়াছে, বুলেটিন বোর্ডেরও সেইরূপ গুরুত্ব শিক্ষা-ক্ষেত্রে রহিয়াছে। বুলেটিন বোর্ড শ্রেণীতে বা বিদ্যালয়ে থাকিবে। এই বুলেটিন বোর্ডে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষণীয় বহু বিষয় লিখিত থাকিবে। এই বুলেটিন বোর্ড একটি পত্রিকার কাজ করিবে। পত্রিকাতে ভাল

ভাল লেখা থাকে। বুলেটিন বোর্ডে সেইরূপ ভাল ভাল বিষয় সাঁটা অবস্থায় থাকিবে। বুলেটিন বোর্ডে শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীগণের সৃজনাত্মক লেখার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

বুলেটিন বোর্ডের সুবিধা এই যে এই বোর্ডে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনাত্মক লেখা সাঁটা থাকে। সৃজনাত্মক লেখা সকলে দেখিবে এই উৎসাহে ও আগ্রহে ছাত্রছাত্রীগণ আরও ভাল করিয়া লিখিতে প্রেরণা বোধ করিবে। বুলেটিন বোর্ডে বিভিন্ন পত্রিকার ভাল ভাল লেখা কাটিয়া সাঁটা থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীরা উহা পড়িয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

ফ্ল্যানেল বোর্ড

ফ্ল্যানেল বোর্ডও শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামের মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। শ্রেণীতে শিক্ষাদানকালে যেমন শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার করিয়া থাকেন, তেমনি তিনি ফ্ল্যানেল বোর্ড ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু পার্থক্যের মধ্যে এই যে শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে প্রয়োজনীয় জিনিস বা ছবি অঙ্কিত করেন, কিন্তু ফ্ল্যানেল বোর্ডে শিক্ষক তৈয়ারী ছক, ছবি, পরিসংখ্যান ইত্যাদি আঁটিয়া দেন এবং প্রয়োজন বোধে আবার তুলিয়া নিয়া আসেন। ফ্ল্যানেল বোর্ড নিম্নশ্রেণীর শিশুদের পক্ষে খুব উপযুক্ত। বিভিন্ন ছবি ফ্ল্যানেল বোর্ডে আঁটিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

৪। আদর্শ

শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলির মধ্যে আদর্শ অন্যতম। যখন কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদিগকে দিতে পারেন না, তখন তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিবর্তে আদর্শ (model) দেখাইয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা দিতে পারেন। যেমন, শ্রেণীকে হ্রদ পর্বত ইত্যাদি এবং অনেক জন্তুও দেখানো সম্ভব নয়, কিন্তু তাহাদের আদর্শ দেখান চলে।

৫। ফ্ল্যাশ কার্ড

কতকগুলি কার্ডে ঘটনা পরম্পরায় ছবি বা লেখা থাকে। পাঠদান কালে শিক্ষক এই কার্ডগুলি ছাত্রছাত্রীদিগকে দেখাইয়া থাকেন। যেখানে সকলে দেখিতে পায় এইরূপ একটি নীতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র দলের কাছে ফ্ল্যাশ কার্ডগুলি উপস্থাপিত করা হয়। কার্ডগুলিকে বেশী ক্ষণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে ধরিয়া রাখা হইবে না। সমগ্র বিষয়টির বর্ণনা দানে ফ্ল্যাশ কার্ডগুলি সাহায্য করিবে।

৬। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন

সাধারণ ভাবে ছবি দেখানর চাইতে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নে ছবি দেখান বেশী কার্যকরী। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নে ছবি পর্দার উপর পড়ে এবং উহা বেশী লোক দেখিতে পারে। তাহা ছাড়া ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের স্লাইড দ্বারা একটার পর আর একটা ছবি ঘটনার সঙ্গতি রাখিয়া দেখান যায়।

আমাদের দেশে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের প্রচলন থাকিলেও উহা এ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। বর্তমানে ইহা শ্রেণীকক্ষে বসানোর প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। শিক্ষামূলক স্লাইডের সাহায্যে অনেক ছবি শ্রেণীকক্ষে দেখান যাইতে পারে। শ্রেণী এই সময় অন্ধকার করিয়া লইতে হয় এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের ছবি একটি সাদা পর্দার উপর বা সাদা দেওয়ালে পতিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জাম দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকে।

৭। এপিডায়োস্কোপ

এপিডায়োস্কোপ অনেকটা ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের মতই। ইহাও শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে বিশেষ উপকারে আসে। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নে স্লাইডের সাহায্যে ছবি বড় করিয়া দেখান হয়, কিন্তু এপিডায়োস্কোপ যে কোন বহির ছবি আরও বড় করিয়া পর্দার উপর ফেলা যায়। ইহাতে স্লাইডের প্রয়োজন হয় না। তাহা ছাড়া ইহা দ্বারা আর একটি উপকার হইয়া থাকে। শিক্ষক যদি কোন ছবির সীমারেখা বর্ধিত আকারে আঁকিয়া লইতে চান, তাহা হইলে তিনি এপিডায়োস্কোপের সাহায্য লইতে পারেন। মোট কথা, এপিডায়োস্কোপ দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় জিনিস।

৮। গ্রামোফোন

শ্রাব্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলির মধ্যে গ্রামোফোন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। গ্রামোফোনের আবিষ্কার বহু দিন হইল হইয়াছে, কিন্তু অল্প কিছু কাল হইল ইহা শিক্ষাসরঞ্জাম হিসাবে শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরাজী ভাষায় উচ্চারণ শিক্ষা দিবার জন্য অনেক রেকর্ড তৈয়ারী হইয়াছে। এই রেকর্ডগুলি ছাত্রছাত্রীদের শুনাইয়া তাহাদের সঠিক উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয়; আমাদের বাংলাভাষায় এইরূপ উচ্চারণ শিক্ষা দিবার জন্য এখন পর্যন্ত রেকর্ড তৈয়ারী হয় নাই। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যেরূপ নানা দিকে উন্নতি

হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় ঐরূপ রেকর্ডও কিছু দিনের মধ্যে তৈয়ারী হইবে।

৯। সিনেমা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ছবি দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জাম হিসাবে উৎকৃষ্ট। সাধারণ ছবি অনড় স্থির। কিন্তু সিনেমার ছবি সর্বদা নড়িতেছে, এবং দর্শকের কাছে উহা জীবন্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। বলাই বাহুল্য ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষামূলক সিনেমার ছবি দেখিয়া সবিশেষ উপকৃত হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে চলন্ত ছবিগুলি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক মনে হয় এবং ছবির বিষয় সম্বন্ধে পূর্বজ্ঞান না থাকিলেও ছাত্রছাত্রীরা ঐ চলন্ত ছবি দর্শন করিয়া এমনই একটি ব্যক্তিগত অনুভূতি লাভ করে যে ঐ ছবি আর তাহার কাছে অপরিচিত বলিয়া মনে হয় না।

শ্রেণীতে সিনেমার ছবি দেখান সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রত্যেক শিক্ষাদান ক্ষেত্রেই প্রস্তুতির প্রয়োজন। সিনেমার ছবির ক্ষেত্রেও তাই। ছাত্রছাত্রীরা সিনেমার ছবি দেখিতে ভালবাসে। অতএব তাহাদিগকে ছবি দেখানর জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে, এইরূপ পরিকল্পনা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কোন সিনেমার ছবি দেখানর পূর্বে, ছাত্রছাত্রীগণ কি কি জিনিসের উপর গুরুত্ব দান করিয়া দেখিবে সে বিষয়ে শিক্ষক নির্দেশ দিবেন। যদি প্রয়োজন হয় তবে একবার সিনেমা দেখার পর ছাত্রছাত্রীদিগের সঙ্গে সিনেমা-সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া পুনরায় সিনেমা দেখান যাইতে পারে। ইহাতে সিনেমা-সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীদের মনে গাঁথিয়া থাকিবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে শিক্ষামূলক ফিল্ম তৈয়ারী হইতেছে এবং সেই ফিল্মগুলি বিদ্যালয়ে দেখান হইতেছে। আমাদের দেশে শিক্ষামূলক ফিল্ম বেশী তৈয়ারী হয় নাই, কিন্তু সরকারী ডকুমেণ্টারী ফিল্ম অনেক আছে। ঐগুলি শিক্ষামূলক হইলেও এখনও বিদ্যালয়ে ঐ সব ছবি ভাল ভাবে দেখান হয় না। ফিল্মকে শীঘ্রই আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে কাজে লাগান হইবে বলিয়া আশা করি।

১০। রেডিও

শ্রাব্য শিক্ষা-সরঞ্জামগুলির মধ্যে রেডিও অন্যতম। রেডিয়োর মাধ্যমে নানা বিষয়ে ভাল ভাল বক্তৃতা সকলের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। এই

বক্তৃতাগুলি সবই ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত করিয়া রেডিয়োতে আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে রেডিও একটি প্রকৃষ্ট শিক্ষার মাধ্যম, কিন্তু আমাদের দেশে রেডিও এখনও ঐরূপ মর্যাদা পায় নাই। কলিকাতার বেতার কর্তৃপক্ষ বিদ্যার্থীদের জন্য দুপুরবেলা নানা রকম সারগর্ভ আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকার বিদ্যালয়গুলিতে বিনা পয়সায় রেডিও দিতেছেন। সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বেতারের সারগর্ভ বক্তৃতা ও আলোচনা শুনিতে পাইতেছে। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য আলোচনা চলে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন না।

১১। টেপ রেকর্ডার

শ্রাব্য শিক্ষাসরঞ্জামগুলির মধ্যে টেপ রেকর্ডার একটি। টেপ রেকর্ডার দামী জিনিস, আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে উহার প্রচলন খুব কমই হইয়াছে, কিন্তু ইহার শিক্ষাসম্পর্কীয় সম্ভাব্যতা প্রচুর। অতএব ইহা প্রবর্তন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। টেপ রেকর্ডার দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া যায়। শিক্ষক কোন শিক্ষাবিদকে দিয়া কোন একটি অনুচ্ছেদ রেকর্ড করাইয়া ছাত্রছাত্রীদের শুনাইতে পারেন। শুধু একটি শ্রেণীতে নয়, পাশাপাশি উপরের ও নীচের শ্রেণীতে টেপ রেকর্ডার চালাইয়া ছাত্রছাত্রীদের শুনাইতে পারেন। টেপ রেকর্ডারের সুবিধা হইল এই যে টেপগুলি মুছিয়া আবার সেগুলিতে পুনরায় রেকর্ড করা যায়। ইহাতে খরচ কম হয়। ছাত্রছাত্রীদের উচ্চারণে ত্রুটি সব চেয়ে বেশী ধরা পড়িবে নিজের কাছে। নিজের কথা নিজে শুনিলে এবং সাথে সাথে যদি ছাত্রছাত্রী আদর্শ পাঠ শুনে, তাহা হইলে সে তাহার ভুলত্রুটি ধরিয়া লইতে পারে। এই অবস্থায় শিক্ষক মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীদের কথা বা পড়া টেপ রেকর্ড করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতে পারেন। সঙ্গীত শিক্ষায় টেপ রেকর্ডার অত্যন্ত সাহায্যকারী। শিক্ষার্থী নিজের গান বা বাজনা টেপ রেকর্ড করিয়া তারপর উহা বাজাইয়া সঙ্গীত শিক্ষকের সাথে ভুলত্রুটি লইয়া আলোচনা করিতে পারে। তাহা ছাড়া নিজের গান বা বাজনার সঙ্গে শিক্ষার্থী বিশেষজ্ঞের গান বা বাজনা তুলনা করিয়া দেখিয়া নিজেকে কতটুকু শোধরাইতে হইবে তাহা বুঝিতে পারে।

১২। চার্ট

এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলি মুখে বোঝানর চাইতে চার্টে বোঝান সহজ। চার্ট একটি দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন যেখানে কোন কিছুর সাথে কোন কিছুর তুলনা, বা কোন কিছুর সারাংশ, বা কোন কিছুর সাথে কোন কিছুর বৈপরীত্য দেখান, কিংবা জিনিসটাকে ভাল ভাবে বুঝাইবার জন্য অন্য কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়।

চার্ট সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা একটি দৃষ্টিনির্ভর শিক্ষাসরঞ্জাম বলিয়া ইহাকে বেশ বড় করিয়া আঁকিতে হইবে যাহাতে শ্রেণীর সকল অংশ হইতেই দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ চার্টে খুব বেশী কথা লিখিত থাকিবে না, অল্প কথায়ই জিনিসটিকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। চার্টটিতে এমন কোন ছবি থাকিবে না, যাহা শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিচিত নয়। সর্বশেষ, চার্টগুলি যেন দেখিতে সুন্দর হয়।

চার্টগুলি যদি অন্য কোন দৃশ্য শ্রাব্য শিক্ষাসরঞ্জামের সহিত ব্যবহৃত হয়, তবে উহা আরও কার্যকরী হইবে। যেমন একটি গ্রামের আদর্শ দেখাইয়া গ্রামের প্রয়োজনীয় ইতিবৃত্ত চার্টের সহিত দেখান যায়, তাহা হইলে উহা ছাত্রছাত্রীদের বেশী উপকারে লাগিবে।

বিভিন্ন প্রকারের চার্ট শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—Tree chart, Flow chart, Isotype chart ইত্যাদি।

Tree চার্ট দ্বারা একটি বিষয়ের বৃদ্ধি বা পরিণতি দেখান চলে। মূল জিনিস হইতে বিভিন্ন বিষয়গুলি শাখা-প্রশাখার ন্যায় বাহির হইয়া আসিয়াছে ইহা দেখিলে ছাত্রছাত্রীদের মনে ঐসব ধারণা বদ্ধমূল হয়। **Flow চার্টও** প্রায় একই রকমের জিনিস। ইহাতেও একটি মূল জিনিস হইতে কি ভাবে অন্যান্য জিনিসগুলি সংগঠিত হইয়াছে তাহা তীর বা লাইন দ্বারা দেখান হইয়া থাকে। **Isotype চার্ট**—পরিসংখ্যানগুলি ছবি দ্বারা অর্থবোধক করা হইয়াছে। **Pye চার্ট** বলিয়া এক রকম চার্ট আছে। এই চার্টে বৃত্তাকারে একটি সমগ্র জিনিসের অংশগুলি থাকে। বৃত্তের অংশগুলি সমগ্র জিনিসের অংশের গুরুত্ব অনুসারে ছোট বড় হইয়া থাকে। এই অংশগুলি ধীরে ধীরে বাহির হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ভারতের রপ্তানি দ্রব্যগুলি গুরুত্ব ও আয়তন হিসাবে একটি বৃত্তের মধ্যে স্থাপনা করা গেল। ধরা যাক, প্রথম বাহির হইল লৌহ, তারপর বাহির হইল ম্যাঙ্গানিজ, তারপর চা ইত্যাদি।

প্রত্যেকটির রপ্তানির আয়তন হিসাবে বৃত্তের অংশগুলি ছোট বড় করা হইয়াছে। আর একটি চার্ট আছে তাহাকে বলে Pull চার্ট। Pull চার্টেও একটি সমগ্র বিষয়ের অংশ লওয়া হয়। এইখানে অংশগুলিকে আয়তন বা সংখ্যা হিসাবে ভাগ করা হয় না, বিভিন্ন গুণের সমাবেশ এইখানে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি আমাদের ভারতে রপ্তানিশিল্প বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে কি কি বৃদ্ধি করিতে হইবে। এইখানে Pull চার্ট ব্যবহার করিতে হইবে। যে যে জিনিসগুলি বাড়াইতে হইবে, সেইগুলির নাম বিভিন্ন চার্টে লিখিয়া ধীরে ধীরে একটার পর আর একটা ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

১৩। ডায়াগ্রাম বা নক্সা

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতে ডায়াগ্রাম বা নক্সা প্রয়োজন হয়। ডায়াগ্রাম বা নক্সার বৈশিষ্ট্য হইল যে, উহা শুধু জিনিষটির আকারকে বুঝায়। ছবির সাথে ইহার পার্থক্য আছে। ছবি জিনিসটির পূর্ণ রূপ দেখায়, কিন্তু ডায়াগ্রামে শুধু উহার আকার বুঝা যায়। জ্যামিতি ক্ষেত্রেও ইহা একান্ত-ভাবেই অপরিহার্য। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইহা ছাড়া চলে না। ডায়াগ্রাম দিয়া বুঝাইবার সময় যদি সম্ভব হয় তবে আসল জিনিসটিকেও দেখান দরকার। যদি একটি ফলের ডায়াগ্রাম বা নক্সা শ্রেণীতে দেখানর প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সেই ফলটিও দেখাইলে ভাল। যদি আসল বস্তুটি না পাওয়া যায় তাহা হইলে উহার আদর্শ বা ছবি ডায়াগ্রাম বা নক্সার সহযোগী শিক্ষাসরঞ্জাম হিসাবে দেখান যাইতে পারে।

ডায়াগ্রাম বা নক্সাটি সঠিক ভাবে অঙ্কিত করিতে হইবে। কম্পাস, রুলার, স্কেল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া স্কেল অনুযায়ী নক্সা অঙ্কিত করিতে হইবে। নক্সার ভিতর কোন প্রয়োজনীয় জিনিস বুঝিতে হইলে উহা রঙ্গীন চক দ্বারা অঙ্কিত করিয়া ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

১৪। পোষ্টার বা প্রাচীরপত্র

পোষ্টার সাধারণতঃ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সরকার কোন জিনিস জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য পোষ্টারের সাহায্য লইয়া থাকেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহও নিজ নিজ বিশেষত্ব প্রচার করিবার জন্য পোষ্টারের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

পোষ্টার সাধারণতঃ কাগজের উপর ছাপা বা আঁকা হয়। ছবিটি বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন লেখার সাহায্যে ঐ বিষয়বস্তুটিকে পরিষ্কার করা হয়। সুতরাং পোষ্টারে বা প্রাচীরপত্রে ছবি ও লেখার সমন্বয় থাকিবে।

পোষ্টারের বিশেষত্ব হইতেছে,—

১। সদা সর্বদা পোষ্টার দৃষ্টির সম্মুখে রাখা যায় ২। যে কোন জায়গায় পোষ্টারটি দেখান যায়।

শ্রেণীতে পোষ্টারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের এমন কিছু করণীয় জিনিস আছে, যাহা তাহাদের প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখা দরকার। যেমন দাঁত মাজা, মুক্ত বায়ুতে বেড়ান, অথবা আজকের দিনের দেশের প্রতিরক্ষার জন্য সাহায্য ও নির্দেশ ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সরঞ্জাম। এইগুলি ছাত্রছাত্রীদের মনে রাখিতে হইলে সর্বদা চোখের সামনে থাকা দরকার। অতএব পোষ্টারের বা প্রাচীরপত্রের তুল্য আর কোন কার্যকরী মাধ্যম নাই। ইহা ছাড়া দেশ ভ্রমণের পোষ্টার বা প্রাচীরপত্র দেখাইয়া শিক্ষক ভূগোল বা সমাজ-বিদ্যার পাঠ ভাল ভাবে দিতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরাও নিজেরাই পোষ্টার বা প্রাচীরপত্র তৈয়ারী করিতে পারে এবং তাহাদ্বারা বহু অভিজ্ঞতাও লাভ করিতে পারে।

১৫। মানচিত্র ১৬। গ্লোব

মানচিত্র একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টি-নির্ভর প্রদীপন। ভূগোল ও সমাজ-বিদ্যা শিক্ষাদানে ইহার বহুল প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাই। সমাজ-বিদ্যা বিষয়ক পুস্তক দেখিলে দেখা যাইবে যে দৃষ্টি-নির্ভর শিক্ষাসরঞ্জামের মধ্যে মানচিত্রের স্থান দ্বিতীয়, প্রথম স্থান হইতেছে ছবির।

মানচিত্র পৃথিবী বা পৃথিবীর একটি অংশের বিবরণ। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিবরণ গ্লোব বা গোলক হইতে হইলেই সবচেয়ে ভাল হয়। ছাত্রছাত্রীরা যখন একটি গোলক পরীক্ষা করিয়া দেখে, তখন সে একটি স্থানের সঙ্গে অপর স্থানের আয়তন, দূরত্ব ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারে। মানচিত্র আঁকা হয় সমতল কাগজের উপর, অথচ পৃথিবী গোল। একটি গোল জিনিসকে সমতল চ্যাপ্টা স্থানে রূপায়িত করিতে হইলে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই অসুবিধা

ছাত্রছাত্রীদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা কি তাহা ছাত্রছাত্রীরা জানিবে এবং এই রেখাগুলি কি কারণে গোলকে দেওয়া হয় তাহা ছাত্রছাত্রীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। অক্ষরেখাগুলি উত্তর দক্ষিণে নিরক্ষরেখার সমান্তরাল। পূর্বে পশ্চিমে দূরত্ব দ্রাঘিমা রেখা দ্বারা সূচিত হয় এবং উহারা এক মেরু হইতে অন্য মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। গোলকের ও মানচিত্রের মধ্যে স্কেল লেখা থাকিলে উহা দ্বারা সঠিকভাবে এক স্থান হইতে আর এক স্থানের দূরত্ব বুঝিতে পারা যায়। মানচিত্র ও গোলকের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকট হইয়া উঠিবে। তাহা ছাড়া মানচিত্রে বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুঝাইতে বিভিন্ন চিহ্ন ও রঙ্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহা দ্বারা অনেক জিনিস পরিষ্কার হইয়া থাকে।

মানচিত্র হইতে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রথমতঃ কোন স্থানের অবস্থান মানচিত্র হইতে জানা যায়। তাহা ছাড়া আরও অনেক বিষয় মানচিত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। যথা, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অর্থ-নৈতিক উৎপাদন, নৈসর্গিক অবদান, আবহাওয়াজনিত খবর, রাজনৈতিক খবর ইত্যাদি মানচিত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। অনেক সময় দুই ধরণের মানচিত্র পাশাপাশি রাখিয়া উহাদের বৈশিষ্ট্য ভাল করিয়া দৃষ্টি দিয়া দেখিলে অনেক নূতন নূতন তথ্য জানা যায়। দুই ধরণের মানচিত্র পাশাপাশি রাখিলে দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক পরিস্ফুট হইয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ভারতের যদি দুইটি মানচিত্র—একটি প্রাকৃতিক এবং অপরটি শিল্প সম্বন্ধীয় মানচিত্র—শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের দেখান যায়, তবে ছাত্রছাত্রীরাই বুঝিতে পারিবে কি করিয়া প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইতেছে।

মানচিত্র অনুশীলনে ছাত্রছাত্রীরা কাজ করে, কিন্তু তাহা ছাড়া যদি তাহারা নিজেরা মানচিত্র তৈয়ারী করে, তাহা হইলে খুব উপকার হয়। তাহাদের জানিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগকে অর্থপূর্ণ কাজ করিতে সহায়তা করে। এই সৃজনাত্মক কাজ করার ফলে, সে কতকগুলি জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করিবে, এবং তাহার কাছে কোন কোন জ্ঞান বিশেষত্বপূর্ণ হইয়া দেখা দিবে। যখনই কোন ছাত্র মানচিত্র অঙ্কন করিতে উৎসাহবোধ করে, তখনই সে মানচিত্র অঙ্কনকে অর্থপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলিয়া মনে করে। ফলে তাহার কাজের মধ্যে নিখুঁত ও পরিষ্কার কাজের লক্ষণ ফুটিয়া উঠে।

ভূগোল ও সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য বহু সংখ্যক মানচিত্রের প্রয়োজন। যে সমস্ত মানচিত্রের মধ্যে সঠিক বিষয় জানা যাইবে এবং যে মানচিত্রগুলি বিভিন্ন খবর সম্বলিত, সেই সব মানচিত্রই রাখা উচিত।

গোলকও খুব বেশী প্রয়োজন। ছোট গোলক হইতে বড় গোলক পর্যন্ত সকল প্রকারের গোলকই বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে। একটি ১৬″ গ্লোব বিদ্যালয়ে রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

কালো কাপড়ে আঁকা বিভিন্ন দেশের সীমারেখ মানচিত্র বিদ্যালয়ে থাকারও প্রয়োজন আছে। কারণ এই সীমারেখ মানচিত্রের সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীগণকে বিভিন্ন বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইতে পারেন।

মানচিত্রের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের অধীত জ্ঞানও পরীক্ষা করা করা হইয়া থাকে। শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে সীমারেখ মানচিত্র দিয়া স্থান, নদী পর্বত, উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদি দেখাইতে বলিতে পারেন।

১৭। পুতুল নাচ

পুতুল নাচ আমাদের দেশে বহু দিন যাবৎ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, কিন্তু শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে উহা কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা ছাড়া পুতুল নাচের ব্যবহারও কমিয়া আসিতেছে, কারণ সিনেমার বহুল প্রচলন। কিন্তু পুতুলনাচেরও বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার মূল্য শিক্ষাক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। পাশ্চাত্ত্য দেশ-সমূহে পুতুল নাচের বহুল ব্যবহার কিছু দিন যাবৎ চলিতেছে।

পুতুল-নাচ একটি সুন্দর জিনিস। পশ্চিম বাঙ্গালার গ্রামসমূহে ইহার প্রচলন হইলে সাধারণ লোকে যে খুব আনন্দ পাইবে তাহার আর সন্দেহের অবকাশ নাই। পুতুল নাচে সাজপোশাক মঞ্চের সাজসজ্জা ইত্যাদির কম প্রয়োজন হয়। পুতুল নাচে বহু লোকের প্রয়োজন হয়। কেহ কেহ পুতুল বানায়, কেহ কেহ পুতুল চালনা করে, আর বাকীরা পুতুলের বক্তব্যগুলি বলে।

পূর্বে বলিয়াছি, পুতুলনাচকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার প্রয়োজনে লাগাইতে পারা যায়। যদিও পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইহার বহুল ব্যবহার চলিতেছে, কিন্তু ভারতের বিদ্যালয় সমূহে ইহার ব্যবহার খুব কম। তবে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ভারতের বিদ্যালয়গুলি যে এই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, ইহাই আনন্দের বিষয়।

পুতুল নাচের মধ্য দিয়া হাতের কাজ, কলা, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ-বিদ্যা, রচনা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া যায়। ছাত্রছাত্রীরা অর্থাৎ ছোট শিশুরা নিজেরাই পুতুল নাচার পরিকল্পনা করে, পুতুল নাচের জন্য গল্প লিখে, পুতুল তৈয়ারী করে, পুতুল চালনা করে এবং পুতুলের সংলাপও রচনা করিয়া থাকে। ইতিহাসের ঘটনা গল্প ইত্যাদি পুতুল নাচে খুব ভালভাবে রূপায়িত করা যায়। নানা রকমের পুতুল নাচের ব্যবস্থা করা যায়। হাতের আঙ্গুলে পুতুলের খোলসটা পরাইয়া দিয়া পুতুলের চালনা করা চলে। আর এক রকম পুতুল নাচ আছে যাহাতে কাঠির উপরে পুতুলগুলিকে বাঁধিয়া চালনা করা হয়। আর এক রকম পুতুলনাচ আছে যেখানে সূতার সাহায্যে পুতুলের হাত পা নাড়ান হইয়া থাকে। পুতুলনাচে সাধারণ অভিনয়ের মত নাচগান ইত্যাদি থাকিলে ভাল হয়। শিশুদের বয়স অনুযায়ী পুতুল নাচের ব্যবস্থা হইবে। পুতুল নাচ বেশী ক্ষণ স্থায়ী হইবে না।

১৮। অভিনয়

দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামের মধ্যে অভিনয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীরা অভিনয়ের মাধ্যমে অনেক কিছু শিক্ষা করে। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, সংলাপ রচনা ইত্যাদি ছাত্রছাত্রীগণ শিক্ষা করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া সব চেয়ে বড় গুণ যাহা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিকশিত হয়, তাহা হইতেছে ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনী ক্ষমতা। যখন ছাত্রছাত্রীরা কোন নাটক অভিনয়ের প্রজেক্ট গ্রহণ করে, তখন তাহারা নাটকের বিষয়বস্তু স্থির করা হইতে আরম্ভ করিয়া অভিনয়ের পরিকল্পনা, অভিনয় সম্পাদন ও বিচার ইত্যাদি করিয়া থাকে। দলীয় কাজ করিবার জন্য তাহাদের মনোভাব বৃদ্ধি পায়, তাহারা সহযোগিতামূলক কাজ করে। তাহা ছাড়া অভিনয় করিতে মঞ্চে উঠিয়া তাহারা সাহসও প্রদর্শন করিয়া থাকে। অনেক ছাত্রছাত্রীই লাজুক স্বভাবের থাকে, তাহারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায় না। অভিনয় সংগঠন ও অভিনয় করার মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীরা সেই দুর্বলতা কাটাইয়া উঠে এবং নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতা অর্জন করে।

অভিনয় করার ও আয়োজনের মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীরা বিষয়বস্তুটি ভাল ভাবে বুঝিয়া লয়। পরিকল্পনার মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীরা অনেক গুণের অধিকারী হইয়া থাকে।

১৯। শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য পরিভ্রমণের কথা অনেক শিক্ষাবিদ্ বলিয়া থাকেন। এই প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাইতে পারে। প্রথম কথা হইতেছে, শিশু তাহার আবেষ্টনীকে ভাল করিয়া চিনিবে, তবেই তাহার শিক্ষা দানা বাঁধিয়া উঠিবে। মহাদেব দেশাই ১৯৩৮ সনের Year Book of Education এ একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, সাহিত্যিক শিক্ষা আমাদের মনকে বইয়ের পড়ার মধ্যে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা মুক্ত দৃষ্টি দিয়া কোন কিছুই দেখিতে পারি না। ভূগোল মুখস্থ করিয়া পৃথিবীর কোন্ জায়গায় কি আছে, তাহা অনায়াসে আমরা বলিয়া দিতে পারি, অথচ আমারই গ্রামে আমারই জমির উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে কাহার জমি তাহা আমরা জানি না। তাহার কারণ আমাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তির অভাব।

বিদ্যালয়ের পরিকল্পিত পরিভ্রমণের সংজ্ঞা দিয়াছেন F.F. Gaither। তাঁহার "The Excursion Project" নামক প্রবন্ধে তিনি বিদ্যালয়ের পরিকল্পিত পরিভ্রমণকে "any type of Project that tends itself to investigtion, experimentation and gaining knowledge by first-hand contact with life, the individual's environment and the world at large." বস্তুতঃ পক্ষে বিদ্যালয়ের পরিকল্পিত পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য হইতেছে শ্রেণীকক্ষে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিবার উপায় নাই, সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা শিশুরা অনুসন্ধান করিয়া, গবেষণা করিয়া, পর্যবেক্ষণ করিয়া, পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষভাবে হাতে-কলমে লাভ করিবে। প্রতি বয়সের শিশুর জন্যই এইরূপ পরিভ্রমণ কার্যকরী হইবে বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করেন। প্রথম স্তরের শিশুর জন্য পরিভ্রমণ হয়ত সীমাবদ্ধ থাকিবে নিজস্ব গ্রামের মধ্যে আর পঞ্চম শ্রেণীর শিশুরা হয়ত গ্রামের বাহিরে নিকটস্থ সহরে বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যাইবে।

বর্তমান শিক্ষার ধারায় আমরা শিশুর প্রয়োজনকে মূলধন করিয়া শিক্ষা দিতে চাহিতেছি। তাহা হইলে শিশু যে পরিবেশে বড় হইয়া উঠিতেছে সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকা একান্তই আবশ্যক। সে পরিবেশকে দেখিবে, পরিবেশের স্বকীয় মর্যাদা সে দিবে এবং পরিবেশ অপরিবর্তনীয়, সেই পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে সে চেষ্টা করিবে এবং প্রয়োজন বোধে সচেষ্ট হইয়া পরিবেশের উন্নতি বিধান করিতে চেষ্টা করিবে। শিশুর পরিবেশে ও সমাজে এমন কতকগুলি সামাজিক ও নৈসর্গিক বস্তুসম্ভার আছে

যাহার প্রভাবে সেই স্থানের জীবনযাত্রা-প্রণালী একটা বিশেষ প্যাটার্ন অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে এবং ভবিষ্যতেও হয়ত সেই ধারা অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিবে। এই অবস্থায় শিশুর শিক্ষা ঐ-সম্পর্কিত লেখা-পড়া বা অঙ্কেই শুধু পর্যবসিত না হইয়া ঐ সম্পর্কিত নানা সমস্যার সহিত জড়িত হইয়া যাইবে। শিশু বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইয়া নিজে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবে এবং বস্তুর তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। প্রকৃতপক্ষে শিশুর পরিবেশের বস্তুসম্ভার শিশুর পাঠ্যক্রম হইয়া দাঁড়াইবে।

পরিভ্রমণ দ্বারা শিশুর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইবে এই ধারণাকে ভিত্তি করিয়া আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের উপরে হইবে শিক্ষাবিদ্‌গণ পরিভ্রমণকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়া আসিতেছেন। জন ডিউই ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ হইতেই সামাজিক অভিজ্ঞতাকে বিদ্যালয়ে কার্যকরী করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, শিশুর পক্ষে তখনই খুব অপচয় দেখা যাইবে যখন শিশু তাহার বিদ্যালয়ের বাহিরের অভিজ্ঞতাকে বিদ্যালয়ে কার্যে পরিণত করিতে পারে না, পক্ষান্তরে সে বিদ্যালয়ে যাহা কিছু শেখে তাহারও সে জীবনের প্রয়োগ করিতে পারে না।

ডিউই ছাড়াও শিশুর বিদ্যালয়ের জীবনের বহির্ভূত জীবনের সম্পর্কে আরও অন্যান্য শিক্ষাবিদ্ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়া বলিয়াছেন যে, শিশুর সামাজিক পরিবেশ হইতে সমাজ-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে প্রত্যেক শিশু তাহার স্বকীয় সামাজিক পরিবেশের সমস্ত সামাজিক সমস্যাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হইয়া ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার করিয়া গ্রহণ ও বর্জন করিতে শিক্ষা করিবে। বলা বাহুল্য, শিশুকে যদি সমাজের সমস্যার সঙ্গে জড়িত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি শিশুমনে চিন্তার খোরাক জোটাইবে, যথা— সমাজ ও স্বাস্থ্যরক্ষা, সমাজ ও জীবন, সমাজ ও আমাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, সমাজের উৎপাদনশক্তি, সমাজ ও অন্যান্য প্রাণিজগৎ ইত্যাদি। এই সমস্ত সমাজ-সম্পর্কিত সমস্যা শিশুমনে উদয়ের ব্যবস্থা করা যায়, যদি বিদ্যালয়ের পরিভ্রমণগুলি সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়া সংগঠন করা যায়।

বিদ্যালয়ের পরিভ্রমণ সম্পর্কে পরিবেশের উপর একটা গুরুত্ব আরোপ করায় কেহ যেন মনে না করেন শিশুর নিকটস্থ পরিবেশই শিক্ষাব্যাপারে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের পরিভ্রমণের ক্ষেত্র শিশুর স্তরভেদে পৃথক হইবে।

পরিভ্রমণের মূল কথা হইতেছে, শিশু শ্রেণীকক্ষে তাহার পুস্তকে যাহা কিছু পড়িবে, সেই সমস্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা শিশুর নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে।

পরিভ্রমণের গুরুত্বকে আরও বেশী স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে এই জন্য যে, পরিভ্রমণ শিশুর প্রয়োজন এবং আগ্রহ এই দুই অবস্থাকেই যথেষ্ট মর্যাদা দিতেছে। সমস্ত সাধারণ-পর্যায়ভুক্ত শিশুই নানা কাজে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। শিক্ষাব্যাপারে এই আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই শিশু ও তাহার পরিবেশকে পরস্পরের প্রতি ক্রিয়াশীল করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন ও শিক্ষাগ্রহণে শিশুকে সাহায্য করে। সাধারণতঃ শ্রেণীকক্ষ শিশুর জগৎকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়, এই অবস্থায় যদি শিশু তাহার শ্রেণীকক্ষের বাহিরে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিবার সুবিধা পায় তাহা হইলে শিশুর পক্ষে যে কোনও প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জনই সুখকর হইবে। প্রকৃতপক্ষে পরিভ্রমণে শিশুর দল তাহাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চেষ্টা করে। সাধারণতঃ সাধারণ-পর্যায়ভুক্ত শিশুর দল কর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং পরিভ্রমণের দ্বারা শিশুরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে নানা কর্ম করিতে সুযোগ পাইয়া থাকে।

বিদ্যালয়ে পরিভ্রমণ একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইলেও, তাহার সঙ্গে আরও কয়েকটি প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। পরিভ্রমণে অনুমতি দান করা কিংবা সে বিষয়ে বন্দোবস্ত করিবার পূর্বে শিক্ষক-শিক্ষিকা ভাবিয়া দেখিবেন যে, বিশেষ করিয়া ঐ সময়ের জন্য প্রস্তাবিত পরিভ্রমণের প্রয়োজন সত্যি করিয়া আছে কি না। তাহা ছাড়া শিশুদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ঐ জাতীয় পরিভ্রমণে আছে কি না, পরিভ্রমণের পরিকল্পনা ঐ স্তরের শিশুদের উপযুক্ত হইতেছে কি না, ইত্যাদি অনেক কিছু শিক্ষকের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

শিক্ষাবিদেরা বলেন যে, শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ ব্যাপারে শিশুদের প্রতি শিক্ষকদের তিনটি দায়িত্ব আছে। প্রথমতঃ শিশুগণ যে গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করে, তাহার সঙ্গে তাহাদিগকে খাপ খাওয়াইতে সাহায্য করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন অনুসারে তাহাদিগকে সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিত্বকে তাহার নিজস্ব শক্তি-অনুযায়ী ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। যদি পরিকল্পিত পরিভ্রমণ এই সমস্ত

চাহিদাকে মিটাইতে পারে, তাহা হইলে পরিভ্রমণের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আর যদি পরিভ্রমণ দ্বারা এই সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে পরিভ্রমণ বর্জন করিতে হইবে।

এই প্রশ্নের সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন জড়িত। কখন পরিভ্রমণের বন্দোবস্ত করিতে হইবে? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যখন শিশুরা পরিভ্রমণে যাইবার জন্য উপযুক্ত হইয়াছে, তখনই তাহাদের পরিভ্রমণে নিয়া যাইতে হইবে। কোন কাজের ইউনিট স্থির করার পর যদি শিশুরা ঐ কাজের ইউনিটেরই কোন একটি অংশ দেখিতে চায় তাহা হইলে তখন তাহাদের পরিভ্রমণে নিয়া যাইতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন এক শ্রেণীর শিক্ষক হয়তো তাহাদের বিদ্যালয়ের জন্য একটি পাকা খাবার-ঘর তৈয়ারী করিবার কথা প্রকাশ করিলেন, তখন ছেলেরা ইট কি করিয়া পোড়াইতে হয় তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে। তখন তাহাদের যেখানে ইট কাটা হইতেছে সেইখানে পরিভ্রমণে লইয়া যাইতে পারা যায়। কিংবা এক শ্রেণীর শিশুরা যখন বলিল যে, তাহারা চিড়িয়াখানার প্রজেক্ট করিবে, কিংবা হাওড়া পুলের প্রজেক্ট করিবে, তখন তাহাদের সেই সমস্ত স্থানে পরিভ্রমণে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া বইয়ে যদি কোন একটি বিষয় পড়িয়া শিশুরা আরও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সেই জাতীয় কাজ যেখানে হইতেছে সেখানে যাইতে চায়, তাহা হইলেও সেখানে যাইতে পারে। 'দামোদর বাঁধ' চতুর্থ-শ্রেণীর 'কিশলয়ে' পড়িয়া যদি চতুর্থ-শ্রেণীর শিশুরা বাঁধ দেখিতে যাইতে চায়, তাহা হইলে তাহারা সেখানে যাইতে পারে। অবশ্য পরিভ্রমণের স্থলগুলি খুব বেশী দূরে যদি হয় তাহা হইলে সেখানে লইয়া যাওয়া শিক্ষকের পক্ষে খুবই মুস্কিল, তাহার কারণ নানা রকম প্রশ্ন তখন তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে শিশুদের পরিভ্রমণে লইয়া যাওয়ার প্রস্তুতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। আমাদের দেশ দরিদ্র। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের তহবিলে এত টাকা নাই যে সকল শিশুকে বেশ একটু দূরে পয়সা খরচ করিয়া লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। অথচ পরিভ্রমণের প্রয়োজনীয়তাও যে খুব বেশী আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় শিক্ষক গ্রামের সমস্ত অভিভাবককে ডাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে পারেন। অভিভাবকবর্গকে পরিভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলে হয়ত কয়েক জন

বড় লোক অভিভাবক নিজেদের বাস, গাড়ী, লরী ইত্যাদি দিয়া শিশুদের সাহায্য করিতে পারেন। প্রস্তাবটা হয়ত অনেক শিক্ষক গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তহবিলের যখন অভাব, তখন তাঁহাদের হাল ছাড়িলেও চলিবে না। গ্রামের মধ্যে অনেক সহৃদয় ও উৎসাহী অভিভাবক আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া চলিলে অনেক সময় অনেক কাজে তাঁহাদের সাহায্য নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।

পরিভ্রমণের করিকল্পনা হইবে সহযোগিতামূলক। শিক্ষক যদি শিশুদের লইয়া পরিভ্রমণে যাইবার ব্যবস্থা করেন, তবে প্রত্যেক শিশুর অভিভাবকের নিকট হইতে শিক্ষক অনুমতি চাহিয়া নিবেন। শিক্ষকের যেমন নানা ভাবে পরিকল্পনা করিবার কাজ আছে, সেইরূপ শিশুদেরও এই পরিকল্পনায় দায়িত্ব আছে। তাহারা পরিভ্রমণে গেলে কি ভাবে সেখানে যাইবে, কি কি খাবার জিনিস সাথে লইয়া যাইবে, পথে তাহারা কি ভাবে চলিবে, কি ভাবে অন্যের সাথে ব্যবহার করিবে, কি ভাবে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিবে, ইত্যাদি সমস্ত কিছু বিচার করিয়া তাহারাই শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাদের পক্ষ হইতে পরিভ্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করিবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষ বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। পরিভ্রমণের কেন্দ্র যদি নিকটে হয় তবে যে বয়সের শিশুরা পরিভ্রমণের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহারাই শুধু যাইবে। আর যদি পরিভ্রমণের কেন্দ্র দূরে হয় এবং কোন সহৃদয় অভিভাবকের সাহায্যে যদি যানবাহনের যোগাড় করা যায় এবং সমস্ত বিদ্যালয়ের শিশুদের নিয়া যাওয়ার স্থান যদি যানবাহনাদিতে থাকে, তাহা হইলে সকল শিশুদেরই লইয়া যাওয়া উচিত হইবে। তবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক থাকিবেন। তাঁহারা স্ব স্ব শ্রেণী পরিচালনা করিবেন এবং শিশুদের বয়স অনুযায়ী আগ্রহের কেন্দ্র স্থির করিয়া শিশুদিগকে সেই ভাবে অভিজ্ঞতা দান করিতে চেষ্টা করিবেন।

পরিবেশ পর্যবেক্ষণ

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে পরিবেশ পর্যবেক্ষণের স্থান অতিশয় উচ্চে। পরিবেশের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যাহা চোখে পড়ে না, দেখার উদ্দেশ্য লইয়া দেখিলে অনেক জিনিষই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উদ্দেশ্য লইয়া দেখিলে যে সকল জিনিষ দৃষ্ট হয়, তাহার সম্যক বিশ্লেষণ শিশু করিতে পারে না, মূল ও সূত্রও তাহার

কাছে অজানিত থাকিয়া যায়। অথচ দৃষ্ট জিনিষের সমগ্রের কিছু অংশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে বোধগম্য হয়, বাকী অংশটুকু প্রয়োজন বোধে 'করা' ও 'আলোচনার' মধ্য দিয়া শিশু আয়ত্ত করিতে পারে, ইহার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বর্তমানে সেদিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে না। যাঁহারা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় বিশ্বাসী, তাঁহারা অনেকেই বিভিন্ন অবস্থার চাপে শ্রেণী-সংশ্লিষ্ট কর্মকেই বিশেষভাবে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদানে উদ্যোগী ও শ্রেণীর বাহিরের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে শিক্ষাদানের ভিত্তিস্বরূপ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। ফলে ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। শ্রেণী-সংশ্লিষ্ট কর্ম যথা,—প্রজেক্ট, শিল্পকাজের ও নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত কর্মের উপরেও উপযুক্ত রকম গুরুত্ব আরোপ খুব অল্পস্থানেই হইতেছে। শিল্প অনুসরণ করার মধ্যে যে স্থৈর্য, পরিশ্রম ও প্রণালী-শুদ্ধ সুব্যবস্থিত কার্যক্রম প্রয়োজন, তাহারও সম্যক অনুশীলন না হওয়ার জন্য কর্ম বলিতে, কতকগুলি আধাআধি প্রজেক্ট এবং কতকগুলি অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্দেশিত কর্মে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রজেক্টের কাজ বা অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্দেশিত কর্ম যদি সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যাপ্ত করিয়া হইত, তাহা হইলে বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না, কিন্তু তাহাও অতিমাত্রায় শ্রেণীগত কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'হাট' এর প্রজেক্ট করিতে যাইয়া 'হাট' দেখান হয় না, 'রেলওয়ে' প্রজেক্ট করিতে যাইয়া রেলষ্টেশন ও তৎসংশ্লিষ্ট শিশুকে বিষয়সমূহ দেখান হয় না, খুব বেশী হইলে বই হইতে রেলওয়ে ইঞ্জিন বা গাড়ী দেখান হইয়া থাকে। ফলে উহারা প্রজেক্টের পর্যায়ও আসিয়া দাঁড়ায় না। এই সমস্ত দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে বিদ্যালয়ের কর্মানুসরণের একটি ভিত্তি স্থির করিয়া লইয়া তবে কর্মানুসরণ করা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পশ্চিম বাংলায় ১৯৪৭ সনে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে, মাত্র কয়েকটি বুনিয়াদী (প্রাথমিক) বিদ্যালয় ছিল, ১৯৫৪-এর মধ্যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় পৌনে তিন শতের মত। এই পৌনে তিন শত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কর্মকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে কিভাবে কর্মকে অনুসরণ করা হইতেছে তাহার সম্যক রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হয় নাই, কিন্তু কয়েকটি স্কুলে কর্মের যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেভাবে কর্মানুসরণ করা চলিলে, কর্মের খোলসটারই শুধু দেখা মিলিয়া থাকে, স্পিরিট

নষ্ট হইয়া যায়, বিশেষতঃ ভারসাম্য রক্ষিত না হওয়ার ফলে বিত্যালয়ের কাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, শিক্ষককে অভিভাবকের চাপে তাল সামলাইতে গিয়া শেষ পর্যন্ত পুরাতন গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। কোনও-ক্রমে বৎসরের শেষ কয় মাসে বইয়ের পাতা শেষ করিয়া তাঁহাকে পরিত্রাণ পাইতে হইয়া থাকে। ফলে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিশু সকলেই কর্মের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে।

এ অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? প্রথম হইতেছে, কর্মকে শিক্ষাব্যবস্থার অধীন করিতে হইলে বিভিন্ন কর্মধারাকে একটা উন্নততর 'প্লেন'এ লইয়া আসিতে হইবে এবং সেই 'প্লেন'-এ যাহাতে সমস্ত কর্মধারাগুলি একত্র মিলিত হইতে পারিবে। সেই 'প্লেন'এ যাহাতে সমস্ত কর্মধারাগুলি সমান মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিলে তবেই সেখানে ভারসাম্য রক্ষিত হইবে। সামাজিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও শিল্প-কাজ—সকলই যদি এক 'প্লেন'-এ যাইয়া সমান গুরুত্ব লাভ করিতে পারে তাহা হইলেই কর্মের ভারসাম্য রক্ষিত হইবে, কর্ম প্রকৃত মর্যাদা লাভ করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, শুধু যে কোন ভাবে কর্ম সম্পাদন করিলেই চলিবে না, কর্মের প্রতিক্ষেত্রের প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কারণ কর্মগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, কর্মগুলির উৎপত্তির ধারা হইতে সমাপ্তির ছেদ পর্যন্ত জড়িত হইয়া রহিয়াছে বহু শিক্ষণীয় বিষয়। অতএব কর্মের কোন প্রক্রিয়াকে ছোট করিয়া দেখিবার উপায় নাই।

তৃতীয়তঃ, শুধু কর্ম সম্পাদনের মাঝেই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়গুলিকেও আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে।

এইখানে বিত্যালয়ের ও গ্রামের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ কি ভাবে বিত্যালয়ের শিশুগণকে নানা রকম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সাহায্য করিতে পারে, সেইদিকে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই দুইটি বিষয় বিত্যালয়ের সমগ্র কার্যক্রমের অংশ মাত্র। ইহাদের উপরই সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইলে সমস্ত কার্যক্রমের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যাইবে। বিত্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান ও অবস্থানগুলির পর্যবেক্ষণ কি ভাবে করা যাইতে পারে তাহার একটি কার্যকরী

পরিকল্পনা দেওয়া যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত পাঠ্যসূচীর ভিতরে পরিবেশ পরিচিতির ব্যব। রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার পরিচালনা নিয়মানুগ না হওয়ার দরুণই উহা সুফলপ্রসূ হইতে পারে নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। বিদ্যালয়ে গ্রামের শিশুরাই পড়িতেছে। গ্রামের সকল শিশুই এই প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া এক হয় উন্নততর শিক্ষা লাভ করিতে গমন করিবে, আর না হয় এই বিদ্যালয় হইতেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। শুধু শিক্ষকের পুস্তকানুগ শিক্ষাদান কিংবা কার্যসম্বলিত শিক্ষাদানই শিশুর দেহ-মনকে উপযুক্তভাবে গঠিত করিয়া তুলিতে পারিবে না, যদি না শিশু বিদ্যালয়ের পরিবেশের সমস্যাগুলির সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত না হয়। পরিবেশের সমস্যা বলিতে শিশুর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কথাই বলা হইতেছে। পরিবেশের সমস্যার সঙ্গে পরিচয়, শিশুর দিক হইতে একতরফা হইলে চলিবে না; শিশুর পিতামাতা ও অভিভাবকের সহিত সমাজের কি সম্বন্ধ, তাহাদের সমস্যা এবং সমগ্র সামাজিক পরিবেশের উন্নতি বিধান ইত্যাদি, সকল কিছুর সঙ্গেই শিশু পরিচিত হইবে। উহা শুধু পরিচয়েই সন্নিবেশিত থাকিবে না, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিকেও শিশুর দৃষ্টি থাকিবে, শিশুর সেখানে দায়িত্বও লইতে হইবে।

এই সমস্ত দিক হইতে শিক্ষক শিশুকে কি ভাবে পরিচালিত করিবেন সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া একটি পরিকল্পনার ইঙ্গিত নিম্নে দেওয়া হইল। নিম্নে যতটুকু দেওয়া হইল, তাহা সাধারণ ইঙ্গিত হিসাবে ধরিয়া লইতে হইবে। গ্রামবিশেষের সমস্যা হইবে বিভিন্ন, শিশুদের কার্যকরী কর্মপন্থাও সেই পথ অবলম্বন করিয়া রচিত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

যে শিক্ষক তাঁহার শিশুদের দিয়া প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণের কাজ করাইতে চান এবং সেই পরিবেশ হইতে শিশুর জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিতে চান, সেই শিক্ষককে যথেষ্ট রকম কুশলী হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষক শিশুর সঙ্গেই এক জন আবিষ্কারকের ভূমিকা লইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি সমস্ত জিনিষকে তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে না দেখিয়া শিশুদের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিবেন, ইহাই হইতেছে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের প্রথম পাঠ। কিন্তু প্রয়োজনবোধে শিক্ষক শিশুদের দৃষ্টির

ঊর্ধ্বে উঠিয়াও শিশুদের সমস্যামূলক বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিবেন এবং তৎসংশ্লিষ্ট বস্তু বা বিষয়, উহার কারণ ও প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কেও ভাল করিয়া আলোচনা করিবেন। এই সম্বন্ধে বিরোধী দল হইতে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে। বিরোধী দল বলেন যে, আবিষ্কারক শিশুর দল যখন পর্যবেক্ষণ কার্যে বাহির হয়, তখন সাধারণতঃ শিক্ষক শিশুদের এমনি ভাবে নিজেদের দায়িত্বেই ছাড়িয়া দেন যে শিশুরা উপযুক্তভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে না। ফলে এই জাতীয় পর্যবেক্ষণ-প্রচেষ্টা অত্যন্ত ভাসাভাসা ও অসম্বদ্ধ এবং কুশলী নির্দেশের অভাব সূচিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের যুক্তি ও আপত্তির খণ্ডনার্থেই শিক্ষকের দায়িত্ব এইখানে কতটুকু তাহার আলোচনাও করা হইবে।

শিক্ষক যখনই শিশুদের লইয়া পরিবেশ পরিভ্রমণার্থে বাহির হইবেন, কিংবা পরিবেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইবেন, তখন শিশুদের লইয়া বাহির হইয়া গিয়া গল্পচ্ছলে প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই তাঁহার দায়িত্ব সম্পূর্ণ হইল, ইহা কখনও বলা চলে না। শিক্ষকের দুইটি দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, একটি হইতেছে পরিবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা, দ্বিতীয়টি হইতেছে পর্যবেক্ষণের শেষে শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়া আসার পর সেই পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহের আলোচনা ও সংগৃহীত বস্তু-সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

প্রথমটি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে একটি কথা আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। শিশুদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে শীত ও বসন্তকালের কয়েকটি মাস পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। কারণ, এই কয়টি মাস ছাড়া গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন মাসের পরিভ্রমণের ক্লান্তি ও কষ্ট যেন পরিভ্রমণ ও আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করে, ইহাই হইতেছে শীত ও বসন্তকালের মাসসমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য স্থিরীকরণের বিশেষ উদ্দেশ্য। কিন্তু শীতকালেও নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এইরূপ পরিভ্রমণ বা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না, কারণ বৎসরের ঐ সময়ে শ্রেণী-পাঠনার সমাপ্তি। জানুয়ারী মাসে বৎসর আরম্ভ হয়, শিশুদের মনে জাগে নূতন আশা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও উদ্দীপনা; অতএব জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ এই তিনটি মাসে শিশুদের পক্ষে, তাহাদের নূতন শ্রেণী পাঠনায়, পর্যবেক্ষণ-সূচী অবলম্বন করা সবচেয়ে সুবিধাজনক। এই কয় মাসের

সময়-পত্রিকায় শিশু-অভিযাত্রীদলের পরিবেশ পরিভ্রমণ ও আবিষ্কারের জন্য বিশেষ সময় নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে। এই কয় মাস ছাড়া যে আর অন্যান্য মাসে পর্যবেক্ষণে বাহির হওয়া চলিবে না, এমন কথা কিছু নাই। যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বৎসরের অন্যান্য সময়েও পর্যবেক্ষণের কাজ চলিবে। আবহাওয়া বিপর্যয়ের জন্যই গ্রীষ্ম ও বর্ষা বাদ দিয়া শীত ও বসন্তেই পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রীষ্ম ও বর্ষায় প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যও রহিয়াছে, তাই যখন প্রয়োজন হইবে, তখন শিক্ষক শিশুদের লইয়া পর্যবেক্ষণে বাহির হইবেন। বলা বাহুল্য, আকাশ পরিষ্কার ও যাতায়াতের সুবিধা হয় এইরূপ দিন বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন।

পর্যবেক্ষণের কাজ বা আবিষ্কারের কাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন রূপ হইবে। যে কাজ তৃতীয় শ্রেণীর শিশুরা করিতে পারিবে, সেই কাজ প্রথম শ্রেণীর শিশুর পক্ষে করা অসম্ভব ; তাহা ছাড়া, যে জিনিষ শিশুরা পর্যবেক্ষণ করিবে সেই জিনিষের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনটুকুও শিশুকে হজম করিতে হইবে। এই কারণে শিশুরা যাহা দেখিবে, সে বিষয়ে শিক্ষকের পূর্ব পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। যখনই শিক্ষক কোন এক দিনের পর্যবেক্ষণের কার্যে বাহির হইবেন, সেই দিনই সমগ্র পর্যবেক্ষণের একটি অংশ হিসাবে, যে জিনিষগুলি দেখিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে শিশুদের জন্য একটি questionnaire বা প্রশ্নপত্র তৈরী করিয়া দিতে হইবে। এই প্রশ্নপত্রটি শ্রেণীর এবং শিশুদের গ্রহণ করিবার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া রচনা করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে প্রশ্নপত্রের বাহিরে যে শিশুরা দেখিতে পারিবে না, এমন একটি বিধিনিষেধের বেড়াজাল পর্যবেক্ষণের কার্যে কখনই থাকিতে পারে না, শিশু যাহা ইচ্ছা তাহা দেখিবে, প্রয়োজনবোধে শিশু ভিন্ন প্রশ্নও করিবে, কিন্তু যে প্রশ্নপত্রটি রচনা করা হইয়াছে, সেই দিকে শিশুর পর্যাপ্ত দৃষ্টি দিতে হইবে, ইহাও শিশুকে জানাইয়া রাখা দরকার।

শিশুদের এই প্রশ্নপত্রটির মধ্যে নানা বিষয়ের ইঙ্গিত থাকিবে। শিশুরা তাহাদের গ্রামের সমস্ত দিক দেখিয়া বেড়াইবে, কোথায় গাছপালা, কোথায় পুকুর, নর্দমা, খাল, বিল, মাঠ, শস্যক্ষেত্র, হাট, বাজার, মঠ মন্দির, মসজিদ, বিভিন্ন কুটির-শিল্প, গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের থাকার দরুণ গ্রামের উন্নতি, অবনতি ইত্যাদি শিশুদের ও উঁচু শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দেখিতে হইবে। সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই এই সব দেখিবে, কিন্তু ছাত্র-

ছাত্রীরা বয়স ও শ্রেণী অনুযায়ী পর্যবেক্ষণের বিশ্লেষণ ও আলোচনার দ্বারা স্থির হইবে। প্রত্যেক জিনিষের 'কি' ও 'কেন' সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের জানিতে হইবে, তবেই শিক্ষার অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে ছাত্রছাত্রীরা বুঝিতে পারিবে।

শিশুরা বহু বার বহু গাছ দেখিয়াছে, কিন্তু সেই গাছের দৃশ্যরূপ শিশু কতটা মনে রাখিতে পারিয়াছে? যে সমস্ত গাছের সঙ্গে শিশুর বিশেষ সম্বন্ধ যথা,—আম, কুল, জাম, পেয়ারা ইত্যাদি মাত্র এই জাতীয় কয়েকটি গাছ সম্বন্ধেই শিশুরা কিছু হয়ত বলিতে পারে, কিন্তু প্রতিদিন পরিবেশে অন্যান্য বহু গাছ দেখিয়াও তাহারা সেই গাছগুলিকে মনে রাখিতে পারে না। এমন কি, যে গাছের সঙ্গে শিশুদের বৎসরের এক সময় খুব পরিচয় হয়, অর্থাৎ কুল গাছের সঙ্গে, সেই কুল গাছেরই পাতার বৈশিষ্ট্য কি, তাহা অনেক উচ্চ শ্রেণীর শিশুও বলিতে পারে না। পরিবেশে যে জিনিষ আছে, সেই জন্য বই পড়িতে হয় না, প্রয়োজন শুধু দৃষ্টি মেলিয়া দেখিবার মত শক্তি অর্জন করা।

শিশুরা প্রাকৃতিক পরিবেশে পর্যবেক্ষণ করিবার সময় পাতা সংগ্রহ করিবে, সেই পাতা শিশুরা দেখিবে, শ্রেণীকক্ষে সেই সমস্ত পাতা আনিয়া বিশ্লেষণ করিবে। এই ভাবে কাজ করিলে পাতার সম্বন্ধে বইতে পড়িয়া শিখিবার প্রয়োজন হয় না। কোন্ মাসে কি ফসল জন্মে, সেই ফসলের বীজ কখন বপন করা হইয়াছে, তাহা সর্বদা দেখিয়াও শিশুরা জানে না। ভাল ফসল ফলাইতে হইলে চাষীরা কি করে, তাহাও শিশুরা সর্বদা দেখিতেছে, কিন্তু সে কথা শিশুরা জানে কি? এই রকম বহু জিনিষ পরিবেশে আছে যাহা শিশুরা জানে না আর বহু বার দেখিয়াও তাহারা সেটা মনে রাখিতে পারে না। মনে না রাখিবার প্রকৃত কারণ হইতেছে উপযুক্ত দৃষ্টির অভাব।

আমাদের পরিবেশে পাখী, নানা রকম পোকামাকড়, ব্যাঙ, কেঁচো ইত্যাদির অভাব কি? কিন্তু শিশুরা পাখী দেখিলেও মনে রাখিতে পারে না, কোন্ সময় কোন্ পাখী দেখা যায়, কয়েকটি মাসে কেন ব্যাঙের ডাক শোনা যায় না, তাহাও শিশুরা জানে না। শিশুরা জানে না বলিয়া শিশুদের উপর কোন দোষারোপ করা যাইতেছে না, শুধু পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতির দিক হইতেই ইহার আলোচনা করা হইতেছে। কিন্তু জিনিষ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়া শিশু যদি পর্যবেক্ষণ করিবার কৌশলটুকু আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে তাহা

হইলে শিশুর দৃষ্টি ক্রমে সন্ধানী হইয়া আসিবে, শিশু প্রত্যেকটি জিনিষ লক্ষ্য করিতে শিখিবে।

শিশু প্রতি হাটবারে গ্রামের বিভিন্ন লোককে হাটে বিভিন্ন জিনিষ লইয়া যাইতে দেখে। শিশুকে যদি বুঝাইয়া দিতে পারা যায় যে বিভিন্ন লোকে কেন বিভিন্ন জিনিষ বাজারে লইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে শিশু তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে, এবং পরে শিশু ঐ সম্পর্কীয় যে সমস্ত জিনিসের সন্ধান লইবে, তাহা শিশুর কাছে আপনা-আপনিই সহজ হইয়া আসিবে। হাটে যাইয়া শিশুরা অনায়াসে শিক্ষকের সাহায্যে বিভিন্ন জিনিষের সমাবেশ দেখিতে পারে, জিনিষগুলি কাহারা কিনে, কোথায় সে সমস্ত জিনিষ যায় ইত্যাদি সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিই শিশুরা আনন্দের সঙ্গে মনে রাখিতে পারে। শুধু তাই নয়, হাটে বহু জিনিসের আমদানীও হইয়া থাকে। সেই সমস্ত জিনিষ কেন আমদানী করা হয়, গ্রামের ও আশেপাশের অন্যান্য স্থানের লোকেরা কি বিষয়ে অভাব বোধ করে ইত্যাদি অনায়াসে শিশুরা বা ছাত্রছাত্রীরা বুঝিতে পারে—গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার দিকগুলি ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিষ্কার হইতে থাকে। যে সমস্ত কাঁচামাল রপ্তানী হইয়া নিকটস্থ মিল বা কলে যাইতেছে এবং সেই সমস্ত মিল বা কলে কি প্রস্তুত হয়, তাহা ছাত্রছাত্রীরা প্রসঙ্গক্রমে বুঝিতে পারে। গ্রামে যে সমস্ত কুটির-শিল্প আছে তাহার উৎপাদন গ্রামবাসীদের প্রয়োজন মিটাইতে পারে কিনা, এবং যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা কোথায় যায়, তাহাও শিশুদের অজানা থাকে না। হাটের আমদানী দ্রব্যের মত ভারতের বিভিন্ন রাজের লোকেরাও হাটে আসিয়া মিলিত হয়, বিভিন্ন জিনিষ কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্ত। ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের দেখিয়া ও কথা বলিয়া তাহাদের কথাবার্তার ধরণ, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি লক্ষ্য করিতে পারে, বাংলার বাহিরের লোকদের রীতিনীতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সহজ পরিচয় হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হওয়া বইয়ের পাতা মুখস্থ করার চেয়ে বেশী কার্যকরী, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহের অবকাশ নাই।

ছাত্রছাত্রীদের গ্রামের সমাজের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে। যে গ্রামে শিশুরা বসবাস করিবে, তাহার সম্পূর্ণ চিত্র শিশুর নখদর্পণে থাকিবে, তবেই ত শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণতার দাবী করিতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, গ্রামে এমন কি আছে যাহা শিখিবার বিষয়বস্তু হইতে পারে। প্রথম

কথা হইতেছে, শিশুরা যদি স্বীয় গ্রাম্য সমাজকে চিনিতে পারে, তাহা হইলে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সমাজ সম্বন্ধে তাহার ধারণা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া আসিবে। গ্রামের সমাজের সম্বন্ধে একটু ভিত্তি তৈয়ারী হইলেই, সেই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া অন্যান্য সমাজের যাচাই করা চলিবে। নিজের সমাজকে কষ্টিপাথর বলা হইতেছে না। বলা হইতেছে একটি কাঠামো, যে কাঠামোর বর্ধিত বা সংক্ষিপ্ত বা সংশোধিত সংস্করণ হইতেছে অন্যান্য সমাজ। অতএব স্বীয় সমাজের দোষ, ত্রুটি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভালমন্দ ইত্যাদির সমগ্র রূপ যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের জানা হইয়া যায়, সেই দিকে শিক্ষকের পরিকল্পনা করিতে হইবে। গ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দান কতটুকু, তাহাদের দান দ্বারা গ্রাম কতটুকু সমৃদ্ধ হইতেছে, বিভিন্ন কুটির-শিল্পের কর্মীরা গ্রামে কতটা সম্পদ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং আর কিরূপ সাহায্য পাইলে তাহারা গ্রামকে আরও সম্পদশালী করিয়া তুলিতে পারে, তাহাও ছাত্রছাত্রীদের জানিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা শুধু বই পড়ার ভিতর সন্নিবেশিত নয়, গ্রামের মঙ্গল ও কল্যাণ যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সঙ্গে জড়িত আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। অতএব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যে রকম পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বর্তমানে কৃষক-সম্মেলন ইত্যাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা গ্রামের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সম্মেলনের ব্যবস্থা করিবে। ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে সমবেদনশীল হয়, যাহাতে তাহারা অপরের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিতে পারে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে অপরকে সাহায্য করিবার এবং নূতনকে গ্রহণ করিবার মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, সেইদিকে শিক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গ্রামে কোথায় কোন্ শিল্পকাজ হইতেছে, ছাত্রছাত্রীরা তাহার সন্ধান রাখিবে। সেই শিল্পকাজের কি ভাবে উন্নতি হইবে ছাত্রছাত্রীরা তাহার ব্যবস্থা করিতে অগ্রণী হইবে। যদি অর্থের প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহারা শিক্ষকের সঙ্গে মিলিত হইয়া গ্রামের বড়দের সঙ্গে এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া সেই সমস্যার সমাধান করিতে সচেষ্ট হইবে। কুটির-শিল্পটি যাহাতে অকালে নষ্ট না হয় সেইদিকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই লক্ষ্য রাখিবে। তাহারা বয়স্কদের বুঝাইবে যে গ্রামের একটি শিল্পের নষ্ট হইয়া যাওয়া, সেই লোকের ব্যক্তিগত ক্ষতি ছাড়াও গ্রামের লোকের সমষ্টিগত ক্ষতিও কম নয়।

এই প্রসঙ্গে শিশুদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের যোগাযোগের কথা প্রশ্নটি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রামের সঙ্গে যদি বিদ্যালয়ের সংযোগ না থাকে তাহা হইলে শিক্ষা উপযুক্ত খাতে চলিতেছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রামবাসীরা ও অভিভাবকেরা যেমন শিশুদের শিক্ষায় দরদ দিয়া শিশু ও শিক্ষককে সাহায্য করিবে, শিক্ষকও গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া শিশুদের সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে পরিচালিত করিবেন। গড়ে মাসে এক দিন অন্ততঃ পক্ষে শিশুরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া গ্রামের সেবা করিবে। যে শিক্ষার ধারা ছাত্রছাত্রীরা জীবনে গ্রহণ করিয়া একটি নূতন জীবনের অধিকারী হইতে যাইতেছে, সেই শিক্ষার ধারা, পরোক্ষভাবে অভিভাবকদের কাছে শিশুরা সেবার মধ্য দিয়া প্রচার করিবে। সেই প্রচারের প্রভাব অভিভাবকদের মনে যদি ধাক্কা দিতে পারে, তবেই ত শিশুর গৃহ ও বিদ্যালয় একই ভাবে শিক্ষা-পীঠস্থান হইতে পারিবে।

পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে মন্দির, মসজিদ, মঠ ইত্যাদিও কম শিক্ষাপ্রদ নয়। শিক্ষক ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন। ধর্মপ্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট মেলার ইতিহাসও শিশুদের নিকট কম চমকপ্রদ নয়, ইহাও শিশুরা অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারিবে।

পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনেক কথা আলোচনা করা হইল। শিশুরা পর্যবেক্ষণ করিবে, অনুসন্ধান করিবে, আবিষ্কার করিবে। এইরূপ করিতে হইলে শিশুদের প্রথম চাই questionnaire বা প্রশ্নপত্র। তাহা ছাড়া শিশুরা যে সব জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনিবে, তাহারও ইঙ্গিত শিক্ষক দিবেন। তিনি ঐ সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য বিভিন্ন ধরণের পাত্র, রাস্তা মাপিবার জন্য চেন, দিক্‌নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী কম্পাস, ইত্যাদিও শিশুদের সংগ্রহ করিয়া দিবেন। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যদি কিছু কাজ যুক্ত হয়, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। উহাতে শিশুরা আনন্দ পাইবে বেশী।

পর্যবেক্ষণের কাজ পর্যবেক্ষণকালেই শেষ হইয়া যাইবে না, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পর্যবেক্ষণের কাজের পর শ্রেণীতে পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট নানারূপ কাজ করিতে হইবে, তবেই শিশুরা বা ছাত্রছাত্রীরা যাহা শিখিয়াছে তাহা দানা বাঁধিয়া উঠিবে। প্রথমে শিশুরা বা ছাত্রছাত্রীরা যাহা সংগ্রহ করিয়া

আনিয়াছে, তাহা শ্রেণীতে বিভিন্ন 'কোণে' সাজাইয়া রাখিবে। যে জিনিষ যে পাত্রে বা যে স্থানে রাখা উচিত, ছাত্রছাত্রীরা সেই সব জিনিষ ঠিক সেই সেই স্থানে রাখিবে। পাতা সংরক্ষণের জন্য ব্লটিং পেপার চাই। ব্লটিং পেপারে পাতা রাখিয়া উহা চাপ দিয়া কয়েক দিন রাখিতে হইবে, তাহার পর পাতাগুলিকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া খাতায় আঁটিয়া দিতে হইবে। ফুলও ঐ ভাবে রাখা যায়। পাখীর বাসা, ডিম ইত্যাদি ভিন্ন স্থানে নাম লিখিয়া রাখিতে হইবে। বেঙাচি, ছোট ছোট মাছ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে জল দিয়া রাখিতে হইবে। প্রয়োজনমত জল বদলাইতে হইবে। বিভিন্ন ফসলের উপযুক্ত মাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বিভিন্ন বোতলে লেবেল লাগাইয়া রাখিতে হইবে। বিভিন্ন ফসলের বীজ যোগাড় হইলে, সেগুলিও বোতলে লেবেল লাগাইয়া রাখিতে হইবে ইত্যাদি।

এই সমস্ত কাজ ছাড়াও বিভিন্ন দলের ছাত্রছাত্রীদের নেতা তাহাদের পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট শ্রেণীতে শিক্ষকের উপস্থিতিতে পড়িবে। সমস্ত রিপোর্ট পড়া হইয়া গেলে ছাত্রছাত্রীরা ঐ রিপোর্ট লইয়া আলোচনা করিবে এবং শিক্ষক শেষ সময়ে সকলের বক্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া সারাংশ বলিবেন, কিংবা কোন কথা তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। তাহা ছাড়া পর্যবেক্ষণের পর কোন একটি কাজের ইউনিট লইয়া একটি প্রজেক্টও করা যাইতে পারে। প্রজেক্টে, বিভিন্ন দলে ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করিবে, এবং সকল দলে মিলিয়া একটি প্রজেক্ট গড়িয়া তুলিবে। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সহ পরে প্রজেক্টটির বিচার ও আলোচনা করিতে পারেন।

পর্যবেক্ষণকে এইভাবে কাজে লাগান হইলে বিভিন্ন বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে সে বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলিতে পারেন। পর্যবেক্ষণ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মের আধিক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াই তাঁহারা আপত্তি তুলিয়া থাকেন। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, নীচের শ্রেণীতে পাঠ্যক্রম শিশুর কর্মানুযায়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তাহার কারণ শিশুরা যে সমস্ত জিনিষে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বোধ করে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষা দেওয়া প্রথম অবস্থায় মনোবিজ্ঞানসম্মত। তাহা ছাড়া পর্যবেক্ষণ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম ও অন্যান্য হাতের কাজ ও শিল্প কাজের সাহায্যে পরিবেশ সম্বন্ধে শিশু সমগ্র জ্ঞান যেমন লাভ করে, তেমনি ঐ জ্ঞান স্থিত করিবার জন্য মাতৃভাষা, অঙ্ক, স্থানীয় ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায়। উপরের শ্রেণী

সম্পর্কে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পর্যবেক্ষণ ছাড়াও শিল্পকাজের উপর গুরুত্ব দিতে হয়। সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও সাহিত্য, অঙ্ক ও পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস শিক্ষা দিতে হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং শিল্পকাজের মধ্য দিয়া পাঠ্যসূচীর অনেক অংশই শেষ করা যায় বটে, কিন্তু অনেক অংশ বাকীও থাকিয়া যায়। যেগুলি বাদ রহিল সে সমস্ত ক্ষেত্রে পাঠগুলিকে activise করা যাইতে পারে কিংবা তাহাও সম্ভব না হইলে হার্বাটের পঞ্চবিধ ক্রমের সাহায্যে পড়াইতে হয়। অতএব বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উচ্চ শ্রেণীতে যদি পাঠ্যসূচীকেই অনুসরণ করিয়া পাঠদান করিতে হয়, তাহা হইলে উপরের যে সমস্ত পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে, সেইভাবেই পড়ান যাইতে পারে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম শিক্ষাদানের পদ্ধতির বিভিন্ন পন্থার মধ্যে অন্যতম। ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের পরিচিত জিনিষ হইতে যত স্বচ্ছন্দভাবে অজানাকে জানিতে পারিবে, প্রথমেই অজানা জিনিষকে তত সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। উদাহরণস্বরূপ পঞ্চম শ্রেণীর ইতিহাস পাঠ্যসূচীর একটি অংশ ধরা যাইতেছে। ছাত্রছাত্রীদিগকে পঞ্চম শ্রেণীতে 'স্বাধীনতা-সংগ্রাম' পড়িতে হয়। এই অধ্যায়টি শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর শেষ দিকে দেওয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ বৎসরের প্রায় শেষ দিকে না হইলেও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ছাত্রছাত্রীদের উহা পড়িতে হয়। কিন্তু জানুয়ারী মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ছাত্রছাত্রীদের ২৩শে নেতাজীর জন্মদিবস, ২৬শে প্রজাতন্ত্র দিবস ও ৩০শে গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ এই তিনটি দিবস পালন করিতে হয়। এই দিবসগুলিকে যদি ছাত্রছাত্রীদের দিয়া প্রজেক্টের মত করিয়া পালন করান যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দিবসগুলির তাৎপর্য বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের আর স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে জানিবার বাকী রহিল কি? অতএব দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরা বৎসরের প্রথম দিকেই পাঠ্যসূচীর শেষ পর্যায়ের ইতিহাস সম্পর্কীয় জ্ঞান, কর্ম ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়া লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া প্রথমেই ইতিহাস পড়াইতে গিয়া 'বাবর' সম্পর্কে পাঠদান করা হইয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে সমূহ যে আগ্রহের কেন্দ্র, তাহা বেশী কার্যকরী হয়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মোটেই নাই। কিন্তু অনেক শিক্ষাবিদ্ আছেন, যাঁহারা ইতিহাসের ক্রমকে নষ্ট করিতে চান না, তাঁহারা বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যসূচীগুলি একটি ক্রম অবলম্বন করিয়া রচিত

হইয়াছে এবং 'স্বাধীনতার ইতিহাস' শিক্ষালাভের অনেক পূর্বে ছাত্রছাত্রীরা 'বাবর' শিখিবে এবং তাহার পর তাহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া 'স্বাধীনতার ইতিহাসে' গিয়া পৌছিবে। ঐ শিক্ষাবিদ্‌গণ সময়-জ্ঞানের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া ঐ পন্থা অনুসরণে পক্ষপাতী। কিন্তু যাহা সহজে বোঝা যায়, তাহা তাহাদের পক্ষে গ্রহণ করিতে পারাই সহজ এবং যোগাযোগ রক্ষা করিয়া তাহা হইতে অন্য দিকে যাত্রা করাও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। এই শিক্ষাবিদ্‌গণ ভূগোলের ক্ষেত্রেও এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে স্থানীয় ভূগোলই মাত্র শিক্ষা দেওয়া চলে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের ভূগোল, ভারতবর্ষের ভূগোল এবং পৃথিবীর ভূগোল ঐ ভাবে শিক্ষা দেওয়া চলে না। কথাটা খাঁটি সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থানীয় ভূগোল সম্বন্ধে শিশু বা ছাত্রছাত্রীর জ্ঞান যদি স্থিত হয়, তাহা হইলে স্থানীয় ভূগোল হইতেই বাংলাদেশ, তথা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। গ্রামের কাঁচা মাল ট্রেন, মোটরগাড়ী, নৌকা ইত্যাদির সাহায্যে সহরে শিল্প অঞ্চলে যায়। শিল্পাঞ্চল বলিতে কোন্ শিল্পাঞ্চল তাহাও শিশুরা জানিতে পারে। ইহার পর শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদের কাছে গ্রামের উৎপাদন, রপ্তানী, আমদানী ইত্যাদির মধ্য দিয়া ভারতের বিভিন্ন ভৌগোলিক সমস্যা আসিয়া পড়িবে। স্থানীয় ভূগোলের সঙ্গে উহার যোগাযোগ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে উহা বিস্তৃতভাবে পড়া সহজসাধ্য হইবে।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের ফলে আরও একটি বিশেষ গুণ শিশুদের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতেই সকলের কাছেই বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে যে রেষারেষি, হানাহানি করিয়া বাঁচিয়া থাকা চলিবে না। যুদ্ধ তখনই সম্ভব, যখন যুদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু যুদ্ধ যখন পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়ে, যখন টেনিস বলের মত, একটি ছোট্ট আণবিক বোমা এক সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ করিয়া থাকে, তখন যাঁহারা যুদ্ধান্বেষী, তাঁহারাও যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবার প্রস্তাব করিয়া থাকেন। পৃথিবীই যদি আণবিক বোমার প্রভাবে ধ্বংস হইয়া যায় তাহা হইলে হিংসা দ্বেষ কাহাকে লইয়া? এই দিক হইতে অবশ্য বহু রাষ্ট্রই যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছে। কিন্তু কোন জিনিষের চাপে কোন কাজ হইতে বিরত হওয়া ভবিষ্যতে খুব বেশী কার্যকরী হয় না। বাহিরের চাপে সহাবস্থিতির জন্য ব্যগ্র হওয়া এবং অন্তরের প্রেরণায়

সহাবস্থিতির জন্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করা,—এই দুইয়ের ভিতরে শেষোক্ত অবস্থাই শ্রেয়। অতএব সকলেই যেন সেই দিক হইতে শিক্ষা পায়, সকলের মনে যাহাতে একটা আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগিয়া উঠে, সেই দিকে চেষ্টা প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টার আরম্ভ-অবস্থা হইবে শিশুদের নিয়া। তাহারাই ভবিষ্যৎ নাগরিক, তাহারাই দেশ পরিচালনার অগ্রদূত। যদি প্রথম হইতেই শান্তি ও সমন্বয়ের জন্য ধীরে ধীরে অজানিতে শিশুদের মন প্রভাবান্বিত করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের সামগ্রিক জীবনও গড়িয়া উঠিবে। শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যুদ্ধ নিরোধের জন্য তখন আর বেগ পাইতে হইবে না, সকলেই তখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থিতির জন্য গড়িয়া উঠিবে, পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করিবে।

শিশুদের মনে এইরূপ আন্তর্জাতিকতাবোধ ও শান্তি-সম্বন্ধীয় মনোভাব কি ভাবে জাগ্রত করা যায়? অন্যান্য নানা রূপ প্রণালী আছে, কিন্তু 'পর্যবেক্ষণের' ক্ষেত্রে শিশুদের মন যত সহজে ঔদার্য্যপূর্ণ করা যায়, তত সহজে প্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্য দিয়া আর অন্য কোন ভাবে করা যায় না। বিভিন্ন দেশের ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে বইয়ে পড়া, তাহাদের বিষয় লইয়া নাটক-অভিনয় করা, তাহাদের কাছে পত্র-প্রেরণ, বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, আন্তর্জাতিক দিবস প্রতিপালন করিয়া শান্তি ও আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও সেমিনার করা, U. N. O.র মত করিয়া প্রথমে বিদ্যালয়ের শিশু-পরিষদে আলোচনা কিংবা পরে জেলায় বা পশ্চিমবঙ্গে একটি শিশু-পরিষদ গঠন করিয়া সেইখানে U. N. O.র মত আলোচনা করা, বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের ছবির প্রদর্শনী ইত্যাদি বহু ভাবে আন্তর্জাতিকতাবোধ বৃদ্ধির চেষ্টা করা যায়। উহার কার্যকরী ক্ষমতা প্রচুর স্বীকার করিয়া লইলেও, ঐরূপ ব্যবস্থায় পশ্চিম বাংলার সমস্ত শিশুকে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া হয় না। কিন্তু শিক্ষক-পরিচালিত পরিবেশ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে শিশুরা গ্রামের প্রত্যেকটি জিনিষ ও প্রত্যেক শ্রেণীর লোককে আপনার বলিয়া গ্রহণ করে এবং প্রত্যেকটি জিনিষ ও মানুষের প্রতি তাহাদের মায়ামমতাবোধ বৃদ্ধি পায়। মানুষে মানুষে প্রভেদ নাই, প্রত্যেকটি মানুষই সমজের অন্তর্গত, এবং প্রত্যেক মানুষেরই সমাজে কোন না কোন রূপ দান আছে,—এই স্বীকৃতি ও মর্যাদা শুধু শিক্ষাই দিতে পারে। শিশুরা সেই শিক্ষাই এই মেলামেশা, সেবা এবং গ্রামের সকল বস্তু ও

মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা-মূলক কর্মের মধ্য দিয়া পাইতেছে। শিশুদের মন যদি ধীরে ধীরে এই ভাবে গড়িয়া উঠে, স্নেহ, মমতা, সমবেদনা ও সাহায্য করিবার মনোবৃত্তি যদি শিশুদের মনে অল্প বয়স হইতেই দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিকতা-বোধ ও শান্তি সম্বন্ধে তাহাদের জানিবার বাকী রহিল কি? যতটুকু বাকী রহিল, শিশুদের গঠিত মন তাহা গ্রহণ করিতে ভবিষ্যৎ জীবনে কখনই দ্বিধা বোধ করিবে না।

বাচনিক প্রদীপন

আমরা পূর্ববর্তী অংশে শ্রাব্য-দৃশ্য প্রদীপন বা শিক্ষা-সরঞ্জামের কথা আলোচনা করিয়াছি। ঐ প্রদীপনসমূহ শ্রেণীতে পাঠদানের সময় বিশেষ উপযুক্ত এই কথা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। শ্রাব্য-দৃশ্য প্রদীপন ছাড়াও বাচনিক প্রদীপন রহিয়াছে। বাচনিক প্রদীপন প্রয়োগ করিলেও পাঠদান অত্যন্ত সরস ও সহজ হয়। আমরা নিম্নে বাচনিক প্রদীপন সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বাচনিক প্রদীপন নিম্নলিখিত প্রকারের হইতে পারে ; যথা—

(ক) **তুলনা**—একটি নূতন বিষয় জ্ঞান দানের সময় পূর্বজ্ঞাত কোন বিষয়বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিলে নূতন বিষয়ের জ্ঞান ভাল হয়।

(খ) উদাহরণ দান—একটি নূতন বিষয় বুঝাইবার সময় বা কোন বিমূর্ত (abstract) বিষয় ছাত্রছাত্রীদিগকে ভাল ভাবে বুঝাইবার সময় শিক্ষক উদাহরণের সাহায্য নিয়া থাকেন। উদাহরণের সাহায্যেই অনেক সময় বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যায়, ছাত্রছাত্রীরা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে।

(গ) **ছোটগল্প বলা**—উদাহরণের মতই কোন বিষয়কে বুঝাইতে গিয়া শিক্ষক ছোট গল্প বলিয়া নিজের বক্তব্যটি বুঝাইয়া থাকেন।

(ঘ) **সাদৃশ্য কথা বা বিষয়ের উল্লেখ** করিয়া শিক্ষক তাহার বিষয়বস্তুকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে পারেন। শিক্ষক ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের সময় সদৃশ্য ঘটনার উল্লেখ করিতে পারেন বা বিষয়টির সমান্তরাল কোন বিষয়বস্তু অন্য পুস্তক হইতে বর্ণনা করিতে পারেন। ইহাতে বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদিগের কাছে সহজবোধ্য হইবে, ছাত্রছাত্রীরাও পাঠদান শুনিয়া আনন্দলাভ করিবে।

৫। সরব পঠন ও নীরব পঠন

পাঠদান কালে সরব পঠন ও নীরব পঠন উভয়েরই ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়েই শিক্ষাক্ষেত্রে সমান উপযোগী নয়। তাই তাহাদের সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা হইল।

সরব পঠনের উপকারিতা

(১) সরব পঠনের দ্বারা উচ্চারণের শিক্ষা ভাল হয় এবং তাহা ছাড়া মৌখিক বর্ণনা দিবার শক্তি শিশু অর্জন করে।

(২) সরব পঠনে শিশুর ভাষার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য থাকে এবং শিশুর ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

(৩) সরব পঠনে তিনটি ইন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহার হয়; যথা,—দর্শন, শ্রবণ ও বাকের। এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন হওয়ার ফলে শিশুদের পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

(৪) যেহেতু শিশু বেশী মনোযোগ দান করে, সেই হেতু তাহার পক্ষে স্মরণ রাখাও সহজ হয়।

(৫) কোন কোন বিষয় অভিনয় ও আবৃত্তির আকার শিক্ষা করিলে কথাগুলি ছাত্রছাত্রীদের মনে গাঁথিয়া থাকে এবং ফলে সেই সব কথা শিশুর অনেক দিন পর্যন্ত স্মরণ থাকে।

সরব পঠনের অসুবিধা ও অপকারিতা

১। সরব পঠনের ফলে পাঠে বেশী সময় ব্যয়িত হয় এবং পাঠের উন্নতি কম হইয়া থাকে।

(২) ভাষার প্রতি লক্ষ্যের দরুণ ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবিষয় মর্মানুসরণ না করিয়াই পড়িয়া যাইতে পারে। অতএব সরব পঠনে অনেক সময় উপযুক্তরূপ মর্মানুসরণ হয় না।

(৩) বেশী উচ্চৈঃস্বরে যদি পড়া হয়, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীর উহাতে বেশী পরিশ্রম হইবে এবং উহা মনোযোগ দানে মোটেই সাহায্য করিবে না। নিজের শিক্ষার জন্য যদি পড়িতে হয় তাহা হইলে নিজের পড়ার স্বর নিজের কাণে যাহাতে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে এই ভাবে পড়িতে হইবে। উচ্চৈঃস্বরে বা নিম্নস্বরে পড়া ভাল নয়। শ্রেণীতে যদি পড়িতে হয় তবে শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রী যাহাতে শুনিতে পায় এইরূপ ভাবে পড়িতে হইবে। কিন্তু বেশী জোরে চেঁচাইয়া পড়া কখনও উচিত হইবে না।

(৪) সরব পঠনে অন্যের পাঠের ব্যাঘাত হয়। তাই বেশী ছাত্র একসাথে অনেক ক্ষণ বসিয়া পড়িতে পারে না।

নীরব পঠনের সুবিধা

(১) নীরব পঠনে মর্মানুগ্রহণের সুবিধা, কারণ ইহাতে ভাষা হইতে ভাবের প্রতিই গুরুত্ব থাকে বেশী।

(২) নীরব পঠনে অল্প সময়ে বেশী বিষয় পাঠ করা সম্ভব।

(৩) নীরব পঠনে সরব পঠন হইতে পরিশ্রম কম হয়।

(৪) ইহাতে এক স্থানে বসিয়া অনেক ছাত্রছাত্রী নানা বিষয় পাঠ করিতে পারে।

(৫) নীরব পঠন দ্বারা ইচ্ছা করিয়া মনোযোগ দানের শক্তি বৃদ্ধি ও চিন্তা শক্তির বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

(৬) নীরব পঠন দ্বারা ছাত্রছাত্রী নিজের চেষ্টায় শিক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৭) নীরব পঠনে অভ্যস্ত হইলে ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যৎ জীবনে নানা পুস্তক পড়িয়া জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়।

নীরব পঠনের অসুবিধা

(১) নীরব পঠন ছোট শিশুদের জন্য উপযোগী নয়। ইহার কারণ এই যে নীরব পঠনে ইচ্ছামূলক মনোযোগ বেশী দিতে হয়।

(২) নীরব পঠনে শিশুদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা হয় না এবং মৌখিক বর্ণনা-শক্তিও বৃদ্ধি পায় না।

(৩) নীরব পঠনে ভাষার প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হয় না এবং তাহার ফলে ভাল ভাষা জ্ঞান হয় না।

(৪) নীরব পঠনে শিশুর ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে না।

নিম্ন শ্রেণীতে সরব পঠন শিশুরা অভ্যাস করিবে, কারণ নীরব পঠনে শিশুরা উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করিতে পারে না।

৬। পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা

পাঠ্য বিষয় শুধু পড়াইলেই চলিবে না, অর্জিত জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের মনে গাঁথিয়া দিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। না হইলে

ছাত্রছাত্রীরা অর্জিত জ্ঞান বেশী দিন মনে রাখিতে পারিবে না। অর্জিত জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের মনে গাঁথিয়া দিবার জন্য প্রয়োজন পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা। কোন একটি শীর্ষের বর্ণনা দিবার পর শিক্ষক সেই শীর্ষের উপর নানারূপ প্রশ্ন করিয়া পাঠটির পুনরাবৃত্তি করিবেন। শীর্ষটি বড় হইলে বর্ণনার সাথে সাথেই প্রশ্ন দ্বারা পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা করা যাইতে পারে। শীর্ষগুলি শেষ হইয়া যাইবার পর সমগ্র বিষয়টির উপর শিক্ষক প্রশ্ন করিয়া পুনরালোচনা করিতে পারিবেন। ইহাতে ছাত্রছাত্রীরা বিষয়টি ভাল করিয়া মনে রাখিতে পারিবে। কিন্তু দীর্ঘকাল স্মরণ রাখিবার জন্য এই প্রক্রিয়াই যথেষ্ট নয়। স্মৃতিশক্তির সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে কোন বিষয় শিক্ষা দিবার পর ২।৩ দিন পর উহার আবার পুনরালোচনা করার প্রয়োজন রহিয়াছে। শ্রেণীতে ইহা করা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভবপর নয়, কারণ উহাতে শ্রেণীতে শিক্ষাদানের গতি শ্লথ হইয়া যাইবে। এই কারণে ছাত্রছাত্রীকেই এই বিষয়টির পুনরালোচনা গৃহেই করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু শিক্ষক একটি বিষয়ে অবহিত হইবেন। তিনি পাঠদানের পরের দিন নূতন পাঠ আরম্ভ করিবার পুর্বে প্রশ্নের সাহায্যে পূর্বদিনের পাঠ ছাত্রছাত্রীদের কতটা স্মরণ আছে তাহা যাচাই করিয়া দেখিবেন। এই পর্যায়ে যতটুকু পুনরালোচনা করার প্রয়োজন তাহা তিনি করিবেন। তাহা ছাড়া খুব ছোট শিশুদের বেলায় শিক্ষক সপ্তাহের শেষে একটি মৌখিক পরীক্ষা করিয়া অতীত বিষয়ের পুনরালোচনা করিতে এবং বড় ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে মাসের শেষে বা termএর শেষে এই জাতীয় পরীক্ষা লওয়া যাইতে পারে।

বিষয়ভেদে পুনরালোচনার আকারও ভিন্ন হইয়া থাকে। অঙ্কের ক্ষেত্রে যে নিয়মের অঙ্ক করা হইয়াছে সেই অঙ্ক করিতে দিলে, কিংবা জ্যামিতির Extra করিতে দিলে, কিংবা ভূগোলের অতীত অংশ সম্পর্কে মানচিত্র অঙ্কন করিতে দিলে। কিন্তু সাহিত্য পাঠের উপর নির্ভর করিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিতে দিলে বা রচনা লিখিতে দিলে ভালরূপ পুনরালোচনা করা হইবে।

৭। সারাংশ গঠন

পাঠের শেষে পাঠ্যবিষয়ের সারাংশ ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় বোর্ডে শিক্ষক লিখিয়া দিতে পারেন। ইহাতে ছাত্রছাত্রীদের মনে পাঠের বিষয়বস্তু ভালভাবে গাঁথিয়া থাকিবে। সারাংশ গঠনে খুব প্রয়োজনীয় কথা বা

তথ্যগুলির উপরই গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। শিক্ষক যে সকল সময়ে বোর্ডেই সারাংশ লিখিয়া দিবেন, এমন নয়। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সহযোগিতায় পাঠ্যবিষয়ের উপর সারাংশ গঠন করিয়া দিবেন। তারপর তিনি তখন ছাত্রছাত্রীদিগকে উহা লিখিতে বলিতে পারেন। সকল বিষয়েই যে পাঠের সারাংশ লেখার প্রয়োজন আছে এমন নয়। ইতিহাস ভূগোল, সমাজ-বিদ্যা, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের সারাংশ দেখানর ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, কিন্তু গণিত, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সারাংশ না লেখাইয়া নিয়ম বা সূত্র গঠন করিয়া তাহা লিখাইয়া দিতে পারা যায়। সাহিত্যের পাঠে বাক্যের ব্যাখ্যা বা কঠিন শব্দের অর্থও লেখান যাইতে পারে।

References

1. A first book on Teaching by Nancy Catty.
2. The art of questioning in the class-room by Francer M. Austen.
3. Exploration in the junior school by Philips and Mc Innes.
4. Modern methods and Techniques of Teaching by Yoakam & Simpson.
5. Theory and Practice in elementary school by Saucier.
6. শিক্ষা by শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা

সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় মধ্যে পরীক্ষার স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে আলোচনা কিছুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। শিক্ষাবিদ্, সাধারণ লোক, অভিভাবক সকলেই বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে মতামত দিতেছেন। মতামতগুলি বিভিন্ন ধরণের। কেহ কেহ বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণ অবসান ঘটাইবার কথা বলিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন ধরণের পরীক্ষা অবলম্বন করার কথা বলিতেছেন, আবার কেহ কেহ সমস্ত প্রকার পরীক্ষারই গুণগান করিতেছেন। বেশীর ভাগ লোকই পরীক্ষা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেছেন কেন? চিন্তা করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেকেই কোন না কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন এবং সেই পরীক্ষার ত্রুটিই তাঁহাকে পরীক্ষা সম্বন্ধে মতামত দিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু পরীক্ষা সম্বন্ধে এই তর্ক-বিতর্ক নূতন নহে। শিক্ষাবিদ্গণ বহু দিন যাবতই ছাত্রছাত্রীদের উপর পরীক্ষার গুরুভারের কথা বলিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে পরীক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। "সমস্ত পরীক্ষাই কি খারাপ, এবং সকল রকম পরীক্ষারই কি অবসান ঘটান প্রয়োজন?" "কোন প্রকার পরীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? থাকিলে সেই পরীক্ষা কি ধরণের হইবে?" "কোন বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, এবং তাহার প্রশ্নের আকারই বা কি হইবে?" "উত্তরগুলির পরীক্ষা কি ভাবে নৈর্বক্তিক হইবে?"

এই প্রশ্নগুলি লইয়া বহু আলোচনা চলিতেছে। এই প্রশ্নগুলির সাথে আরও অনেক বিষয় জড়িত। ছাত্রছাত্রী যে শিক্ষালাভ করে, সেই শিক্ষার ফলাফল কি একই প্রকার পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইতে পারে? শিক্ষার উদ্দেশ্য নানাবিধ। শিক্ষার লক্ষ্যবস্তুতে ছাত্র পৌছিতে পারিল কি না তাহা জানিবার উপায় পরীক্ষা, কিন্তু সেই পরীক্ষা এমন কি মানের হইতে পারে যাহাতে শিক্ষার ব্যাপক গণ্ডীর উহা পরিক্রমা করিতে পারে? এই প্রসঙ্গে আমাদের পরীক্ষা-গ্রহণের উদ্দেশ্য বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য

বর্তমানে যে পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে, সেই পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্য দিয়া পরীক্ষার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হইয়া থাকে :

(ক) এই পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রী **ব্যক্তিগত** ভাবে কোন বিষয়ে কতটা জ্ঞান অর্জন করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। একটি শ্রেণীর **দলগত** উন্নতিও এই পরীক্ষার মাধ্যমে স্থির করা যায়।

(খ) ব্যক্তিগত ও দলগত উন্নতি যেমন পরীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা যায়, তেমনি **শ্রেণী-শিক্ষকেরও শিক্ষাদান কার্যের পরীক্ষা** করা হয়। এই পরীক্ষা প্রত্যক্ষভাবে করা না হইলেও পরোক্ষভাবে করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের উন্নতি বুঝা যায় পরীক্ষার ফলাফল হইতে। এবং সেই ফলাফলের মান হইতে শিক্ষক কি ভাবে তাঁহার শিক্ষাদান-কার্য করিয়াছেন তাহার পরিমাপ করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া বেতন দেওয়া হইত। সেই প্রথা আজ আর নাই বটে, কিন্তু তবুও আজ স্কুল ভাল কিংবা মন্দ তাহা পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে।

(গ) পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা **ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ সাফল্য** সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। কোন কোন পরীক্ষার ফলাফল হইতে ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রী কোন বিষয়ে সাফল্য লাভ করিবে তাহার অনুমান করা যায়। পরীক্ষার ফলাফল কোন একটি নির্দিষ্ট মান সূচিত করে। সেই মানে যাহারা পৌছিয়াছে তাহারা কোন একটি নির্দিষ্ট কর্ম-সম্পাদন করিতে পারিবে এইরূপ অনুমান করা যায়। কোন কোন মহাবিদ্যালয়ে নিয়ম আছে যে, যে ছাত্রছাত্রী কোন বিষয়ে অনার্স নিবে সে যদি প্রাকবিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় সেই বিষয়ে শতকরা ৬০ নম্বর পাইয়া থাকে তবেই সে সেই-বিষয়ে অনার্স নিতে পারিবে। যে ছাত্রছাত্রী যে বিষয়ে শতকরা ৬০ নম্বর পাইয়াছে, সেই ছাত্রছাত্রীর সেই বিষয়ে প্রবণতা আছে এবং বিষয়টিকে সে ভালও বাসে। অতএব ঐ ফলাফল তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করিতে পারে। অতএব পরীক্ষা গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে শিক্ষার পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার ছাত্রছাত্রীকে দান করা।

(ঘ) পরীক্ষা গ্রহণ দ্বারা যে ছাত্রছাত্রীদের বিষয়গত জ্ঞানের পরিমাপ করা হইল এমন নয়। পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে অধ্যবসায়,

পরিশ্রম, ধৈর্য, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি জিনিসের প্রয়োজন এবং এইগুলিও তাহার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অতএব পরীক্ষা-গ্রহণের মাধ্যমে শুধু **বিষয়গত ব্যুৎপত্তিই** জানা যায় না, শিক্ষার্থীর **অন্যান্য গুণাবলীও** জানিতে পারা যায়।

(ঙ) পরীক্ষা-গ্রহণ **পড়াশুনায় প্রেরণা** দান করে। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক উভয়েই ইহা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার চাপেই বর্তমান সময়ে পড়াশুনা করিয়া থাকে। পড়াশুনার জন্যই স্বাভাবিক পড়াশুনা খুব কম ছাত্রছাত্রীই করে। এই কারণে অনেক শিক্ষাবিদ্ পরীক্ষা-গ্রহণ তুলিয়া দিবার বিরোধী। পরীক্ষা-গ্রহণের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদিগকে উদ্বুদ্ধ করাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিক ভাবে পড়াশুনা করিতে প্রেরণাবোধ করে না। পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা ছাত্রছাত্রীকে পাঠে প্রেরণা দান করিতে হইলে প্রতিযোগিতা, শাস্তির ভয়, নিন্দা পুরস্কার ইত্যাদি বিবিধ ব্যবস্থার কথা ছাত্রছাত্রীকে জানাইতে হয়। পাঠে স্বাভাবিক প্রেরণা ছাত্রছাত্রীরা পায় না। তাহাদের পাঠে প্রেরণা দান করিবার জন্য এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা মোটেই মঙ্গলজনক নয়।

(চ) অনেক শিক্ষাবিদই মনে করেন যে পরীক্ষার একমাত্র কাজ হইতেছে **সুপরিচালনা**। পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষক স্থির করেন কোথায় তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কোথায় তাঁহার সাফল্য। পক্ষান্তরে ছাত্রছাত্রীরাও নিজেদের দোষ-ত্রুটি সাফল্য ইত্যাদি পরীক্ষার ফলেই বুঝিতে পারিয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতিও পরীক্ষার ফল দ্বারা নিরূপণ করা হয়।

(ছ) পরীক্ষা গ্রহণের ফলে ছাত্রছাত্রীরা অষ্টম শ্রেণী হইতে কে কোন্ বিষয় লইয়া সাফল্য লাভ করিবে তাহা বুঝিতে পারে। অতএব পরীক্ষা গ্রহণ কর্ম নির্ণয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ-পরিদর্শক।

পরীক্ষা গ্রহণের ঐতিহাসিক দিক

যত দিন যাবৎ কোন উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কোন কিছু শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তত দিন হইতেই পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। বোধ হয় চীনদেশেই পরীক্ষাপ্রথা প্রথম প্রচলিত হয়। অবশ্য আজিকার দিনের মত লিখিত পরীক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা পূর্বে ছিল না। বর্তমান সময়ের **লিখিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র গত শতাব্দীতে**। পূর্বে মৌখিক

পরীক্ষাই বেশী ছিল। প্রাচীন ভারত, গ্রীস রোম ইত্যাদি স্থানে গুরু শিষ্যের আলোচনার মধ্য দিয়া পরীক্ষা চলিত। মধ্যযুগের ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার্থীকে গবেষনামূলক লেখাও দিতে হইত। বর্তমানে আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে লিখিত পরীক্ষার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীতে অবশ্য মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণের ত্রুটি

উপরে পরীক্ষা গ্রহণের যে সকল উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে, বর্তমান গতানুগতিক লিখিত পরীক্ষা-ব্যবস্থায় সেই উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হইতেছে না। পরীক্ষা গ্রহণ নানা দিক হইতে সমালোচিত হইতেছে।

১। পরীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, **পরীক্ষা সমগ্র পাঠ্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে**। পরীক্ষার যেইরূপ চাহিদা সেই চাহিদা অনুসারে পাঠ্যক্রম অদল বদল করা হয়। বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষায় এই কথার গুরুত্ব বেশী বুঝা যায়। যেমন নিম্নবুনিয়াদী স্তরের শেষে কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই, কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর শেষে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাহারা পড়ে তাহাদিগকেও পরীক্ষার সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ীই চতুর্থ শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা দিয়া থাকে। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যে শিল্প শিক্ষা করিয়া থাকে, গণতান্ত্রিক জীবন যাপন করিতে শিক্ষা করে, ইহাদের ত কোন পরীক্ষাই হয় না। যে সমস্ত বিষয় পরীক্ষার অন্তর্গত তাহাদের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, অথচ অন্য যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইল তাহার কোন পরীক্ষা হইল না, অবহেলিত রহিয়া গেল। অতএব পরীক্ষা-ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা বুঝা যাইতেছে।

২। প্রচলিত পরীক্ষায় সমগ্র পাঠ্যসূচী হইতে পরীক্ষার প্রশ্ন করা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ সমগ্র পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞান লাভ করিল কিনা তাহা বুঝা যায় না। শিক্ষক-শিক্ষিকা পরীক্ষার প্রশ্ন আঁচ করিতে পারেন এবং সেই ভাবে ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত হইতে বলেন। পক্ষান্তরে ২।৪ বৎসরের প্রশ্ন দেখিয়া প্রশ্ন কি হইবে আঁচ করিয়া লয়। ইহার ফলে

ছাত্রছাত্রীরা সমগ্র পাঠ্যসূচী পড়ে না, **বাছিয়া বাছিয়া মুখস্থ** করে এবং **ফলে পাঠ্যসূচীর অনেক অংশ সম্বন্ধেই ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞান লাভ করে না।**

৩। তৃতীয়তঃ, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি **অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে।** ইহার ফলে ছাত্রছাত্রীগণ যে যত বেশী পারে পাঠ মুখস্থ করে। পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রেরণা দেয় বটে, কিন্তু সত্যিকার শিক্ষা ব্যাপারে উহা প্রেরণা যোগায় না। কেবল যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা যায়, তাহা নয়, পিতামাতা বা অভিভাবকদের মধ্যেও এই মনোভাব দেখা যায়। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যেও এইরূপ অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। এক শ্রেণীর শিক্ষক সেই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পারদর্শিতা লইয়া গর্ব করেন, ফলে যে শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ততটা কৃতকার্য হইতে পারে নাই, সেই শ্রেণীর শিক্ষকের মনে হিংসা ও দ্বেষের উদয় হয়। এই প্রতিযোগিতা শুধু বিদ্যালয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে না। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে পর্যন্ত এই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার কুফল দেখা যায়।

৪। চতুর্থতঃ, প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা আরও একটি বিশেষ কারণে করা হইয়া থাকে। পরীক্ষা-পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের উপর একটি **মনস্তাত্ত্বিক** প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। পিতামাতা-অভিভাবক-শিক্ষক সকলের বেশী রকম চাপের দরুণ ছাত্রছাত্রীদের **মানসিক বৈকল্য** দেখা যায়। ভাল করিয়া পাশ করিতে হইবে, প্রতিনিয়ত এই কথা ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতা-অভিভাবক-শিক্ষকের মুখ হইতে শুনিতে হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা **অতিরিক্ত পরিশ্রম** করিয়া যায়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ছাত্রছাত্রীদের **শারীরিক ক্ষতি** হয়, ফলে ঘুমের অভাব, ক্ষুধার অভাব এবং অন্যান্য রোগে ছাত্রছাত্রীদের ভুগিতে দেখা যায়। মানসিক ভয়, নির্ভরতার অভাব, বিশ্বাসের অভাব এই সব **মানসিক বিকৃতিও** দেখা গিয়া থাকে।

৫। পঞ্চমতঃ, পরীক্ষা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি পূর্বে দেওয়া হইত। পরীক্ষার একটি পরোক্ষ উপকারিতা আছে বলিয়া শিক্ষার্থীগণ বলিতেন। তাঁহারা বলিতেন যে পরীক্ষার মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীদের **মানসিক শৃঙ্খলা** হয়। কিন্তু বর্তমানে নানা গবেষণার ফলে প্রমাণিত

হইয়াছে যে, **পরীক্ষাপদ্ধতির চাপে মানসিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করান সম্ভব নয়।**

৬। অনেক শিক্ষাবিদই বর্তমানে বলিতেছেন যে **প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি** মোটেই **নির্ভরযোগ্য নয়।** তাঁহারা দুইটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া এই কথা বলিয়াছেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথম কথা হইল, যদি পরীক্ষক একই বিষয়ের উপর দুই বার পরীক্ষা লন এবং তিনি যদি দুই বার খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তবে দেখা যাইবে ছাত্রছাত্রীগণ **দুই বার দুই রকম নম্বর পাইয়াছে।** দ্বিতীয়তঃ যদি একই পরীক্ষার খাতা দুই জন পরীক্ষক পরীক্ষা করিয়া দেখেন তবে দেখা যাইবে যে, দুই পরীক্ষক দুই রকম নম্বর দিয়াছেন। এই **নির্ভর-যোগ্যতার অভাবকে** বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। তিনটি দিক হইতে ইহার বিচার করিয়া দেখার প্রয়োজন—(ক) ছাত্রছাত্রী, (খ) পরীক্ষার প্রশ্ন, (গ) পরীক্ষক।

(ক) ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিবার সময় নানারূপ জটিল শারীরিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে থাকে। এই অবস্থার তারতম্যের ফলে বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন রূপ পরীক্ষা দিয়া থাকে। সাধারণ অবস্থায় ছাত্রছাত্রীগণ প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করিতে পারে তাহাই পরীক্ষা হইতে পাওয়া দরকার। কিন্তু পরীক্ষার সময় কোন ছাত্রছাত্রীই সাধারণ অবস্থায় থাকে না।

(খ) পরীক্ষায় যে প্রশ্ন দেওয়া হয়, সেই প্রশ্ন সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারের একটি অংশের উপর মাত্র, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের সমগ্র পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞানের উপর পরীক্ষা হয় না, জ্ঞানের অংশের উপর হয় মাত্র। অংশের তারতম্যের ফলে ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের ক্ষেত্রেও তারতম্য দেখা যায়।

(গ) পরীক্ষক যে প্রশ্ন করেন, সেই প্রশ্ন সমগ্র পাঠ্য পুস্তকের উপর করিতে পারেন না। ফলে উহা আংশিক পরীক্ষা হয় মাত্র। তাহা ছাড়া পরীক্ষার উত্তরগুলি পরীক্ষক দেখিয়া থাকেন। এক জন নির্দিষ্ট পরীক্ষককেই নম্বর দানে অসমঞ্জস দেখা যায়। এইরূপে একই খাতার উপর বিভিন্ন বিভিন্ন নম্বর দিতে দেখা গিয়া থাকে। উত্তরের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্যাপারও অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষকগণ একমত নহেন। একই রচনা পরীক্ষাতে দেখা যায় এক জন পরীক্ষক সর্বোচ্চ নম্বর দিয়াছেন আবার আর এক জন দিয়াছেন

সর্বনিম্ন নম্বর। মনোবিজ্ঞানীগণ এই বৈষম্যের বিষয় নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে মানসিক অবস্থা, ক্লান্তি, খাদ্য ইত্যাদি পরীক্ষকদের নম্বর দানে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। পরীক্ষক যদি কোনও সময়ে কোন ব্যাপারে রাগান্বিত অবস্থায় থাকেন, তবে তাঁহার খাতার নম্বর দেওয়া কম হইবে, এবং তিনি যদি খুশ মেজাজে থাকেন তবে তাঁহার খাতার নম্বর দেওয়া একটু দরাজ হইবে এইরূপ দেখা গিয়াছে।

পরীক্ষকের রুচি পছন্দ ব্যক্তিগত ধারণা ইত্যাদির জন্যও পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতার অভাব দেখা যায়। পরীক্ষা যদি এই কারণে প্রভাবান্বিত হয় তবে এই পরীক্ষাপদ্ধতিকে আমরা ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি বা Subjective type বলিয়া থাকি। রচনাধর্মী পরীক্ষা-পদ্ধতিতে পরীক্ষকের মনের ভাব, ব্যক্তিগত ধারণা, বিশ্বাস, রুচি, পছন্দ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। ঢাকা ট্রেনিং কলেজে রচনা পদ্ধতিতে উত্তর বিভিন্ন পরীক্ষকে দিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। নম্বরের অত্যন্ত বৈষম্য দেখা যায়। ব্যক্তিগত রুচি, মান, বিশ্বাস, ধারণা, সময়, অবস্থা ইত্যাদি নম্বরের বৈষম্যের কারণ বলিয়া মনে করা হইয়াছিল।

৭। নির্ভরযোগ্যতার অভাব যেরূপ রচনা-ধর্মী পরীক্ষাগুলির মধ্যে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ উহাদের **সত্যতা বা Validityর অভাবও দেখা যাইয়া থাকে।** অনেক সময় দেখা যায় যে, যে জ্ঞান পরিমাপ করিবার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই জ্ঞানের পরিমাপ না করিয়া অন্য জ্ঞানের পরিমাপ করা হইয়াছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভূগোল পরীক্ষার কথা। ভূগোল পরীক্ষায় লিখিতে হইলে মাতৃভাষায় লিখিতে হয়। লিখিতে গিয়া পরীক্ষার্থী হয়ত বানান ভুল বা বাক্য রচনায় ভুল করিল। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর সেই ভুলের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়া নম্বর দিয়া থাকেন। পরীক্ষক অনেক সময়েই অবান্তর বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন, আসল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিমাপ করা হয় না।

আধুনিক পরীক্ষা

পরীক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি আলোচনা করিতে গিয়া আমরা পরীক্ষার প্রশ্ন ও পরীক্ষাকার্যে ব্যক্তিমুখী-পদ্ধতির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। পরীক্ষকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মনের অবস্থা, সময়, ধারণা ইত্যাদি পরীক্ষাকে

প্রভাবান্বিত করিয়াছে। উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। পরীক্ষাকার্যে ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি বর্জন করিয়া নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করাই আধুনিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য। অবশ্য এই জাতীয় পরীক্ষাও যে একান্তই নির্ভুল, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহারও প্রধান ত্রুটি হইল সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। এই পরীক্ষা পদ্ধতি **তিনটি** স্তরে বিভক্ত :—

১। প্রশ্নপত্র তৈয়ারী করা।

২। প্রশ্ন উত্তর করিবার পদ্ধতি।

৩। মূল্যায়ন করিবার পদ্ধতি।

এই তিনটি ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তিমুখী পদ্ধতির প্রভাব রহিয়াছে, কিন্তু মূল্যায়ন করিবার পদ্ধতিতে কোন ত্রুটি দেখা যায় না।

১। নূতন ধরণের পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রশ্নের উত্তরে কোন **রচনাধর্মী উত্তর লিখিতে হয় না**। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর **'হ্যাঁ-না', 'সত্য-মিথ্যা', পাদপূরণ** বা **টিক** দিয়া কিংবা **কাটা** দিয়া প্রশ্নের উত্তর করিতে হয়। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্ট, দুই রকম উত্তর হইবার উপায় নাই। অতএব শিক্ষার বিশ্বাস, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ব্যক্তিগত অসুবিধা কোনটাই পরস্পরে প্রশ্নের উত্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। উত্তরটি হয় ভুল হইবে, না হয় শুদ্ধ হইবে, মাঝামাঝি কিছু হইতে পারিবে না। নম্বরও হইবে হয় পূর্ণ, না হয় কিছুই নয়, শূন্য।

২। এই স্থানে একটি বিশেষ **সাবধান বাক্য** বলা প্রয়োজন। এই জাতীয় প্রশ্নপত্র রচনা করিবার সময় **পরীক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্যটি** স্মরণ রাখিতে হইবে। ধরা যাক ভূগোল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করা হইতেছে। এইখানে ভূগোলের সম্পর্কিত জ্ঞানকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া যায়,—যথা (১) ভৌগোলিক ঘটনাবলীর জ্ঞান, (২) ভৌগোলিক ঘটনাসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ, (৩) ভৌগোলিক অবস্থার কার্যকারণ, (৪) মনুষ্য জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব, (৫) ভৌগোলিক প্রভাবের ফলে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা, (৬) মানচিত্র ইত্যাদি। এই সমস্ত অংশগুলির উপর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করিলে ভূগোল সম্পর্কিত সমস্ত রকম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। কিন্তু নূতন পরীক্ষা প্রণালীতে এইরূপ বিভিন্ন উদ্দেশ্য ভাগ করিয়া প্রশ্নপত্রাদি সব সময় রচিত হয় না, ফলে ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি প্রকাশ পাইতে থাকে।

৩। নূতন পরীক্ষা পদ্ধতিতে **বহু প্রশ্ন** করিবার সুযোগ থাকায় **পাঠ্য-সূচীকে পরিক্রমা** করিয়া প্রশ্ন করা যায়। পূর্বের রচনাত্মক প্রশ্নে সমগ্র পাঠ্যবস্তুর উপর প্রশ্ন করা সম্ভব হইত না, ফলে পাঠ্যবস্তুর বহুলাংশই পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইত না।

৪। নূতন ধরণের পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীকে **সমগ্র পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু পড়িতে হয়।** কারণ কোন স্থান হইতে প্রশ্ন আসিবে তাহা বলা যায় না। পূর্বেকার পরীক্ষা ব্যবস্থায় প্রশ্ন পূর্বাহ্নে আন্দাজ করিয়া পড়িলেই চলিত।

৫। নূতন ধরণের পরীক্ষায়, পরীক্ষার যাথার্থ্য ও সত্যতা সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয়বস্তুকে ভাগ করিয়া লইলে, অবান্তর বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করার কোন প্রশ্নই আসে না।

৬। নূতন ধরণের পরীক্ষাগুলি **নির্ভরযোগ্য**। কারণ পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি মূল্যায়নে কোন রূপ প্রতিফলিত হয় না।

৭। এই পরীক্ষায় উত্তরের ভিতর কোনও রূপ **মতদ্বৈধ না থাকায়, অতি অল্প কালের মধ্যেই পরীক্ষার খাতা পরীক্ষিত হইতে পারে।** শিক্ষকদের পরিশ্রমের ইহাতে লাঘব হয়। পরীক্ষকের গুরুত্ব এই নূতন পরীক্ষায় কমিয়া গিয়াছে। রচনাত্মক পরীক্ষায় পরীক্ষকের যে মনোযোগ, চিন্তা, যুক্তি ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, এই জাতীয় উত্তর-পত্র দেখিতে শিক্ষকের সেইরূপ মনঃসংযোগ প্রয়োজন হয় না। এইক্ষেত্রে ছক-কাটা উত্তর দেখিয়া নম্বর দিলেই হইল। এইখানে পরীক্ষকের গুরুত্ব যে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৮। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেখিতে কম সময় লাগিলেও, এই জাতীয় প্রশ্নপত্র **রচনা করিতে সময়ও বেশী লাগে** এবং **প্রচুর পরিশ্রমও করিতে হয়।** ইহা **ব্যয়সাপেক্ষও** বটে। প্রশ্নটি রচনাত্মক প্রশ্ন হইতে অনেক বড় হয় এবং ছাপাইতেও অপেক্ষাকৃত বেশী পয়সা ব্যয় হয়।

নূতন ধরণের পরীক্ষা নানা ধরণের হইয়া থাকে। যথা—(১) সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন (True false test) (২) শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন (Multiple choice test) (৩) সম্পূর্ণ করার প্রশ্ন (Completion test) (৪) সামঞ্জস্য সন্ধান (Marking test) (৫) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন (Short answer test) (৬) সাদৃশ্য অনুসারে সাজানোর প্রশ্ন।

এই জাতীয় প্রশ্নগুলির নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) **সত্য-মিথ্যা বিচার**—এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে কতক সত্য কতক মিথ্যা দেওয়া থাকে। ইহার মধ্যে সত্য তথ্যগুলি বাছিয়া লইয়া চিহ্নিত করিতে হয়। যেটি ঠিক, তাহার পাশে (√)টিক চিহ্ন এবং যেটি ঠিক নহে, মিথ্যা, তাহার পাশে (×) কাটা চিহ্ন দিবার নির্দেশ থাকে।

যথা—(i) অশোকের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

(ii) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়।

(২) **শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন**—প্রশ্নের নানা রকম সত্য-মিথ্যা উত্তর দেওয়া আছে, উহাদের মধ্য হইতে শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন করিয়া বাহির করিতে হয়। যথা—

(i) (ক) হর্ষবর্ধন (খ) আকবর (গ) অশোক—বিভিন্ন দেশে ধর্ম-প্রচারের জন্য ধর্ম-মহামাত্র প্রেরণ করেন।

(ii) কাহারও বাড়ীতে ডাকাতি হইলে কি কাজ করা উচিত ?

(ক) নিজ বাড়ীতে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত।

(খ) পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।

(গ) পালিয়ে যাওয়া উচিত।

এই দুইটি প্রশ্নের ভিতরই সঠিক উত্তর রহিয়াছে। সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিতে হয়।

(৩) : **সম্পূর্ণ করার প্রশ্ন**

এইরূপ প্রশ্নে বাক্যের মধ্যে একটি বা দুইটি শব্দ উহ্য থাকে। উপযুক্ত শব্দ বসাইয়া বাক্যটি সম্পূর্ণ করিতে হয়।

(i) মহম্মদ তুঘলক দিল্লী হইতে—রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

(ii) সূর্য — দিকে উদিত হয় এবং — দিকে অস্ত যায়।

(৪) **সামঞ্জস্য সন্ধান**—দুই শ্রেণীর কতকগুলি বিষয়বস্তু এলোমেলো ভাবে সাজান থাকে। দুই দিকের বস্তু বা তথ্য বাছিয়া লইয়া উভয়ের মধ্যে যুক্ত করা হয়। যথা—

১৫২৬ খৃঃ— হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভ।

৬০৬ ,, —পলাশীর যুদ্ধ হয়।

১৭৫৭ ,, —পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়।

এইখানে যে তারিখের সঙ্গে যে ঘটনার মিল আছে তাহা তীর দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

(৫) **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন**

এমন কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়, যাহার উত্তর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যথা—

(i) আমেরিকা আবিষ্কার করেন কে ?

(ii) ভারতের রাজধানীর নাম কি ?

(iii) মহাকাশে প্রথম ভ্রমণ করেন কে ?

(৬) **সাদৃশ্য অনুযায়ী সাজানো**

বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু বা প্রাণীর নাম দেওয়া থাকে, উহাদিগকে সাদৃশ্য অনুসারে সাজাইতে হয়।

যথা—গরু, ছাগল, মহিষ, বিড়াল, বাঘ, কুকুর, শশক, ইঁদুর, বানর।

পুরাতন ও নূতন পদ্ধতির পরস্পর তুলনামূলক চিত্র

নূতন ধরণের পরীক্ষার **অনেক গুণ** আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার **ত্রুটিও** আছে।

প্রথমতঃ, এই প্রশ্নপত্র রচনা করিতে **বহু সময় ব্যয়** হয় এবং ইহা অত্যন্ত **ব্যয়সাপেক্ষও** বটে। অনেক বিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র রচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার মুদ্রণ-খরচ এত বেশী যে অনেক বিদ্যালয়ই এইগুলি করার খরচ বহন করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষার্থীর নিকট হইতে বর্ণনা, তুলনা, যুক্তি, বিচার ইত্যাদি চাওয়া যায় তাহা হইলে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি দ্বারা তাহা সুবিধা হয় না। এই পরীক্ষায় শুধু ঘটনামূলক **জ্ঞানের পরিমাপ** করা যায়, কোন জিনিসের **রসানুভূতি,** বা **চিন্তার ধারা** বুঝিতে পারা যায় না। প্রচলিত রচনাত্মক পরীক্ষা-পদ্ধতিতে চিন্তাধারা, যুক্তি, রসানুভূতি, রচনার ক্ষমতা ইত্যাদি ভালভাবে বুঝিতে পারা যায়।

তৃতীয়তঃ, নূতন পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় আন্দাজে উত্তর দেয়, জানিয়া উত্তর দেয় না। আন্দাজে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উত্তর দিবার ফলে অনেক সময় প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইয়া যায়। ইহা একটি ত্রুটি। কিন্তু পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে মূল্যায়নের নিয়ম নম্বর দেওয়ার অসুবিধা দূর করিয়াছে।

উপরের কথাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, নূতন ধরণের পরীক্ষা-সমূহে **ঘটনামূলক জ্ঞানের পরীক্ষা** হয় বটে, কিন্তু **বিচার, যুক্তি, কল্পনাশক্তি, রচনাভঙ্গি** ইত্যাদির **পরিচয় নূতন পরীক্ষা-পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না**। কিন্তু নূতন পরীক্ষা-পদ্ধতি অনেক সমস্যার সমাধান করিয়াছে একথাও সত্য। এই কারণে বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌গণ নূতন ধরণের পরীক্ষা ও প্রচলিত পুরাতন পদ্ধতিতে পরীক্ষার একটি সংমিশ্রণ সাধন করিতে চাহিতেছেন। তাঁহারা বলেন এই সংমিশ্রণের ফলে ঘটনা-মূলক জ্ঞানের যেরূপ পরীক্ষা হইবে, সেই রূপ কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি, রচনা শক্তি ইহাদেরও পরীক্ষা হইবে।

বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা

প্রচলিত লিখিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

১। **মৌখিক পরীক্ষা**—মৌখিক পরীক্ষা অতি প্রাচীন কাল হইতে গ্রহণ করা হইতেছে। লিখিত পরীক্ষার বহু পূর্বে মৌখিক পরীক্ষার জন্ম। লিখিত পরীক্ষার **কুফল** সম্বন্ধে আজ যাহা বলা হইতেছে, তাহা এক সময় মৌখিক পরীক্ষা সম্বন্ধেও বলা হইয়াছিল। মৌখিক পরীক্ষায় পর পর পরীক্ষার্থী **একই রূপ সুবিধা পায় না**। প্রশ্নের ভাষা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এক হইলেও পরীক্ষকের গলার স্বর ভিন্ন হইতে পারে, এবং তাহাতেও ভিন্ন ফল দর্শাইয়া থাকে। তাহা ছাড়া পরীক্ষার প্রশ্নগুলি **আদর্শীকৃত পরিমাপের** (Standardised Tests) হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে পরীক্ষার **ফলে ভুল-ভ্রান্তি** পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা লিখিত পরীক্ষার অবস্থা হইতে **আবেগজনিত বেশী অসুবিধা** ভোগ করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ খুব **নীচু শ্রেণীতে** মৌখিক পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে, কারণ ঐ শ্রেণীর শিশুরা লিখিতে ভাল পারে না। চাকুরীর **প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায়** মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। চাকুরীর প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় যখন লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে, সেইখানে পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা যায়, কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর **উপস্থিত বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব** ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের পরিচয়

পাওয়া যায় মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমেই। এই কারণে চাকুরীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষা বা Viva Voce Testএর গুরুত্ব খুব বেশী।

২। **বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা**—বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার প্রচলন আছে তাহা অনেকেই জানে। এই পরীক্ষায় **অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ বিশেষ করা হয় না**। এই পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীর **ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ-বাণী** করা যায়। বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা বর্তমানে খুব বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুই রকম ভাবে এই পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে—**ব্যক্তিগত ভাবে** ও **দলগতভাবে**। ব্যক্তিগত পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীকে একক ভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং দলীয় পরীক্ষায় সমগ্র শ্রেণীর পরীক্ষা করা হয়। বুদ্ধিমাপক পরীক্ষাগুলি **বিনে-সীমা** (Binet-simon)র বুদ্ধিমাপক প্রশ্নগুলি অবলম্বন করিয়া রচিত। প্রশ্নগুলি ঐ বয়সের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপর প্রয়োগ করিয়া **আদর্শীকৃত** (Standardised) করা হইয়াছে। যে বয়সের প্রশ্ন পত্র যে ছাত্রছাত্রী পারিয়াছে, সেই ছাত্রছাত্রী সেই বয়সের বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

আদর্শের সাহায্যে পরিমাপ (Standardised Tests)

বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শের সাহায্যে পরিমাপের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু অর্জিত জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আদর্শের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। ধরা যাক, অষ্টম শ্রেণীর জন্য একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করা হইয়াছে, কিন্তু উহার মান হইয়াছে সপ্তম শ্রেণীর উপযুক্ত। বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নপত্রের উত্তরে ছাত্রছাত্রীরা ভাল নম্বর পাইবে, আবার যদি উহা নবম-দশম শ্রেণীর মান অনুযায়ী প্রশ্নপত্র রচনা করা যায় তাহা হইলে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীই ঐ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েরই প্রশ্নপত্রের মান নিজস্ব। একটি সাধারণ মানের উপর নির্ভর করিয়া প্রশ্নপত্র রচনা করা হয় না। তাই কোন পরীক্ষার ফল দেখিয়া ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যার তুলনামূলক বিচার করা চলে না। কোন কোন স্থানে দুধ ৮০ তোলায় এক সের বলিয়া বিক্রয় করা হয়। কোথায়ও বা ১১০ তোলায় সের। উহাদের মান নিশ্চয়ই এক নয়। সেই পরীক্ষার ফলের উপর বিদ্যার তুলনামূলক বিচার করা চলে না। এই কারণে পরিমাপ করিবার একটি **আদর্শ মান** নির্ণয় করা দরকার। নিম্নলিখিত উপায়ে **আদর্শীকৃত প্রশ্ন**

রচনা করা যায়। বিভিন্ন বয়সের উপযুক্ত অর্জিত জ্ঞানেরও প্রশ্নপত্র রচনা করা হয় এবং তাহার পর উহা ঐ বয়সের বহু ছাত্রছাত্রীদের ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে দেওয়া হয়। এই ভাবে বহু ছাত্রছাত্রী যদি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছে বলিয়া দেখা যায় তবে উহা আদর্শীকৃত হয়।

বর্তমান সময়ে **আমেরিকার** বিদ্যালয়সমূহে এই প্রকার পরীক্ষা-পদ্ধতির অর্থাৎ আদর্শীকৃত পরিমাপের সাহায্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাদিগকে **Standardised Tests or Norm Tests** বলা হয়। ইহাতে এক একটি আদর্শীকৃত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে **উত্তরের মূল্য নিরূপণ** করা হইয়া থাকে। যেমন, বিভিন্ন বয়সের ও শ্রেণীর কতকগুলি আদর্শ হাতের লেখা আছে। শিশুর হাতের লেখা ঐ আদর্শ দেখিয়া উহার মূল্য নিরূপণ করা হয়। অঙ্ক, বানান, রচনা, বাক্য গঠন ইত্যাদিও আদর্শের সাহায্যে পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

অন্তস্থ (Internal) ও বহিস্থ (External) পরীক্ষা

১। যখন বিদ্যালয়ে কোন শ্রেণীতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং সেই সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের উন্নতি ও অবনতির, পরিমাপ করা হয় তখন তাহাকে **অন্তস্থ পরীক্ষা** (Internal Examination) বলা হয়। বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক, বার্ষিক ইত্যাদি অন্তস্থ পরীক্ষা হইয়া থাকে।

২। বিদ্যালয়ের বাহিরের কোন **স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বহিস্থ পরীক্ষা পরিচালনা** করিয়া থাকে। বহু স্কুলের পরীক্ষা একই প্রশ্ন পরীক্ষা দ্বারা গৃহীত হয়।

বহিস্থ পরীক্ষা বা **সার্বিক পরীক্ষাগুলি** বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া থাকে। একটি স্তরের পাঠের শেষেই এই পরীক্ষা গৃহীত হয়। আমাদের পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড স্কুল ফাইনেল বা হাইয়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পরিচালনা করিয়া থাকে। শিক্ষার একটি স্তরের শেষেই এই পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই স্কুল ফাইনেল কিংবা হাইয়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ করিলে ছাত্র বা ছাত্রী কলেজে প্রবেশের অনুমতি পাইয়া থাকে। ডিগ্রী পরীক্ষা, ডাক্তারী পরীক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারীং পরীক্ষা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এইগুলি সবই সার্বিক বা বহিস্থ পরীক্ষা।

অন্তস্থ পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার মান নির্ণীত হয়। এই মান বিভিন্ন বিদ্যালয়ভেদে বিভিন্ন। তাই এই অন্তস্থ পরীক্ষা দ্বারা বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের তুলনামূলক বিচার করা চলে না। কিন্তু সার্বিক বা বহিস্থ পরীক্ষা একটি বিশেষ স্থানের একই স্তরের সকল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বহিস্থ পরীক্ষার ফলাফল দ্বারা ঐ স্তরের শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক বিচার করা চলে।

আর এক প্রকারের বহিস্থ পরীক্ষা আছে। উহা **প্রতিযোগিতামূলক**। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে দেখা যায় ১০টি চাকুরীর জন্য প্রার্থী দাঁড়ায় ৪০০ জন। ইহাদিগের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ তাহা স্থির করা কঠিন। তখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রার্থীরা সকলেই পরীক্ষায় বসেন। এই সার্বিক পরীক্ষায় বা Public Examination শুধু পাশ করিলেই চলে না, ঐ দশ জনের মধ্যে এক জন হইয়া প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হইতে হয়।

বহিস্থ পরীক্ষার ত্রুটি

বহিস্থ পরীক্ষার অনেক **ত্রুটি** আছে বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করিয়া থাকেন।

১। বহিস্থ পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীকে কোন সময়ে **অধিকতর পরিশ্রম** করিতে হয়। ইহার ফলে তাহাদের **স্বাস্থ্যহানি** ঘটিয়া থাকে।

২। এই পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীকে ভাল ভাবে না বুঝিয়া অল্প সময়ে বেশী **মুখস্থ** (cramming) করিতে হয়।

৩। এই পরীক্ষা দ্বারা অনেক সময়ই **প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না**। অনেক ছাত্রছাত্রী ভাল করিয়া পড়িয়াও পরীক্ষার সময় উপযুক্ত উত্তর দিতে পারে না, আবার কোন কোন ছাত্রছাত্রী ভাল ভাবে না পড়িয়াও কয়েকটি প্রশ্ন নির্বাচন করিয়া পড়ায়, পরীক্ষায় ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

৪। বহিস্থ পরীক্ষার গুরুত্বের ফলে জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে **পরীক্ষা পাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়**।

৫। বহিস্থ পরীক্ষা রচনার আকারে হয়, তাই উত্তরে বিষয়ের জ্ঞানের চাইতে **ভাষাজ্ঞানের উপর বেশী গুরুত্ব** আরোপ করা হয়।

৬। বহিস্থ পরীক্ষা পরীক্ষকের মতামত, ইচ্ছা অনিচ্ছা, আবেগ, মনোভাব ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে।

কিন্তু বহিস্থ পরীক্ষার সুবিধা যে একেবারে নাই, এমন নহে। ইহার **সুবিধাগুলি** হইল এই :—

১। বহিস্থ পরীক্ষা একস্তরের অর্জিত জ্ঞান পরীক্ষার সুযোগ দেয় এবং পরের স্তরের পাঠের জন্য উপযুক্ত কি না তাহা স্থির করিয়া দেয়।

২। বহিস্থ পরীক্ষার ফলে ছাত্রছাত্রীগণ তাহাদের জ্ঞান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুছাইয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের আত্মবিশ্বাস জন্মে।

৩। বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বহিস্থ পরীক্ষা দেয়। ইহা ছাত্রছাত্রীদিগকে মানসিক উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ প্রেরণা দান করিয়া থাকে।

৪। বহিস্থ পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রছাত্রী জীবনে উপযুক্ত কর্ম বাছিয়া লইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বহিস্থ পরীক্ষার নানারূপ ত্রুটি থাকিলেও, ইহার যে সুবিধা নাই এ কথা বলা চলে না। অতএব বহিস্থ পরীক্ষা একেবারে বন্ধ করা চলিতে পারে না। তবে ইহার যে দোষগুলি আছে, তাহার **প্রতিকার করিবার জন্য কয়েকটি উপায়** অবলম্বন করা যাইতে পারে।

১। ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে **দৈনন্দিন কাজ** যদি সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে বহিস্থ পরীক্ষা হইতে বঞ্চিত করা উচিত।

২। ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে নিজে **চিন্তা করিয়া প্রশ্নের উত্তর** দিতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহারা যেন কখনই মুখস্থ করিয়া প্রশ্নের উত্তর না দেয়। নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তরও যেন তাহারা না দিতে পারে এইরূপ প্রশ্ন করিতে হইবে। প্রশ্নের উত্তর ছোট এবং অনেকগুলি প্রশ্ন করিতে হইবে।

কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড।—বিদ্যালয়ে অন্তস্থ পরীক্ষা হইয়া থাকে। সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক ও বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা অনেক বিদ্যালয়ে আছে। কিন্তু প্রচলিত লিখিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের ত্রুটির জন্য ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা ভালরূপে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কোন ছাত্রছাত্রী যদি কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভে উন্নতি লাভ না

করিতে পারিল, তাহা হইলে কি কারণে তাহা হইতেছে না, তাহার কারণও নির্ণয় করা হয় না। তৃতীয়তঃ, শিক্ষাদানের পদ্ধতি ভাল না মন্দ তাহা পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া বিচারও করা হয় না। ফলে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ছাত্রছাত্রাদের মঙ্গলের সূচনা করিলেও, প্রকৃত-পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে উহা বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে নাই। কিন্তু অন্তস্থ বা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সাথে যদি **ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিমাপপত্র** (Cumulative Record Card) থাকে তবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় এবং তাহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অসাফল্যের কারণও নির্ণয় করিতে পারা যায় এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি উপযুক্ত কি না তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

এদিকে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে **প্রগতিপত্র** বা Progres Report চালু আছে। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনায় কতটা উন্নতি বা অবনতি করিল, তাহা পিতামাতা-অভিভাবকদিগকে জানাইবার জন্য প্রগতিপত্র ব্যবহার করা হয়। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া উঁচু শ্রেণীতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। অত্যন্ত অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়ই আছে যেখানে বৎসরের সবগুলি পরীক্ষা বিবেচনা করিয়া উঁচু শ্রেণীতে উঠানর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সকল বিদ্যালয়ই ছাত্রছাত্রীদের বর্ষশেষে উন্নতি ও অবনতি পিতামাতা-অভিভাবকদিগকে জানাইয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে কিছু জানান উচিত এই মনে করিয়া বিদ্যালয় পিতামাতা-অভিভাবককে খবর পাঠায় এবং নিজেদের দায়মুক্ত বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই প্রগতিপত্র ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালাভে কোনরূপ সহায়তা করে না, তাহা ছাড়া এই প্রগতিপত্র মারফত বিদ্যালয়ও পিতামাতা-অভিভাবকদের সঙ্গে কোন রূপ যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারে না এবং দুইয়ের মধ্যে সহযোগিতার ভাবও দেখা যায় না। ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল ও উন্নতিই হইল প্রগতিপত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেই উদ্দেশ্য প্রচলিত প্রগতিপত্রের দ্বারা সাধিত হয় না। উপযুক্ত প্রগতিপত্র তৈয়ারী করিতে হইলে কয়েকটি বিষয় মনে রাখিতে হয়। বৎসরে কয়েকটি প্রগতিপত্র রচিত হইবে এবং প্রগতিপত্রগুলি আলাদা আলাদা কাগজে রচিত না হইয়া একই কাগজে পর পর উন্নতি ও অবনতি লিখিত থাকিবে। অর্থাৎ প্রথম মাসের মাসিক পরীক্ষায় কোন ছাত্রছাত্রী যদি ইংরেজীতে ৫০ পাইয়া থাকে, আর দ্বিতীয় মাসে সে যদি ৫৬

পায়, তাহা হইলে প্রগতিপত্রে মাস অনুযায়ী পাশাপাশি ৫০ ও ৫৬ থাকিবে। পিতামাতা অভিভাবক নম্বর দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন ছাত্রছাত্রীর কতটা উন্নতি হইয়াছে।

প্রগতিপত্রের মাধ্যমে পিতামাতা অভিভাবককে কি জিনিস জানান হইবে তাহা আমাদের বিবেচনার বিষয়বস্তু। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ই পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রী কতটা আয়ত্ত করিল তাহাই প্রগতিপত্রে লিখিয়া থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে বিষয়ের নম্বর দ্বারাই ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি ও অবনতি পরিমাপ করা যায় না। নম্বর বেশী পাইলেও কোন ছাত্রছাত্রীর উহা উন্নতিসূচক বলিয়া নাও ধরা যাইতে পারে। ধরা যাক একটি ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় ইতিহাসে ১০০এর মধ্যে যথাক্রমে ৫৫ ও ৬৫ নম্বর পাইয়াছে, নম্বর দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় দ্বিতীয় পরীক্ষায় ছাত্রটির উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আসলে হয়ত প্রথম পরীক্ষার প্রশ্ন হইতে দ্বিতীয় পরীক্ষার প্রশ্ন সহজ হইয়াছে, ফলে ছাত্রটির বেশী নম্বর উঠিয়াছে। প্রথম পরীক্ষায় ৫৫ পাওয়ার ফলে ছাত্রটির শ্রেণীতে স্থান ছিল ষষ্ঠ, কিন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষায় সে ৬৫ নম্বর পাইলেও তাহার শ্রেণীতে স্থান হইয়াছে দশম। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ইতিহাস শিক্ষায় ছাত্রটি পিছাইয়া পড়িয়াছে। নম্বর এইখানে তাহার উন্নতির পরিচায়ক নয়। এই কারণে প্রগতিপত্রে পাশাপাশি নম্বর লিখিলেও ঐ নম্বর পাইয়া শ্রেণীতে সে কত স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাও লিখিত থাকিবে, তাহা হইলেই ছাত্রটির শিক্ষাগত অবস্থা ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

পিতামাতা অভিভাবককে যদি এইটুকু সংবাদ মাত্র ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পিতামাতা-অভিভাবকের পক্ষে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। যে সব ছাত্র উন্নতি করিতে পারিতেছে না, তাহারা কেন উন্নতি করিতে পারিতেছে না, তাহা পিতামাতা-অভিভাবককে জানাইতে হইবে, তবেই তাঁহারা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারিবেন। কারণ-নির্ণয়কারী পরীক্ষা যদি ছাত্রছাত্রীদের লওয়া যায়, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞানেরও যেমন পরিমাপ হইবে, তেমনই আবার কেন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনায় উন্নতি করিতে পারিতেছে না, তাহা বুঝা যাইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে পিতামাতা-অভিভাবক যদি জানিতে পারেন যে তাঁহাদের ছাত্রছাত্রী ইংরেজীতে বিশেষ উন্নতি করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই যে তাহার ইংরেজীর Grammar

এর ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নয়, তাহা হইলে পিতামাতা অভিভাবক ছাত্রছাত্রীর সেই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়া শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিবেন। এই কারণে কারণ নির্ণয়কারী পরীক্ষা বা Diagnostic Test হওয়া বাঞ্ছনীয়।

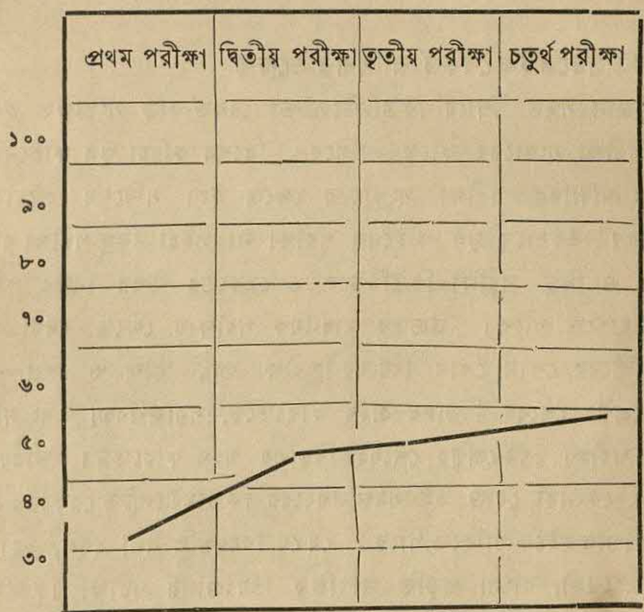
প্রগতিপত্রে ছাত্রছাত্রীদের Character বা চরিত্র সম্বন্ধে লেখা থাকে। খুব খারাপ কিছু কাজ যদি ছাত্রছাত্রী না করে, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীকে 'চরিত্রের' বেলায় ভাল বা good লেখা হইয়া থাকে। কিন্তু চরিত্র বলিতে উহা যে কতটা ব্যাপক তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হয় না।

তাহা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের বিস্থালয়ে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিও লেখা হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় প্রয়োজন। অনেক সময় ছাত্রছাত্রী স্বল্প কারণে, এমন কি, বিনা কারণেও বিস্থালয়ে আসে না। বিস্থালয়ে না আসার দরুণ দুই পক্ষের ক্ষতি হয়, প্রথমতঃ, ছাত্রছাত্রীদের পাঠানুসরণ করিবার অসুবিধা হয়, দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষকের বা শিক্ষিকার পক্ষে ঐ ছাত্রছাত্রীকে বিষয়-বস্তু না বুঝাইবার দরুণ শ্রেণীর কাজে অসুবিধা হইয়া পড়ে। তাহারা যখন আসিবে, তখন যে ভাবে হউক পূর্বপঠিত বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দিতে হয়।

শ্রেণীতে অনুপস্থিতির খবর যদি বিস্থালয় হইতে পিতামাতা-অভিভাবকদের-জানান যায়, তাহা হইলে তাঁহারা ছাত্রছাত্রীর অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিতে পারেন, এবং বিনা কারণে ছাত্রছাত্রীদের বিস্থালয়ে না আসা বন্ধ করিতে পারেন। যে বিস্থালয়ের প্রগতিপত্রে উপস্থিত-অনুপস্থিতির হিসাব দেওয়া হয় না, সেই বিস্থালয় ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল সম্বন্ধে উদাসীন বলা যাইতে পারে।

বর্তমানে বিস্থালয়গুলিতে এক বিশিষ্ট ধরণের প্রগতিপত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাদিগকে কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ড বলা হইয়া থাকে। কিউমিউলেটিভ শব্দটি ইংরেজী, ইহার অর্থ হইতেছে 'একের উপর আর এক'। কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ডে ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভিন্ন পরিমাপের কথা লেখা থাকে। ছাত্রছাত্রীর একটি পরিমাপের ফলাফল জানিয়া আমরা সেই ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে কোনও রূপ সিদ্ধান্তে আসিতে পারি না, কিন্তু যদি প্রত্যেকটি বিষয়ের বিভিন্ন পরিমাপের ফলাফল আমরা জানিতে পারি তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি ছাত্র বা ছাত্রীর উন্নতি বা অবনতি, কি হইতেছে। ধরা যাক্ আমরা একটি ছাত্রের ইতিহাসের চারিটি পরীক্ষার

ফলাফল জানিতে পারিলাম। সে যথাক্রমে ১০০এর মধ্যে ৪০, ৫০, ৫৫, ৬০ পাইয়াছে। কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ড যে পন্থা অবলম্বন করিয়া পরিমাপগুলি রাখা হয়, সেই মাপ মত আমরা ঐ নম্বরগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করিতে পারি।



আমরা এই ক্ষেত্রে দেখিতেছি যে ছাত্রটি ক্রমাগত উন্নতি করিয়াই চলিয়াছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রী উন্নতি করিতেছে, না তাহাদের অবনতি হইতেছে তাহা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ডে ছাত্রছাত্রীরা সমগ্র বিদ্যালয় জীবনে প্রত্যেকটি বিষয়ে কতদূর উন্নতি বা অবনতি করিল তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হয়। এমন কি কোন ছাত্রছাত্রী যখন একটি বিদ্যালয় ছাড়িয়া অন্য বিদ্যালয়ে চলিয়া যাইবে, তখন সেই ছাত্র বা ছাত্রীর কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ডটি নূতন স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। ছাত্রছাত্রীর সমগ্র বিদ্যালয় জীবনে তিনটি কিউমিউলেটিভ কার্ড রাখার কথা হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ড থাকিবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থাকিবে একখানা এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের জন্য থাকিবে আর একটি কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ড। পশ্চিমবঙ্গের সেকেণ্ডারী বোর্ডের

উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ড সম্বন্ধে নির্দেশ আসিয়াছে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য একটি রেকর্ড-কার্ড এবং নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য একটি কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড থাকিবে।

কিউমিউলেটিভ রেকর্ড রাখিবার উদ্দেশ্য

বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ড সংরক্ষিত হইলে উহা পরীক্ষা সংস্কারের কাজে লাগিবে। বিশেষ করিয়া স্কুল ফাইনেল ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে ইহা সবিশেষ প্রয়োজনে লাগিবে। একসাথে স্কুল ফাইনেল পরীক্ষা না লইয়া কিছু পরীক্ষা বহিস্থ পরীক্ষা ও কিছু পরীক্ষা কিউমিউলেটিভ রেকর্ডের উপর নির্ভর করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের কোন কোন বিষয়ের পরীক্ষা যথা, হিন্দি ও শিল্প কাজ নবম শ্রেণীর শেষেই বিদ্যালয় গ্রহণ করিতেছে, সমাজ-বিদ্যা এবং গণিত বিষয়ে পরীক্ষা দশম শ্রেণীর শেষেই বিদ্যালয় গ্রহণ করিতেছ। ভবিষ্যতে হয়ত সেকেণ্ডারী বোর্ড এই সমস্ত বিষয়ের কিউমিউলেটিভ রেকর্ডের নম্বর বিদ্যালয়গুলি হইতে চাহিতে পারে। যে যে বিষয়গুলি বলা হইল, ইহাদের ছাড়া ইংরেজী, বাংলা প্রভৃতি আবশ্যিক বিষয়গুলির পরীক্ষা কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ডের উপর নির্ভর করিয়া হইতে পারে। কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ডের নম্বর একাধিক পরীক্ষার নম্বরের উপর নির্ভর করিয়া লিপিবদ্ধ, অতএব উহারা বহিস্থ পরীক্ষা হইতে বেশী নির্ভরযোগ্য। তখন শুধু বিশেষভাবে নির্বাচিত বিষয়গুলিরই বহিস্থ পরীক্ষা হইবে। তাহা ছাড়া হয়ত বহিস্থ পরীক্ষাগুলিরও শতকরা ২৫ ভাগ নম্বর কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড হইতে লওয়া হইবে।

কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ডে যে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপসূচক বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ থাকিবে, তাহা নয়, ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক জীবন সম্বন্ধে ইহাতে ইঙ্গিত থাকিবে। ছাত্রছাত্রীর আগ্রহ, ক্ষমতা, চারিত্রিক গুণাবলী ইত্যাদিও ইহার মধ্যে থাকিবে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা যে বৃত্তি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত তাহা পূর্বেই বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কোন ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষার জন্য উপযুক্ত তাহাও পূর্বেই বলা যাইবে।

কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ড ও সাধারণ প্রগতি-পত্র

কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ড ও সাধারণ প্রগতিপত্র যাহা অভিভাবকদের কাছে প্রেরণ করা যায়—এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ বর্তমান, কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ড পিতামাতা-অভিভাবকের কাছে পাঠান হয় না। ইহা অত্যন্ত গোপনীয় দলিল। যদি কোনও অভিভাবক তাঁহার বাড়ীর ছেলের কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ড দেখিতে চান, তবে তিনি বিদ্যালয়ে আসিয়া দেখিতে পারেন। সাধারণতঃ শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে সকলেই সকলের রেকর্ড-কার্ড সাধারণতঃ দেখিতে পারে না। তাহা ছাড়া এই দুইটি কার্ডের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হইল কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ডে যে ফলাফল লিপিবদ্ধ থাকে, তাহার প্রত্যেকটি বহু পরিমাপের সমষ্টি, কিন্তু সাধারণ প্রগতিপত্রে এইরূপ সাধারণতঃ হয় না।

কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ডের বিষয়বস্তু

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কিউমিউলেটিভ রেকর্ড-কার্ডে শুধু অর্জিত জ্ঞানেরই পরিমাপ থাকিবে না। ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে বহু বিষয় এই রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ থাকিবে। বিষয়গুলি হইল নিম্নরূপ :—

১। প্রথমেই ছাত্রছাত্রীর নাম বয়স, জন্মতারিখ, পিতামাতা-অভিভাবকের পরিচয়, ভর্তির তারিখ ইত্যাদি ছাত্রছাত্রীর সাধারণ **পরিচয়** সম্পর্কিত তথ্য রেকর্ড-কার্ডে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

২। তাহার পরে থাকিবে **ছাত্রছাত্রীর শারীরিক বিকাশ**। ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন ত্রুটি আছে কিনা, কোন অসুখ-বিসুখে ভুগিয়াছে কিনা, বৎসরের পর বৎসর তাহার স্বাস্থ্য কিরূপ যাইতেছে তাহা রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ থাকিবে। বিদ্যালয়ে শুধু মানসিক বিকাশ হইলেই চলিবে না। ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক বিকাশ কি রূপ হইতেছে তাহাও লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৩। ছাত্রছাত্রীদের কতকগুলি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কি ভাবে বিকাশ হইতেছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত। এই সমস্ত ক্ষমতাগুলি পরিমাপ করিবার জন্য কতকগুলি **আদর্শীকৃত পরিমাপ** (Standardised Tests) এর ব্যবস্থা আছে। বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্নিহিত সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষার প্রভাব তাহার উপরও পতিত হয়। প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাইলেই বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে বুদ্ধি বৃদ্ধি হয় না।

৪। বিদ্যালয়ে **অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ** একাধিক পরীক্ষার ভিত্তিতে কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৫। **ছাত্রছাত্রীর আগ্রহ** কোন দিকে তাহা কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ডে লেখা থাকিবে। ছাত্রছাত্রীদের জীবনে এই আগ্রহের মূল্য অত্যন্ত বেশী। যদি ছাত্রছাত্রীর কোন বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ থাকে, তবে সে সেই বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ও নানা কাজের মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীদের মনে আগ্রহ জাগরিত করিতে পারে। অতএব ছাত্রছাত্রীদের কোন বিষয়ে কি আগ্রহ আছে তাহা তাহাদের কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ডে লিখিত থাকিবে।

৬। বিদ্যালয়ই ছাত্রছাত্রীদের **ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুণাবলীর** বিকাশের ব্যবস্থা করিবে। ছাত্রছাত্রীর চারিত্রিক গুণাবলী কি ধরণের তাহা কিউমিউলেটিভ কার্ডে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৭। ছাত্রছাত্রীর পারিবারিক জীবন তাহার বৃত্তি-নির্ধারণের উপর অত্যন্ত বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অতএব ছাত্রছাত্রীদের **ব্যক্তিগত জীবন** সম্বন্ধে সমুদয় তথ্য কিউমিউলেটিভ কার্ডে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৮। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে খেলাধূলা, সমাজসেবা ইত্যাদি করিয়া থাকে। তাহাছাড়া তাহারা করে সাহিত্য চর্চা। কোন্ ছাত্রছাত্রী কি **ধরণের কাজ** করে, তাহা শিক্ষক ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া রাখিয়া কিউমিউলেটিভ কার্ডে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

পরীক্ষা সংস্কার

বর্তমান সময়ে পরীক্ষায় বিশেষ করিয়া বহিস্থ পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার সংখ্যা খুব বেশী হইতেছে। ইহার একটি প্রধান কারণ হইল পরীক্ষা গ্রহণ করিবার পদ্ধতির ত্রুটি। এই ত্রুটিগুলি আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

১। ছাত্রছাত্রী যাহারা পরীক্ষা দিবে, তাহাদের মন হইতে প্রথমতঃ **পরীক্ষাভীতি দূর করিতে হইবে।**

২। অনেক সময় দেখা যায় ছাত্রছাত্রী সারা বৎসর না পড়িয়া পরীক্ষার কিছু পূর্ব হইতে প্রশ্ন বাছিয়া পড়িয়া কোনও রকমে **'চান্সে' পাশ** করিয়া যায়। এই ব্যবস্থা **বন্ধ করিতে হইবে।**

৩। **শুধু বাৎসরিক পরীক্ষার ফল** দেখিয়াই ছাত্রছাত্রীদের **বিচার করা উচিত নয়**। ঘন ঘন পরীক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে। ছাত্রছাত্রী-দিগকে ঐ সব পরীক্ষা দিতে হইবে। সারা বৎসরের পরীক্ষার ফল হইতে ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইবে না অনুত্তীর্ণ হইবে, তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

৪। রচনামূলক এবং ব্যক্তিমুখী পরীক্ষা হইতে **নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা** করিতে হইবে। অবশ্য ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে রচনামূলক প্রশ্ন হওয়াই শ্রেয়, কারণ এই সব ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বিশেষ কার্যকরী হয় না।

৫। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনার **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উভয়ই থাকা উচিত**, কারণ নিছক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন অনেক সময়ই পরীক্ষার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে না।

৬। ছাত্রছাত্রীদের **শুধু পাঠ্যবিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ** করিলেই **চলিবে না**। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ নয়। শিক্ষার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের **সর্বাঙ্গীণ বিকাশ** হয়। অতএব পরীক্ষার ব্যবস্থা এইরূপ করিতে হইবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ পরিমাপ করা যায়। আমরা পূর্বে কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ডের (Cumulative Record Card এর) কথা উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের এই ধারাবাহিক বিবরণ রাখিতে হইবে। শুধু পাঠ্য বিষয়ের নম্বরের মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীদের সকল দিকে বিচার করা যায় না। **কর্মের ভিতর দিয়া** তাহারা যে **শিক্ষা** লাভ করিল, তাহাদের যে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইল, তাহা সবই পরীক্ষা-পদ্ধতির অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজন।

৭। প্রশ্ন করার পদ্ধতির ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে রচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক উভয় প্রকার প্রশ্ন করিতে হইবে। এই স্থানে আরও বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন যে ছাত্রছাত্রীরা যেন **মুখস্থ করিয়া উত্তর দিবার সুযোগ না পায়**। রচনাত্মক প্রশ্ন ছোট হইবে এবং ছাত্রছাত্রীরা তাহাতে চিন্তার খোরাক পায় এমন ভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করিতে হইবে।

স্বাধীন ভারতে **দুইটি শিক্ষা কমিশন** বসিয়াছে—একটি **বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন** অপরটি **মুদালিয়র কমিশন**। উভয় কমিশনই পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের জন্য বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন। মুদালিয়র কমিশন পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব দিয়াছেন।

এই প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। **মুদালিয়র কমিশন** বলিয়াছেন।

"It would appear that the External Examination cannot be altogether done away with. Certain steps however have to be taken to minimise its undesirable effects. Firstly there should not be too many external examinations. Secondly, the subjective element which is unavoidable in the purely essay type examination should be reduced as far as possible. The essay type examination has its own value. It tests certain capacities which cannot be otherwise tested, but it cannot be the only test for measuring the attainment of pupils. One of its greatest disadvantages is that it gives undue weight to the power of verbal expression in which so many individual differences exist. In order, therefore, to reduce the element of subjectivity of the essay-type tests, objective tests of attainments should be widely introduced side by side. Moreover the nature of tests and the type of questions should be thoroughly changed. They should be such as to discourage cramming and to encourage intelligent understanding (Mudaliar Commission, Pages 147-48).

মুদালিয়র কমিশন পরীক্ষার খাতায় নম্বর দান সম্পর্কে সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বহিস্থ ও অন্তস্থ পরীক্ষা এই দুই পরীক্ষা সম্বন্ধে এই কমিশন নিম্নলিখিত ইঙ্গিত করিয়াছেন। বর্তমানে পরীক্ষার খাতায় ১০০এর মধ্যে নম্বর দানে কতকগুলি সুবিধা আছে, কিন্তু অসুবিধাগুলি সুবিধার চেয়ে বেশী। এই কমিশন বলিয়াছেন যে **নম্বর বণ্টনে ত্রুটি** থাকিতে পারে। নম্বরকে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া বণ্টন করাতে ব্যক্তিমুখী ত্রুটি দেখা গিয়া থাকে। কমিশন বলিয়াছেন—"It is indeed difficult to distinguish between two pupils, one of whom obtains, say, 45 marks and another 46 or 47." ইহাতে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় নম্বর দানে পরীক্ষক অত্যন্ত সতর্ক হইয়া নম্বর বণ্টন করিয়াছেন এবং একের সাথে অপরের পার্থক্য দেখাইয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে ত্রুটি রহিয়াছে। জ্ঞানের পরিমাপের ক্ষেত্রে ৪৫ ও ৪৬এর মধ্যে সত্যিকার পার্থক্য কোথায়?

হার্টগ কমিটির রিপোর্টে (১৯২৯) এই বিষয়ে "An Examination of Examinations" শীর্ষক স্থানে ইহার বিশদ আলোচনা হইয়াছে। আমরা যদি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব **সব সময়ে ওজন করিয়া নম্বর দেওয়া সম্ভব নয়।** পরীক্ষক নানা সময়ে নানারূপ অবস্থায় থাকেন, তাঁহার পক্ষে ত্রুটিহীন নম্বর বণ্টন সম্ভব নয়। যেখানে উত্তরের কোন নির্দিষ্ট মান নাই, সেইখানে পরীক্ষকের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিয়া থাকে, তিনি অজ্ঞাতসারেও বণ্টনে ভুল করিতে পারেন। তাই আমরা ২৯ ও ৩০এর মধ্যে কোন পার্থক্য করিতে পারি না। ২৯ পাইয়া এক ছাত্রছাত্রী ফেল করিল, অথচ ৩০ নম্বর পাইয়া পাশ করিল, ইহা কেমন? তাই **কমিশন বলিয়াছেন,** "A simpler and better system is the use of finepoint scale to which 'A' stands for excellent, 'B' for good, 'C' for fair and average, 'D' for poor and 'E' for very poor. এই পরীক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীকে একটি বড় অংশের মধ্যে ফেলা হয়। বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ। কমিশন এইভাবে প্রশ্নপত্র দেখার জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু **ইহারও একটি অসুবিধা** আছে। ইহা দ্বারা দলগত মান বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ব্যক্তিগত মান বুঝিতে পারা যায় না। ধরা যাক 'A' দলে ৬ জন ছাত্রছাত্রী আছে, ইহাদের মধ্যে কে প্রথম জানা যায় না। বলা বাহুল্য এই ছয়জনের মধ্যে প্রভেদ নিশ্চয়ই রহিয়াছে, তাহা হইলে ব্যক্তিতা বা individuality সম্বন্ধে কি ভাবে আমরা অবহিত হইব? কমিশন বলিয়াছেন, "The system recommended here will work in almost all cases except where distinctions are to be made for the award of scholarships and prizes. In these cases (whose number will always be limited) the system may be modified to introduce finer scale which may show the difference between two cases which may be almost similar. It must however be admited that a difference of a few marks on the percentile scale is more often a matter of chance than of exact determination. We note that changes have been introduced in recent years in several universities whose candidates who have secured first or second class are arranged in the alphabetical order of their names and not as hitherto according to the percentile scale". এই বিষয়টি

ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তবে ইহা ঠিক যে **প্রতীক** ব্যবহারের যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে।

কমিশন আরও বলিয়াছেন যে **বহিস্থ পরীক্ষা যতদূর কমান সম্ভব কমান হইবে।** কমিশন বলিয়াছেন, "We recommend that there should be only one public examination to indicate the completion of the School Course." কমিশন আরও বলিয়াছেন যে শেষ বার্ষিক পরীক্ষাও সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে আবশ্যিক নয়। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিবে তাহারা বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ও কিউমিউলেটিড রেকর্ড কার্ডের উপর নির্ভর করিয়া শেষ সার্টিফিকেট লাভ করিতে পারিবে।

বহিস্থ পরীক্ষা সম্বন্ধে কমিশন বার বার বলিয়াছেন যে ইহার সংখ্যা কমাইতে হইবে। **কমিশন** নূতন পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে **সুপারিশ** করিয়াছেন, তাহার সারাংশ হইল নিম্নরূপ :—

১। ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নির্ণয় করিবার জন্য কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড ও অন্যান্য প্রগতিমূলক রেকর্ড কার্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। বহিস্থ পরীক্ষা যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে এবং রচনামূলক পরীক্ষার ব্যক্তিমুখী ব্যবস্থাও কমাইতে হইবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নসমূহ দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহাছাড়া প্রশ্নের ধরণও পরিবর্তন করিতে হইবে।

৩। ছাত্রছাত্রীদের শেষ মূল্যায়নের সময় বিদ্যালয়ের প্রগতিপত্র ও অন্তস্থ পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে।

৪। মূল্যায়নের নম্বর না দিয়া প্রতীকের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। মাধ্যমিক স্তরের শেষে একটি বার্ষিক পরীক্ষা হইবে।

৬। শেষ পরীক্ষার সার্টিফিকেটের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ের অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপের কথাই শুধু লিখিত থাকিবে না, যে সমস্ত অন্তস্থ পরীক্ষার বিষয় রহিয়াছে, তাহার পরিমাপের হিসাবও ঐ সার্টিফিকেটে দেওয়া থাকিবে।

৭। কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখিতে হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংঘ-পদ্ধতি (Group Method)

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে "একা না বোকা"—একা একা কাজ করা আর দশে মিলে কাজ করার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পার্থক্য রহিয়াছে। গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রকাশ ও প্রসারের সংগে সংগে দেখা যাইতেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ ক্রমশঃই অবহেলিত হইতেছে এবং তার পরিবর্তে যে বিষয়টি নূতন ভাবে মর্যাদার সংগে গৃহীত হইতেছে সেটি হইল সংঘ স্বার্থবোধ। বস্তুতঃপক্ষে মানুষের চিন্তাধারার এ এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলা যাইতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব লাঘব করিয়া সমবেত ভাবে শিক্ষাপরিচালনা করার যে ব্যবস্থা তা বৈদিক ও বৌদ্ধযুগের শিক্ষা-পদ্ধতিতে কিছু কিছু দেখা যায়—যদিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং গৌরব অর্জনই ছিল তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধতির মুল বিষয়।

কিন্তু আমাদের জানিতে হইবে "শিক্ষাপদ্ধতি" নামক বস্তুটি কি? এর অর্থই বা কি? ইহা জানার পূর্বেও আমাদের জানা দরকার শিক্ষা বলিতে কি বোঝায়? "শিক্ষা" কথাটির যদিও কোনো একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ তবুও এটুকু বলা যাইতে পারে শিক্ষা হইল শিশুর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর সার্বিক বিকাশ সাধনের অন্যতম পন্থা। পদ্ধতি বলিতে আমরা বুঝি সেই পন্থাসমূহ যাহার মাধ্যমে শিশুর সুপ্ত গুণাবলী বাস্তবে রূপায়িত হয়। আর শিক্ষাপদ্ধতি (teaching method) বলিতে আমরা বুঝি সেই উপায়-সমূহ যার সাহায্যে প্রধানতঃ শিশুর বৌদ্ধিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনের চেষ্টা হয়।

শিক্ষাজগতে বহু প্রকারের ছাত্রছাত্রী আসে—তাহাদের প্রত্যেকে অপর বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য, মেধা, চাহিদা ইত্যাদির দিক হইতে সকলের চাইতে আলাদা। সেইজন্য পাঠদান কালে পাঠদানকারী কি ভাবে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ছাত্রছাত্রীর কাছে নিজের বক্তব্য বিষয়টি পেশ করিবেন সেটা একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষা-দানের যে পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে তাহা হইল শ্রেণী পাঠনা পদ্ধতি (class teaching method) যাহাতে ছাত্রছাত্রী নিষ্ক্রিয় শ্রোতা এবং শিক্ষক সক্রিয়

বক্তার আসন গ্রহণ করেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া এই পদ্ধতিই সর্বত্র চলিয়া আসিতেছে—কিন্তু এই পদ্ধতির সুবিধার চাইতে অসুবিধাগুলি প্রচুর পরিমাণে অনুভূত হওয়ার জন্যে আজ নূতন পদ্ধতিতে পাঠদানের প্রশ্ন উঠিতেছে। ইহার ফলে যে সব নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার মধ্যে সংঘ-পদ্ধতি অন্যতম।

সংঘ-পদ্ধতি কা'কে বলে?

সংঘ বলিতে বোঝায় একটি দল যেখানে একের অধিক লোক বা ছাত্রছাত্রী মিলিত হয় কোনো উদ্দেশ্যে। সংঘপদ্ধতি বলিতে আমরা বুঝি সেই পদ্ধতি যাহাতে শ্রেণীর একের অধিক ছাত্রছাত্রী মিলিয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া একটি বিষয়ে বিভিন্ন দিকের বা বহু সমস্যার সমাধান নিজেদের মধ্যে আলোচনার ও পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে সক্রিয় ভাবে করিয়া থাকে। এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হইল **ছাত্রছাত্রীকে দেহে-মনে সক্রিয় করিয়া তোলা**—এখানে **শিক্ষক** তাঁহারা উচ্চাসন ছাড়িয়া **শিশুদের স্তরে নামিয়া আসেন ও সহায়তা করেন**।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক্, কোনো নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক মহোদয় সকল ছাত্রছাত্রীদের সামনে একটি সমস্যা রাখিলেন "শিক্ষার লক্ষ্য কি"। এই মর্মে এবং সমগ্র শ্রেণীতে দশটি দলে ভাগ করিয়া দিলেন। প্রতি দল দশটি করে লক্ষ্য স্থির করিল এবং তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিল। পরে শিক্ষক মহাশয়ের নেতৃত্বে দশটি দল তাদের চিন্তাধারা উপস্থাপিত করিল এবং সবাই মিলিয়া সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লক্ষ্যগুলি ঠিক করিয়া লইল। এইটি সংঘ-পদ্ধতির একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত উদাহরণ।

সংঘ-পদ্ধতি আবার বিভিন্নরূপে অনুসৃত হয়; যথা:—

(১) **সেমিনার** বা **আলোচনা চক্র**

(২) **প্যানেল ডিস্‌কাসন**

(৩) **প্রজেক্ট বা প্রকল্প** (ব্যাপক অর্থে)

(৪) **দলীয় আলোচনা**

(৫) **শিক্ষাশিবির পরিচালনা**

(৬) **কর্মশালা** (Workshop) ইত্যাদি।

কি ভাবে সংঘ-পদ্ধতি পরিচালিত হয়?

সংঘপদ্ধতি কতকগুলি দলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়—সমগ্র শ্রেণীকে কতকগুলি দলে বিভক্ত করিয়া দিয়া তাহাদের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা হয় এই পদ্ধতিতে। সংঘপদ্ধতি পরিচালনায় দলবিভাগ করা একটি কঠিন কাজ। কর্মের উদ্দেশ্য অনুযায়ী দলের সভ্যসংখ্যা ও প্রকৃতি স্থিরীকৃত হয়। প্রত্যেক দলে এক জন দলনেতা এবং এক জন লিপিকার (Recorder) থাকেন। দলনেতার পরিচালনায় সেই দলের উপর ন্যস্ত বিষয়টি তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন—লিপিকার তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণ আলোচনাসভায় সকলের সামনে উপস্থাপিত করেন এবং শ্রেণীর সকলে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সংঘপদ্ধতির বিস্তৃতি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় ব্যাপক। এই দলগুলি বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। যেমন—অংকের জন্য দলবিভাগ করিতে হইলে শিক্ষক-মহাশয় অংকে বেশ ভাল ছাত্রের সংগে খারাপ ছাত্রকে জুড়িয়া দিতে পারেন। আবার কোনো প্রজেক্ট করার সময় বুদ্ধি, সংখ্যা, পারদর্শিতা ইত্যাদির দিক হইতে যথাসম্ভব সমতা বজায় রাখিতে হইবে। যদি কর্মের উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতা হয় তাহলে দলবিভাগ এমন ভাবে করিতে হইবে যাহাতে কোনো প্রকার অসম প্রতিযোগিতা না হয়।

দল পরিচালনায় শিক্ষকের দায়িত্ব সর্বাধিক। তাঁকে সবসময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে দলগুলির সদস্যরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ করে—কেউ যেন নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে না থাকে। এটা যদিও স্বাভাবিক যে কিছু ছেলেমেয়ে খুব তাড়াতাড়ি কোনো বিষয় বুঝিতে পারে, আবার কারো পক্ষে একটি বিষয় বুঝিতে বেশ সময় লাগে, তবুও শিক্ষকের কাজ হবে এইক্ষেত্রে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করা। তাঁকে আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে যার যা কাজ সে সেই কাজ করে। দলের কাজে কখনও প্রতিযোগিতা ও গতি আসবে আবার কখনও শৈথিল্যের ভাব দেখা দেবে। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকমহাশয়ের।

সংঘ-পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে আলোচনা :—

আলোচনাচক্র বা সেমিনার :—শ্রেণীতে সামগ্রিক ভাবে কোনো একটি মূল বিষয় লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করার পর সমগ্র শ্রেণীকে

কতকগুলি দলে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং মূল বিষয়টিকে সংগতি-পূর্ণভাবে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলগুলিকে পুস্তক ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করা হইয়া থাকে। দলের এক জন দলনেতা, লিপিকার ও তথ্যবিশেষজ্ঞ মনোনীত হন। দলগুলি মাঝে মাঝে নিজেরা মিলিত হইয়া পারস্পরিক আলোচনা করিয়া বিষয়টি সকলে জানিয়া নিতে পারেন। তথ্যবিশেষজ্ঞও এবিষয়ে তাদের সাহায্য করিতে পারেন। এই বার্ষিক আলোচনার সারমর্ম লিপিকার লিখিয়া রাখিবেন। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে বিভিন্ন দলনেতা তাঁহার দলের বিবরণী সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করেন—সকলের সামনে দলগুলির বিবরণী পাঠ করা হয়। সর্বশেষে কতকগুলি প্রস্তাবসহ সকলের আলোচনার সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হয়।

Work-shop বা কর্মশালা—এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কাজ করার জন্য কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞ ব্যক্তি উৎসাহী, কর্মোদ্যমশীল ও পারদর্শী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একত্র মিলিত হন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর শিক্ষার্থীরা তাঁহাদের পরিচালনায় হাতে কলমে কাজ করেন। সর্বশেষে তাদের কর্মবিবরণী প্রকাশিত হয় যেমন সাহিত্য কর্মশালা ইত্যাদি। এতে তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার চাইতে বাস্তব ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করে বেশী পরিমাণে।

প্যানেল ডিস্কাসন—এই পদ্ধতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেবার জন্য কয়েক জন নির্বাচিত ব্যক্তি থাকেন—ইহাতে এক জন সভাপতিও থাকেন। আলোচ্য বিষয়টি এমন কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় যাহাতে সকলের বক্তৃতার মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট বিষয়টি সামগ্রিক ভাবে ও সুস্পষ্টভাবে সকলের সামনে উপস্থাপিত হতে পারে। সভাপতি সর্বশেষে সকলের বক্তৃতার সারসংক্ষেপ করেন।

প্রজেক্ট বা প্রকল্প—সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে যে প্রজেক্ট করা হয় তাকে সংঘপদ্ধতির পর্য্যায়ে আনিয়া পরিচালিত করা যাইতে পারে। ইহাতেও দলবিভাগ করা হয়, প্রতি দলকে সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনা করা হয় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা কয়েকটি ছোটো ছোটো লক্ষ্যের দিকে। এখানেও শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতা বেশী পাইয়া থাকেন। কাজের শেষে সকল দলের কাজের মূল্যায়ন করা হয়।

শিক্ষাশিবির পরিচালনা—এই পদ্ধতিতে কোনো প্রকার শিক্ষামূলক অভিপ্রায়ে ছাত্রছাত্রীরা একত্রিত হন—কয়েকজন দলনেতা তাদের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরা শিবির স্থাপনার জন্য এমন জায়গা স্থির করেন যেখান হইতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়টি সম্বন্ধে তথ্য অর্জন করিতে পারে। কয়েকদিনের জন্য তাঁহারা সেখানে অবস্থান করেন। পরিচালনার শেষে তাঁহাদের ঐ কয়দিন শিবির যাপনের একটি মূল্যায়ন করা হয়।

এই ধরণের সংঘপদ্ধতির দ্রুত প্রসারণ হইতেছে সর্বত্র। শিক্ষার অগ্রগতির সংগে সংগে এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই পদ্ধতিতে মানুষের মনের জড়তা নিক্রিয়তা দূরীভূত হইয়া যায় এবং তার পরিবর্তে তাহারা উৎসাহী, সচেষ্ট ও উদ্যমী হইয়া ওঠে। তাহাদের বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতার উন্নতি হয় এই পন্থা অবলম্বনের ফলে। সকলের সাথে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করার ফলে পারস্পরিক চিন্তার আদান-প্রদানের পথ সুগম হয় এবং সকলেই এর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়—শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়, তারা আত্মসচেতন হয়—ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা দূরীভূত হয়—সমাজকেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক আসে।

যদিও এই পদ্ধতিতে অন্যান্য পদ্ধতির চাইতে, সময় কিছুটা বেশী লাগে তবুও সুপরিচালনার গুণে অনেক বড় বড় এবং জটিল সমস্যার সমাধান ইহাতে সহজে করা সম্ভব হয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাহাতে সকলেই সমান ভাবে উপকার গ্রহণ করিতে পারে এবং যাহাতে মুষ্টিমেয়ের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ না থাকে।

কোন্ সময়ে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে

সেমিনার, প্যানেল ডিসকাশন, কর্মশালা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার সংঘ-পদ্ধতির পরিচালনা করিতে আমরা দেখিয়াছি। কোন সময়ে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা আমাদের জানা দরকার।

যে বিষয় আলোচনা কালে দেখা যায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আছে, তখন সেমিনারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অংশগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে আগমন করিবেন।

প্যানেল আলোচনা বা ছক কাটা আলোচনার বিশেষত্ব হইল এই যে এইখানে বক্তারা পর পর কোন একটি বিষয়ের সমস্ত দিকগুলি আলোচনা

করে। এইখানে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে বক্তাদের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য থাকিতে হইবে। বক্তারা বক্তৃতার পর শ্রোতাদের নিকট হইতে প্রশ্ন আহ্বান করিতে পারেন। এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ঐ বিষয়ে প্রতীতি হইয়াছে কি না জানা যাইতে পারে।

কর্মশালা হইল জড়বস্তু একসাথে জড় করা। শিক্ষা-কর্মশালায় এইরূপ একটি উদ্দেশ্য নিয়া কোন সৃজনাত্মক কাজ করা হয়। সংবাদ পত্র, অন্যান্য পত্রিকা ইত্যাদির সাহায্য লইয়া কর্মশালার ডিরেক্টার কর্মীদের চিন্তার খোরাক জুটাইয়া দেন।

দলীয় আলোচনায় দলনেতার কর্তব্য

শিক্ষক শিক্ষিকা দলীয় আলোচনায় বিভিন্ন দল স্থির করিয়া দেন। প্রত্যেক দলের এক জন করিয়া নেতা থাকেন। দলগুলির আলোচনা হইতে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত পাইতে হইলে দলগুলির নেতাদের বিশেষ গুণ-সম্পন্ন হইতে হইবে। সাধারণতঃ চারি ধরণের নেতা দেখা যায়। এই নেতারা কিরকম ধরণের তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

১। এই দলের নেতা দলের অন্তর্ভুক্ত নন। তাঁহাকে দলের আলোচনা করিবার জন্যই ডাকিয়া আনা হয়। সাধারণতঃ শ্রেণীতে যদি কোন বিশেষ সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দলীয় নেতা না বাছিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে কাহাকেও তথ্যবিশেষজ্ঞ হিসাবে রাখিয়া তাঁহাকেই দলের কার্য পরিচালনা করিবার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। দলের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও তাঁহার দলের উপর প্রভাব রহিয়াছে। তিনিই দলের মূল ব্যক্তি হইয়া দাঁড়ান, ফলে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার মত উপযুক্ততা কেহ অর্জন করিতে পারেনা।

২। দলের নেতা হিসাবে স্বেচ্ছাচারী নেতাও দেখা যায়। তিনি নিজের ইচ্ছামত দলকে পরিচালনা করিয়া থাকেন। ফলে দলটির নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না, এবং দলটি নেতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়ে এবং দলের নেতার অনুপস্থিতিতে দলের কাজ মোটেই চলে না। বলা বাহুল্য এই দল মোটেই সৃজনাত্মক কাজ করিবার মত উপযুক্ত নয়।

৩। আর এক রকম নেতা দেখা যায়, যিনি স্বেচ্ছাচারী নেতার ঠিক উলটা। তিনি কোন সিদ্ধান্তেই আসিতে সক্ষম হন না। দল যাহা করে

তাহাতেই তিনি মত প্রদান করিয়া থাকেন। ফলে দলের কার্য-পরিচালনার সময় ভীষণ গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়া থাকে। দলে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত অতিশয় কমই হইয়া থাকে। এই দলের কাজে স্বাধীনতা প্রচুর থাকিলেও, আসলে কাজ কম হইয়া থাকে।

৪। আর এক রকম নেতা আছেন, তাঁহাকে বলা হয় গণতান্ত্রিক নেতা। এই নেতা দলের অন্যান্য অংশকারীদের সাথে একযোগে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি দলের প্রত্যেক অংশকারীকে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে বলিয়া থাকেন এবং সকলের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করিয়া থাকেন। গণতান্ত্রিক নেতা পক্ষপাতহীন, বন্ধুভাবাপন্ন, সহিষ্ণু, নীরব শ্রোতা এবং তাঁহার রসবোধও আছে।

অংশগ্রহণকারীদের কাজ

দলীয় আলোচনায় নেতা কি কি জাতীয় হইতে পারে তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। বলা বাহুল্য গণতান্ত্রিক নেতাই এই জাতীয় সংঘ আলোচনা পদ্ধতিতে বিশেষ প্রয়োজন।

সংঘ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদেরও কাজ রহিয়াছে। গণতান্ত্রিক দলে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর আলোচনার একই রূপ ক্ষমতা রহিয়াছে। কিন্তু অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লোক দেখা যাইয়া থাকে। ইহাদের সম্বন্ধে জানাও প্রয়োজন। কিন্তু তাহার পূর্বে অংশগ্রহণকারীদের দলীয় আলোচনায় কি করা দরকার তাহা দেখিতে হইবে।

যখন কোন মতামত জানাইবার প্রয়োজন কোন সভ্য বোধ করেন তখন তিনি কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া তাহা বলিবেন। অন্য কেহ যখন কথা বলে তখন কথা বলা উচিত নয়। অন্যের কথা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত। কোন সভ্যের কিছু মতামত প্রকাশ করিতে হইলে তাহা অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক হইবে। সভাপতিকে সাহায্য করিবার জন্য বক্তব্যটি সহজ ও সুস্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে দলের মধ্যে সকলেই উৎকৃষ্ট সভ্য থাকেন না, অনেক সভ্য থাকেন যাঁহারা সভার কাজে রীতিমত বাধার সৃষ্টি করেন।

অনেক সভ্য আছেন যাঁহারা নিজেরাই কথা বলিয়া যান, অন্যকে কথা বলিতে দেন না, এমন কি অন্যের যে কথা বলিবার কিছু থাকিতে পারে, তাহাও বুঝিয়া দেখেন না।

অনেক সভ্য আছেন, যাহারা অন্যের কথা বলিবার সময় সর্বদা বাধা দেন এবং নিজে কথা বলিতে চেষ্টা করেন :

আবার অনেক সভ্য আছেন, যাঁহারা কথা বলিবার সময় আসল কথাকে এড়াইয়া অন্য কথার অবতারণা করেন।

অনেক সভ্য আছেন যাঁহারা অন্যে কথা বলিবার সময় পাশের সভ্যের সাথে চুপি চুপি কথা বলিয়া আসল কথায় বাধা সৃষ্টি করেন।

আবার অনেক সভ্য আছেন, যাঁহারা মোটেই কথা বলেন না। তাঁহারা যে কিছু বোঝেন না এমন নয়—বোঝেন, তবুও কথা বলেন না। সভাপতি তাঁহাকে কথা বলিবার সুযোগ করিয়া দিবেন। কিছু উৎসাহ পাইলেই তিনি কথা বলিবেন এবং তাহার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য অতি অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

শ্রেণীতে সংঘ পদ্ধতির ব্যবহার কখন হইবে

কোন পর্যবেক্ষণ, শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ, গ্রাম দর্শন ইত্যাদি কাজে এবং প্রজেক্ট পদ্ধতিতে, সমস্যা পদ্ধতিতে, বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক জীবন পরিচালনার কাজে এই সংঘ-পদ্ধতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোন বিষয়বস্তুকে সমস্যা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহাকে সংঘপদ্ধতিতে সমাধান করা চলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কার্য-সমস্যা-পদ্ধতি

(Project Method of Dewey)

ডিউইর প্রভাব

ডিউই যখন চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তখন তিনি একটি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় খুলিয়া তাঁহার নিজস্ব শিক্ষাসম্বন্ধীয় নীতিগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তাঁহার মতে শিশু যদি স্বাভাবিক আগ্রহে কোন বস্তুকে অনুসরণ করিয়া তাহা হইতে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাহা হইলে শিশুরা সমগ্র ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস বৃদ্ধি হইবে। তাঁহার এই নীতি তিনি তাঁহার পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করিয়া দেখেন। তিনি প্রচলিত শ্রেণীব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া এমন আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিলেন যাহাতে শিশুরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া জ্ঞানার্জন করিতে পারে। শিশুরা প্রথম অবস্থা হইতেই নানাভাবে প্রশ্ন করিবার সুযোগ পাইবে, যে বিষয়ে শিশুর আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয় সেই দিকে সে মনঃসংযোগ করিতে পারিবে। বিভিন্ন প্রকারের হাতিয়ার ও বস্তু-সম্ভার লইয়া সে খেলা ও কাজ করিতে পারিবে, ছবি আঁকিবে, কোন কিছু তৈয়ারী করিবে, ভাঙ্গিবে, গড়িবে, সেলাই করিবে ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে প্রচলিত শ্রেণীকক্ষের প্রতিযোগিতা আর শিশুদের মধ্যে থাকিবে না, গড়িয়া উঠিবে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা।

শিশুরাই যদি স্বচেষ্টায় কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে শিখিতে থাকে, তবে শিক্ষকদের কাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। শিক্ষকের কাজ হইতেছে শিশুদিগকে তাহাদের স্ব স্ব কাজে পরিচালিত করিয়া উচ্চতর বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া। সাধারণতঃ শিশুরা যদি নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী খেলা বা কাজ করিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের হস্তের মাংসপেশী সম্বন্ধে অনুশীলন এবং সামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়া বাস্তবিক পক্ষে শিশুর আর খুব বেশী অগ্রসর হইবার থাকে না। কিন্তু শিক্ষকের ইঙ্গিত ও নির্দেশ শিশুদের একটি উচ্চস্তরে লইয়া যাইয়া তাহাদের বিকাশ সাধন করে। আগ্রহের কেন্দ্রগুলি এমনিই ভাবে শিক্ষকের ইঙ্গিতে স্থির

করা হয় যাহাতে সেইগুলি মানুষের মৌলিক চাহিদার (অন্ন বস্ত্র ও আবাস) পরিপূরণকেই ইঙ্গিত করে।

শিক্ষা-সম্বন্ধীয় এইরূপ বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী শিশুর জীবনকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করে দেখিয়া আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহ ডিউইর শিক্ষানীতিকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করে। আমেরিকায় ডিউইর সহকর্মী কিলপ্যাট্রিক ডিউইর শিক্ষানীতির উপর ভিত্তি করিয়া 'প্রজেক্ট মেথডের' বা 'কার্য-সমস্যা-পদ্ধতি' প্রবর্তন করেন।

কার্য-সমস্যা-পদ্ধতি

স্বাভাবিক পরিবেশে কোন কার্যরূপ-সমস্যা সমাধানের আকারে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে প্রজেক্ট মেথড বলে। (A Project is a problematic act carried to completion in its natural setting —Stevenson).

এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য কোন কার্যরূপ-সমস্যা ছাত্রের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং ছাত্রকে স্বচেষ্টায় তাহা সমাধান করিতে বা কাজটি সম্পন্ন করিতে বলা হয়। অভীষ্ট লক্ষ্য ছাত্রের সামনে ধরা হয়; কিন্তু তাহা সমাধানের উপায় ছাত্রকে স্বচেষ্টায় আবিষ্কার করিতে হয় এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাহাকে গন্তব্য-স্থলে পৌছিতে হয়। (আবিষ্ক্রিয়া-পদ্ধতিতে ছাত্রকে পাঠের লক্ষ্য বলা হয় না, পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রকেই তাহা আবিষ্কার করিতে হয়।) কতকগুলি কার্য-সমস্যার তালিকার আকারেই এক এক বিষয়ের পাঠ্য-স্থচি প্রস্তুত করা হয় এবং সেই সকল কাজের ভিতর দিয়া ছাত্রগণ এক এক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে।

প্রজেক্ট দুই আকারে হইতে পারে। যথা,—

(১) বুদ্ধিমূলক, (২) কার্যমূলক

(১) বুদ্ধিমূলক কার্য-সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্রকে সকল সময় বাস্তবিক কাজটি করিতে হয় না। কার্য-সমস্যাটি সমাধানের কল্পিত কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিলেই সমস্যাটির সমাধান হইল। যথা—কোন ছাত্রকে কলিকাতা হইতে লাহোর যাওয়া-রূপ কার্য-সমস্যাটির সমাধান করিতে বলা হইল। ইহার জন্য সে মানচিত্র, রেলওয়ে টাইম-টেবল ইত্যাদি দেখিয়া কখন, কি উপায়ে, কোন্ পথে যাইতে হইবে, কত খরচ লাগিবে, কি কি

জিনিস সঙ্গে লইতে হইবে ইত্যাদি নির্ধারণ করিবে। তাহার পর সে কলিকাতা হইতে লাহোর যাওয়ার কল্পিত ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করিতে পারিলেই কার্য-সমস্যাটির সমাধান করা হইল। নগর-সভার কাজ, পোষ্ট-আফিসের কাজ, সমবায় সমিতির কাজ, জেলা-শাসন, আইন-সভা প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিক খবর সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ে তাহাদের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(২) কার্যমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্রকে বাস্তবিক কাজটি করিতে হইবে। শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়-শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছাত্রকে কতকগুলি কাজ করিতে দিবেন। ছাত্র স্বচেষ্টায় তাহা সম্পাদনের উপায় স্থির করিবে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে তাহা সম্পাদন করিবে। যথা,—দিক নির্ণয় করা, সময় নির্ণয় করা, বিদ্যালয়ের ও গ্রামের নক্সা তৈয়ার করা; বেঞ্চ, চেয়ার, টেব্‌ল প্রভৃতি নানা রকম জিনিষ প্রস্তুত করা; বড় ছাত্রদের একটা বাগান করা, একটা গৃহ নির্মাণ করা, একটা পুল নির্মাণ করা, ভূ-গোলক তৈয়ার করা, দোকান করা, পশুপক্ষী পালন করা, কাগজ তৈয়ার করা; মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনা, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কঠিন কাজও দেওয়া যাইতে পারে।

স্কুলের সীমানার মধ্যে থাকিয়াও ছোট ছোট কার্য-সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কাজগুলি সম্পন্ন করিতে হইলে অনেক সময় ছাত্রগণকে স্কুল-সীমার বাহিরেও লইয়া যাইতে হইবে।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে শিশুদিগকে চারিটি স্তরে কার্যটি শেষ করিতে হইবে। যথা,—

১। কাজের ইউনিট ঠিক করা

২। পরিকল্পনা করা

৩। কার্য সম্পাদন করা

৪। বিচার করা

১। শিশুরাই কাজের ইউনিট স্থির করিবে, কিন্তু যেহেতু শিশুদের অভিজ্ঞতা কম, সেই হেতু শিক্ষক তাঁহার ইঙ্গিত দ্বারা শিশুদিগকে দিয়া কাজের ইউনিট স্থির করাইয়া লইবেন।

২। শিশুরা কাজের পরিকল্পনা করিবে। কে কি কাজ করিবে তাহা তাহারা স্থির করিয়া দলগঠন করিবে।

৩। শিশুরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া কাজ করিবে।

৪। কাজের শেষে শিশুরা সকলে মিলিয়া কার্যটির বিচার করিয়া দেখিবে ও আলোচনা করিবে।

এই পদ্ধতির উপকারিতা

(১) নানা কাজের মধ্য দিয়া, হাতে-কলমে শিক্ষা হয় বলিয়া, ইহাতে ছাত্রদের ভাল শিক্ষা হয় এবং তাহারা অধিকতর কাজের লোক (Practical) হয়।

(২) ছাত্রগণ তাহাদের অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার করিতেও শিক্ষা করে।

(৩) শিক্ষার সহিত বাস্তব জীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কেননা, কার্য-সমস্যাগুলি সাধারণতঃ বাস্তব-জীবনের ক্ষেত্র হইতে নির্বাচন করা হয়।

(৪) ছাত্রগণকে স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভের উৎসাহ দেওয়া হয়।

(৫) শ্রেণী-পাঠনার একঘেয়েমি নষ্ট হয়।

(৬) বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Co-relation) স্থাপিত হয়। কারণ, একটা কাজ করার সময়ে অনেক বিষয়ের জ্ঞানের ব্যবহার করিতে হয়।

(৭) সমস্যা-সমাধানের আকারে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছাত্রের সামনে ধরা হয় বলিয়া ছাত্রগণ শিক্ষার জন্য অধিকতর আগ্রহশীল হয়।

(৮) ছাত্রগণের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়।

ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল কার্যসমস্যা-পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ করা কঠিন। কারণ, কেবল এই পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞান দেওয়া যায় না, কার্য-সমস্যাগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয় না এবং অনেক বিষয়ে ছাত্রের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তবে শ্রেণী-পাঠনার অনুপূরকভাবে কার্যসমস্যা-পদ্ধতিতেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক দোষের প্রতিকার হইবে এবং অভাব পুরণ হইবে।

পাঞ্জাব প্রদেশে **মোগা** নামক গ্রামে মিশনারীগণ 'প্রজেক্ট' পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তথায় সরকারী পাঠ্য-সূচী অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিলেও ছাত্রগণকে প্রধানতঃ নানা কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করিতে দেওয়া হয়। এই বিষয়েও তাহারা যে সফলতা অর্জন করিয়াছে, অনেকে তাহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রজেক্ট পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব

শিক্ষাদান সম্পর্কে প্রজেক্ট পদ্ধতি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার কারণগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) শিশুরা বাস্তব জীবনের কোন ঘটনায় আকৃষ্ট হইয়া সেই **কাজকে কেন্দ্র করিয়া** কাজ করিতে সুরু করে। শিশুরা স্বভাবতঃই কৌতূহলী। বাস্তব জীবনের সেই ঘটনাকে শিশুরা কৌতূহলী দৃষ্টির সাহায্যে দেখিয়া, হাতে-কলমে উহার বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে। ফলে শিশুর কাছে কাজ হয় আনন্দদায়ক ও হৃদয়-গ্রাহী।

(২) শিশুরা কর্মপ্রিয়, তাহারা কাজ করিতে ভালবাসে, কাজ করিয়া তাহারা আনন্দ পায়। মামুলি শিক্ষা-পদ্ধতিতে কর্মের স্থান নাই, আনন্দের স্থানও নাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভেও শিশুরা বঞ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিশুরা নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে **কর্মের মধ্যে সেই শিক্ষা লাভ** করে। অতএব শিশু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে।

(৩) তৃতীয়তঃ, শিশুরা সকলে মিলিয়া কাজ করে বলিয়া তাহাদের মধ্যে একটা **সামাজিকতা-বোধ** জাগ্রত হইতে দেখা যায়। এই সামাজিকতা-বোধ শিশু-জীবন গঠনে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করে। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক বলেন, "Project is a whole-hearted purposeful activity in a social environment." যে বয়সে শিশুরা দলীয় কার্যে উৎসাহী, সেই বয়সে যদি সামাজিকতা-বোধ জাগ্রত হইবার মত কর্মের সুযোগ শিশুদের দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কর্মকে যে শিশুরা আনন্দে গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

(৪) চতুর্থতঃ, কর্মের কেন্দ্রটি বাস্তব জীবনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলিয়া উহা একটি **সমস্যার সৃষ্টি** করিয়া শিশুমনকে সেই **সমস্যার জট ছাড়াইতে আগ্রহান্বিত** করিয়া তোলে। এই দিক হইতেও এই প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

প্রজেক্ট পদ্ধতির অসুবিধা

১। প্রতি শিশুর নিজস্ব বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ স্তরে উঠা শ্রেণীর সকল শিশুর পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। কাজের ইউনিটগুলি বুদ্ধি অনুশীলনের ক্ষেত্রে একই রূপ সম্ভাবনাযুক্ত নয়, ফলে কোন কোন দল

নিজেদের বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র খুঁজিয়া পায় না। অনেক কর্মই পৌনঃপুনিক এবং তাহাতে হস্তের নিপুণতা বৃদ্ধি ছাড়া বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী নয়। যদি শিশুদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে এমন সব জিনিষ আমদানী করিতে হয় যে, প্রকৃতপক্ষে প্রজেক্টের সঙ্গে তাহাদের কোন সংযোগ থাকে না।

২। প্রজেক্ট অনুসরণ করিয়া শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে শিক্ষার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করা যায় না। ফলে শিশু কতটুকু অগ্রসর হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত শিশু কিছুই করিল না এবং অভিজ্ঞতাও অর্জন করা হইল না, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেল, সে বার বারই ঐ কাজ করিয়াছে।

প্রজেক্টের নমুনা

চিড়িয়াখানা প্রজেক্ট

ভূমিকা। কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর শিশু কলিকাতায় চিড়িয়াখানা দেখিতে গিয়াছে।

ইউনিট স্থির করা। শিশুরা চিড়িয়াখানা দেখিয়া এতই প্রীত হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের শ্রেণীতে ঐরূপ একটি চিড়িয়াখানা তৈয়ারী করিতে চাহিল। শিক্ষক অনুমোদন করিলেন। শ্রেণীর সমস্ত শিশুরা এই কাজে উৎসাহী হইল।

পরিকল্পনা। শ্রেণীর সমস্ত শিশুরা পরিকল্পনা করিতে বসিল। কেহ বলিল তাহারা নিজেরাই মুখোস তৈয়ারী করিয়া জন্তু সাজিবে, কেহ বলিল মাটি দিয়া জন্তু তৈয়ারী করিবে, কেহ বলিল জীবজন্তুর ছবির বই জোগাড় করিয়া ছবি আঁকিবে ও ছবি কাটিবে ইত্যাদি। কেউ কেউ বলিল, তাহারা সকলে মিলিয়া চিড়িয়াখানা দেখিয়া আসিবে।

তাহার পরদিন তাহারা সকলে মিলিয়া চিড়িয়াখানা দেখিয়া আসিল। তারপর কাজের জন্য দল গঠন আরম্ভ হইল।

প্রথম দল। কাজের জন্য বই ও ছবি সংগ্রহ করিয়া একটা চিড়িয়াখানার বই তৈয়ারী করিবে এবং যাহারা মাটি দিয়া জন্তু তৈয়ারী করিবে, তাহাদের ছবি দেখাইয়া সাহায্য করিবে।

দ্বিতীয় দল। মাটি এবং অন্যান্য জিনিস দিয়া জন্তু-জানোয়ার তৈরী করিবে।

তৃতীয় দল। কি ভাবে চিড়িয়াখানা সাজাইবে তাহার ভার লইল।

কাজ আরম্ভ হইল।

১। প্রথম দল নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের বই যোগাড় করিয়া ছবি আঁকিয়া এবং অকেজো বই হইতে ছবি কাটিয়া একটি ছবির বই তৈয়ারী করিল। জন্তু-জানোয়াদের ছবিগুলি একটি সাদা খাতায় আঁটা হইল। ছবিগুলির নীচে জন্তু-জানোয়ারের বিবরণী দেওয়া হইল। মাঝে মাঝে তাহারা দ্বিতীয় দলকে ছবি দেখাইয়া জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি তৈয়ারী করিতে সাহায্য করিল।

এই দল প্রতিদিন কতটা কাজ করিল এবং কি কি কাজ করিল তাহা দিন-লিপিতে লিখিয়া রাখিল।

২। দ্বিতীয় দল মাটি, সোলা, বাঁশ, নেকড়া, তুলা ইত্যাদির সাহায্যে নানা রকম জীবজন্তু তৈয়ারী করিল।

এই দলও প্রতিদিনকার কাজের হিসাব লিখিয়া রাখিল।

৩। তৃতীয় দল কোথায় চিড়িয়াখানা হইবে তাহা স্থির করিয়া কি ভাবে চিড়িয়াখানা সাজাইবে, তাহার পরিকল্পনা করিল। চিড়িয়াখানা স্বাভাবিক পরিবেশে কি করিয়া করা যায় তাহাও স্থির করিল।

এই দলও প্রতিদিনকার কাজের হিসাব রাখিল।

তিনটি দলের মধ্যে যথাসম্ভব যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা রহিল।

চিড়িয়াখানার কাজ শেষ হইল। **চিড়িয়াখানা খোলা হইবে,** দর্শকদের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। চিড়িয়াখানা খোলার পূর্বে বিভিন্ন দলগুলি একত্র হইয়া বিভিন্ন দলের রিপোর্ট পাঠ করিল। তৃতীয় দল চিড়িয়াখানা সাজাইল।

বিচার ও আলোচনা। সকলে মিলিয়া চিড়িয়াখানা দেখিল এবং ভুল ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া আসিয়া শিক্ষকের সভাপতিত্বে তাহা আলোচনা করিল। বিদ্যালয়ের সকল শিশুদের চিড়িয়াখানা দেখিতে দিতে হইবে এবং তাহাদের সমালোচনাও বিচার করিয়া দেখা হইবে।

শিক্ষক প্রজেক্টের কাজে শিশুদের প্রয়োজন অনুসারে শিশুদিগকে পরিচালিত করিবেন, তবেই উন্নততর কর্ম ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে শিশুদিগকে উন্নীত করিতে পারিবেন।

শিক্ষক বা শিক্ষিকা এই প্রজেক্টকে অবলম্বন করিয়া শিশুদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিবেন।

পড়া—জন্তু-জানোয়ারের বই পড়া।

লেখা—জন্তু-জানোয়ারের গল্প লেখা।

অঙ্ক—বিদেশ হইতে জন্তু-জানোয়ার কেনা ও আনা সম্বন্ধে দাম কষা এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্ক করা।

গঠনমূলক কাজ—মাটির কাজ ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া কাজ।

ভূগোল—কোথায় জন্তুগুলি পাওয়া যায়, কোন্ জলবায়ুতে বাস করে, ইত্যাদি।

চিত্রাঙ্কন—জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকা।

পর্যটন—সমাজগতভাবে চিড়িয়াখানা দেখা।

সঙ্গীত ও ছন্দানুভঙ্গী—বিভিন্ন জীবজন্তুর সম্বন্ধে গান, আবৃত্তি ও ছন্দানুভঙ্গী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা

শিশুদিগকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহারা স্থির হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই, কোন কিছু একটা কাজ করিতেছে। হয়ত তাহারা লাফাইতেছে, খেলিতেছে, চীৎকার করিতেছে, কোনও একটা জিনিষ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, পিতামাতা বা বয়স্ক ব্যক্তিদের নকল করিয়া কোন কাজ করিতেছে বা কথা বলিতেছে বা রেল ইঞ্জিন হইয়া হুস্ হুস্ শব্দ করিতেছে, এমন আরও কত কি! চুপ করিয়া যে তাহারা একেবারে না বসিয়া থাকে তাহা নয়; যখন তাহাদের কাছে কোনও একটি সুন্দর চিত্তাকর্ষক গল্প বলা হয়, তখন তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া শোনে বই কি! কিন্তু তাহা ছাড়া, গল্প শোনা বা নিশ্চেষ্ট মনে ছবি দেখা বা কোনও কিছু পড়া কিংবা লেখা ছাড়া, তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। চুপ করিয়া বসিয়া নিবিষ্ট মনে তাহারা কাজও করে, কিন্তু কোনও কাজ ছাড়া তাহারা শূন্য মন লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না, ইহা আমরা প্রত্যহ শিশুদের কার্য-

কলাপ লক্ষ্য করিলেই দেখিয়া থাকি। **চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে শিশুর শক্তির উৎস ক্ষয়িত হয় এবং তাহাতে তাহাদের স্নায়ুর উপর বস্তুতঃ পক্ষে জুলুম করা হয়। ফলে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।** শারীরিক বৃদ্ধির জন্য সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পরিচালন এবং তৎসঞ্চালনজনিত কাজ অতীব প্রয়োজন। এইরূপ কর্মের ফলেই শিশু স্বকীয় কাজগুলি সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়, তদুপরি তাহার ভবিষ্যৎ কর্মও সুনিয়ন্ত্রিত হয়, এবং কর্ম ও নিজের দেহের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিতে শিক্ষা করে। এক কথায় কর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করিয়া শিশু জীবনের প্রতি কর্মের জন্য প্রস্তুত হয়।

শিশুকে কর্ম করিতে নিষেধ করার ফলে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা, যাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি দিয়া শিশুদের পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন। এযাবৎকাল পর্যন্ত শিশুকে কেন কর্ম করিতে নিষেধ করা হইয়াছে? প্রথম কথা হইতেছে, শিশুকে মনে করা হইয়াছে অক্ষম; তাহার দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহাই বয়স্কেরা মনে করিয়া আসিয়াছেন। তাই শিশুর প্রতি কর্মে বিধিনিষেধের সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শিশুর ধ্বংস করিবার প্রবৃত্তির উপরই পিতামাতা-অভিভাবক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। শিশুরা ভাঙ্গিতেই সক্ষম, গড়িতে তাহারা পারে না, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা শিশুকে কোন কিছু স্পর্শ করিতে দেন নাই। ফলে শিশু নিজের উপর নিজে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছে—তাহারা হইয়াছে নিস্তেজ, অক্ষম, ভীত ও সন্ত্রস্ত, এবং যে কোনও কর্মে তাহারা পশ্চাৎপদ। ত্রুটি কাহার? পিতামাতা-অভিভাবকের, না শিশুর? শিশুকে সুযোগ দান না করিলে শিশু শিক্ষা লাভ করিবে কেমন করিয়া? প্রথম অবস্থায় প্রত্যেকেরই ভুল হয়, শিশুর ভুল ত হইবেই। ভুল হইবে, এই আশঙ্কায় তাহার কর্ম রুদ্ধ করিলে চলিবে কেন? শিশুকে কাজ করিতে দিলে সে ভুল করিয়া ঠেকিয়া শিক্ষা লাভ করিবেই, কিন্তু কর্মে অক্ষম মনে করিয়া তাহাকে নির্জীব পদার্থে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলে তাহার অমঙ্গল ডাকিয়া আনাই হইবে। তাহা ছাড়া শিশুর কর্ম শুধু কর্মেই নিবদ্ধ নয়। শিশুর কর্মের সঙ্গে জ্ঞান আহরণেরও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রশ্ন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শিশু প্রতি বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান আহরণ করিতে চায়, প্রয়োজন হইলে সে বস্তুকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া তাহার ভিতরে

কি আছে তাহা দেখিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায়ই পিতামাতা-অভিভাবক শিশুকে বাধা দেন সবচেয়ে বেশী। শিশুকে এই অবস্থায় সাহায্য করিলে শিশুর ধ্বংস প্রবৃত্তিকে সাহায্য করা হইবে এই কথাই তাঁহারা মনে করেন। কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকিলেও সর্বক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে। শিশুর অভিজ্ঞতা লাভের পথে ব্যক্তিগত বা সমাজগত কোন ক্ষতি যাহাতে না হয়, তাহা লক্ষ্য করা দরকার সন্দেহ নাই। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সেরূপ আশঙ্কা থাকে না। তবে শিশুকে 'অনধিকার চর্চার' অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয় কেন? এই অনধিকার চর্চার কথা আমরা আরও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

যাঁহারা বয়স্ক তাঁহারা অনধিকার চর্চা করেন না, তাহার কারণ তাঁহাদের পরিবেশে যে সব বস্তু আছে তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্যক পরিচয় আছে, কিংবা পরিচয় না থাকিলেও ঐ বস্তুর সংশ্লিষ্ট অন্য বস্তুর সঙ্গে পরিচয় আছে। অতএব কোন বিষয়ে তাঁহারা অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাইয়া অনধিকার চর্চা হইতে বিরত থাকেন। কিন্তু এমন জিনিষ যদি তাঁহাদের পরিবেশে হঠাৎ দেখা যায়, যাহার সঙ্গে তাঁহাদের কোন পরিচয় নাই, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিবেন? ঐ বস্তুর সম্যক পরিচয় লাভে তাঁহাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকিবে না। জ্ঞান আহরণের স্পৃহা ও ঔৎসুক্য বয়স্ক মনকেও আঘাত করিবে। সামাজিক আদব-কায়দাদুরস্ত বয়স্ক মন অনধিকার চর্চা করে না বটে, কিন্তু জ্ঞানলাভে আগ্রহ জানায়। শিশুর ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিশুর সঙ্গে তাহার পরিবেশের পরিচয় সামান্য, তাহা ভাল করিয়া মোটেই দানা বাঁধে নাই, এমতাবস্থায় শিশু যদি হঠাৎ তাহার আবেষ্টনীতে নূতন জিনিষের সমাবেশ দেখিতে পায়, তবে গভীর দৃষ্টি লইয়া সে দেখিবে বই কি? তাহাকে সেখানে বাধা দিলে উহা মনস্তত্ত্বসম্মত হইবে না নিশ্চয়। তাহা ছাড়া শিশু যদি কোন একটি বস্তু এক বার ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরকার তথ্যের সন্ধান লইতে সক্ষম হয়, তবে সেই বস্তু-সম্পর্কিত ব্যাপারে সে পুনরায় অনুসন্ধিৎসু হইবে না। **এই ভাঙ্গার মধ্য দিয়াই শিশু ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠে এবং তাহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।**

শিশু যে শুধু ভাঙ্গিয়াই শিক্ষালাভ করে, এমন নহে; সে গড়িয়াও শিক্ষালাভ করে। ভাঙ্গা ও গড়ার মধ্যে সে একটা সম্পর্ক স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। তাহা ছাড়া শিশু ভাঙ্গা-গড়ার অন্তর্দৃষ্টি লইয়াও যে সব সময় শিক্ষা লাভ করে তাহা নহে। কতকগুলি জিনিষে শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য কেন্দ্রীভূত হয়,

অথচ সেই জিনিষগুলির অন্তরে প্রবেশ করিতেও তাহারা সক্ষম নয়। সে সমস্ত ক্ষেত্রে তাহারা অনেক সময় বহিরাবরণটুকুকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। পিতামাতা বা অভিভাবকের কর্মের কথাই ধরা যাউক। শিশু উহাদের কাছে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সকল অবস্থাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। সে সকল ক্ষেত্রে শিশু পিতামাতা-অভিভাবককে অনুকরণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শিশু ডাক্তার পিতার কর্মকে লক্ষ্য করিয়া রোগীর পরিচর্যা করে, মাতার কার্যাদি লক্ষ্য করিয়া রান্না করে, বাসন ধোয় ইত্যাদি। শিশু বাস্তব জীবনে যাহা দেখে তাহা অনুকরণ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে চেষ্টা করে।

বস্তুতঃপক্ষে শিশু নিজের কর্মের মধ্য দিয়াই যাহা আয়ত্ত করে তাহাই সে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা করে। রুশো এবং পরবর্তী শিক্ষাবিদ্‌গণও স্বীকার করিয়াছেন যে, শিশু অবস্থায় ইন্দ্রিয়ানুভূতি-প্রসূত জ্ঞানই শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে শিক্ষা করে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালনের ফলেই শিশুর জ্ঞানের ভিত্তি জন্মায়। শিশুমন পরিপক্ক হইয়া উঠিলে অবশ্য প্রজ্ঞাপ্রসূত জ্ঞান শিশুমনে দানা বাঁধিতে থাকে। অতএব জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে শিশুকে স্বীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, ইহা আজ সকল শিক্ষাবিদ্‌ই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কিছুদিন পূর্বে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। পূর্বে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাতে শিক্ষকই চিন্তা করিয়াছেন, পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং অবশেষে তাঁহাদের চিন্তাধারা শিশুর উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। **শিশুর কাজ ছিল শিক্ষকের আদেশ পালন করা এবং তাহাদের প্রতি শাসন-ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত কঠোর।** শিক্ষা ছিল শ্রেণীগত, পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি ছিল অনমনীয়। কর্ম হইতে অভিজ্ঞতা অর্জন বা কাজের কোন ব্যবস্থাই শ্রেণীকক্ষে ছিল না, শুধু ছিল পুস্তকের বহুল ব্যবহার। খাতা, পেন্সিল, কাগজ, পুস্তক ও প্রশ্নোত্তর ছিল শিক্ষাদানের মূল কথা। এমন কি শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটা ধরাবাঁধা রীতি অনুসরণ করা হইত।

কিন্তু বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের রূপ যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহার কারণ আমরা সংক্ষেপে অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব। পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা কেন আজ শিশুকেন্দ্রিক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। এই অবস্থার সূত্রপাত যে আজ হঠাৎ হইয়াছে তাহা নয়, ইহার সূত্রপাত হইয়াছে বহু দিন পূর্বে—প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে কমোনিয়াসের সময়। তারপর রুশো, পেস্তালজি, ফ্রোয়েবেল, মন্তেসরী, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রভৃতি মনস্বিগণ কর্মের ধারাকে বিভিন্ন দিক হইতে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া শিশুর শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রী করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। তিন শত বৎসর পূর্বে ইহার গোড়া পত্তন হইলেও আজ বিংশ শতাব্দীতে কর্মকেন্দ্রিকতার দিকে এতটা ঝোঁক কেন দেখা যাইতেছে, তাহা দেখা যাইতে পারে।

ইহার প্রথম কারণ হইতেছে শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির গতি পূর্বকাল হইতে অপেক্ষাকৃত বেশী। বিজ্ঞানের বিস্ময় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে অতি দ্রুতগতিতে নাড়া দিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের এই কম্পনকে অস্বীকার করিবার আজ আর উপায় নাই। **শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয় পক্ষই আজ শিশুর চাহিদাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।** মনোবিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্য শিক্ষার গোড়াকে নাড়া দিয়া যাইতেছে। বেশী দিনের কথা নয়, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও বিদ্যালয়ে শাস্তির স্থান ছিল অমূল্য। শাস্তি ব্যতিরেকে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, ইহাই ছিল ভারতে প্রচলিত রীতি। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে আরও কিছুদিন পূর্ব হইতেই ইহার অপকারিতা স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে শাস্তি ও কঠোর শাসন শিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল, তাহাই শিক্ষাদানে বাধার সৃষ্টি করে বলিয়া বর্তমানে সকল শিক্ষাবিদ্‌দের অভিমত। তাঁহারা বলেন, শিশুর শাস্তির প্রতি ঘৃণা রূপান্তরিত হইয়া শিক্ষকে বা শিক্ষণীয় বস্তুতে যাইয়া স্থিতি লাভ করিতে পারে। কথাটা কতদূর মারাত্মক তাহা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে শিশুর শিক্ষার ধারা ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতেছে। তাহার পর বিশেষ করিয়া **ফ্রয়েড, ইয়ুঙ্গ** ও **এাডলারের** কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁহারা অচেতন মনের যে খবর আমাদের দিয়াছেন, তাহা আমাদের উপেক্ষা করিবার মোটেই উপায় নাই। মনের ⅞ **ভাগের** কোন খবরই আমরা জানি না। এই অজানা ভাবধারা যে শিশু-জীবনে কতটা ক্রিয়াশীল তাহাও আমাদের বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য।

শিশুর ভাবাবেগের মূলে যে কোন কারণ নাই এ কথা কে বলিতে পারে? অতএব মনের অচেতন অবস্থাও আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

স্লুলজার—রুশোর কাল হইতে শিক্ষাবিদ্‌গণ শিশুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিবার জন্য বিশেষ করিয়া আবেদন জানাইয়া আসিতেছেন। তাহা হইলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্তও ইহা ভালভাবে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ শিক্ষক সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছে, ফলে শিশু-পর্যবেক্ষণ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করিতে সাহায্য করিতেছে।

শিক্ষার ধারা বদলানর দ্বিতীয় কারণ সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনজনিত। যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং তাহার ফলে নানারূপ সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। শিল্পোন্নতির ফলে সহর ও সহরতলী এবং শিল্পাঞ্চলে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছে। আমাদের বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। ১৯২১ সনের আদমসুমারীতে কলিকাতা সহরে ও সহরতলীতে ১৩ লক্ষ লোকের বাস ছিল; আজ ১৯৫৪ সনে সেই লোকসংখ্যা উন্নীত হইয়া প্রায় ৭০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। জন্মের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রামাঞ্চল হইতে গ্রামবাসীরা পয়সা উপার্জনের জন্য সহরে আসিয়া ভীড় জমাইয়াছে, ইহাও অনস্বীকার্য। ফলে গ্রাম হইতে আগত শিশুর দল, শান্ত সুনিবিড় পরিবেশের বহু বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। শিশু-জীবন আজ সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত। সুবিধা যে তাহারা কোনও কোনও ক্ষেত্রে না পাইতেছে তাহা নয়; জীবনধারণের মান হইতেছে উচ্চ এবং জ্ঞান আহরণের সীমারেখাও পরিবর্ধিত। কিন্তু অসুবিধার কথা মনে হইলে তাহার বহুলতাকে মূল্য না দিয়া উপায় নাই। জীবন হইয়াছে তাহাদের জটিলতর, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত এবং শিশুরা হইয়াছে গৃহকর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। গ্রামে অবস্থানকালে প্রতি শিশু প্রতি পরিবারকেই নানাভাবে সাহায্য করিত, কিন্তু সহরে পরিবার সেই সুবিধাও সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে; সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হইতেছে যে, গ্রামে শিশুরা বয়স্কদের সংযোগে বৃদ্ধি পাইত, পিতামাতা পুত্রকন্যা একটি বিশেষ মনোবৃত্তি লইয়া সংসার-জীবন যাপন করিত, পারিবারিক ও সামাজিক

বৈশিষ্ট্যগুলি শিশুরা পিতামাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিত।

বিদ্যালয়ে কর্মের অভাব ছিল, শিশুরা সেখানে আয়ত্ত করিত পুস্তকমুখী বিদ্যা, কিন্তু গৃহে তাহারা শিক্ষালাভ করিত জীবনযাপনোপযোগী অন্যান্য আচার-ব্যবহার। কিন্তু সহরে আগমন করিবার পর তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পিতা রহিয়াছেন সহরের কর্মচক্রে সর্বদা ঘূর্ণায়মান, আর মাতার অবস্থা গৃহের আবেষ্টনীতে ততোধিক সঙ্কটাপন্ন। অতএব শিশুদের সঙ্গে পিতামাতার যোগাযোগ কোথায়? সমাজ-ব্যবস্থার এইরূপ পরিবর্তনের ফলে শিশুদের পক্ষে যে ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে, তাহা পরিপূরণ করিবার পন্থা কি? এই দ্রুত অবনতির পথ হইতে শিশুদের আজ রক্ষা করিতে পারে একমাত্র বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের কাজ শুধু পুস্তকমুখী হইলে চলিবে না। পুস্তকমুখী পাঠদান কিছুটা চলিয়াছে গ্রামে, কারণ শিশুদের ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষা পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে গৃহে। কিন্তু সহরে সেই সুবিধা থাকিবে না। গৃহের শিক্ষার অভাবের পরিপূরণ করিবার জন্যই সহরে এই সব বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। শিশুর প্রয়োজন আজ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আর উপেক্ষা করিবার উপায় নাই, সময়ও নাই। শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন আজ একান্তভাবে কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিশুর জীবন আজ কর্মের সূত্রে তাহার সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে। শিশুদের জীবনের দাবী আজ মানিতেই হইবে। Dewey বলিয়াছেন, "It is a change, a revolution, not unlike that produced by Copernicus when the astronomical centre shifted from the earth to the sun. In this case the child becomes the sun round which the appliances of education revolve."

অনির্দেশিত কাজ

কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের কর্ম সম্বন্ধে নানা রকম ভুলভ্রান্তিময় ধারণা অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কর্মের নানা রূপ ও প্রকার সম্বন্ধে বিভিন্ন

শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা গিয়াছে। শিক্ষকের কর্ম ও শিশুর কর্ম এবং দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কেও অনেক ভ্রান্তি বর্তমান। এই অবস্থায় কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে শিশুর কর্মের স্থান কোথায় এবং কর্মের স্বরূপই বা কি, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

বর্তমান শিক্ষার ধারা শিশুর কর্মচঞ্চলতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং এই স্বীকৃতির ভিত্তি হইতেছে শিশুর নিজস্ব চিন্তাধারা ও তাহার শিক্ষালাভ-সম্পর্কিত মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান। শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা অতীত হইতে বর্তমানে অনেক বেশী অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমাদের শিশুর শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, তাহার বাহিরে কোনও রূপ কিছু আরোপ করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

শিশুর কর্মকে আমরা দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া উভয়ের তাৎপর্য আলোচনা করিতে পারি। প্রথমটি হইতেছে, **শিশুর স্বয়ং-কর্ম ও দ্বিতীয়টি হইতেছে শিক্ষক বা শিক্ষিকার নির্দেশ অনুযায়ী শিশুর কর্ম**। শিশুর স্বয়ংকর্ম বলিতে আমরা সেই কর্মকেই বুঝি যাহা **শিশু স্বেচ্ছায় সম্পাদন করে, বয়স্কদের চাপ যেখানে সম্পূর্ণভাবে অবর্তমান**। অর্থাৎ শিশুর সমস্ত ব্যক্তিত্ব যেখানে কর্মের মধ্যে সমাহিত। কিন্তু শিশু যেখানে শিক্ষক বা শিক্ষিকার নির্দেশ অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে, সেখানে গোটা জিনিষটার পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষক বা শিক্ষিকাই সমস্ত কর্মসম্পাদন শিশুদের দ্বারা করাইয়া থাকেন। শিশুরা কর্ম-ব্যস্ত থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাতে প্রকৃত কর্মের পর্যায়ে ফেলা চলে না, কারণ ঐ কর্মের মধ্যে শিশুদের মন সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত নয়। মোট কথা ঐ কর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট শিশুর মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে। শিক্ষক বা শিক্ষিকার আদেশে যে কার্য সম্পাদিত হয়, সেই কর্মে শিশুর মানসিক শক্তির প্রকৃত অনুশীলন হয় না। তাহা ছাড়া শিশুর মনের মধ্যে একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়; শিশু মনে করিতে থাকে যে, আদিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাহার কর্মের কোন মূল্যই নাই। সে নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। **শিশুর কর্ম-ক্ষমতাই যে এই মনোবৃত্তির ফলে রুদ্ধ হয় তাহা নয়, শিশুর জীবনের ভারসাম্য প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়**। অথচ শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে শ্রেণীর কার্যের সময় না থাকিলে চলে না। এদিকে শিশুর

ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ, এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে শিশুর স্বয়ং-কর্মের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষাদান করা সম্ভব কিনা তাহা বিবেচ্য।

শিশু স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যে কাজ করে বা যে কাজের অবতারণা করে, তাহাই হইতেছে শিশুর পক্ষে **অনির্দেশিত কাজ**। ওদিকে যে সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষকের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন বেশী করিয়া অনুভূত হয়, সেই সব ক্ষেত্রে শিক্ষকের নির্দেশ দান এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মকে নির্দেশিত কাজ বলা হয়। সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি কর্ম 'নির্দেশিত' কর্মের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে **নির্দেশিত ও আদিষ্ট কর্মের মধ্যে যে ব্যবধান বর্তমান**, তাহা বুঝিয়া দেখিবার প্রয়োজন। শিক্ষক যখন আদেশ দিয়া **কর্মের প্রতি অংশ শিশুদের দ্বারা সম্পাদন করাইয়া লন, তাহা হইতেছে আদিষ্ট কর্ম; কিন্তু নির্দেশিত কর্মের মধ্যে এইরূপ আদেশের স্থান নাই। নির্দেশিত কর্মের মধ্যে শিশুর স্বাধীনতা একেবারে ক্ষুণ্ণ হয় না; কিন্তু আদিষ্ট কর্মের মধ্যে শিশুদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে না, শিশুরা যন্ত্রচালিতের মত শিক্ষকের আদেশ মানিয়া চলিতে শিক্ষা করে।** নির্দেশিত কর্মে শিশুদের কর্ম হয় স্বতঃস্ফূর্ত এবং শিশুরা স্বীয় কর্মে শিক্ষকের ইঙ্গিত দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া নিজেদের সৃজনী শক্তিতে সমৃদ্ধ হইতেছে বলিয়া অনুভব করিতে শিক্ষা করে। এদিকে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শিশু যদি শিক্ষকের নিকট সর্বদা কর্ম-সম্পর্কিত নির্দেশ ও আদেশ পায়, তাহা হইলে তাহার কর্মের উৎস বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু সত্যিকারের কর্মের উৎস বন্ধ হয় আদিষ্ট কর্মের মধ্যে, যেখানে শিক্ষক বা শিক্ষিকাই শিশুর কর্মের অর্ধেকের বেশী সম্পাদন করেন, নিজের পরিকল্পনা শিশুর উপর চাপাইয়া দিয়া। নির্দেশিত কর্ম ও আদিষ্ট কর্ম এক জিনিষ নয়। নির্দেশিত কর্মের মধ্যে শিক্ষকের নির্দেশ বর্তমান সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই নির্দেশের মধ্যে শিশুর সৃজনী শক্তি জাগ্রত করিবার মালমসলা রহিয়াছে। কিন্তু আদিষ্ট কর্মের মধ্যে প্রতি ধাপে নির্দেশ থাকার দরুণ শিশুর মৌলিক শক্তিও ঐরূপ আদেশের দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, তাহারও আশঙ্কা রহিয়াছে। তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, শিশুর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আদিষ্ট কর্মের কোন স্থানই একেবারে নাই। বস্তুতঃপক্ষে তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে যে, দুই প্রকার কর্ম শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসৃত হইতে পারে। প্রথম হইতেছে অনির্দেশিত কর্ম এবং দ্বিতীয় নির্দেশিত কর্ম। উভয়েরই প্রয়োজন আছে, স্তরভেদে ঐরূপ কর্মের স্থল নিরূপিত হইবে।

কিরূপ অবস্থায় ও কিরূপ ক্ষেত্রে অনির্দেশিত কর্ম চলিতে পারে, তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ৬+ এবং ৭+ বর্ষবয়স্কদের জন্য অনির্দেশিত কর্ম চলে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি শিশু কর্মচঞ্চল, সে সর্বদাই কাজ করিতে চায়। কর্মদ্বারা শুধু যে তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাহা নয়, তাহার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও নানাভাবে পরিচালনার দ্বারা কর্মপ্রবণ হয়, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, আবেগময় জীবন স্থিত হয় ও তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়। তাহাই যদি হয় তবে অনির্দেশিত কর্ম ও নির্দেশিত কর্মের মধ্যে এইরূপ বিভাগ সৃষ্টি করার তাৎপর্য কি, এই প্রশ্ন আসিতে পারে। ৬+ বৎসরে শিশু গৃহ হইতে প্রথম যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন তাহার মানসিক অবস্থা দানা বাঁধে নাই। এই অবস্থায় তাহার আবেষ্টনীর মধ্যে এত জিনিষ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন হয় যে, সে একটার পর আর একটা কাজ দ্রুত করিয়া যাইতে উন্মুখ হয়। এমন সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার সীমা-রেখার মধ্যে তাহার মানসিক উন্মুখতাকে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন নয় বলিয়াই শিক্ষকগণ এই বয়সে অনির্দেশিত কর্মের সুপারিশ করিয়াছেন। শিশুরা এই বয়সে নানাবিধ কাজ সম্বন্ধে স্বীয় প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে শিক্ষা করুক, তাহাদের দেহ ও মন কর্মে প্রবণ হউক, তাহার পরে শিশু শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

তাহা হইলে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, একটা বিশেষ বয়সের জন্য অনির্দেশিত কাজ বিশেষভাবে উপযুক্ত। কিন্তু অনির্দেশিত কর্ম শিশুর বিশেষ বয়সের উপযোগী হইলেও, তাহাকে কি ভাবে সেইরূপ কর্মে নিয়োজিত করা যায়, তাহা আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। শিশুর জন্য প্রয়োজন কর্মে স্বাধীনতা, সেই হেতু তাহাকে সমস্ত ক্ষেত্রেই পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। তাহা করিলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা বা উচ্ছৃঙ্খলতায় যাইয়া দাঁড়াইবে। তাহা হইলে শিশুর স্বাধীনভাবে কর্ম করিবার জন্য উপযুক্ত আবেষ্টনী তৈয়ারী করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সেই আবেষ্টনীর মধ্যে শিশু স্বীয় ইচ্ছামত যাহা খুশী করিতে পারে, এইরূপ স্বাধীনতা শিশুকে অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। **আবেষ্টনীর মৃদু চাপ অজানিতে যেন শিশু-মনোবৃত্তিকে সুব্যবস্থিত করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।**

অনির্দেশিত কর্মের সুপরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা শিক্ষককে করিতে হইবে।

প্রথমতঃ শ্রেণীকক্ষ থাকিবে বেশ বড়। শিশুরা যাহাতে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে, কর্মের জন্য নানা বস্তু সম্মুখে রাখিবার স্থান পায়, এইরূপ প্রচুর স্থান-সম্বলিত হইবে শ্রেণীকক্ষ। দ্বিতীয়তঃ শ্রেণীর দেওয়ালে কতকগুলি শেল্‌ফ থাকিবে, তাহাতে থাকিবে শিশুর কর্মের উপযোগী নানা জিনিষ। সেল্‌ফগুলির উচ্চতা হইবে শিশুর দৈর্ঘ্য অনুযায়ী, অর্থাৎ এমন ভাবে শেল্‌ফ-গুলিতে জিনিষপত্র সজ্জিত থাকিবে, যাহাতে শিশুরা অনায়াসে জিনিষগুলি বাহির করিতে এবং পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতে পারে। শেল্‌ফগুলির কোন ঢাকনা থাকিবে না। শিশু যেন তাহার চোখের সম্মুখে সমস্ত জিনিষগুলি স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়, সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শেল্‌ফে অবস্থিত বস্তুগুলি যেন শিশুর মনে আগ্রহ জন্মায়, এইজন্য খোলা শেল্‌ফে জিনিষগুলি রাখা প্রয়োজন। শেল্‌ফ ছাড়াও দেওয়াল ঘেঁসিয়া বা ঘরের কোণে কোন কোন জিনিষ রাখা যাইতে পারে। যে জিনিষগুলি শিশুরা নিজ নিজ কর্মের জন্য বাহির করিয়া আনিবে, সেগুলি সাধারণতঃ থাকিবে শেল্‌ফে, আর বাকী জিনিষগুলি যেগুলি অন্যত্র বহন করিয়া লইয়া যাওয়া একটু অসুবিধা-জনক, সেই জিনিষগুলি ঘরের কোণায় বা দেওয়াল ঘেঁষিয়া রাখা যায়। প্রয়োজনবোধে শিশুরা সেইস্থানে যাইয়া এই জিনিষগুলি সহযোগে খেলিতে পারে।

শ্রেণীকক্ষে শিশুদের কর্মের জন্য যে যে জিনিষ প্রয়োজন, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। **মাটি**—একতাল পরিষ্কার কাদামাটি শিশুদের জন্য শ্রেণীকক্ষে রাখা প্রয়োজন, কারণ শিশুরা কাদামাটি দ্বারা নানা রকম সৃজনাত্মক কর্ম করিতে সক্ষম।

২। **বালু**—একটা লম্বা কাঠের বড় অথচ নীচু পাত্রে কিছু বালি রাখা যাইতে পারে। কাঠের পাত্র না পাওয়া গেলে দেওয়াল ঘেঁষিয়া ইটের বেড়ের মধ্যে বালি রাখা সম্ভব। শিশুরা সেখানে যাইয়া বালু দ্বারা নানা রকম জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে শিশুরা শুক্‌নো বালিতে জল ঢালিয়া বালুর মণ্ড করিবার উপযোগী করিয়া লইতে পারে।

৩। দেওয়ালের কাছে বড় একটি টিনের নীচু টবে কিছু জল রাখা আবশ্যক। জলের সাহায্যে শিশুরা নানা প্রকার খেলা করিয়া থাকে। শিশুরা জল খুব পছন্দ করে।

৪। **কাঠের ছোট ছোট টুকরা** এই শ্রেণীর পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত। হাতুড়ি, করাত, পেরেক ইত্যাদির দ্বারা কাঠের কাজ করিতে শিশুরা বাস্তবিক খুবই ভালবাসে।

৫। **নানা রকম কাগজ, যথা—সাদা, লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি,** ইত্যাদি নানা রং-এর কাগজ শিশুদের জন্য শেল্‌ফে সজ্জিত থাকিবে। খবরের কাগজ, সেলোফেন কাগজ ইত্যাদিও শিশুদের কাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

৬। **পাতলা রঙীন কার্ড বোর্ড** শিশুদের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে, অতএব কার্ড-বোর্ডের ব্যবস্থা থাকিতেই হইবে।

৭। **তুলি রং, কাঁচি ছুরি ও ব্লেড, সূচ সূতা, চক, পেইন্ট** ইত্যাদিও শ্রেণীকাজের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

৮। **কয়েকটি ছোট ছোট বোর্ড।**

উপরের যে সমস্ত জিনিষের নাম করা হইল, তাহা ছাড়া আরও নানারকম জিনিষের প্রয়োজন। এই জিনিষগুলি বয়স্কদের নিকট মূল্যহীন হইলেও উহারা শিশুদের কাছে অমূল্য। জিনিষগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ফেলিয়া দেওয়া জিনিষ।

ছেঁড়া ছবির বই, ক্যাটালগ, রেলওয়ে টাইমটেবিল, ছেঁড়া মাসিক পত্রিকা, সূতাছাড়া সূতার রেল, ফেলিয়া দেওয়া কার্ড-বোর্ডের বাক্স—যথা জুতার বাক্স, ঔষধের বাক্স, বোতাম, তেঁতুল বীচি, দড়ি, ন্যাকড়া, পাথরের টুকরা, ভাঙ্গা ঘড়ির অংশ, ভাঙ্গা শামুক, ঝিনুক, কর্ক, ছোট ছোট পাথর, খালি ম্যাচবাক্স ও সিগারেটের বাক্স ইত্যাদি শিশুরা তাহাদের কাজে লাগাইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে যে যে জিনিষপত্রের উল্লেখ করা হইল, সেই সম্পর্কিত মূলনীতি একটু বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। যে সমস্ত বস্তু শিশুদের জন্য কিনিয়া রাখা হইবে, তাহা স্বল্প দামের হউক তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু 'গরীব দেশ, গরীব দেশ' বলিয়া তাহাদের জন্য কিছুই কেনা হইবে না, তাহা চলে না। বিনা পয়সায়, শুধু ব্যবহৃত বাজে জিনিষ দ্বারা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদান সম্ভব নয়। শিশুদের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ

জন্মাইবার জন্য নতুন জিনিষ আমদানী করিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পরের ধাপে যে-সব জিনিষের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের বাস্তবিক পক্ষে কোন দাম নাই। এইগুলি শিশুদের অত্যন্ত প্রিয় জিনিষ। শিশুদের প্রিয় এই জিনিষগুলি দ্বারা অন্যান্য বস্তুর সহযোগে শিশুদের কর্ম পরিচালনা করা সম্ভব হয়। অবশ্য, একেবারে খরচ হইবে না, এটাও যেমন সমীচীন নয়, সেইরূপ খরচও খুব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

শিশুরা স্বাধীনভাবে অনির্দেশিত কাজ কি ভাবে আরম্ভ করিবে তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। দুই রকম ভাবে কাজ আরম্ভ করা যায়। শিশুর সংখ্যার চেয়ে বেশী কাজের ইউনিট শিক্ষক বা শিক্ষিকা শ্রেণীকক্ষে সাজাইয়া রাখিয়া আসিতে পারেন। যে কাজ শিশুরা পছন্দ করিবে, সেই কাজ তাহারা করিতে সুরু করিতে পারে। আর এক রকম পন্থা হইতেছে, শ্রেণীকক্ষের শেল্‌ফে বা র‍্যাকে বা কোণায় বিভিন্ন জিনিষগুলি সাজান রহিয়াছে, শিশুরা নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী কাজগুলি বাছিয়া নিতে পারে। কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নির্দেশ না থাকিলেও, কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিশুদিগকে শিক্ষক অবহিত করিতে চেষ্টা করিতে পারেন ; যথা,—কাজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিতে এবং জিনিষপত্রাদি গুছাইয়া রাখিতে। নিজের প্রয়োজনেই ঐ সব অভ্যাস শিশুর জন্মিবে, এইরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। ভিত্তিগত জ্ঞান থাকিলেই উহাকে অন্যক্ষেত্রে প্রয়োজনে লাগাইতে শিশুরা নিজেরাই প্রেরণা বোধ করিবে। কিন্তু শিশুকে প্রথম অবস্থায়ই যেখানে কর্মে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে, সেইখানে তাহার স্বাধীনতার মধ্যে কর্তব্য কাজটুকু সম্বন্ধেও স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। তবে সেই সকল নির্দেশগুলির মধ্যে নেতিবাচক নির্দেশ না থাকাই ভাল।

প্রথম অবস্থায় অনির্দেশিত কাজে শিশুদের হয়ত বিশেষ দক্ষতা দেখিতে পাওয়া গেল না। হয়ত দেখা গেল, এক এক দলের প্রায় সমস্ত শিশুই একই কাজ করিতেছে। যদি কেহ একটি মাটির ঘোড়া বানাইল, দেখা গেল অনেকেই তাহা বানাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিংবা যদি কেহ একটি গাছ আঁকিল, সকলেই গাছ আঁকিতে আরম্ভ করিল। প্রথম অবস্থায় এইরূপ কাজ দেখিয়া হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। তাহার কারণ শিশুর জীবন বিদ্যালয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত আদিষ্ট কাজের মধ্যে অতিবাহিত

হইয়া আসিয়াছে। কাজ, খেলা, বেড়ান, খাওয়া ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই পিতামাতা-অভিভাবকের আদেশ শিশুকে অনুসরণ করিতে হইয়াছে। অতএব বিদ্যালয়ে আসিয়া এইরূপ বিভিন্ন কাজের সুযোগের মধ্যে সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে, কোন্ কাজটি সে করিবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, সৃজনাত্মক কাজ না করার দরুণ কাজের সম্ভাব্যতাগুলিও তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে না। এই অবস্থা শিশুর বেশী দিন থাকে না। হস্ত ও মস্তিষ্ক একযোগে চলিবার কালে শিশুর ভাব ও কর্মরাজ্যের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়, সে নানারূপ কাজ করিতে শিক্ষা করে। অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশু শ্রেণীকক্ষে যাইয়া কোন কাজ না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ইহা তাহার কাজ করিবার অনিচ্ছা বা অপারগতার লক্ষণ নাও হইতে পারে। সে কি করিবে, কি ভাবে করিবে, এইরূপ চিন্তাও সে চুপ করিয়া থাকিয়া করে; এই স্তরকেও কর্মের স্তর বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, তাহা না হইলে শিশুর প্রতি অবিচার করা হয়, কারণ কাজ সম্বন্ধে চিন্তা করাও কার্যেরই অঙ্গ। এইরূপ চুপ করিয়া চিন্তা করার মধ্য দিয়াই এক দিন কাজের প্রতি শিশুর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

যে সমস্ত জিনিষ শিশুদের দ্বারা এই সময়ে তৈরী হইবে, সেগুলির ব্যবস্থা কি ভাবে হইবে? প্রতিদিন এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা কাজের মধ্য দিয়া একেবারে নেহাৎ কম জিনিষ তৈরী হইবে না। শিক্ষক সেই সমস্ত জিনিষ যে শ্রেণীকক্ষেই রাখিতে পারিবেন, এইরূপ প্রচুর স্থান হয়তো শ্রেণীকক্ষে নাই। যদি থাকে তবে সেই জিনিষগুলি ঘরের একদিকে সারি করিয়া সাজাইয়া রাখিতে পারেন, শিশুরা তাহাদের জিনিষগুলি প্রয়োজন বোধে আনিয়া উহা দ্বারা খেলা করিয়া পরে আবার সেগুলি যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে পারিবে। কিন্তু সেইরূপ প্রচুর স্থান যদি শ্রেণীকক্ষে না থাকে, তবে শিক্ষক সেই জিনিষগুলি সুবিধামত অন্যত্রও রাখিতে পারেন। তবে শিশুদের নিজেদের কাজ যাচাই করিবার জন্য এবং তাহাদের মধ্যে কাজে উৎসাহ বর্ধন করিবার জন্য জিনিষগুলি প্রতি মাসে একবার বিদ্যালয়ের সকলের দেখিবার জন্য একটি ছোট প্রদর্শনীয় ব্যবস্থা করিতে পারেন। বলা বাহুল্য এইরূপ ভাবে শিশুদের কাজ অন্যদের চোখে মর্যাদা লাভ করিলে শিশুরা কাজে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিবে। প্রথম অবস্থায় শিশুদের মধ্যে কাজ না করার

যে ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট পরিবর্তন তখন লক্ষ্য করা যাইবে। তাহারা শুধু একটি জিনিষই করিতে চাহিবে না, নূতন নূতন জিনিষ তাহারা করিবে, এবং একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াও তখন কর্ম সম্পাদন করিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে 'দোকান-ঘরের কথা'। শিশুরা নিজেরাই দোকান-ঘর তৈয়ারী করিয়া তাহার বেচা-কেনা, জিনিষপত্রের আমদানী ইত্যাদি করিবে। 'দোকান-ঘরের' সঙ্গে একটি 'পুতুলের সংসার' থাকিলে প্রয়োজনের দিক হইতেই দোকানকে সমৃদ্ধ করা শিশুদের অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইবে। দোকান-ঘরে ডল-শিশুদের জন্য কাপড়-জামার অভাব হইলে শিশুরা কাপড়-জামা তৈয়ারী করিতে বসিয়া যাইবে। দোকান-ঘরে ছোট ডল-শিশুদের জন্য টানাগাড়ী থাকিলে শিশুরা নিজেরাই তাহা তৈয়ারী করিবে। ডল-পুতুলের বনভোজন হইবে, দোকানদারের বনভোজনের সমস্ত জিনিষ যোগাইতে হইবে। পক্ষান্তরে ডল-পুতুলদের অসুখ করিলে ঔষধের ব্যবস্থাও দোকান হইতেই হইবে। শিশুদের মধ্যে যদি কেহ ডাক্তার হয়, তাহা হইলে ত বেশ ভাল কথা ; রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ষ্টেথিস্কোপ চাই, ইন্‌জেকসন দিবার সমস্ত জিনিষও ত অপরিহার্য ; ডাক্তারের আবার নিজস্ব গাড়ী ছাড়া চলে না, তাহার জন্য আবার একটা খেলার গাড়ীও তৈরী করা চাই।

শিশুরা যখন অনির্দেশিত কর্মে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন দেখা যায় তাহারা এমন সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ আরম্ভ করে, যাহা বয়স্কেরা শিশুদের দ্বারা করা সম্ভব বলিয়া ভাবিতেও পারে না। বলা বাহুল্য এই শিশুদের এই সমস্ত কাজ বয়স্কদের কাজের অনুকরণমাত্র। শিশুরা অভিভাবকদের যাহা করিতে দেখে, তাহা অনুকরণ করিতে স্বাধীনভাবে সুযোগ পাইয়া তাহারা সেই ভাবধারার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে।

অনির্দেশিত স্বাধীন কাজের মধ্যে শিক্ষকের করণীয় কিছুই নাই এ কথা বলিলে ভুল বলা হয়। প্রথম কথা হইতেছে, শিশুদের স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ দেওয়া হইতেছে তাহাদের অন্তর্নিহিত কর্মের উৎসকে খুলিয়া দিয়া শিশু-জীবনকে স্থিত করিবার উদ্দেশ্যে। শিশুরা কর্মচঞ্চল, তাহারা কাজ করিবে, খেলিবে ইত্যাদি। কিন্তু প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যাহা শ্রেয় ও প্রেয় তাহাই তাহাদিগকে করিতে হইবে, তাহার সীমার বাহিরে যাওয়া চলিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, শিশু সকল সময়ে সকল

ক্ষেত্রে যে স্বীয় বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে সক্ষম হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। কোন স্থানে যাইয়া সে হয়ত অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, এমনও হইতে পারে। অতএব তাহার সেখানে সাহায্যের প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ অনেক সময় দেখা যায় শিশু শিক্ষককে তাহাদের খেলার মধ্যে অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। অতএব দেখা যাইতেছে, শিশুদের অনির্দেশিত কাজের মধ্যেও শিক্ষকের বিশেষ স্থান আছে, তাঁহাদের একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। শিশু কোন কাজ করিতেছে না এমন অবস্থা যদি হয়, তখন শিক্ষক কোন কাজটা শিশুর ভাল লাগে তাহা বাহির করিতে বিভিন্ন কার্যের ইউনিটগুলি শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া শিশুকে কার্যে উৎসাহিত করিতে পারেন। বিভিন্ন শিশুর মধ্যে যদি জিনিস লইয়া কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায়, কিংবা এক শিশু যদি অন্য শিশুর উপর বস্তু সম্পর্কে আধিপত্য বিস্তার করিতে চায়, তাহা হইলে শিশুদের বস্তুর উপর অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নে শিক্ষকের মনস্তত্ত্ব-সম্পর্কিত জ্ঞানের বিশেষ পরিচালনার প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। শিশুরা কাজ করিতে করিতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইয়া শিক্ষকের কাছে সমস্যার সমাধান জানিতে চায়; সেই ক্ষেত্রে শিশুদের সাহায্য করা শিক্ষকের একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সাহায্য করার মধ্যে তারতম্য থাকিবে, শিক্ষক স্বীয় বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কোনক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করিবেন, কোন ক্ষেত্রে বা ইঙ্গিতদ্বারা শিশুকে সাহায্য করিবেন। শিশুর প্রশ্নের উত্তর দিতেও তিনি একইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন। শিশু নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই যেন বাহির করিয়া লইতে পারে এইরূপ অবস্থায় যদি সৃষ্টি করিয়া দেন তাহা হইলেই সব চেয়ে ভাল। তাহা ছাড়া শিশুর অনির্দেশিত কাজের মধ্যে, নূতন কিছু শিশুদের দ্বারা করাইবার জন্যও শিক্ষকের প্রচেষ্টা থাকিবে। প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষভাবে তিনি নূতন আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া শিশুকে নূতন নূতন কাজে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। আরও এক ক্ষেত্রে শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন হয়। শিশু যখন কোনও কাজ করিবার সময় কোন যন্ত্রপাতি ভুলভাবে ব্যবহার করে, তখন শিক্ষকের হস্তক্ষেপ করিতেই হয়। যন্ত্রপাতি নির্ভুলভাবে ব্যবহার করিলে কাজ করা সহজ হয়, অতএব শিশুকে নির্ভুলভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে অনির্দেশিত কাজের মধ্যেও শিক্ষক সাহায্য করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, **শিশু কাজের মধ্যে যে-যন্ত্র ভুলভাবে ব্যবহার করিতেছে, তাহারই ব্যবহার শিক্ষক**

দেখাইয়া দিবেন, সাধারণভাবে যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বন্ধে নির্দেশ দিবেন না। পক্ষান্তরে শিশু যেন তাহার খেলনা বা মডেল তৈয়ারী করিতে যাইয়া বড় বড় জিনিষ তৈয়ারী করে, সেদিকেও শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন। তাহার কারণ, ছোট জিনিষ তৈয়ার করিতে যে দক্ষতার প্রয়োজন হয়, বড় জিনিষ তৈয়ারী করিতে তাহার চেয়ে কম দক্ষতার পরিচয় দিলেও চলে, অথচ একটি পূর্ণ জিনিষও তৈয়ারী হয়। শিশুরা কাজ করিয়া আনন্দিতও হয়, অথচ ছোট জিনিষ দক্ষতার সঙ্গে করিতে না পারিলে নৈরাশ্যও তাহাদের আসে না। ট্রাম, বাস, মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন, বাড়ী, বাক্স, ইত্যাদি বড় বড় করিয়া কোন রকম ভাবে তৈয়ারী করিতে হয়ত শিশুরা পারে। ঐ সকল জিনিষের বস্তুগত আকৃতির সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকিলেও শিশুরা আনন্দের সঙ্গে উহাদের গ্রহণ করিবে, কিন্তু ছোট জিনিষ তৈয়ারী করিতে যে হস্ত-চাতুর্যের প্রয়োজন হয়, তাহা ঐ শিশুদের না থাকায় উহা করিতে আরম্ভ করিলে শিশুরা তাহা করিতে পারিবে না। ফলে তাহাদের মধ্যে নৈরাশ্য আসিবে।

সকল কাজে শিশুদের সাহায্য দান করিতে হইলে শিক্ষকদের এই সকল সৃজনাত্মক কাজ সম্পর্কে নিম্নতম জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। মাটির কাজ, কিছু কাঠ ও কার্ড-বোর্ডের কাজ, অঙ্কন, খেলনা তৈয়ারী ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকদের কাজ করিবার মত জ্ঞান থাকা নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

অনির্দেশিত কাজ শিশুদের কাজ করিবার দক্ষতা অর্জন ও শরীর চালনার দিক দিয়া কতটা প্রয়োজনীয়, তাহা সংক্ষেপে পূর্বেই কিছু বলা হইয়াছে। এই কাজের সঙ্গে পড়া লেখা ও অঙ্ক কি ভাবে যুক্ত করা যায়, তাহাই বিচার্য। তবে একথা পরিষ্কার ভাবে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে, সমস্ত কাজের সঙ্গে যে লেখা পড়া ও অঙ্ককে যুক্ত করিতেই হইবে, তাহারও কোন কথা নাই। শুধু কাজ করিয়া আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যেই শিশুরা কাজ করিতে পারে। তবে বর্তমানে এইখানে শিশুদের 3 R সম্বন্ধে কতটুকু জ্ঞানলাভের সম্ভাব্যতা আছে, তাহাই শুধু বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

শিশুরা যখন দোকান-ঘর বা ডল-পুতুলের সংসার লইয়া খেলা করে, তখন তাহারা নানারকম কাজ করে। দোকান-ঘরের জিনিষগুলির লেবেল সাজান, জিনিষের দামের চার্ট তৈয়ারী, দোকানের জিনিষ মজুদ করিবার জন্য বিভিন্ন শিশুর কাছে চিঠি লেখা, ইত্যাদি কাজ ত শিশুদের লাগিয়াই আছে, তাহা ছাড়া, যে সকল শিশু এককভাবে কোন কাজ করিতেছে, তাহাদের জিনিষগুলি

অন্যের জিনিষের সঙ্গে যাহাতে মিশিয়া না যায়, তাহার জন্য জিনিষের নামের লেবেল লাগান এবং তাহার নীচে নিজের নাম লেখা ইত্যাদি ত প্রতিদিনের কাজ। তারপর প্রতিদিন শিশুরা যে যে কাজ করে তাহার একটি তালিকা তাহাদের 'খবরের' মধ্যে স্থান পায়। দোকানের খবর, ডল-পুতুলের সংসারের খবরও সেই খবরের কাগজে লিখিত থাকে। বাস ট্রেন বা এরোপ্লেন তৈয়ারী করিয়াই হয়ত অনেক শিশু ক্ষান্ত থাকে না। কোথা হইতে কোথায় ট্রেন বা বাস যায়, তাহার পরিচয়-পত্র, কার্ড-বোর্ডে টিকিটের দাম লেখা, মাইল প্লেট লেখা ইত্যাদিও শিশুরা আপনা-আপনি করিতে চেষ্টা করে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই শিশু সাধারণতঃ শিক্ষকের সাহায্য প্রার্থনা করে। যদি শিশু শিক্ষকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা নাও করে, তবুও শিক্ষকেরা সেখানে অগ্রণী হইয়া যাইয়া শিশুকে সাহায্য করিতে প্রয়াসী হইবেন। ইহার দুইটি প্রয়োজনীয় দিক আছে। প্রথম হইতেছে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। কারণ শিশু কাজ করিতে যাইয়া ভুল পথেও পরিচালিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক তাঁহার ইঙ্গিত দ্বারা শিশুর জ্ঞানলাভের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে আলোড়ন করিয়া দেখিতে সাহায্য করিতে পারেন। শিক্ষক শুধু প্রয়োজনবোধেই সাহায্য করিবেন, এবং ইঙ্গিত দ্বারা কোন কার্য হইতে কার্যান্তরে যাইবার মত পথের সন্ধানও দিবেন।

নির্দেশিত কাজ

অনির্দেশিত কাজ যখন শিশুরা করিয়াছে, তখন দেখা গিয়াছে যে, শিশুরা তাহাদের স্ব স্ব কাজ নিয়া ভয়ানক ব্যস্ত, কিন্তু ব্যস্ততার ভিতরেও দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করা গিয়াছে। প্রথমতঃ একদল শিশু কাজ হইতে কার্যান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছে, আবার কিছুক্ষণ পরেই সেই কাজ হইতে নিজেকে ছিনাইয়া আনিয়া হয়ত অন্য কোনও কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আর একদল শিশু কাজ করিয়াছে অন্যভাবে। তাহারা কর্ম হইতে কর্মান্তরে মনোনিবেশ করে নাই, বরং তাহারা একটি কাজের মধ্যেই নিজেদের নিয়োজিত রাখিয়াছে। এবং সেই কর্মকে যথাসম্ভব নানা দ্রব্যাদির দ্বারা রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বলা বাহুল্য এই দুইদল

শিশু একই প্রয়োজনের তাগিদে দুইটি বিভিন্ন রূপ ধরিয়া নিজেদের চাহিদার আবেদন জানাইতেছে। আসল কথা হইতেছে **শিশুদের কর্মরাজ্য ও ভাবরাজ্য এই দুইয়ের গতি বিভিন্ন বেগসম্পন্ন হইলেও দুইই গতিপ্রধান। ভাব কখনও কর্মকে ছাড়াইয়া যায় আবার কর্মও কখনও ভাবকে ছাড়াইয়া যায়।** কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন, কারণ অনেকেই হয়ত মনে করিতে পারেন যে, শিশু হয়ত ভাবরাজ্যে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু শিশু সেখানে তাহার কর্মকে রূপ দিতে মানুষের অসাধ্য কর্ম কি করিয়া সম্পন্ন করিবে। কাজ হয়ত মানুষের অসাধ্য, কিন্তু শিশুর পক্ষে অসাধ্য কি? শিশু হয়ত একটি ছোট পাটখড়ির টুক্‌রার দুইদিকে দুই পা রাখিয়া পাটখড়িকে পক্ষীরাজ ঘোড়া বানাইয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া গেল। অতএব **শিশুদের ভাব ও কর্মের গতি বিভিন্ন হইলেও শেষ পর্যন্ত উহারা সমান্তরাল ও সমব্যাপ্ত।** কিন্তু ক্রমে শিশুদের ভাবরাজ্যে ভাঙ্গন ধরে, কর্মের যে কোনও রূপকে কর্মের নামকরণ করিতে শিশুদের মন সায় দেয় না। তাই যখন দুইদল শিশুকে দুইভাবে চলিতে দেখা যায়, তখনই মনে হয় শিশুরা আর নিজেদের ধ্যানধারণা নিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না, তাহারা নূতন নূতন ভাবধারা দ্বারা পুষ্ট হইতে চায়। বলা বাহুল্য তাহারা যখন বস্তুতে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই, কিংবা একই বস্তুকে বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভারে সাজাইয়াছে, তখনই তাহাদের ভাবধারার দৈন্য প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষকের নির্দেশের সাহায্যে তখন তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করিতে তাহারা চাহিয়াছে। অতএব শিশুর মঙ্গলই যখন অভিপ্রেত, তখন শিক্ষকই শিশুর সমস্ত ঔৎসুক্যের খোরাক দিয়া তাহার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবার জন্য নানাভাবে প্রয়াস পাইবেন। বয়সের অনুপাতে শিশুর কর্মের একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে, যাহার বাহিরে শিশুর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়; শিশু ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার ধারণার অধীন কৃত কর্মের মধ্যেই সন্নিবেশিত থাকিতে চায়। **তাহার চিন্তাধারা সেই সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারে না, তাহার কারণ প্রথমতঃ তাহার অভিজ্ঞতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ কর্মের ধারার ইঙ্গিত না পাওয়ার ফলে কর্মের পথ তাহার কাছে রুদ্ধ। এই অবস্থায় শিক্ষক যদি কর্মে শিশুকে সাহায্য না করেন, নূতন কর্মের সন্ধান শিক্ষক শিশুকে না**

দেন, কিংবা নূতন কর্ম হইতে উপলব্ধ জ্ঞানের পূর্ণ প্রয়োগ করিয়া শিশুমনকে সমৃদ্ধ না করেন, তাহা হইলে শিশুকে কোনও ভাবে অগ্রসর করান আর সম্ভবপর হইবে না। এই কারণেই শিশুকে অনির্দেশিত কাজ করিতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশিত কাজ করিতে দেওয়ারও বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। তাহা হইলে শিশুর অনির্দেশিত কাজের ভাবধারা শিক্ষকের নির্দেশ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অভিজ্ঞতা আহরণে দানা বাঁধিবে।

তাহা হইলে শিক্ষক নির্দেশিত কর্মের ব্যবস্থা কিরূপ ভাবে করিবেন, তাহাই এখন আলোচনার বিষয়বস্তু। আমরা অনির্দেশিত কর্মের আলোচনা কালে নির্দেশিত কর্ম ও আদিষ্ট কর্মের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, আদিষ্ট কর্মের মধ্যে শিক্ষক কর্মের প্রতি ক্ষেত্রে শিশুকে আদেশ দ্বারা কর্মের সরল গতিকে শুষ্ক করিয়া দিয়াছেন, শিশুমনে সেইরূপ কর্ম আর কোনও ভাবে রেখাপাত করিতে পারে নাই। কিন্তু নির্দেশিত কর্মে শিশু শিক্ষকের নিকট হইতে ইঙ্গিত পাইয়া কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে, কর্মের পরিকল্পনা করিয়াছে, কর্মকে নূতন খাতে বহাইতে শিক্ষা করিয়াছে, পথ যেখানে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, সেখানে সে শিক্ষকের সাহায্য লাভ করিয়াছে। অতএব শিশুকে নির্দেশিত কর্মের মধ্য দিয়া পরিচালনা করিবার সময়ে শিক্ষক যদি শিশুমনকে উপযুক্ত খোরাক দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে শিক্ষকের উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

শিক্ষক কি ভাবে অগ্রসর হইবেন? তিনি প্রথম শ্রেণী হইতেই অনির্দেশিত কাজের সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশিত কাজের ব্যবস্থা করিবেন। ঐরূপ নির্দেশিত কর্ম যে পুরাপুরি প্রজেক্টের * আকার ধারণ করিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। উহা যে-কোন কর্মের রূপ ধারণ করিতে পারে, তবে ঐরূপ কর্ম শিশুদের প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত হইলে ভাল হয়। কিন্তু 'প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত'—ইহাকে একান্ত নির্দেশ হিসাবে মানিয়া না নেওয়াই ভাল, কারণ শিশুদের শিক্ষণীয় এমন অনেক জিনিষই হইতে পারে, যে সম্বন্ধে শিশুরা তখনও কোন আভ্যন্তরীণ তাগিদ অনুভব নাও করিতে পারে। সে

* প্রজেক্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই হইয়াছে।

যাহা হউক, যদি সম্ভব হয় তবেই প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত কর্মকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম সম্পাদন চলিতে পারে। ইহার সবচেয়ে বড় কারণ শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি। কিন্তু শিক্ষকের নির্দেশে যদি কোনও কর্মের ইউনিট আরম্ভ হয়, তাহা হইলে শিশুমনকে আগ্রহান্বিত করা যাইবে না, এমন কথা বলা চলে না।

সে যাহা হউক, শিক্ষক প্রথমতঃ শিশুদের নিজেদের আগ্রহ বা প্রেরণা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন। শিশুদের দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়কেই যে কর্মের ইউনিট ধরিয়া কার্যে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। **শিশুদের প্রস্তাবিত বিষয় যদি শিশুর নূতন জ্ঞান আহরণে সম্পূর্ণ সহায়ক না হয়, তাহা হইলে এইরূপ কর্মের ইউনিট পরিহার করা একান্ত কর্তব্য।** এ অবস্থায় শিক্ষক নিজেই কর্মের ইউনিট বাছিয়া দিবেন।

কর্মের ইউনিট স্থির করা

এই প্রসঙ্গে Dewey তাঁহার The School and the Child নামক পুস্তকে বলেন যে, শিশুদের কাজের ইউনিট শিশুরাই একান্তভাবে দায়িত্ব লইয়া স্থির করিতে পারে না, এবং শিক্ষকের পক্ষে শিশুদের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকাও সমীচীন নয়। শিক্ষক শ্রেণীতে কিছুকাল যাবৎ শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার পক্ষে শিশুর মনের চাহিদাকে উপলব্ধি করিয়া তাহাদের জন্য কর্মের বিষয় স্থির করা শিশুদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হওয়া ছাড়া শিশুর পক্ষে অমঙ্গলজনক কিছুতেই হইবে না।

কিন্তু বিষয় বা ইউনিট নির্ধারণ ব্যাপারে শিক্ষক যদি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া স্বীয় ইঙ্গিতকে শিশুদের মুখ দিয়াই প্রকাশ করাইতে চান, তাহা হইলে দুই কুলই রক্ষা পায়, শিক্ষকও শিশুর প্রয়োজন ও সুসম্বদ্ধ জ্ঞান বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্মের ইউনিট স্থির করিয়া লন, পক্ষান্তরে শিশুর দলও তাহাদের পরিকল্পিত কর্মের বিস্তার ও সম্পাদনা দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়। তবে কর্মের ইউনিট স্থিরীকরণে লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে শিশু সেই ইউনিটকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছে কি না তাহা লক্ষ্য করা। **শিশুরা যদি শিক্ষকের ইঙ্গিতকে নিজেদের পরিকল্পিত কাজ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়া বিস্তৃতভাবে কর্মের পরিকল্পনা করে, কর্মের বিভিন্ন দিক সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে এবং স্বীয় কর্মের সমালোচনা**

করিয়া কর্মের সুষ্ঠু সম্পাদন করে, তবেই কর্ম শিশু-জীবনকে সমৃদ্ধ করিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

শিক্ষক যেমন শিশুদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার হিসাব লইয়া সেই ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কেন্দ্র করিয়াই কর্মের ইউনিট স্থির করিবেন, সেইরূপ শিক্ষক বা শিক্ষিকা অন্য নানারূপ বিশেষ অবস্থারও সুযোগটুকু গ্রহণ করিলে শিশুর পক্ষে উহা বিশেষরূপে মঙ্গলপ্রদ হইবে। গ্রামের মেলা, কোনও রূপ আনন্দ-উৎসব, কোনও বিশিষ্ট লোকের জন্ম বা মৃত্যু-তিথি ইত্যাদি শিশুর জীবনকে যথেষ্ট ভাবে আলোড়িত করিতে পারে এবং শিশুর অভিজ্ঞতার প্রবাহও নূতন খাতে চলিতে পারে।

শিক্ষকদের আরও একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য এখানে রহিয়াছে। শিক্ষক যদি কাজের পূর্ণ নির্দেশ না দিয়া কর্ম-সম্পাদনের উপযুক্ত যথাসম্ভব সমস্ত দ্রব্যাদির ব্যবস্থা রাখিতে পারেন, তবে শিশু শিক্ষকের ইঙ্গিত দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়া সুষ্ঠুভাবে কর্ম-সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাইবে।

শ্রেণীতে কর্ম আরম্ভের পূর্বে শিক্ষক কতকগুলি কাজ করিলে শিশুদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় এবং শিশুরাও কর্মানুসরণ করিতে যাইয়া নূতন নূতন কর্মের পথের সন্ধান পায়। প্রথমতঃ শ্রেণীতে শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিবেন। শিশুদের বয়স এবং তাহাদের গ্রহণ করিবার পক্ষে উপযুক্ত মানসিক অবস্থা আছে বিবেচিত হইলে আলোচনাগুলি যে শিশুদের অগ্রগমনের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সব আলোচনা-কালে সত্যি কি হয় তাহা একবার সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। শিক্ষক যখন আলোচনা করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে শ্রেণীর অন্যান্য শিশুরা আলোচনায় যোগদান করে। অবশ্য তাহাদের বক্তব্য খুবই অপর্যাপ্ত হয় একথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শিক্ষকের আলোচনা এবং তাহার সঙ্গে কয়েকটি শিশুর অংশ গ্রহণ আলোচ্য বিষয়টিকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে এবং শিশুর আগ্রহের ও ঔৎসুক্যের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফলে কর্মের পথ শিশুদের কাছে সুগম হইয়া উঠে, যাহারা কাজ করে বা কর্ম পরিচালনা করে, তাহারাও জ্ঞান আহরণের পথকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে।

শিক্ষক আলোচনাকে নীরস জিনিষের মধ্যে কখনও সীমাবদ্ধ রাখিবেন না। শিশুর পরিবেশের রূপ-রস-মাধুর্য শিশুর নিকট আলোচনাচ্ছলে

সুন্দর করিয়া পরিবেশন করিলেই শিশুর আগ্রহকে আকর্ষণ করা সম্ভব হইবে। শিক্ষক প্রকৃতির সৌন্দর্য ও প্রকৃতির ইন্দ্রজাল বা অনির্বচনীয়তা সম্বন্ধে শিশুদের অবহিত করিবেনই, তাহা ছাড়া, তিনি শিশুদের কাছে নানা চিত্তাকর্ষক গল্প বলিতে পারেন। গল্পের গাঁথুনি যেমন করিয়া শিশু-মনে রেখাপাত করে, সেইরূপ বস্তু-বিষয়ক কথার জাল ততটা প্রভাব বিস্তার শিশুমনে করিতে পারে না। শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিয়া সেই আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে সুফলপ্রসূ করিতে পারে অধিক পরিমাণে গল্প। গল্পকে কর্মে রূপায়িত করাও শিশুদের পক্ষে হয় সহজ। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য; কথাটি হইতেছে শিশুর পক্ষে কোন বস্তুকে কর্মে রূপায়িত করা সম্পর্কে। যে জিনিষ শিশু প্রতি ধাপে ধাপে বুঝিয়া অগ্রসর হইবে, সেই কর্মকে রূপায়িত করা শিশুর পক্ষে কষ্টজনক। কিন্তু যে বিষয়ের আগাগোড়া উপলব্ধি শিশুর হইয়াছে, তাহাকে কর্মে রূপায়িত করা, দেখা গিয়াছে, অত্যন্ত সহজ। গতিপ্রধান গল্প কর্মের ক্ষেত্রে আসিয়াও দ্রুতগতি লাভ করে। সেইখানে শিক্ষকের সামান্য নির্দেশ শিশুর মনোজগতকে বিশেষভাবে আলোড়ন করিয়া দেয়, কর্ম-সম্পাদন করিবার কুশলতা, শিশুর কর্ম-জগতের কাছে যেন হার মানিতে চায়, কর্ম করিবার প্রেরণা আর কর্মের দক্ষতা এই দুইয়ের গতি তখন সমান তালে যেন চলিতে চায় না, এমনই হয় শিশুদের কর্মের গতি। কিন্তু যে নির্দেশটুকুর সাহায্যে শিশুদের কর্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই নির্দেশটুকু শিক্ষকের নিজস্ব দান, সেখানে শিশুরা মাথা খুঁড়িয়াও অনির্দেশিত কাজের দ্বারা পরিপুষ্ট হইবার পথ খুঁজিয়া পায় না। অতএব শিশুকে সাহায্য দানের প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষ স্পষ্ট ভাবেই মানিয়া লইতে হয়, না হইলে শিশুর গতি রুদ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

শিশুর পরিবেশকে কর্মে রূপায়িত করিয়া তুলিতেও শিশুকে সর্বদা দেখা গিয়া থাকে। অনির্দেশিত কর্মের ক্ষেত্রে পরিবেশ শিশুদের কর্মের অধীন হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমস্ত কর্মাধীন বিষয়গুলির মধ্যের যোগসূত্র সংস্থাপিত হয় নাই। শিশুরা কর্মের খাতিরেই কর্ম করিয়া গিয়াছে। তাহারা মাটি, বালি, জল, রং, তুলি ইত্যাদি লইয়া কাজ করিয়াছে এবং খেলিয়াছে। শিশুর দেহ-মন কর্মে নিয়োজিত হইয়াছে, মাংসপেশীগুলি কাজের মধ্য দিয়া একটা বিশেষ ছন্দ আয়ত্ত করিয়াছে, ক্ষুদ্র মাংসপেশীগুলি দক্ষতা অর্জন করিয়াছে। শিশুর

দেহ-মন কর্মের প্রবণতা অর্জন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সমগ্র বস্তুর ক্ষেত্রে তাহাদের অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়া উঠিতে সুযোগ পায় নাই। এইখানে প্রয়োজন শিক্ষকের নির্দেশ। পরিবেশের অনেক জিনিষকে ভিন্ন ভিন্ন ইউনিটে ভাগ করিয়া শিশুদের দ্বারাই কর্মের ইউনিটগুলি গ্রহণ করাইয়া তাহাদের দ্বারাই ইউনিটের কর্ম সম্পাদন করাইতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ পরিবেশের "ঘরবাড়ী", "স্কুল-বাড়ী", "বাজার" "গ্রাম" "কৃষকের বাড়া ও গোলা" ইত্যাদি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট শিশুরা গ্রহণ করিয়া উহাদের লইয়া কার্য করিয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য এই সমস্ত কর্মের ইউনিটগুলির সুষ্ঠু সম্পাদন এবং তাহা হইতে শিশুদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করাইতে পারা যায় নির্দেশিত কাজের মধ্য দিয়া। প্রতি ইউনিটের জন্য নির্দেশ দান করিয়া কর্মেরও বিভিন্ন ভাগগুলির মধ্যে যথার্থ যোগাযোগ স্থাপন করিয়া বিষয়বস্তুর সমগ্রতা সংস্থাপন করিতে পারিলেই শিশুদের অভিজ্ঞতা লাভ সহজ হইয়া আসিবে। এই ছোট ছোট ইউনিটের দু-একটি সম্পাদন করাইতে পারিলেই শিশুদের দ্বারা বৃহত্তর ক্ষেত্র আলোড়ন করিয়া দেখা সম্ভব হইবে। ভিত্তি শক্ত হইলে তাহার উপর যে-কোন কাঠামো গড়িয়া তোলা যায়। গ্রামের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই শিশুরা গ্রামের সংযোজক রাস্তাগুলি গ্রামের বাহিরের জগতের সঙ্গে কি ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহা আয়ত্ত করিতে অগ্রসর হইতে পারিবে, কিন্তু গ্রামই যদি শিশুর কাছে অপরিচিত থাকিয়া যায় তাহা হইলে শিশু কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া কর্ম করিবে? শিশু-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যদি শিশুর কর্মের বিভিন্ন ব্যবস্থা করা যায়, শিশুকে যদি স্তরে স্তরে নির্দেশিত কাজের মারফত পরিচালনা করা যায়, তাহা হইলে শিশুর কর্মদক্ষতা ও তাহার মানসিক কর্ম-রাজ্য উভয়ের সীমাই পরিবর্ধিত হইয়া চলিতে বাধ্য।

স্বয়ং-কর্মের উদ্দেশ্যে শিশুদের আগ্রহ বৃদ্ধিকরণের জন্য শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করিবেন, শিশুদের কাছে গল্প বলিবেন এবং পরিবেশের বাহিরে যাহা কিছু নূতন ও জানিবার উপযুক্ত বস্তু আছে, সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি শিশুদের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি ইত্যাদি শিক্ষক করাইবেন। এইরূপ প্রচেষ্টার ফলেই শিক্ষক শিশুদের সমস্ত কর্মগুলিকে উপযুক্ত খাতে প্রবাহিত করিয়া শিশুদিগকে নূতন নূতন জ্ঞানের অধিকারী করিতে পারিবেন এবং শিশু-জীবনকে সহজ ও সরল করিতে সক্ষম হইবেন। পূর্বে শিশুদের যে সমস্ত

খেলাগুলি ছিল Make believe, সেইগুলিই এখন বাস্তবের ক্ষেত্রে রূপ নিতে ধীরে ধীরে চেষ্টা করিবে।

শিশুদের মনে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জন্মান সম্পর্কে শিক্ষকের প্রতি একটু সাবধান-বাণী এই ক্ষেত্রে উচ্চারণ করা যাইতে পারে। শিক্ষক শিশুদের আগ্রহ বৃদ্ধি করিবার মত দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন একথা ধরিয়া লওয়া হইল। কিন্তু এই দক্ষতা প্রয়োগ ক্ষেত্র-বিশেষে হ্রাস-বৃদ্ধি পাইবে, ইহাও জানা শিক্ষকবর্গের আবশ্যক। **যখনই দেখা যাইবে যে শিক্ষকের ইঙ্গিতে শিশু সঠিকভাবে কর্মের ধারা অবলম্বন করিয়া যাইতেছে, তখনই শিক্ষক সক্রিয় সাহায্য হইতে বিরত হইবেন।** শিশুকে বেশী সাহায্য করিলে আপাতদৃষ্টিতে কর্ম অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইলেও, শিশু তাহার নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দেয় এবং শিশুর সৃজনী-প্রবণতা নষ্ট হইয়া যাইতে আরম্ভ করে। এই সম্পর্কে কর্মের ইউনিট স্থির করিয়া দেওয়া সম্পর্কে সামান্য আলোচনা পুনরায় করা যাইতেছে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, শিশুরা অনুভূত প্রয়োজন হইতে কর্মের ইউনিট স্থির করিতে চাহিলেও, সেই কর্মের ইউনিট শিশুদের দেহ, বয়স ও মনের পক্ষে উপযুক্ত নাও হইতে পারে, সেইজন্য শিশুর সুসমঞ্জস জ্ঞান বৃদ্ধি ও সমগ্র বৃদ্ধির জন্য কর্মের ইউনিট শিক্ষকই যদি স্থির করিয়া দেন তবে ভাল হয়। কথাটা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কর্মের ইউনিট অনুসরণ করিতে যাইয়া যদি শিশুরা সেই ইউনিটের সমান্তরাল আরও একটি ইউনিটকে পছন্দ করিয়া উহা করিতে আগ্রহান্বিত বোধ করে, তাহা হইলে শিক্ষক সেই স্থানে কি করিবেন? এখানে একটি উদাহরণ দিয়া জিনিষটি বুঝাইতে চেষ্টা করা হইতেছে।

তৃতীয় শ্রেণীর শিশুরা একটি 'বাস' প্রজেক্ট করিবে স্থির করিয়াছে। 'বাসের' রাস্তা শিশুদের বিদ্যালয়ের ঠিক সম্মুখভাগে। আর স্কুলের পিছন দিকে রেলের লাইন। শিশুদের পরিবেশে ও তাহাদের চলাচলের সীমার মধ্যেই রেললাইন ও বাসের রাস্তা উভয় উভয়কে ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শিশু 'বাস' দেখে এবং রেললাইন ও রেলগাড়ীও প্রতিদিন দেখিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় যদি শিশুরা বাসের রাস্তা তৈয়ারী করিতে যাইয়া রেলের লেভেল-ক্রসিং তৈয়ারী করে এবং পরে 'রেল প্রজেক্ট' করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে ও বাস প্রজেক্ট করিতে মোটেই আর উৎসাহ

বোধ না করে, তাহা হইলে কি করা যাইবে? শিক্ষক তাঁহার পূর্ব সিদ্ধান্ত স্থির রাখিবেন, না শিশুর আপাত আগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া প্রজেক্টটি পরিবর্তন করিয়া দিবেন? 'বাস প্রজেক্ট' পরিবর্তন করিলে শিক্ষক যে উদ্দেশ্য লইয়া জ্ঞানদানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বরবাদ হইয়া যায়, কিন্তু ইউনিটের পরিবর্তন করিলে তিনি পাইতেছেন শিশুদের সহযোগিতা, মনোযোগ, আগ্রহ ও ঔৎসুক্য। এদিকে নূতন ইউনিটে শিশুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং তাহার সম্ভাব্যতা বাস প্রজেক্ট হইতে কোন অংশেই কম নয়। কিন্তু যদি শিশুরা বাস প্রজেক্ট আরম্ভ করিয়া এমন একটি ইউনিটের দাবী জানাইত, যাহার শিক্ষামূলক সম্ভাব্যতা একেবারে নাই, সেই ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুদের ইউনিট পরিত্যাগ করিতে নানারূপ পন্থা অবলম্বন করিতে নিশ্চয়ই সচেষ্ট হইবেন।

বিভিন্ন প্রকার নির্দেশিত কাজ

অনির্দেশিত এবং নির্দেশিত কর্মের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য নিম্নে কয়েক জাতীয় কর্মের উদাহরণ দেওয়া হইল। এই দুই প্রকার কর্মের মধ্যে মূল পার্থক্য বুঝিতে পারিলেই কর্মগুলির রূপ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। সাধারণতঃ যে কাজ শিশুদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত, যে কাজের জন্য শিশু শিক্ষকের কাছে সাহায্যের জন্য কোনরূপ আবেদন জানায় না এবং যে কাজ শিশু অন্তর্নিহিত প্রেরণাবোধ হইতেই সম্পাদন করিতে আরম্ভ করে, সেই কাজই প্রকৃতপক্ষে অনির্দেশিত কাজ। এই প্রসঙ্গে শিশুর কর্ম করিবার স্তর সম্বন্ধেও আলোচনা করা যাইতে পারে। অনির্দেশিত কাজে শিশু সর্বদা কাজগুলিকে নির্দিষ্ট সুসম্বন্ধ ধারা অনুযায়ী সম্পন্ন করে না, সে কাজগুলিকে যে ভাবে পারে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী শেষ করিতে চেষ্টা করে। শিশুর শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি করিবার মত কাজের ধারার ইঙ্গিত বা সেই সম্পর্কিত নির্দেশ সেখানে থাকে না। মোট কথা অনির্দেশিত কাজে শিশুর কর্মের কুশলতা বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু সামগ্রিক বৃদ্ধি তাহার হইতে চায় না। অনির্দেশিত কাজেও শিক্ষকের ইঙ্গিত থাকে বটে, কিন্তু সেই ইঙ্গিত শিশুর কর্মের ধারাকে অবলম্বন করিয়াই হয়। তাহার ফলে শিশুর যে বিকাশ হয় তাহা তাহার কর্মকুশলতাকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু নির্দেশিত কর্মের মধ্যে শিক্ষক শিশুর অভিজ্ঞতার গণ্ডীকে বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই শিশুকে কর্মের

ইঙ্গিত দেন। শিক্ষকের ইঙ্গিতের ফলেই শিশু কর্মের পরিধিকে বৃদ্ধি করে, ফলে শিশুর নূতন অভিজ্ঞতা নানাভাবে হইতে থাকে। নূতন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুর চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং নূতন কাজ গ্রহণ করিবার মত তাহার মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে। অতএব শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পক্ষে নির্দেশিত কাজের প্রভাব বেশী, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু অনির্দেশিত কাজেরও যে প্রয়োজন আছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুইয়ের প্রয়োজন দুই স্তরে। সে যাহা হউক, পূর্বেই এই দুই রকম কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং অনির্দেশিত কাজ প্রথম শ্রেণীর জন্যই খুব উপযুক্ত বলিয়া সেখানে মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে একটি সাজান দোকান-ঘর প্রায় প্রতি বিদ্যালয়েই রাখা হয়। এই সাজান দোকান-ঘরটি সম্পর্কিত যে কাজ, সে কাজ সাধারণতঃ অনির্দেশিত কাজের পর্যায়েই হইয়া থাকে। তবে প্রত্যেক কাজের দুইটি দিক সর্বদাই থাকে, একটি বিষয়-সম্পর্কিত, অপরটি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিক। অনির্দেশিত কাজের বিভিন্ন বিষয়-সম্পর্কিত বিকাশের পরিধি কম। এদিকে শিশুর ব্যক্তিত্বের-বিকাশের দিকে শিক্ষকের নির্দেশ দানের প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়, কারণ, অনির্দেশিত কাজের মধ্যে কাজের নিপুণতা-সম্পর্কিত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি অসামাজিক মনোবৃত্তি দেখা যায়, তবে শিক্ষকের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হয় না। অনেক সময় শিক্ষকের ইঙ্গিতও কার্যকরী হয় না, তখন শিক্ষকের নির্দেশের প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। অতএব দেখা যাইতেছে, নির্দেশিত কাজ ও অনির্দেশিত কাজের মধ্যে প্রথম অবস্থায় একটা সীমারেখা টানা একরূপ অসম্ভব।

প্রথম অবস্থায় দোকানের জিনিষ থাকে কল্পনাপ্রসূত। একটি ঠোঙ্গার ভিতর বালি রাখিয়া তাহা বন্ধ করিয়া চিনির প্যাকেট বলিয়া দোকানে সাজাইয়া রাখা হয়। শিশুরা ঐরূপ জিনিষ লইয়া বেচা-কেনা খেলিতে দ্বিধা বোধ করে না, কিন্তু কিছুদিন পরে শিশুদের পরিপক্কতা আরও বৃদ্ধি পাইলে ঐরূপ অবাস্তব ও অপ্রাকৃত জিনিষ লইয়া খেলা করিতে শিশুরা মোটেই আনন্দ পায় না, তখন তাহারা চায় প্রকৃত ও বাস্তব জিনিষ। এই সময়ে শিশুদের নির্দেশ দান শিক্ষকের পক্ষ হইতে একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

খেলনার দোকান—খেলনার দোকান শিশুদের কাছে অতিশয় প্রিয়। শিশুরা নানারকম বাক্স এবং ফেলিয়া দেওয়া জিনিষ হইতে খেলনা প্রস্তুত করে,

কিন্তু শিক্ষককে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে হয়। শিশু চায় তাহাদের তৈয়ারী জিনিষ বিক্রয় হউক, এই অবস্থায় শিক্ষকের সাহায্য দান অতীব প্রয়োজনীয়। বলা বাহুল্য, শিশুরা শিক্ষক হইতে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়। শুধু তাহাই নয়, শিক্ষক উপযুক্ত বিবেচনা করিলে শুধু ইঙ্গিত দ্বারা শিশুদিগকে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়া পরিচালনা করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

ফেরি করিয়া বিক্রী—অনেক শিশু তাহাদের তৈয়ারী জিনিষ ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতে ভালবাসিবে। এইখানে শিশুরা নিজেদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কিছুটা কাজ করিতে পারিলেও, এখানেও দেখা যায় শিক্ষক শিশুকে কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়া থাকেন। শিক্ষকের নির্দেশ ও সাহায্য শিশু-ফেরিওয়ালাকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সাহায্য করে।

সিনেমা—বায়োস্কোপের ছবি দেখান, বর্তমানে সহর ও সহরতলীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের একটি নির্দেশিত কর্মের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে শিশুরাই সিনেমা খেলার প্রশ্ন উত্থাপন করে। শিক্ষক এই ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়া শিশুদের দ্বারা সিনেমার বাক্স তৈয়ারী করান। শিশুদের তৈয়ারী ছবিগুলিকে একত্র করিয়া হয় ফিল্ম। তখন সেই ছবিগুলিকে পরপর আঠা দিয়া লাগাইয়া সিনেমার বাক্সের দুই দিকে দুইটি কাঠের 'রোলের' মধ্যে আটকাইয়া দেওয়া হয়। একটি 'রোল' গুটাইলেই অন্য রোল হইতে ছবি খুলিয়া আসিয়া দর্শকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। শিশুর দলকে সেই ছবিগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে শিখাইয়া দেওয়া হয়। শিশুরা পৃথকভাবে সিনেমার ছবি গুটানর সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়া যায়। বলা বাহুল্য, শিশুদের নানারূপ বিকাশ এইরূপ খেলার সাহায্যে হইয়া থাকে।

পুতুল নাচ—পুতুল নাচ শিশুদের একটি প্রিয় খেলা। এই খেলায়ও শিক্ষকের সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। পুতুল নাচ দুই রকমের হইয়া থাকে। একরকম—সুতার সাহায্যে পুতুলের উপরের দিকের সঙ্গে বাঁধিয়া তারপর সুতা টানিয়া পুতুলদের পরিচালিত করা হয়, আর দ্বিতীয় প্রকার—পুতুলের পায়ের দিকে ধরিয়া পুতুলকে চালনা করা হয়। পুতুল নাচের ভিতরও একটি কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ষ্টেজের বন্দোবস্ত করা হয়, আর উভয় ক্ষেত্রেই উপরে ও নীচে কালো পর্দা থাকে, যাহাতে পুতুল পরিচালনা বাহির হইতে বুঝিতে পারা না যায়। শিশুরা পুতুল নাচের খেলা শিক্ষকদের সাহায্যেই

পরিচালনা করিয়া থাকে। এইরূপ খেলায় পুতুলদের কথাগুলি শিশুরা পর্দার আড়াল হইতে বলিয়া দেয়, অর্থাৎ পুতুলের চরিত্রের অভিনয় হইয়া থাকে। শিশুরা এইরূপ খেলায় বিশেষ আনন্দ বোধ করিয়া থাকে। শুধু আনন্দই নয়, শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এই সমস্ত খেলার মধ্য দিয়া হইতে থাকে।

বাড়ী—বাড়ী তৈয়ারী শিশুরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করে। প্রথম অবস্থায় এইরূপ বাড়ী তৈয়ারীতে কোনরূপ নির্দেশের প্রয়োজন হয় না, শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, কোন খালি কাঠের বাক্স পাইলেই তাহাকে বাড়ীতে পরিণত করিয়া ফেলে। কিন্তু একটু ভালভাবে বাড়ী তৈয়ারী করিতে হইলে শিক্ষকের নির্দেশের প্রয়োজন হয়।

গ্রাম ও সহর তৈয়ারী—বাড়ী তৈয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুরা গ্রাম ও সহর তৈয়ারীর পরিকল্পনা করিতে আরম্ভ করে। সহরের ভিতর শিশুরা দোকানপাট, স্কুল, সিনেমা, পাহাড়, নদী, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপন করে। এইরূপ কাজ শিশুরা অনির্দেশিত অবস্থায় সম্পন্ন করিতে পারে না। প্রয়োজন হয় শিক্ষকের নির্দেশ। শিশুরা যখন কিছুটা অগ্রসর হয় তখনই শিক্ষক নানারূপ ইঙ্গিত দ্বারা আপনার অভিরুচি অনুযায়ী এবং শিশুদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় এইরূপ ভাবে কাজের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

বাজার—শিশুরা বাজার তৈয়ারী করিতে ভালবাসে। তাহারা নিজেরাই বাড়ীর প্রয়োজনে হাট কিংবা বাজার করিতে যায় এবং বাজার বা হাটের বিচিত্র আবেষ্টনী শিশুমনকে যথেষ্ট আকর্ষণ করে। শিশুরা ছোট ছোট দোকান-ঘর তৈয়ারী করিয়া বিভিন্ন জিনিষের আড়ত স্থাপন করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করে। এই কাজে শিক্ষকের নির্দেশ বিশেষ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়।

পোষ্টাফিস, রেল-ষ্টেশন, ট্রেন, বাস, ইট কাটা, গোলাবাড়ী, রান্না ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া শিশুরা কাজ করিতে অত্যন্ত আনন্দ পায়। বলা বাহুল্য এই কাজগুলি করিতে উচ্চ শ্রেণীর শিশুরাই দক্ষতা দেখাইবে। এই সকল কাজের মারফত শিশুরা বহু বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে সক্ষম হয়। এই সমস্ত কাজগুলিও নির্দেশিত কাজের অন্তর্গত। অনির্দেশিত কাজ হিসাবে শিশুরা কাজ আরম্ভ করিলে প্রকৃতপক্ষে শিশুরা বেশী দূর কাজে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে খেলা করে, নাচে, গান গায়, অভিনয় করে, ইহা সকলই অনির্দেশিত কাজের অন্তর্গত। কিন্তু এই খেলা, নাচ, গান,

ছন্দানুভঙ্গী, অভিনয়ই পরে নির্দেশিত কাজের অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক বিষয়েরই পরিধি বাড়ে, জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং শিশু সেই জটিলতার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া যদি শিক্ষালাভ করিতে চায়, তবেই শিক্ষকের সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময় ছোট ছোট শিশুকে দেখা যায়, সে শুনিয়া শুনিয়া একটি গানের কলি সুন্দর ভাবে গাহিতে পারে বা বড়দের নাচিতে দেখিয়া সে নাচিতেও পারে। কিন্তু সে সেইখানেই স্থিত হইয়া থাকিবে যদি তাহাকে নির্দেশ দিয়া অগ্রসর করিয়া লওয়া না হয়। খেলা ও অভিনয় ক্ষেত্রেও তাই। শিশুরা আপনা-আপনি খেলে, পর্দা টানিয়া অভিনয়ও করে, কিন্তু তাহাদিগকে যদি ভালভাবে নির্দেশ দানের বন্দোবস্ত না করা যায়—তাহা হইলে তাহারা খেলা বা অভিনয় কোনদিকেই পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে না।

শিল্প কাজ নির্দেশিত কাজের অন্তর্গত। শিল্পকাজ শিক্ষায় কতকগুলি স্তর আছে, সেই স্তরগুলি সম্পর্কে শিক্ষক যদি নির্দেশ না দেন তাহা হইলে শিল্প-শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না।

হাতের অন্যান্য কাজে শিক্ষকের নির্দেশ ততটা না থাকিলেও ক্ষতি নাই। হাতের কাজ ও শিল্প কাজের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। শিল্প কাজের প্রতি স্তর শিক্ষা না করিলে শিল্পকাজ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু হাতের কাজে, যাহাকে ইংরাজিতে Hand work বলা হয় তাহাতে, শিক্ষার কোন স্তর নাই, শুধু হস্তের নিপুণতার উপর কাজের সাফল্য নির্ভর করে।

কর্ম (Activity) এবং কার্য-সমস্যার (Project) মধ্যে পার্থক্য

'কর্মকে' এই পরিচ্ছেদেই চুলচেরা-বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে। 'কর্ম' শব্দটির অর্থ বিশেষভাবে ব্যাপক এবং ইহার অধীন আদিষ্ট কর্ম, অনির্দেশিত কর্ম ও নির্দেশিত কর্ম, সকলই রহিয়াছে, এবং ফলে কার্য-সমস্যাও উহার অধীনে আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু কার্য-সমস্যা বা প্রজেক্টে একটি বিশেষ নীতি অনুসৃত হইয়া কর্মের ধারা স্থির করা হয় বলিয়া উহাকে 'কর্ম' হইতে আলাদা করিয়া বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে।

'কর্ম' ব্যাপক অর্থে সকল প্রকার কর্মকেই জড়াইয়া আছে, কিন্তু ইহাকে যদি 'প্রজেক্ট' হইতে আলাদা করিয়া লওয়া যায় তখন 'কর্ম' বলিতে কতকগুলি ছোট ছোট কর্মের ইউনিটকেই বোঝায়, যাহার ভিতর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সমস্তই রহিয়াছে, কিন্তু উহার সমস্ত কিছুই শিক্ষকের আদিষ্ট বা নির্দেশিত বা

সম্পূর্ণভাবেই অনির্দেশিত। কিন্তু প্রজেক্টের ক্ষেত্রে শিশুরা তাহাদের গৃহে ও বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রার মধ্যে এমন একটি আগ্রহ-কেন্দ্র খুঁজিয়া পায়, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া শিশুরাই তাহাদের কর্মের পরিকল্পনা করিয়া থাকে।

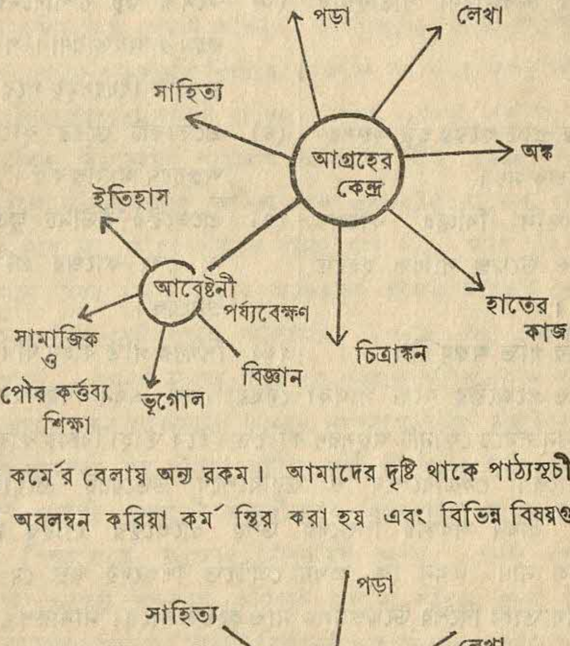
প্রজেক্ট-পদ্ধতি অনুযায়ী কার্য করিতে গেলে চারিটি স্তরে কার্য সম্পন্ন করিতে হয় ; যথা,—**কাজের ইউনিট স্থির করা, পরিকল্পনা করা, কার্য সম্পাদন করা ও বিচার করা**। যে কোন প্রজেক্টের মধ্যে এই চারিটি ব্যবস্থাপনা থাকিবেই। **যে কাজের মধ্যে এই চারিটি ব্যবস্থার অভাব আছে, তাহাকে প্রজেক্ট পর্যায়ভুক্ত করা চলিতে পারে না।** প্রজেক্ট পরিচালনার দায়িত্ব হইতেছে শিশুদের, তবে তাহারা শিক্ষকের নিকট হইতে কাজের নির্দেশ লইতে পারিবে। কর্মের বেলায় প্রজেক্টের মত কর্মের স্তরের কোন কড়াকড়ি নাই। 'কর্ম' যে কোনও ভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। **আদিষ্ট কর্মে** শিক্ষকের আদেশ ও নির্দেশ কর্মের প্রতি অংশে জড়িত থাকে, **অনির্দেশিত কর্মে** শিক্ষকের নির্দেশ নাই বলিলেও চলে, শিশুরা ইচ্ছামত কাজ করে, আর **নির্দেশিত কর্মে** শিশুরা শিক্ষকের নিকট হইতে প্রয়োজন-বোধে কর্মের ইঙ্গিত পাইয়া থাকে। কিন্তু প্রজেক্টের শিশুরা নিজেরাই কাজের ইউনিট স্থির করা হইতে **প্রতিস্তরের কাজ** শিক্ষকের সহযোগিতায় সম্পন্ন করিয়া যায়।

সাধারণ কর্মের সঙ্গে প্রজেক্টের ব্যবধান কাজের সময়ে বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে না। কিন্তু একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে ব্যবধানটা স্পষ্ট হইয়া আসিবে। 'কর্মের' বেলায় শিশুকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষক কতকগুলি কাজের ব্যবস্থা করেন। শিশুদের জন্য পাঠ্য-সূচী পূর্বাহ্ণেই নির্ধারিত থাকে, শিক্ষক সেই পাঠ্যসূচী সম্পর্কিত ব্যবহারিক জ্ঞানদানের জন্য কতকগুলি কর্মের ইউনিট স্থির করিয়া দেন। সেই কর্মগুলি সমস্তই পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র করিয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু প্রজেক্টের বেলায় শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া শিশুর পাঠ্যসূচী যতটা সম্ভব শেষ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ 'কর্মের' বেলায় শিক্ষক যখন পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র করিয়া কর্মের ব্যবস্থা করেন, তখন অনেক ক্ষেত্রেই সেই কর্মের ইউনিট শিক্ষক যান্ত্রিক ভাবে স্থির করেন, অর্থাৎ শিক্ষক যদি ইঙ্গিত দ্বারা শিশুর আগ্রহের উদ্রেক না করাইতে পারেন, তাহা হইলে নূতন শিক্ষার সবচেয়ে বড় কথা অর্থাৎ **শিশুর আগ্রহ ও প্রয়োজন** উপেক্ষিত হয়। প্রজেক্টের বেলায় তা হয় না, কারণ শিশুরা শিক্ষকের সঙ্গে

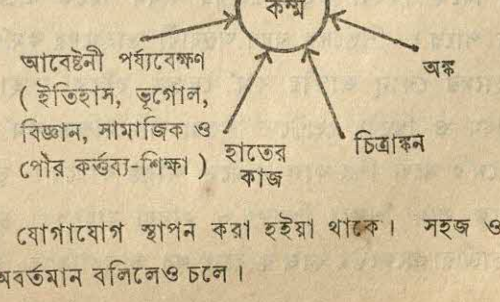
সহযোগিতা করিয়া 'সমস্তা' অর্থাৎ কর্মের ইউনিট স্থির করে। অর্থাৎ শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহ তুই-ই যথোপযুক্ত মর্যাদা পাইয়া থাকে।

নিম্নে তুইটি ছক দেওয়া গেল, এই ছক তুইটি হইতেই তুইটি শিক্ষার ধারা যথেষ্ট ভাবে পরিস্ফুট হইবে।

প্রজেক্টের বেলায় আগ্রহের কেন্দ্র হইতে অতি সহজভাবে অন্যান্য বিষয়ের উদ্ভব হয়, এবং শিশুরা প্রয়োজনের খাতিরেই সেই সমস্ত বিষয় শিখিয়া ফেলিতে আগ্রহ বোধ করে।



কিন্তু কর্মের বেলায় অন্য রকম। আমাদের দৃষ্টি থাকে পাঠ্যসূচীর দিকে। পাঠ্যসূচী অবলম্বন করিয়া কর্ম স্থির করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়গুলির সঙ্গে



কর্মের কৃত্রিম যোগাযোগ স্থাপন করা হইয়া থাকে। সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত-ভাব সেখানে অবর্তমান বলিলেও চলে।

কর্ম ও প্রজেক্টের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা নিম্নে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

কর্ম	প্রজেক্ট
(১) শিশুরা হাতে-কলমে কাজ করে। কিন্তু দায়িত্ব হইতেছে শিক্ষকের।	(১) শিশুরা নিজেরাই সব কাজ করে, দায়িত্ব তাহাদেরই।
(২) জ্ঞান মুখ্য, কর্ম গৌণ।	(২) কর্ম মুখ্য, কর্মকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞান আহরিত হয়।
(৩) কর্মের অবতারণা পাঠ্যসূচীর জন্য।	(৩) কর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্যই কর্মের অবতারণা। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়সমূহ পরে আসে।
(৪) কর্মের প্রতি স্তরের সুষ্ঠু অনুসরণ আবশ্যিক নয়।	(৪) প্রত্যেকটি স্তরের কাজের সুষ্ঠু অনুসরণ আবশ্যিক।
(৫) কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কাজের দ্বারাও উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।	(৫) প্রজেক্টের ইউনিট ক্ষুদ্র থাকে না এবং কাজের প্রতি অংশ সুসংবদ্ধ।
(৬) শিক্ষার গতি অন্তর্মুখী।	(৬) শিক্ষার গতি বহির্মুখী।

কর্ম ও প্রজেক্টের মধ্যে পার্থক্য দেওয়া গেল, এখন বিদ্যালয়ে শ্রেণীর কাজে কোন্ সময়ে কোন্‌টি অনুসরণ করিতে হইবে তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে ও স্তরবিশেষে উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। প্রথম অবস্থায় শিশুদের উপর প্রজেক্টের দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া চলে না। এমন কি, প্রথম শ্রেণীতে শিশুদের জন্য যে কর্মের ব্যবস্থা হইবে তাহা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক নাও হইতে পারে। নানারূপ ছোটখাট অনির্দেশিত ও নির্দেশিত কর্মের মধ্য দিয়া শিশুমন প্রস্তুত হইলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষ দিকে কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম দিকে প্রজেক্টের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। শিশুদের বয়স অনুযায়ী তাহাদের কর্মক্ষমতা বিচার করিয়া তাহাদের কোন্ জাতীয় কর্ম দেওয়া হইবে তাহা স্থির করা হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুরা অনির্দেশিত কর্ম করিবে এবং নির্দেশিত কর্মের মধ্যে শিল্প-কাজ করিতে আরম্ভ করিবে। তৃতীয় শ্রেণীতে প্রজেক্টের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা শিল্পকর্মও করিয়া যাইবে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা প্রজেক্টের কাজ করিতে খুব ভালবাসিবে; কারণ দায়িত্ব

লইয়া কর্ম করিবার মত বয়স তাহাদের এই সময়ে হইয়াছে। এই সময়ে শিল্পকর্মও তাহাদের চলিবে; অনির্দেশিত ও নির্দেশিত কর্মের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা প্রতি শ্রেণীতে নাচ-গান খেলাধূলা নাটকাভিনয় ইত্যাদি করিবে। **চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে নাটকাভিনয় প্রজেক্টের ধারা অবলম্বন করিয়া হইতে পারিবে।**

অনেক শিক্ষাবিদ্ উচ্চ শ্রেণীতে প্রজেক্ট পদ্ধতি অচল বলিয়া মনে করেন। প্রজেক্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে, এ-বিষয়ে তাঁহারা অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করেন না, কিন্তু শ্রেণীর নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শেষ হইবে না বলিয়া মত পোষণ করেন। তাহা ছাড়া বিভিন্ন প্রজেক্ট অনুসরণ করিলেও সেখানে কতকগুলি বিষয়ের পুনরুক্তি হয় মাত্র, নূতন জ্ঞান দেওয়া চলে না বলিয়া তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কিন্তু একথা একান্ত সত্য নয়। যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচনা জীবনকে কেন্দ্র করিয়া হয় তাহা হইলে জীবনকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাকে প্রজেক্টের মারফত কেন শিক্ষা দেওয়া চলিবে না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আর যদি পাঠ্যক্রমে এমন কোন বিষয় থাকে যাহার অভিজ্ঞতা প্রজেক্ট মারফত দেওয়া চলে না, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করা চলিতে পারে। এমনও হইতে পারে যে, অন্যান্য আবেষ্টনীগত অভিজ্ঞতার ফলে সে সম্বন্ধে নূতন অভিজ্ঞতা তাহার আপনাআপনিই জন্মাইবে। তাহা ছাড়া যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই ফাঁকগুলি পূরণ করিবার জন্য অবরোহণ প্রণালী অনুযায়ী মামুলীভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে যে-কোন গোঁড়ামিই অচল। প্রতি ক্ষেত্রেই যে কর্ম কিংবা প্রজেক্ট অনুসরণ করিয়াই চলিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই। প্রয়োজন অনুযায়ী মামুলী শিক্ষারও সাহায্য লইতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্যা পদ্ধতি (Problem Method)

যদিও কার্য-সমস্যা পদ্ধতি (Project Method) এবং সমস্যা পদ্ধতি (Problem Method) এই দুইয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে, তবুও ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। কার্য-সমস্যাপদ্ধতিতে (Project Method) বাস্তব অবস্থায় একটি কার্যকরী সমাধানের কথা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সমস্যা পদ্ধতিতে (Problem Method-এ) মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমস্যার সমাধান হইয়া থাকে। সমস্যা পদ্ধতিতে শ্রেণীতে হাতে কলমের কাজের কিছু প্রয়োজন হয় না। সংক্ষিপ্ত আকারে বলিলে বলা যায় যে কার্য-সমস্যা পদ্ধতিতে মানসিক ও শারীরিক কর্মাদি একটি কার্যে সমস্যার সমাধান করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে সমস্যা পদ্ধতিতে শুধু মানসিক উপায়ে সমস্যার সমাধান হইলেই যথেষ্ট।

সমস্যা পদ্ধতি ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানে খুবই কার্যকরী। এই দুইটি বিষয়ে শিক্ষাদানে যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুব প্রয়োজন এবং সমস্যা পদ্ধতি যুক্তি ক্ষমতা বর্ধনে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

নানা রকম সমস্যা দেখা যাইতে পারে। এমন অনেক সমস্যা আছে যে গুলির সমাধান একেবারেই হয় নাই। ছাত্রছাত্রীরাই সেই সমস্যার সমাধানের পথে অগ্রসর হইবে। আর এক প্রকার সমস্যা আছে, যে সমস্যার সমাধান পুস্তকের নানা রকম যুক্তির ও সিদ্ধান্তের মধ্যে রহিয়াছে। ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় মাত্র। কিন্তু প্রথম প্রকারের সমস্যা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপস্থিত করাই এক হিসাবে ভাল। এইখানে ছাত্রছাত্রী সমস্যার সঙ্গে বিজড়িত বহু সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম হয়। এমন ভাবে কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব করা যায় যে উহা যেন ছাত্রছাত্রীর আশে পাশে প্রায় সকল লোকেরই জীবন স্পর্শ করে? যেমন, "খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বর্ধিত হইতেছে কেন?" "মাছের দাম বাড়িতেছে কেন?" ইত্যাদি।

সমস্যার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থা দুই ভাবে হইতে পারে। প্রতিদিন-কার পাঠের বিষয়বস্তু কতকগুলি সমস্যামূলক প্রশ্নে বিভক্ত করিয়া ছাত্র-

ছাত্রীদের সম্মুখে রাখা যাইতে পারে। এই সমস্যাগুলি সামান্য চেষ্টা করিয়াই সমাধান করা যায়। পক্ষান্তরে শিক্ষক শিক্ষিকা কয়েকটি মূল সমস্যা, যাহার সমাধানে বেশী সময় ব্যয়িত হইবে এমন কয়েকটি সমস্যা ছাত্রছাত্রীদের কাছে রাখিতে পারেন। সমগ্র ইতিহাসের পাঠ্যসূচীকে এমনই সমস্যার আকারে ছাত্রছাত্রীদের কাছে রাখা যাইতে পারে। এইরূপ ভাবে যদি সমগ্র পাঠ্যসূচীর বণ্টন করা হয়, তাহা হইলে শিক্ষকশিক্ষিকাকে ছাত্রছাত্রীদের বয়স, চিন্তন ক্ষমতা, আগ্রহ ইত্যাদিও ভাল করিয়া দেখিয়া বিচার করিয়া ঐরূপ সমস্যা উপস্থাপিত করিতে হইবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে সমস্যা এক শ্রেণীর পক্ষে উপযুক্ত সেইরূপ সমস্যা অন্য শ্রেণীর পক্ষে উপযুক্ত নয়।

সমগ্র পাঠ্যসূচীকে কয়েকটি সমস্যায় বণ্টনের মধ্যে ছাত্রছাত্রীকে ব্যক্তিগত ভাবে সমস্যার সমাধান করিতে হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি যে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান পুস্তকেই বহু পূর্বে করা রহিয়াছে। শুধু ছাত্রছাত্রীকে ঐ সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। এইরূপ সমস্যা ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থিত করিলে ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের নিজের বিচার বুদ্ধিতে সিদ্ধান্তে আগমন করে না, কিন্তু যে সমস্ত জ্ঞান সে পুস্তক হইতে অর্জন করে, সেই জ্ঞানই তাহার সমস্যার মীমাংসা করিয়া দেয়। তাই অনেক শিক্ষক শিক্ষিকাই এইরূপ সমস্যা সমাধানকে সমস্যা পদ্ধতি বলিয়াই স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা বলেন যে, ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া দেখিয়া যে সমস্যার সিদ্ধান্তে উপনীত হইল না, তাহা আবার সমস্যা কি? যে সমস্যার বিশ্লেষণ করিতে সময়, চিন্তন, নূতন ধারায় যুক্তি অন্বেষণ করিতে হয়, তাহাই প্রকৃত সমস্যা পদ্ধতির অন্তর্গত বলিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন।

চিন্তার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কতকগুলি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাহা করিতে হয়। প্রথমতঃ সমস্যাটি কি তাহা জানিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, তৃতীয়তঃ এই বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা এবং চতুর্থতঃ একটি সিদ্ধান্তে আগমন। এই চারিটি স্তরের মধ্য দিয়া আসিলেই সমস্যার পূর্ণ সমাধান হইতে পারে। এই সম্পর্কে কয়েকটি নীতি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পালন করিতে হইবে।

প্রথমতঃ ছাত্রছাত্রীরা মনে করিবে যে সমস্যাটি তাহাদের নিজের। প্রজেক্ট বা কার্য-সমস্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে যে সমস্যাটির উদ্ভব হয় ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকারও সেইখানে

দায়িত্ব ছিল। সমস্যা স্থিরীকরণে শিক্ষক-শিক্ষিকার হাতও ছিল খুব বেশী। সমস্যা পদ্ধতিতেও সমস্যা স্থিরীকরণে যদি ছাত্রছাত্রীদের বেশী দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে শ্রেণীকক্ষে অরাজকতার শুরু হইবে। ছাত্রছাত্রীদের মনে শ্রেণীকক্ষে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইবে, তাহা হয় ত সমাধান করিবার মতই নয় বলিয়া দেখা গেল। এইরূপ অবস্থার ফলে সময় সময় খুব নৈরাশ্যজনক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দেখা যায়। ভাল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শুধু আগ্রহশীল শ্রেণী হইলে চলিবে না, আগ্রহের সাথে সাথে মূল্যবোধেরও প্রয়োজন। তিনিই হইতেছেন প্রকৃত শিক্ষক যিনি যে সমস্ত সমস্যার সমাধানে শ্রেণীকে অগ্রসর করাইতে চাহিবেন, সেই সমস্ত সমস্যা যেন পূর্বাহ্নেই ছাত্রছাত্রীদের মনে উদয় হয় এইরূপ ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ সমস্যাটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইবে। যখন শ্রেণী বুঝিতে পারিবে যে সমস্যাটি তাহাদেরই, তখন শিক্ষক সেই সমস্যাটিকে ভাল ভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলিয়া ধরিবেন। এই কথাটা একটু বেশী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহার গুরুত্ব আছেই বলিয়া বলা হইতেছে। ছাত্রছাত্রীগণ তাড়াতাড়ি বিষয়টি ভুলিয়া যায়। সমস্যাটি ভুলিয়া গেলে, সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হওয়াই তখন মুস্কিল হয়। অনেক বক্তৃতায় দেখা যায়, যে উদ্দেশ্য লইয়া বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে, বক্তা তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া নানা রকম বাজে কথার অবতারণা করিয়া বসিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ সমস্যা সমাধানের জন্য নানাবিধ বিষয় বাছিয়া লইতে হইবে। প্রথম অবস্থায় শ্রেণীতে এই বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা যদি সমস্যার পটভূমিকা বুঝিতে পারে, তাহাদেরও এই বিষয়ে বক্তব্য থাকা সম্ভব। শিক্ষক শিক্ষিকা নিজেই স্থির করিবেন এই পটভূমিকার আলোচনায় তাঁহার অবদান কতটুকু হইবে। যদি শ্রেণী অল্প বয়স্ক বালকবালিকাদের জন্য হয়, তাহা হইলে শিক্ষক শিক্ষিকা বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সঠিক বই বা বইয়ের পাতা নির্দেশ করিয়া দিবেন। কিন্তু একটু বেশী বয়স্ক ছাত্রছাত্রী যাহাদের ঐ বিষয়ের ভিত্তিগত কিছু জ্ঞান আছে, তাহাদিগকে শিক্ষক-শিক্ষিকা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিবেন মাত্র। বহু বিষয়ের মধ্যে বাছিয়া ছাত্রছাত্রীরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে।

চতুর্থ সমস্যাটির সমাধান সঠিক ও পরিষ্কার হইবে। যে সিদ্ধান্তে ছাত্রছাত্রীরা উপনীত হইবে সেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকে সেইদিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন। সিদ্ধান্তটি সত্য হইল কি না শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় তাহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন।

সমস্যা পদ্ধতির সুবিধা

সমস্যা পদ্ধতির কতকগুলি সুবিধা আছে বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ্ বলেন।

১। সমস্যা জীবনের সঙ্গে যুক্ত। জীবনে প্রত্যেকেই কোন না কোন সমস্যার সম্মুখীন সর্বদাই হইয়া আছে। অতএব সমস্যা সমাধানের কৌশল ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় জীবন হইতেই আয়ত্ত করা উচিত।

২। সমস্যা পদ্ধতি আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক এবং ইহা একটি শিক্ষামূলক প্রণালী।

৩। সমস্যা পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীরা সিদ্ধান্তে আসিতে স্থান পায়, ইহা গণতান্ত্রিক জীবনে অতিশয় মূল্যবান জিনিস।

৪। ছাত্রছাত্রীগণ এই পদ্ধতিতে চিন্তা করিয়া মানসিক কর্মে প্রবৃত্ত হয়। শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ শিক্ষকের কথা শুনিয়া থাকে, এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীগণ সক্রিয়ভাবে সমস্যার উপর চিন্তা করিতে পায়।

৫। সমস্যাপদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

৬। পুস্তকে ছাপার অক্ষরে যাহা লেখা আছে, তাহা যে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা ছাত্রছাত্রীগণ শিক্ষা করে।

৭। এই পদ্ধতিতে পুস্তকের পাতা হইতে ছাত্রছাত্রীরা চিন্তার খোরাক পায়।

৮। এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের মুক্ত মন ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ছাত্রছাত্রীরা বুঝিতে পারে একটি প্রশ্নের বিভিন্ন দিক আছে।

পক্ষান্তরে সমস্যা-পদ্ধতির কতকগুলি অসুবিধাও রহিয়াছে। ইহার প্রধান অসুবিধা হইল ছাত্রছাত্রীরা এই পদ্ধতিতে শিখিবার সময় সমস্যার উত্তরটিই শুধু পুস্তকেই খুঁজিয়া বেড়ায়। ফলে বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের পূর্ণ জ্ঞান হয় না।

সমস্যা-পদ্ধতির আর একটি ত্রুটি দেখান হইয়া থাকে। সমস্যা পদ্ধতি সমস্ত ছাত্রছাত্রীরাই সমস্যা লইয়া যেন কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু কাজে সত্যিকার কিছু হয় না। এইরূপ অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই।

সমালোচকগণ বলেন যে সমস্যাগুলির এমনই আকার থাকে যে তাহাতে বিচার করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্তে আসার মত কিছু থাকে না। কিন্তু সমালোচকগণের এই অভিযোগ সমস্যা পদ্ধতির বিরুদ্ধে হইতে পারে না, এই অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অনেক সমস্যা ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থিত করা শিক্ষকের কাজ, এইখানেই পদ্ধতির ত্রুটির কথা মোটেই উল্লেখ করা যাইতে পারে না।

সংঘকাজ ও সমস্যা-পদ্ধতি

দলীয় বা সংঘকাজে সমস্যা-পদ্ধতির প্রয়োগ খুব ভালভাবে হইতে পারে বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ্ বলিয়া থাকেন। সমস্যা-পদ্ধতির প্রয়োগ নিম্নলিখিত ভাবে হইতে পারে। কোন এক শ্রেণীতে, কোন একটি বিষয় আলোচনার পর একটি বড় সমস্যার উদ্ভব হইল। কিছু প্রাথমিক আলোচনার পর শিক্ষক শ্রেণীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করিয়া দিলেন। প্রত্যেকটি দলই ঐ সমস্যার সমাধানের কাজে আলাদা ভাবে আলোচনা কার্যে ব্যাপৃত হইয়া গেল। প্রত্যেক দলের ছাত্রছাত্রীগণ তাহাদের নিজস্ব সংগৃহীত উপাদান লইয়া ঐ সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত রহিল। তাহারা ঐ আলোচনার উপরে সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলে। সমগ্র শ্রেণী তখন সকল দলের আলোচনা শুনিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর এক রকমেও সমস্যা-পদ্ধতির কাজ হয়। শ্রেণীর সভাপতি অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণীকে সমস্যাটি বুঝাইয়া দেন এবং সমস্যাটির বিভিন্ন দিক আলোচনা করিবার জন্য বিভিন্ন দলকে দায়িত্ব দান করেন। বিভিন্ন দলগুলি আলাদাভাবে বসিয়া সমস্যাটির এক একটি দিক আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে আসে। পরে দলগুলি একত্র হইয়া সমস্যাটির বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া লয়। এইস্থানে সমস্যার বিভিন্ন দিক একটি দল আলোচনা করে না বটে কিন্তু পরে শ্রেণীতে ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বিষয়টি বুঝিতে পারে।

দলীয় কাজে সমস্যা-পদ্ধতির কাজ ভাল হয় বলিয়া অনেকে দাবী করেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে, না হইলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে দলের অনেকে ঠিকমত ভাবে কাজ করে না। প্রত্যেক দলের এক জন করিয়া নেতা থাকে। নেতা যদি খুব চালাক চতুর না হয়, তবে তাহাকে নিজেকেই সব কাজ করিতে হয়, সে আর কাহাকেও দিয়া কাজ করাইতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষায় পাঠদান-পরিকল্পনা

শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠদান সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রয়োজন বর্তমান সময়ে বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন পূর্ব হইতেই পরিকল্পনার প্রয়োজন, শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহাই। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রভাব। পূর্ব হইতে পরিকল্পনা না করিয়া চলিলে দেখা যায় কাজগুলি ঠিকমত দানা বাঁধিয়া উঠে না, এবং শেষ রক্ষাও কোন কোন ক্ষেত্রে হয় না। আইন-ব্যবসায়ী তাঁহার 'কেস্' সম্পর্কিত সওয়াল জবাবের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হন, ইঞ্জিনিয়ার বাড়ী তৈয়ারী করিবার পূর্বে বাড়ীর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া থাকেন; সৈন্যাধ্যক্ষ প্রতি-পক্ষকে আক্রমণ করিবার পূর্বে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কথিত আছে, নেপোলিয়ন ঘরে বসিয়াই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই যুদ্ধ জয় করিতেন, অর্থাৎ তিনি নিখুঁত পরিকল্পনা করিয়া পরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। অতএব দেখা যাইতেছে, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পূর্ব পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিকল্পনার স্থান থাকিবে ইহাতে আর স ন্দেহ কি?

পূর্ব হইতেই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনাকে স্থান দেওয়া হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কি ভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। পূর্বে ছিল পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষা, কতকগুলি মোটা পুস্তকের পৃষ্ঠা ছিল সারা বৎসরের কাজের ইঙ্গিত। পূর্বে বৎসরের ছুটির কয়দিন অর্থাৎ ৫২টি রবিবার ও ৮৫।৯৫ দিন অন্যান্য ছুটি, এই কয়দিন ৩৬৫ দিন হইতে বাদ দিয়া যে কয়দিন থাকিত, তাহাতে আবার শনিবারের অর্ধেক দিনের কথা বিবেচনা করিয়া, বৎসরের মোট সময় বাহির করা হইত। পরে এই মোট সময়কে বিভিন্ন পুস্তকের মোট পৃষ্ঠার মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। ইহাই ছিল পাঠ-পরিল্পকনার গোড়ার কথা। শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে প্রয়োজনীয়তা ও কাঠিন্যের দিক হইতে বিচার করিয়া সময়ের হ্রাসবৃদ্ধি করার নিয়ম ছিল। কিন্তু এইরূপ

পরিকল্পনা আজ অনেক কারণে অচল হইয়া পড়িয়াছে। বৎসরের কতটুকু সময় শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে ব্যয়িত হইবে, তাহা যে ভাবে বাহির করা হইয়াছে, সেইভাবে আজও সময় বাহির করিয়া লওয়া হইবে, কিন্তু সে সময়টা পুস্তকের মোট পৃষ্ঠার মধ্যে বিভক্ত হইবে না, **তাহার প্রথম কারণ মোট পুস্তক ও মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা আমাদের জানা নাই, অতএব সময়কে পৃষ্ঠানুযায়ী ভাগ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।** তাহা হইলে শিক্ষা-পরিকল্পনার পরিবর্তনের কারণ কি?

শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের ফলেই পাঠ-পরিকল্পনার পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। বর্তমান সময়ে শিক্ষা বলিতে কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয়কে আয়ত্ত করা শুধু নয়, প্রকৃত শিক্ষা বলিতে শিশুর সামাজিক বিকাশসাধন বুঝায়। এই কারণেই বর্তমান সময়ে সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিশুর সমস্ত রকম বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। তাই শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্য যখন অত বিরাট, তখন শিক্ষাদান-পরিকল্পনা, তথা পাঠদান-পরিকল্পনাও যে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমান সময়ে শিশুর শিক্ষাসম্পর্কীয় ধারণা সম্বন্ধে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। পূর্বে শিশু মানসিক ক্ষমতা পরিচালনা দ্বারা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করিত এবং শিশুর শিক্ষালাভ বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যেই সম্পাদিত হইত বলিয়া সকল শিক্ষাবিদের ধারণা ছিল। **কিন্তু বর্তমান সময়ে সকল শিক্ষাবিদ্ই বিশ্বাস করেন যে, শিশু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ করে এবং অভিজ্ঞতা লাভ বিদ্যালয় কিংবা বিদ্যালয়ের বাহির উভয় স্থানেই হইতে পারে।** এই কারণেই শিশুর অভিজ্ঞতা যাহাতে উপযুক্ত ধারায় লাভ হইতে পারে সেই জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের অধীনে শিশু যাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশু কোথায় ও কি ভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাহাও শিক্ষকের পাঠদান-পরিকল্পনার বিষয়ীভূত।

তৃতীয়তঃ বর্তমান নূতন শিক্ষার ধারায় পাঠ্যক্রমের রদবদল হওয়ার ফলে পাঠদান-পরিকল্পনা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। **বর্তমান শিক্ষায় পাঠ্যক্রম শিশু এবং শিশুর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে।**

এই অবস্থায় শিশুর আগ্রহ, অনাগ্রহ, ইচ্ছা অনিচ্ছা, ঔৎসুক্য ইত্যাদিকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করিয়া পাঠ-পরিকল্পনা করা হইতেছে। বলা বাহুল্য এইরূপ সামগ্রিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পূর্বে কখনও পাঠ-পরিকল্পনা করা হইত না।

পাঠ-পরিকল্পনাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথমতঃ **বেশী দিনের জন্য পরিকল্পনা**। শ্রেণীর সমস্ত শিশু সম্পর্কে সমগ্র বৎসরের বা একটি বৎসরাংশের (term এর) জন্য পাঠ-পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। যদি বৎসরাংশের জন্য পরিকল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র বৎসরকে কল্পনাধীন রাখিয়া তবে বৎসরাংশের পরিকল্পনা করা যাইতে পারিবে। এইরূপ পরিকল্পনায় বিভিন্ন কর্মের ইউনিট স্থির করিয়া লওয়া হইবে এবং শ্রেণীর বিভিন্ন দলগুলি কিভাবে সম-অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যাপৃত থাকিবে, তাহার ইঙ্গিত থাকিবে।

দ্বিতীয় প্রকারের পরিকল্পনা হইতেছে প্রথম পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত কোন **একটি কাজের ইউনিট সম্পর্কে**। প্রথম পরিকল্পনা হইতে ইহার ব্যাপ্তি স্বভাবতই ছোট। এইরূপ কাজের **ইউনিট কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া শিশুর দল ও শিক্ষক উভয়ে মিলিয়া করিবেন এবং কর্মের বিভিন্ন অংশগুলিকে শিশুর জীবনের ক্ষেত্রে আনিয়া শিক্ষক উহাদিগকে উপযুক্তভাবে শিশুদের দ্বারা সম্পাদন করাইবেন, তবেই শিশুর সামগ্রিক বৃদ্ধির আদর্শ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে**। দ্বিতীয় প্রকারের পরিকল্পনারই অংশবিশেষ হইতেছে তৃতীয় পরিকল্পনা বা **দৈনিক পাঠদান পরিকল্পনা**। ইহা কাজের ইউনিটেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

বৎসর বা বৎসরাংশের পরিকল্পনা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যক্রম (curriculum) জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হেতু পরিবর্তিত হইতেছে এবং উহা শিশুর আগ্রহ, ঔৎসুক্য, কর্মক্ষমতা, বয়স ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইতেছে। শ্রেণীর পাঠ্যক্রম এই হিসাবে অত্যন্ত নমনীয় হইলেও কয়েক বৎসর যাবৎ শিশুদের কাজের ধারা ও তাহাদের ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের সামগ্রিক উন্নতি ও বিকাশের জন্য কতকগুলি জিনিষের অনুশীলন প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইতেছে ঐ শ্রেণীর সাধারণ পাঠ্যক্রম। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে ঐ শ্রেণীর শিশুদের ঐ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি

রাখিয়া পরিচালনা করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট লক্ষ্যযুক্ত আদর্শ ও শিশুর মধ্যে যে ব্যবধান তাহা পরিপুরণ করিবার জন্য কতকগুলি কাজের ইউনিট সম্পাদন আবশ্যক। অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে, কাজের ইউনিট সম্পাদিত হইলে শিশুর প্রয়োজনীয় সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হইবে, কিন্তু অন্যান্য শিক্ষাবিদের মতে কাজের ইউনিট সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে সুসমঞ্জস শিক্ষাদানের জন্য পুস্তকের ধারা অনুযায়ী বিষয়-শিক্ষাদানেরও প্রয়োজন আছে। মতভেদ যাহাই হউক না কেন, এটা স্থির নিশ্চিত যে, কতকগুলি কাজের ইউনিট সম্পাদনের মধ্য দিয়াই শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের সম্ভাবনা এবং সেই হেতু শিক্ষককে বৎসরের জন্য বা বৎসরাংশের জন্য কাজের বিভিন্ন ইউনিটের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কাজের ইউনিট

কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের পরিকল্পনার, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ইউনিট সম্পর্কেই আলোচনা এইখানে নিবদ্ধ থাকিবে। কাজের ইউনিট বলিতে কি বুঝিতে পারা যায় এবং তাহার বৈশিষ্ট্য কি, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে পারা যায়।

ইউনিট বলিতে একটা একত্রীভূত ভাবের সমাবেশ—এইরূপ একটা অর্থ প্রকাশিত হয়। পূর্বের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যেমন পাঠগুলিকে বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া শিক্ষাদান করা হইত, কর্মের ইউনিট অনুসরণের ক্ষেত্রে কিন্তু তাহা নয়। **কাজের ইউনিট একটা সামগ্রিক বিকাশ ইঙ্গিত করে এবং উহার সঙ্গে বিজড়িত থাকে কতকগুলি একত্রযুক্ত অর্থপূর্ণ কর্মসমূহ।** শিশু প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট কাজ করিতে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করে, এমনই থাকে কাজের ভিতরে গাঁথুনি।

কাজের ইউনিটের মধ্যে আরম্ভ ও শেষ সূচিত করিয়া থাকে। ফলে সমগ্র কাজ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা শিশুদের জন্মিয়া যায়।

কাজের ইউনিটের মধ্যে শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য খুবই সুস্পষ্ট। শিশু এই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা করিবার সুযোগ পায়।

কাজের ইউনিটের মধ্যে শিশু কাজ করিতে করিতে অগ্রসর হয় বলিয়া তাহার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রও পরপর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অতএব শিশুর কাছে নূতন অভিজ্ঞতা আনন্দপূর্ণভাবে প্রতিভাত হয়।

ইউনিটের স্বরূপ বুঝিতে পারা গেল। এখন কাজের ইউনিটের ব্যবস্থাপনা কিরূপভাবে হইবে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

শিশুদের সঙ্গে সহযোগিতায় একটি সমস্যা উদ্ভাবন করিতে হইবে।* কি প্রণালীতে 'সমস্যা' উদ্ভাবিত হইতে পারে? প্রথমে শিক্ষক শিশুদের কথাবার্তা, আগ্রহ, আলোচনা ইত্যাদি হইতে কি সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। শিশুর ইঙ্গিতকে সমস্যার আকার দিতে যতটুকু আলোচনার প্রয়োজন, তাহা শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে করিবেন।

সমস্যা একবার স্থির হইয়া গেলে শিক্ষক শিশুকে ঐ সমস্যা সমাধানের মধ্যে দিয়া কতটুকু শিক্ষা দিতে পারেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই স্থানেও ইহাকে দুইটি বিশেষ দিক হইতে আলোচনা করিয়া দেখিতে পারা যায়। **প্রথমে সমস্যাসম্পর্কিত কি কি শিক্ষা শিক্ষক শিশুকে দিবেন, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক কি ভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিবেন।**

কাজের ইউনিট আরম্ভ করা সম্পর্কে শিক্ষককে নানাদিক বিবেচনা করিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। পূর্বে যে-কোনও কাজ শিশুর ইচ্ছা বা আগ্রহ ব্যতিরেকেই আরম্ভ করা হইত। এখন কোন কাজেই ইউনিটের যে অংশে শিশুর আগ্রহ বা ঔৎসুক্য নিবদ্ধ, সেইখান হইতেই শিশুকে অভিজ্ঞতা দান আরম্ভ করিতে হইবে।

এই কাজের ইউনিট সম্পাদনার মধ্যে শিশু যে-সমস্ত কাজ করিবে, তাহার একটা তালিকা শিক্ষকের পক্ষে রাখা উচিত। কাজেই প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশু নানা কাজ, যথা—খবর সংগ্রহের নিমিত্ত পড়া, অভিজ্ঞতা অর্জন সম্বন্ধে রিপোর্ট দান, জিনিষ তৈরী, ছবি আঁকা, লেখা ইত্যাদি বহু রকম কাজ করিতে পারে—এইগুলি সকলই শিশুর স্বয়ংকর্ম। এই সকল কর্মের হিসাব শিক্ষক রাখিবেন।

ইউনিটের কাজের সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার কি ব্যবস্থা করা যায় তাহার সম্ভাব্যতা স্থির করিতে হইবে শিক্ষককেই। ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে সেই কর্মের ইউনিটের সহজ যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তাহার মাধ্যমে শিক্ষার বন্দোবস্ত করা যায়।

শিক্ষক শিশুদের সাহায্য লইয়াই কাজের সমস্যা স্থির করিয়াছেন এবং সেই সমস্যাকেই কেন্দ্র করিয়া কাজের ইউনিট গড়িয়া উঠিয়াছে। এই যে কাজের

* কিরূপভাবে কাজের ইউনিট স্থির করিতে হইবে, তাহা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা'র অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইউনিট, ইহার পরিচালন বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে শিশুদের প্রয়োজন, আগ্রহ এবং ক্ষমতার উপর। শুধু তাহাই নয়, শিশুদের পূর্ব অভিজ্ঞতা, আবেষ্টনীতে কাজ করিবার মত বস্তুসম্ভার ইত্যাদিও কাজের ইউনিটের পরিচালন-সাফল্যকে যথেষ্টভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ শিশুদের কোন একটি কাজের ইউনিটের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইলে আবেষ্টনীগত প্রভাব শিশুদের মধ্যে এতদূর হওয়া উচিত যে, শিশুরা যেন ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াই সেই কাজে অগ্রসর হয়। এই কারণে বিদ্যালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যেই এমনভাবে সমস্যাকে জিয়াইয়া রাখিতে হইবে যে, শিশুরা যেন স্বাভাবিক আকর্ষণেই সমস্যা সমাধান করিতে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে।

তৃতীয়তঃ কাজের ইউনিট যাহাতে শিশুদের কর্মের উৎসাহকে সর্বদা পরিবর্ধিত করে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্মপরিচালনা করিতে হইবে। শিশুরা যেন সুচিন্তিত যুক্তি ও বিচার প্রয়োগ করিয়া কর্ম করিতে পারে, তাহারা যেন স্বীয় ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের জন্য উপযুক্ত অভ্যাসগুলি গঠন করিতে সুযোগ পায় এবং পরিশেষে শিক্ষণীয় বিষয়গুলিতেও যাহাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেইদিকে দৃষ্টিদান করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিশুদিগকেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিবার অবকাশ ও সুযোগ দিতে হইবে। ইউনিটের পরিকল্পনা এমনভাবেই করিতে হইবে যাহাতে কাজগুলিই শিশুদের মনে কাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে। শিশু অনুসন্ধান করিতে করিতে এমনভাবে চুলচেরা বিচার করিয়া অগ্রসর হইবে যে, কার্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশু প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হইবে।

কাজের ইউনিট সম্পর্কে একটি উদাহরণ

একটি গ্রামের বিদ্যালয়ে দেখা গেল শিশুরা সকলেই প্রায় পেটের রোগে ভুগিতেছে। চতুর্থ শ্রেণীর শিশুরা, তাহাদের প্রতিদিনকার খবরের মধ্যে তাহাদের পেটের রোগের কথা প্রায়ই উল্লেখ করে; যথা—আজ রমা আসতে পারেনি, কারণ তার আমাশয় হয়েছে, ইত্যাদি। শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে নানা আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গ্রামের জলের অসুবিধার কথা শিশুমনে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই তিনি শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া 'সমস্যা' স্থির করিলেন।

সমস্যা—গ্রামে জলের অসুবিধা ও রোগের উৎপত্তি।

সমস্যা স্থির হইলে পর শিশুরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া শিক্ষকের সাহায্যে অনুসন্ধান-পত্র তৈয়ারী করিয়া জল সরবরাহ ব্যবস্থা লক্ষ্য করিবে।

পুকুরে একদল শিশু যাইবে এবং কি ভাবে পুকুরের জল দূষিত হইতেছে, তাহা অনুসন্ধান-পত্রে লিখিয়া আনিবে।

সেই পুকুর হইতে কোন্ কোন্ পরিবার জল নেয় এবং সেই সকল পরিবারে কোনও রোগ হইয়াছিল কিনা, কি জাতীয় রোগ এবং এখনও সে-সব পরিবারে কেহ অসুস্থ আছে কিনা, তাহার হিসাব একদল শিশু লইবে।

যে যে চিকিৎসক ঐ সকল পরিবারে চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের নিকট একদল শিশু যাইয়া ঐ সকল রোগ জলবাহিত কিনা জানিবে।

সমস্ত দলগুলি তখন শিক্ষকের সঙ্গে বসিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রামের জলের অসুবিধা এবং তাহার ফলে কি ভাবে রোগের উৎপত্তি হইতেছে তাহা বিচার করিয়া দেখিবে। জলের অসুবিধা দূর হইলে রোগের প্রাদুর্ভাবও কমিয়া যাইবে, এই সিদ্ধান্তে তাহারা আসিবে।

শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে দিবেন।

শিশুরা জল সম্বন্ধে পড়াশুনা করিবে; জল কি ভাবে দূষিত হয় তাহা পুস্তক হইতে দেখিয়া লইয়া নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবে; জল বিশুদ্ধ করিবার প্রণালীসমূহ তাহারা বিভিন্ন পুস্তক হইতে পড়িয়া লইবে; তাহারা বিভিন্ন পুকুরের জল কি ভাবে দূষিত হয় তাহা একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করিবে; প্রত্যেকের খাতায় জল-সম্বন্ধীয় আরও অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ থাকিবে; জল বিশুদ্ধীকরণের নিয়মাবলীও এই খাতায় থাকিবে; খাতার মলাটে সুন্দর ডিজাইন থাকিবে। এইভাবে শিশুরা এই সমস্যা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়, যথা—পড়া, লেখা, অঙ্ক করা ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিবে।

এইবার এই সমস্যা-সম্বন্ধীয় কাজ আরম্ভ হইবে। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া শিশুরা বিভিন্ন জল প্রাপ্তির স্থানগুলি, যথা—পুকুর, কূয়া ইত্যাদির মডেল তৈয়ারী করিবে ও ছবি আঁকিবে এবং জল কি ভাবে দূষিত হয় তাহা দেখাইবে। একটি ভিন্ন মডেলে সংরক্ষিত পুকুর ও সংরক্ষিত কূয়া হইতে পানীয় জল নেওয়ার উপকারিতা দেখাইবে। প্রতি অবস্থার ছবি অঙ্কিত হইবে।

জল বিশুদ্ধীকরণের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া শিশুরা জল বিশুদ্ধ

করিতে শিখিবে। প্রত্যেক কাজের মডেল শ্রেণীকক্ষে থাকিবে। প্রত্যেকটি উপায় সম্বন্ধে শ্রেণীকক্ষে জল বিশুদ্ধীকরণের পরীক্ষা-কার্য চলিবে।

শিশুরা প্রথম অবস্থায় অনুসন্ধান-কার্য দ্বারা সমস্যাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে, দ্বিতীয় অবস্থায় চিকিৎসক ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া সমস্যাটি সম্বন্ধে পুস্তকাদি হইতে বিভিন্ন তথ্য আহরণ করিয়াছে। তৃতীয় অবস্থায় শিশুরা মডেল তৈয়ারী করিয়া নানা রকম পরীক্ষা-কার্য চালাইয়া জল বিশুদ্ধ রাখিবার এবং বিশুদ্ধ জল গৃহে কি ভাবে ব্যবহার করিয়া রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। চতুর্থ ধাপে শিশুরা তাহাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে গ্রামের সকলের কাজে লাগাইবার জন্য কয়েকটি পোষ্টার তৈয়ারী করিয়া গ্রামের সকলকে এ বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য পুকুর ও কুয়ার কাছে লাগাইয়া রাখিবে।

এইরূপ কাজের ইউনিটের মধ্য দিয়া শিশুরা শুধু জল সম্বন্ধেই নানা তথ্য অবগত হইল না, এই সমস্যার সঙ্গে বিজড়িত আরও নানা বিষয় সম্বন্ধেও তাহারা অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। শিশুদের জ্ঞানের পরিধি কি ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত সংক্ষেপে এখানে দেওয়া হইতেছে।

শিশুরা বিভিন্ন পুস্তক হইতে **পড়ে** (১) জল-সম্বন্ধে, (২) জল দূষিত হওয়া সম্বন্ধে, (৩) জল বিশুদ্ধীকরণ সম্বন্ধে, (৪) জলবাহী রোগ সম্বন্ধে, (৫) জলবাহী রোগের প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে ইত্যাদি।

শিশুরা **লেখে** (১) যাহা বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, (২) নিজে হাতে-কলমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, (৩) পরীক্ষা-কার্যের রিপোর্ট, (৪) অনুসন্ধানসম্পর্কীয় উত্তর, (৫) জলসম্পর্কিত বিভিন্ন গল্প, (৬) জলসম্পর্কিত অভিনয় ইত্যাদি।

শিশুরা **ছবি আঁকে** (১) বিভিন্ন পরীক্ষাকার্যের ছবি, (২) রোগের জীবাণু, (৩) রোগ-সংক্রমণ, (৫) বইয়ের মলাট ইত্যাদি।

শিশুরা **অঙ্ক করে** (১) দূরত্ব সম্পর্কীয়, (২) বর্গক্ষেত্র সম্পর্কে ইত্যাদি।

তাহা ছাড়া শিশুরা স্বাস্থ্যরক্ষা, বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি সম্বন্ধেও আংশিক ভাবে জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে।

প্রথম দুই প্রকারের পাঠ-পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এইক্ষণে তৃতীয় প্রকারের পরিকল্পনা অর্থাৎ দৈনিক পাঠদান-পরিকল্পনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

দৈনিক পাঠদান-পরিকল্পনা

পূর্বেও দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষক শ্রেণীপাঠনার সময়কে বিভিন্ন বিষয়ের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া প্রতি বিষয়ের জন্য যতটা সময় নির্ধারিত হইত তাহা বাহির করিয়া বিষয়গুলিকে কঠিন ও সহজ এইভাবে সাজাইয়া দিনের পাঠদান-পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত করিতেন। দিনের প্রথম অবস্থায় মন যখন সহজ ও সতেজ থাকে তখন দেওয়া হইত কঠিন বিষয়, তারপর সহজ বিষয়। এইরূপ ভাবে শিশুর মস্তিষ্কের উপর চাপ লাঘব করিয়া বিষয়গুলি সাজাইলেই পাঠ-পরিকল্পনার কর্তব্য শেষ হইত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে বর্তমান সময়ে শিক্ষার গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে। অতএব পাঠ-পরিকল্পনাকে অত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। শিশুর জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া যে শিক্ষা, সেই শিক্ষার জন্য যেমন কাজের ইউনিটের পরিকল্পনার প্রয়োজন, তেমনি দৈনিক কাজেরও ভিন্নরূপ বিলিব্যবস্থার প্রয়োজন। **কিন্তু অনেক শিক্ষাবিদ্ দৈনিক পাঠদান-পরিকল্পনার যৌক্তিকতাকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যেহেতু শিশুর প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া শ্রেণীর কর্ম সম্পাদনা হইবে, সেই হেতু দিনের কর্মকে একটি কাঠামোর মধ্যে বাঁধিয়া রাখা উচিত হইবে না।** এইরূপ ভাবে সময়-পত্র পরিহার করা খুব ভাল এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হইলেও নূতন শিক্ষাব্রতীর কাছে সময়-পত্রের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। সময়-পত্র নমনীয় হউক এবং প্রয়োজনবোধে উহাকে যথাসম্ভব শিথিল করা হউক, কিন্তু তবুও একটা সময়-পত্র এবং তাহাতে কাজের পরিকল্পনার ইঙ্গিত থাকিলে কাজ সহজ হইয়া আসে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান সময়ে পাঠ-পরিকল্পনা শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহের ভিত্তিতেই হইয়া থাকে। শিশুর প্রয়োজন হইতেছে খেলা, খাওয়া, কাজ করা, শিক্ষা করা, ঘুমান, সৃষ্টি করা, ব্যক্তিগত চাহিদাকে অনুসরণ করা ও দলের মধ্যে থাকিয়া আনন্দ অনুভব করা। যখনই শিক্ষক শিশুর পূর্বোক্ত জীবনগত অভিজ্ঞতাকে পাঠ্যক্রমে যথার্থ মূল্য দিবেন, তখনই দৈনিক পরিকল্পনা শিক্ষকের নিকট সহজ হইয়া আসিবে। সময়-পত্রকেও প্রয়োজনবোধে যেভাবে ইচ্ছা অদল-বদল করিতে আর আপত্তি থাকিবে না।

শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে সে সমগ্রভাবে বৃদ্ধি পাইবে, জীবনের কোন অংশের বিকাশই তাহার ব্যাহত হইবে না। অতএব শিক্ষকের পাঠ-

পরিকল্পনার মধ্যে শিশু কোন্ লক্ষ্য বস্তুতে যাইয়া পৌছাইবে, তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত থাকিবে। শিশুকে দলগতভাবে কাজ করিতে, নাচিতে, গাহিতে, খেলা করিতে এবং ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা-কার্যে রত থাকিতে, হাতের কাজ করিতে, লিখিত বিষয় পাঠ করিতে, পড়িতে, অনুসন্ধান করিতে ইত্যাদি সমস্ত রকম কাজ করিতে দেখা যাইবে। এই সমস্তই শিক্ষকের পাঠ-পরিকল্পনা ও সময়-পত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে। তাহা ছাড়াও শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসম্বন্ধ বিকাশ এবং গৃহে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে তাহার প্রতিফলন সুনাগরিকত্বের পরিচায়ক হয়, সেইভাবে শিশুকে শিক্ষক গড়িয়া তুলিবেন —এইরূপ ইঙ্গিত থাকিবে শিক্ষকের পাঠদান-পরিকল্পনায়। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষকের শিক্ষাদান-পরিকল্পনায় আরও কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট হইয়া প্রতিভাত হইবে। তিনি প্রতি শিশুর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ, অনাগ্রহ, ঔৎসুক্য ইত্যাদিকে মর্যাদা দিয়া তাহার নিজস্ব ধারা অনুযায়ী তাহাকে বিকাশ লাভ করিতে সুযোগ দিবেন। শিশুর অভিজ্ঞতার পরিধিকে বৃদ্ধি করিতে শিক্ষক সর্বদা সচেষ্ট হইবেন। ইহার ফলে শিশু যে পৃথিবীতে বাস করে সেই পৃথিবী সম্বন্ধেই বেশী করিয়া অনুসন্ধিৎসু হইবে এবং তাহার জ্ঞানের পরিধি বেশী করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া শিশুর 3R-এর ভিত্তিকে তিনি যথেষ্ট রকম সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা করিবেন। কারণ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বর্ধিত করিতে হইলে হাতে-কলমে কাজের বাহিরেও পুস্তকলব্ধ জ্ঞান আহরণ করিবার প্রয়োজন আছে। 3R-এর ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে শিশুর অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ হইবে। সর্বোপরি শিশুর নীতিগত মানসিক স্তরকে উন্নীত করিতে হইবে। শিশুর উপরে উক্ত সর্বরকম বিকাশের ক্ষেত্রকে আলোড়ন করিয়া শিক্ষক তাঁহার পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার পাঠ-প্রস্তুতি সার্থক হইবে।

পাঠ-পরিকল্পনার প্রকৃষ্ট ছক প্রবর্তন সম্বন্ধে অনেক শিক্ষক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। **কিন্তু প্রকৃষ্ট ছক বলিয়া কোন কিছুকে অনুসরণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ কোন একটি ছক কোন শিক্ষকের কাছে মনোগ্রাহী হইলেও উহা অন্য সকলের কাছেও যে মনোগ্রাহী হইবে, এমন কিছু কথা নাই**। দ্বিতীয়তঃ অনেক শিক্ষক মনে করেন যে, পাঠের 'প্ল্যান' বা পরিকল্পনা অতিশয় বিস্তৃতভাবে লেখা প্রয়োজন, এমন কি প্ল্যানের মধ্যে যে বিষয়সম্ভূত প্রশ্ন দেওয়া

হইয়াছে, সেই প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তর সেইখানে লেখা থাকিবে। এইরূপ পরিকল্পনার ত্রুটি কোথায় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। সাধারণতঃ যে সকল শিক্ষক পরিকল্পনার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল, তাঁহারাই ঐরকম প্ল্যান তৈরী করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নের যে উত্তর শিক্ষক শিশুর নিকট হইতে প্রত্যাশা করিয়াছেন, শিশু সেই উত্তর হয়ত না দিয়া অন্য কোন উত্তর দিল, যাহার ফলে সমগ্র পাঠদানের ধারা বদলাইয়া গেল, তখন কি হইবে? বস্তুতঃপক্ষে বিস্তৃত পাঠদান-পরিকল্পনায় শিক্ষক পাঠটীকার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন, শিশু তাহার আগ্রহের বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া যেদিকে অগ্রসর হইতে চায়, তাহাতে শিক্ষক বাধাপ্রদান করেন এবং তাঁহার পাঠটীকা-বহির্ভূত কোন প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের উপরেও তিনি আর মনোযোগ দান করিতে পারেন না। যদি বাধ্য হইয়া শিশুর আগ্রহকে কিংবা শিশুর প্রশ্নকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হয় তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে থাকেন, ফলে শিক্ষাদান সাফল্যমণ্ডিত হয় না। শিক্ষাদানের সাফল্য দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, **প্রথমতঃ নমনীয় অথচ সুচিন্তিত পাঠ-পরিকল্পনা, আর দ্বিতীয়তঃ পাঠদান সম্পর্কে শিক্ষকের নির্ভীক মনোভাব।**

যে দুইটি বিষয়ের কথা বলা হইল তাহা কি কি উপায়ে শিক্ষক তাঁহার আয়ত্তাধীন করিতে পারেন? প্রথমতঃ শিক্ষক তাঁহার পাঠ-পরিকল্পনা **নিজের সুবিধা ও শ্রেণীর সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তুত করিবেন, পরিদর্শকের সন্তোষার্থে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয় আমদানী করিবেন না। দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনার বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে পারম্পর্য রক্ষিত হইবে।** কাজের ইউনিট হইতে যে কার্যগুলির উদ্ভব হইবে, সেই সম্বন্ধে শিশুদের মনে যথোপযুক্ত আগ্রহ উৎপাদিত করিবার মত ব্যবস্থার ইঙ্গিত থাকিবে পাঠ-পরিকল্পনায়। তৃতীয়তঃ **পাঠ-পরিকল্পনার** পূর্বে যে পাঠ বা **কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কাজের ব্যবস্থা থাকিবে।** চতুর্থতঃ পাঠ-পরিকল্পনার মধ্যে **কয়েকটি প্রশ্ন বা আলোচনার বিষয় থাকিবে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া শিশুরা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া নূতন জ্ঞান আহরণ করিতে সমর্থ হয়।** পাঠ-পরিকল্পনায় যদি উপরে উক্ত নীতিগুলি শিক্ষক মানিয়া চলেন, তাহা হইলে তিনি যে

পাঠদানকার্যে সাফল্য অর্জন করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাঠ-পরিকল্পনার মধ্যে আর একটি বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে; পাঠদানের মধ্যে শিক্ষক প্রদীপন হিসাবে যে-সমস্ত বস্তু ব্যবহার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেইগুলি পূর্বাহ্নেই যোগাড় করিয়া রাখিবেন। শুধু তাহাই নয়, শিশুরা যে-সব জিনিষ লইয়া কাজ করিবে, পূর্বাহ্নে তাহারও যোগাড় থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ কাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিনিষপত্র খোঁজাখুঁজি করিতে হইলে কাজ পণ্ড হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। পাঠদান-পরিকল্পনা সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, শিক্ষক পূর্বদিনের পরিকল্পনার মধ্যে পরের দিনে কি কাজ করা হইবে তাহার একটু ইঙ্গিত দিবেন। কাজের শেষে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ হইল কিনা এবং-পরিকল্পনার কোনরূপ অদলবদল করিতে হইল কিনা, তাহা 'আত্মবিশ্লেষণ' শীর্ষক অনুচ্ছেদে লিখিয়া রাখিলে ভাল হয়। Raleigh Schorling তাঁহার Student Teaching নামক পুস্তকে একটি ভাল পাঠদান-পরিকল্পনা করিতে যে কয় প্রকার উপায় অবলম্বন করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন, তাহার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

(১) সবচেয়ে ভাল ও উপযুক্ত প্রদীপনের ব্যবস্থা করুন; (২) খুব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন পাঠটীকায় লিখুন; (৩) উপযুক্ত উদ্দেশ্য স্থির করুন; (৪) শিশুর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের স্তর ঠিক করুন; (৫) শ্রেণী অনুযায়ী পাঠ্যসূচীর প্রতি লক্ষ্য রাখুন; (৬) উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করুন; (৭) শিশুর পুস্তকের লিখিত অংশের দিকে লক্ষ্য রাখুন; (৮) পূর্বজ্ঞানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে বর্তমান পাঠ যুক্ত করুন; (৯) শিশুদিগকে লিখিত কাজের নির্দেশ দিন; (১০) শিশুদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়া কাজের বন্দোবস্ত করুন যাহাতে শিশুরা তাহাদের লক্ষ্য বস্তুতে পৌছিতে সক্ষম হয়; (১১) পাঠ-পরিকল্পনা নমনীয় করুন; (১২) সময়ের উপর দৃষ্টি রাখুন; (১৩) কাজের পরিমাপের জন্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত করুন।

নূতন শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠদান করিবার পূর্বে শ্রেণীর শিশুদের সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান-পত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিত খবরগুলি সংগ্রহ করিয়া তালিকাভুক্ত করিয়া লইবেন। (১) ক্রমিক নং, (২) শিশুর নাম, (৩) বয়স, (৪) বৌদ্ধিক অবস্থা, (৫) পড়ার ক্ষমতা, (৬) লিখিবার ক্ষমতা, (৭) কথা বলার ক্ষমতা, (৮) অঙ্ক কষিবার ক্ষমতা, (৯) বাড়ীর অবস্থা—কৃষ্টিগত—আর্থিক, (১০) সাধারণ স্বাস্থ্য।

এই ভাবে শিশুদের বিস্তারিত খবর লইলে শিশুদের অবস্থা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় এবং সেই ভাবে শিশুদের কাজের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই ভাবে খবর সংগ্রহ ছাড়াও পড়ান আরম্ভ করিবার পর্বে শিশুদের একটি পরীক্ষা লওয়া উচিত। পাঠদান ও কাজ সম্পর্কে প্রয়োজন অনুযায়ী শিশুদের মধ্যে দল গঠন করিয়া লইলে ভাল হয়।

শিশুদের সময়-পত্র সাধারণ ভাবে নিম্নলিখিত ভাবে হইতে পারে। এই কাঠামো বা ছক ইঙ্গিত মাত্র। ইহার রদবদল শিক্ষক যে ভাবে ইচ্ছা করিয়া লইবেন।

দৈনিক সময়-পত্র

১১—১১·২০—শিশুরা আসিয়া শিক্ষকদের অভিবাদন করিয়া শ্রেণীকক্ষে যাইয়া বিভিন্ন দলে শ্রেণীকক্ষ সাজাইবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবে, জিনিষপত্র গোছাইয়া রাখিবে। দলগতভাবে বিদ্যালয় সাফাই করিবে।

১১·২০—১১·৪৫—সকল শিশুর সমবেত হওয়া, প্রার্থনা সঙ্গীত ; দেশ বিদেশের খবর পাঠ ; দৈনিক ঘোষণা ; শিশু বা শিক্ষকের কয়েকটি কথা।

১১·৪৫—১২·৩০—নাম ডাকা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ক্যালেণ্ডারে তারিখ লেখা, শ্রেণীতে আবহাওয়া-পঞ্জী ঠিক করা, খবর পড়া, বলা ও লেখা।

১২·৩০—১·৩০—অনির্দেশিত বা নির্দেশিত কাজ (শিল্পকাজ, প্রজেক্ট, ইত্যাদি), ডাইরী লেখা, স্বাঙ্গীকৃত শিক্ষা ইত্যাদি।

১·৩০—২—বিশ্রাম (এই সময়ে স্কুলে খাওয়ার বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হয় ; আর যদি একান্তই বন্দোবস্ত না করা যায়, তাহা হইলে খাবার বাড়ী হইতে শিশুরা নিয়া আসিয়া এই সময় খাইবে।)

২—২·৪৫—3R (সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম অনুযায়ী)

২·৪৫—৩·১৫—ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান (সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম অনুযায়ী)

৩·১৫—৪—সঙ্গীত, নাটকাভিনয়, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন (সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম অনুযায়ী)।

৪—৪·১৫—দিনের কাজের হিসাব, পরের দিনের কর্ম-পরিকল্পনা।

৫—৬ খেলা।

সপ্তাহের সময়-পত্রে নানা কাজের ইঙ্গিত

শিক্ষক সপ্তাহের কার্যের সময়-পত্র তৈয়ারী করিবার কালে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন। এই বিষয়গুলি সকলই কর্ম-সংশ্লিষ্ট, অতএব এই সমস্ত বিষয় সুষ্ঠুভাবে অনুসৃত হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মের ধারা একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

সাপ্তাহিক সময়-পত্রে শিক্ষক শিশুদের লইয়া **সপ্তাহে এক দিন পরিবেশ পরিচিতির** জন্য বাহির হইবেন। এইরূপ ব্যবস্থা সাপ্তাহিক সময়-পত্রে থাকিবে। পরিবেশ পরিচিতির কাজ সুপরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক শিশুদের সুবিধা অনুযায়ী তাহাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলের নেতার কাছে বিভিন্ন অনুসন্ধান-পত্র দিয়া দিবেন, এবং কি ভাবে তাহারা অনুসন্ধান-পত্রের উল্লিখিত খবরসমূহ সংগ্রহ করিবে, তাহার ইঙ্গিত দিবেন।

এই প্রসঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষায় সমবায় শিক্ষাদান-পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষার তিনটি বিষয় যথা—শিল্প, প্রাকৃতির পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হয় এবং এই তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যাখ্যাকারী ও অনুগামিগণ বলিয়া থাকেন। বিভিন্ন স্তরের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ যাহা এই তিনটি আগ্রহের কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত হইবে না, তাহাই গতানুগতিক পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হইবে, তাহা ছাড়া প্রায় সমস্ত বিষয়ই ঐ তিনটি কেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে শিল্পের উপর যেমন গুরুত্ব দিতে হয়, তেমনই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপর গুরুত্ব দিতে হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ হইতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সংগ্রহ করিতে হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া শিক্ষকের পর্যবেক্ষণের জন্য বাহির হইতে হইবে, একথা পূর্বেই অবশ্য বলা হইয়াছে। কিন্তু বৎসরের সকল সময় প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া পর্যবেক্ষণে বাহির হওয়া হয়ত যাইবে না। কারণ অতিরিক্ত গরম বা বৃষ্টি পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত সময় নয়। তাই শীতকালের কিছু সময় এবং বসন্তকালের কিছু সময় ব্যাপিয়া সপ্তাহে প্রয়োজনবোধে এক দিন বা দুই দিন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য ছাত্র-ছাত্রীরা পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অনুসন্ধান-

পত্রের প্রশ্ন অনুযায়ী নানা তথ্য সংগ্রহ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে যে জিনিষ যোগাড় করিতে পারা সম্ভব তাহাও সংগ্রহ করিবে। পরে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। পাঠের মালমসলা শিশুদের পর্যবেক্ষণের বিবরণী হইতে সংগৃহীত হইবে।

শিশুরা সপ্তাহে এক দিন শিক্ষকের সঙ্গে **তাহাদের জীবনের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিবে।**

আলোচনার পর কাজের ব্যবস্থা। সপ্তাহের সময়-পত্রে অন্ততঃপক্ষে এক দিন **সাম্প্রদায়িক সাফাইয়ের বন্দোবস্ত থাকিবে**। এই সাফাই কাজ প্রতিদিনকার সাফাই কাজ হইতে বিভিন্ন প্রকারের হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এইদিন গ্রামসেবামূলক কাজ কিছুটা করিলে ভাল হয়।

সপ্তাহে অন্ততঃপক্ষে **৫ ঘণ্টা শিল্প-কাজ ও প্রজেক্টের কাজ করিতে হইবে**। এই সময়ের মধ্যে প্রজেক্ট বা শিল্প-কাজকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য বিষয় শেখান হইবে না। এই সময়টুকু শুধু প্রজেক্ট বা শিল্প-কাজেই ব্যয়িত হইবে। **ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষার জন্য সপ্তাহে অপর ৫ ঘণ্টা সময় ব্যয়িত হইবে। খেলা, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সপ্তাহের সময়-পত্রে যথাযোগ্য স্থান পাইবে।** শিশুরা ক্রীড়াকেন্দ্রে প্রতিদিন খেলা করিবে। সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষা প্রতিদিন শিশুরা করিবে না, দুই দিন করিয়া সপ্তাহে চার দিন, প্রতি শ্রেণীর সময়-পত্রে ৩০ হইতে ৪০ মিনিট সময় রাখা যাইতে পারে। সময় বাড়ান বা কমান শিশুদের আগ্রহ ও মনোযোগের উপর নির্ভর করিবে।

সপ্তাহে এক দিন **শিশুরা তাহাদের শ্রেণীর পত্রিকা লেখার জন্য এক ঘণ্টার জন্য সমবেত হইবে**। এই সময় কেহ প্রবন্ধ লিখিবে, কেহ পত্রিকার জন্য ছবি আঁকিবে, কেহ কবিতা লিখিবে, কেহ প্রতি পৃষ্ঠায় ডিজাইন করিবে, কেহ সুন্দর করিয়া পত্রিকাতে লিখিবে, ইত্যাদি।

যদি সম্ভব হয় **শিশুরা ও বালক-বালিকারা সপ্তাহে এক দিন শিক্ষক বা শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ে স্নান করিবে**। স্নানের দিন প্রতি শ্রেণী পালাক্রমে সমগ্র বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিবে। জলখাবার অবশ্য যে-কোন প্রকারের হইতে পারিবে। বিদ্যালয়ের বাগানে যে আলু হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ করিয়া লবণ দিয়া শিশুদের দিতে পারা যায়, বিদ্যালয়ে যদি বেলগাছ থাকে, তবে বেলপানাও মন্দ নয়, তাহাও শিশুদের দেওয়া যায়, ইত্যাদি। এ সকল জিনিষের অভাবে যদি শিশুরা ইচ্ছা করে,

তাহা হইলে কিছু চাঁদা আদায় করিয়া হালুয়া বা রুটি তরকারি ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে পারে। স্নান ও টিফিন তৈয়ারীর মধ্য দিয়া শিশু স্বাস্থ্য, সামাজিক ও পৌরকর্তব্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ছাড়াও নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে। অতএব সপ্তাহের সময়-পত্রে অন্ততঃপক্ষে এক দিন এরূপ কাজের বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হয়। এই সমস্ত ছাড়াও সময়-পত্রে অন্যান্য বিষয়সমূহ শিক্ষার জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে।

এই কয়েকটি বিষয় ছাড়া **নৃত্য, আবৃত্তি, ছন্দানুভঙ্গী, অভিনয় ইত্যাদি এককভাবে বা যখন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া আসিবে তখন তাহাদের বন্দোবস্তও সময়-পত্রিকায় করিয়া লইতে হইবে।** সপ্তাহে অন্ততঃপক্ষে ১½ ঘণ্টা সময় **উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে কাটাইবে।** লাইব্রেরীতে নীরবে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠাভ্যাস করিতে শিখিবে।

শ্রেণী-বিন্যাস

শ্রেণী-বিন্যাস বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন প্রকারের হইবে। একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ; শিশুদের প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস করিতে হইবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষপত্র আমদানী করিয়া শ্রেণী বোঝাই করা উচিত হইবে না। শ্রেণীর প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির কথা নিম্নে উল্লেখ করা হইল। শ্রেণীবিশেষ এইগুলির মধ্য হইতে স্বয়ং-শিক্ষামূলক চার্ট বা বস্তুসমূহ বাছিয়া শ্রেণীর প্রয়োজনে লাগাইতে হইবে। এই সমস্ত কাজ শিক্ষক ও শিশু-দল, উভয়ে মিলিয়া করিবে।—(ক) **ইংরেজী ও বাংলা মাসের ক্যালেণ্ডার,** (খ) **প্রকৃতি-পঞ্জী,** (গ) **আবহাওয়া পঞ্জী,** (ঘ) **শিশুদের কাজের তালিকা,** (ঙ) **প্রকৃতি কোণ,** (চ) **শিশুরা যে যে গান শিখিয়াছে তাহার তালিকা,** (ছ) **দৈনিক খবরের কাগজ,** (জ) **শিশুদের মাসিক পত্রিকা,** (ঝ) **নেতাদের নামের তালিকা,** (ঞ) **দিনের কাজের পরিকল্পনা,** (ট) **দৈনিক তাপ, বৃষ্টি ইত্যাদির চার্ট,** (ঠ) **শিশুদের অঙ্কিত ছবির প্রদর্শনী।**

এই সমস্ত নানা চার্ট ছাড়াও শিক্ষক **শিশুদের প্রয়োজনে** শ্রেণীতে অন্যান্য চার্ট সাজাইয়া রাখিতে পারেন। তাহা ছাড়া শিক্ষক শ্রেণীকে একটি লেবরেটরীতে পরিণত করিবেন, যাহাতে শিশুরা নিজেদের ইচ্ছায় ও প্রেরণাতে তাহাদের আরব্ধ কার্য সম্পাদন করিতে পারে। শ্রেণীতে শিল্প

শিক্ষার যন্ত্রপাতি ও কাজ করিবার মত অন্যান্য বস্তুসমূহ শিশুদের হাতের কাছেই থাকিবে, এইরূপ ভাবে সেই জিনিষগুলি শ্রেণীকক্ষে সাজান থাকিবে। শ্রেণীকক্ষের এক কোণে একটি র‍্যাকে শ্রেণীর লাইব্রেরী থাকিবে। এই শ্রেণী-লাইব্রেরীর পুস্তকসমূহ শিশুরা নিজেদের কর্মের তাগিদেই পড়িয়া ফেলিতে আগ্রহ বোধ করিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান-সমস্যা

প্রথম শ্রেণীর শিশুদের শিক্ষাদানের সমস্যাই বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা, একথা যে-কোন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষককেই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যান্য শ্রেণীর শিশুরা বিদ্যালয়ে কিছুদিন অবস্থানের ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে কিছুটা খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে, অতএব শিক্ষকের পক্ষে সে ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়া খুব কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর শিশুদের হইতেছে গৃহাবেষ্টনজনিত ভিত্তি, যার সঙ্গে বিদ্যালয়ের বুনিয়াদের যথেষ্ট পার্থক্য। অতএব প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের নিকট বৎসরের প্রথম দিকে প্রভূত সমস্যা দেখা দেয়, যার সমাধান বাহিরের লোকেরা যত সহজসাধ্য বলিয়া মনে করেন, ততটা নয়। বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ প্রায় ৩০টি শিশুকে লইয়া শ্রেণী-শিক্ষককে যে কত অসুবিধায় পড়িতে হয় তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। বাড়ী এবং খেলার ছোট আঙ্গিনা হইতে শিশু যখন বৃহত্তর আবেষ্টনীতে আসিয়া প্রবেশ করে, তখন শিক্ষককে করিতে হয় দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান। গৃহ ও বিদ্যালয়ের ব্যবধান বিরাট সন্দেহ নাই, কিন্তু যে শিক্ষক সেই ব্যবধানকে যত ছোট করিয়া শিশুদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিবেন, তিনিই হইবেন প্রথম শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক হইবার যোগ্য ব্যক্তি।

এই ব্যবধান নিরসন পদ্ধতি খুবই কঠিন সন্দেহ নাই। শিক্ষককে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে শিশুর পিতামাতা ভাইবোনের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিতেই হইবে, তবেই শিশু পাইবে অত্যন্ত আপন জন, যাহার নিকট হইতে কোন

কিছু গ্রহণ করিতে তাহার আর আপত্তি থাকিবে না, বরং শিশুর মনে অজানিতে জাগিবে আশা, আনন্দ ও উদ্দীপনা।

প্রথম শ্রেণীর শিশুদের অবস্থা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। প্রথম শ্রেণীতে শিশুরা হয়ত আছে ৩০ জন। দুই-একটি পরিবার হইতে ২।৩ জন করিয়া আসিলেও কম-সে-কম ২৫টি বিভিন্ন পরিবার হইতে তাহারা বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষালাভের জন্য আসে, একথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যায় ২৫টি বিভিন্ন আবেষ্টনী হইতে শিশুদের আসার ফলে বিভিন্ন প্রকার জীবন-যাত্রার মানের সঙ্গে পরিচিত হইয়া এবং তাহাদের ভাবধারার পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দিয়া ও শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া golden mean বা মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়া, শিক্ষককে চলিতে হইতেছে।

এই ত গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হইতেছে প্রত্যেক শিশুকে প্রায় প্রথম শিক্ষার্থী হিসাবে সব কিছুই শিখিতে হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে কিংবা অন্যান্য শ্রেণীতে শিশুর পূর্বজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষককে পড়া, লেখা, অঙ্কশিক্ষা বা অন্যান্য শিক্ষার জন্য আবেষ্টনী তৈয়ারী করিতে হয়। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে শিশুদের পূর্বজ্ঞান কতটুকু? বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ভাষা শিক্ষার পূর্বজ্ঞান শুধু শিশুর কথা বলা, যা **শিশু-জীবনে এখনও সুনিয়ন্ত্রিত হয় নাই**। লেখার পূর্বজ্ঞান **হিজিবিজি আঁকা**, অঙ্ক শেখার পূর্বজ্ঞান **সংখ্যা সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা**। **স্বাস্থ্য পৌর কর্তব্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান স্ব স্ব গৃহোপযোগী**। হাতের কাজে **এলোমেলো সৃজনাত্মক কাজ করিবার ইচ্ছা আছে অথচ প্রেরণা নাই**।

এই ত গেল সংক্ষেপে প্রথম শ্রেণীর শিশুদের অবস্থা। অন্যান্য শ্রেণীর শিশুদের অবস্থা হইতে ইহাদের অবস্থা কত বিভিন্ন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রতিপদে শিশুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের চালনা করিতে হইবে, তাহা না হইলে মুখে বলায় বা আদেশ করায় পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হইবে। গৃহের প্রভাব যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ধারার পরিপন্থী হয়, তবে স্বাস্থ্যরক্ষা বা সামাজিক কর্তব্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানদান খুবই কষ্টসাধ্য হয়। এমন কি লেখাপড়া, অঙ্কশিক্ষা যাহার পূর্বজ্ঞান শিশুর খুবই কম, তাহাও শিশুমনকে সহজে আকর্ষণ করে, তবুও জীবনের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ শিশুদের দ্বারা অনুসরণ করান সম্ভব হইয়া ওঠে না।

প্রথম শ্রেণীর শিশুদের অবস্থা যখন সর্বত্র এইরূপ, তখন সাধারণ শিক্ষক কি ভাবে অগ্রসর হইলে কাজের কিছু সুবিধা হইবে, সেকথা আলোচনা করাই উদ্দেশ্য।

শিক্ষকের কর্তব্য হইতেছে শিশুর শিক্ষার জন্য উপযুক্ত আবেষ্টনী তৈয়ারী করা এবং সেই আবেষ্টনী ক্রমবর্ধমান ও ক্রমপরিবর্তনশীল হইলেও একটা সাধারণ আবেষ্টনী শিশুদের জন্য থাকিবে, যাহাকে প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করিয়া শিক্ষককে শিশুদের লইয়া চলিতে হইবে। এই সাধারণ আবেষ্টনীটি তৈয়ারী করিতে হইবে শ্রেণীকক্ষে। শ্রেণীবিন্যাস এবং শ্রেণীকে উপযুক্ত উপকরণে সজ্জিত করা শিক্ষকের দক্ষতার পরিচায়ক এবং ইহার উপরই শিশুর শিক্ষার গতি নির্ভর করিতেছে।

এখন প্রথম শ্রেণীকে শিক্ষক কি ভাবে সাজাইবেন এবং সেইখানে সর্বনিম্ন কিরূপ ব্যবস্থা করিলে শিশুদের মন সহজে আকর্ষণ করা সম্ভব হইবে, সেই বিষয়ের আলোচনাই এইখানে নিবদ্ধ হইবে।

শ্রেণীকক্ষ খুব যে নানা রকম ছবি দিয়া সাজাইতে হইবে, তাহা নয়। শিশুর প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া শ্রেণীকক্ষ সাজাইতে হইবে ; অতএব বাহিরের লোকেরা কবে আসিয়া বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া বাহবা দিবেন, এই উদ্দেশ্যেই শুধু শ্রেণীকক্ষ সজ্জিত হইবে না।

প্রথমতঃ শ্রেণীতে কয়েকটি বাঁধান সুন্দর ছবি থাকিবে ; মাত্র কয়েকটি ছবি, বেশী নয়। সুন্দর ছবি শিশুমনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ; কিন্তু যদি শ্রেণীকক্ষে খুব বেশী ছবি থাকে, তাহা হইলে শিশুরা সেই ছবিগুলিকে আসবাবের মতই মনে করিবে, উহাদের তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টাই করিবে না। শ্রেণীতে ছবির মধ্যে দুই রকমের ছবি থাকিবে, একরকম থাকিবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-প্রকাশক, আর একরকম ছবি, দেশের অল্প কয়েকজন বড় বড় নেতার, যাঁহাদের জীবন-কাহিনীর সঙ্গে শিশুরা সর্বদা বিদ্যালয়ের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পরিচিত হইবার সুযোগ পাইবে এবং যাঁহাদের জীবনী শিশু-জীবনকে রীতিমত প্রভাবান্বিত করিবে। তাই এইগুলি হইতেছে শ্রেণীর স্থায়ী ছবি, এইগুলিকে কোন সময়ে বদলাইবার প্রয়োজন নাই।

এই স্থায়ী ছবিগুলি ছাড়া শ্রেণী-কক্ষের দেওয়ালে কতকগুলি frieze থাকিবে। এই frieze গুলি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। Frieze গুলি তৈয়ারী করার ভার শিক্ষকের। তিনি শিশুর প্রয়োজনকে ভিত্তি করিয়া frieze তৈয়ারী

করিয়া দেওয়ালে টানাইয়া দিবেন। Frieze গুলি হইবে দুই রকমের। একরকম হইবে বৎসরের বিভিন্ন ঋতুর নানারূপের ছবি। বলা বাহুল্য, সময়োপযোগী নির্দিষ্ট ঋতুর ছবিই শুধু থাকিবে। ঋতু বদল হইলে ছবিও বদল হইয়া যাইবে ; আর দ্বিতীয় রকম frieze হইতেছে বহুল প্রচলিত গল্প-বিষয়ক। গল্পগুলি কয়েকটি ছবিতে রূপায়িত থাকিবে। ছবিগুলিকে পর পর সাজাইয়া রাখিলে শিশুমনকে সহজে আকৃষ্ট করিবে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী ছবিসম্বলিত ছড়া ও কবিতা বড় বড় করিয়া লিখিয়া টানাইয়া রাখা চলে। যে-সব frieze এর কথা বলা হইল তাহাদের চাহিদা শিশুর কাছে মিটিয়া গেলেই শিক্ষক শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুধাবন করিয়া নূতন frieze তৈয়ারী করিবেন। এই সঙ্গে শিশুদের আঁকা ছবি ও প্যাটার্ণ শ্রেণীর দেওয়ালে স্থান পাইবে। তবে সেইগুলির আকর্ষণ শিশুদের কাছে ক্ষণস্থায়ী ও দ্রুত পরিবর্তনশীল। নিজেদের আঁকায় নিজেরা সন্তুষ্ট না হইয়া আরও ভাল ছবি আঁকিয়া সেই স্থান পূরণ করিতে তাহারা চাহিবে।

Frieze এর কাজের সাথে সাথে শিক্ষক আরও একটি প্রয়োজনীয় কাজ করিবেন। শ্রেণীর প্রতি আসবাব এবং জানালা-দরজাতে কার্ড-বোর্ডের লেবেল লাগাইতে হইবে এবং সেই লেবেলগুলিতে বড় বড় মোটা অক্ষরে জিনিষের নাম লিখিয়া রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া 'দরজা খোল,' বই আন,' 'কলম দাও,' 'জানালা বন্ধ কর' ইত্যাদি আদেশসূচক নানারকম বাক্য বড় বড় করিয়া কার্ডে লিখিয়া শিক্ষক নিজের কাছে রাখিয়া দিবেন এবং যখন শিশু উপযুক্ত হইবে, তখন মুখে আদেশ দিবার বদলে শিশুকে আদেশসূচক কার্ড দেখাইয়া কাজে প্রবৃত্ত করাইবেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রেণীকক্ষ শিশুদের আকৃষ্ট করিবে এই উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষক শ্রেণীকক্ষ সাজাইবেন। শ্রেণীকক্ষ আকর্ষণীয় করিতে হইলে নানা জিনিষের যেমন আয়োজন করিতে হইবে, তেমনি কক্ষটি বেশ বড় না হইলেও চলিবে না। সাধারণতঃ ৮ বর্গফুট স্থান হইলেই শিশুদের বসিবার মত স্থানের সঙ্কুলান হইয়া যাইবে, কিন্তু যেহেতু শিশুদের নানাবিধ সৃজনাত্মক কাজ এই শ্রেণীতে বসিয়াই করিতে হইবে এবং শ্রেণীতে নানা জিনিষের ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে, সেই হেতু প্রতি শিশুর জন্য ১৫ বর্গফুট স্থান পাওয়া গেলে শ্রেণীর কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার আশা করিতে পারা যায়।

যে স্থানটিতে বসিয়া শিশুরা পড়াশুনা করিবে সে স্থানে কোন চেয়ার বেঞ্চি ইত্যাদি থাকিবে না, সেখানে আসন পাতিয়া শিশুরা বসিবে। ৩০ জন শিশু ও এক জন শিক্ষকের জন্য একটি শ্রেণীতে অন্ততঃ পক্ষে ৩১টি আসন ও একটি ছোট ডেস্ক থাকিবে। শিক্ষকের ডান কিংবা বাঁদিকে ব্ল্যাকবোর্ড থাকিবে, কোন্ দিকে থাকিবে সেটা অবশ্য ঘরে আলো আসার উপর নির্ভর করিবে। বড় বোর্ডের সঙ্গে ছোট একটি বোর্ড থাকিলে ভাল হয়।

প্রথম শ্রেণীতে দিনপঞ্জী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। একটি ২´×১½´ প্লাই-উডের উপরের অংশে ঐ ঋতুর পরিচায়ক একটি ছবি থাকিবে। ছবিটি সংগ্রহ করিয়া আনা যাইতে পারা যায়, কিংবা শিক্ষক উহা আঁকিয়া বোর্ডে আটিয়া দিতে পারেন। তারপর নীচে লিখা থাকিবে **মাসের নাম**—। শূন্য স্থানে বারটি মাসের কাটা কাটা নাম হইতে যেটি উপযুক্ত তাহা শিশুরাই খুঁজিয়া লইয়া শূন্য স্থানের একটি হুকে লাগাইয়া দিবে। প্রত্যেকটি মাসের নামগুলির উপর আইলেট লাগান থাকিবে, যাহাতে হুকে আটকান সহজ হয়। ইহার পর থাকিবে বারের নাম—, তার নীচে তারিখ—। এই দুই স্থানেও মাসের মত একই প্রক্রিয়ায় কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, শিশুরা প্রতিদিন এই জাতীয় কাজ করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে। তারিখের নীচে থাকিবে, দিনটি কেমন—। অর্থাৎ আবহাওয়ার কথা। 'দিনটি কেমন' এই পর্যায়ে কি লেখা থাকিবে, তাহা পরে আলোচিত হইল।

তাহা ছাড়া পূর্বেই বাংলা ও ইংরেজী মাসের ক্যালেণ্ডার শিক্ষক শিশুদের সাহায্যে তৈয়ারী করিয়া দেওয়ালে টানাইয়া রাখিবেন। এই ক্যালেণ্ডার দেখিয়া প্রতিদিনকার তারিখ লেখা হইবে। ক্যালেণ্ডারের বোর্ডের নীচের অর্ধেকের মধ্যে থাকিবে তারিখ আর উপরের অর্ধেকের মধ্যে থাকিবে যে মাসের তারিখ লেখা হইতেছে, সেই মাসের ঋতু-বৈশিষ্ট্যের ছবি।

দিন-পঞ্জী তৈয়ারী যেমন শিশুদের বার তারিখ ইত্যাদি শিখিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী, তেমনি আবহাওয়ার একটি চার্টও প্রতি দিনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের বিশেষ সহায়ক। পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং সেই হিসাবে আবহাওয়া সম্বন্ধে অবহিত হওয়া শিশুদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ। আবহাওয়ার চার্টে তারিখ থাকিবে ও আবহাওয়ার স্বরূপ নানাভাবে বিশ্লেষণ করা থাকিবে ; সূর্য বলিতে বোঝায় রৌদ্র রহিয়াছে, মেঘের চিহ্ন নাই ; মেঘাবৃত সূর্য মানে, মাঝে মাঝে রৌদ্র, মাঝে মাঝে মেঘ ;

গাছগুলি নুইয়া পড়িয়াছে, তাহার অর্থ বাতাস বহিতেছে; বাতাসের দিক বোঝা যাইতেছে গাছের নুইয়া-পড়া হইতে; তারপর বৃষ্টি পড়িতেছে; এইরূপে নানা ছবির সাহায্যে আবহাওয়ার বিভিন্ন রূপ চার্টে বুঝাইয়া দেওয়া থাকিবে। প্রতিদিন শিক্ষক শিশুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া সেই দিনের বৈশিষ্ট্যগুলি শিশুদের দিয়া নোট করাইবেন।

শ্রেণী-কক্ষের একটি কোণে একটি টেবিলে, পরিবেশ হইতে সংগৃহীত বহু বস্তু থাকিবে। সংগ্রহ করার প্রথম দায়িত্ব হইবে শিক্ষকের, কিন্তু শ্রেণীর কাজ কিছুটা অগ্রসর হইতেই তাঁহাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য শিক্ষক শিশুদের কাছে প্রস্তাব করিবেন। বলা বাহুল্য শিক্ষক এ-বিষয়ে আশাতিরিক্ত সাহায্য পাইবেন। শিশু চায় কাজ করিতে এবং এই জাতীয় কাজ শিশুর খুবই মনোমত। ঋতু এবং ঋতুর দান সম্পর্কে যে সব ছবি টানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার পোষকতা করিবে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত এই সকল বস্তু। প্রকৃতির দান সামান্য নয়, একটি টেবিলে তার সঙ্কুলানও হইবে না। তাই যে সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে শিশুরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবে এবং যেগুলির সংরক্ষণ সম্ভব সেইগুলিই শিক্ষক রাখিয়া দিবেন। বাকীগুলির সঙ্গে শিশুদের পরিচিত করিয়া তিনি সেই জিনিষগুলির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন। নানারকম শস্য, ফলমূল, গাছের ডাল, পাতা, ব্যাঙের ছাতা, শামুক, মৌমাছি, ফড়িং, পাখীর পরিত্যক্ত ডিম, পাখীর পরিত্যক্ত বাসা, পিঁপড়ার ডিম, মৌমাছির চাক, ইত্যাদি যাহা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব সবই শিশুর কাছে প্রীতিকর ও শিক্ষাপ্রদ হইবে।

সংগৃহীত বস্তুগুলির নিকটে একটি কাচে ঘেরা, উপরের-দিক-খোলা বাক্স রাখিয়া তাহার মধ্যে জল দিয়া ছোট ছোট মাছ বা ব্যাঙাচি রাখিয়া তাহাদের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে। এই ব্যাপারে শিশুরা খুবই আনন্দ পাইবে। কাচ-ঘেরা বাক্সও খুব ব্যয়সাধ্য নয়। নিপুণ শিক্ষক একটি কাচের বাক্স অনায়াসে তৈয়ারী করিয়া লইতে পারেন।

একটি প্লেন কাঠের চারিদিকে চারিটি কাঠ খাঁচ করিয়া লম্বভাবে বসাইয়া দিয়া কাচগুলি খাঁচের মধ্যে লাগাইয়া দিলেই কাঁচঘেরা বাক্স হইল। জল যাহাতে চুয়াইয়া না পড়ে, তাহার জন্য পুটিং লাগাইয়া জোড়াগুলি আটকাইয়া দিতে হইবে। এইভাবে কাচঘেরা বাক্স তৈরী করিলে খরচ খুবই কম পড়িবে অথচ শিশুদের মনের খোরাক জোটান যাইবে প্রচুর।

পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য যে বস্তুগুলি সংগৃহীত হইল তাহার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ থাকিবে শ্রেণীর বাগানের। প্রথম শ্রেণীর জন্য একখণ্ড জমিতে বাগান করিতে হইবে, শিক্ষকের সাহায্য লইয়া শিশুরা সেখানে ফুল ও সব্জির গাছ রোপণ করিবে এবং যত্ন করিয়া সেগুলিকে বাঁচাইয়া ও বড় করিয়া তুলিবে।

শ্রেণী-কক্ষের একদিকে যেমন একটি প্রদর্শনী রহিল, সেইরূপ আর একদিকে থাকিবে একটি খেলার দোকান-ঘর। এই দোকানে থাকিবে নানা রকমের জিনিস। জিনিসগুলি সবই কৌটায় বা বড় বড় কার্ডবোর্ডের বাক্সে থাকিবে। কোন বাক্সে বা কৌটায় কি আছে তাহা জানিবার জন্য সেই কৌটায় বা বাক্সে লেবেল লাগাইতে হইবে এবং সেই লেবেলে লেখা থাকিবে বড় বড় অক্ষরে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের নাম। আর তারপর থাকিবে জিনিসের দাম সহ একটি তালিকা। জিনিসের দাম কল্পনাপ্রসূত হইবে না। বাস্তব জীবনে জিনিসের যে দাম প্রচলিত আছে, সেই দামই তালিকায় লেখা থাকিবে। জিনিসের নাম ও দাম প্রথমে লিখিয়া দিবেন শিক্ষক, তারপর শিশুদের পরিচালনার ফলে দোকানের অবস্থা নানাদিক হইতে উন্নত হইবে, তখন শিশুরাও যাহা কিছু লিখিবার সব লিখিয়া লইবে। দোকানে দাঁড়িপাল্লা ও ওজন থাকিবে। প্রতিদিন একজন হইবে বিক্রেতা আর সকলে হইবে ক্রেতা। জিনিস কিনিতে হইলে টাকা-পয়সার প্রয়োজন; সেই প্রয়োজন মিটিবে কার্ডবোর্ডের টাকা-পয়সা তৈয়ারী করিয়া। আসল মুদ্রার সঙ্গে কার্ডবোর্ডের কিছু টাকা, আধুলি, সিকি, দশ, পাঁচ ও দুই নয়াপয়সা ও এক নয়া-পয়সা শিক্ষক নিজেই তৈয়ারী করিয়া রাখিবেন, যাহাতে করিয়া শিশুরা ঐ কার্ডবোর্ডের মুদ্রাগুলির সঙ্গে সহজে পরিচয় স্থাপন করিতে পারে। দাঁড়িপাল্লার সঙ্গে বাটখারার প্রয়োজন। দাঁড়িপাল্লা শিক্ষক অতি সহজেই তৈয়ার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু বাটখারা আসল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই জাতীয় বাটখারার দ্বারা দুইটা কাজ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ সত্যিকার ওজন সম্বন্ধে ধারণা এবং সেই ওজন-নির্ধারক মানের সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মান হয়। দুইয়ের সামঞ্জস্য যাহাতে হয় সেজন্য আসল বাটখারা বিশেষ কার্যকরী হইবে। সম ওজনের ইট-পাটকেল ততটা মনোগ্রাহী হইবে না কিংবা তাহা দ্বারা ওজনের প্রচলিত মানের সম্বন্ধে ধারণা লাভও হইবে না।

দোকান সম্বন্ধে আরও দুই-একটি কথা না বলিলে শ্রেণীতে দোকান করার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। দোকানের দেওয়ালে দোকান পরিচালন সংশ্লিষ্ট কয়েকটি কথা লেখা থাকিবে। যথা—

এক দর। ধারে বিক্রী নাই। ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না। লাইনে দাঁড়াইবেন। ফেরৎ পয়সা গুনিয়া লইবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘরের এক কোণে দোকান-ঘর হইল, আর এক কোণে থাকিবে একটি পুতুলের সংসার। একটি বাড়ী, পুতুল, তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। খাট, বিছানা, কাপড়-চোপড়, থালা-বাসন ইত্যাদিও কিছু কিছু থাকিবে। সামান্য ছোট সংসার, ইহার উপর ভিত্তি করিয়া শিশুরা পুতুল-সমাজের যথেষ্ট উপকার করিতে পারে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও অন্যান্য উৎসব ঐ পুতুলের সংসারকে কেন্দ্র করিয়াই করিতে পারা যায়।

অনেক শিক্ষাবিদ্ প্রথম শ্রেণীতে এইরূপ একটি পুতুলের সংসার রাখা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন। সংক্ষেপে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিতে গেলে এটুকু বলিতে পারা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর শিশুরা তেমন ভাবে প্রজেক্ট অনুসরণ করিতে পারে না। অথচ শুধু খণ্ড খণ্ড activity তাহাদের সব সময় আনন্দ দিতে পারে না, তাই এমন একটা চিত্তাকর্ষক কেন্দ্র শ্রেণীতে স্থাপন করা যায়, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া শিশুরা প্রজেক্ট না হইলেও প্রজেক্ট-এর মত কিছু করিতে পারে। পুতুলের সংসার, নিজেদের সংসারেরই ছায়া বলিয়া শিশুদের কাছে ঐ কেন্দ্রকে ঘিরিয়া কোন কিছু রচনা করিতে পারা অসম্ভব হইবে না।

শ্রেণীর এক অংশে যেমন পুতুলের সংসার রহিল, সেইরূপ আর এক অংশে থাকিবে একটি ছোট লাইব্রেরী। ছোট একটি আলমারি, তাহাতে থাকিবে শিশুদের উপযোগী কিছু ছবির বই। আলমারির নিকট একটি নীচু অথচ বড় টেবিল থাকিবে, আর তাহার চারিদিকে থাকিবে ৫।৬ খানা চেয়ার। যে সব শিশু কোন activityতে যোগদান করিতে চাহিবে না অথচ পড়িতে চাহিবে, তাহাদের জন্য এ ব্যবস্থা থকিবে। তবে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশুই যেন বই পড়ার সুযোগ পায়।

শ্রেণীতে এসব জিনিষ ছাড়াও, শিশুদের নিত্য ব্যবহারের উপযোগী নানারকম জিনিসের বন্দোবস্ত থাকিবে। চক্, ক্রেয়ন, রং, তুলি, বাঁশ, বেত, কাটারি, কাগজ, কাঁচি, তুলা, তক্‌লি, কাঠ, পেরেক, হাতুড়ি, করাত, আঠা,

কোদাল, খুরপি ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস শ্রেণীতে মজুত থাকিবে। শ্রেণীকক্ষের বাহিরে একটি বালির স্তূপের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, আর তাহার অদূরে থাকিবে মাটির কাজ করিবার স্থান। সুবিধা হইলে কাছেই খুব অগভীর একটি চৌবাচ্চা মাটির সমতলে তৈয়ারী করিয়া রাখিলে ভাল হয়।

Activityগুলি কি ভাবে পরিচালিত হইবে সে প্রসঙ্গের আলোচনা করা এইখানে সম্ভব নয়, কিন্তু activityর সঙ্গে অন্যান্য যে শিক্ষণীয় বিষয় যুক্ত থাকিবে, তাহার জন্য পূর্বাহ্নে প্রস্তুতি প্রয়োজন। Activityর উপর নির্ভর করিয়া সাহিত্যের যে যে পাঠের উদ্ভব হওয়া সম্ভব, প্রথম অবস্থায় সেইসব পাঠগুলির প্রতি বাক্য ১০″।১২″ দৈর্ঘ্য এবং ২″।২½″ প্রস্থ কার্ডবোর্ডে, বড় বড় মোটা হরফে লিখিয়া সেই বাক্য এবং বাক্যের অংশ, শব্দ ও অক্ষর বড় বড় খামে পুরিয়া রাখিতে হইবে। প্রয়োজন-অনুযায়ী শিশুকে সেই পাঠগুলি পড়িতে ও লিখিতে দিতে হইবে। শিশু সেইগুলি পড়িবে এবং বাক্য ও শব্দ তৈয়ারী করিবে, ভাঙ্গিবে এবং আবার গড়িবে। Activity হইতে উদ্ভূত বস্তুর ছবির মিলিত সংখ্যাও মোটা হরফে লিখিয়া শিশুকে প্রয়োজন অনুযায়ী দিতে হইবে। সংখ্যার ধারণা দিবার জন্য activity ছাড়াও নানা রকম খেলার যোগাড় রাখিতে হইবে। এই খেলাগুলি অবশ্য শিক্ষক নিজেই তৈয়ারী করিয়া দিবেন। এই জাতীয় খেলার মধ্যে লুডো, সাপ ও সিঁড়ি, গোলকধাঁধা ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। খেলা ছাড়া সংখ্যার ধারণা দিবার জন্য শ্রেণীতে কয়েকটী বলফ্রেমের যোগাড় রাখিতে হইবে।

সংক্ষেপে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণীতে কি জিনিসের প্রয়োজন তাহার সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হইল। শ্রেণীর প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিসগুলি সংখ্যায় কমিবে বা বাড়িবে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে পুরানো শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে মুক্ত হইয়া যদি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারাই অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রেণী নানা উপকরণে পূর্ণ রাখিতে হইবে। শিশু কর্ম চায়, কাজ করিতে পারিলে সে যত সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়, বসিয়া বসিয়া শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী পড়াশুনা করিতে সে তাহার শতাংশের এক অংশও আগ্রহ বোধ করিবে না। কিন্তু কর্ম করিতে চাহিলেই শিশুকে যে ভাবে ইচ্ছা কাজ করিতে দিলে চলিবে না, সেইখানেই চাই শিক্ষকের পরিকল্পনা। মনে রাখিতে হইবে, প্রথম শ্রেণীর শিশুর পক্ষে সমস্তই নূতন, লেখাপড়া, সংখ্যা, পরিবেশ-সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু, স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিকতা ও

পৌরকর্তব্য ইত্যাদি সব কিছুই তাহাকে নূতন শিখিতে হইবে। অতএব শিশুকে সুনিয়ন্ত্রিত কর্মের মাধ্যমে আনন্দের মধ্যে শিক্ষা দিতে পারিলেই, কাজ শিক্ষকের পক্ষে সহজ হইবে। নানা উপকরণে সজ্জিত শ্রেণী হইতেছে নাটকাভিনয়ের বাঁধা স্টেজ, যাহাকে নির্দিষ্ট অভিনয়ের জন্য সামান্য পরিবর্তন করিয়া কাজে লাগান যাইতে পারে। যে-সব উপকরণের কথা বলা হইয়াছে, সেই সব উপকরণ সংখ্যায় ও প্রকরণে, কমবেশি, স্থান, কাজ ও পাত্র অনুযায়ী প্রতি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে থাকিবে, তবেই শিশুগণকে কর্মে প্রবৃত্ত করা সম্ভব হইবে।

উপকরণের তালিকা দেখিয়া হয়ত শিক্ষক বলিবেন যে, স্কুলবোর্ডের পক্ষে একটি শ্রেণীর জন্য এত খরচ করা সম্ভব নয় এবং চাহিলেও টাকা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু যে-সব জিনিসের কথা লেখা হইয়াছে, তাহাতে টাকা দিয়া কিনিবার মত জিনিসের সংখ্যা খুব বেশি নাই। টাকা বেশি খরচ হইবে হয়ত লাইব্রেরীতে। কিন্তু বইয়ের ব্যবস্থা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকারের ১৯৫০ সনের সার্কুলার অনুযায়ী যাহা হইয়াছে, তাহাতে লাইব্রেরীতে খুব বেশি টাকা খরচ হইবে না। প্রত্যেকটি শিশু শ্রেণীর উপযোগী বিভিন্ন লেখকের একটি করিয়া বই কিনিবে এবং সেই বইগুলি শ্রেণীর লাইব্রেরীতে থাকিবে। তাহা হইলে সব শিশুই সব বই পড়িবার ও দেখিবার সুবিধা পাইবে। এই ব্যবস্থা খুব বেশি কার্যকরী হওয়া মুশকিল স্বীকার করিলেও উদ্যোগী শিক্ষক যদি অভিভাবকের সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করেন, তবে শ্রেণীর লাইব্রেরীতে শিশুদের পুস্তক রাখা খুব বেশি অসুবিধাজনক না-ও হইতে পারে।

উপকরণের জন্য পৌনঃপুনিক নিয়মিত খরচ (recurring expenditure) হইবে চক্, রং কাগজ ইত্যাদিতে। আর কোদাল, খুরপি, হাতুড়ি, কাটারি, করাত ইত্যাদি কিনিতে খরচ হইয়াছে স্কুল স্থাপনের সময় এককালীন খরচের টাকা (capital expenditure) হইতে। এককালীন টাকা ত স্কুলের প্রথম অবস্থায় পাইতে হইবেই, আর সামান্য পৌনঃপুনিক (recurring) খরচও বুনিয়াদী স্কুলের জন্য যেভাবে হোক যোগাড় করিতে হইবে। কিন্তু উপকরণের তুলনায় খরচ হইবে অতি সামান্য একথাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। বেশীর ভাগ জিনিসই শিক্ষককে পরিশ্রম করিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক জিনিস কিনিবার অপেক্ষায় থাকিলে খরচে ত কুলাইবে না, দ্বিতীয়তঃ পয়সা দিয়াও ঠিক উপযুক্ত জিনিস পাওয়া যাইবে না। অতএব শিক্ষককেই

মাঝে মাঝে শিশুদের সাহায্য লইয়া সমস্ত জিনিষ তৈয়ারী করিয়া ফেলিতে হইবে। বলা বাহুল্য শিশুর কাছে ইহার মূল্য মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়।

প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান কালে কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ভাবে তাহার তালিকা দেওয়া হইল। এই উপকরণ ও জিনিস-পত্রাদি কিভাবে কাজে লাগাইলে সুফল পাওয়া যাইবে সে আলোচনার ক্ষেত্র এই স্থানে নয়, তবুও এই উপকরণগুলির সাহায্যে শিশু কতটা শিক্ষা পাইতে পারে তাহাই শুধু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

১। Activity হইতে শিশুরা শুধু কাজ করিতেই শেখে না বা তাহাদের হাতের মাংসপেশীগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হয় না—তাহারা পড়িতে, লিখিতে, অঙ্ক করিতে, পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে, ভদ্রভাবে চলিতে, মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতেও শিক্ষা লাভ করে।

২। Friezeগুলি হইতে শিশুর সৌন্দর্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়, শিশুরা কল্পনা হইতে গল্প তৈরী করিতে, বলিতে ও লিখিতে শিখে। তাহারা কবিতা আবৃত্তি ও অভিনয় করিতে শিখে এবং আবেষ্টনীর জ্ঞানও তাহাদের বৃদ্ধি পায়।

৩। দোকান-ঘর হইতে লেখাপড়া ও অঙ্কশিক্ষা ছাড়াও সামাজিক ও পৌরকর্তব্যাদি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করে।

৪। পুতুলের সংসার হইতে স্বাস্থ্যরক্ষা, পৌরকর্তব্য, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা ইত্যাদি শিক্ষা পায়।

৫। সংগৃহীত দ্রব্যাদি হইতে পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় গভীর হয়। পড়িতে ও লিখিতে প্রেরণা জাগে।

৬। লাইব্রেরীতে পড়া হইতে শিশুরা নীরবে, অন্যের অসুবিধা না করিয়া পড়িতে শিখে ইত্যাদি।

প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদানের সমস্যা খুব বেশি। মোটের উপর শিক্ষককে সর্বদা শিশুর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা শিশুদের লইয়া কি করিতে চাই, কি আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, কি ভাবে চলিলে সেই আদর্শে পৌঁছান যাইতে পারে, সেই দিকে শিক্ষকের সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তবেই প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান সফল হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাঙ্গীকৃত শিক্ষা (সম্বন্ধিত শিক্ষা)

(Integrated Teaching)

যেখানে জীবনের কোন প্রত্যক্ষ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইখানেই এইরূপ সাঙ্গীকৃত শিক্ষা সম্ভবপর হয়। এইরূপ শিক্ষার প্রধান কথা এই যে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পরস্পর বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন, অমূর্ত জ্ঞান হিসাবে না আসিয়া, বাস্তব সমস্যা ও ঘটনার সহিত প্রত্যক্ষ সংযুক্ত ও সজীব রূপ পায়। এইরূপ শিক্ষা ও তাহার প্রয়োগ একই সঙ্গে যুক্ত থাকায়, শিশু সহজেই শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারে। প্রচলিত শিক্ষার অমূর্ত মামুলি সাহিত্যিক শিক্ষা প্রধানতঃ শিশুর বুদ্ধিকেই প্রভাবান্বিত করে, তাহার ভাবময় জীবন ও কর্মময় জীবনে কোনরূপ গভীর রেখাপাত করে না। বিচ্ছিন্ন ভাসাভাসা জ্ঞান শিশুকে কর্মবিমুখ করিয়া তোলে। শিশু সাধারণতঃ আচরণ-ধর্মী, সে নানারূপ আচরণ ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকে এবং উহা সমস্তই তাহার জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এই জন্য পূর্ব-প্রচলিত মামুলি সাহিত্যিক শিক্ষা অপেক্ষা জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত শিক্ষা বা সাঙ্গীকৃত শিক্ষা শিশুর পক্ষে অনেক বেশী সার্থক। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহকে অবলম্বন করিয়াই সাঙ্গীকরণ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এই জন্যই স্বাভাবিক আগ্রহগুলিকে জানা ও বোঝা প্রয়োজন। সাধারণতঃ শিশুরা তাহাদের প্রবৃত্তিগুলির দ্বারাই অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনের মধ্যে উন্নতধরণের ভাবাবেগ-সমূহ গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। এবং ইহাদ্বারা সাঙ্গীকৃত পদ্ধতিতে নূতন নূতন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

প্রথম শ্রেণীর শিশুদিগকে শিশুদের প্রিয় খেলা, বেড়ান, খাওয়া ইত্যাদিকে অবলম্বন করিয়া সাঙ্গীকৃত শিক্ষা সার্থকভাবে দেওয়া যায়, কারণ এই সময়ে তাহাদের অনুকরণ-প্রবৃত্তি, সংগ্রহপ্রবৃত্তি, খাদ্যান্বেষণ প্রভৃতি প্রবৃত্তি-নিচয়েরই প্রভাব অধিক। 'পুতুলের বিবাহ' শিশুদের নিকট একটি আনন্দদায়ক খেলা,

ইহা অনুকরণ-প্রবৃত্তির পরিপোষক। এইরূপ একটি খেলার মধ্য দিয়া শিশুদের কল্পনাশক্তির বিকাশ হয়, নানা দ্রব্যের সঙ্গে পরিচয় হইয়া থাকে। ইহাতে সামাজিক জীবনের এক অংশ তাহাদের নিকট স্পষ্টতর হয়, ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়, এবং স্বাভাবিক আগ্রহকে ব্যাহত না করিয়াও কিছু পরিমাণে গণিতের মত কঠিন বিষয়ের অবতারণা করা যায়। কিন্তু শিশুদের যখন বয়োবৃদ্ধি হয়, তখন তাহাদের আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয় অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে দেশাত্মবোধ, সঙ্ঘ-অনুরক্তি প্রভৃতি উন্নততর ভাবাবেগ গড়িয়া তোলা সম্ভব এবং তখন আমরা কোন জাতীয় নেতার স্মরণতিথি পালন, জাতীয় পতাকা অভিবাদন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রতিও তাহাদিগকে আগ্রহী করিয়া তুলিতে পারি। এইরূপ অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া শিশুর কাছে সহজেই আরও প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করিতে পারি এবং এই বয়সের মধ্যে শিশুদের স্বাবলম্বনের মনোভাব উত্তরোত্তর বিকশিত হইয়া উঠায় শিশুরা উৎসবে হিসাব-নিকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে আরও সহজে গণিত প্রভৃতি বিষয় শিখিবার এবং উৎসবে-অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা ও অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে যথেষ্ট সাহিত্য শিক্ষার সুযোগ পায়।

উপরের উহাহরণগুলি হইতে আমরা দেখিব যে, সাঙ্গীকরণ শিক্ষায় শিশুর জীবনকে অবলম্বন করিয়া সহজেই শিক্ষামূলক বিষয়গুলির অবতারণা ঘটিতেছে এবং জীবন ও শিক্ষা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যাইতেছে। ডিউই (Dewey) ইহাকেই Education through Life বলিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে শুধু যে পাঠ্য বিষয়গুলিকেই পৃথক্ করা যায় না তাহা নহে, জীবন হইতেও শিক্ষাকে পৃথক করা যায় না। ইহার আর একটি সুবিধা এই যে, জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শিশুর নিকট জীবন্ত সত্যরূপে প্রতিভাত হয় এবং শিশুর সমগ্র জীবনে শিক্ষার আগ্রহ সঞ্জীবিত থাকায় শিশু সহজেই নিজের প্রচেষ্টায় শিখিতে যত্নশীল হয় এবং শৈশবে তাহার শিক্ষা কতখানি অগ্রসর হইল, ইহা লইয়া হিসাব করিবার প্রয়োজন ঘটে না। যদি এই পদ্ধতিতে প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা শিক্ষার গতি প্রথম দিকে কিছু শ্লথও হয়, তাহাতেও বিচলিত হইবার কোন হেতু নাই, কারণ শিক্ষার অন্তর্নিহিত প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া শিশু যদি শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ অনুভব করে, তাহা

হইলে পরবর্তী জীবনে এই আপাতক্ষতি পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবে না, পরন্তু শিক্ষা ও জীবন এই দুইয়ের মধ্যে অসঙ্গতি, শিক্ষার যে বিরাট অপচয় ঘটাইতেছে তাহা রোধ হইবে ও সমাজ উন্নত হইবে।

সাঙ্গীকৃত শিক্ষাদানের কয়েকটি পাঠটীকার নমুনা

পাঠটীকা রচনা করা সম্পর্কে কোন একটি বিশেষ ছক অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ না করা হইলেও কোন পাঠটীকার ছক বা নমুনা সম্বন্ধে প্রত্যেক নূতন শিক্ষাব্রতীরই পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। পাঠটীকার বিস্তৃত নোট শিক্ষক নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী করিয়া লইবেন, কিন্তু সেই পাঠটীকার মধ্যে সাঙ্গীকৃত শিক্ষার ফলে অন্যান্য যে সব জিনিষ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু হিসাবে স্বচ্ছন্দে, স্বাভাবিকভাবে শিশুর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই আসিবে, সেই সম্বন্ধে সামান্য নির্দেশ এইখানে এই ছক বা পরিকল্পনার মধ্যে থাকিবার প্রয়োজন আছে। তাহার কারণ, এইরূপ একটি আগ্রহের কেন্দ্রের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি কতদূর হইতে পারে, তাহার একটি নমুনাসূচক নির্দেশনামা নূতন নূতন শিক্ষাব্রতীরা না জানিতে পারিলে অপরাপর আগ্রহকেন্দ্রগুলির উপযুক্ত সম্বন্ধিত বা সাঙ্গীকৃত জ্ঞানের পরিকল্পনা তাঁহারা করিতে পারিবেন না। এই কারণেই অতি সংক্ষেপে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেণীর জন্য পাঠদানের ছক একটি করিয়া দেওয়া গেল। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠটীকাটি একটু বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইল, কিন্তু অন্যান্য পাঠটীকাগুলি একটি বা দুইটি বিষয়ে নিবদ্ধ থাকায় সংক্ষিপ্ত। শিক্ষক মহাশয়েরা শিশুদের প্রয়োজন ও আগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবেন।

প্রচলিত বিদ্যালয়ে শিশুর জীবন সাধারণতঃ বৈচিত্র্যহীন ও সঙ্কীর্ণ। তাহার কারণ শিশুর সঙ্গে শিক্ষকের ভাবের একান্ত অভাব। শিক্ষকের সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ ও যোগাযোগ অতিশয় সীমাবদ্ধ এবং পুস্তকের চাপে শিশুর দেহ-মন অত্যন্ত রসহীন। জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা যদি সফল করিতে হয়, তাহা হইলে শিশুর বিদ্যালয়-জীবনের এই সঙ্কীর্ণতা ও রসহীনতার পরিবর্তে তাহাকে সরস, সাবলীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। কাজকর্ম, উৎসবানুষ্ঠান, ভ্রমণ, সাহিত্য-সভা, পত্রিকা-সম্পাদন, সাফাই ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়া শিশু-জীবনে বৈচিত্র্যের আমদানী করা যাইতে পারে। শিশুর জীবনের স্বাভাবিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই এই সকল বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা

করা হইয়া থাকে, যেন ঐগুলি তাহাদের সমষ্টি-জীবনের অংশ হইয়া দাঁড়ায় এবং শিক্ষকের চাপান ব্যাপার হইয়া না থাকে—কারণ তাহা না হইলে জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

প্রথম শ্রেণীর শিশুদের বয়স ও অভিজ্ঞতা খুবই অল্প। তাহা ছাড়া শিশুর জীবনে কোন কর্ম ও চিন্তাধারা কিছুই দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। প্রথম শ্রেণীর শিশুদের পক্ষে কোন কাজে বা ঘটনায় দীর্ঘ সময় মনোনিবেশ করা বা বিষয় সম্বন্ধে ধারাবাহিক আগ্রহ রক্ষা করা মোটেই সম্ভব নয়। এই জন্য এই বয়সের শিশুর বিদ্যালয়-জীবনে নানা বৈচিত্র্যময় খেলাধূলা ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখিয়া ঐগুলির মধ্য দিয়াই শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হয়। সূতা কাটা, বাগানের কাজ ইত্যাদিতে শিশুরা অতি আনন্দের সঙ্গেই যোগদান করে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সমস্ত কাজকেই লক্ষ্যীভূত করিয়া ধারাবাহিক প্রচেষ্টাদ্বারা কর্ম সম্পাদন করিতে পারেন। সুতরাং খেলা-ধূলা, অনির্দেশিত কাজ ইত্যাদি খেলাচ্ছলে সম্পাদিত কর্ম হইতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীতে পাঠদান করিতে শিক্ষকেরা সবচেয়ে বেশী অসুবিধা ভোগ করেন। তাহার কারণ হইতেছে, এই শ্রেণীতে শিশুরা বাড়ি হইতে প্রথমে আসিয়া ভর্তি হয় এবং গৃহ ও বিদ্যালয়ের ব্যবধান তাহাদের কাছে অত্যন্ত বড় বলিয়াই বিদ্যালয়ের জীবনকে আপন করিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে অসুবিধাজনক বোধ হয়। তারপর বিদ্যালয়ের নূতন জীবনের সঙ্গে আসে লেখা, পড়া, অঙ্ক—উহাদের সাথে কোন পরিচয়ই শিশুর পূর্বে ছিল না। অতএব সব কিছুর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শিক্ষকের পক্ষে চলা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি। অন্যান্য শ্রেণীর শিশুদের কতকগুলি অভ্যাস পূর্বেই গঠিত হইয়াছে, এবং লেখা পড়া অঙ্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ ভিত্তি শিশুমনে দানা বাঁধিয়া উঠার ফলে শিশুর অগ্রগতিতে শিক্ষকের সাহায্যদান অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া মনে হয়।

কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও পুরাতন প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ না করিলেও প্রকৃত ব্যবধান হিসাবে এইটুকু উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষা জীবন-বহির্ভূত নয়, লেখাপড়া ও অঙ্কের সঙ্গে শিশু-জীবনের যতটুকু কর্ম সেই বয়সের উপযুক্ত, তাহা শিশুর অবশ্য করণীয়। 'গুরুজনকে

ভক্তি করিবে,' শুধু বইয়ের পাতায় নয়, শিশুরা জীবনেও উহা অঙ্গাঙ্গী-ভাবে যুক্ত থাকে; পৌরকর্তব্য বা স্বাস্থ্য-বিষয়ক অন্যান্য শিক্ষা বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, জীবনের অবশ্য-পালনীয় নির্দেশ হিসাবে শিশুকে গ্রহণ করিতে হয়। **ধরিয়া বাঁধিয়া শিশুকে নির্দেশ দেওয়া হয় না, পরোক্ষ নির্দেশ, কর্মের ভিতর দিয়া শিশুর জীবনে অভ্যাসরূপে গঠিত হয়।** অতএব কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে জীবন ও জীবনের জন্য প্রস্তুতি এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শিশুকে চলিতে হয় বলিয়াই প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে চালনা করা সবচেয়ে কঠিন কাজ বলিয়া শিক্ষকের মনে হয়।

বিদ্যালয়ের এই শ্রেণীতে শিশু প্রথম আসে। প্রাক্-প্রাথমিক বা পূর্ব বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষাই সে পায় নাই। অতএব সে বিদ্যালয়ে আসিয়া কিভাবে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবে, তাহাই তাহার কাছে হয় সমস্যা। এই সমস্যা শুধু শিশুর নয়, শিক্ষকেরও, এবং তাঁহার কাছেই এ-সমস্যার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণটা একটু খুলিয়াই বলিতেছি। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে, সেখানে শিশুরা নাকি খুব বেশি স্বাধীনতা পায়, নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে পায় ইত্যাদি। **শিশু স্বাধীনতাও পায়, শিশুর ইচ্ছাকেও সম্মান দেওয়া হয়, কিন্তু কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি করা হয় না।** শিশুকে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার ভিতর না রাখিলে শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। শিক্ষকের ইঙ্গিতপূর্ণ (suggestive) নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা দানের ফলেই শিশু শিক্ষার একটা ধারা পাইতে পারে, সুঅভ্যাস তাহার মধ্যে গঠিত হওয়া সম্ভব হয়, লেখাপড়ার দিকে শিশুমন একটা গতি পায়। অতএব শিক্ষকের দায়িত্ব কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট, এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সাধারণ প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেমন শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু বইয়ের পাতার মধ্যেই নিবদ্ধ, কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব তেমনি সীমাবদ্ধ বইয়ের বাহিরে বহু দূরে প্রসারিত; কর্মের ধারা উভয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন।

প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর শিশুদের উপর বাহিরের শাসন আরোপ করিয়া শ্রেণীগত ভাবে শিক্ষা দিয়া নিজের দৈনন্দিন কর্তব্য শেষ করেন, কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষককে শিশুদের

ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ, ঔৎসুক্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া শিশুর সমগ্র জীবন গঠনে অগ্রসর হইতে হয়। শিশুর কাজের মধ্যে থাকে আনন্দ, এবং সেই আনন্দপূর্ণ কাজের মারফৎ শিশুরা শেখে স্বাস্থ্যনীতি, সামাজিক কর্তব্য, লেখাপড়া, অঙ্ক ইত্যাদি; শিশুর অজানিতে শিশুর মনের মধ্যে মধ্যে শিশু-জীবনের কর্তব্যগুলি দানা বাঁধিয়া ওঠে। এখানে শিশুর উপর বাহিরের শাসন নাই, আছে কর্মের মধ্য দিয়া ইঙ্গিতপূর্ণ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। কর্মের আনন্দ, এবং কর্ম-উদ্ভূত ক্লান্তির অপনোদনের যে ব্যবস্থা তাও আনন্দপূর্ণ, অতএব শিক্ষার রূপ শিশুদের কাছে ভীতির বস্তু নয়, আনন্দের আহ্বান মাত্র। শিশুর জীবনে যিনি এইরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করেন, সেই শিক্ষকের দায়িত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

নিম্নে বর্ণিত পাঠটি প্রথম শ্রেণীর শিশুদের বৎসরের দ্বিতীয় মাসে দেওয়া চলিতে পারে। বৎসরের প্রথম মাস যাইবে শিশুদের বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করাইতেই। শিক্ষক এই সময় নানা গল্প, খেলা, ছড়া, সঙ্গীত, প্রকৃতি-পরিচয় ইত্যাদির মধ্য দিয়া শিশুদের জড়তা কাটাইয়া দিবেন, এবং শিশুর মনকে নানাভাবে পড়া ও লেখার জন্য প্রস্তুত করিবেন। তাই দ্বিতীয় মাসে যখন শিশুরা মৌখিক প্রকাশে কিছুটা সক্ষম, যখন তাহাদের অঙ্কন বা নানা রকম কাজ করার ফলে অঙ্গুলি সঞ্চালন কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তখন এইরূপ পাঠদান সম্ভব, এবং শিশুদের পক্ষে আনন্দ সহকারে ইহার অনুসরণও সহজসাধ্য। বলা বাহুল্য, এই সময়ে শিশুরা নানা রকম খেলার মধ্য দিয়া বা লেখাপড়ার জন্য মন প্রস্তুতীকরণের ফলে নিজেদের নাম এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় শব্দ বাক্য সমগ্র ভাবে পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছে। এইরূপ অবস্থায়ই উক্তরূপ পাঠের অবতারণা চলিতে পারে।

উক্ত পাঠটীকা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শিশুদের জন্য মাত্র তিন রকমের কাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষকের পক্ষে যে-সব কাজের উপকরণ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য তাহাই এইখানে উল্লেখ করা হইল। অবশ্য এইসব উপকরণও সব সময়ে সব বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ইহার চেয়েও কম পয়সায় বা বিনা পয়সায় যোগাড় করা যায় এমন সব উপকরণ এবং তৎসংযোজিত কর্মের কথা কেহ হয়ত উল্লেখ করিতে পারেন। কিন্তু **শিশুর**

প্রথম শ্রেণীর আংশিক পাঠটীকা—শিশুর সংখ্যা—৩০ ; সময়—১½ ঘণ্টা

১	২	৩	৪	৫
কাজ	উদ্দেশ্য	পরিকল্পনা	উপকরণ	উপস্থাপন
ছবি আঁকা, কাগজ কাটা, ও মাটির জিনিষ রং করা। **বিশেষ দ্রষ্টব্য** :— শ্রেণীতে এই তিনটি কাজেরই ব্যবস্থা থাকিবে, বেশী কাজের ব্যবস্থা করার স্থবিধা নাই।	আত্মপ্রকাশের স্থযোগ দেওয়া।	শিশুদের সহযোগিতায় শিশুদের তিনটি দলে ভাগ করা এবং কাজ করিতে কি কি জিনিষের প্রয়োজন হইবে তাহা শিশুদের সাহায্যেই স্থির করা। **বিশেষ দ্রষ্টব্য** :— যদি শ্রেণীতে এমন ৩।৪টি শিশু থাকে, যাহারা শ্রেণীতে নূতন আসিয়াছে অন্য কোন কাজ করিতে চায় না, তাহা হইলে তাহাদের জন্য কয়েকটি সীমা-রেখা ছবি দেওয়া হইবে। শিশুরা সেই-গুলি লাল নীল পেন্সিল বা ক্রেয়ন দিয়া ভরাট করিবে।	ছবি, খাতা, লাল-নীল পেন্সিল, ক্রেয়ন, রং, তুলি মাটির জিনিষ, চক, বোর্ড ইত্যাদি।	শিশুরা কয়েকটি দলে ভাগ হইয়া কাজ করিবে, আমি তাহাদের কাজ দেখিব, যদি কেহ সাহায্য চায় তাহা হইলে তাহাকে সাহায্য করিব। ১। ছবি আঁকার দল—শিশুদের সংখ্যানুযায়ী হয়ত রংএর বাক্স কম—ঐগুলি নিয়া যাহাতে তাহাদের মধ্যে গোলমাল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিব। ২। ছবি কাটার দল—শিশুরা নানা রকমের ছবি কাটিবে এবং ছবিগুলি বিভিন্ন ভাবে তাহাদের শ্রেণীপুস্তকে আঠা দিয়া আঁটিবে। ৩। রং দিবার দল—যে মাটির জিনিষগুলি শিশুরা তাহাদের দোকান-ঘরের জন্য তৈয়ারী করিয়াছিল, সেইগুলি তাহারা রং করিবে। ৪। বাকী ২।৩টি শিশু সীমা-রেখ ছবিগুলি লাল-নীল পেন্সিল দিয়া আঁকিয়া ভরাট করিবে।

৬	৭	৮	৯	১০
সাঙ্গীকৃত বিষয়সমূহ	বিশেষ বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	প্রস্তুতি
(১) মাতৃভাষা, পড়া, লেখা। (২) সংখ্যা-গণনা, যোগ অঙ্ক। (৩) সামাজিক শিক্ষা	—বিশেষ পাঠ মাতৃভাষা, কর্ম হইতে উদ্ভূত কয়েকটি পাঠ পড়া ও লেখা।	শিশুদের আত্ম-প্রকাশে সাহায্য করা ও বাংলা পড়া ও লেখা শেখান।	১২″ × ৩″ কার্ড, চাইনিজ ইঙ্ক, তুলি, খাতা, পেন্সিল, শ্লেট. ইত্যাদি	(১) ১নং দল যে যে ছবি আঁকিয়াছে তা তাহারা বর্ণনা করিবে। আমি তাহাদের বর্ণনা কার্ডে লিখিয়া দিব। (২) ২নং দল ছবি কাটিয়া ছবি খাতায় সাঁটিবে এবং ছবির বর্ণনা দিবে, আমি তাহাদের কথা কার্ডে লিখিয়া দিব। (৩) মাটির যে জিনিষগুলিতে শিশুরা রং দিল, সেগুলি শিশুরা বলিবে, আমি তাহাদের কথাগুলি কার্ডে লিখিয়া দিব। (৪) বাকি ২।৩ জন শিশু কোন্ কোন্ ছবি ভরাট করিল, তা তাহারা বলিবে, আমি সেই ছবির নীচে বড় বড় করিয়া লিখিয়া দিব।

১১	১২	১৩
উপস্থাপন	প্রয়োগ	বিচার ও মন্তব্য
(১) ১নং দল পড়িবে ও লিখিবে, —আমি ছবি এঁকেছি আমি বিড়াল এঁকেছি আমি গাছ এঁকেছি, আমি মোটরকার এঁকেছি, আমি বাড়ি এঁকেছি, আমি ফুল এঁকেছি ; ইত্যাদি। (২) ২নং দল পড়িবে ও লিখিবে। —আমি ছবি কেটেছি, আমি কাগজ কেটেছি, আমি মানুষের ছবি কেটেছি, আমি গরুর ছবি কেটেছি, ইত্যাদি (৩) রং দেওয়ার দল পড়িবে ও লিখিবে। —আমি রং দিয়েছি, আমি কলায় রং দিয়েছি, আমি আমে রং দিয়েছি ইত্যাদি। (৪) বাকী দল পড়িবে ও লিখিবে— বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, কাক ইত্যাদি। প্রতিক্ষেত্রে শিশুরা সাহায্য চাহিলে আমি সাহায্য করিব।	প্রতি দলের প্রত্যেক শিশুকে আমি দলীয় কার্ড দিয়া উহাতে কি লেখা আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিব। সে পড়িবে ও না দেখিয়া লিখিবে।	**বিশেষ দ্রষ্টব্য—** প্রতিদিনের পাঠ কতদূর শেষ হইল, কিংবা যদি না শেষ হইয়া থাকে তবে কেন হইল না, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া পাঠদান সমাপনান্তে এইখানে তাহার সমালোচনা লিখিয়া রাখিতে হইবে।

মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য একটি নিম্নতম সীমা নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। মনোমুগ্ধকর বস্তু একেবারে কিছু নাই, এইভাবে কাজ চলিতে পারে না। সামান্য কিছু রং, রং-পেন্সিল, ক্রেয়ন, কাঁচি বা এই জাতীয় অন্য কিছু ছাড়া শিশুদের চলিতে পারে না। উপকরণ অনেক সময় কাজের স্পৃহা বর্ধিত করে, অতএব সেইদিকে একেবারে দৃষ্টি না দিলে চলিবে কেন ?

তিনটি কাজের কথা উপরের পাঠটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কারণ, যদি বেশি ইউনিটের কাজের বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে শিক্ষকের পক্ষে ২৫।৩০টি শিশুকে পরিচালনা করা একটু অসুবিধাজনক হইয়া পড়িতে পারে। শিক্ষক যদি কম ইউনিটের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন, তবেই সকলের কাজ এবং প্রয়োজনবোধে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে শিশুদের সাহায্য করা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয়। ছবি আঁকা, কাগজ কাটা ও মাটির জিনিসে রং করা, এই তিনটি কাজের মধ্যে শিশুদের আগ্রহ, ঔৎসুক্য ইত্যাদিকে সীমাবদ্ধ করা সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন তুলিতে পারেন, কিন্তু বেশি ইউনিটের কাজের সুবিধার কথা যাহা পূর্বে বিবৃত করা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও যদি শিশুকে যে কোনও কাজ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তবে তাহার শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ করা অসুবিধাজনক হয়, তাহার একটি বিশেষ গতিপথ ধরিয়া অগ্রসর হয় না। অতএব কর্মগুলি যে-কোন ধরণের হউক না কেন, কয়েকটি নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যে শিশুর কর্ম বাছাইয়ের স্বাধীনতাকে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে।

কাজগুলি স্থির থাকিলেও সেই কাজগুলি সম্পর্কে দলবিভাগে শিশুদের প্রাধান্য থাকিবে বেশি, তাহাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে যথাসম্ভব মর্যাদা দিতে হইবে। তবে যদি এমন অবস্থা হয় যে, শিশুরা সকলেই কাগজ কাটিতে চাহিল, তবে কি হইবে ? কাঁচি রহিয়াছে ৮।১০টি, কাগজ কাটিতে চাহিল ১৫টি শিশু, এ অবস্থায় শিক্ষক ইঙ্গিতের (suggestion) সাহায্যে শিশুগণকে অন্যান্য কাজের সঙ্গে যোগাযোগ করাইয়া দিবেন।

শিশুদের তিনটি দল ভিন্ন ভিন্ন কাজ করিতে লাগিল। দুই একটি শিশু হয়ত একেবারে নূতন আসিয়াছে। তাহাদের নিয়া কি কাজ করা যাইবে ? যদি তাহারা নির্দিষ্ট দলগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে কাজ করিতে পারে তো ভালই ; যদি না পারে, যদি পূর্বের নানা খেলা ও কর্মের

সঙ্গে তাহাদের অপরিচয়ের ফলে তাহারা কাজে অভ্যস্ত হইতে না পারিয়া থাকে, তবে হয়ত তাহারা ঐসব কর্ম হইতে বিরত থাকিবে, হয়ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চাহিবে। যদি সেইরূপ অবস্থাই হয়, তবে কয়েকটি কাগজে গরু, ঘোড়া, বাড়ি, গাছ ইত্যাদির সীমারেখা আঁকিয়া নিয়া ঐ শিশুদের লাল-নীল পেন্সিল দিয়া ছবি ভরাট করিতে দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ করিতে হয়ত তাহাদের কোন আপত্তি হইবে না। কারণ নূতন কাজে অনভ্যস্ততাজনিত ভীতির কারণ এখানে নাই, এখানে তাহাদের শুধু অর্ধেক কাজ সমাপ্ত করিতে হইতেছে। অতএব তাহারা হয়ত ঐ কাজ করিবে।

এদিকে দলগুলির কাজ চলিল। কাজের শেষে শিক্ষক শিশুদের পড়া ও লেখা শিখাইবেন। কি করিয়া শিখাইবেন? কাজ শেষ হইবার সাথে সাথে কাজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ, শিশুমনে জাগাইয়া তোলা সম্ভব। শিশুরা কি আঁকিয়াছে, কি কাটিয়াছে, কি লাগাইয়াছে, ইত্যাদির পরিচয় দিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবে। এ আগ্রহ তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত। এই অবস্থায় যদি শিক্ষক পূর্বেই কাজের পরিচয় সম্বন্ধে কতকগুলি কার্ড তৈয়ারী করিয়া লইয়া যান, এবং যে যে কাজের পরিচয় তিনি পূর্বে অনুমান করিতে পারেন নাই, তাহা যদি তিনি তৎক্ষণাৎ কার্ডে লিখিয়া শিশুদের দেন, তাহা হইলে শিশুরা সেইগুলি পড়িতে ও লিখিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবে। এই অবস্থায় প্রায়ই ব্যক্তিগত সাহায্য প্রয়োজন হইতে পারে। কারণ কোন দল হয়ত ছবি আঁকিয়াছে, কিন্তু দলের মধ্যে কেউ আঁকিয়াছে বিড়াল, কেউ গাছ, কেউ বাড়ি, কেউ মোটরকার ইত্যাদি। এই অবস্থায়, 'আমি বিড়াল এঁকেছি' একথা শুধু যে বিড়াল আঁকিয়াছে সেই পড়িবে ও লিখিবে।

ব্যক্তিগত সাহায্য করিতে গেলে বহু সময়ের দরকার, এবং শ্রেণীমধ্যে গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কথাটা অর্ধসত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। যদি সকলে একত্র কাজ শেষ করিয়া পড়িতে ও লিখিতে চায়, তাহা হইলে এই অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু দলগুলি সাধারণতঃ একই সময়ে কাজ শেষ করিবে না, আর, একটি দলের মধ্যেও সকলের কাজ একই সময়ে শেষ হইবে না। এই অবস্থায় কাজ আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণ পর হইতেই কাজের কার্ডগুলি বিলি করা ও লেখার কাজ আরম্ভ করিলে সকল শিশুকেই সাহায্য করা চলিবে। আর তাহা ছাড়া শ্রেণীর যে

শৃঙ্খলাভঙ্গের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, শিশুরা মাস দুয়েকের মধ্যে সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুটা ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়া নিজেরাই একত্র হইয়া শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালে তাহাদের বক্তব্য টানাইয়া রাখিয়াছে।

"একসাথে কথা বলিব না।"

"কাজ করিব।"

"পালার জন্য অপেক্ষা করিব।" ইত্যাদি।

এই কথাগুলি শিশুরা প্রায় প্রতিদিন শিক্ষকের সাথে সাথে পড়ে। অতএব অনর্থক 'দাদা' 'দাদা' বলিয়া চীৎকার করিয়া শ্রেণীর শৃঙ্খলাভঙ্গ তাহারা স্বেচ্ছায় করিতে চাহিবে না। শিশুরা যতটুকু কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে শিখিয়াছে তাহা তাহারা জীবনের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়াই শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে ; অতএব শৃঙ্খলাভঙ্গের আশঙ্কা দক্ষ শিক্ষকের কাছে নাই।

তাহা হইলে কোন্ দলগুলি কি কি শিখিল তাহা একবার দেখা যাইতে পারে। অবশ্য বাক্যগুলি শিশুর কর্মের পরিচয় দিতেছে ; অতএব শিশু যত বেশি কাজ করিয়াছে, তত বেশি বাক্য ও শব্দ সে শিখিতে পারিবে। বাক্য কি জাতীয় হইবে তাহা সম্পূর্ণ না জানা থাকিলেও বাক্যগুলি নিম্নলিখিত ধরণের হইতে পারে।

১। নূতন দল পড়িল ও লিখিল—বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, কাক, বাড়ী, ইত্যাদি।

২। ছবি আঁকার দল পড়িল ও লিখিল—আমি ছবি এঁকেছি। আমি বিড়াল এঁকেছি। আমি মোটরকার এঁকেছি। আমি গাছ এঁকেছি। আমি বাড়ী এঁকেছি। আমি ফুল এঁকেছি ইত্যাদি।

৩। ছবি কাটার দল—আমি ছবি কেটেছি। আমি কাগজ কেটেছি। আমি মানুষের ছবি কেটেছি। আমি গরুর ছবি কেটেছি। আমি কুকুরের ছবি কেটেছি ইত্যাদি।

৪। রং দেওয়ার দল—আমি কলায় রং দিয়েছি। আমি কমলায় রং দিয়েছি। আমি আমে রং দিয়েছি। আমি সন্দেশে রং দিয়েছি। আমি জিলিপিতে রং দিয়েছি ইত্যাদি।

দলগুলির মধ্যে দেখা যাইবে, অনেকেই কতকগুলি কাজ একরকম করিয়াছে, যেমন ছবি আঁকার দলে অনেকেই 'গাছ' আঁকিয়াছে, 'বাড়ী'

আঁকিয়াছে ইত্যাদি, কিংবা কাগজ কাটার দলের মধ্যে অনেকেই হয়ত 'গরুর ছবি,' 'গাছের ছবি,' 'বাড়ীর ছবি,' কাটিয়াছে ইত্যাদি; রং দিবার দলে অনেকেই 'কলায়' রং দিয়াছে, 'আমে' রং দিয়াছে ইত্যাদি। অতএব বাক্যের মধ্যে একটি শব্দ অদল-বদল করিয়াও শিশুরা লিখিতে বা পড়িতে পারে। এই সকল লেখা-কার্ড লইয়া একটি পড়া-লেখার খেলাও অবতারণা করা সম্ভব। লেখা ও পড়ার শেষে, দলের সব কার্ডগুলি একত্র করিয়া কোন একটি ছেলে বা মেয়েকে বলিতে পারা যায়—"তুমি যে যে কার্ডগুলি নিয়ে কাজ করেছ, সেগুলি বেছে নাও ও পড়।" এইভাবে সব ছেলেমেয়েকেই তাহাদের পড়া ও বাক্য পরিচয়ের পরীক্ষা করা যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে শিশুদের আক্ষরিক জ্ঞান নাই, তাহারা নিজেদের নাম বা প্রয়োজনীয় কয়েকটি শব্দ মাত্র লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে। এখন কর্মের সাথে যুক্ত শিশুর নিজস্ব বক্তব্য, বাক্যের আকারে শিশুর কাছে যখন উপস্থিত করা যাইবে, তখন শিশু তাহা আগ্রহ সহকারেই পড়িবে। সেইহেতু পড়া বা লেখা শিখায় শিশুদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। কোন একটি দল, ধরা যাউক ছবি আঁকার দল, যখন 'আমি ছবি এঁকেছি' এই বাক্যটির দৃশ্যরূপ দেখিয়া পড়িতে ও লিখিতে শিখিল, তখন দুই দিকের দুইটি শব্দ ঠিক রাখিয়া মধ্যের শব্দ বাড়াইয়া গেলে শিশুদের পড়িতে ও লিখিতে সুবিধা হইবে, পড়া ও লেখার পুনরাবৃত্তি হইবে এবং বাক্যগুলির দৃশ্যরূপ শিশুর মগজে ছাপ মারিয়া বসিবে। প্রত্যেক দলের প্রথম বাক্যটি দলের সকলের জন্য, অতএব সেই বাক্যটি বোর্ডে বড় করিয়া লিখিয়া দেওয়া চলে, তাহাতে বাক্যের দৃশ্যরূপের সঙ্গে উহাদের চাক্ষুষ পরিচয় হইবে বেশি। অক্ষরের সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলেও বাক্য হইতে এইভাবে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া চলে। এ প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য পাঠটীকা

পূর্বেই প্রথম শ্রেণীর প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, প্রথম শ্রেণীর শিশুদের দীর্ঘ মনোযোগ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা বলা যাইতে পারে। তাহারাও খুব বেশী দীর্ঘ মনোযোগ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে

পারে না। শুধু তাহাদিগকে স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজে কিছু সময়ের জন্য নিযুক্ত করা যাইতে পারে মাত্র। খুব ছোটখাট প্রজেক্ট কাজ, যেগুলি শিশুরা করিতে আনন্দ পাইবে, অথচ মানসিক বা শারীরিক কোন-প্রকার পরিশ্রমই খুব বেশী করিয়া করিতে হইবে না, এমন কাজ তাহাদিগকে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর শিশুদের হইতে এই শ্রেণীর শিশুদের বয়স এক বৎসর বৃদ্ধি হইয়াছে এবং উহাদের পরিপক্বতাও অনুরূপ ভাবে হইয়াছে, ইহা ভুলিয়া গেলেও চলিবে না। অতএব প্রথম শ্রেণীর শিশুদের হইতে যে কিছুটা ধারাবাহিকতা তাহাদের ক্ষেত্রে আশা করা যাইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রথম শ্রেণীর শিশুরা যখন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তাহাতে ধারাবাহিকতা থাকে না—নিত্য নূতন জিনিষে তাহারা আগ্রহান্বিত বোধ করে এবং যাহা অতীতে দেখিয়াছে তাহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় কতটুকু হইল, তাহাতে তাহারা মোটেই আগ্রহী হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে কিছুটা ধারাবাহিকতা আনা যায়—চারার বৃদ্ধি, ফলের বৃদ্ধি, ফুল হইতে কুঁড়ি, ইত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিক পরিবর্তনের প্রতি তাহাদের পর্যবেক্ষণ নিবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠটীকা—ছাত্র-সংখ্যা ৩০

১	২	৩	৪	৫
কাজ বা আগ্রহের কেন্দ্র	উদ্দেশ্য	পরিকল্পনা	উপকরণ	সময়
শ্রেণীর আশে-পাশের সৌন্দর্য-বিধান	সৌন্দর্য শৃঙ্খলা বোধ ও দায়িত্ব-বোধ বৃদ্ধি	দলে দলে বিভক্ত হইয়া শিশুরা শ্রেণী ও শ্রেণীর বহির্ভাগ পরিষ্কার করিবে, জিনিষপত্র গুছাইবে, পানীয় জল আনিবে, ফুলদানীতে ফুল দিবে, ধুপ জ্বালাইবে।	ঝাঁটা, ঝাড়ন, ঝুড়ি বালতি, কুঁজা, ইত্যাদি।	৩০ মিনিট
প্রার্থনা	আধ্যাত্মিক বিকাশ	গান ও শিক্ষকের ২।১টি নীতিমূলক কথা	ধুপ, ধুপদানী	১০ মিনিট
পরিবেশ সম্বন্ধে আগ্রহ	পরিবেশ সচেতনতা	খবর বলা	বোর্ড, ঝাড়ন, চক্ ইত্যাদি	২০ মিনিট
আবহাওয়া আলোচনা	পরিবেশ সচেতনতা	আবহাওয়া	আবহাওয়ার ছবি ও ক্যালেণ্ডার।	১৫ মিনিট
বাগানের কাজ	কর্মাগ্রহ ও কর্ম-কুশলতা বৃদ্ধি, শারীরিক ব্যায়াম	আগাছা পরিষ্কার, মাটি কোপান ইত্যাদি	খুরপি, ঝুড়ি, কোদাল ইত্যাদি	১৫ মিনিট মাতৃভাষা ৩০ মিনিট গণিত ৩০ মিনিট সাহিত্য ৩০ মিনিট

৬	৭	৮	৯
উপস্থাপন	সাঙ্গীকৃত বিষয়সমূহ	বিশেষ পাঠ	উপকরণ
শিশুরা শিক্ষকের ইঙ্গিতে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কাজ করিবে।			
নিজ নিজ আসনে বসিয়া সমবেত গান। শিক্ষক গল্পচ্ছলে নীতিমূলক ২।১টি কথা বলিবেন।			
শিশুরা খবরের মধ্য দিয়া পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হইবে। শিক্ষক নিজে ২।১টি খবর বলিয়া শিশুদিগকে উৎসাহিত করিবেন।			
আবহাওয়ার ছবি পরিবর্তন, আবহাওয়া ক্যালেণ্ডার লেখা ইত্যাদি।	প্রাকৃতিক ভুগোল	বর্ষা ঋতুর খবরসমূহ	আবহাওয়া চার্ট ইত্যাদি।
কৃষিনেতার অধীনে বিভিন্ন দলে শিশুরা আগাছা পরিষ্কার করিবে, মাটি কোপাইবে এবং বর্ষার ফসলের গাছগুলির ব্যবস্থা করিবে। কাজ শেষ হইতে ১০মিনিট বাকী থাকিতে শিশুর দল হাত-পা ধুইতে যাইবে এবং ঠিক সময়ে শ্রেণীতে আসিবে। কাজের আরম্ভ ও কাজের শেষ, দুইটি কার্ডবোর্ডের ঘড়ি দ্বারা নির্দেশ দান করা হইবে।	মাতৃভাষা গণিত সাহিত্য	নিজভাব প্রকাশ। সময় দেখা, সময়ের হিসাব। বর্ষার কবিতা বর্ষামঙ্গলের জন্য প্রস্তুতি।	বাগানের কাজের খাতা। দুইটি কার্ড-বোর্ডের ঘড়ি। বোর্ড বা বড়-কাগজের সিটে লেখা কবিতা

১০	১১	১২	১৩
প্রস্তুতি	উপস্থাপন	প্রয়োগ	বিচার ও মন্তব্য
নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে তাহাদের নির্দিষ্ট পাঠে আগ্রহী করা হইবে। গত সপ্তাহে কি রকম বৃষ্টি হইয়াছে? চারিদিকের গাছগুলি বড় হইয়াছে কেন? ইত্যাদি।	নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সাহায্যে পাঠ্য-বিষয়ের অবতারণা করা হইবে— কেন এমন ঘন ঘন বৃষ্টি হয়, জান কি? আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে খুব বৃষ্টি হয়, তাই দুই মাসকে বর্ষাকাল বলে।	পাঠ্য-বিষয় সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হইবে:— কোন্ দুই মাস বর্ষাকাল বল ত? বর্ষাকালে চাষ করিবার সুবিধা কি? ইত্যাদি	
বাগানে কি কি কাজ করা হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে আলোচনা। আগাছা পরিষ্কারের উদ্দেশ্য কি, লতাগুলিকে অবলম্বন করান কেন হইল, এই সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করা হইবে।	বোর্ডে নিম্নলিখিত বিবরণী লেখা হইবে— "আজ আমরা বাগানের আগাছা তুলেছি। এবার গাছগুলি বড় হবে। বাগানটা সুন্দর দেখাবে। লতাগুলি মাচায় উঠিয়ে দিয়েছি।'	বোর্ডের লেখা মুছিয়া দেওয়া হইবে, শিশুরা নিজে নিজে নিজের ভাষায় তাহাদের বাগানের খাতায় বাগানের কাজ সম্বন্ধে লিখিবে।	
ঘড়ির কাঁটা দু'টির সাহায্যে কখন কাজ আরম্ভ হয় ও শেষ হয় তাহা বোঝায়।	শিশুরা ৩০ মিনিট কাজ হইয়াছে বুঝিতে পারিলে ১ ঘণ্টা, ১½ ঘণ্টা, ২ ঘণ্টা, ২½ ঘণ্টা, ইত্যাদি কত মিনিট হয় এবং কোন একটা নির্দিষ্ট সময় হইতে ১ ঘণ্টা ২ ঘণ্টা ইত্যাদি চলিয়া গেলে কয়টা বাজিবে, তাহা শিশুরা লিখিবে।	প্রশ্ন:— আধ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ১ ঘণ্টায় কত মিনিট? ৯টার সময় একটি শিশু বাড়ী গেল এবং (কার্ড বোর্ডের ঘড়িতে কাঁটা দেখাইয়া) এই সময় ফিরিয়া আসিল, তাহা হইলে সে কত মিনিট পরে আসিল?	
বর্ষা সম্বন্ধে নানা গল্প করিয়া বর্ষা-মঙ্গল উৎসবে আবৃত্তি করার প্রসঙ্গ তুলিয়া সিটে লেখা কবিতাটি সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করা।	শিক্ষক সিটেলেখা কবিতা আবৃত্তি করিবেন এবং শিশুদের দিয়া সমবেত ভাবে আবৃত্তি করাইবেন ইহার পর শিশুরা ব্যক্তিগত ভাবে কবিতাটি পড়িবে।	শিক্ষক প্রশ্ন করিবেন— কবিতাটিতে কোন ঋতুর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে? কবিতাটি আবৃত্তি কর।	

তৃতীয় শ্রেণীর পাঠটীকা

তৃতীয় শ্রেণীতে বাগানের কাজ আরও ব্যাপক আকারে দেওয়া যায়। এই শ্রেণীর জন্য একটি পৃথক ভূমিখণ্ড নির্দিষ্ট রাখিয়া শ্রেণীগত ভাবে উহাকে ঘেরাও করিয়া তাহাতে ঋতু অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা, জমি বিভিন্ন দলের মধ্যে বণ্টন করা, ইত্যাদি কাজের পরিকল্পনার মধ্য দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। চাষের উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করার ব্যবস্থাও শিশুরাই করিতে পারে এবং ঐরূপ বিক্রয় ও তাহাদের প্রয়োজনীয় খাতা, কাগজ, ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একটি কো-অপারেটিভ খোলা যায়। উহা তাহারাই পালাক্রমে পরিচালনা করিবে ও হিসাব রাখিবে। সপ্তাহান্তে দায়িত্বভার একজনের নিকট হইতে অপরের নিকট প্রদত্ত হইবার পূর্বে আয়ব্যয় ও হিসাব-নিকাশ শ্রেণীতে দাখিল করার ব্যবস্থা থাকিবে। এই উপলক্ষ্যে শিশুরা বাস্তব জীবনের মধ্য দিয়া ভালভাবে হিসাব-নিকাশ শিখিবে। নিম্নলিখিত পাঠ-পরিকল্পনাতে ঐরূপ কাজকে শিক্ষণীয় করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর পাঠটীকা—ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৩০—তারিখ—

১	২	৩	৪	৫	৬
আগ্রহের কেন্দ্র	উদ্দেশ্য	পরিকল্পনা	উপকরণ	সময়	উপস্থাপন
কো-অপারেটিভ পরিচালনা	সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি	নিজেদের বাগানে ফসল বিক্রীর ব্যবস্থা হইতে কো-অপারেটিভ পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা। কি কি চাহিদা ও কি কি জিনিষ বিক্রয় হইতে পারে তাহার পরিকল্পনা করা।	বাক্স বা আলমারী, কো-অপারেটিভের বিক্রীর জন্য জিনিষপত্র।	১ ঘণ্টা	কো-অপারেটিভ পরিচালনার জন্য ছাত্রছাত্রীরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া কাজ করিবে। তাহারা চাঁদা উঠাইবে, জিনিষগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রাখিবে এবং প্রত্যেক রকম জিনিষের কেনা দাম লিখিয়া রাখিবে।
				৩০ মিনিট	
				৩০ মিনিট	
				৬০ মিনিট	

তৃতীয় শ্রেণীর পাঠটীকা—ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৩০—তারিখ—

৭	৮	৯	১০
সাঙ্গীকৃত বিষয়সমূহ	বিশেষ পাঠ	উপকরণ	প্রস্তুতি
গণিত	টাকা পয়সার হিসাব	বোর্ড, চক খাতা, পেন্সিল	নূতন কেনা জিনিষপত্রের হিসাব বোর্ডে লেখা হইবে এবং শ্রেণীর সকলকে বুঝিতে চেষ্টা করান হইবে। খুব সামান্ত লাভ রাখিয়া জিনিষ-পত্রের দাম নূতন করিয়া ফেলা হইবে।
মাতৃভাষা	ডাইরী লেখা	ঐ	প্রতিদিনকার কাজ কতদূর অগ্রসর হইল তাহার আলোচনা।
সামাজিক শিক্ষা ও সাহিত্য	কো-অপারেটিভের প্রতিনিধি নির্বাচন ও তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন	ঐ	নির্বাচনের প্রসঙ্গ উত্থাপন-পূর্বক নির্বাচনের নিয়মাবলী স্মরণ করাইয়া নূতন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হইবে। বিদায়ী প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ দিবার কথা উত্থাপন করিতে হইবে।

১১	১২	১৩
উপস্থাপন	প্রয়োগ	বিচার মন্তব্য
নিম্নলিখিত ভাবে জিনিষগুলির দাম স্থির করা হইবে :—ডজনের দাম হইতে একটির। দিস্তার দাম হইতে ১ সিট কাগজের। এক সেরের দাম হইতে ছটাক, আধপোয়া, পোয়া ইত্যাদি। ছাত্র-ছাত্রীদিগকে এইরূপ হিসাব করিতে সাহায্য করা হইবে।	জিনিষের পার্থক্যের জন্য, যথা—পেন্সিলের ভালমন্দ, কাগজের ভালমন্দ ইত্যাদির জন্য দামের পার্থক্য হয়। ঐ বিভিন্ন দামের উপর ভিত্তি করিয়া অনুরূপ হিসাব করিতে ছাত্রছাত্রী-দিগকে ভার দেওয়া হইবে।	
বিভিন্নদলকে কাজের ডাইরী লিখিতে উৎসাহিত করা হইবে। করা হইবে। কি ভাষায় বিদায়ী প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতে পারে তাহা বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া হইবে। তারপর উহা মুছিয়া ফেলিয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে নিজ ভাষায় লিখিতে বলিতে হইবে।	ছাত্রছাত্রীরা ডাইরী লিখিবে এবং শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিবে। মন্ত্রীপরিষদের সভ্যগণ পর পর উঠিয়া বিদায়ী প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে। মন্ত্রীরা ছাড়াও অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলে বলিতে পারে।	

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠটীকা

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পাঠটীকা অনেকটা একই ছকে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। **সম্বন্ধিত বিষয়গুলি বা সাঙ্গীকৃত বিষয়সমূহ অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে যাহা আসিবে তাহাই ছাত্রীদের শিখিতে সাহায্য করিতে হইবে।** ছাত্রছাত্রীরা যখন চতুর্থ শ্রেণীতে আসিয়া পৌছাইবে, তখন তাহাদের যথেষ্ট বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে, তখন **তাহারা গভীরভাবে মনঃসংযোগ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি কাজ করিয়া যাইতে পারে এবং প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয়ে পৌর্বাপর্য্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।** এই অবস্থায় যে-সব কাজের ইউনিটে মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম বেশী, সেইরূপ কাজের ইউনিটের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। একটি কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে চার বৎসর ধরিয়া থাকার দরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কতকগুলি সদভ্যাস গঠিত হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, কর্মানুগ হওয়ার দরুণ কর্মগুলি সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের ধারা তাহাদের জানা হইয়া গিয়াছে। ফলে কি ভাবে কাজ করিতে হয়, কি ভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান দ্বারা উহাদিগকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারা যায় তাহার ধারা তাহারা শিক্ষা করিয়াছে। এই অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদিগকে কাজ দিলে তাহারা ত কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারিবেই, অধিকন্তু ঐ কাজের সঙ্গে সমস্ত সংশ্লিষ্ট ও সম্বন্ধিত বিষয়সমূহও আয়ত্ত করা তাহাদের পক্ষে সহজ হইবে। চতুর্থ শ্রেণীর জন্য একটি নববর্ষোৎসবের সংক্ষিপ্ত পাঠটীকা করিয়া দেওয়া হইল। ইহার সঙ্গে অন্যান্য সম্বন্ধিত বিষয়সমূহ কি ভাবে আসিবে, তাহা দেখানই প্রকৃতপক্ষে এই পাঠটীকার উদ্দেশ্য।

একটি আগ্রহের কেন্দ্র হইতে ছাত্র-ছাত্রীকে যতরকম ভাবে অভিজ্ঞতা দেওয়া চলিতে পারে, তাহার ইঙ্গিত উপরে দেওয়া হইল। **কিন্তু ইহাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ না মনে করাই সমীচীন হইবে, কারণ কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় ও প্রয়োজনের তাগিদে ইহার সম্প্রসারণ ও সংকোচন করা যাইতে পারিবে।** কিন্তু এইরূপ বিভিন্নমুখী জ্ঞানদান করিতে হইলে শিক্ষকের ঐ সমস্ত কাজে বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। নববর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের লেখার খোঁজ শিশুরা নিশ্চয়ই তাহাদের লাইব্রেরীতে করিবে। কিন্তু ঐ জাতীয় প্রবন্ধ ও কবিতা, বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকা হইতে

চতুর্থ শ্রেণীতে আগ্রহের কেন্দ্র-সম্বন্ধিত শিক্ষা

আগ্রহের কেন্দ্র	সম্বন্ধিত শিক্ষা		
	সাহিত্য—পড়া	সৃজনাত্মক লেখা	অঙ্ক
নববর্ষ উৎসব পালন	ঋতু সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ। ঐ সম্বন্ধিত কবিতা পাঠ। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ঋতু ও নববর্ষ সম্বন্ধে কবিতা পাঠ। আনন্দবাজারের আনন্দমেলা ও যুগান্তরে ছোটদের পাততাড়িতে প্রকাশিত ঋতু-বিষয়ক ও নববর্ষ সম্বন্ধে কবিতা ও প্রবন্ধ সংগ্রহ এবং পাঠ।	নববর্ষের উৎসবে শিশুরা যে কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করিবে, তাহা তাহারা লিখিবে। নববর্ষ উৎসব কি ভাবে পরিচালিত হইবে সেই বিষয় আলোচনা ও ছাত্রছাত্রীদের নববর্ষ উৎসব পালনের পরিকল্পনা লেখা। নববর্ষ উৎসবের জন্য নিমন্ত্রণ-লিপি লেখা।	বৎসর, মাস, দিন, ঋতু ইত্যাদি সময়-সম্পর্কিত অঙ্ক।

বিজ্ঞান	সমাজ-বিজ্ঞান	ইতিহাস	
ঋতু-পরিবর্তন. দিন-রাত্রি, সৌরজগৎ, চান্দ্র-মাস ইত্যাদি। পূর্বে মানুষ কি ভাবে সময়ের হিসাব রাখিত ইত্যাদি।	চৈত্র সংক্রান্তি ও নব-বর্ষ সম্বন্ধে নানারূপ উপাখ্যান ও গল্প।	বিগত বৎসরের ইতিহাস আলোচনা। সময়-রেখা দ্বারা ঘটনার সন্নিবেশ।	

সংগ্রহ করা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেই কাজ প্রধানতঃ শিক্ষককেই করিয়া দিতে হইবে। এই কারণেই শিক্ষক প্রতি বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞানদান সম্পর্কেই ছাত্রছাত্রীদের ঝোঁক ও প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানদান করিতে অগ্রণী হইবেন।

উপরে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠটীকার যে ছকটি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আগ্রহের কেন্দ্রের সঙ্গে যে যে বিষয় যুক্ত হইতে পারে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়গুলির পৃথক্‌ভাবে পাঠটীকা লিখিতে হইলে প্রত্যেকটি বিষয় অন্ততঃপক্ষে তিনটি স্তরে বিশদভাবে সাজাইয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর পাঠটীকার যে যে ছক দেওয়া হইয়াছে তাহাও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া লেখা হয় নাই, শুধু ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে মাত্র। যে বিষয়টি আগ্রহের কেন্দ্র হইতে পৃথক্ হইয়া বিস্তৃতভাবে পাঠদানের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিবে, তাহার পূর্ণ পাঠটীকা ঐ ইঙ্গিতের উপর তিনটি স্তরের মধ্যে রচিত হইবে। এই পুস্তকেরই বিষয় শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়গুলির বিস্তৃত পাঠটীকার নমুনা দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠটীকা

শিশুদের বয়স এই সময় ১১+, নানারূপ কাজের অভিজ্ঞতার দিক হইতে পরিপক্বতার দিক হইতে এবং বিদ্যালয়ের কাজের ধারা অনুসরণ করিবার মত মনোভাবের দিক হইতে ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তাহারা

নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষার শেষ পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বিভিন্ন কর্মের ইউনিট তাহারা যথাযথরূপে সম্পাদন করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে। সমস্ত কাজের মধ্য দিয়া যে তাহাদের সামগ্রিক জীবন বিকাশ লাভ করিতেছে তাহাদের চেতন মনে তাহার স্পষ্ট ধারণা না জন্মিলেও, এই সমস্ত কাজ দ্বারা যে তাহারা বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছে এবং হইবে এই ভরসাটুকু অন্ততঃ তাহাদের জন্মিয়াছে। অতএব তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজের ইউনিটের মাধ্যমে আরও ব্যাপক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

উদাহরণস্বরূপ এইখানে পোষ্ট-অফিস প্রজেক্টের কথা উল্লেখ করা হইতেছে। পূর্বেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠটীকার জন্য ছক দেওয়া হইয়াছে। এইখানে ছক না দিয়া বিষয়টি সম্বন্ধে ছকের ধারায়ই বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। নূতন শিক্ষাব্রতী ইচ্ছা করিলেই উহাকে নিজের সুবিধামত ছকের মধ্যে ফেলিয়া পাঠটীকায় রূপান্তরিত করিয়া লইতে পারিবেন।

কাজের ইউনিট স্থির করা

একটি থানার অধীন কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় একত্রিত হইয়া একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছে। সেই প্রদর্শনী-কমিটির ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে সেই প্রদর্শনী দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে। সেই চিঠিখানিতে যে ডাক-টিকিটখানা ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাতে ছিল গান্ধীজীর প্রতিকৃতি। এই টিকিটখানা দেখিয়া শ্রেণীর সকলেই এই ডাক-টিকিটের সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। শিক্ষক তখন ডাক-টিকিটের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদিগকে নানারকম প্রশ্নাদি করেন। ছাত্রছাত্রীদের সকলের ডাক-টিকিট, মনিঅর্ডার, রেজেষ্ট্রি চিঠি, চিঠি বিলি, ডাক প্রেরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় তাহারা সকলেই নানা আলোচনার পর শিক্ষকের ইঙ্গিত দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া **পোষ্ট-অফিস প্রজেক্ট** করিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করে। কাজের ইউনিট স্থির হয় **পোষ্ট-অফিস**।

উদ্দেশ্য—পোষ্ট-অফিস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও সম্বন্ধিত শিক্ষা।

পরিকল্পনা—পোষ্ট-অফিস প্রজেক্ট করিবার জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, এই জন্য ছাত্রছাত্রীরাই পোষ্ট-অফিসে যাইতে চাহিবে এবং শিক্ষক

তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নিকটস্থ পোষ্ট-অফিসে যাইবেন ও পোষ্টমাষ্টার মহাশয়কে পোষ্ট-অফিসের বিবিধ কাজ ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিবেন। পোষ্টমাষ্টার মহাশয়,চিঠি কি ভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরিত হয়, সে-সম্বন্ধে বলিবেন এবং ডাকবিভাগীয় যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিবেন। পোষ্ট-অফিসের প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য জিনিষগুলি পোষ্টমাষ্টার মহাশয় ছাত্রছাত্রীদিগকে দেখাইবেন। ছাত্রছাত্রীরা সমস্ত কিছু ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া নোট করিয়া লইয়া আসিবে।

উপকরণ--কার্ডবোর্ড, কাঁচি, ছুরি, আঠা, সূচ, সূতা, কাগজ, নিক্তি, আলুর ছাপের জন্য আলু, ফেলিয়া দেওয়া পোষ্টকা ´ ও খাম, মনিঅর্ডার ফরম, টাকা তুলিবার ফরম্ ইত্যাদি।

কাজের ইউনিট, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ইত্যাদি স্থির হইলে শিক্ষকের নির্দেশে ছাত্রছাত্রীরা কি ভাবে কাজ করিবে এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষালাভ করিবে, তাহার ইঙ্গিত নিম্নে দেওয়া হইল।

উপস্থাপন—ছাত্রছাত্রীরা সকলেই প্রজেক্টের কাজ করিবে। শিক্ষক তাহাদের কাজের আগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্নদলে শিশুদের ভাগ করিয়া দিবেন।

(ক) ক-দল পোষ্টকার্ড, খাম ও ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার তৈয়ারী করিবে।

(খ) খ-দল পোষ্ট-অফিসের ফরম ও বিজ্ঞপ্তিগুলি বাংলায় লিখিবে। বলা বাহুল্য শিক্ষক এই সময়ে পোষ্ট-অফিসের বিজ্ঞপ্তিগুলি ইংরাজি হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া বিশেষভাবে সাহায্য করিবেন।

(গ) গ-দল টাকা-পয়সা ইত্যাদি কার্ডবোর্ড দিয়া তৈয়ারী করিবে এবং আলুর ছাপ দিয়া ডাকটিকিট ও ষ্ট্যাম্প তৈয়ারী করিবে।

(ঘ) ঘ-দল পোষ্ট-অফিসের কাউণ্টার, ডাকবাক্স, দাঁড়ি-পাল্লা, নিক্তি ইত্যাদি তৈয়ারী করিবে।

এইভাবে চারিটি দল পোষ্ট-অফিস সম্পর্কিত নানাবিধ কাজ করিয়া একটি পোষ্ট-অফিস গড়িয়া তুলিবে।

পোষ্ট-অফিসের সমস্ত কাজকর্ম সম্পূর্ণ হইলে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষককে দিয়া যথারীতি পোষ্ট-অফিস উদ্বোধন করাইবে। সেই সময় হইতেই পোষ্ট-অফিসের কাজ সুরু হইবে। শিশুদের মধ্যেই হইবে, পোষ্টমাষ্টার, পিয়ন, রানার ইত্যাদি। প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য পোষ্ট-অফিসের কাজ চলিবে।

ছাত্র-ছাত্রীরা কেহ কিনিবে খাম, কেহ কিনিবে পোষ্টকার্ড, কেহ পাঠাইবে টাকা, কেহ পাঠাইবে রেজেষ্ট্রী চিঠি, কেহ রাখিবে সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা।

বিচার—শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা যে এই প্রজেক্টের কাজ সম্পন্ন করিয়াছে, তাহাতে তাহারা কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের সভাপতিত্বে তাহাদের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা ও বিচার করিয়া দেখিবে। ছাত্রছাত্রীদের সমালোচনা এবং তদুপরি শিক্ষকের মন্তব্য শিশুদের গঠনমূলক কাজে যথেষ্ট সহায়ক হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সম্বন্ধিত বিষয়সমূহ—পোষ্ট-অফিসের কাজের মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে পারেন।

(১) পড়া ও লেখা (২) অঙ্ক (৩) ইতিহাস (৪) ভূগোল।

(১) পড়া ও লেখা—ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদিন কাজের রিপোর্ট লিখিতে হইবে। বলা বাহুল্য উহা ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীগত শিক্ষার ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইবে। শুধু সাধারণভাবে কাজের ডায়েরী লেখাতেই উহা পর্যবসিত থাকিবে না। পোষ্টমাষ্টার, পিয়ন, রানারের কাজ-সংক্রান্ত একটি গল্প এবং সেই গল্পকে সম্মিলিতভাবে নাটকে রূপায়িত করা, বা পোষ্ট-অফিস-সংক্রান্ত কোন প্রবন্ধ, ছড়া বা কবিতা লেখা এই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য-করণীয় কাজ। রচিত নাটককে অভিনয় করিতে ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ আনন্দবোধ করিবে।

(২) অঙ্ক—এই প্রজেক্টের মাধ্যমে অঙ্ক শিক্ষার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। ছাত্রছাত্রীরা খাম, পোষ্টকার্ড, ডাকটিকিট ইত্যাদি কেনাবেচা, টাকা প্রেরণ, টাকা জমা, এবং টাকা উঠানর মধ্য দিয়া বহু টাকার লেনদেন করিয়া থাকে। এইরূপভাবে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যে ছাত্রছাত্রীদিগকে কত রকম অঙ্ক শেখান যায়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সামান্য যোগ-বিয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগ্নাংশ এবং সুদকষা অঙ্ক পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা করিতে সক্ষম হইবে। অঙ্ক ছাড়া জ্যামিতিও তাহারা শিক্ষা করিতে সক্ষম হয়। শিক্ষক বিভিন্ন আকারের ডাকটিকিট দেখাইয়া ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র ইত্যাদি শিক্ষা দিতে পারেন।

(৩) ইতিহাস—পূর্বে কি ভাবে চিঠিপত্রাদি প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল তাহা শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে বলিবেন। প্রাচীনকালে জনসাধারণের জন্য কোনপ্রকার

সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল না। ইহা ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সংবাদাদি লোক মারফত প্রেরিত হইত। দ্রুত সংবাদ প্রেরণের জন্য পারস্যের এক রাজা এক এক দিনের রাস্তা অতিক্রম করিবার জন্য অশ্বসহ লোকের ব্যবস্থা রাখিতেন। প্রাচীন মিশরে পায়রার সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করা হইত। পরবর্তী কালে রোমে অশ্বপৃষ্ঠে করিয়া জরুরি চিঠিপত্রাদি একস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত হইত। ইহার পরে রাজাদের প্রয়োজন ছাড়াও ধর্মযাজক ও ব্যবসায়িগণের জন্য চিঠিপত্র প্রেরণ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ক্রমে সাধারণ লোক চিঠিপত্রাদি প্রেরণ করিবার সুবিধা পায়। এই সময়ে চিঠির প্রাপক চিঠি-প্রেরণের খরচ বা মাশুল বহন করিত। কিন্তু ইহাতে সরকারের ক্ষতি হইতে লাগিল। মাত্র একশত বৎসর যাবৎ পত্রপ্রেরক ডাক-টিকিটের মাশুল দিয়া পত্র প্রেরণ করিতে আরম্ভ করে। ইংলণ্ডের স্যার রোলাণ্ড ছিল ডাক-টিকিটের আবিষ্কর্তা। একদিন স্যার রোলাণ্ড একটি সরাইখানায় বসিয়াছিলেন, এমন সময় ডাকপিয়ন সরাইখানার এক যুবতীর নিকট একখানি পত্র লইয়া আসে। যুবতী পত্রখানির এপিঠ-ওপিঠ ভাল করিয়া উল্টাইয়া দেখিয়া উহা গ্রহণ করিবে না বলিয়া পিয়নকে ফেরত দিল। ফলে যুবতীকে কোনরূপ ডাকমাশুল দিতে হইল না। যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্যার রোলাণ্ড জানিতে পারিলেন যে, অত্যধিক ব্যয়ভার হেতু তাহারা ডাক বিভাগকে ফাঁকি দিতে বাধ্য হয়। যুবতী বলে যে, সাধারণতঃ গরীব লোকদের মধ্যে পত্র-লেখক ও পত্র-প্রাপকের মধ্যে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে খবরাদি আদান-প্রদান করা হয়। ঐসকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন খামের উপর অঙ্কিত করিয়া দিলে শুধু পত্র-প্রাপকই ঐ চিহ্নগুলির অর্থ বুঝিতে পারে এবং পত্র-প্রাপক খামের উপর ঐ সমস্ত চিহ্নগুলি ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া পত্র ফেরত দেয়। বলা বাহুল্য এইরূপভাবে বিনা পয়সায় সংবাদাদি আদান-প্রদান চলিলে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই। এদিকে ডাকমাশুল ছিল অত্যন্ত বেশী। স্যার রোলাণ্ড তখন পত্র-প্রেরককে ডাকমাশুল দিয়া পত্র প্রেরণ করিতে হয় এইরূপ ব্যবস্থা করেন, ফলে ডাক-টিকিটের প্রচলন হয়। প্রথম ডাকটিকিট বাহির হয় এক পেনির ভিক্টোরিয়া মার্কা ষ্ট্যাম্প।

শিক্ষক এইভাবে ডাক প্রেরণের ইতিহাস ও ডাকটিকিটের ইতিহাস, ছাত্রছাত্রীদিগকে আলোচনা কালে বলিবেন। তাহা ছাড়া বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ক বহু তথ্যাদি ডাকটিকিটের মধ্যে

প্রতিফলিত থাকে। শিক্ষক বিভিন্ন সময়ের ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনার প্রবর্তন করিতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা ডাকটিকিটে অঙ্কিত ছবিগুলি দেখিবে এবং শিক্ষক ঐ ছবিগুলির ব্যাখ্যা করিবেন।

আমাদের দেশে যে ষ্ট্যাম্পগুলি ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পূর্বে ছিল এবং বর্তমানে যে সমস্ত ষ্ট্যাম্প প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করিলে রাজনৈতিক পরিবর্তন যথেষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

এইভাবে শিক্ষক বা শিক্ষিকা বিভিন্ন ষ্ট্যাম্পের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদিগকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি, ভারতীয় অভিযান ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদিগকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দান করিতে পারিবেন।

শিক্ষক যে এই সমস্ত বিষয় ইতিহাস হিসাবেই আলোচনা করিবেন তাহা নয়, সাহিত্যের অংশ হিসাবেও এই তথ্যগুলির ব্যবহার চলিবে।

(৪) **ভূগোল**—শিক্ষক বিভিন্ন দেশের ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করিয়া সেইগুলি মহাদেশ হিসাবে বিভক্ত করিবেন ; শিক্ষক তখন পঞ্চম শ্রেণীর ভূগোলের পাঠ্যক্রমকে বিশেষভাবে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন দেশের ষ্ট্যাম্পগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিবেন।

বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ও যাতায়াত প্রজেক্ট

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা "বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ও যাতায়াত" সম্পর্কীয় একটি প্রজেক্ট করিতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিবার পর কাজের ইউনিট স্থির করা শিক্ষকের পক্ষে মোটেই অসুবিধাজনক হইবে না।

শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান যুগের যানবাহনে যাতায়াতের সঙ্গে অতীতের যানবাহন সম্বন্ধে বলিবেন এবং যানবাহনের ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

কিছুকাল পূর্বেও না ছিল রেলপথ, না ছিল ভাল রাস্তা। ভারতবর্ষে কয়েকটি বড় রাস্তা ছাড়া ভাল বড় রাস্তা ছিল না বলিলেই চলে। রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তাগুলি ছিল ছোট, সঙ্কীর্ণ এবং কাঁচা। বৃষ্টির সময়ে সেগুলিতে এত কাদা হইত যে পথ চলাই হইত দায় ; শীতের সময় ধূলার জন্য যাতায়াত

ছিল অসুবিধাজনক। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিদেশের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। ভারতবর্ষে সাধারণ লোকেরা হাঁটা-পথেই চলাচল করিত বেশী। যেখানে নৌ-পথে যাইবার উপায় ছিল সেখানে অবশ্য নৌ-পথেই লোকজন চলাচল করিত। যাহাদের অবস্থা ভাল ছিল, তাহারা ঘোড়া বা পালকীতে চড়িয়াও যাতায়াত করিত। গো-যানেরও ব্যবহার ছিল, কিন্তু স্থানে স্থানে রাস্তা এত সঙ্কীর্ণ থাকিত যে, গো-যানেও চলাচল অসুবিধাজনক ছিল, বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে গো-যানে চলাচল করা অসম্ভবই ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই রাস্তা ভাল করিয়া তৈয়ারী করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডে ম্যাক-অ্যাডাম নামে এক ভদ্রলোক পাথরের কুচিগুলিকে একত্রিত করিয়া আলকাতরা মিশাইয়া চাপ দিয়া সুন্দর রাস্তা তৈয়ারী করা আবিষ্কার করেন। ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হইলেও এই ঢেউ ভারতবর্ষে আসিয়া বহু পরে পৌঁছে। ইংলণ্ডে এবং ইউরোপীয় মহাদেশের বিভিন্ন দেশে সাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্য 'ষ্টেজ কোচ' চলার ব্যবস্থা ছিল। এই নূতন 'টারম্যাকাডাম' রাস্তায় ষ্টেজ কোচগুলির চলাচলের অনেক সুবিধা হয়; ষ্টেজ কোচগুলি ঘোড়ায় টানিত এবং একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে কয়েকবার ঘোড়া পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনুভূত হইত।

ষ্টেজ কোচের পর জর্জ ষ্টিফেনসন আবিষ্কার করেন রেল-ইঞ্জিন। ভারতবর্ষেও রেলপথ স্থাপিত হয়। বর্তমানে ভারতে বিস্তৃতভাবে রেলপথ বসান আছে, কিন্তু তবুও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনের তুলনায় রেলপথ অপর্যাপ্ত; রেল-ইঞ্জিন বিদেশ হইতে এখনও আমদানী করা হয়, কিন্তু চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই রেলগাড়ীর ইঞ্জিন নির্মাণ বিষয়ে ভারতবর্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। ভারতবর্ষে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রেললাইন স্থাপিত হয়। রেলওয়ে শতবার্ষিকী উৎসব ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে নূতন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ উৎসব উপলক্ষে সরকার একটি প্রদর্শনী-ট্রেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঘুরাইয়া জনসাধারণকে দেখার সুযোগ দিয়াছিলেন। প্রথম যখন রেলগাড়ী ভারতবর্ষে চলা আরম্ভ হয় তখন তাহার গতি ছিল ১৫ মাইল, বর্তমানে রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৬০ মাইল চলে।

মোটরগাড়ী ও সাইকেল রেলগাড়ীর বহু পরে আবিষ্কৃত হয়। জনসাধারণ মোটর বাসে চড়িয়াও নানাদিকে গমনাগমন করিয়া থাকে। মোটর বাসের

গতি প্রতি ঘণ্টায় ২৫ হইতে ৩০ মাইলের মধ্যে। মোটরগাড়ী অবশ্য অনেক বেশী দ্রুত চলিতে পারে।

যানবাহনের দিক হইতে সর্বশেষ আবিষ্কার হইতেছে বিমান। বিমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে যাত্রী ও মাল বহন করিতে আরম্ভ করে। যাত্রীবাহী বিমান বর্তমানে নানারকমের আছে, কোন কোন বিমান ঘণ্টায় ৪০০ মাইলও যায়, আবার কোন কোন বিমান ঘণ্টায় চলে ২০০ মাইল।

নিম্নে চলাচলের বিভিন্ন উপায় বা যান-বাহনের চলার বিভিন্ন সময়-রেখা দেওয়া হইল।

হাঁটা	ঘণ্টায় ৩ মাইল
ষ্টেজ কোচ	ঘণ্টায় ১০ মাইল
ঘোড়া	ঘণ্টায় ২০ মাইল
বাস	ঘণ্টায় ২৫ মাইল
ট্রেন	ঘণ্টায় ৬০ মাইল
বিমান	ঘণ্টায় ২০০ মাইল

বিশেষ দ্রষ্টব্য। যানবাহন ও যাতায়াত সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দেওয়া হইল, সেই ইঙ্গিত অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন দলে উপরি উক্ত যানবাহন ও রাস্তাঘাট তৈয়ারী করিবে। তাহারা তাহাদের কাজের রিপোর্ট দাখিল করিবে এবং সমস্ত কাজ দেখার পর তাহারা তাহাদের শিক্ষকের অধীনে সমালোচনা ও গঠনমূলক প্রস্তাবাদি করিবে। শিক্ষক সেই সমস্ত আলোচনার ভিত্তিতে সম্বন্ধিত বিষয়সমূহ শিক্ষা দিতে পারিবে। উপরে যানবাহনাদি যাতায়াত সম্বন্ধে যে-সমস্ত আলোচনা করা গিয়াছে তাহার ভিত্তিতে সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের কিছু অংশ ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে।

কয়েকটি কর্মের ইউনিট

নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর উপযুক্ত কয়েকটি কর্মের ইউনিটের উল্লেখ নিম্নে করা হইল। শ্রেণী এবং ছাত্রছাত্রীদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে নিম্নোক্ত কর্মের ইউনিটগুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইগুলি ছাড়াও আরও বহু কর্মের ইউনিট এই শ্রেণীগুলির জন্য উপযুক্ত

হইতে পারে। স্থানীয় সমস্যাগুলি কর্মের ইউনিটে সহজেই পরিণত করা যায়।

দোকান ঘর, পুতুলের বাড়ী, পুতুলের সংসার, পুতুলের বিয়ে, চড়ুইভাতি, আমাদের গ্রাম, আদর্শ পল্লী, কৃষকের বাড়ী, কামার কুমার ইত্যাদি শিল্পীদের গৃহ ও জীবন, যানবাহন, বাস, ট্রেন, সিনেমা, বিভিন্ন দেশের ছেলে-মেয়ে, বিভিন্ন ধরণের বাসগৃহ; রাস্তাতৈরী; রেল ষ্টেশন; ষ্টীমার ষ্টেশন; বাস ষ্টেশন; হাট; বাজার; স্থানীয় চাউলের কল; স্থানীয় পাট ব্যবসাকেন্দ্র; কাঠের দোকান; করাত কল; কলোনী সৃষ্টি; পোষ্ট অফিস; স্থানীয় শিল্পকেন্দ্র; স্থানীয় রাস্তাঘাট; গ্রাম্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা; জল সরবরাহ ব্যবস্থা; আদর্শ বিদ্যালয়; প্রাগৈতিহাসিক জীবনযাত্রা; ভারতের ও বিভিন্ন দেশের ধর্মসংস্কারক; তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাস ও চতুর্থ শ্রেণীর ইতিহাস; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম; পলাশীর যুদ্ধ; ভারতবর্ষের সুলতানী আমল; ভারতবর্ষের মুঘল আমলের জীবনযাত্রা; ১৫ই আগষ্ট; ২৩শে জানুয়ারী; ২৬শে জানুয়ারী; বিভিন্ন ঋতু; গোবর গ্যাস; উন্নতির পথে ভারতবর্ষ; উন্নতির পথে পশ্চিম বাংলা; ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের আগমন; নদীর কাজ; তরিতরকারির কথা; বনমহোৎসব; তুলার কথা; কাঠের কথা; বাঁশবেতের কথা; গত নির্বাচন; ইত্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ইতিহাসের কর্মের ইউনিট কি ভাবে ধরা যাইতে পারে তাহার একটু ইঙ্গিত দেওয়া হইল।

তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যসূচীতে কতকগুলি ঐতিহাসিক গল্পের সমাবেশ রহিয়াছে। এই গল্পগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে যদি অল্প কয়েকটি কথা বলা যায় এবং বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি বা দুইটি শিশু ঐ কথাকে রূপায়িত করিয়া শিশু-দর্শকদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়, তবে যাহারা উহা দেখিবে তাহারা ঐ দৃশ্যটি মনে রাখিতে পারিবে। এইভাবে documentary flim-গুলির মত যদি শিশুদের মধ্যেই কেহ এই শ্রেণীর সমগ্র ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর শিশুদের দ্বারা রূপায়িত কথাগুলি পড়িয়া যায় আর ফিল্মের মত শিশুদের দ্বারা রচিত এক দৃশ্য হইতে আর এক দৃশ্য চলিয়া যাইতে থাকে তবে ইতিহাসের সমগ্র পাঠ্যসূচী শিশুর মনে এককভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিবে। এইরূপ কাজ কখন হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। অনেক সময়ে দেখা যায় বৎসরের ৯।১০ মাসের মধ্যেই ইতিহাসের পাঠ্যসূচী শেষ হয়, তখন সমগ্র পাঠ্যসূচীর উপর এইরূপ কর্মের ব্যবস্থা চলিতে পারে। এই কাজে

আনন্দও যেমন, গড়িয়া তুলিতে খাটুনিও সেইরূপ। বিভিন্ন সময়ের পোষাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র ছাত্রছাত্রীরাই তৈয়ারী করিবে। শিক্ষকের সহযোগিতায় ও ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহের প্রাবল্যে এই জাতীয় কর্মের ব্যবস্থা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয় বলিয়া দেখা গিয়াছে।

চতুর্থ শ্রেণীতে ইতিহাসের পাঠ্যসূচীতে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির বিক্ষিপ্ত ভাবে সমাবেশ রহিয়াছে, গল্পের ধারা সেইখানেও অব্যাহত, যদিও তৃতীয় শ্রেণীর রকম নয়। এই শ্রেণীতেও হিন্দুযুগ, সুলতানী যুগ এইভাবে ভাগ ভাগ করিয়া ইতিহাসের আলেখ্য তৈয়ারী করা যায়। এই শ্রেণীতে কয়েকজন ধর্মসংস্কারকের কথা রহিয়াছে, তাঁহাদের নিয়া অপর আর একটি কর্মের ইউনিট রচনা করা যাইতে পারে।

ছাত্রছাত্রীরাই এই জাতীয় কর্ম পরিচালনা করিবে, শিক্ষক সাহায্য করিবেন মাত্র।

শিল্পকাজ পরিচালনা

পরবর্তী ছক অনুযায়ী শিল্পকাজ পরিচালনা করা যাইতে পারে। শিল্পকাজ পরিচালনার মধ্যে প্রত্যেকটি কর্মের স্তরের সঙ্গে যে যে বিষয় সম্বন্ধিত জ্ঞান হিসাবে আসে, তাহারই আলোচনা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে করিতে হইবে। সমগ্র কাজটির মধ্যে কয়েকবারই এইরূপ সম্বন্ধিত জ্ঞান দেওয়ার সুযোগ আসিতে পারে। প্রথমতঃ যে শিল্প কাজটি করা হইবে, সেই শিল্পকাজ সম্বন্ধে প্রথমেই ভালভাবে পরিচয় দিতে হইবে। শিল্প-পরিচয় সব সময়ে প্রয়োজন হয় না, শুধু যখন সেই শিল্পকাজ প্রথম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হইবে তখন করিতে হইবে। ইহার পর হইবে যে কাজটি করিতে দেওয়া হইবে তাহার পরিচয়। শিক্ষক বোর্ডে কাজটির ছবি আঁকিবেন, ছাত্রছাত্রীরাও ছবি আঁকিয়া লইবে। শিল্পকাজের ছবি আঁকার গুরুত্ব খুবই বেশী। এইখানে ভালভাবে জিনিষটির ড্রইং করিতে হইবে। ড্রইংএর সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতি আসিবে। তারপর যে জিনিষ লইয়া কাজ করিবে, সেই জিনিষগুলির বৈশিষ্ট্য দাম ইত্যাদি আলোচনা করিতে হইবে। তারপর শিশুরা কাজ করিবে। দলগতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষক শিশুদের সাহায্য করিবেন। কাজের শেষে শিশুরা সমগ্র কাজের আলোচনা করিবে, লিখিবে এবং জিনিষটি উৎপাদন বহিতে লিখিয়া রাখিবে। কাজের জন্য

যতটুকু জিনিষ লওয়া হইয়াছিল এবং কাজের শেষে যতটুকু জিনিষে দাঁড়াইয়াছে, তাহার হিসাব বাহির করিতে হইবে। জিনিষ যতটুকু নষ্ট হইল, তাহারও দাম বাহির করিতে হইবে। বিভিন্ন কাঁচামাল, সময়, মজুরি ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া জিনিষটির দাম স্থির করা হইবে। ছাত্রছাত্রীদের মজুরি প্রথম অবস্থায় ঘণ্টা প্রতি ⁄০ আনা ধরিয়া ধীরে ধীরে উহা বর্ধিত করা যাইতে পারে। বাজার দর হইতে জিনিষের দর যাহাতে বেশী না পড়ে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শিল্প কাজের দুইটি ছক এখানে দেওয়া হইল।

কাতাই শিল্প

কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পরিকল্পনা	কাতাই কাজ	কর্ম-সমস্যা
সূতা কাটা	শিল্প কাজে দক্ষতা অর্জন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশ	চরকা, পাঁজ	শিক্ষক আলোচনা করিবেন ছাত্রছাত্রীরা কি কি জিনিষ তৈয়ারী করিবে এবং তাহার জন্য কতটা সূতা কাটিবে।	শিশুরা কাজ করিবে। শিক্ষক ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবে সাহায্য করিবেন	কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে শিক্ষক তাহার সমাধান করিবেন এবং ঐ সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা করিবেন। উহাই পাঠের ইউনিট হইবে।

কর্মের হিসাব	কর্মের বিচার	সম্বন্ধিত শিক্ষা		মন্তব্য
		সাদৃশ্য	অঙ্ক	
কর্মের শেষে শিশুদের ধারাবাহিক বিবরণী লেখা। সূতার দাম কষিয়া বাহির করা।	শিশুরা কিভাবে কাজ করিল তাহার বিচার	আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার বোর্ডে লেখা—ছাত্রদের লেখা	কাজের উপর নির্ভর করিয়া অঙ্ক কষিয়া কত তার সূতা কাটিবে তাহা বাহির করা—সমগ্র ও অংশ	

কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	কাজের ছবি	সম্বন্ধিত শিক্ষা		
				জ্যামিতি	কাঠ ও অন্যান্য জিনিষ	দাম
যে কোন কাঠের কাজ	শিল্প কাজে দক্ষতা অর্জন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ	কাঠ, কাঠের কাজ করিবার যন্ত্রপাতি— পেরেক, স্ক্রু, স্যাণ্ডপেপার, পালিশ ইত্যাদি	যে কাজটি ছাত্রেরা করিবে, শিক্ষক তাহার ছবি আঁকিবেন, ছাত্রেরা আঁকিবে	জ্যামিতি জ্ঞান	কাঠের ও অন্যান্য জিনিষের পরিচয়	কিউ-বিক ফিটের অঙ্ক—কাঠের সাধারণ দাম। স্থানীয় কাঠ ও ভারতের অন্যান্য স্থানের কাঠ

কাঠের কাজ	সম্বন্ধিত শিক্ষা			মন্তব্য
	মাতৃভাষা	অঙ্ক	উৎপাদন	
ছাত্রেরা কাজ করিবে, শিক্ষক প্রয়োজনমত ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করিবেন দলগত সাহায্যের ক্ষেত্রে যে যে প্রক্রিয়া সমস্ত ছাত্রেরাই ভুল করে তাহা লইয়া আলোচনা	কাজের ডাইরী	তৈয়ারী জিনিষের মাপ। যতটা কাঠ নেওয়া হইয়াছিল এবং যাহা তৈয়ারী হওয়ার পর আছে, তাহাতে কতটা কাঠ নষ্ট হইয়াছে তাহা বাহির করা।	নিয়মিতভাবে রেকর্ড করা। দাম ফেলা—সময়, জিনিষ, পারিশ্রমিক, লাভ-ক্ষতি	

References

1. Teaching in Infant Schools—K. V. Woodford.
2. Principles of Teaching Method by Pinsent.
3. A First book on Teaching by Nancy Catty.
4. Theory and Practice in Elementary Schools by Saucier.
5. Learning and Teaching in Infant Schools by Hume.
6. Scheme of work—Evans Bros (for Infant Classes)

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাতৃভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদান-পদ্ধতি

মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা

(১) মাতৃভাষা ও সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা না করিলে শিশু শুদ্ধ, সঠিক এবং সুন্দরভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না এবং অন্যের সহিত ভাব-বিনিময় করিতে পারে না।

(২) মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ভাল জ্ঞানলাভের উপর শিশুর অন্যান্য বিষয় শিক্ষা, বস্তুতঃ তাহার সমগ্র শিক্ষালাভই প্রধানতঃ নির্ভর করে। কেন না, অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান-লাভের জন্যও মাতৃভাষার সাহায্য লইতে হয়।

(৩) শিশুর চিন্তাশক্তি এবং ভাববৃত্তির বিকাশ সাধন কার্যে মাতৃভাষা সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করে। কেন না, মাতৃভাষার জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু ভাষার সাহায্যে অভিজ্ঞতার সঠিক ধারণা করিতে শিক্ষা করে, জাতিগত উত্তরাধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করে, অভিজ্ঞতা ও জাতিগত জ্ঞান স্মরণ রাখে এবং প্রয়োজন মত ব্যবহার করে। সে তখন ভাষার সাহায্যে **চিন্তা করে** এবং ভাষার দ্বারা তাহার চিন্তা শৃঙ্খলাপূর্ণ হয়। সাহিত্য পাঠ ও চর্চার দ্বারা উচ্চ চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও ভাববৃত্তির বিকাশ হয়। (শিক্ষা—২ অধ্যায়, ১৯শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(৪) মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের মত এই যে, মৌলিক চিন্তা করিবার এবং তাহা প্রকাশ করিবার পক্ষে মাতৃভাষাই সর্বাপেক্ষা বেশী উপযোগী।

(৫) মাতৃভাষায় ভাল জ্ঞান লাভ করিলে নানা পুস্তক পড়িয়া স্বচেষ্টায় জ্ঞান লাভ করা যায় এবং সাহিত্য পাঠের ও চর্চার বিমল আনন্দ উপভোগ করা যায়।

(৬) জাতীয় সাহিত্যই জাতির উচ্চ চিন্তা, দর্শন, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আধার বা সঞ্চয়াগার। সুতরাং মাতৃভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা

অবহেলা করিলে মানুষ নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত সুপরিচিত হইতে পারে না।

ভাষা ও সাহিত্য। কোন প্রকার অলঙ্কারহীন যে সহজ ও সরল কথায় মনের ভাব প্রকাশ করা যায় তাহাকে **ভাষা** বলে। ভাষার সাহায্যে মনের সাধারণ ভাবগুলি মাত্র প্রকাশ করা যায়, জটিল বা উন্নত ভাবগুলি প্রকাশ করা যায় না এবং করিলেও তাহা সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায় না ও তাহার দ্বারা শ্রোতার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করা যায় না। যে অলঙ্কার ও কল্পনাপূর্ণ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় মনের জটিল ও উন্নত চিন্তা প্রকাশ করা যায় এবং শ্রোতার ভাববৃত্তি জাগরিত করিয়া তাহার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করা যায় তাহাকে **সাহিত্য** বলে। যথা,—

আমার বয়স চল্লিশ বৎসর মাত্র—ভাষা।
আমি চল্লিশ শীতকাল বা গ্রীষ্মকাল দেখিয়াছি—সাহিত্য।
আমার তখন পূর্ণ যৌবন—ভাষা।
তখন আমার জীবনের বসন্ত ঋতু—সাহিত্য।

শিশু প্রথমে কেবল মাতৃভাষাই শিক্ষা করিতে পারে। ভাষার উপর যথেষ্ট দখল হওয়া এবং তাহার চিন্তাশক্তি ও ভাববৃত্তির প্রয়োজনীয় বিকাশ হওয়ার পূর্বে তাহাকে সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া যায় না। কেন না, বিশুদ্ধ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশের শক্তিলাভের পূর্বে ছাত্রকে সাহিত্য শিক্ষাদানের চেষ্টা করিলে সে কোনটাই ভালরূপে শিক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং প্রাথমিক স্তরে শিশুকে কেবল মাতৃভাষাই শিক্ষা দেওয়া যায়, এবং তাহার সাহায্যে তাহাকে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিতে হয়। তাই এই স্তরের পাঠ্য পুস্তকগুলি সরল ভাষায় লেখা প্রয়োজন। মধ্য বাঙ্গলা স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-শিক্ষার সূচনা করা যায় এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে ছাত্রকে সাহিত্যেরও কিছু কিছু আস্বাদ দেওয়া যায়।

ভাষা-শিক্ষাদানের ক্রম

মৌখিক ভাষা শিক্ষাদান

লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষাদানের পূর্বে শিশুকে মাতৃভাষায় অন্যের কথা বুঝিতে ও নিজের শুদ্ধ, সরল ভাষায় সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ **কথোপকথনের ভিতর দিয়াই শিশুর**

মাতৃভাষা শিক্ষা আরম্ভ হইবে। কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী প্রণালীতে প্রথমে বস্তু-পাঠের ব্যবস্থা করিলে শিশু নানা জিনিষের নাম বলিতে ও তাহাদের সরল বর্ণনা দিতে শিখিবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক নানা গল্প বলিতে পারেন এবং শিশুকে গল্পগুলি পুনরাবৃত্তি করিতে উৎসাহ দিতে পারেন। সময় সময় কোন সাধারণ বিষয়ে শিক্ষক শিশুগণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। প্রথম হইতেই শিশুকে **বিশুদ্ধ উচ্চারণ** করিয়া কথা বলিতে শিক্ষা দিতে হইবে। কেননা, সে একবার অশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে অভ্যস্ত হইলে তাহা সংশোধন করা খুব কঠিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পড়া ও লেখা শিক্ষা

পড়া ও লেখা শিক্ষা। লিখিতে পড়িতে শিক্ষাদানের প্রকৃত প্রণালী সম্বন্ধে নানা মত আছে। নিম্নে পড়া ও লেখার বিভিন্ন প্রণালী ও তাহাদের আপেক্ষিক মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।—

(১) বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রণালী (Analytic Method)। যে সকল সরল ও বক্ররেখার সাহায্যে এক এক বর্ণ গঠিত, বর্ণটিকে বিশ্লেষণ করিয়া শিশুকে প্রথমে সেই রেখাগুলি আঁকিতে এবং পরে তাহাদের সংশ্লেষণে বর্ণটি গঠন করিয়া তাহা লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া যায়। এই প্রণালীর দোষ এই যে, রেখা-অঙ্কন হইতে বর্ণলেখা ও পড়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ শিশু যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করে। কেননা, **শিশুর নিকট রেখা বা বর্ণের কোন অর্থ নাই।**

(২) বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি (Alphabetic Method)। এই প্রণালীতে প্রথমে এক একটি করিয়া সমস্ত বর্ণগুলি লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয়; পরে বিভিন্ন বর্ণের সাহায্যে এক এক শব্দ গঠন করিয়া তাহা পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্বে এই প্রণালীতেই শিশুকে পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। আমাদের দেশে এখনও ইহা প্রচলিত আছে।

এই প্রণালীর প্রধান দোষ এই যে, ইহা শিশু-মনোবিজ্ঞান-সম্মত নহে। কেননা, শিশু প্রথমে এক একটা বর্ণ উচ্চারণ করিতে শিখে না, **এক একটা বাক্য বা বাক্যাংশ** বলিতে শিখে। তাহা ছাড়া শব্দের মধ্যে স্থান না পাইলে বর্ণের কোন অর্থ হয় না; সুতরাং শিশুর নিকট স্বতন্ত্র বর্ণগুলির কোন মূল্য নাই। তাই এক একটি বর্ণ পড়িতে বলিলে সে যন্ত্রের ন্যায় কাজ করে, ইহাতে কোন আনন্দ পায় না; ফলে, তাহার পক্ষে বর্ণ শিক্ষা করা অত্যন্ত নীরস ও কষ্টসাধ্য বোধ হয় এবং ইহার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়।

(৩) **ফোনেটিক প্রণালী** (Phonetic Method)। এই প্রণালীতে শিশুকে প্রথমে বিভিন্ন স্বরযন্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া এক এক বর্ণ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাহার পরেই লেখা বর্ণগুলি পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার দোষ এই যে, বিভিন্ন স্বরযন্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণ উচ্চারণ করা একটা অত্যন্ত কৃত্রিম কাজ, তাই এই উপায়ে বর্ণ শিক্ষা করা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন; অন্যের বিশুদ্ধ উচ্চারণের অনুকরণ করিয়াই সে সহজে কথা বলিতে শিক্ষা করে। স্বরযন্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া শিক্ষক বিশুদ্ধ উচ্চারণের আদর্শ দেখাইতে পারেন এবং তাহার অনুকরণ করিয়াই শিশু বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করিতে পারে; তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে স্বরযন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া যায় না।

(৪) **শব্দক্রমিক প্রণালী** (Word Method)। এই প্রণালীতে শিশুকে প্রথমেই এক একটা সহজ সহজ শব্দ শিক্ষা দিয়া পরে তাহাদের অন্তর্গত বিভিন্ন বর্ণগুলি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়; ইহা মনোবিজ্ঞান-সম্মত এবং শিশুর পক্ষে আনন্দজনক; কেননা, শিশু প্রথমে এক একটা শব্দ বলিতে শিখে এবং তাহার নিকট শব্দগুলির অর্থ আছে। কিন্তু শিশুর নিকট শব্দের অর্থবোধ হইলেই উহা শিশুর শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শব্দক্রমিক প্রণালীতে শিশুর শিক্ষা বিভিন্ন শব্দের মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে শিশুর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় এবং শিশুরা বিচ্ছিন্ন শব্দগুলি আগ্রহ সহকারে আয়ত্ত করিতে মনোযোগী হয় না। বর্ণানুক্রমিক শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে এই শিক্ষা-পদ্ধতি অনেক ভাল, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়।

(৫) **দ্বৈত প্রণালী** (Composite Method)—পড়া ও লেখা একই সঙ্গে চলিতে পারে, এমন একটি প্রণালী শিশুদের শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া একদল শিক্ষাবিদ্ দ্বৈত প্রণালীকে ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত প্রণালী বলিয়া

মনে করেন। এই প্রণালীতে একই আকৃতি-বিশিষ্ট অক্ষরগুলিকে আলাদা আলাদা করিয়া শ্রেণী-বিভাগ করিয়া রাখা হয়। একটি শ্রেণীর একটি অক্ষর কোন ভাবে শিশুকে শিখাইতে পারিলে, অন্য অক্ষরগুলি অতি সহজে শেখান যাইতে পারে। যথা,—শিশুকে যদি ব শেখান যায় তাহা হইলে র, ক, ধ, ঝ, ঋ, ইত্যাদি শিশু অতি তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহার পর সেই শ্রেণীর সকল অক্ষরগুলিকে অদল-বদল করিয়া শব্দ ও বাক্য তৈয়ারী করা যায়, যথা—বক, কর, ধর, বধ; এবং বক ধর, বধ কর ইত্যাদি। এইরূপ ভাবে একটি শ্রেণীর অক্ষরসমূহ শেখান হইয়া গেলে, পরে আর একটি শ্রেণীর অক্ষরগুলি শেখান যাইতে পারে। তখন দুই শ্রেণীর অক্ষর দ্বারা শব্দ ও বাক্য তৈয়ারী করা সহজ হয়। একই আকৃতি-বিশিষ্ট অক্ষরসমূহ পড়াইতে ও লেখাইতে সহজ বলিয়াই এই পদ্ধতিতে **দ্বৈত পদ্ধতি** বলা হয়।

(৬) **দেখা ও বলা পদ্ধতি (Look and Say Method)**।

শিশুকে প্রথমে এক একটা বস্তু বা প্রাণীর ছবি দেখাইয়া তাহার নাম বলিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। শিশু আনন্দের সহিত ছবির নাম শিক্ষা করে। (প্রথমে সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার না করিয়া সরলবর্ণ-গঠিত সহজ সহজ নাম শিক্ষা দিতে হইবে)। তাহার পর শিক্ষক সেই নামবাচক শব্দগুলি এমনভাবে উচ্চারণ করিবেন যেন তাহাদের অন্তর্গত বর্ণগুলি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয়। শিশুও তাঁহার অনুকরণ করিয়া সেইভাবে উচ্চারণ করিবে। যথা,—আমের ছবি দেখাইয়া শিক্ষক বলিবেন 'আ-ম'। তাঁহার অনুকরণ করিয়া শিশুও 'আ-ম' বলিবে। শিশু কতকগুলি নামবাচক শব্দ এইভাবে উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করিলে শিক্ষক এক একটি শব্দ বোর্ডে লিখিয়া দিবেন এবং ধীরে ধীরে পূর্বোক্ত ভাবে উচ্চারণ করিবেন। শিশুর সামনেও বড় বড় অক্ষরে সেই সকল শব্দলেখা কাগজ দিতে হইবে। শিশু সেই লেখা শব্দের উপর **অঙ্গুলি সঞ্চালনের** সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া বার বার এক একটি শব্দ পূর্বোক্তভাবে উচ্চারণ করিবে। ইহাতে শিশুর দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহার হয় বলিয়া সে অল্প সময়ের মধ্যে শব্দগুলি ও তাহার অন্তর্গত বর্ণগুলি পড়িতে শিখিবে।

এইভাবে শিশু বর্ণগুলি উচ্চারণ করিতে ও পড়িতে কিছু অভ্যস্ত হইলে, তাহার সামনে রঙ্গীন কাগজের কাটা বর্ণ ছড়াইয়া দিয়া তাহাকে এক

একটা নামের অন্তর্গত বর্ণগুলি খুঁজিয়া লইতে এবং তাহাদের সাহায্যে **নামবাচক শব্দগুলি** প্রস্তুত করিতে দেওয়া যায়। অল্প কয়েকদিন এইভাবে শিক্ষা করিলে শিশু নির্ভুলভাবে বর্ণমালা পড়িতে শিখিবে।

ইহার পর নানা সহজ সহজ কাজ নির্দেশক ছোট ছোট বাক্য বোর্ডে লিখিয়া দিয়া শিশুকে তাহা পড়িয়া তদনুযায়ী কাজ করিতে বলা যায়।

সর্বশেষে শিশুকে ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে রচিত গল্প পড়িতে দেওয়া যায়। সরল বর্ণগুলি শিক্ষাদানের পর শিশুকে সংযুক্ত বর্ণ শিক্ষা দিতে হইবে। ইহার জন্য প্রথমে দুই বা বেশী বর্ণ পাশাপাশি লিখিয়া দিতে হইবে, পরে বিভিন্ন বর্ণের পরিবর্তে তাহাদের **চিহ্নগুলি** ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিতে হইবে।

(৭) **বাক্যক্রমিক প্রণালী** (Sentence Method)। শিশু প্রথমে এক একটা শব্দ বলিতে শিখিলে, অল্প সময়ের মধ্যে সে এক একটা ছোট ছোট বাক্য বলিতে পারে। লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করার পূর্বেই সে ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে কথা বলিতে শিখিয়াছে। এই জন্য কোন কোন শিক্ষাবিদ্ শিশুকে প্রথমে এক একটা ছোট বাক্য শিক্ষা দিয়া পরে তাহার অন্তর্গত শব্দগুলি ও শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলি শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেন।

তাঁহারা বলেন যে, শিশু যে মুহূর্তে কথা বলিতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে সে বাক্যের অর্থপ্রকাশক শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করে। অতএব শিশুর কাছে পূর্ণ বাক্য অর্থবোধক ও অর্থপ্রকাশক। সেই হেতু শিশুর পক্ষে পূর্ণবাক্য হইতে পড়া ও লেখা শিক্ষা আরম্ভ করা সহজসাধ্য বলিয়া শিক্ষাবিদেরা মনে করেন। পূর্ণ বাক্যতে বাক্যের অর্থ পরিস্ফুট হওয়ার ফলে শিশুরা সেই বাক্য পড়িতে ও লিখিতে আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। যে জিনিষে শিশুরা আনন্দ পায়, সেই জিনিষ শিশুর পক্ষে আয়ত্ত করা অতিশয় সহজ হয়। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শিশুরা বর্ণ না শিখিয়াই বাক্য ও শব্দ পড়িতে পারিবে কেমন করিয়া। প্রথম কথা, যে পাঠ শিশুদের জন্য রচিত হইবে, তাহা দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইবে। প্রথম হইতেছে **কর্ম**, দ্বিতীয় হইতেছে **আবেষ্টনী**। শিশুর কর্ম শিশু নিজেই সম্পাদন করিয়াছে, অতএব কর্ম-উদ্ভূত পাঠ শিশু পড়িতে না পারিলেও, সেই পাঠের বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দ শিশুর জানা আছে এবং বাক্যের সমগ্র অর্থও শিশুর অজানা নয়। এই অবস্থায় বাক্যের অর্থ বোঝার দিক হইতে শিশুর কোন অসুবিধা হইবে না,

অসুবিধা হইবে পড়ায় ও লেখায়। সহজ পরিচিত বাক্যটি যদি বোর্ডে লিখিয়া দিয়া শিশুকে সেই বাক্যের দৃশ্যরূপ বারবার দেখাইয়া এবং নিজের পড়ার অনুকরণে উচ্চারণ করিতে শিশুদের শিক্ষা দিয়া, শিক্ষক শিশুদের সমগ্র বাক্যটির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন, তাহা হইলে সমগ্র বাক্যটির দৃশ্যরূপ শিশুর মস্তিষ্কে আসিয়া ছাপ মারিয়া বসিবে। শিশু যেমন ছবি দেখিয়া ছবিটিকে মনে করিয়া রাখে, সেইরূপ শিশু সমগ্র বাক্যটির দৃশ্যরূপ দেখিয়া সমগ্র বাক্যটিকে মনে করিয়া রাখিবে। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাউক শিশুর ছবি আঁকার পর, পাঠের বাক্যটি হইতেছে "আমি ছবি এঁকেছি।" শিশু শুধু একটি ছবি আঁকিবে না, নানারকম ছবি আঁকিবে। প্রথম বাক্যের পরে যদি শিশুর অন্যান্য আঁকা ছবির উপর পাঠ তৈয়ারী করা যায়—আমি বাঘ এঁকেছি, আমি ঘোড়া এঁকেছি, আমি বাড়ী এঁকেছি—তাহা হইলে দেখা যায় বাক্যের প্রথম ও শেষ শব্দটি একই রাখিয়া ভিতরের শব্দটি অদল-বদল করিয়া শিশুর লেখা ও পড়ার অভিজ্ঞতাকে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। শিশুর কর্মের উপর নির্ভর করা ছাড়াও আবেষ্টনীর উপর নির্ভর করিয়াও বাক্য রচনা করা যায়। শিশুর আবেষ্টনীও শিশুর পরিচিত, অতএব পাঠের অর্থ বুঝিতে শিশুর বেগ পাইতে হইবে না। প্রায় একই রকম কয়েকটি সমগ্র বাক্য শিশুদিগকে শিক্ষা দিয়া তারপর সেই বাক্যগুলিকে শব্দে ও বর্ণে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগকে বর্ণ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারা যায়। বাক্যক্রমিক শিক্ষা-প্রণালীতে পাঠ রচনা করিতে নিম্নলিখিত কয়েকটি জিনিষের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে :—

(১) বাক্যের সকল শব্দ শিশুর পরিচিত হইবে এবং উহাদের অর্থ শিশুদের নিকট বোধগম্য হইবে ;

(২) শব্দগুলি পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইবে ;

(৩) পাঠের বাক্যগুলির মধ্যে অর্থের ধারাবাহিকতা থাকিবে।

বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিলে শিশু একটি সমগ্র জিনিষ আয়ত্ত করিতে পারে বলিয়া আনন্দিত হয়, শিশুর পড়িবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সে সাবলীল ভঙ্গীতে পড়িতে পারে এবং পড়ায় শিশুর দৃষ্টি ও বাচনের প্রসার (Eye Voice Span) বৃদ্ধি পায়।

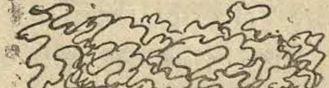
লিখন শিক্ষাদান। প্রথমে শিশুকে ঠিকমত কলম ধরিয়া হস্ত চালনা করিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রঙ্গীন পেন্সিল ঠিক ভাবে ধরিয়া রেখা টানিয়া

টানিয়া কাগজে আঁকা নানা **জ্যামিতিক ঘর পূরণ** করিতে দেওয়া যায়। শিশু আনন্দের সহিত ইহা করিবে। যখন দেখা যাইবে যে, শিশু সরল ও বাঁকা রেখা টানিতে শিখিয়াছে তখন তাহাকে লেখা অক্ষরের উপর পেন্সিল চালনা করিতে দেওয়া যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সে বর্ণগুলি উচ্চারণও করিবে। তাহার পর কিছুকাল কলাপাতার উপর দাগ কাটিয়া অক্ষর লিখিয়া দিয়া অথবা কাগজে সাধারণ পেন্সিলের দ্বারা অক্ষর লিখিয়া শিশুকে ঠিকমত কলম ধরিয়া তাহার উপর কালি দিয়া লিখিতে দিতে হইবে। (আমাদের দেশে পূর্বে এই প্রথা প্রচলিত ছিল)। সর্বশেষে শিশুকে আদর্শ লেখা দেখিয়া লিখিতে দেওয়া প্রয়োজন। সুন্দর আদর্শ লেখা দেখিয়া শিশু যত বেশী লিখিবে, শিশুর লেখা ততই সুন্দর হইবে।

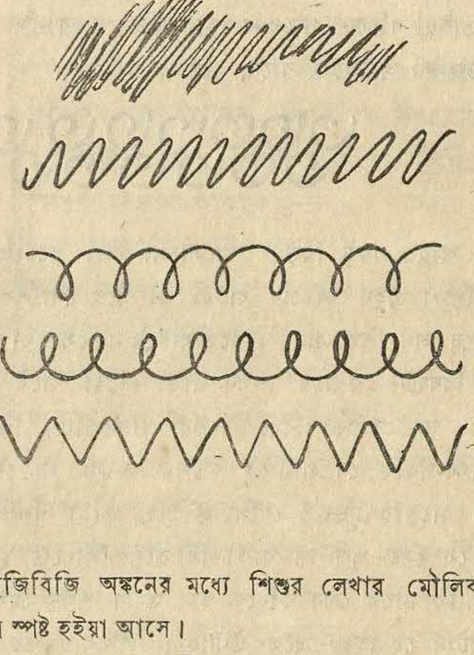
শিশুকে লিখন ও পঠন প্রায় এক সঙ্গেই শিক্ষা দিতে হইবে। অক্ষরের উপর অঙ্গুলি চালনা করিয়া পড়িতে শিক্ষার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অক্ষরের উপর পেন্সিল চালনা করিয়া লিখিতেও শিক্ষা দিতে হইবে।

কার্যতঃ দেখা গিয়াছে যে, উপরিউক্ত প্রণালীতে ১৫ দিন হইতে এক মাসের মধ্যে শিশুকে পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দেওয়া যায়।

প্রচলিত প্রণালীতে লেখা শিক্ষা দিবার কথা উপরে উল্লেখ করা গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে লেখা শিক্ষা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। শিশুদের প্রথম শিক্ষার্থী হিসাবে বিদ্যালয়ে আসার পরই জ্যামিতিক ঘর পূরণ, হেলান রেখা, সরল রেখা, বক্র রেখা ইত্যাদি অঙ্কন করিতে হয়। আদিষ্ট কাজ হিসাবে কাজগুলি মোটেই মনোগ্রাহী নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। তাহা ছাড়া, শিশুর অঙ্গুলিসমূহের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জন্মিবার পূর্বেই শিশুকে অক্ষরের মৌলিক রেখাগুলি অঙ্কন করিতে শিক্ষা দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। তাহার চেয়ে শিশুর স্বাভাবিক গতিকে অনুসরণ করিয়া চলাই বাঞ্ছনীয়। প্রথম কথা, পূর্ব-বুনিয়াদী বা প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিশুকে যদি একটি চক ও একটি বোর্ড দেওয়া যায়, এবং তাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই অঙ্কিত করিতে বলা হয়, তাহা হইলে সে সাধারণত কি করে? সে বোর্ডে এবং শ্লেটে নানারকম হিজিবিজি অঙ্কন করিয়া থাকে। এই শিশুর হিজিবিজির নমুনা। কিছুদিন

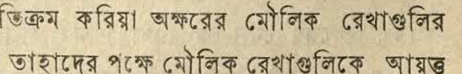


এইরূপ হিজিবিজি আঁকিবার পর শিশুর হিজিবিজি অঙ্কনও বিশেষ ধারা বহিয়া চলিতে দেখা যায়। শিশু আঁকে—



ইত্যাদি।

পরের হিজিবিজি অঙ্কনের মধ্যে শিশুর লেখার মৌলিক রেখাগুলি ততদিনে প্রায় স্পষ্ট হইয়া আসে।

আমাদের দেশে পূর্ব-বুনিয়াদী বা প্রাক্-প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা শিশু সংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। ঐ স্তরের শিশুর অঙ্গুলি সঞ্চালনের দক্ষতা অর্জন নিম্ন-বুনিয়াদী স্তরের সকল শিশুর পক্ষে কার্যকরী না হওয়ার দরুণ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণীর সকল শিশুকে পূর্ব-বুনিয়াদীর প্রাক্-লিখন স্তরের সঙ্গে পরিচয় করান প্রয়োজন অবশ্য শিশুদের অঙ্গুলি সঞ্চালন বয়স বৃদ্ধি অনুযায়ী কিছুটা নিমন্ত্রিত হওয়ার ফলেই প্রথম শ্রেণীতে অতি শীঘ্র শিশুরা হিজিবিজি আঁকার স্তর অতিক্রম করিয়া অক্ষরের মৌলিক রেখাগুলির স্তরে আসিয়া পৌছায়। তখন তাহাদের পক্ষে মৌলিক রেখাগুলিকে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য হয়। তাহারা হিজিবিজিকে ভাঙ্গিয়া আঁকে 

ইত্যাদি। এই অবস্থায় যখন শিশুরা আসিয়া পৌছায় তখন তাহাদের পক্ষে

অক্ষর তৈয়ারী করা সহজ হয়। তাহারা অনায়াসে ব ক র ত ল ইত্যাদি লিখিতে পারে।

ব ক র ত ল

শিশুরা যে অক্ষরগুলি লিখিতে শিখিল, সেই অক্ষরগুলির সঠিক রূপ যাহাতে তাহাদের মনে ভালভাবে থিতাইয়া বসিতে পারে, তাহার জন্য অক্ষরগুলি দিয়া শিশুরা প্যাটার্ন ও ডিজাইন আঁকিতে পারে, যথা



ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটু বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন। শিশুরা নূতন ধারায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইয়া এইভাবে মৌলিক রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া যে লেখা শিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। শিশুরা সমগ্র বিষয়টি একবারে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে একথা পুর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব পড়া বিষয়ে শিশুরা বাক্যক্রমিক শিক্ষা-পদ্ধতি বা শব্দক্রমিক শিক্ষা-পদ্ধতি যে পদ্ধতিই অনুসরণ করুক না কেন, শিক্ষকের লেখা শব্দ বা বাক্যের দৃশ্যরূপ দেখিয়াই শিশু তাহা লিখিতে শিখিয়া ফেলিবে। তবে সেই শব্দ বা বাক্য কি রূপে লিখিতে হয়, কি ভাবে আরম্ভ করিয়া কি ভাবে শেষ করিতে হয়, তাহা শিক্ষক দেখাইয়া দিবেন। লিখিবার প্যাটার্ন দেখাইয়া দিলে উল্টাইয়া লিখিবার ভয় শিশুদের পক্ষ হইতে আর থাকিবে না। শিক্ষক কখনও শিশুর উল্টা দিকে বসিয়া শিশুকে লেখা শিক্ষা দিবেন না, তাহা হইলে শিশু কিন্তু উল্টা করিয়া লিখিতে শিখিবে, যথা—শিক্ষক যদি শেখান **বল** তবে শিশু লিখিবে **লব** এবং তাহা উল্টা করিয়া।

সে যাহা হউক, শিশু সমগ্র বাক্য বা শব্দ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাক্য বা শব্দ লিখিতেও শিক্ষা করিবে। তাই যদি হয়, তবে শিশুর পক্ষে হিজিবিজি আঁকা, অক্ষরের মৌলিক রেখা শিক্ষা, প্যাটার্ন তৈয়ারী করা এই সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন কি, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে। উত্তরে বলা যায় যে শিশু শব্দ বা বাক্য প্রথম হইতেই লিখিয়া যাইবে, সেদিক হইতে আপত্তির কোন কারণ নাই। কিন্তু শিশু যখন বাক্য ও শব্দের দৃশ্যরূপ দেখিয়া লিখিয়া থাকে তখন অক্ষরের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য শিশু আয়ত্ত করিয়া লিখিতে পারে না। অতএব

শিশু যখন বিশ্লেষণ করিয়া অক্ষর লিখিতে শিখিবে তখন সে যাহাতে স্বীয় অঙ্গুলির পেশীসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বিস্তার করিয়া অক্ষরের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ করাও প্রয়োজন। এই কারণেই উপরে উল্লিখিত অক্ষরের মৌলিক রেখাগুলি শিক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ লেখার উদ্দেশ্য থাকিবে পরিষ্কার করিয়া লেখা, যাহাতে উহা অপরের পঠনযোগ্য হইতে পারে। অতএব হাতের লেখা ভাল করিবার জন্যও মৌলিক রেখাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। সুন্দর করিয়া লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত জিনিষগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক :—

(১) বাক্যের সমস্ত অক্ষরগুলি সমান হইবে।

(২) শব্দের অক্ষরগুলি সমান দূরত্ববিশিষ্ট হইবে এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলিও পরস্পর সমান দূরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৩) অক্ষরগুলি একইরূপ হেলান বা দাঁড়ান হইবে।

(৪) অক্ষরের মাত্রাগুলি যথাযথরূপ ব্যবহৃত হইবে।

(৫) প্রত্যেকটি অক্ষরের রেখা একই প্রকার মোটা বা সরু হইবে।

(৬) স্বরবর্ণের চিহ্নগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

প্রাচীনকালে লেখা সম্বন্ধে যে নীতি পালিত হইত, তাহা নিম্নের শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যায়।

সমানি সমশীর্ষানি বর্তুলানি ঘনানি চ।
মাত্রাস্ত প্রতিবদ্ধানি যো জানাতি স লেখকঃ॥

উপরের যে নীতিগুলির সম্বন্ধে বলা হইল, সেই নীতি যান্ত্রিকভাবেও যদি অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে শিশু মোটামুটি সুন্দরভাবে লিখিতে পারিবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বিভিন্ন পঠন-শিক্ষা-পদ্ধতির বিশ্লেষণ

পূর্বেই কয়েকটি পঠন শিক্ষাদান-পদ্ধতি আলোচনা করা গিয়াছে। শিক্ষকের শিক্ষাদান বিষয়ে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌টি গ্রহণ-যোগ্য নয়, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি শিশু-শিক্ষার পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। অথচ আমরা ত সকলেই সেই পদ্ধতি অনুসারেই এতদিন

পর্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়া আসিয়াছি। যাহারই ঐতিহ্য আছে, তাহাই যে ভবিষ্যতেও একান্তভাবে অনুসৃত হইবে এমনও কোন কথা নাই। শিশুরা প্রথমে অক্ষর এবং সেই অক্ষর-সম্বলিত শব্দ ও বাক্য পড়িতে সত্যই কোন আনন্দ পায় না। আমরা যদি শিশুর আনন্দ ও আগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদানকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া মনে করি তাহা হইলে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি মাতৃভাষা শিক্ষাদানে কোনই স্থান পাইতে পারে না।

শব্দক্রমিক এবং দেখা ও বলা পদ্ধতি, বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু শিশুর সামগ্রিক চিন্তাধারার ক্রমকে যদি আমরা মাতৃভাষা শিক্ষাদানে মানিয়া লই, তাহা হইলে শব্দক্রমিক এবং দেখা ও বলা পদ্ধতি হইতে বাক্যক্রমিক শিক্ষাদান পদ্ধতিকে উচ্চস্থান দেওয়াই মনোবিজ্ঞানসম্মত।

ফোনেটিক পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান স্বরযন্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া শিশুর পক্ষে উহা কৃত্রিম কাজ, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ; সেই কারণে উহা শিশুর শিক্ষার পক্ষে একান্তই অনুপযুক্ত।

শিশুর লেখা ও পড়া শিক্ষাদানে দ্বৈত পদ্ধতি উপযুক্ত বলিয়া আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু শিশুকে একই আকারবিশিষ্ট অক্ষরগুলির উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষা দেওয়ার দরুণ শিশু অক্ষরগুলিকে গুলাইয়া ফেলিতে পারে এবং ফলে শিশুর শব্দগুলিকে উল্টাইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে, অতএব এই পদ্ধতিও শিশুর ভাষা শিক্ষাদানের প্রথম সোপান হিসাবে অনুপযুক্ত।

বাক্যক্রমিক শিক্ষা-পদ্ধতি শিশুর চিন্তার ধারা অবলম্বন করিয়া রচিত বলিয়া উহা মনোবিজ্ঞান-সম্মত। শিশুকে এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান করিলে শিশু ভাষা শিক্ষা করিতে যথার্থ আনন্দ পাইবে, একথা বলাই বাহুল্য।

সমস্ত ক্ষেত্রেই যে শিশু বাক্যক্রমিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা পাইয়া লাভবান হইবে এরূপ কোন কথা নাই। ইংরাজী ভাষায় ২৬টি অক্ষরের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকরী হইলেও উহা যে বাংলাভাষায় বহু অক্ষর ও স্বরবর্ণের চিহ্নের ক্ষেত্রেও একইরূপ কার্যকরী হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই। এই বিষয়ে ১৯৪০-৪১ সনে বাংলাদেশে কয়েকটি পরীক্ষাকার্য বিভিন্ন স্থানে হইয়াছে বটে এবং পরীক্ষাগুলির ফলাফল বাক্যক্রমিক শিক্ষা-পদ্ধতির স্বপক্ষীয় হইলেও উহাকে সত্যই বাংলা দেশের জন্য একান্তভাবে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। এখনও উহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। তবে উহা শিশুর

আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের উপর নির্ভর করিয়া রচিত বলিয়া এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা করিতে শিশু আনন্দ ও আগ্রহবোধ করে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পড়ার জন্য প্রস্তুতি

প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে শিশু ভর্তি হইবামাত্রই তাহাকে পড়িতে, লিখিতে ও সংখ্যা গণনা করিতে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়া থাকে। শিশু এতদিন পর্যন্ত খেলা করিয়াছে ও বেড়াইয়াছে; হঠাৎ বিদ্যালয়ের বেড়াজালের মধ্যে আসিয়াই তাহাকে পড়া-লেখা করিতে আরম্ভ করিতে হয়। ইহার ফলে শিশুর পড়া ও লেখার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? এই কারণেই যদি শিশুর মনকে পূর্বাহ্লে নানাবিধ খেলার মধ্য দিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যেই শিশুর গ্রহণ করিবার মত মনোভাব গড়িয়া উঠিবে এবং তখন সে নিজের ইচ্ছা অনুসারেই পড়িতে ও লিখিতে শিখিবে। কি ভাবে শিশুর মন পড়া ও লেখার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে সে বিষয়ে পূর্ণ নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রেণীর শিশুদের নানারকম খেলার মধ্য দিয়া আগ্রহ সৃষ্টি করার উপরই মন-প্রস্তুতীকরণ নির্ভর করিয়া থাকে। এই সম্পর্কে সামান্য কিছু ইঙ্গিত দেওয়া যাইতে পারে মাত্র।

প্রথম ভর্তির পরে শ্রেণীর সকল শিশুদেরই গলায় নিজেদের নামের কার্ড কয়েকদিনের জন্য ঝোলান থাকিবে। কার্ডে শিশুদের নাম বড় বড় করিয়া লেখা থাকিবে। লেখার দৃশ্যরূপ দেখিয়া শিশু নিজের নামের সঙ্গে পরিচিত হইবেই, পক্ষান্তরে অপর শিশুদের নাম ও কার্ডে লেখা নামের সঙ্গেও শিশুরা পরিচিত হইবে। নাম লেখা কার্ড দিয়াও শিক্ষক কয়েকটি নাম-চেনা খেলার প্রবর্তন করিয়া শিশুদের লেখা চেনার পরীক্ষা করিতে পারেন।

এক গাছের নীচে সকল শিশুর নামের কার্ডগুলি সাজাইয়া রাখিয়া শিশুদের ২৫ গজ দূরে একটি লাইনে দাঁড় করাইয়া দিতে পারা যায়। তারপর তাহাদিগকে এক সাথে দৌড় দিয়া নিজের নামের কার্ডখানি আনিতে নির্দেশ দিলে শিশুরা নিজ নিজ নামের কার্ড সকলের আগে চিনিয়া বাহির করিয়া আনিতে প্রয়াস পাইবে। এই খেলা শিশুরা খুবই পছন্দ করে।

দ্বিতীয়তঃ শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি জিনিষের সঙ্গেও একটি করিয়া নাম-লেখা কার্ড ঝোলান থাকিবে। চেয়ার, টেবিল, বোর্ড, আসন, পুতুলের ঘর

ইত্যাদি সকলের সঙ্গেই একটি করিয়া বস্তু-পরিচিতি সম্পর্কিত কার্ড ঝোলান থাকা যুক্তিসঙ্গত। এই লেখাগুলির ছবি অজানিতে শিশুর মনের উপর ছাপ বসাইয়া দিবে।

শ্রেণীতে কয়েকটি কার্ডে কাজের নির্দেশ ও আদেশ লেখা থাকিবে। শিশুদের কোন কাজ করিতে দিতে হইলে সেই কাজগুলি একে একে শিশুদের দেখান হইতে পারে। শিশুরা সেই আদেশ দেখিয়া কাজ করিতে অগ্রসর হইবে। প্রথম ২।১ দিন হয়ত শিশুরা একটি আদেশসূচক কার্ডে কি লেখা আছে তাহা জানিতে পারিল না। কিন্তু তাহারা না পারিলে, বারে বারে তাহাদের দেখাইলে, এবং বাক্যের উচ্চারণের ফলে, বাক্যটিকে চিনিয়া উঠিতে তাহারা সক্ষম হইবে।

ছড়া, আবৃত্তি, গান, খেলা ইত্যাদি প্রচুরভাবে শিশুদের দিয়া করাইতে পারা যায়। এই সমস্ত জিনিষে শিশু আগ্রহ বোধ করিলেই বড় বড় সীটে লেখা ছড়া, গান ইত্যাদি লিখিতে ও পড়িতে শিশুরা আগ্রহ বোধ করিবে।

ছবি-সম্বলিত গল্পের Frieze তৈয়ারী করিয়া উহা শ্রেণীকক্ষে টানাইয়া রাখিলে সেইগুলি দেখিতে শিশু নানাবিধ বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিতে পারে, ফলে তাহাদের লেখা ও পড়ার দিকে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মিতে পারে।

ক্যালেণ্ডার, আবহাওয়ার চার্ট, নেতাদের নাম, শিশুরা যে যে গান শিখিয়াছে তাহাদের তালিকা ইত্যাদিও শ্রেণীর দেওয়ালে টানান থাকিবে। এই সমস্ত দেখিয়াও শিশুরা পড়ার প্রতি একটা স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করিবে।

শ্রেণীর আবেষ্টনী যদি পড়া ও লেখা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত হয়, তবে উহা শিশু-মনকে ধীরে ধীরে প্রভাবান্বিত করিবে এবং বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুদের আর বৈরীভাব থাকিবে না।

ইহার পর কর্ম ও আবেষ্টনীর উপর ভিত্তি করিয়া শিশুকে পড়া ও লেখা যথাযথভাবে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে মাতৃভাষা শিক্ষা নিম্নলিখিত জিনিষের উপর নির্ভর করিয়া চলে—

(১) খবর (২) আবেষ্টনী (৩) কাজ (৪) লেখা (৫) ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি (৬) নাচ-গান ইত্যাদি।

ছড়াশিক্ষাদান পদ্ধতি

শিশুর প্রথম কাব্যই হইল ছেলে-ভুলানো ছড়া, ইংরেজিতে যাকে বলে Nursery Rhymes। ছড়ার ছন্দের ভিতর দিয়া শিশুমন উধাও হইয়া যায় কল্পনার রঙ্গীন রাজ্যে যেখানে অসম্ভব বা অবাস্তবের সমাবেশ থাকিলেও শিশু অসম্ভব বা অবাস্তবের প্রাচীরে মাথা খুঁড়িয়া ফিরিয়া আসে না।

পঠনক্রিয়া সুরু হইবার পূর্বে হইতেই ছড়া শিক্ষা সুরু করা প্রয়োজন। ছড়ার আবেদনই শিশুকে পঠনে আগ্রহী করিয়া তোলে। পঠনক্রিয়ার পূর্বেই সুরু করা হয় বলিয়া ছড়া মৌখিক ভাবে শিক্ষা দেওয়াই বিধেয়।

কিন্তু মৌখিক পাঠ হইলেও ছড়ার বিষয়বস্তু সম্বলিত রঙীন ছবিযুক্ত প্রদীপন পত্র সর্ব্বদা ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাহাতে শিশুর নিকট ছড়ার পাঠ আকর্ষণীয় হয়। ছড়া দলবদ্ধ ভাবে শিখানো দরকার। তবে প্রয়োগ পর্বে ব্যক্তিগত ভাবে বলানর প্রয়োজন আছে।

ছড়ার পাঠদান কালে প্রথমে ছড়ার প্রদীপন পত্রটি শ্রেণীতে টানাইয়া দিয়া সেখানে যে সকল চিত্র রহিয়াছে সেই চিত্রসংক্রান্ত প্রশ্ন করিয়া শিশু-মনে উৎসুক্য সঞ্চার করা প্রয়োজন। তৎপর শিক্ষক ছড়াটি ভাববোধক অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক লাইন আবৃত্তি করিবেন, সঙ্গে শিশুরা আবৃত্তি করিবে। এক এক লাইন আবৃত্তি করিলেও ভাববোধক এক একটি অংশ পর্য্যন্ত এক এক বারে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। নতুবা ছড়ার আবেদন ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে।

আবৃত্তির মাঝে মাঝে কল্পনা-উদ্দীপক প্রশ্ন থাকা প্রয়োজন। তাহাতে প্রথমতঃ আবৃত্তির একঘেয়েমি দূর হয়, দ্বিতীয়তঃ শিশু সহজে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তৃতীয়তঃ প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে তাহার গুছাইয়া কথা বলিবার ক্ষমতা বাড়ে, চতুর্থতঃ ছড়ার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়। মাঝে মাঝে পরীক্ষামূলক প্রশ্নও করা চলে। তাহাতে শিশু ছড়াটি কতখানি উপলব্ধি করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায়। যেমন—

"খোকন যাবে শ্বশুর বাড়ী,
সঙ্গে যাবে কে।
বাড়ীতে আছে কেলো ভুলো,
কোমর বেঁধেছে।"

এখানে কল্পনা-উদ্দীপক প্রশ্ন—খোকনের শ্বশুর বাড়ী কোথায়, খোকনের শ্বশুরবাড়ী দেখতে কেমন ? এধরণের প্রশ্নের কোন জবাব ছড়াটিতে নাই। শিশুরা কল্পনা হইতে ইহার উত্তর দিবে। এইগুলি কল্পনা-উদ্দীপক প্রশ্ন। আবার প্রশ্ন করা হইল, খোকনের সহিত যাইবার জন্য কাহারা কোমর বাঁধিয়াছে ? ইহার উত্তর ছড়ার ভিতরেই আছে। ইহা পরীক্ষামূলক প্রশ্ন। মোট কথা ছড়ার পাঠদানকালে প্রশ্ন থাকা বিধেয়।

দুই চারিবার সমবেত ভাবে আবৃত্তির পরে ব্যক্তিগত ভাবে পড়িতে দেওয়া যায়। অক্ষর পরিচয় না থাকিলেও অনেক শিশু মুখস্থ হইয়া যাইবার ফলে ছড়াটি মুখে বলিতে পারিবে।

ছড়ার পাঠদান কালে মাঝে মাঝে অঙ্গভঙ্গী থাকা ভাল। শিক্ষক অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়া না দিয়া শিশুদের কল্পনাকেই উদ্দীপ্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। যেমন কেলোভুলো কি ভাবে কোমর বাঁধিয়াছে দেখাও।

ছড়া হইতে পঠনের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। (১) ছড়ার ভিতরে যে সকল শব্দ আছে সেই শব্দগুলি দিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্ড তৈয়ারী করিয়া সেই শব্দ-কার্ড গুলির সাহায্যে পর পর শব্দগুলি সাজাইয়া ছড়াটি তৈয়ারী করিতে দেওয়া যায়। (২) শিক্ষকও ছড়াটি শব্দ-কার্ডের সাহায্যে তৈয়ারী করিতে পারেন। মাঝে মাঝে দুই চারিটি শব্দ তিনি বাদ রাখিয়া শিশুদের সেই শব্দগুলি পুরণ করিতে নির্দ্দেশ দিবেন। শিশুরা ঠিক ঠিক শব্দ কার্ড তুলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান পুরণ করিবে।

যে সকল শিশু পঠনে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের ছড়াটি (ছোট হইলে) সম্পূর্ণটা অথবা তাহার মধ্য হইতে নির্বাচিত শব্দ লিখিতে দেওয়া যায়।

বর্ণনামূলক ছড়ার বিশেষ বিশেষ অংশ আঁকিতে দেওয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবিধ পাঠ

মাতৃভাষা শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষার স্তরভেদে বিভিন্ন প্রকারের পাঠ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। যথা, **পঠনের পাঠ, ভাষা-শিক্ষার পাঠ ও সাহিত্য-শিক্ষার পাঠ**। কিন্তু অনেক সময় একই পাঠে এই দুই বা তিন বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রাথমিক স্তরে পঠনের পাঠের আকারেই মাতৃভাষা শিক্ষাদান আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু পরে উহার সহিত ভাষা-শিক্ষাদান-কার্যও যোগ করিতে হয়। মধ্য- বাঙ্গালা স্তরে পঠনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-শিক্ষাদানের অধিকতর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরেও ভাষাশিক্ষার পাঠই দেওয়া হয়। কিন্তু সাহিত্য-শিক্ষাদানও আরম্ভ করা যায়।

পঠনের পাঠ

শিশু পূর্ববর্ণিত প্রণালীতে লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিলে, প্রথমে **পঠনের পাঠের সাহায্যেই তাহাকে মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে হইবে**। যখন শিশু এক একটি শব্দ বানান না করিয়া পড়িতে পারে, তখনই তাহাকে পঠনের পাঠ দেওয়া যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম মানে ইহা আরম্ভ করা যায়। বস্তুতঃ **শুদ্ধ, সুস্পষ্ট ও ভাবব্যঞ্জক পঠন এবং মর্ম গ্রহণ শিক্ষাই প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য**। অবশ্য মর্ম গ্রহণের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবির বইয়ে কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকে লিখিত কঠিন শব্দার্থও শিক্ষা দিতে হইবে এবং ক্রমশঃ শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে হইবে। পঠনের পাঠে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে :—

(১) **ছাত্রের অবস্থান**। পড়িবার সময় ছাত্র সোজা হইয়া দাঁড়াইবে, বাম হাতে বই লইবে এবং ডান হাত ঝুলাইয়া রাখিবে, **চক্ষু হইতে পুস্তক মাত্র ১২″ ইঞ্চি দূরে থাকিবে,** যেন বাম দিক হইতে আলো আসিয়া পুস্তকে পড়ে সেই ভাবে দাঁড়াইবে। ডান দিক হইতেও আলো

আসিতে দেওয়া যায়, কিন্তু কখনও আলোর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে না ; এক একজন শ্রেণীর সামনে আসিয়া শ্রেণীর দিকে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইবে ও পড়িবে।

(২) **স্বর**। অতি উচ্চ ও নিম্ন স্বরে পড়া ভাল নহে। সাধারণতঃ নিজের উচ্চারণ স্পষ্ট ভাবে নিজের কাণে পৌছাইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে, শ্রেণীর সকল ছাত্র যেন শুনিতে পায় এইরূপ উচ্চ স্বরে পড়িতে হইবে। কিন্তু অস্বাভাবিক চেঁচাইয়া পড়া উচিত নহে, সর্বদা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বরে পড়িতে হইবে। **লেখকের মনের ভাব প্রকাশ করিবার মত প্রয়োজনীয় স্বরভঙ্গি করিতে হইবে**। যথা, ক্রোধ, ভয়, বিস্ময় বিদ্রূপ বা বিরক্তির ভাব থাকিলে তাহা যেন সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়, সেই ভাবে পড়িতে হইবে। তবে কোন রকম **সুর করিয়া পড়া ভাল নহে**

(৩) **বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ**। **প্রত্যেক শব্দের বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হইবে** ; এই বয়সে শিশুর বাক্-যন্ত্র নমনীয় ও পরিবর্তনক্ষম থাকে, সুতরাং বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষাদানের ইহাই প্রশস্ত সময় ; এই সময়ে ভুল উচ্চারণ শিক্ষা করিলে পরে তাহা সংশোধন করা খুব কঠিন। বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষাদানের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যায় :—

(ক) শিশুর স্বরযন্ত্রের কোন দোষ থাকিলে ডাক্তারকে দিয়া পরীক্ষা ও চিকিৎসা করাইয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(খ) শিক্ষক বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া পড়িলে ও কথা বলিলে, শিশু তাঁহার অনুকরণ করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে শিখিবে।

(গ) প্রয়োজন হইলে শিশুকে **কঠিন কঠিন শব্দের** বিশুদ্ধ উচ্চারণ বার বার আবৃত্তি করিতে (pronunciation drill) দেওয়া যায়।

(ঘ) সময় সময় শিশুকে আবৃত্তি (Recitation) **বা অভিনয়ের আকারে পড়িতে দেওয়া গেলে** সে বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিবে।

(ঙ) **স্বরযন্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া পড়িতে শিক্ষাদানই বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষাদানের প্রধান উপায়**। ইহার জন্য শিক্ষককে মাতৃভাষার স্বর-বিজ্ঞান (Phonetics) শিক্ষা করিতে হইবে এবং শিশু পড়িবার সময়ে তাহার স্বরযন্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহার করে কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু শিশুকে ইহা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে।

(৪) **বিরাম**। পঠনের সময় কমা (,), সেমিকোলন (;), দাঁড়ি (।) প্রভৃতি বিরাম-চিহ্নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং **চিহ্নানুযায়ী প্রয়োজনমত থামিয়া থামিয়া পড়িতে হইবে**। তাহা না করিলে কোন বিষয় পড়িয়া অর্থবোধ হইবে না। কোন চিহ্ন থাকিলে, কতক্ষণ থামিতে হইবে তাহা ছাত্রকে যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে হইবে। যথা,—(,) থাকিলে একটু থামিবে, কিন্তু শ্বাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে না। (;) থাকিলে শ্বাস ত্যাগ করিবে, কিন্তু তাড়াতাড়ি পুনঃ শ্বাস গ্রহণ করিয়া পড়িতে হইবে। (।) থাকিলে শ্বাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে এবং স্বাভাবিক ভাবে পুনঃ শ্বাস গ্রহণ করিয়া পড়িতে হইবে। ইহা ছাড়া, **পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলি** (Phrases) **একসঙ্গে পড়িতে হইবে**। ইহা না করিলে অর্থবোধ হইবে না। প্রথমে শিক্ষক বাক্যের এই সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলি ভাগ করিয়া দিতে পারেন। যথা,—অতি প্রাচীনকালে। মগধ প্রদেশে। জরাসন্ধ নামে। এক রাজা। ছিলেন। এইরূপ স্বাভাবিক সম্পর্কযুক্ত বাক্যাংশগুলি পৃথক ভাবে না পড়িলে কিরূপ ফল হয় তাহা নিম্নের উদাহরণ হইতে দেখা যাইবে। যথা,—অযোধ্যার। রাজা রামচন্দ্র। সীতাকে লক্ষ্মণের। সহিত বনে। পাঠাইয়া দিলেন।

পরে শিক্ষকের আদর্শ-পঠন শুনিয়াই ছাত্রগণ বাক্য ঠিকভাবে ভাগ করিয়া পড়িতে শিখিবে। **সর্বশেষে অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পড়িতে শিখিলেই পড়িবার সময়ে বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি পরস্পরের সহিত সম্পর্কানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইবে।**

(৫) **প্রস্বর** (accent)। **পড়িবার সময়ে ঠিক অর্থ প্রকাশের জন্য বিভিন্ন শব্দের উপর প্রয়োজনমত জোর দিয়া পড়িতে হয়, ইহাকে প্রস্বর বলে**। ঠিকভাবে প্রস্বর ব্যবহার না করিলে বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না। কেননা, বিভিন্ন শব্দের উপর জোর দিয়া পড়িলে বাক্যের বিভিন্ন অর্থ হয়। যথা,—তুমি দুপুর বেলা রামের বাড়ীতে গল্প করিবার জন্য যাও। এই বাক্যে 'তুমি' শব্দের উপর জোর দিয়া পড়িলে বুঝাইবে যে তুমিই যাও, অন্য কেহ নহে ; 'দুপুর বেলা' শব্দ দুইটির উপর জোর দিয়া পড়িলে বুঝাইবে যে, দুপুর বেলাই যাও, অন্য সময়ে নহে ; 'রামের বাড়ীতে' এই শব্দ দুইটির উপর জোর দিয়া পড়িলে বুঝাইবে যে, রামের বাড়ীতেই যাও, অন্যত্র নহে ; 'গল্প করিতে' শব্দ দুইটির উপর জোর দিয়া পড়িলে বুঝাইবে যে, গল্প করিতে যাও, অন্য কাজের জন্য নহে।

'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে ?'—এই বাক্যটি ঠিক অর্থ-প্রকাশক ভাবে পড়িবার জন্য দুইটি শব্দের উপর জোর দিয়া পড়িতে হইবে।

(৬) **গতি**। ভাব প্রকাশের জন্য কোন অংশ কিছু দ্রুত এবং কোন অংশ কিছু ধীরে পড়িতে হয়। যথা,—

"বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই ?"

বক্তার ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার জন্য উপরিউক্ত কবিতার প্রথম চরণ কিছু ধীরে এবং দ্বিতীয় চরণ কিছু দ্রুত পড়িতে হইবে।

(৭) **ছন্দ**। **কবিতা পাঠের সময়ে ঠিকভাবে ছন্দের অনুসরণ করিয়া পড়িতে হইবে**। ইহা না করিলে, কবিতার সম্যক ভাব প্রকাশ পায় না এবং তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না।

(৮) **ভুল নিবারণ ও সংশোধন**। যদি শিক্ষক মনে করেন যে অধিকাংশ ছাত্র ঠিকভাবে পড়িতে পারিবে না, তবে পাঠের প্রথমে তিনি **কঠিন কঠিন শব্দগুলি বোর্ডে লিখিয়া দিয়া ছাত্রগণকে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিবেন, এবং নিজে আদর্শ পাঠ দিবেন**। তাহার পরেই ছাত্রগণকে পড়িতে দেওয়া যায়। প্রাথমিক স্তরে প্রায় সর্বদাই শিক্ষকের আদর্শ পাঠদানের প্রয়োজন হয়।

ইহা সত্ত্বেও ছাত্রগণ পঠনের সময়ে ভুল করিবে এবং শিক্ষককে যত্নের সহিত তাহা সংশোধন করিতে হইবে। কেননা, ছাত্রগণ একবার ভুল পড়িতে অভ্যস্ত হইলে পরে সে অভ্যাস ভঙ্গ করা কঠিন। কিন্তু পড়িবার সময়ে মাঝখানে ছাত্রকে থামাইয়া ভুল সংশোধন করা উচিত নহে। শিক্ষক তখন ভুলগুলি লক্ষ্য করিবেন এবং নোট করিবেন; ছাত্রগণকেও লক্ষ্য করিতে এবং নোট করিতে বলিবেন। এক এক বাক্য, চরণ, শীর্ষ বা অনুচ্ছেদ পড়া শেষ হইলে, শিক্ষক ছাত্রগণের সহযোগিতায় ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিবেন। বেশী ভুল করিলে ছাত্রকে তাহা পুনঃ শুদ্ধভাবে পড়িতে বলিবেন।

(৯) **সমস্বরে পঠন**। কেহ কেহ ছাত্রগণকে একসঙ্গে সমস্বরে পড়িতে বলেন, কিন্তু ইহা আপত্তিজনক। অকারণ ইহাতে শ্রেণীতে হট্টগোলের সৃষ্টি হয়, অন্য শ্রেণীর কাজের ব্যাঘাত হয়, এবং ছাত্রগণ সাধারণতঃ যন্ত্রের ন্যায় আবৃত্তি করে। তবে বানান না করিয়া প্রথম পঠনের

সময় শিশুগণ অনেক সময় শিক্ষকের পঠন শুনিবার পরও ঠিকভাবে পড়িতে পারে না, স্থতরাং এই সময়ে কিছুদিন তাহাদিগকে শিক্ষকের সহিত সমস্বরে পড়িতে দেওয়া যায়। কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব এই ব্যবস্থা ত্যাগ করিতে হইবে। তবে যদি কোন ছাত্র কিছুতেই ঠিকভাবে পড়িতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে সময় সময় শিক্ষকের সহিতে বা অন্য কোন ভাল ছাত্রের সহিত সমস্বরে পড়িতে দেওয়া যায়।

(১০) **বই না দেখিয়া পাঠ শ্রবণ**। সময় সময় শিক্ষক বা একজন ছাত্র পড়িতে পারে এবং ছাত্রগণ বই না দেখিয়া পাঠ শ্রবণ করিতে পারে। ইহাতে একদিকে যে শিক্ষক বা ছাত্র পাঠ করে তাহাকে খুব যত্নের সহিত ভাল ভাবে পড়িতে হয়, যেন অন্যে শুনিয়া তাহার মর্মানুসরণ করিতে পারে। অপর দিকে ছাত্রগণকে তাহা একাগ্র মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে হয়। নতুবা তাহারা মর্মানুসরণ করিতে পারে না। কিন্তু ইহা প্রাথমিক স্তরের ছাত্রগণের উপযোগী নহে।

(১১) **মর্মানুসরণ**। কোন লিখিত বিষয়ের মর্মানুসরণই প্রকৃত পঠন। পঠন সরবই হউক বা নীরবই হউক, মর্মানুসরণ না করিলে পঠনই হয় না। বিরাম, যতি, গতি, ছন্দ ইত্যাদি মর্মানুসরণের সাহায্য করে বলিয়াই তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া পড়িতে হয়। কিন্তু যন্ত্রের ন্যায় সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া পড়িলেও ছাত্র পঠিত বিষয়ের মর্মানুসরণ নাও করিতে পারে। স্থতরাং মর্মানুসরণ করিয়া পড়িতেছে কিনা, তাহার প্রতি শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ছাত্রের পঠন শুনিয়াই সে মর্মানুসরণ করিতেছে কিনা বুঝা যাইবে। পঠনের পর ছোট ছোট প্রশ্নের সাহায্যেও ছাত্র মর্মানুসরণ করিয়াছে কিনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন; সময় সময় নীরব পঠনের ব্যবস্থা করিলে মর্মানুসরণ ভাল অভ্যাস হয়। স্থতরাং উচ্চ শ্রেণীতে পঠনের পাঠে নীরব পঠনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পঠনের পাঠে কার্যক্রম

১। **পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা ও নূতন পাঠ ঘোষণা**। প্রথমে প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের পূর্বপাঠের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহার পর নূতন পাঠে যদি কোন নূতন কবিতা বা প্রবন্ধ আরম্ভ করিতে হয় তবে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞাত কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নূতন পাঠ ঘোষণা করিতে হইবে।

২। **কঠিন শব্দের উচ্চারণ শিক্ষাদান**। নূতন পাঠে কঠিন কঠিন শব্দ থাকিলে, সেইগুলি বোর্ডে লিখিয়া দিয়া ছাত্রগণকে তাহাদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিতে হইবে। (প্রাথমিক স্তরের উচ্চে ইহার প্রয়োজন হয় না। তথায় পঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কঠিন কঠিন শব্দের উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া যায়)।

৩। **শিক্ষকের পঠন ও ছাত্রের দাগ কাটা**। শিক্ষক যথাস্থানে থামিয়া থামিয়া, আস্তে আস্তে পড়িবেন, ছাত্রগণ বিরাম-চিহ্নহীন থামিবার স্থানগুলি চিহ্নিত করিয়া লইবে। (সাধারণতঃ কেবল প্রাথমিক স্তরেই ইহার প্রয়োজন হয়)।

৪। **শিক্ষকের আদর্শ পঠন**। শিক্ষক সেই দিনের জন্য নির্দিষ্ট সমগ্র বিষয়টি ভালভাবে পড়িবেন এবং ছাত্রগণ মনোযোগ সহকারে শুনিবে।

৫। **শীর্ষ বিভাগ, ছাত্রের এক এক শীর্ষ পঠন ও মর্ম আদায়**। শিক্ষক পঠনীয় বিষয়টিকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবেন এবং কয়েক জন ছাত্রকে এক এক শীর্ষ পড়িতে দিবেন। এক এক জনের পঠনের পর তাহার ভ্রম সংশোধন করিবেন। তিনি তিন-চারি জন ছাত্রের সেই শীর্ষ পাঠের পর কঠিন কঠিন শব্দার্থ জিজ্ঞাসা করিবেন ও শিক্ষা দিবেন। সর্বশেষে প্রশ্নের সাহায্যে মর্ম আদায় করিবেন।

৬। **নীরব পঠন**। এইরূপে সমস্ত শীর্ষগুলি পাঠের পর ছাত্রগণকে নির্দিষ্ট (৫-১০ মিনিট) সময়ের মধ্যে সমগ্র বিষয়টি নীরবে পাঠ করিতে দেওয়া যায়। ইহা প্রাথমিক স্তরের উপযোগী নহে।

৭। **সমগ্র পাঠের পুনরালোচনা**। কয়েকটি প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের নিকট হইতে সমগ্র পঠিত বিষয়টির সারমর্ম আদায় করিতে হইবে। অথবা ছাত্রগণকে সমগ্র পাঠের সারাংশ লিখিতে দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে সারমর্ম শিক্ষক বোর্ডে লিখিয়া দিবেন, এবং ছাত্র-ছাত্রীগণকে দিয়া কয়েক বার উহা পড়াইয়া পরে বোর্ডের লেখা মুছিয়া ফেলিবেন। পরে তিনি ছাত্র-ছাত্রীগণকে পুনরায় নিজ ভাষায় সারমর্ম লিখিতে বলিবেন।

৮। **গৃহকাজ ও নূতন পাঠ নির্দেশ**। গৃহকাজ হিসাবে পঠিত বিষয় সম্বন্ধে ২।৩টি প্রশ্নের উত্তর শিখিয়া আসিতে বা লিখিয়া আনিতে দেওয়া যায়। নূতন শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা করিয়া আনিতেও দেওয়া যায়। ৩য় মান হইতে নূতন পাঠ নির্দিষ্ট করিয়া তাহা একবার পড়িয়া আসিতেও বলা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাষা-শিক্ষার পাঠ

ছাত্রের শব্দভাণ্ডার পুষ্ট ও ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করাই ভাষা শিক্ষার পাঠের প্রধান লক্ষ্য। পঠনের পাঠ ইহার সূচনা করে এবং তাহার কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া তাহাকে ক্রমশঃ ভাষা শিক্ষার পাঠে পরিণত করা যায়। এই উদ্দেশ্যে ক্রমশঃ পঠনের পরিমাণ কমাইয়া ভাষা শিক্ষার কাজে অধিকতর সময় ব্যয় করিতে হইবে।

ভাষা-শিক্ষার পাঠের কার্যক্রম

(১) **ছাত্রের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা।** এই সময়ে পূর্ব পাঠের কঠিন কঠিন শব্দের ও বাক্যের অর্থ এবং ব্যাখ্যাও শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন।

(২) **পঠনীয় বিষয়ের শীর্ষ-বিভাগ।** বিভিন্ন ছাত্রের দ্বারা এক এক শীর্ষ পাঠ এবং প্রয়োজন মত তাহার ভ্রম সংশোধন। তাহার পর কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ এবং কঠিন কঠিন বাকোর ব্যাখ্যা শিক্ষাদান। কঠিন শব্দ বা বাক্যাংশ বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে। সেই শব্দগুলি শিশুদের দ্বারা সমস্বরে পাঠ করাইয়া উচ্চারণ শিক্ষা দিতে হইবে। তারপর অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া শিক্ষক বোর্ডে শব্দের অর্থ লিখিয়া দিবেন।

(৩) **সমভাবের কবিতা বা গদ্যাংশ** সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা **পঠন।**

(৪) **সমগ্র বিষয়ের নীরব পঠন** ও সারমর্ম লিখন অথবা প্রশ্নের সাহায্যে মর্ম আদায়।

(৫) নূতন শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহার করিয়া **বাক্য গঠন** এবং গৃহকাজ ও নূতন পাঠ নির্দেশ।

(৬) সাহিত্যের পুস্তকে শিশুদের জন্য নানারূপ প্রবন্ধ ও গল্প সন্নিবেশিত থাকে। সেই সব প্রবন্ধের মধ্যে যদি শিশুদের হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার মত কিছু থাকে, তবে তাহা কার্যদ্বারা রূপায়িত করিতে হইবে।

সাহিত্য শিক্ষার পাঠ

সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার, কল্পনা ও উচ্চ ভাবপূর্ণ লেখা পড়িয়া তাহার সম্যক্ অর্থবোধ ও সৌন্দর্য উপভোগ করিতে শিক্ষাদানই **সাহিত্য পাঠের প্রধান লক্ষ্য**। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সাহিত্যের রসবোধ বা সৌন্দর্য উপভোগ করিতে শিক্ষাদানই ইহার প্রধান কাজ।

ইহার জন্য কোন স্বতন্ত্র পাঠ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনীয় ভাষাজ্ঞান জন্মিলে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য শিক্ষাও দেওয়া যায়। সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া ভাল সাহিত্য পাঠই সাহিত্য শিক্ষার প্রধান উপায়। কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে কোন একটা কবিতা বা গদ্যাংশ ভালরূপে না বুঝিয়া তাহার সৌন্দর্য উপলব্ধি বা উপভোগ করা যায় না। সুতরাং সাহিত্য শিক্ষার পাঠেও ছাত্রকে প্রথমে কঠিন কঠিন শব্দের ও বাক্যের অর্থ বা ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতে হইবে। ইহার পর সুন্দর সুন্দর শব্দ বা বাক্যাংশ, সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ও ভাব, ছন্দ-নৈপুণ্য বা ভাষা-নৈপুণ্যের প্রতি ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া এবং তাহাদের গূঢ়ার্থ, বিশেষত্ব ও ব্যবহার বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া ছাত্রগণকে সাহিত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও উপভোগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। বিশেষতঃ ছাত্রগণকে কল্পনার সাহায্যে বর্ণিত বিষয়ের মানসিক ছবি গঠন করিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কেননা কল্পনাই সাহিত্যের প্রাণ। কল্পনার সাহায্য ব্যতীত সাহিত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধি বা উপভোগ করা সম্ভব নহে।

ইহার পর অন্য পুস্তক হইতে অনুরূপ ভাবপূর্ণ সুন্দর সুন্দর কবিতা বা গদ্যাংশ পড়িয়া শুনাইলে পাঠ আনন্দদায়ক হইবে এবং পঠিত বিষয় ছাত্রের মনে গভীর রেখাপাত করিবে।

সর্বশেষে ছাত্রগণকে সুন্দর সুন্দর শব্দ, বাক্য, অলঙ্কার বা ভাবের ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা করিতে বা কোন বর্ণনা দিতে বলা প্রয়োজন। (সুন্দর সুন্দর শব্দ, বাক্য, অলঙ্কার ও ভাবপূর্ণ বর্ণনা লিখিয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে একটা নোট বই রাখিতেও বলা প্রয়োজন)।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন কবিতা বা গদ্যাংশের সমস্ত শব্দ, বাক্য, অলঙ্কার প্রভৃতির সম্যক্ অর্থ শিক্ষা করিয়াও ছাত্র তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে অসমর্থ হইতে পারে। সেই জন্য তাহার

সৌন্দর্যের প্রতি ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহা উপভোগ করিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষককে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। এই কাজে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে হইলে সাহিত্য-শিক্ষককে সাহিত্যরসজ্ঞ বা সাহিত্য-অনুরাগী হইতে হইবে। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ থাকিলে, সাহিত্যের সৌন্দর্য দর্শনে তাঁহার আপন হৃদয়ে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস জন্মিলে এবং তিনি সুন্দর মর্মস্পর্শী ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেই, তাঁহার সাহিত্য পাঠনা প্রকৃত ফলপ্রসূ হইবে এবং তাহার ফলে ছাত্রছাত্রীগণ সাহিত্যের রস বা সৌন্দর্য উপভোগ করিতে শিখিবে।

৬নং শীর্ষে প্রবন্ধ ও গল্পকে কার্য দ্বারা রূপায়িত করিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ছাত্রছাত্রীরা প্রবন্ধ বা গল্প পড়িয়া ভাবরাজ্যে উহার রস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের বয়সের অনুপাতে শুধু ভাবরাজ্যে যাইয়া কোন জিনিষের রস গ্রহণ করিতে যাওয়া খুব সহজ নহে, সেই কারণে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকের কোন কোন অংশ কার্যদ্বারা বক্তব্যকে রূপায়িত করিতে পারিলে ভাল হয়। যথা, ‘নদীর কাজ’, ‘গাছের জীবন’ ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুরা অনায়াসে নানারূপ কর্ম-সম্পাদন করিতে পারে। ‘আমের কুসি’, ‘অবাক জলপান’ ইত্যাদিকে অনায়াসে নাটকে রূপায়িত করা চলে। নাটকের জন্য পোষাক তৈয়ারী, ষ্টেজ বাঁধা ইত্যাদি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কর্মে উৎসাহিত করিয়া থাকে; তাহারা সৃজনাত্মক শিক্ষার সুযোগ পাইবে। অবশ্য সমস্ত প্রবন্ধ ও গল্পকেই এইরূপে রূপায়িত করা সম্ভব হইবে না। তাহার প্রথম কারণ সময়ের অভাব, দ্বিতীয় কারণ সমস্ত প্রবন্ধেই কর্মের মালমসলা বেশী থাকে না। কল্পনার দ্বারা কর্মের আমদানী করার প্রয়োজন নাই।

গদ্য ও কবিতার পাঠদান-পদ্ধতি

ভাষা ও সাহিত্য অনুভব ও রসোপলব্ধির জিনিষ। তথাপি শ্রেণীতে কোন গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ লইয়া যখন পাঠদান করা হয়, তখন কতকগুলি ক্রম মানিয়া চলা প্রয়োজন হয়, কেননা তাহার ভিতর দিয়াই শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট অংশের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ, অর্থ উপলব্ধি ও ভাবগ্রহণে সক্ষম হয় এবং ইহাই রসোপলব্ধির গোড়া পত্তন। শ্রেণীতে কোন গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ লইয়া পাঠদান করিতে হইলে প্রথমে শিক্ষার্থীর মনের প্রস্তুতি প্রয়োজন।

মনের প্রস্তুতির জন্য অংশটির ভিতরে যে বিষয়বস্তু আছে সে সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করা চলে, অনুরূপ কোন পঠিত অংশের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়া সুরু করা চলে, বিষয়বস্তু-সংক্রান্ত কোন ছবি দেখাইয়া প্রশ্নমাধ্যমে মনকে আগ্রহী করা যায়। গল্পচ্ছলে ভূমিকা করা যায়, কোন কাজের সহিত সম্বন্ধ ও পাঠ হইলে কাজ সংক্রান্ত আলোচনা মাধ্যমে সুরু করা যায়। শিক্ষার্থীর মনকে প্রস্তুত করিয়া পাঠের অবতারণা করা আবশ্যক। পাঠটি যদি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত হয় তবে সকলে পাঠ্যপুস্তকের নির্দ্দিষ্ট অংশ খুলিয়া পাঠের অনুসরণ করিতে পারে। ইহা পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত না হইলে সে সম্পর্কীয় প্রদীপন-পত্র এবং প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া Reading chart থাকা প্রয়োজন।

গদ্যাংশের বা পদ্যাংশের পাঠদানকালে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ উভয় পদ্ধতিরই প্রয়োজন আছে। বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সমস্ত অংশটি হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে মর্ম গ্রহণে সাহায্য করে।

প্রথমে শিক্ষককে নির্দ্দিষ্ট অংশের আদর্শ পাঠদান করিতে হইবে। আদর্শ পাঠদান অর্থই যতি বিরাম উচ্চারণ, স্বরভঙ্গী ইত্যাদি সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠদান। আদর্শ পাঠদান এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ধ্বনির ভিতর দিয়াই বিষয়ের অন্তর্নিহিত ভাব শিক্ষার্থীর মর্ম স্পর্শ করে। প্রয়োজন বোধে শিক্ষক একাধিক বারও আদর্শ পাঠ দান করিতে পারেন।

ইহার পর শিক্ষার্থিবৃন্দকে আদর্শ ভাবে পাঠ করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে। শ্রেণীর প্রত্যেককে দিয়া একই দিনে আদর্শ পাঠ দেওয়াইবার প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন শিক্ষার্থী যেন সুযোগ পায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীর আদর্শ পাঠদানের সময়ই উচ্চারণের ত্রুটি বা অন্যান্য অবিশুদ্ধতা তাহাকে থামাইয়া দিয়া সংশোধন করা সমীচীন নয়। পাঠের সময় শিক্ষক ও শ্রেণীর অন্য সকলে লক্ষ্য রাখিবে। নির্দিষ্ট অংশ বা একটি অনুচ্ছেদ পাঠের পর সংশোধন করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

সমস্ত গদ্যাংশ বা পদ্যাংশটিকে প্রয়োজনমত বিভিন্ন শীর্ষে ভাগ করিয়া বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন শীর্ষ হইতে প্রশ্নের সাহায্যে তাৎপর্য গ্রহণে সাহায্য করিতে হইবে। তাৎপর্য গ্রহণে সাহায্যের জন্য কঠিন কঠিন

শব্দের অর্থ উপলব্ধিতে সাহায্য করা প্রয়োজন। কঠিন কঠিন শব্দ বোর্ডে লিখিয়া শিক্ষার্থিবৃন্দের সাহায্যেই উত্তর আদায় করিতে হইবে। এক একটি শীর্ষ বিশ্লেষণের পর সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট শীর্ষের মর্ম্মার্থ আদায় করা প্রয়োজন। একবার বিশ্লেষণ ও পরে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে আলোচিত হইলে শিশুদের মনে কোন ভুল ধারণা থাকিলে তাহার সহজে নিরসন হইয়া যাইবে। বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্য হইতে যত দূর সম্ভব বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের সাহায্যে ও বিভিন্ন কঠিন শব্দের অর্থবোধ সাহায্যে শিক্ষার্থীকে সমস্ত বিষয়টি উপলব্ধি করিতে সাহায্য করা হয়। সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে শুধু মোট মর্মার্থ গ্রহণ করিতে হয়।

সকল শীর্ষের আলোচনার শেষে সমস্ত বিষয়টির পুনরালোচনা প্রয়োজন। এ অংশকে প্রয়োগ অংশ বলা যায়। প্রথম মনের প্রস্তুতি পর্ব্ব, তাহার পর উপস্থাপন পর্ব্ব, সর্ব্বশেষ প্রয়োগ পর্ব্ব।

প্রয়োগ পর্ব্বে শিক্ষকের মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে ভাবে উপস্থাপন পর্ব্বে পাঠ্যবিষয়টি আলোচিত হইয়াছিল, প্রয়োগ পর্ব্বে তাহা অপেক্ষা ভিন্ন রূপে অগ্রসর হইতে পারিলেই ভাল। এজন্য প্রশ্নের ধরণও পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। তাহাতে পাঠে নূতনত্ব সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার্থীর এক-ঘেয়েমি দূর হয়। শিক্ষার্থী সত্যই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে কিনা, তাহা ভালভাবে যাচাই করা যায়। যেমন 'স্বাধীনতার সুখ' কবিতাটিতে চড়াই বলিতেছে,

"আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা 'পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে।"

উপস্থাপন পর্ব্বে এই অংশের পাঠদানকালে যদি প্রশ্ন করা হয় চড়াই বাবুইকে কি বলিতেছে? তবে প্রয়োগ পর্ব্বে প্রশ্ন করা চলে—চড়াই মহাসুখে থাকে বলিতেছে কেন, বাবুইর রোদ বৃষ্টি ঝড়ে কষ্ট পাইবার কারণ কি?—ইত্যাদি।

গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের পাঠে মনে রাখা প্রয়োজন যে যখন ভাষা ও সাহিত্য হিসাবে পাঠ দেওয়ার চিন্তা করা হইতেছে, তখন তাহার ভিতর ব্যাকরণের অনুপ্রবেশ না করানই ভাল। তাহাতে পাঠের সরলতা নষ্ট হইয়া যায়। পাঠ্যপুস্তক হইতে ব্যাকরণের পাঠ দান করা যায় না, তাহা নহে। তবে ব্যাকরণের পাঠ ভিন্ন দিনে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষকের আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে পাঠের ভিতর সমভাবের উক্তি ভাষা ও সাহিত্যের পাঠকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলে। কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রে ইহার অধিক প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরে অনেক সময় ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ বিভিন্ন ধরণের কর্মের সহিত যুক্ত করিয়া দিলে পাঠ্যাংশটির ধারণা পরিষ্কার হয় ও পাঠটিও হৃদয়গ্রাহী হয়। যেমন দার্জিলিং ভ্রমণ প্রবন্ধের সহিত পাহাড়ের মডেল, খেলনা রেলগাড়ী প্রস্তুত ইত্যাদি।

গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ যে পাঠই হউক না কেন, বোর্ডের ব্যবহার অপরিহার্য। শব্দার্থ, সারাংশ ইত্যাদি বোর্ডে লেখা প্রয়োজন। নূতন শব্দ-সম্ভারও বোর্ডে লিখিয়া দিয়া ছাত্রছাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

প্রাথমিক স্তরে প্রয়োগ পর্ব্বে পাঠ্যাংশের বর্ণনামূলক কোন অংশ আঁকিতে দেওয়া যায়। কোন বিশেষ পাঠকে অভিনয় আকারে রূপ দেওয়া যায়—যেমন, মণ্টুর বিদেশ ভ্রমণ। তাহাতে পাঠ্যাংশটি আরও হৃদয়গ্রাহী হয়।

কোন একটি নির্দিষ্ট অংশের পাঠের শেষে কিছু কিছু লেখার কাজও দেওয়া চলে। লেখার জন্য প্রশ্নগুলি রচনাত্মক (subjective) ও নির্দেশাত্মক (objective) উভয় প্রকারেই হইতে পারে। তথ্যমূলক অংশের নির্দেশাত্মক প্রশ্ন ও ভাবমূলক অংশের রচনাত্মক প্রশ্ন হওয়া বিধেয়।

গদ্যাংশ অপেক্ষাও পদ্যাংশে আদর্শ পাঠ সম্বন্ধে সতর্কতা প্রয়োজন। আদর্শ পাঠের মধ্য দিয়াই শিক্ষার্থী পদ্যাংশের ছন্দ, ভাব রস সব কিছু গ্রহণ করিতে পারে।

অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের পাঠের সময়ে লেখক বা কবির জীবনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা, তাঁহার অন্যান্য লেখার সহিত পরিচয় এবং যে বিষয়ের গদ্য বা পদ্য অন্য লেখক বা কবির অনুরূপ বিষয়বস্তু লইয়া কোন রচনা থাকিলে তাহার সহিত পরিচয় সাধন করান প্রয়োজন।

সরব পাঠ ও নীরব পাঠ

ভাষা ও সাহিত্যের যথাযথ উপলব্ধি এবং বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করিবার জন্য বিধিবদ্ধ উপায়ে পাঠের প্রয়োজন। পাঠ দুই প্রকারের হইতে পারে—(১) **সরব পাঠ** (২) **নীরব পাঠ**। জোরে জোরে উচ্চারণ করিয়া

যে পাঠ তাহাই সরব পাঠ এবং মনে মনে যে পাঠ তাহাই নীরব পাঠ। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই উভয় প্রকার পাঠেরই প্রয়োজন আছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই কতকগুলি স্থবিধা ও অস্থবিধা আছে।

সরব পাঠ—(১) সরব পাঠে চোখে দেখা, কাণে শোনা ও মুখে উচ্চারণ করা এই বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়ার সমন্বয় থাকে। এতগুলি প্রক্রিয়া একত্র কাজ করে বলিয়া বিষয়বস্তুর অর্থ উপলব্ধি সহজতর হয়।

(২) কোন বিষয় মুখস্থ করিবার প্রয়োজন হইলে সরব পাঠে তাহা দ্রুততর সম্পন্ন করা যায়। অনেকগুলি প্রক্রিয়া একত্র কাজ করে বলিয়া বিষয়বস্তু সহজে উপলব্ধি করা যায় এবং উপলব্ধি যত গভীর হয় মুখস্থ তত সহজ হয়।

(৩) সরব পাঠে সংশোধনের পথ প্রশস্ততর। ভুল উচ্চারণ করিলে শিক্ষক সহজেই তাহা ধরিতে পারেন এবং সংশোধন করিয়া দিতে পারেন।

(৪) সরব পাঠের মধ্য দিয়া স্বর সংযম (modulation of voice), স্বরভঙ্গী (intonation), যতি বিরাম চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ সকল দিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় এবং আদর্শ পঠন আয়ত্ত করার পথে সাহায্য হয়। বলা বাহুল্য আদর্শ পঠন ব্যতীত বিষয়বস্তুর সঠিক উপলব্ধি সম্ভব নয়।

(৫) সরব পঠনের মধ্য দিয়া জড়তা দূর হয়। লজ্জাশীল ও ভীরু শিশু সরব পঠনের ভিতর দিয়া লজ্জা ও ভীরুতাকে কাটাইয়া উঠিতে পারে।

(৬) নীরব পাঠে যে একাগ্রতার প্রয়োজন, সরব পাঠে সে একাগ্রতার প্রয়োজন হয় না—সে জন্য প্রাথমিক স্তরের ছোট সদাচঞ্চল শিশুর পক্ষে সরব পাঠ অধিক উপযোগী।

কিন্তু সরব পাঠের উপর সর্ব্বদা নির্ভর করা যায় না। ইহার অনেক অস্থবিধার দিকও আছে। সরবে পাঠ করা অর্থই গোলমাল। বিদ্যালয়ে অনেকগুলি শ্রেণীর কাজ চলিতে থাকা-কালীন সকল শ্রেণীতে সরব পাঠ চলিলে কাজ ব্যাহত হয়। তাহা ছাড়া উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ্য বিষয়বস্তু অনেক বেশী। সকল বিষয় সরব পাঠের ভিতর দিয়া গ্রহণ করিতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। জীবনে চলার পথে মানুষ যে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করে, সরব পাঠের ভিতর দিয়া তাহা সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। Life is short but art is long. ব্যবসায়ী যখন কাজের চাপের ভিতর ব্যবসা-

সংক্রান্ত একটি গ্রন্থপাঠ করেন, তখন প্রত্যেকটি কথা সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া গ্রন্থপাঠ করিতে হইলে তাঁহার যতটা সময়ের প্রয়োজন, নীরব পাঠের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অনেক কম সময়ে গ্রন্থপাঠ সমাপ্ত করা সম্ভব। তাহা ছাড়া সরব পাঠে সহজেই ক্লান্তি আসে। নীরব পাঠে সহজে ক্লান্তি আসে না। এখানেই নীরব পাঠের উপযোগিতা।

নীরব পাঠে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পরিলক্ষিত হয় :—

(১) নীরব পাঠে ক্লান্তি কম ;

(২) নীরব পাঠে অল্প সময়ে অনেক বেশী আয়ত্ত করা সম্ভব ;

(৩) নীরব পাঠে অযথা গোলমাল নিবারণ হয় ;

(৪) অর্থোপলব্ধির ক্ষেত্রে সরব পাঠের প্রয়োজন থাকিলেও রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে নীরব পাঠের প্রয়োজনীয়তা সমধিক ;

(৫) গ্রন্থাগারে পাঠের পক্ষে নীরব পাঠ অধিক উপযোগী ;

(৬) নীরব পাঠের মধ্য দিয়া সংযম শিক্ষা হয় ;

(৭) নীরব পাঠে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায় ; এবং

(৮) নীরব পাঠ গভীর ভাবে চিন্তা করিতে ও চিন্তাকে সুবিন্যস্ত করিতে সাহায্য করে।

নীরব পাঠ নিম্নশ্রেণীর উপযোগী না হইলেও প্রাথমিক স্তরে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণী হইতেই নীরব পাঠের ভিত্তি স্থাপন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে ব্ল্যাকবোর্ডে দুই তিনটি সংবদ্ধ বাক্য লিখিয়া তাহা একবার দেখিতে দিয়া মুছিয়া ফেলা যায় এবং ছাত্রছাত্রীকে তাহার সারটুকু বলিতে বলা যায়।

দুই একটি পূর্ণ বাক্য লিখিয়া দিয়া একবার দেখিতে দিয়া মাঝে মাঝে শব্দ মুছিয়া দিয়া সেই শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে বলা যায়।

পুস্তক হইতে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ মনে মনে পড়িতে দিয়া সারাংশ বলিবার নির্দেশ দেওয়া যায়। ইহা হইতেই ক্রমশঃ বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পুরা পুস্তকই নীরবে পাঠ করিবার অভ্যাস আয়ত্ত হইতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শুদ্ধ বানান শিক্ষাদান

শুদ্ধ বানান শিক্ষাদানের জন্য দুই রকম ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথম হইতেছে মামুলি **প্রচলিত নীতি**। এই নীতি অনুযায়ী শব্দের বানান শিক্ষাদানকেই মুখ্য স্থান দেওয়া হয়। শব্দের বানান শিক্ষাই হইতেছে সেইখানে উদ্দেশ্য। শিশুকে শব্দের বানান শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মিতভাবে সহজ শব্দ হইতে কঠিন শব্দের বানান শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, যথা—অজ, আম, ইট ইত্যাদির পর বাবা, কাকা, দাদা, আতা ইত্যাদি। তারপর ইকার যোগ, ঈকার যোগ করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। তারপর দুই অক্ষর, তিন অক্ষর, চারি অক্ষরযুক্ত শব্দ, তারপর যুক্তাক্ষর-সম্বলিত শব্দ ইত্যাদি ধীরে ধীরে শিশুর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে বানান শিক্ষা দেওয়াকে মামুলি প্রচলিত পদ্ধতির অন্তর্গত ধরা হয়।

আরও এক রকম ভাবে বানান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। উহা হইতেছে **প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি** (Incidental Method)। বানান শিক্ষা, নির্দিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয় না। যে শব্দ শিশুর শিক্ষার প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হয় সেই শব্দকেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা পঠন ও লিখন শিক্ষাদানে বাক্যক্রমিক শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি। ঐ পদ্ধতিতে শিশুর মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করা যায় এবং বাক্য ও শব্দের দৃশ্যরূপ শিশুমনে দানা বাঁধিয়া উঠে। বানান শিক্ষার প্রাসঙ্গিক নীতি ও বাক্যক্রমিক শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে সহজ সম্বন্ধ বিদ্যমান, অতএব এই নীতি অনুযায়ী শিশুকে বানান শিক্ষা দিতে হইলে শিশুর মনোযোগের উপর চাপ দিতে হয় না। শিশু অতি সহজেই তাহার শিক্ষণীয় বিষয়টুকু আয়ত্ত করিতে পারে। মামুলি নীতিতে দেখা গিয়াছে যে, শিশু যে-সকল শব্দ জীবনে সেই সময়ে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার চেয়ে শতকরা ৭৫টি বেশী শব্দ সে বানান করিতে শিখে। বলা বাহুল্য, শিশু তাহাতে আনন্দ পায় না, সে শুধু যান্ত্রিকভাবে সব শব্দগুলি শিখিয়া ফেলে। প্রসঙ্গক্রমে শিশু যে সকল শব্দ শিক্ষা করে সেই সকল শব্দ শিশুর কাছে প্রয়োজনীয় ও অর্থপূর্ণ, অতএব সেই সকল শব্দ সাগ্রহে শিক্ষা করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?

অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে, প্রচলিত মামুলি পদ্ধতি অনুযায়ী বানান শিক্ষাদান করিলে শিশুর শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পায়, এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রয়োজনের খাতিরে শিশু যাহা শিক্ষা করে, তাহাতে শিশুর শব্দভাণ্ডার বিশেষভাবে পুষ্ট হয় না। কথাটা হয়ত আপাতদৃষ্টিতে সত্য, কিন্তু শিশুর বয়সের পরিপক্বতা যথাযথরূপে বৃদ্ধি না হইলে, শুধু শিশুর শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া লাভ কি? শিশু সেগুলি মনে রাখিতে পারিবে না, এলোমেলো হইয়া যাইবে; পক্ষান্তরে যে সময় সেজন্য ব্যয়িত হইল, তাহাই অনর্থক ব্যয়িত হইল। এই কারণে যদি শিশুর শব্দসম্পদই বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শিশুর বিদ্যালয়ের আবেষ্টনী ও সমস্ত কার্যক্রমের মধ্য দিয়া শিশুর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিলেই শিশুর শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পাইবে এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়া সেই সকল শব্দ ব্যবহৃত হইবার ফলে সেই শব্দগুলি শিশুমনে স্থায়ী হইয়া রেখাপাত করিবে।

মামুলি পদ্ধতিতে বানান শিক্ষায় নিম্নলিখিত শিক্ষার ক্রম প্রতিপালিত হইয়া থাকে।—(১) শিশু শব্দের প্রতিটি অক্ষর ভালভাবে উচ্চারণ করিয়া শব্দটি পড়ে। (২) শিশু চোখ বন্ধ করিয়া আবার শব্দটি ঐভাবে উচ্চারণ করে। (৩) শিশু চোখ খুলিয়া শব্দটিকে পুনরায় দেখিয়া আবার পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত বানান ঠিক না হয়, শিশু পর পর এইভাবে পড়িয়া ও চোখ বন্ধ করিয়া উচ্চারণ করিয়া যায়। বানান ঠিক হইলে শিশু শব্দটিকে লিখিয়া ফেলে। এইরূপ ভাবে শিক্ষার ক্রম শিশুর পক্ষে মোটেই আনন্দদায়ক নয়।

প্রসঙ্গক্রমেও যে যে শব্দ শিক্ষা করা যায়, তাহা সমগ্র শব্দ হিসাবে শিক্ষা করিলেও তাহা যাহাতে স্থায়ী ভাবে মনে স্থান পায় সেই জন্য সেই সব শব্দগুলিকে বারে বারে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া শিখিয়া ফেলিতে হয়।

পুস্তকে ও অন্যান্য ভাবে শিশু যে সমস্ত নূতন শব্দের সম্মুখীন হইবে, সেই সমস্ত শব্দের বানান শিশু কি ভাবে শিখিবে তাহার ইঙ্গিত নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) বাক্যগুলি কিছু পড়িতে শিক্ষার পরেই কাটা বর্ণের সাহায্যে নানা শব্দ তৈয়ার করিতে দেওয়া যায়। ইহাতে তাহারা বেশ আমোদ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বানান শিক্ষা ভাল হয়।

(২) পুস্তকের পাঠের অন্তর্গত কঠিন কঠিন শব্দের বানান মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ ও সঙ্গে সঙ্গে বার বার আবৃত্তি করিলেও ভাল বানান শিক্ষা হয়।

(৩) পঠনের পাঠের প্রারম্ভে **কঠিন কঠিন শব্দগুলি বোর্ডে লিখিয়া** দিয়া তাহাদের উচ্চারণ ও বানানের প্রতি ছাত্রছাত্রীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় এবং শব্দগুলি লিখিয়া রাখিতে বলা যায়।

(৪) ইহার পর ছাত্রগণকে যত বেশী **পুস্তক দেখিয়া লিখিতে** (transcriptions) **দেওয়া** হয়, তাহাদের তত বেশী শুদ্ধ বানান শিক্ষা হয়।

(৫) **শ্রুতলিপি**। ইহার সাহায্যে ছাত্রগণের বানান শিক্ষাও হয় এবং বানানের জ্ঞান পরীক্ষাও হয়। সুতরাং ছাত্রগণ লেখার কাজে কিছু অভ্যস্ত হইলেই তাহাদিগকে শ্রুতলিপি শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(৬) কোন শব্দের বানান ভুল লিখিলে তাহার **শুদ্ধ বানান দেখিয়া লিখিতে** ও সঙ্গে সঙ্গে মুখে আবৃত্তি করিতে দেওয়া যায়। ইহাতে তিনটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহার হয় বলিয়া দ্রুত বানান শিক্ষা হয়।

(৭) **অভিধানের ব্যবহার**। শিশু একটু বড় হইলে পর যখন কোন শব্দের বানান সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ হয়, তখনই অভিধান খুলিয়া তাহার বানান দেখিয়া লওয়া অভ্যাস করিলে বানান শিক্ষা ভাল হয়।

(৮) **ব্যাকরণের নিয়ম শিক্ষাদান**। ইংরেজীর ন্যায় বাঙ্গালা শব্দের গঠন কেবল ব্যবহারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাহাদের গঠন সম্বন্ধে ব্যাকরণে অনেক ধরাবাঁধা নিয়ম আছে। যথা,—ণত্ববিধান, ষত্ববিধান, সন্ধি, সমাস, কৃৎ, তদ্ধিত ইত্যাদি; সেই নিয়মগুলি ভাল ভাবে শিক্ষা করিলে বাঙ্গালা শব্দের বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু প্রথমে ব্যাকরণের সাহায্যে বানান শিক্ষা দেওয়া যায় না। শিশু বড় হইলে ভাষার উপর কিছু দখল হওয়ার পরেই ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া যায়।

শ্রুতলিপি শিক্ষাদান

শ্রুতলিপির সাহায্যে ভুল বর্ণ-বিন্যাস সংশোধন করা যায়, শুদ্ধ বানান শিক্ষা দেওয়া যায় এবং বানান জ্ঞানের পরীক্ষাও করা যায়। তাহা ছাড়া ইহা দ্বারা শুনিয়া মর্মানুসরণের এবং দ্রুত সুস্পষ্ট লেখারও অভ্যাস হয়। ইহাতে খুব মনোযোগ সহকারে শুনিয়া লিখিতে হয় বলিয়া ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু শ্রুতলিপি শিক্ষাদানের পুর্বে শিশুকে দেখিয়া দেখিয়া লেখার কাজে অভ্যস্ত করিতে হইবে। এই অভ্যাস হওয়ার পুর্বে ছাত্রগণ শ্রুতলিপির কাজ

করিতে পারে না। তাহা ছাড়া শ্রুতলিপি দ্বারা বানান জ্ঞানের পরীক্ষা বা ভুল বর্ণ-বিন্যাস সংশোধন অপেক্ষা ভুলের সম্ভাবনা কমাইবার বেশী চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রুতলিপি দেওয়ার পূর্বে ছাত্রগণকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালনের নির্দেশ দিতে হইবে :—

(ক) শিক্ষক যখন কোন বাক্য বা বাক্যাংশ পড়িবেন, তখন ছাত্রছাত্রীগণ কেবল মনোযোগ সহকারে শুনিবে। তিনি **পড়া শেষ করিয়া থামিলেই ছাত্রছাত্রীগণ লিখিতে আরম্ভ করিবে।**

(খ) ছাত্রছাত্রীগণ কোন শব্দ শুনিতে না পাইলে বা বুঝিতে না পারিলে বা কোন বাক্য লেখা শেষ করিতে না পারিলেও কিছু **জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না**, তাহার জন্য **ফাঁক রাখিয়া যাইবে।** দ্বিতীয় বার যখন পঠন হইবে, তখনই তাহার ফাঁক পুরণ করিবে।

(গ) কেহ কাহারও লেখা দেখিতে পারিবে না বা কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।

(ঘ) লেখা বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেখা বন্ধ করিতে হইবে।

শ্রুতলিপির কার্যক্রম

(১) নির্দিষ্ট পদ্যাংশ বা গদ্যাংশে যদি এরূপ কঠিন শব্দ থাকে যেগুলির সহিত ছাত্রছাত্রীগণের পূর্বে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা কম, শিক্ষক প্রথমেই সেগুলি বোর্ডে লিখিয়া দিবেন এবং তাহাদের অর্থ বলিয়া দিবেন। ছাত্রছাত্রীগণ তাহাদের খাতায় সেগুলি লিখিয়া লইবে।

(২) ইহার পর শিক্ষক সমস্ত অংশ ধীরে ধীরে প্রয়োজন মত উচ্চ স্বরে, সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া পড়িবেন, এবং ছাত্রগণ মনোযোগ সহকারে শুনিবে। পাঠের পর প্রয়োজন বোধ করিলে শিক্ষক তাহার সারমর্ম বলিতে পারেন। (উচ্চ শ্রেণীতে ইহার প্রয়োজন নাই)।

(৩) এইক্ষণে শিক্ষক এক এক বাক্য বা বাক্যাংশ বিরাম-চিহ্নাদি অনুসরণ করিয়া ধীরে ধীরে পড়িবেন এবং প্রত্যেক বাক্য বা বাক্যাংশের শেষে কিছুক্ষণ থামিবেন, তখন ছাত্রগণ তাহা লিখিয়া ফেলিবে। (নিম্ন শ্রেণীতে বিরাম-চিহ্নগুলি বলাও প্রয়োজন)।

(৪) শিক্ষক পুনরায় সমস্ত অংশ পাঠ করিবেন। ছাত্রগণ কোন ফাঁক রাখিয়া থাকিলে তাহা পুরণ করিবে এবং যথাস্থানে বিরাম-চিহ্নগুলি দিবে। (৫ম মান হইতে বিরাম-চিহ্ন বলিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষকের স্বরভঙ্গি ও বিষয়ের মর্মানুসরণ করিয়া ছাত্রগণই বিরাম-চিহ্ন দিবে এবং ইহাতে তাহাদের ভাল শিক্ষা হইবে)।

(৫) ইহার পর ১।২ মিনিট অপেক্ষা করিয়া শিক্ষক লেখা বন্ধ করার আদেশ দিবেন এবং ছাত্রছাত্রীগণকে তখনই লেখা বন্ধ করিতে হইবে।

শ্রুতলিপি সংশোধন

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিজেই শ্রুতলিপি সংশোধন করিবেন। খাতা ফেরৎ দেওয়ার সময়ে শিশুগণ যে-সকল শব্দের বানান ভুল করিয়াছে সেই শব্দগুলি শুদ্ধ আকারে বোর্ডে লিখিয়া দিবেন, এবং ছাত্রেরা নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া লইবে।

মধ্যস্তর হইতে ছাত্রগণের দ্বারাই শ্রুতলিপি সংশোধন করাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ছাত্রের খাতা তাহার বামপার্শ্বস্থ ছাত্রকে দিতে বলিবেন। সর্বশেষের খাতা সর্বপ্রথম ছাত্রকে দিবে। যদি পাঠ্য-পুস্তক হইতে শ্রুতলিপি দেওয়া হইয়া থাকে, ছাত্রছাত্রীগণ পুস্তক দেখিয়াই শ্রুতলিপি সংশোধন করিবে। অন্য পুস্তক হইতে শ্রুতলিপি দেওয়া হইয়া থাকিলে শিক্ষক পদ্যাংশ বা গদ্যাংশটি বোর্ডে লিখিয়া দিবেন (পাঠের পূর্বে লিখিয়া বোর্ডে উল্টাইয়া রাখাই ভাল), তাহা দেখিয়াই ছাত্রগণ ভুল সংশোধন করিবে এবং ভুলের সংখ্যা লিখিয়া দিবে।

শিক্ষক নিজে সংশোধন না করিয়া ছাত্রের দ্বারা সংশোধন করাইবার উপকারিতা এই যে, অন্যের ভুল সংশোধন করিবার সময়ে ছাত্রছাত্রীগণ নিজেরাও শিক্ষা লাভ করে। ইহাতে সময়ের মিতব্যয়িতা হয়।

বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ শিক্ষার জন্যই শ্রুতলিপি দেওয়া হয়। তাই ছাত্রের শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এ-স্থলে শ্রুতলিপির কার্যক্রম দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষার জন্য শ্রুতলিপি দিতে হইলে ১ম শীর্ষ বাদ দিতে হইবে এবং ২য় শীর্ষও বাদ দেওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রচনা শিক্ষাদান

ভাষা বা সাহিত্য শিক্ষার দুইটি দিক আছে: (১) অন্যের কথা শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহার মর্ম গ্রহণ। ভাষা বা সাহিত্যের পাঠের ইহাই প্রধান লক্ষ্য। (২) **শুদ্ধ সঠিক ও সুন্দর ভাবে নিজের মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করা। ইহাকেই রচনা বলে।**

ভাষা বা সাহিত্য পাঠের দ্বারা পরোক্ষভাবে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশের শক্তি লাভ হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে চর্চার ব্যবস্থা না করিলে ইহার সম্যক্ বিকাশ হয় না।

রচনা **মৌখিক**ও হইতে পারে, **লিখিত**ও হইতে পারে।

কথোপকথন, গল্প বলা, চিত্রের বর্ণনা দান, বস্তু, স্থান, বা কাজের বর্ণনা দান, খবর বলা, কোন বিষয়ের আলোচনা বা বাদানুবাদ (debate), বক্তৃতা দান ইত্যাদির সাহায্যে **মৌখিক রচনা** শিক্ষা দেওয়া যায়।

লিখিত রচনা শিক্ষাদানের উপায়ঃ—

(১) **বাক্য রচনা**। নূতন নূতন শব্দ, সুন্দর সুন্দর বাক্যাংশ, বিভিন্ন পদবাচক শব্দ, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত একই শব্দ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া কতকগুলি বাক্য লিখিতে দেওয়া যায়।

(২) **পাদপূরণ**। উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া শূন্যস্থান পূরণ করিতে দেওয়া যায়।

(৩) কোন কবিতা বা গদ্যাংশ সম্বন্ধে পাঠগ্রহণের পর তাহার সারমর্ম লিখিতে দেওয়া যায়। পঠিত বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরও লিখিতে দেওয়া যায়।

(৪) **সম্প্রসারণ** (Elaboration)। একটা ছোট বাক্য বা একটা ভাবকে সম্প্রসারণ করিতে দেওয়া যায়; যথা,—

(ক) বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্রাবণ মাসের কালমেঘে ঢাকা আকাশ হইতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। চারি দিকে অন্ধকার; মনে হইতেছে যেন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ইত্যাদি।

(খ) সততাই কর্মকুশলতা। বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু সততাই সকল কার্যে সফলতা-লাভে সাহায্য করে।

কেননা সততার দ্বারা এক দিকে আত্মবিশ্বাস জন্মে এবং তাহার ফলে যথাশক্তি চেষ্টা করা যায়। অপর দিকে ইহাদ্বারা অন্যের বিশ্বাস ও সহযোগিতা লাভ করা যায় এবং তাহাতে যে কোন কাজে সফলতা লাভ করা সহজ হয়। সুতরাং বলা যায় যে, সততাই শ্রেষ্ঠ কর্মকুশলতা।

(৫) ব্যাকরণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের নিয়মগুলি প্রয়োগ করিয়াও রচনা করিতে দেওয়া যায়। যথা,—বিভিন্ন নিয়মের ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা, সরল বাক্যকে মিশ্রবাক্যে এবং মিশ্রবাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করা; বাচ্য পরিবর্তন; উক্তি-পরিবর্তন (Change of narration) ইত্যাদি।

(৬) **চিত্রের সাহায্যে রচনা।** একটা বা বেশী চিত্র দেখিয়া তাহাদের বর্ণনা লিখিতে বা তাহাদের সাহায্যে কোন গল্প রচনা করিতে দেওয়া যায়।

(৭) কোন বস্তু, স্থান, ঘটনা বা কাজ দেখিয়া তাহার **বর্ণনা** লিখিতে দেওয়া যায়। শিশুরা যে কাজ করে তাহার ধারাবাহিক বর্ণনা শিশুরা আনন্দের সঙ্গে দিয়া থাকে। ইহা তাহাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত বলিয়া তাহাদের লেখা একটা নিজস্ব গতি পাইয়া থাকে। শিশুদের দৈনন্দিন কাজের লিখিত বর্ণনা দান, তাহাদের রচনা শিক্ষার মূলকথা। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া শিশুদের রচনাকৌশল শিক্ষা দেওয়া চলে।

(৮) **ছোট ছোট গল্প রচনা।** শ্রমের পুরস্কার, অলসতার পরিণাম, অধ্যবসায়ের ফল, মিথ্যাবলার পরিণাম ইত্যাদি বিষয়ে ছোট ছোট গল্প লিখিতে দেওয়া যায়।

(৯) **পত্র লিখন।** ছাত্রগণকে নিজ নিজ পিতামাতা, ভাইভগ্নী, আত্মীয় বন্ধু বা অন্যের নিকট কোন বিষয় বা কাজ সম্বন্ধে পত্র লিখিতে দেওয়া যায়।

(১০) **প্রবন্ধ রচনা** (Essay writing)। **প্রবন্ধই মৌলিক রচনা।** কেননা ইহাতে ভাব এবং ভাষা উভয়ই লেখকের নিজস্ব। সুতরাং ইহার দ্বারা যেমন ভাব প্রকাশের শক্তি লাভ হয় তেমন চিন্তা-শক্তিরও বিকাশ হয়। অতএব ছাত্রগণকে যত বেশী সম্ভব প্রবন্ধ লিখিতে দেওয়া উচিত। প্রবন্ধ চারি প্রকারের হইতে পারে। যথা,—(১) **বর্ণনামূলক** (descriptive), (২) **বিবরণমূলক** (narrative), (৩) **চিন্তামূলক** (reflective) এবং (৪) **সমালোচনামূলক** (critical)।

প্রাথমিক ও মধ্য বাংলা স্তরে সাধারণতঃ প্রথম দুই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনা শিক্ষা- দেওয়া যায়। মধ্য বাংলা স্তরের শেষের দিকে চিন্তামূলক রচনাও আরম্ভ

করা যায় এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে ইহার বহুল চর্চার ব্যবস্থা করা যায়। সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরের শেষের দিকে আরম্ভ করা যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরেই ইহা ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়।

ভাল প্রবন্ধ রচনার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করা কর্তব্য :—

(১) বর্ণনামূলক বা বিবরণমূলক প্রবন্ধ রচনার জন্য ছাত্রকে বস্তু, প্রাণী,ঘটনা ইত্যাদি **ভালভাবে পর্যবেক্ষণ** করিতে ও কল্পনার সাহায্যে তাহাদের মানসিক ছবি গঠন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে তাহাদের **ছবি মনের পটে জাগরিত করিয়াই** প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। প্রবন্ধ লিখিবার পূর্বে **বর্ণনীয় বিষয়কে বিভিন্ন ভাগে বা শীর্ষে বিভক্ত করিয়া** এবং তাহাদিগকে যৌক্তিক আকারে সাজাইয়া এক এক শীর্ষের সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

(২) চিন্তামূলক প্রবন্ধ লিখিবার পূর্বে **বিষয়টি সম্বন্ধে ভাল ভাবে চিন্তা করিতে হইবে**। ইহার ফলে বিষয়টি সম্বন্ধে **যে যে ভাব মনে আসে সেগুলি শীর্ষের আকারে লিখিয়া ফেলিবে**। তাহার পর শীর্ষগুলি যৌক্তিক আকারে সাজাইয়া এক এক শীর্ষের সম্প্রসারণ করিলেই ভাল প্রবন্ধ রচনা হইবে। ভালরূপ চিন্তা না করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রসর হইলে কিছুতেই ভাল প্রবন্ধ লেখা যাইবে না।

(৩) সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখার পূর্বে বিষয়টির **দোষগুণ বা স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি** ভালরূপে চিন্তা করিয়া শীর্ষের আকারে লিখিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর শীর্ষগুলি ঠিকভাবে সাজাইয়া এবং এক এক শীর্ষের সম্প্রসারণ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে। **উপসংহারে বিষয়টি সম্বন্ধে লেখকের নিজ সিদ্ধান্ত লিখিতে হইবে**।

(৪) এক এক অনুচ্ছেদে এক এক শীর্ষের বর্ণনা লিখিতে হইবে।

(৫) নিজের স্বাভাবিক ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে, তবে ইহা লেখা শেষ করার পর, ভাষাগত ভুল সংশোধন ও তাহার সম্ভবমত উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

(৬) মনের ভাবগুলি অল্প কথায়, সম্পূর্ণভাবে ও সুন্দরভাবে প্রকাশের চেষ্টা করিতে হইবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়িয়া পাঠক বা পরীক্ষক কেহই সন্তুষ্ট হয় না।

(৭) তথ্য বা ভাবই প্রবন্ধের **প্রধান** অঙ্গ এবং ভাষা তাহা প্রকাশের বাহন মাত্র। সুতরাং প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে তথ্য বা ভাবের প্রতি বেশী

লক্ষ্য রাখিবে। তবে সুন্দর ভাষায় ভালভাবে প্রকাশ করিতে না পারিলে তথ্য বা ভাবের ফর্দ দিলেই ভাল প্রবন্ধ হইবে না।

(৮) পুস্তকে লিখিত রচনা মুখস্থ করার ন্যায় মূঢ়তা আর কিছুই হইতে পারে না। তথ্য বা ভাব সংগ্রহের জন্য এবং তাহা প্রকাশের নমুনা হিসাবে পড়া যায়। কিন্তু নিজে চিন্তা করিয়া, নিজের ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্যাকরণ শিক্ষাদান-পদ্ধতি

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা। এই বিষয়ে শিক্ষাবিদ্‌গণ একমত নহেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, ভালরূপে ভাষা বা সাহিত্য শিক্ষার জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান সম্পূর্ণ অপরিহার্য। অন্য কেহ কেহ ভাষা বা সাহিত্য শিক্ষার জন্য ব্যাকরণের জ্ঞানের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াও স্বীকার করেন না। সম্ভব হইলে তাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা হইতে ব্যাকরণ বাদ দিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

ইহা সত্য যে, শিশু অনুকরণ ও অভিজ্ঞতার সাহায্যেই ভাষা শিক্ষা করে, ভাষার আকার বা গঠন সম্বন্ধে কোন নিয়মের অনুসরণ করিয়া ভাষার জ্ঞান অর্জন করে না। সুতরাং **প্রথমে ব্যাকরণের কিছুমাত্র সাহায্য না লইয়াই ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত**। ইহা ছাড়া ব্যাকরণকে ভাষার বিজ্ঞান বলা যায়। সুতরাং ভাষার উপর যথেষ্ট দখল লাভের পূর্বে ভাষা-বিজ্ঞান বা ব্যাকরণের শিক্ষা দেওয়া যায় না। এই জন্যই **প্রাথমিক স্তরে স্বতন্ত্রভাবে ধারাবাহিক ব্যাকরণ শিক্ষা না দেওয়াই বিধেয়**। উচ্চতর স্তরগুলিতেও ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করিয়া ভাষা বা সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। তাহা করিবার চেষ্টা করিলে ছাত্রের ভাষার কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হয়, সে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখে না, তাহার ভাষা কখনও পার্বত্য নির্ঝরের ন্যায় স্বাভাবিক প্রবল উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হয় না। সাহিত্য পাঠ এবং রচনার সাহায্যেই সকল স্তরে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে হইবে।

কিন্তু ভাষার উপর কিছু দখল লাভের পর ভাষা-বিজ্ঞান বা ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া না হইলে ছাত্রের ভাষা-জ্ঞান সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেননা ব্যাকরণ শিক্ষা না করিলে কোন্ কথাটা শুদ্ধ, কোন্ কথাটা অশুদ্ধ তাহা বলিতে পারে না। সুতরাং **ভাষা শিক্ষার জন্য নহে, ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এবং ভাষার অভিজ্ঞতালব্ধ** (empirical) **জ্ঞানকে যৌক্তিক** (rational) **জ্ঞানে পরিণত করার জন্যই ব্যাকরণ শিক্ষা-দানের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।** বিশেষতঃ বাংলা একটা বৈজ্ঞানিক ভাষা, ইহার আকার ও গঠন সুচিন্তিত নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষা না করিলে ছাত্রছাত্রীর বাংলা ভাষার জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না এবং সে বিশুদ্ধ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখিবে না। অতএব **মধ্য বাংলা স্তর হইতে ধারাবাহিক ব্যাকরণ শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন** এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে ছাত্রের ব্যাকরণ-জ্ঞান অনেকটা সম্পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইতে হইবে।

শিক্ষাদান-পদ্ধতি

(১) প্রথমে ছাত্রের পাঠ্য-পুস্তককে ভিত্তি করিয়াই ব্যাকরণও শিক্ষা দিতে হইবে। এক একটা বাক্যকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অন্তর্গত বিভিন্ন পদগুলির নাম বা সংজ্ঞা শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু পঠনের পাঠে ইহার স্থান হইবে না ; ইহার জন্য স্বতন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা করা উচিত।

(২) ছাত্রদের সহযোগিতায় **আরোহী প্রণালীতে** (Inductive Method) **কতকগুলি উদাহরণের বিচার করিয়া সমস্ত পদের সংজ্ঞা গঠন করিতে হইবে।** যথা,—

উদাহরণ :—মতি একটা লোকের নাম। পুস্তক একটা বস্তুর নাম। গরু একটা জীবের নাম। দয়া একটা গুণের নাম। গমন একটা কাজের নাম।

সংজ্ঞা। যে সকল শব্দের দ্বারা কোন লোকের নাম, বস্তুর নাম, জীবের নাম, গুণের নাম বা কাজের নাম বুঝায়, তাহাদিগকে নাম-বাচক পদ বা বিশেষ্য বলে। এইরূপে সমস্ত পদের সংজ্ঞা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ছাত্রছাত্রীগণ সেগুলি খাতায় লিখিয়া লইবে।

(৩) প্রত্যেক **সংজ্ঞা গঠনের পর অবরোহী প্রণালীতে** (Deductive Method) **তাহা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।** যথা,—এক এক

পদের সংজ্ঞা গঠনের পর সাহিত্য পুস্তক হইতে যত বেশী সম্ভব সেই পদ-বাচক শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে দেওয়া যায়, উচ্চশ্রেণীতে ব্যাকরণ পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার সময়ও পুস্তকে লিখিত সংজ্ঞা মুখস্থ করিতে না দিয়া উপরিউক্ত প্রণালীতে সংজ্ঞা গঠন করিতে হইবে এবং পুস্তকে প্রদত্ত উদাহরণ মুখস্থ না করিয়া ছাত্রগণকে নিজে উদাহরণ দিতে হইবে। নির্ভুলভাবে তাহা করিতে পারিলেই তাহাদের ঠিক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বুঝা যাইবে।

ব্যাকরণের অন্যান্য প্রায় সমস্ত সংজ্ঞা বা নিয়মগুলিও আরোহী প্রণালীতে ছাত্রগণের সহযোগিতায় প্রস্তুত করিতে হইবে এবং অবরোহী প্রণালীতে তাহাদের বহুল প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যথা,—কারক, সন্ধি, সমাস, ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্যও তাহাদের এক এক শ্রেণীর নানা উদাহরণ পরীক্ষা করিয়া এক এক সংজ্ঞা বা নিয়ম গঠন করিতে হইবে এবং প্রত্যেক সংজ্ঞা বা নিয়মের অনেক উদাহরণ ছাত্রগণকে খুঁজিয়া লইতে বা নিজে দিতে হইবে।

বচন বা লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্যও বিভিন্ন শ্রেণীর উদাহরণ পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন নিয়মগুলি গঠন করিতে হইবে এবং এক এক নিয়মের যথেষ্ট উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া বা সরবরাহ করিয়া তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৪) **শব্দের উৎপত্তি বা গঠন শিক্ষাদান**। সংস্কৃত হইতে যে সকল বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের গঠন শিক্ষাদানের জন্য কৃৎ ও তদ্ধিত ভালরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। বৈদেশিক শব্দগুলি কোন্ ভাষার কি কি শব্দ হইতে হইয়াছে তাহা শিক্ষা করিলেই হইবে। এই জাতীয় কাজ বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে হইবে।

(৫) বর্ণাশুদ্ধি নিবারণের জন্য **ণত্ববিধান ও ষত্ববিধানের নিয়মগুলি** উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে।

(৬) কোন ভাষার সমস্ত আকার ধরা-বাঁধা নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, ব্যবহারের দ্বারাও অনেক নূতন নূতন আকারের সৃষ্টি হয়। যতগুলি সম্ভব উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া এবং তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এইগুলি শিক্ষা দিতে হইবে।

(৭) **রচনার সাহায্যে শিক্ষাদান**। পূর্বোক্ত প্রণালীতে ব্যাকরণের নিয়মগুলি শিক্ষাদানের পর ছাত্রছাত্রীগণকে **তাহাদের ব্যবহার করিয়া যত বেশী সম্ভব রচনা করিতে দেওয়া হইলেই তাহাদের জ্ঞান সঠিক ও স্থায়ী হইবে**। নিম্নশ্রেণীতে শিশুরা প্রত্যেক নিয়মের ব্যবহার করিয়া কয়েকটি

বাক্য রচনা করিতে পারে ; উপরের শ্রেণীতে গল্প রচনা, প্রবন্ধ রচনার ভিতর দিয়াও ব্যাকরণের নিয়মগুলির প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায়।

(৮) **ছাত্রছাত্রীর ভুল সংশোধন**। ছাত্রছাত্রীর রচনায় ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় প্রত্যেক ভুল সংশোধনের সময় **ভুল হওয়ার কারণ বলিতে হইবে এবং শুদ্ধ আকার শিক্ষা দিতে হইবে**। তবে অনবধানতাবশতঃ ভুল করিলে তাহা চিহ্নিত করিয়া ছাত্রকেই সংশোধন করিতে দেওয়া হয়।

(৯) **ছাত্রের দ্বারা ভুল সংশোধন**। শুদ্ধ উদাহরণের সাহায্যে যেমন ছাত্রকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া যায়, সেরূপ **ভুল লেখা সংশোধন করিতে দিয়া তাহার জ্ঞান পরীক্ষা করা যায়**। তবে শুদ্ধ আকার ছাত্র-ছাত্রীকে ভাল ভাবে শিক্ষা দেওয়ার এবং ব্যবহারের দ্বারা তাহার মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করার পূর্বে তাহাকে ভুল সংশোধন করিতে দেওয়া উচিত নহে।

সাহিত্যের সহিত অন্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন

(১) **ইতিহাস**। সাহিত্যে ইতিহাসের অনেক ঘটনার উল্লেখ থাকে। সুতরাং সাহিত্য শিক্ষাদানের সময় সেই সকল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণও শিক্ষা দিতে হয়। ঐতিহাসিক বিষয়েও অনেক কবিতা, প্রবন্ধ, কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি লিখিত হয় ; সেই সকল পাঠ করিলে **সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসেরও কিছু জ্ঞান হয়**।

(২) **ভূগোল**। সাহিত্যে অনেক স্থানের উল্লেখ ও বর্ণনা থাকে। তাহা শিক্ষা দেওয়ার সময় মানচিত্রে সেই সকল স্থান দেখাইতে হয় ও তাহাদের কিছু জ্ঞান দিতে হয়। সুতরাং তাহা পাঠে **ভূগোলেরও কিছু জ্ঞান হয়**। বিশেষতঃ ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিলে সাহিত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভূগোলেরও যথেষ্ট জ্ঞান হয়।

(৩) **অঙ্কন-বিদ্যা**। নিম্নস্তরে সাহিত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেক ছবি দেখাইতে হয়। ছাত্রছাত্রীগণকেও সেই সকল ছবি আঁকিতে উৎসাহ দেওয়া যায়। তাহা ছাড়া উচ্চস্তরে সাহিত্যের বর্ণনা পড়িয়া ছাত্রগণকে তাহার ছবি আঁকিতে দেওয়া হইলে সাহিত্যের সৌন্দর্য উপভোগের সাহায্য হয়, অঙ্কন-বিদ্যাও শিক্ষা হয়। বস্তুতঃ **সাহিত্য এবং অঙ্কন-বিদ্যা উভয়ই ভাব প্রকাশে ও ভাববৃত্তি বিকাশে সাহায্য করে**। সুতরাং

পরস্পরের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইলে সাহিত্য শিক্ষা যথেষ্ট আনন্দপূর্ণ হইবে।

(৪) **প্রকৃতি-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান** ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়, সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিতে এবং সেই সকল বিষয়ে রচনা লিখিতে দিলে সাহিত্যও শিক্ষা হয়, অন্যান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ হয়।

ছন্দ *

বাংলা সাহিত্য পড়াইতে হইলে শিক্ষকের ছন্দ সংবন্ধে কিছু জানা থাকা প্রয়োজন। ছন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে বাংলা কবিতা পড়া যায় না; ছাত্রছাত্রীরা ছন্দ কাহাকে বলে তাহা পড়িবে না সত্য, কিন্তু তাহারা ছন্দ অনুসারে কবিতা পড়িবে ও আবৃত্তি করিবে। এই কারণেই শিক্ষকের ছন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অপরের লেখার মধ্যে যে ছন্দ আছে, সেই ছন্দ বুঝিতে না পারিলে তাঁহার লেখা ভাল ভাবে পড়া হইবে না, এবং তিনি যে বিষয়বস্তু বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহাও বোধগম্য হইবে না।

শিশু যখন ছোটবেলায় ছড়া আবৃত্তি করে, তখন সে দুলিয়া দুলিয়া ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে। ছড়ার ছন্দবৈচিত্র্যই তখন শিশুকে আনন্দ দেয়। অর্থ সেখানে প্রধান হইয়া দেখা দেয় না। ছন্দের ঝঙ্কারে শিশুর দেহ ও মন উদ্বেল হইয়া উঠে। অতএব দেখা যায় যে, ছন্দের এক স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি আছে। ছন্দের এই স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তির কথা মনে রাখিয়া বিদ্যালয়ে কবিতা পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই কারণে শিক্ষককে ছন্দ সম্বন্ধে জানিতে হইবে। নিজে না জানিলে অপরকে শিক্ষক ছন্দের ধারা অবলম্বন করিয়া শিখাইবেন কি করিয়া?

বাগযন্ত্রের এক এক প্রয়াসে উচ্চারিত শব্দাংশের নাম ধ্বনি। যেমন রবীন্দ্র শব্দের ধ্বনি তিনটি, র-বিন্-দ্র।

ধ্বনি দুই প্রকার—**অযুগ্ম ও যুগ্ম**। ক, বি, তা, প্রভৃতি অযুগ্ম স্বরান্ত ধ্বনির নাম **অযুগ্মধ্বনি**। নাই, দৈ, বৌ, দিন ইত্যাদি যুগ্মস্বরান্ত বা ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিকে বলে **যুগ্মধ্বনি**।

* ছন্দ অংশের প্রথম কয়েকটি লাইন বাদে বাকী অংশ ৺জগদীশচন্দ্র ঘোষের আধুনিক বাংলা ব্যাকরণের 'ছন্দ' অধ্যায় হইতে শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষের অনুমতি ক্রমে লওয়া হইয়াছে।

একটি হ্রস্বস্বর বা হ্রস্বস্বরান্ত ধ্বনি উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে কলা বা মাত্রা বলে।

বাংলায় সমস্ত অযুগ্মস্বর তথা অযুগ্মধ্বনি সাধারণতঃ একমাত্রক বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্তু পৃথকভাবে, অর্থাৎ অন্য শব্দ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হইলে অযুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রক হয়। যথা—

চলি চলি | পা-পা ‖ টলি টলি যায়,
গরবিনী | হেসে হেসে ‖ আড়ে আড়ে | চায়। —রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণে মাঝে মাঝে ধ্বনিবিশেষে যে ঝোঁক পড়ে, তাহাকে **প্রস্বর** (Accent) বলে।

বাংলায় সাধারণতঃ প্রত্যেক শব্দের বা শব্দগুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির উপরেই **প্রস্বর** পড়ে।

´সামনেকে তুই | ´ভয় করেছিস ‖ ´পেছন তোরে | ´ঘিরবে, —রবীন্দ্রনাথ

একঝোঁকে কতকগুলি ধ্বনি উচ্চারণ করিলে যেখানে সেই ঝোঁকের শেষ হয়, সেই বিরামস্থলকে **ছেদ** বা **যতি** (Pause) বলা হয়।

বাংলা ছন্দে চারি প্রকার যতি দেখা যায়—**পূর্ণযতি, অর্ধযতি, লঘুযতি** এবং **উপযতি**।

´চঞ্ : চল | ´মৌ : মাছি ‖ ´গুঞ : জরি'—´গায়
´বেণু : বনে | ´মর্ : মরে ‖ ´দক্ : ষিণ | ´বায়। —রবীন্দ্রনাথ
উপযতি : লঘুযতি | পূর্ণযতি ‖ অর্ধযতি।

পূর্ণযতি দ্বারা নিরূপিত ছন্দ বিভাগের নাম **পঙ্‌ক্তি** (Verse)। অর্ধযতি দ্বারা খণ্ডিত পঙ্‌ক্তিবিভাগের নাম পদ। লঘুযতি দ্বারা ধ্বনিগুচ্ছের নাম **পর্ব** (Foot)। উপযতি দ্বারা নিরূপিত পর্বাংশের নাম **উপপর্ব**।

বাংলা ছন্দের প্রকারভেদ

বাংলা ছন্দ তিন প্রকারের—**যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত**। পর্বের প্রকৃতিগত গঠন-প্রণালীর বিভিন্নতার উপরেই ছন্দের প্রকারভেদ নির্ভর করে।

যৌগিক ছন্দ

যে প্রকার পর্বে শব্দের আদি ও মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি সাধারণতঃ সংকুচিত ও একমাত্রক এবং শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সম্প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক হয়, তাহার নাম **যৌগিক** (Composite) পর্ব। যৌগিক পর্ব লইয়া গঠিত ছন্দের নাম **যৌগিক ছন্দ**।

যৌগিক ছন্দ আয়তন-ভেদে দুই রকম। এই দ্বিবিধ পর্ব ও তাহাদের উপপর্ব-বিভাগ কিরূপ তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) **চতুর্মাত্রক** (Tetramoric) পর্ব=দুই : দুই,
যুক্তপর্ব=তিন : তিন : দুই। যথা—

এ দুর্ : ভাগা | দেশ : হতে : হে মঙ্ : গল | ময়,
দূর : করে | দাও : তুমি ॥ সর্ব : তুচ্ছ | ভয়।
মস্তক : তুলিতে : দাও ॥ অনন্ত : আকাশে
উদার : আলোক মাঝে ॥ উন্মুক্ত : বাতাসে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(খ) ষন্মাত্রক (Hexamoric) পর্ব=তিন : তিন বা দুই : দুই : দুই। যথা—

চলিল : সন্ন্যাসী | ত্যজিয়া নগর ॥
ছিন্ন : চীর : খানি | লয়ে : শিরো : পর
সঁপিতে : বুদ্ধের | চরণ : নখর ॥
আলোকে।

—রবীন্দ্রনাথ

প্রত্যেক ছন্দেরই কতকগুলি বিশেষ বন্ধ অর্থাৎ পদসমাবেশ-রীতি আছে, উহাকে ছন্দোবন্ধ (Metrical Structure) বলা হয়। যে ছন্দোবন্ধের প্রতি পঙ্ক্তিতে দুই পদ থাকে তাহাকে **দ্বিপদী** বলে। প্রতি পংক্তিতে তিন পদ বা চারি পদ থাকিলে তাহাকে যথাক্রমে **ত্রিপদী** এবং **চৌপদী** বলা হয়।

১। **লঘু দ্বিপদী**। মাত্রাবিন্যাস ৮॥৬
এই ছন্দোবন্ধই 'লঘু পয়ার' বা শুধু 'পয়ার' নামে সুপরিচিত।
পুণ্যে পাপে সুখে দুখে ॥ পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও ॥ তোমার সন্তানে।

২। **দীর্ঘ দ্বিপদী**। মাত্রা বিন্যাস ৮॥১০
ইহার অপর নাম 'দীর্ঘ পয়ার'।
হে মোর দুর্ভাগা দেশ ॥ যাদের করেছ অপমান,
অপমান হতে হবে ॥ তাহাদের সবার সমান ॥ —রবীন্দ্রনাথ।

৩। **লঘু ত্রিপদী**। মাত্রাবিন্যাস ৮॥৮॥৬

নদীতীরে বৃন্দাবনে॥ সনাতন একমনে
জপিছেন নাম,
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম॥

৪। **দীর্ঘ ত্রিপদী**। মাত্রাবিন্যাস ৮।৮।১০

সংসার সমরাঙ্গনে॥ যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব।
কর যুদ্ধ বীর্যবান্ যায় যাবে যাক প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।

—হেমচন্দ্র।

ইহাদের ছাড়া আরও অন্যান্য রূপও আছে।

অধুনা যৌগিক পয়ারকে ভিত্তি করিয়া নানা প্রকার বিচিত্র ছন্দোবন্ধ উদ্ভাবিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত **অমিত্রাক্ষর ছন্দ** (Blank verse) যৌগিক পয়ারেরই প্রকারভেদ মাত্র। লঘু পয়ারের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আট ও ছয় মাত্রার দুইটি পদ থাকে, এবং পদবিভাগ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, ইহার ব্যতিক্রম চলে না। কিন্তু আর এক রকম পয়ার আছে যাহার পদবিভাগ তথা যতি-স্থাপনরীতি এত সুনির্দিষ্ট নয় ; এমন কি তাহার পঙ্‌ক্তিপ্রান্তস্থিত পূর্ণযতিটিও অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয় না। কবির ভাবগত প্রয়োজন অনুসারে পঙক্তির প্রান্তে বা মধ্যবর্তী যে-কোন স্থানে পূর্ণযতি স্থাপিত হইতে পারে। ফলে কবির ভাবধারা অনায়াসেই এক পঙক্তি হইতে অপর পঙক্তিতে প্রবাহিত হইয়া চলে। এইরূপ প্রবহমান পয়ারে অনেক সময় মিলও থাকে না। এই জন্য উক্ত প্রকার ছন্দোবন্ধকে অমিত্রাক্ষর (অর্থাৎ অমিল) ছন্দ বলা হয়।

কিন্তু এই মিলহীনতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের আসল বিশেষত্ব নয়। সাধারণ পয়ারের মিল উঠাইয়া দিলেও উহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলা চলিবে না। এই ছন্দের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কয় মাত্রার পর যতি পড়িবে তাহা ইহাতে নির্দিষ্ট নাই, ভাবের প্রয়োজন অনুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে পড়ে। সাধারণ পয়ারে, এক একটি পঙ্‌ক্তি এক একটি অর্থবিভাগ, কিন্তু এই ছন্দে এক পঙক্তির সঙ্গে অন্য পঙক্তির অংশ লইয়া অথবা একটি পঙক্তিরই এক ভগ্নাংশে একটি অর্থবিভাগ সম্পূর্ণ হয়। এই মূলগত লক্ষণটির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহাকে

শুধু অমিত্রাক্ষর বলা সঙ্গত হয় না। এই জন্য ইহাকে **অমিল প্রবহমান পয়ার** নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত,—

কহিলা রাক্ষসপতি | "কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম | তায় আমি | জাগানু অকালে
ভয়ে ; ॥ হায়, দেহ তার দেখ | সিন্ধুতীরে
ভূপতিত ; | গিরিশৃঙ্গ | কিংবা তরু যথা
বজ্রাঘাতে | তবে যদি | একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব বৎস, | আগে পূজ ইষ্টদেবে, ॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ | সাঙ্গ কর বীরমণি ! ॥

—মধুসূদন।

রবীন্দ্র সাহিত্যে আর এক প্রকার প্রবহমান পয়ার দেখা যায়। তাহাতে পঙক্তির শেষে মিল ব্যবহার করা হয়। ইহাকে সমিল **প্রবহমান লঘু পয়ার** বলা হয়। যথা,—

দেবতার দীপ হস্তে | যে আসিল ভবে |
সেই রুদ্রদূতে, বলো, | কোন্ রাজা কবে |
পারি শাস্তি দিতে ? ॥ বন্ধন শৃঙ্খল তার |
চরণ বন্দনা করি' | করে নমস্কার ॥
কারাগার করে অভ্যর্থনা।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

যে প্রকার পর্বে যুগ্মধ্বনিকে গুরু বা দ্বিমাত্রক বা অযুগ্মধ্বনিকে লঘু বা একমাত্রক বলিয়া গণ্য করা হয়। তাহাকে বলে **মাত্রাবৃত্ত** (moric) পর্ব। এই প্রকার পর্ব লইয়া গঠিত ছন্দের নাম মাত্রাবৃত্ত।

মাত্রাবৃত্ত পর্ব আয়তনে চারি রকম।

চতুর্মাত্রক (Tetramoric) পর্ব=দুই : দুই। যথা,—

´স্পন্ : দিত | ´নদী : জল ॥ ´ঝিলি : মিলি | ´করে
´জ্যোৎস্নার | ´ঝিকিমিকি ॥ ´বালুকার। ´চরে। —রবীন্দ্রনাথ

এইখানে প্রতিপদে চারি মাত্রা। কেবল শেষ পর্বগুলিকে দুইমাত্রা এবং আধুনিক বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক রীতি অনুসারে প্রতি পর্বের প্রথমেই একটি করিয়া **প্রস্বর** রহিয়াছে।

পঞ্চমাত্রক (Pentamoric) পর্ব = তিন : দুই ; যথা

´নূতন : জাগা। ´কুঞ্জবনে ॥ ´কুহরি : উঠে। ´পিক
বসন্তের। চুম্বনেতে। বিবশ। দশ। দিক্।
বাতাস ঘরে | প্রবেশ করে | ব্যাকুল উচ্ | ছাসে,
নবীন ফুল | মঞ্জরীর ॥ গন্ধ লয়ে | আসে | —রবীন্দ্রনাথ

এইখানে প্রতি পর্বে পাঁচ মাত্রা। শেষ পর্বগুলি সম্পূর্ণ।

ষন্মাত্রক (Hexamoric) পর্ব = তিন : তিন বা দুই : দুই : দুই। যথা,—

´মুক্ত : বেণীর | ´গঙ্গা : যেথায় ॥ মুক্তি : বিতরে | রঙ্গে
আমরা : বাঙ্গালী | বাস : করি : সেই ॥ তীর্থে : বরদ | বঙ্গে |
—সত্যেন্দ্রনাথ

প্রতি পর্বে ছয় মাত্রা এবং শেষ পর্বগুলি অপূর্ণ।

যৌগিকের ন্যায় মাত্রাবৃত্তেরও দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দোবন্ধ রচিত হইয়া থাকে।

১। **পঞ্চমাত্রপর্বিক ত্রিপদী**। মাত্রাবিন্যাস ১০ ॥ ১০ ॥ ১২

পাষাণে বাঁধা | কঠোর পথ
চলেছে তাতে | কালের রথ— ॥
ঘুরিছে তার | মমতাহীন | চাকা |

২। **ষন্মাত্রপর্বিক চৌপদী** | মাত্রাবিন্যাস ১২ ॥ ১২ ॥ ১২ ॥ ৮

সাগর তোমার | পরশি চরণ ॥
পদধূলি সদা | করিছে হরণ ॥
জাহ্নবী তব | হরি সন্তরণ ॥
দুলিছে বক্ষ | পর।

স্বরবৃত্ত বা লৌকিক ছন্দ

সাধারণতঃ স্বরধ্বনির (syllable এর) সংখ্যার উপর যে পর্বের নির্ভর তাহাদের নাম **স্বরবৃত্ত** (syllable) **পর্ব**। এই প্রকার পর্ব লইয়া গঠিত ছন্দকে বলে **স্বরবৃত্ত ছন্দ**।

এই ছন্দেই আমাদের গ্রাম্য ছড়া রচিত হইয়াছে বলিয়া অনেক সময় ইহাকে ছড়ার ছন্দ বলা হয়। লোক-সাহিত্যের ছন্দের আদর্শে গঠিত বলিয়া ইহাকে **লৌকিক ছন্দ** (Folk metre) নামেও অভিহিত করা যায়। প্রস্বরের প্রবলতা এই ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য।

এই ছন্দে সাধারণতঃ প্রতি পর্বে চারিটি সিলেবল বা ধ্বনি থাকে। যেমন,—

´আবার যদি | ´ইচ্ছা কর ॥ ´আবার আসি | ´ফিরে
দুঃখসুখের | ঢেউ খেলানো ॥ এই সাগরের | তীরে —রবীন্দ্রনাথ

এইখানে প্রতি পঙক্তিতে চার পর্ব, চতুর্থ অপূর্ণ, প্রতি পূর্ণ পর্বে চার স্বর বা ধ্বনি। প্রতি পর্বের প্রথমে একটি করিয়া প্রস্বর রহিয়াছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত,

´বৃষ্টি পড়ে | ´টাপুর টুপুর ॥ ´নদেয় এল | ´বান
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হলো | তিন কন্যে দান | —গ্রাম্য ছড়া

এখানে প্রতি পঙক্তিতে চার পর্ব চার স্বর; শেষটি সম্পূর্ণ। কিন্তু দ্বিতীয় পঙক্তির তৃতীয় পর্বে তিন স্বর।

স্বরবৃত্ত রীতিতে ও দ্বিপদী প্রভৃতিতে সব **ছন্দোবন্ধই** দেখা যায়। উপরের দৃষ্টান্তগুলি অপূর্ণ **দ্বিপদী**।

অলংকার *

বাক্যের ধ্বনিকে শ্রুতিমধুর অথবা উহার অর্থকে হৃদয়গ্রাহী করিবার অভিপ্রায়ে অনেক সময় ত্রিবিধ প্রকার রচনাকৌশলের আশ্রয় লইতে হয়, এই সব রচনাকৌশলের নাম **অলংকার**। অলংকার দ্বিবিধ—**শব্দালংকার ও অর্থালংকার**।

শব্দালংকার

যে সকল অলংকার প্রত্যক্ষতঃ শব্দপ্রয়োগ-গত ধ্বনিসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে, তাহাদের নাম **শব্দালংকার**। শব্দালংকার প্রধানতঃ চারি প্রকার, যথা—**অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তি**।

১। **অনুপ্রাস**—একবিধ ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ বিন্যাসকে **অনুপ্রাস** (Alliteration) বলে। যথা,

চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ,
কোথা চম্পক-আভরণ। —রবীন্দ্রনাথ।

* অলংকার অংশটি শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষের অনুমতিক্রমে ৺জগদীশচন্দ্র ঘোষের আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ হইতে লওয়া হইয়াছে।

২। **যমক**—ভিন্নার্থক একাকার শব্দদ্বয়ের বিন্যাসকে **যমক** (Analogue) কহে। যমক তিন প্রকার—আদ্য, মধ্য, অন্ত্য। যথা—

(১) **ভারত ভারত** খ্যাত আপনার গুণে। (আদ্যযমক)

(২) পাইয়া চরণ **তরি তরি** ভরে আশা। (মধ্যযমক)

(৩) কাতরে কিংকরে ডাকে তার **ভব ভব**। (অন্ত্যযমক)

৩। **শ্লেষ**। একটি শব্দের দুই বা বহু অর্থে প্রয়োগের নাম **শ্লেষ** (Paronomasia, Pun)। যথা,—

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত? ব্যাপ্ত চরাচর।
যাঁহার প্রভাবে প্রভা পায় প্রভাকর। —ঈশ্বরচন্দ্র

ঈশ্বর গুপ্ত—(১) এই নামীয় খ্যাতনামা লেখক ও 'প্রভাকর'—সম্পাদক (২) সাধারণ অর্থে—ভগবান লুক্কায়িত বা অপ্রকাশ প্রভাকর।

(১) এই নামীয় সংবাদপত্র, (২) সূর্য।

৪। **বক্রোক্তি**। এক ব্যক্তির অভিপ্রেতার্থে যদি অন্য ব্যক্তি শ্লেষ বা অন্যবিধ উপায়ে অর্থান্তরে পরিণত করে, তবে বক্রোক্তি (Equivoque) অলংকার হয়।

প্রশ্ন। দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন?

উত্তর। রবির ভয়েতে তথা করে পলায়ন। —হরিশচন্দ্র

প্রশ্নকারীর দ্বিজরাজ=ব্রাহ্মণ; বারুণী—মদ্য।

উত্তরকারীর দ্বিজরাজ=চন্দ্র; বারুণী—পশ্চিম দিক এই অর্থে জবাব দিলেন।

অর্থালংকার

যে সকল অলংকার বিভিন্ন বস্তুর বা ভাবের পারস্পরিক তুলনা প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে শ্রোতার বুদ্ধি ও কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া বাক্যের অর্থকে সুস্পষ্ট ও মনোরম করিয়া তুলিতে সহায়তা করে, তাহাদের নাম **অর্থালকার**।

তুলনামূলক অর্থালংকার

বিভিন্ন বস্তু বা ভাবের কোনো অংশে সাদৃশ্য বা বৈষম্য প্রদর্শনকে তুলনা বলে। দুই বস্তু বা ভাবের মধ্যে যাহার সহিত তুলনা করা হয়, তাহার নাম **উপমান,** আর যাহাকে তুলনা করা যায় তাহাকে বলে **উপমেয়**। যথা,— চন্দ্রের ন্যায় মুখ, এইখানে 'চন্দ্র' উপমান এবং 'মুখ' উপমেয়।

১। **উপমা** (Simile)। সমগুণবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বারা সাদৃশ্য প্রদর্শনকে **উপমা** বলে। যথা,—

সিন্দুর বিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে আহা তারারত্ন যথা। —মধুসূদন।

২। **প্রতীপ**। প্রকৃত উপমাকে উপমেয়রূপে বর্ণনা করিলে **প্রতীপ** (Reversed Simile) অলংকার হয়। যথা,—

সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব, অধরের তুল। —কাশীরাম দাস

৩। **রূপক**। উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনাকে রূপক (Metaphor) অলংকার কহে। ইহাতে 'রূপ' শব্দ কখনও ব্যক্ত, কখনও বা লুপ্ত থাকে। যথা,—

প্রতাপ তপনে কীর্তিপদ্মে প্রকাশিয়া
রাখিবেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।

৪। **উৎপ্রেক্ষা**। উপমেয়কে উপমানরূপে বিতর্ক করিলে **উৎপ্রেক্ষা** (Hypothetical Metaphor) অলংকার হয়। যথা,—

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের শ্রোতখানি বাঁকা,
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার। —রবীন্দ্রনাথ।

৫। **অপহ্নুতি**। উপমেয় গোপন করিয়া যেখানে উপমানের স্থাপন করা হয়, তথায় **অপহ্নুতি** (Denial) হয়। যথা,—

রক্ষকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ বেশে। —মধুসূদন।

৬। **অতিশয়োক্তি**। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকে উপমেয়রূপে নির্দেশ করার নাম **অতিশয়োক্তি** (Hyperbole)। যথা,—

হায় শূর্পনখা
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুইরে অভাগী
কাল-পঞ্চবটী বনে, কালকূটে ভরা
এ ভুজগে। —মধুসূদন।

৭। **ভ্রান্তিমান**। অত্যন্ত সাদৃশ্যহেতু প্রকৃত বিষয়ে অপর বস্তুর যে কবি-কল্পিত ভ্রম, তাহাকে **ভ্রান্তিমান** (Rhetorical Mistake) বলে।

৮। **সমাসোক্তি**। সমান কার্য, সমান লিঙ্গ ও সমান বিশ্লেষণ দ্বারা বর্ণনায় নির্জীব পদার্থে সজীব পদার্থের ব্যবহার আরোপ করিলে **সমাসোক্তি** (personification) হয়।

৯। **নিদর্শনা**। সাদৃশ্য হেতু কাহারও উপর অবান্তর বা অসম্ভব ভাব বা কার্য আরোপ করিলে **নিদর্শনা** (Transference of Attributes) হয়।

১০। **ব্যতিরেক**। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনা করিলে **ব্যতিরেক** (Excess of Object or Subject) অলংকার হয়।

১১। **তুল্যযোগিতা**। একই গুণ বা ক্রিয়ার সহিত অনেক পদার্থের সম্বন্ধ বর্ণিত হইলে **তুল্যযোগিতা** (Identity of Attributes) হয়।

১২। **দৃষ্টান্ত**। সমভাবাপন্ন দুইটি বিষয়ের সাদৃশ্য বর্ণনা করিলে **দৃষ্টান্ত** (Parallel) হয়।

পঠনের পাঠটীকা

শিক্ষক— **স্কুল**—

তারিখ— **শ্রেণী**—৩য় মান।

বিষয়—বাংলা পঠন। **পাঠ্য বিষয়**—"আদর্শ ছেলে" কবিতা।

উদ্দেশ্য—(ক) প্রত্যক্ষ—বিরাম, যতি ইত্যাদি অনুসরণ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া উত্তম পঠন ও মর্ম গ্রহণ শিক্ষাদান।

(খ) পরোক্ষ—চিন্তাশক্তির বিকাশ।

শিক্ষা-সরঞ্জাম—পাঠ্য পুস্তক, দুইটি ছেলের ছবি, সঙ্কল্প কবিতা, চক্ ইত্যাদি।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
১ম	(ক) পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা	প্রয়োজনমত শ্রেণী-বিন্যাস করিয়া প্রথমে নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে পূর্বপঠিত "একতা" কবিতার জ্ঞান পরীক্ষা করিব :— (১) একতা কাহাকে বলে ? (২) "একতা" কবিতায় একতার কি কি উদাহরণ পাইয়াছ বল ? (৩) নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল :— লাজ, বড়াই, জব্দ, বুকের বল। তাহার পর নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে নূতন কবিতাটি পড়িবার জন্য শিশুদের মন প্রস্তুত করিব :— (১) ভাল ছেলে বলিলে কিরূপ ছেলেকে বুঝায় ? (২) কেন তাহাদের ভাল ছেলে বলা হয় ?

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
	(খ) নূতন পাঠ ঘোষণা।	শ্রেণীর শিশুরা ভাল ছেলের কতগুলি গুণ বলিলে "আজ আদর্শ ছেলে নামক কবিতাটি পড়িবে এবং তাহা হইতে বুঝিবে যে ভাল ছেলে কে"—এই বলিয়া নূতন পাঠ ঘোষণা করিব।
২য়	(ক) শিক্ষকের সমগ্র কবিতা পঠন ও ছাত্রছাত্রীদের দাগ কাটা।	ছাত্র-ছাত্রীগণকে তাহাদের পুস্তকের পৃষ্ঠা খুলিতে বলিব, সকলে পুস্তক খুলিয়া রাখিলে আমি ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত থামিয়া থামিয়া কবিতাটি পড়িব এবং ছাত্র-ছাত্রীগণকে মনোযোগ দিয়া শুনিতে বলিব ও আমি বিরাম-চিহ্নহীন যে সকল স্থানে থামিব তথায় দাগ দিতে বলিব। (দাগসহ কবিতাটি ৩য় সোপানে দেওয়া গেল।) পড়ার শেষে ছাত্র-ছাত্রীগণ ঠিকভাবে দাগ কাটিয়াছে কিনা দেখিব।
	(খ) শিক্ষকের আদর্শ পঠন।	আমি বিরাম, যতি, গতি ইত্যাদির অনুসরণ করিয়া সুস্পষ্ট ও প্রয়োজনমত উচ্চৈঃস্বরে সমগ্র কবিতাটির আদর্শ পঠন দিব এবং ছাত্র-ছাত্রীগণকে তাহা মনোযোগ সহকারে শুনিতে এবং নিজ নিজ পুস্তক দেখিয়া অনুসরণ করিতে বলিব। মাঝে মাঝে দেখিব তাহারা মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করিতেছে কি না।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৩য়	শীর্ষ বিভাগ—ছাত্রের এক এক শীর্ষ পঠন, শব্দার্থ শিক্ষা ও মর্ম আদায়। (ক) শীর্ষ— আমাদের/দেশে হবে/সেই ছেলে/কবে, কথায়/না বড় হয়ে/কাজে/বড় হবে; মুখে হাসি/বুকে বল/তেজে ভরা মন, "মানুষ"/হইতে হবে, এই যার পণ। শব্দার্থ—কাজে বড়—ভাল কাজ করিয়া বড় বুকে বল=প্রাণে সাহস। তেজে ভরা=উৎসাহে পূর্ণ। পণ—প্রতিজ্ঞা।	কবিতাটি ৩ শীর্ষে বিভক্ত করিয়া ৩।৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এক এক শীর্ষ পাঠ করিতে বলিব। এক এক জনের এক এক শীর্ষ পাঠের পর ছাত্র-ছাত্রীগণের সহযোগিতায় তাহার ভ্রম সংশোধন করিব। ৩।৪ জনের এক এক শীর্ষ পাঠের পর কঠিন কঠিন শব্দার্থ জিজ্ঞাসা করিব। তাহারা বলিতে না পারিলে আমি বলিয়া দিব, বোর্ডে লিখিয়া দিব এবং তাহারা তাহাদের খাতায় লিখিয়া লইবে। তাহার পর নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে তাহার মর্ম আদায় করিব :— (১) ভাল ছেলে কিসে বড় হয়? (২) তাহার লক্ষণ কি কি? (৩) সে কি পণ করে?
	(খ) শীর্ষ— বিপদ/আসিলে কাছে/হও আগুয়ান। নাহি কি/শরীরে তব/রক্ত, মাংস প্রাণ। হাত পা সবারি আছে/মিছে কেন ভয়? চেতনা/রয়েছে যার/সে কি পড়ে রয়? শব্দার্থ—আগুয়ান=অগ্রসর। মিছে=বৃথা। চেতনা=জ্ঞান, জীবন।শক্তি।	(খ) পদ্ধতি পূর্ববৎ। মর্ম আদায়ের প্রশ্ন :— (১) ভাল ছেলে বিপদে কি করিবে? (২) কেন তাহার ভয় করা উচিত নহে? (৩) কেন সে পড়িয়া থাকে না?
	(গ) শীর্ষ— সে ছেলে কে চায় বল/কথায় কথায়, আসে যার/চোখে জল/মাথা ঘুরে যায়। সাদা প্রাণে/হাসি মুখে/কর এই পণ, "মানুষ/হইতে হবে, মানুষ যখন।" কথায় কথায়=সহজে। সাদা প্রাণে=সরল মনে। মানুষ যখন=যখন মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে।	(গ) শীর্ষ— পদ্ধতি পূর্ববৎ। মর্ম আদায়ের প্রশ্ন :— (১) কি রকম ছেলে লোকে চায় না? (২) ভাল ছেলের কি পণ করা উচিত?

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৩য়	সমগ্র কবিতাটি পাঠ ও পুনরালোচনা। "সঙ্কল্প" কবিতাটি পাঠ ও ইহার তুলনা।	এখন আমি দুইটি ছেলের ছবি দেখাইব। তাহার পর একটি ছেলেকে সমগ্র কবিতাটি পড়িতে বলিব। পড়া শেষ হইলে নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে সমগ্র কবিতার পুনরালোচনা করাইব:— (১) আদর্শ ছেলের লক্ষণ কি কি? (২) সে কি পণ করে? (৩) কি রকম ছেলেকে লোকে চায় না? (৪) ভাল ছেলের কি করা উচিত? ইহার পর সঙ্কল্প কবিতাটি পাঠ করিব ও পঠিত কবিতাটির সহিত সাদৃশ্য দেখাইব।
৪র্থ	গৃহকাজ নির্দেশ।	কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আসিতে ও কঠিন কঠিন পদের অর্থ শিখিয়া আসিতে বলিব।

বাংলা ভাষার পাঠটীকা

শিক্ষক............ 	**স্কুল**............

তারিখ......... 	**শ্রেণী**—৫ম মান।

বিষয়—বাংলা ভাষা। 	**সাধারণ পাঠ**—বিবেকানন্দের বাল্যকাল।

বিশেষ পাঠ—"বালক নরেন্দ্রের আরও দু-একটা ক্ষমতা.................................. ....কলেজের জীবন আরম্ভ হয়।"

গদ্যাংশ।

উদ্দেশ্য— (ক) **প্রত্যক্ষ**—ভাষাজ্ঞান ও ভাব প্রকাশে বৃদ্ধি।

(খ) **পরোক্ষ**—চিন্তা, কল্পনা ও ভাব বৃত্তির বিকাশ।

শিক্ষা-সরঞ্জাম— পাঠ্যপুস্তক, বালক নরেন্দ্রের ও বিবেকানন্দের ছবি, চিকাগো বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতাংশ, বাংলা অভিধান ইত্যাদি।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
১ম	(ক) পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা।	প্রয়োজনমত শ্রেণী-বিন্যাস ও গৃহ-কাজ আদায় করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিব :— (১) নরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে খেলাধুলায় কিরূপ ছিল? (২) বাল্যকালে তাহার মানসিক গুণের পরিচায়ক একটি গল্প বল। (৩) নিম্নলিখিত শব্দ ও বাক্যের অর্থ বল :— ঘুসাঘুসি, পারদর্শী, পুরুষোচিত, সহজসৌন্দর্য, "তাহার চেহারা... ....ছিল।"
	(খ) নূতন পাঠ ঘোষণা	আজ আমরা "বিবেকানন্দের বাল্যকাল" প্রবন্ধের শেষ দুই অনুচ্ছেদ পাঠ করিব।
২য়	শীর্ষ বিভাগ ও এক এক ছাত্রের এক এক শীর্ষ পাঠ এবং শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা শিক্ষাদান। (ক) বালক নরেনের......মধুর ছিল। কঠিন কঠিন শব্দ ও বাক্য :— পরবর্তী, বক্তৃতা শক্তি, স্ফুরণ, অসাধারণ, নৈপুণ্য, স্বভাব মধুর। পরবর্তী জীবনে......হইয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠ.........ছিল।	বিষয়টিকে ৪টি শীর্ষে বিভক্ত করিয়া এক এক ছাত্রকে এক এক শীর্ষ পড়িতে বলিব এবং ছাত্র-ছাত্রীগণের সহ-যোগিতায় প্রয়োজনমত ভুল সংশোধন করিব। তাহার পর বিভিন্ন ছাত্রকে পার্শ্ব-লিখিত শব্দ ও বাক্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করিব। বলিতে না পারিলে বলিয়া দিব ও তাহার খাতায় লিখিয়া লইবে। সর্ব-শেষে নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে মর্ম আদায় করিব : (১) নরেনের কি কি ক্ষমতা ছিল? (২) সঙ্গীতে তাহার কিরূপ নৈপুণ্য লাভ হইয়াছিল?

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
	(খ) আর বক্তৃতার কথা......... প্রশংসা করিয়াছিলেন। কঠিন কঠিন শব্দ ও বাক্য :— মাননীয়, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, সম্মত, মনোভাব, ব্যক্ত। তাঁহার সম্মুখে.........বলিবে। প্রায় আধ ঘণ্টা.........ব্যক্ত করিলেন।	পদ্ধতি পূর্ববৎ। মর্ম আদায়ের প্রশ্ন :— (১) বালক নরেনের বক্তৃতা-শক্তি কিরূপ ছিল? (২) সে তাহার বক্তৃতা-শক্তির কি প্রমাণ দিয়াছিল?
	(গ) "চৌদ্দ বৎসর............ক্ষমা চাহেন।" কঠিন কঠিন শব্দ ও বাক্য :— অন্যত্র, সঙ্গ লইলেন, রীতি, স্বতন্ত্র লজ্জিত, ক্ষমা। বিশ্বনাথের............ছিল। লজ্জিত............ক্ষমা চাহেন।	পদ্ধতি পূর্ববৎ। মর্ম আদায়ের প্রশ্ন :— (১) বালক নরেন্দ্রনাথ কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন? (২) তথায় বিশ্বনাথ তাঁহাকে কিরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন?
	(ঘ) "এবার রায়পুর.........জীবন আরম্ভ।" কঠিন কঠিন শব্দ ও বাক্য : প্রকৃতিদেবীর, বিচিত্র, উপভোগ; শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় আলাপ, উত্তীর্ণ; লাভ হইল.........উপভোগ; ছেলেদের মধ্যে......নাম রাখিলেন।	পদ্ধতি পূর্ববৎ। মর্ম আদায়ের প্রশ্ন :— (১) রায়পুরে গিয়া নরেনের কি কি লাভ ও শিক্ষা হইয়াছিল? (২) তিনি কিরূপে স্কুলে নাম রাখিয়াছিলেন?
৩য়	উদ্ধৃতাংশ পাঠ।	বিবেকানন্দের ছবি দেখাইয়া তাঁহার চিকাগো বক্তৃতা হইতে কিছু অংশ পড়িয়া শুনাইব।
৪র্থ	সমগ্র বিষয়ের নীরব পঠন ও মর্ম গ্রহণ।	ছাত্রগণকে সমগ্র বিষয়টি নীরবে পাঠ করিয়া সারমর্ম লেখার জন্য ১০ মিনিট সময় দিব। অথবা নীরব পঠনের পর নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে সারমর্ম আদায় করিব :— (১) বালক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-জ্ঞান ও বক্তৃতাশক্তি কিরূপ ছিল? (২) রায়পুরে গিয়া তাহার কি কি লাভ ও শিক্ষা হইয়াছিল?

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৫ম	গৃহকাজ নির্দেশ।	বাড়ী হইতে ছাত্র-ছাত্রীগণকে নিম্নলিখিত শব্দের ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা করিয়া এবং নিম্নলিখিত বাক্যের ব্যাখ্যা লিখিয়া আনিতে দিব :— স্ফুরণ, নৈপুণ্য, স্বভাবমধুর, মনোভাব, রীতি, প্রকৃতিদেবী, শাস্ত্রীয়, উত্তীর্ণ। "পরবর্তী জীবনে.........হইয়াছিল" "এই সময়ের মধ্যে.........উপভোগ।"

ব্যাকরণের পাঠটীকা

শিক্ষক............ **স্কুল**............

তারিখ............ **শ্রেণী**......৬ষ্ঠ মান

বিষয়—ব্যাকরণ সাধারণ পাঠ—বহুব্রীহি সমাস

বিশেষ পাঠ— ঐ

উদ্দেশ্য (ক) প্রত্যক্ষ—ব্যাকরণের নিয়ম ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার শিক্ষাদান।

(খ) পরোক্ষ—স্মৃতি, যুক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশ।

শিক্ষা-সরঞ্জাম ব্যাকরণ পুস্তক, Demonstration Chart, চক্‌ ইত্যাদি।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
১ম	(ক) পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা।	প্রয়োজনমত শ্রেণী-বিন্যাস ও গৃহকাজ আদায় করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিব এবং তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নূতন পাঠের বিষয় ঘোষণা করিব :— (১) দ্বন্দ্ব সমাস কাহাকে বলে ? (২) কয়েকটি উদাহরণ দাও। (৩) দ্বন্দ্ব সমাসে কোন্‌ পদের প্রাধান্য থাকে ?

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
১ম	(খ) নূতন পাঠ ঘোষণা।	ইহার পর বলিব "আজ আমরা এমন এক সমাস শিক্ষা করিব যাহা দ্বন্দ্ব সমাসের ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ যাহাতে কোন পদের প্রাধান্য থাকে না।"
২য়	উদাহরণ পরীক্ষা। দশ আনন যার = দশানন (রাবণ) পীত অম্বর যার = পীতাম্বর (কৃষ্ণ) শূল পাণিতে যার = শূলপাণি (শিব) আশু তুষ্ট যে = আশুতোষ (শিব)	পার্শ্ববর্তী উদাহরণগুলি বোর্ডে লিখিয়া দিব এবং ছাত্রছাত্রীগণ সেগুলি পাঠ করিলে জিজ্ঞাসা করিব দশানন, পীতাম্বর প্রভৃতি শব্দে কোন্ পদের প্রাধান্য আছে। তাহারা বলিতে বাধ্য হইবে যে, কোন পদের প্রাধান্য নাই। কেননা দশানন শব্দে দশকেও বুঝায় না, আননকেও বুঝায় না, রাবণকেই বুঝায়, ইত্যাদি।
৩য়	সূত্র-গঠন বা সংজ্ঞা প্রস্তুত করা। যে সমাসে যে দুই পদের সমাস হয় তাহাদের কোনটিকে না বুঝাইয়া অন্য তৃতীয় একটিকে প্রধানরূপে বুঝায়, তাহাকে 'বহুব্রীহি সমাস' বলে।	উপরি-উক্ত উদাহরণগুলি বিচারের ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণের সহযোগিতায় পার্শ্ব-লিখিত সংজ্ঞাটি প্রস্তুত করিব ও বোর্ডে লিখিয়া দিব। ছাত্রছাত্রীগণ নিজ নিজ খাতায় তাহা লিখিয়া লইবে।
৪র্থ	সূত্রের প্রয়োগ। (ক) (১) দীর্ঘ বাহু যার = (২) নীল কণ্ঠ যার = (৩) পাপে মতি যার = (৪) ধর্মে বুদ্ধি যার = (৫) কাল মুখ যার = (খ) (১) রোগতপ্ত, অভুক্ত, হতভাগ্য ভারতভূমির কথা স্মরণ কর। (২) অল্পবিত্ত হইলেও শিক্ষাব্রতী সকলের শ্রদ্ধাস্পদ। (৩) স্থিরবুদ্ধি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনও ভগ্নোৎসাহ হয় না। (৪) অনাদি অনন্ত পরমেশ্বরকে ভজনা কর।	Demonstration Chart খুলিয়া দিয়া তাহাতে পার্শ্ব-লিখিত শব্দগুলি ও বাক্যগুলি পড়িতে বলিব এবং নিম্নলিখিত কাজ করিতে বলিব :— (ক) শীর্ষের পদগুলির সাহায্যে সমাসবদ্ধ পদ গঠন কর। (খ) শীর্ষের বাক্যগুলি হইতে বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণগুলি বাছিয়া বাহির কর ও সমাসবাক্য দাও।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৫ম	গৃহকার্য	বাড়ী হইতে বহুব্রীহি সমাস-সম্পন্ন পদ ব্যবহার করিয়া দশটি বাক্য লিখিয়া আনিতে বলিব।

Reference

1. W. M. Ryburn—Suggestions for the teaching of Mother tongue in India.
2. E. A. Macknee—Instruction in Indian Secondary Schools—Chap. V (By Michael West).
3. Dalton—Principles and Meth ods of Teaching. Chap. V.
4. Percival R. Cole—The Method and Technique of Teaching. Chap. XVIII.
5. P. Wren—The Indian Teacher's Guide, Chap. XII—XV.
6. Khan Bahadur A. Rahman—শিক্ষা-বিজ্ঞান।
7. Kunja Bihari Har—বিশেষ পদ্ধতি—১ম অধ্যায়।
8. The Teaching of Reading by Sentence Method by Edith Luke.
9. Reading An Educational Approach—Evans Brothers.
10. Fundamental Reading—Frances Roe.
11. Teaching Children to Read—By Paul Klapper.
12. Studies in Reading—University of London Press.
13. Improvement of Reading—A. I. Gates.
14. Reading in Modern Education—Heath.
15. Teaching the Child to Read—Bond & Bond.

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস কি ?

ইতিহাস কি, সেই সম্বন্ধে নানা জনে নানা রকম অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। স্পেন্সার বলিয়াছেন, "ইতিহাস পড়িতে চান পড়ুন, কিন্তু পড়ুন আনন্দের জন্য, উহা হইতে যে শিক্ষামূলক তথ্য কিছু বাহির করিতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না।" কেহ বলিয়াছেন, ইতিহাস শিক্ষাদান অনর্থক। কেহ বলিয়াছেন, ইতিহাস শিক্ষা ক্ষতিকর। পক্ষান্তরে ক্রমওয়েল বলিয়াছেন, "ভগবান ইতিহাসের মধ্য দিয়া আবির্ভূত হন"। জোন্স বলিয়াছেন, "ইতিহাস হইতেছে জীবন সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার খনি।" মধ্যযুগের রাজনৈতিক ধুরন্ধর মেকিয়াভেলি বলিয়াছেন, 'ইতিহাস রাজপুত্রের পঠনীয় বিষয়' (History is the subject for the prince)।

ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মতবাদ হইতে একটি জিনিস ভাল ভাবে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইতেছে সকলেই ইতিহাস বলিতে কি বুঝায় তাহা একই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দেখেন নাই। ইতিহাস-শিক্ষাদানের পদ্ধতি আলোচনা করিবার পুর্বে আমরা চিন্তা করিয়া দেখিব, ইতিহাস বাস্তবিক পক্ষে কি। কেন বিভিন্ন লোকে ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করিতেছেন? ইহার উত্তর হইল এই যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাস লিখিত হইয়া আসিতেছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ইতিহাসকে দেখা হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসের বিভিন্ন রূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি।

ইতিহাস লেখাকে আমরা বস্তুতঃপক্ষে দুইটি স্তরে বিভক্ত করিতে পারি, একটি হইতেছে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বের লেখা ইতিহাস, অপরটি হইতেছে উনবিংশ শতাব্দীর পরের লেখা ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে ইতিহাস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে ইতিহাস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখার পর হইতেই উহা সত্যিকার ইতিহাস বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। অতীতের ইতিহাস যাহা রহিয়াছে তাহা সকলই প্রায় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাস তখন

গল্পের আকার লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল। ভাল গল্প হিসাবে পরিচিত হইবার জন্য প্রয়োজন ছিল, শ্রোতাদের আনন্দ বর্ধন করা। ইতিহাস যে সত্য ঘটনা বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লিখিত হইবে, এমন কোন কথা ছিল না। আনন্দবর্ধক ও শুনিতে সুখকর হইলেই উহা ইতিহাস বলিয়া চলিত। প্রাচীন যুগে লিখিবার রীতি জানা ছিল না, এবং ইতিহাস মুখে মুখে যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিত। ফলে প্রথম অবস্থায় ঐতিহাসিক গল্পের যে ভিত্তি ছিল তাহা পর পর মৌখিক ভাবে চলিয়া আসার ফলে স্বীকৃত হইয়াছিল। অতীত যুগের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল আংশিক ভাবে বিনোদনের ব্যবস্থা করা এবং আংশিক ভাবে দেশের যুবকদিগকে উদ্বুদ্ধ করা। তাহা ছাড়া অতীতের স্বর্ণ যুগ সম্বন্ধে তাহাদিগকে অবহিত করাও ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাস সম্পর্কীয় ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারণে খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। গল্পকে সুন্দর করিবার জন্য তাঁহারা পাপপুণ্য ইত্যাদির সমাবেশ করিতেন, অতিপ্রাকৃত মানুষ সৃষ্টি করিতেন। ঘটনা আর কল্পনা একত্র মিলিত করিয়া ইতিহাস-লেখকগণ পরিবেশন করিতেন। অলৌকিক ঘটনাও ইতিহাস-লেখকগণের লেখায় প্রকাশ পাইত। উদাহরণ স্বরূপ মারাঠা চারণ-কবিদের বলা যাইতে পারে; তাঁহারা লিখিয়াছেন যে যখনই দেশের কোন বিখ্যাত রাজা দেহত্যাগ করিতেন, তখনই রক্তবৃষ্টি হইত।

ইউরোপের মধ্যযুগে ইতিহাসকে এইরূপ বিকৃত অবস্থায় দেখা যায়। ইতিহাস এই যুগে ধর্মতত্ত্বকে পরিপোষণ করে। ইতিহাস হয় ব্যবহারিক ও নীতিপূর্ণ উপদেশাবলী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ইতিহাস সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গীতে দৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিক নথিপত্রের গুরুত্ব ধীরে ধীরে উপলব্ধি হয় এবং ইউরোপের প্রগতিশীল দেশসমূহ প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক নথিপত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে নূতন করিয়া সম্পাদন করিতে আরম্ভ করে। ইতিহাসকে বিজ্ঞানরূপ দান করে জার্মানী। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আমরা জার্মানীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কের (Leopold Von Ranke) লেখার মধ্যে দেখিতে পাই। র‍্যাঙ্ক অতীতের কাহিনী ছাত্রছাত্রীগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহার না করিয়া বা বর্তমানের প্রচারের জন্য ব্যবহার না করিয়া,

অতীতে সত্যসত্যই কি ঘটিয়াছিল, তাহা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহার পর অনেকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ইতিহাসকে বিচার করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু ইতিহাসের এই মান সর্বত্রই যে গৃহীত হইয়াছে তাহা নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই নূতন চিন্তাধারার মাঝেও থুসিডাইডিস, গিবন (Thucydides, Gibbon) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক-রূপে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের লেখার মধ্যে নীতি উপদেশাদি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। অনেক সমালোচক ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে ইতিহাসের নৈতিক বল নষ্ট হইয়া যাইবে। অনেক সমালোচক বলেন যে ইতিহাস বহু প্রাচীন কাল হইতে সাহিত্যের অংশ হিসাবে রহিয়াছে এবং উহা ঐ হিসাবেই চিরকাল থাকিবে। ফলে গল্পলেখক এবং নীতি-উপদেশ-পরিবেশক ঐতিহাসিকগণ স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এখনও বিরাজ করিতেছেন।

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জার্মানীর আরও এক জন ঐতিহাসিকের কাছে ঋণী। তিনি হইতেছেন নেভুর (Niebhuer)। তিনি, ঐতিহাসিক লিভি এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া 'রোম প্রজাতন্ত্র' সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার এই লেখা একটি প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। নেভুরের কৃতিত্ব চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিকগণ যাঁহারা জার্মানীতে আসিয়া নেভুরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন, তাঁহারা পুরাতন নথিপত্র ভাল করিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া সত্য ঘটনা-সম্বলিত ইতিহাস প্রণয়ন করিতে থাকেন। এই নূতন ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্টাবস (Stubbs), গার্ডিনার (Gardiner), মেটল্যাণ্ড (Maitland), টাউট (Tout) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। স্টাবস অত্যন্ত অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গীতে মধ্য যুগের সংবিধানের ইতিহাস (Constitutional History) লেখেন। সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ ব্যাপার হইতেছে এই যে তাঁহার লেখার মধ্যে কোন নিজস্ব ছাপ বুঝিতে পারা যায় নাই, অর্থাৎ তাঁহার বই পড়িয়া তিনি রাজনীতির কোন্ দিক দ্বারা নিজে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না, এমনই ছিল তাঁহার অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী। গার্ডিনার স্টুয়ার্টদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসর

ধরিয়া একটি রাজবংশের ইতিহাস লেখেন। ইংলণ্ডের ইতিহাস রচনায় তাঁহার সবচেয়ে বড় অবদান এই যে তিনি অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া এই ইতিহাস লেখেন। স্টুয়ার্ট-যুগ রাজা এবং পার্লামেন্টের সংঘাতের যুগ। গার্ডিনার উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সমান গুরুত্ব দিয়া সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি ইতিহাসের একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'যাহা মানুষ করিয়াছে, বলিয়াছে এবং উপরন্তু যাহা তাহারা ভাবিয়াছে, তাহাই ইতিহাস।'

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্বে ইতিহাস ছিল গল্প। ফলে ওয়ালপোল, নেপোলিয়ান প্রভৃতি যাঁহারা বলিয়াছেন যে ইতিহাস শুধু মিথ্যা কথাই বলে, তাঁহারাও যে একেবারে ভুল করিয়া কথাটি বলিয়াছেন, তাহা নয়। পূর্বের ইতিহাস রচনায় কতকগুলি ত্রুটি ছিল। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক ঘটনাকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইত। দ্বিতীয়তঃ পূর্বের ইতিহাসে রাজা, রাণী, যুদ্ধ ইত্যাদি প্রধান অবলম্বন ছিল। সাধারণ মানুষের জীবন উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তৃতীয়তঃ ইতিহাস রচনায় বিচার ও বিশ্লেষণের কোন স্থান ছিল না, মূল সূত্র দেখিয়া ইতিহাস রচনায় কোন আগ্রহ ছিল না।

ইতিহাস কলা না বিজ্ঞান

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, অনেক শিক্ষাবিদ্ ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু শিক্ষাবিদ্ ইহাকে বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। স্পেন্সার ইতিহাস বিষয়ে কি বলিয়াছেন তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। ইতিহাস পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নিস্ফল প্রচেষ্টা। তাঁহার মতে ইতিহাস কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি, যাহা হইতে কোন রূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় না। স্পেন্সারের অনুগামীরা বলেন যে, ইতিহাসের ঘটনাগুলি প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটে না, যদি, দাবী জানান হয় যে ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। অতএব ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ রীতিনীতি গঠন করাও মুস্কিল।

ইতিহাসের ঘটনাসমূহে আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করে এবং চিন্তা করে। অতএব মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা-নির্ভর কর্মাদি বৈজ্ঞানিক নীতি গঠনে কখনও সাহায্য করিতে পারে না। এই কথাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন

বিদ্যা যে অর্থে বিজ্ঞান, সেই অর্থে ইতিহাস বিজ্ঞানের অন্তর্গত হইতে পারে না। কিন্তু ইহার পরীক্ষাপদ্ধতি বিজ্ঞানের ন্যায় বলিয়াই ইহাকে বিজ্ঞানও বলা যায়। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল, ইতিহাসের তথ্য খুঁজিবার সময় উপযুক্ত ঘটনার খবর পাইবার জন্য খুব বেশী অন্বেষণ, এবং উপযুক্ত ঘটনার কথা জানিতে পারিলেও উহা তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ। সর্বশেষে যাহা পাওয়া গেল, সেই ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া উহা গ্রহণযোগ্য না বর্জনীয় তাহা বাহির করা। ইতিহাস যে ভাবে তথ্য আবিষ্কার করে তাহা হইতেছে উপরি-উক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া। উপরি-উক্ত যে পন্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রতীক। অতএব এই অর্থে যদি ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান হয় তাও ইহা বিজ্ঞান। ঐতিহাসিক যে তথ্য অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন, তাহা হয়ত সাধারণ নীতির অন্তর্গত নয় এবং যাহা তিনি বাহির করিলেন, তাহার হয়ত পুনরাবৃত্তি নাও হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার যে প্রচেষ্টা, তাঁহার সত্যানুসন্ধানের পদ্ধতি, সমস্তই বৈজ্ঞানিক পন্থার অন্তর্গত। অতএব শুধু সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না, এই অজুহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে অবহেলা করা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু বহু ঐতিহাসিক আছেন যাঁহারা ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলিয়া মনে করেন না, তাঁহারা ইতিহাসকে কথা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে বিজ্ঞানে কয়েকটি নীরস নীতি পাওয়া যায় মাত্র। এই নীরস নীতিগুলিকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করিবার দায়িত্ব কবি ও লেখকের কল্পনা ও আবেগ। যে ঐতিহাসিকের সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা বর্তমান, যিনি কল্পনাপ্রবণ ও সংবেদনশীল, তিনিই ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন, অন্যথায় ইতিহাসের কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞান ও কলা উভয়েই ইতিহাসকে তাহাদের অধীন করিতে চায়। এই দাবীর সমন্বয় সাধন কিরূপে হইবে ? ইতিহাসের দুইটি রূপকেই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই ইহাকে বিজ্ঞান ও কলা এই উভয় আখ্যাই দেওয়া যাইবে। ইতিহাসে আছে সত্যানুসন্ধান, অতএব যেহেতু ইতিহাস সত্যের উপর নির্ভর করিয়া বর্ণনা প্রদান করে, সেজন্য ইহা কলা। ইতিহাসের এই দুইটি দিকই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অতএব ইহা বিজ্ঞান ও কলার অন্তর্ভুক্ত। আমরা

অতীতের ঘটনার সত্যরূপ চাই এবং সাথে সাথে চাই সুন্দর বর্ণনা। মিথ্যার আশ্রয় ছাড়াও সত্য ঘটনাকে সুন্দর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য

ইতিহাস বহু দিন হইল রচিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে, ইহার স্থান অত্যন্ত পরে। বিদ্যালয়ে অনেক বিষয় শিক্ষা দিবার মত আছে, অতএব উহাদের উপর ইতিহাস চাপাইয়া দিবার সার্থকতা নাই, ইহাই ছিল পূর্বেকার শিক্ষাবিদদের মত। তারপরে ধীরে ধীরে ইতিহাস শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু উহার পাঠকে গ্রহণ করা হইল খেলা হিসাবে। খেলাতে যেমন আনন্দ লাভ আছে, সেইরূপ এই ইতিহাস-শিক্ষার মধ্যে শুধু আনন্দ লাভ থাকিবে, আর কিছু নয়। ফলে উহা প্রথমে ঐচ্ছিক বিষয়ে বিদ্যালয়ের পাঠ্য স্থচীতে প্রবেশ লাভ করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে দেখা যায় ইতিহাস বিষয়টি অন্যান্য বিষয়ের মত বিদ্যালয়ে সমান মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

ইতিহাস শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য বহু বলিয়া দেখা গিয়াছে। ১৯০৯-১০ সনে ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ করা হয়। তাহাতে ইতিহাস শিক্ষার বহু উদ্দেশ্য দেখা যায়। যে সব উদ্দেশ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইতেছে যে, ইতিহাস শিক্ষাদানের ফলে স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি ও বিচার শক্তির সুসমঞ্জস বৃদ্ধি হয়, দেশপ্রেম শিক্ষা হয়, সেবার মনোবৃত্তি জাগ্রত হয়, ভূগোল ও সাহিত্য শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আগ্রহ জন্মে এবং চলতি ঘটনার সঙ্গে খুব বেশী সহযোগিতা জন্মে। ইহা ছাড়া ইতিহাস শিক্ষার আরও উদ্দেশ্য আছে। ইতিহাস শিক্ষার ফলে ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা হয়, ঐতিহাসিক ঘটনা গ্রহণ ও বর্জন সম্বন্ধে তাহাদের নিপুণতা জন্মে, ঘটনার সমাবেশ করিবার দক্ষতা জন্মে, কার্যকারণ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি জন্মে, পুস্তক ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। তাহা ছাড়া ইতিহাস শিক্ষার ফলে নৈতিক শিক্ষা হয়, দেশপ্রেম বৃদ্ধি পায়, সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। ইতিহাস হইতেছে অতীতের রাজনীতি। এই রাজনীতি যদি শিক্ষা করে তাহা হইলে পরে ছাত্রছাত্রী রাজনীতিবিদ্ হইতে পারিবে।

আমরা এইখানে ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে সকল বর্ণনা করিয়াছি তাহা বিচার করিয়া দেখিব। বিচার বিশ্লেষণ কালে আমরা দুইটি প্রশ্ন মনে রাখিব।

প্রথমটি হইতেছে যে, সত্যিই কি এই উদ্দেশ্য লাভ করিবার মত! আর দ্বিতীয়টি হইতেছে, এই উদ্দেশ্যগুলি কি অন্যান্য বিষয় শিক্ষার মধ্য দিয়া লাভ করা যায় না?

আমরা ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি ও বিচারশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ইতিহাস শিক্ষা দেই। প্রশ্ন হইতেছে ইহা কি অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য? গণিত, ভূগোল, সাহিত্য ইত্যাদি অন্যান্য বিষয় কি স্মৃতিশক্তি, বিচারশক্তি ও কল্পনাশক্তির বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে না? বহু পূর্বে মানুষের মন কতকগুলি পরস্পর-নির্ভরশীল শক্তির গুচ্ছ বলিয়া মানুষ জানিত। ঐ সময়ে যে বস্তুর সাহায্যে ঐ শক্তিগুলির অনুশীলন হইত তাহা মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইত, কিন্তু পরবর্তী কালে যখন মনের উপাদান অন্যভাবে বিশ্লেষিত হইল, তখন হইতে আমরা ইতিহাস বা অন্য কোন বিষয়কে মানসিক ব্যায়াম দ্বারা মানসিক উন্নতির সাহায্য করে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না।

আমরা নৈতিক কারণে কি ইতিহাস শিক্ষা দিব? ইতিহাস বিখ্যাত নরনারীর কাহিনী বিবৃত করে। তাঁহারা মহৎ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কোন মহৎ কারণে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। ইতিহাস অবশ্য আরও একটি বিষয় দেখায়, তাহা হইতেছে পুণ্যের জয়, পাপের ক্ষয়। কিন্তু এই কথা কি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য? অতীতে ইতিহাসের পাতায় বহু জায়গায় দেখা যায় যে, যাঁহারা মহৎ তাঁহারা অনেক দুঃখ সহ্য করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে যাহারা দুষ্ট তাহারা জয়লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া যে সমস্ত লোক ইতিহাসের পাতায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাহারা সত্যসত্যই মহৎ নয়। আর যাঁহারা মহৎ তাঁহারা ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইতিহাসে অনেক জটিল চরিত্রের লোক দৃষ্ট হয়। তাঁহারা তাঁহাদের যুগে বাস করিয়াছেন এবং ঐ যুগের মান অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ জটিলতার মধ্যে না যাইয়া অনেক সময়ই ঐ রূপ ঐতিহাসিক চরিত্র সুন্দর করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন এবং ঐ ব্যক্তির যাহা অপগুণ তাহা অপ্রকাশ রাখিয়াছেন। ঐ রূপ চরিত্র বিশ্লেষণ, আর যাহাই হউক না কেন ইতিহাস নয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। এই সমস্তই হইতেছে ইতিহাসের মূল্য, ইতিহাসের উদ্দেশ্য নয়। কারণ ইতিহাসের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ইতিহাস বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই রচিত হইবে।

আমরা দেশ-প্রেম শিক্ষা দিবার জন্যই কি ইতিহাস শিক্ষা দিব? ইহাই আমাদের একটি বিশেষ প্রশ্ন। যদি ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় দেশ-প্রেম শিক্ষা, তাহা হইলে আমাদের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে নাকচ করিয়া দিতে হয়। আমরা ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করিবার জন্য বহু কষ্ট করিয়া ঐতিহাসিক দলিল-পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া, উহারা কত দূর সত্য তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি। কিন্তু আমরা যদি অতীতকে মহিমাময় করিয়া তুলিতে চাই, যদি আমরা অমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করিয়া নিজেদের অস্তিত্বকে তুলিয়া ধরিতে চাই, তবে আমাদের ইতিহাসের সত্যাসত্য নির্ণয়ের প্রয়োজন কি? কিন্তু অতীতকে উপযুক্তরূপে প্রতিভাত করিয়াও দেশকে ভালবাসা শেখান যায়। তাহাতে অন্যায় কিছু নাই। কিন্তু আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল সত্যান্বেষণ, দেশ-প্রেম নয়। দেশ-প্রেম আমরা পাই মূল্য হিসাবে, ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে নয়।

বর্তমান সরকার ইতিহাসকে প্রচার-নীতির মাধ্যম করিয়া নিজেদের সুবিধামত ইতিহাস রচনা করিবে কি? ইহাই কি ইতিহাসের উদ্দেশ্য? না। ইহা কখনও হইতে পারে না। প্রচার-নীতিকে সাহায্য করিতে হইলে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইবে। ইতিহাসকে যেখানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে চাই, সেখানে মিথ্যার আশ্রয় লইব কি করিয়া? অতএব ইতিহাস বর্তমানের প্রয়োজনে নূতন করিয়া গঠন করা যাইবে না।

রাজনীতি শিক্ষাদানই কি ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য? অতীত কালে রাজনীতি শিক্ষাদানই ছিল ইতিহাস শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিহাস বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বহু পূর্ব হইতেই রাজপুত্রেরা ইতিহাস পাঠ করিতেন রাজ্য-পরিচালনার প্রস্তুতি হিসাবে। আর যুদ্ধনেতারা ইতিহাস পড়িতেন, যুদ্ধ পরিচালনা শিক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু রাজনীতি ইতিহাসের একটি অংশ মাত্র। মানুষ যে সমাজ-জীবন যাপন করে, রাজনৈতিক জীবন তাহার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ইতিহাস মানব-জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ইতিহাসের মধ্যে আমরা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয়, চারুকলাসম্বন্ধীয় জীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে সামান্য কয়েকটি লোককে কোন একটি ইতিহাসের উপাদান অর্থাৎ রাজনীতি শিক্ষা কাম্য নয়, উদ্দেশ্য হইল সমগ্র মানব-সমাজকে পূর্ণ জীবন যাপন করিতে সাহায্য করা। আমরা

দেখিব ইতিহাস শিক্ষা বর্তমান সমাজ জীবনে সকল মানুষকে পূর্ণ জীবন যাপনে সাহায্য করে কি না ?

এই যদি অবস্থা হয় তাহা হইলে আমরা পূর্বে ইতিহাস শিক্ষার যে সব উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কোনটিই ইতিহাস শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া টিকে না। তাহা হইলে ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ?

বিজ্ঞানভিত্তিক ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস শিক্ষার যে উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য প্রণিধানযোগ্য। তাহাদের মতে ইতিহাস বর্তমানকে ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিবে, অর্থাৎ ইতিহাস আমাদের বর্তমানকে ভাল করিয়া বুঝিতে সাহায্য করিবে। দেশের বর্তমান অবস্থা আমাদের বর্তমান মানুষ, আমাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহ, ধর্ম, আচার এবং অন্যান্য সমস্যা ইত্যাদি সবই বুঝিতে ইতিহাস আমাদিগকে সাহায্য করিবে। আমরা নিজেদের সঙ্গে, বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিব না, যদি না বর্তমান পরিবেশ কি ভাবে এইরূপ ভাবে প্রতিভাত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা না যায়। অতীত হইতেই বর্তমানের উদ্ভব হইয়াছে, আজ আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহার উদ্ভব হইয়াছে কিছু পূর্বে ; সেই অবস্থার কারণও রহিয়াছে তাহার কিছু পূর্বে। এইরূপ ভাবে বর্তমানের সঙ্গে অতীতের একটি যোগসূত্র রক্ষিত হইয়াছে। বর্তমানকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে বর্তমানের মধ্যে নিহিত অতীতকে বুঝিতে হইবে, ইহাই ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে বলা যায় ইতিহাস পাঠ বর্তমান অবস্থারই বিশ্লেষণ, ইহা সম্পূর্ণভাবে অতীতের ঘটনা জানা মাত্র নয়। অতীতকে অতীত হিসাবে আমরা গ্রহণ করি না, আমরা গ্রহণ করি বর্তমানের সঙ্গে যোগসূত্র হিসাবে। যদি কোন ঘটনা আমাদের বর্তমানের সঙ্গে একই সাথে গ্রথিত না থাকে, তবে আমাদের কাছে সেই ঘটনার কোন মূল্য নাই। অসম্বন্ধিত ঘটনা বা ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক আখ্যা দেওয়া চলে না। তাহা হইলে ইতিহাস শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল বর্তমানকে ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা এবং উহার কার্যকারণের জন্য অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইতিহাস শিক্ষাদান-পদ্ধতি

ইতিহাস শিক্ষাদানের ক্রম

(১) **অগ্রগামী বা সময়ানুক্রম** (Chronological Order), **পশ্চাদগামী ক্রম**। আদিম যুগ হইতে ইতিহাস শিক্ষা আরম্ভ করিয়া এবং সময়ানুক্রমে অগ্রসর হইয়া, বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায়। **ইহাকেই অগ্রগামী বা সময়ানুক্রম বলে।** বর্তমান অতীতেরই ফল বলিয়া, সময়ানুক্রমে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া অনেকটা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই সাধারণতঃ এই ক্রমেই ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা **যৌক্তিক ক্রম** (Logical Order) **মনোবিজ্ঞান-সম্মত ক্রম** (Psychological Order) **নহে।** কারণ শিশু বর্তমানের সহিতই পরিচিত, সে অতীতকে জানে না। জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যেই অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা দেওয়া মনোবিজ্ঞান-সম্মত। সুতরাং মনোবিজ্ঞান-সম্মত ক্রমে ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইলে বর্তমান হইতে আরম্ভ করিয়া অতীতে যাইতে হইবে। তাই ইহাকে **পশ্চাদগামী ক্রম** বলা হয়।

এই দুই আপাতঃ বিরুদ্ধ সত্যের মধ্যে আপোষ স্থাপনের জন্য ধারাবাহিক ইতিহাস শিক্ষাদানের প্রারম্ভে কয়েকটি পাঠের সাহায্যে ছাত্রগণকে বর্তমান হইতে অতীতে লইয়া যাওয়ার পর সময়ানুক্রমে, ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায় ; যথা,—

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোন্ জাতি (ইংরাজ) রাজত্ব করেন? তাঁহারা কোন্ দেশ হইতে আসিয়া কখন ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন ও কত কাল রাজত্ব করিতেছেন? ইংরাজদের পূর্বে কোন্ জাতি (মুসলমান) ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন ; তাঁহারা কোন্ দেশ হইতে আসিয়া কখন ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেন এবং কতকাল রাজত্ব করেন? মুসলমানদের পূর্বে কাহারা (হিন্দুগণ) ভারতবর্ষে বাস করিতেন ও রাজত্ব করিতেন ; তাঁহারা কখন ভারতবর্ষে আগমন করেন ও কত কাল রাজত্ব করেন? হিন্দুদের আগমনের

পূর্বে কাহারা ভারতবর্ষে বাস করিত?—এইরূপে পশ্চাদ্গামী ক্রমে কয়েকটি পাঠ দিয়া শিশুগণকে বর্তমান হইতে অতীতে লইয়া যাওয়ার পর, আদিম অধিবাসিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সময়ানুক্রমে ভারতবর্ষের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায়।

(২) **বিষয়ানুক্রম** (Topical Order)। কোন একটা ঘটনা বা বিষয়ের ইতিহাস দীর্ঘকাল ব্যাপী হইলেও তাহা স্বতন্ত্রভাবে একসঙ্গে শিক্ষা না করিলে তাহার ভাল জ্ঞান হয় না, কিন্তু সমসাময়িক অন্য বিষয় বা ঘটনার সংশ্লিষ্ট বলিয়া, প্রথমেই এই সকল ঘটনা বা বিষয় স্বতন্ত্রভাবে এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায় না প্রথমে সমগ্র দেশ বা জাতির ইতিহাস সময়ানুক্রমে শিক্ষা দিয়া পরে এক একটা প্রধান প্রধান ঘটনা বা বিষয়ের ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে একসঙ্গে বিষয়ানুক্রমে শিক্ষা দেওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে প্রাথমিক ইতিহাস পড়াইতে, বিষয়কে (Topic) কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দিবার চেষ্টা বিশেষভাবে আদৃত হইতেছে, তাহার কারণ ইতিহাসের বিভিন্ন মনোগ্রাহী বিষয়ে শিশুমন সহজেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই সূত্রে ইতিহাসের প্রতিও শিশুর মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া এই বিষয় বা Topic বাছিতেও শিক্ষক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিবেন অর্থাৎ এমন সকল Topic স্থির করিবেন যেগুলি শিশুমন সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারে। Topic অথবা ইতিহাসের বিষয় বাছিতে আর একটি নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমানের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত আছে এমন সমস্ত বিষয় বাছিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

(৩) **যুগানুক্রম**। বিভিন্ন বংশের রাজত্ব, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের জীবন-কাল, ধর্ম, সভ্যতা ইত্যাদিকে ভিত্তি করিয়া প্রত্যেক দেশের ইতিহাসকে কতকগুলি যুগে বিভক্ত করা যায় এবং **এক এক যুগের বিস্তারিত জ্ঞান দেওয়া যায় ও বৈশিষ্ট্য শিক্ষা দেওয়া যায়**। এই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইলেই বিভিন্ন যুগের সম্বন্ধে শিশুদের জ্ঞান ভাল হয় এবং দেশের বা জাতির ইতিহাসের উপর তাহাদের প্রভাব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায়। যথা, ভারতের ইতিহাসে বৈদিক যুগ, কাব্যের যুগ, বৌদ্ধ যুগ, পৌরাণিক যুগ, তুর্কী যুগ, মুঘল যুগ ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিস্তারিত জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন।

(৪) **ঐককেন্দ্রিক ক্রম**। জাতির সমগ্র ইতিহাস পর পর দুই শ্রেণীতে দুই বৎসরে একবার শিক্ষা দেওয়া যায়। তাহার পরের দুই শ্রেণীতে

দুই বৎসরে পুনঃ তাহার অধিকতর বিস্তারিত এবং গভীরতর জ্ঞান দেওয়া যায়। ইহাকেই **ঐককেন্দ্রিক ক্রম বলে।** যথা, ৩য় ও ৪র্থ মানে একবার, ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানে ২য় বার, ৭ম ও ৮ম মানে ৩য় বার, এবং ৯ম ও ১০ মানে ৪র্থ বার ভারতের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহার সুবিধা এই যে, প্রত্যেক স্তরে ছাত্রের জ্ঞান তাহার শক্তি বা বিকাশানুযায়ী সম্পূর্ণ হয় এবং যতই তাহার বিকাশ হয় ও শিক্ষাজীবন দীর্ঘতর হয়, ততই তাহার জ্ঞান অধিকতর বিস্তৃত ও গভীরতর হয়। (একবার শিক্ষার সময় ২ বৎসরের বেশী দীর্ঘ হইলে শিশুর দ্রুত বিকাশ হওয়ার ফলে প্রথম ও শেষ বৎসর একই মাপকাঠিতে (standard) শিক্ষা দেওয়া যায় না।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইতিহাস শিক্ষাদানের সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার বিষয়

(১) শিক্ষণীয় বিষয়। ঐতিহাসিক **গ্রীন** (Green) **জাতির জীবন-কাহিনীকেই ইতিহাস বলিয়াছেন।** ইহা মনে রাখিয়া ইতিহাস শিক্ষাদানের সময় যে সকল লোক বা ঘটনা দ্বারা জাতীয় জীবন বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, কেবল তাহাদের জীবনী ও সেই সকল ঘটনার বিবরণই শিক্ষা দিতে হইবে, এবং জাতীয় জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই এমন সব অবান্তর বিষয় পরিহার করিতে হইবে। অবশ্য জাতীয় জীবন বলিলে কেবল রাজনৈতিক জীবন বুঝায় না, জাতির আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা-প্রণালী, সমাজ, শিল্প-বাণিজ্য, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতিও জাতীয় জীবনের অন্তর্গত; সুতরাং রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণও শিক্ষা দিতে হইবে।

(২) ঐতিহাসিক বিবরণের সত্যতা। জনশ্রুতি বা গল্প ইতিহাস নহে, জাতীয় জীবনের সত্য কাহিনীই ইতিহাস। **যে সকল বিষয় বা ঘটনার সত্যতা ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে প্রমাণিত হয় নাই, ইতিহাসে তাহাদের স্থান হইতে পারে না।** এমন কি শিশুশ্রেণীতেও

ইতিহাস হিসাবে কোন কাল্পনিক কাহিনী বা গল্প শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ **ইতিহাসে কোন অলৌকিক বিষয়ের স্থান হইতে পারে না।** কোন বিষয় বা ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে তাহার বর্ণনা দেওয়ার পুর্বে "কথিত হয়" "প্রবাদ আছে" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা প্রয়োজন, তাহা হইলেই ছাত্র-ছাত্রীগণ সত্য ও সন্দেহাত্মক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারিবে। **নিম্নশ্রেণীতে বিতর্কমূলক বিষয় যতটা সম্ভব বাদ দেওয়া উচিত।** উচ্চশ্রেণীতে বিতর্কমূলক বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিয়া ও প্রমাণ দেখাইয়া সত্য নিরূপণের চেষ্টা করিতেও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। ইহা ছাড়া মধ্যস্তর হইতে ছাত্রকে ঐতিহাসিক উপাদানের সহিত কিছু কিছু পরিচয় করিলে এবং উচ্চশ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীকে কোন কোন বিষয় উপাদানের সাহায্যে গবেষণা পদ্ধতিতে শিক্ষা করিতে দেওয়া হইলে সে ঐতিহাসিক কাহিনীর সত্যতা উপলব্ধি করিবে।

(৩) **নিম্নস্তরে ইতিহাস শিক্ষাদানের সময় খুব বেশী খুঁটিনাটি তথ্য, অনেক স্থানের বা লোকের নাম এবং অনেক তারিখ দেওয়া সঙ্গত নহে।** কেবল প্রধান প্রধান ঘটনার বর্ণনা, মূল ঘটনা-স্থলের, প্রধান প্রধান নায়কের এবং শতাব্দীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। উচ্চস্তরে ঐককেন্দ্রিক-ক্রমে ক্রমশঃ তাহাদের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে এবং সকল প্রধান প্রধান ঘটনার তারিখও দিতে হইবে। কিন্তু কোন স্তরেই জাতীয় জীবনের উপর প্রভাবশূন্য অপ্রয়োজনীয় ঘটনার বিবরণ, স্থানের বা লোকের নাম, ও তারিখ ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া ছাত্রের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করা উচিত নহে। তবে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া শিশু-মনে যাহাতে আন্তর্জাতিকতা-বোধ জাগ্রত হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি, দ্বেষ ইত্যাদির সৃষ্টি হইতেছে, ইহাঁ নিজের দেশকে ও যুগপৎ অপরের দেশকে না বুঝিতে পারার দরুণই হইতেছে। মানুষ যদি অপরের দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্ত সমস্যা দেখিতে পারিত, তাহা হইলে আর বড় বড় যুদ্ধ পৃথিবীতে সংঘটিত হয়ত না। আন্তর্জাতিকতা-বোধ বৃদ্ধি করিতে হইলে ইতিহাসের মধ্য দিয়াই উহা জাগ্রত করা যাইতে পারে। নিজের দেশের সমস্যার সঙ্গে অপরের দেশের সমস্যা যুক্ত হইলেই মানুষ অপরের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিতে পারিবে। ইতিহাস এবিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে পারে।

(৪) **সময়-জ্ঞান** (Time Sense)। **সময়ের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সময়ানুক্রমে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।** কোন ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার সময়ে তাহা কতকাল পূর্বে ও কখনও ঘটিয়াছে, এবং উহা সম্পূর্ণ হইতে কত সময় অতিবাহিত হইয়াছে ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে হইবে। কিন্তু অল্পবয়স্ক শিশুগণের পক্ষে বহু অতীতকালের বা দীর্ঘ সময়ের ধারণা করা কঠিন। উচ্চ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীগন তাহার ধারণা করিতে পারিলেও তাহা স্মরণ রাখিতে পারে না তাই সময়ের ধারণা দেওয়ার জন্য ও সময়ানুক্রমে ঐতিহাসিক বিবরণ স্মরণ রাখার সাহায্য করার জন্য **সময়-রেখার** (Line of Time) সাহায্য লইতে পারা যায়। রাজত্বের সময় এবং প্রধান প্রধান ঘটনার নামসহ বিভিন্ন **রাজার বা শাসনকর্তার তালিকা** (Historical Chart) ও **সময়ানুক্রমিক ঘটনার তালিকা** (Chronological Chart) ইত্যাদির সাহায্যে ইতিহাস শিক্ষা দেওয় কর্তব্য।

(ক) **সময়-রেখা। ইহা প্রস্তুত করার জন্য একটা রেখাকে সময়ের নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়।** তাহাকে কয়েকটি অংশে সমভাবে বিভক্ত করিলে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় নির্দেশ করে। এক্ষণে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি তাহাদের সময়ানুযায়ী উক্ত রেখার বিভিন্ন অংশে লিখিয়া দেওয়া হইলে সময়-রেখা প্রস্তুত হয়। যথা, ২৫ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি রেখাকে ভারত ইতিহাসের ৫০০০ বৎসর (৩০০০ খৃঃ পূঃ ২০০০ খৃঃ অঃ) সময়ের নিদর্শনরূপে ব্যবহার করা যায়। তাহাকে ২৫ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ইঞ্চি রেখা ২০০ বৎসর নির্দেশ করিবে। প্রত্যেক ভাগকে পুনঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগ এক এক শতাব্দী নির্দেশ করিবে। এক্ষণে যে ঘটনা যে শতাব্দীতে ঘটিয়াছে, তাহা সময়-রেখার সেই শতাব্দী নির্দেশক অংশের পার্শ্বে লিখিয়া দেওয়া যায়। এক এক বংশের বা এক এক রাজার রাজত্বের সময়-রেখা আঁকিয়া ও তাহাতে সমস্ত ঘটনার সময়-সূচক অবস্থান দেখাইতে পারা যায়। একই সময়ে অনেক ঘটনা ঘটিলে দুই বা ততোধিক সমান্তরাল সময়-রেখার সাহায্যে সমস্ত ঘটনার সময় নির্দেশ করা যায়।

(খ) **রাজত্বের সময় ও প্রধান প্রধান ঘটনা-সহ রাজ্য বা শাসন কর্তাগণের তালিকা** (Historical Charts)। ইহাতে বংশের নাম,

রাজার বা শাসনকর্তার নাম, রাজত্বের সময় প্রধান প্রধান ঘটনা ও মন্তব্য পাশা-পাশি লিখিয়া রাখা যায়।

(গ) **সময়ানুক্রমিক ঘটনার তালিকা** (Chronological Chart)। ইহাতে বাম পার্শ্বে সময়ের উল্লেখ করিয়া ডান পার্শ্বে সময়ানুক্রমে সমস্ত ঘটনার তালিকা লিখিয়া দেওয়া যায়। এইরূপে কোন দেশের সমগ্র ইতিহাসের সময়ানুক্রমিক ঘটনার তালিকা প্রস্তুত করা যায়।

(৫) **মানচিত্রের ব্যবহার ও ঐতিহাসিক মানচিত্র অঙ্কন**। সকল সময় মানচিত্রের সাহায্যেই ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে। কোন ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা দেওয়ার সময়ে মানচিত্রে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি দেখাইতে হইবে। ইহা না করিলে ছাত্রছাত্রীরা বর্ণনা ঠিক ভাবে অনুসরণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ মানচিত্রের ব্যবহার না করিয়া ভালভাবে ইতিহাস শিক্ষাই দেওয়া যায় না। তবে ইহার জন্য সাধারণ মানচিত্র হইতে **ঐতিহাসিক মানচিত্র** অধিকতর উপযোগী। কারণ সাধারণ মানচিত্রে অনেক ঐতিহাসিক স্থানের নাম পাওয়া যায় না, অথচ ইহাতে অনেক অপ্রয়োজনীয় স্থান ইত্যাদির নাম থাকে। ঐতিহাসিক মানচিত্রে কেবল প্রয়োজনীয় স্থানের নাম দেওয়া হয় এবং রাজ্যবিস্তার, সাম্রাজ্য সীমা, আক্রমণের পথ ইত্যাদি অনেক ঐতিহাসিক বিষয় দেখান থাকে। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে ছাত্রছাত্রীগণকে নিজ নিজ ঐতিহাসিক মানচিত্র অঙ্কন করিতেও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

(৬) **নক্সা অঙ্কন**। কোন প্রসিদ্ধ যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়ার সময় ব্ল্যাক বোর্ডে বা বড় কাগজে দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনীর অবস্থান নির্দেশ করিয়া নক্সা আঁকিয়া দেখাইলে ছাত্রছাত্রীগণ যুদ্ধের বিবরণ ঠিকভাবে অনুসরণ করিতে ও স্মরণ রাখিতে পারে। কোন আক্রমণকারীর বা বিজয়াভিযানের পথেরও নক্সা আঁকা যায়।

(৭) **চিত্র বা আদর্শ প্রদর্শন**। ইতিহাসে বর্ণিত নানা জিনিষের, লোকের বা ঘটনার চিত্র বা আদর্শ না দেখাইলে অল্পবয়স্ক শিশুগণের নিকট ঐতিহাসিক কাহিনী বাস্তব আকার ধারণ করে না এবং ইহা তাহাদের নিকট চিত্তাকর্ষক হয় না। যথা, আর্যদের পোষাক-পরিচ্ছেদ, অস্ত্রশস্ত্র, ব্যবহার দ্রব্য প্রভৃতির ছবি বা আদর্শ না দেখাইলে অল্পবয়স্ক শিশুগণ কেবল বর্ণনা শুনিয়া আর্যদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারিবে না।

(৮) **কবিতা বা বর্ণনা পাঠ**। শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন সুন্দর কবিতা বা বর্ণনা পড়িয়া শুনাইলে ইতিহাসের পাঠ চিত্তাকর্ষক হয় এবং শিক্ষণীয় বিষয় ছাত্রছাত্রীর মনে গভীর রেখাপাত করে।

(৯) **পাঠ্য পুস্তকের ব্যবহার**। বিদ্যালয়ের সকল স্তরেই ছাত্রগণের ব্যবহারের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা প্রয়োজন। কিন্তু ইহার উপযুক্ত ব্যবহার শিক্ষা না দিলে ইহার দ্বারা উপকার না হইয়া বরং অপকার হইতে পারে। কারণ সাধারণতঃ শিক্ষকগণ পাঠ্য পুস্তকের এক এক অংশ পড়িবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন এবং ছাত্রগণ তাহা মুখস্থ করিয়া আসিয়া শিক্ষকের নিকট বা পরীক্ষার সময়ে বমন করিয়া দেয়। ইহাতে তাহাদের স্মৃতি-শক্তির অপব্যবহার হয় মাত্র, প্রকৃত ইতিহাস শিক্ষা হয় না। **নিম্ন শ্রেণীতে শিশুগণ** শিক্ষকের বর্ণনা শুনিবার পর তাঁহার প্রদত্ত শীর্ষ বা সারাংশের সাহায্যেই পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিবে। পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় শ্রেণীতে ইতিহাসের পাঠ্যসূচী থাকিলেও এই শ্রেণীর ইতিহাসের পুস্তক নাই। এই অবস্থায় শিক্ষক গল্পচ্ছলে ইতিহাস আলোচনা করিবেন। **মধ্য স্তরে** শিক্ষক এক এক বিষয়ের বর্ণনার কয়েকটি প্রশ্ন লিখিয়া দিবেন, ছাত্রগণ পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া নিজ ভাষায় তাহার উত্তর করিবে। **উচ্চ স্তরে** কেবল একটি পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায় না। অন্যান্য পুস্তক পড়িয়া **পাঠ্য পুস্তকের বর্ণনার অনুপূরণ করিয়া এবং তাহার সমালোচনা করিয়াই ইতিহাস শিক্ষা করিতে হইবে**। কোন স্তরেই ছাত্রছাত্রীগণ পাঠ্য পুস্তকের ভাষা মুখস্থ করিতে পারিবে না, পুস্তকে বর্ণিত কাহিনীই শিক্ষা করিবে এবং নিজে প্রয়োজন মত গুছাইয়া নিজ ভাষায় বর্ণনা করিবে।

(১০) **সারাংশ গ্রহণ ও প্রস্তুত করা** (note-taking and note-making)।. ভালভাবে ইতিহাস শিক্ষা করার জন্য সারাংশ গ্রহণ ও সারাংশ তৈয়ারী করা অতীব প্রয়োজনীয় কাজ। নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রত্যেক শীর্ষের বর্ণনা দানের পর প্রশ্নের সাহায্যে পুনরালোচনা করিয়া শিক্ষক নিজেই বোর্ডে সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিখিয়া দিবেন এবং ছাত্রছাত্রীগণ নিজ নিজ খাতায় তাহা লিখিয়া লইবে। মধ্য বিদ্যালয়ের স্তরে শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীগণ হইতে প্রত্যেক শীর্ষের সারাংশ আদায় করিবেন এবং যখনই সম্ভব হয় ছাত্রছাত্রীর দ্বারাই বোর্ডে লিখাইয়া দিবেন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী তাহা খাতায় লিখিয়া লইবে। **উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরের** ছাত্রগণকে নিজে সারাংশ

তৈয়ার করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষকের বর্ণনা শুনিয়া বা পুস্তক পড়িয়া ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই সারাংশ লিখিয়া লইবে এবং শিক্ষক তাহা দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিবেন।

(১১) **ইতিহাসকে বাস্তব আকার দান**। কেবল পুস্তক, পড়িয়া ইতিহাসের জ্ঞান লাভ করিলে ছাত্রছাত্রীগণ ইতিহাসকে গল্প বা উপন্যাসের ন্যায় কাল্পনিক কাহিনী বলিয়া মনে করিতে পারে। নানা প্রকার প্রদীপনের সাহায্যেই ছাত্রছাত্রীগণের নিকট ইতিহাস সত্য কাহিনী বলিয়া প্রমাণ করা যায়, বা ইতিহাসকে বাস্তব আকার দেওয়া যায়। ইহার জন্য নিম্নলিখিত প্রদীপনের ব্যবহার বা উপায় অবলম্বন করা যায়: (ক) **মানচিত্রে ঐতিহাসিক স্থান প্রদর্শন ও ঐতিহাসিক মানচিত্র অঙ্কন**, (খ) **ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের বা ঘটনার ছবি বা আদর্শ প্রদর্শন**, (গ) **সময়-রেখার ব্যবহার** (ঘ) **ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর** বা লেখার, বা ঐতিহাসিক কাগজপত্রের অবিকল প্রতিকৃতি (facsimile) প্রদর্শন। ইহাতে সেই সকল লোক বা দলিলপত্র যে এককালে ছিল সে সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীর কোন সন্দেহ থাকে না। বড় ইতিহাস পুস্তকে এই সমস্ত প্রতিকৃতি দেওয়া থাকে।

(ঙ) **ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের বক্তৃতা**, কথোপকথন, বা বাক্য বা সমসাময়িক লোকের বর্ণনা পড়িয়া শুনাইলে ঐতিহাসিক বিবরণ সত্য বলিয়া ছাত্রছাত্রীর ধারণা হয়।

(চ) **ইতিহাসের লিখিত উপাদান পাঠ**। বিদ্যালয়ের ইতিহাসের বস্তু উপাদান সংগ্রহ করা কঠিন হইলেও লেখা উপাদান সংগ্রহ করা যায় এবং করা উচিত। পাঠদানের সময় পাঠের সহিত সম্পর্কযুক্ত লেখা-উপাদানের অংশ পড়িয়া শুনাইলে ইতিহাস বাস্তব আকার ধারণ করে। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে ছাত্রছাত্রীগণকে পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে একটা উপাদান পুস্তকও দেওয়া উচিত। (বাংলা ভাষায় এইরূপ একখানা পুস্তকের অভাব আছে। আশা করি দেশের খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ শীঘ্র এই অভাব দূর করিবেন)।

(ছ) লিখিত উপাদানের অভাবে খ্যাতনামা **ঐতিহাসিকের বই হইতে** সম্পর্কযুক্ত অংশও পড়িয়া শুনান যায়।

(জ) **ঐতিহাসিক স্থান** বা **ধ্বংসাবশেষ প্রদর্শন**। নিকটে কোন ঐতিহাসিক স্থান বা ধ্বংসাবশেষ থাকিলে ছাত্রছাত্রীগণকে তাহা দেখিতে লইয়া যাওয়া উচিত এবং তাহা দেখিয়াই তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(ঝ) **স্থানীয় ইতিহাসের সহিত সম্পর্ক স্থাপন**। কোন স্থানীয় ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহা ছাত্রছাত্রীর নিকট বাস্তব আকার ধারণ করে।

(ঞ) **ঐতিহাসিক পরিভ্রমণ** (Historical Excursions)। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরের শেষের দিকে ছাত্রছাত্রীগণকে যত বেশী সম্ভব ঐতিহাসিক স্থান, স্মৃতিচিহ্ন (relics). ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি দেখিতে লইয়া যাওয়া যায়, ইতিহাস তাহাদের নিকট তত বেশী চিত্তাকর্ষক হয় ও বাস্তব মনে হয়।

(১২) **ছাত্রছাত্রীগণকে সহযোগিতার সুযোগ দান**। শিক্ষা করা প্রধানতঃ ছাত্রছাত্রীর কাজ ; এই মূল্যবান কথা স্মরণ রাখিয়া ইতিহাস শিক্ষার কাজে ছাত্রছাত্রীগণকে সহযোগিতা করিবার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হইবে। যথা,

(ক) পাঠদানের সময় ছাত্রছাত্রী যে বিষয় অবগত থাকিবার সম্ভাবনা, তাহার বর্ণনা না দিয়া তাহা তাহাদের নিকট হইতে প্রশ্নের সাহায্যে আদায় করিতে হইবে।

(খ) চিত্র ও মানচিত্র ইত্যাদি প্রদর্শন এবং মানচিত্রে বর্ণিত স্থান খুঁজিয়া বাহির করা ছাত্রছাত্রীদেরই কাজ।

(গ) পুনরালোচনা ও সারাংশ গঠন ছাত্রছাত্রীরই কাজ। তাহা প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা করাইতে হইবে।

(ঘ) প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ ঐতিহাসিক গল্প শিক্ষাদানের স্তরে তৃতীয় শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীগণ শিক্ষক-প্রদত্ত সারাংশ লিখিয়া লইবে। মধ্য স্তর ও উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে যতদূর সম্ভব ছাত্রছাত্রীগণই সারাংশ তৈয়ার করিবে।

(ঙ) প্রাথমিক স্তর হইতেই ছাত্রছাত্রীগণ বিভিন্ন যুগের মানুষের ব্যবহার্য নানা জিনিষের ছবি আঁকিবে ও আদর্শ (Model) তৈয়ার করিবে। মধ্য স্তর হইতে তাহারা ঐতিহাসিক নক্সা ও মানচিত্র আঁকিবে।

(চ) সময় সময় পরিদর্শিত পাঠ, ড্যাল্টন-প্ল্যান, সমস্যামূলক পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি প্রভৃতির সাহায্যে ছাত্রছাত্রীগণকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হইলে ছাত্রছাত্রীগণ স্বচেষ্টায় ইতিহাস শিক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে।

(ছ) মধ্য স্তর হইতে ছাত্রছাত্রীগণকে অন্য পুস্তক পড়িয়া পাঠ্য পুস্তকে প্রদত্ত বিবরণের অনুপূরণ করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

(জ) উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে ছাত্রছাত্রীগণ উপাদান পাঠ করিয়াও কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে। (গবেষণা পদ্ধতি)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতিহাস শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি

(১) পঞ্চ-সোপান পদ্ধতি

প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয়ের স্তরে প্রধানতঃ এই পদ্ধতিতেই ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরেও ইহার ব্যবহার করা যায়। তবে ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য ইহার কিছু কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ১ম ও ২য় সোপানের কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হয় না। ১ম সোপানে ছাত্রের পুর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া, ২য় সোপানে নূতন পাঠে শিক্ষণীয় বিষয়ের বর্ণনা দিতে হইবে। এক এক শীর্ষের বর্ণনা দিবার পর প্রশ্নের সাহায্যে পুনরালোচনা করাইয়া তাহার সারাংশ লিখাইয়া দিতে হইবে। প্রাথমিক স্তরে ৩য় সোপানের ব্যবহার হয় না। কারণ স্বতন্ত্র ভাবে পুর্বজ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞানের তুলনা এই স্তরের উপযোগী নহে। তবে ২য় সোপানে নূতন জ্ঞান দানের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বজ্ঞানের সহিত কিছু কিছু তুলনা করা যায়। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরেই ৩য় সোপানের ভাল ব্যবহার হয়। এই সোপানে প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীগণের দ্বারাই তাহাদের পুর্বজ্ঞাত কোন বিষয়ের সহিত নূতন পঠিত বিষয়ের তুলনা করা যায়। ৪র্থ সোপানে সূত্রগঠনের পরিবর্তে প্রশ্নের সাহায্যে পুনরালোচনা করিতে হইবে। পঞ্চম সোপানে সূত্রের প্রয়োগের পরিবর্তে পঠিত বিষয়ে ২।১টা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনিতে দেওয়া যায়।

(২) পরিদর্শিত পাঠ

মধ্য বাঙ্গালা স্তর হইতে সময় সময় এই পদ্ধতিতে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায়। শ্রেণীতে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীগণ পাঠ্য পুস্তকের বা অন্য পুস্তকের নির্দিষ্ট অংশ নীরবে পড়িবে ও সারাংশ লিখিবে ও শিক্ষক তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। অথবা নীরব পঠনের পর শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে পঠিত বিষয়ের জ্ঞান পরীক্ষা করিবেন।

(৩) ডল্টন লেবোরেটরী প্ল্যান

মধ্য স্তরের শেষের দিকে এই পদ্ধতিতে ইতিহাস শিক্ষাদান আরম্ভ করা যায় এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরেই ইহার অধিকতর ব্যবহার হইতে পারে।

কঠিন কঠিন বিষয়গুলি পঞ্চ-সোপান পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়া সহজ সহজ অংশগুলি ছাত্রগণকে ডল্টন পদ্ধতিতে স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিতে দেওয়া যায়।

(৪) কার্য-সমস্যা পদ্ধতি

বিদ্যালয়ের প্রত্যেক স্তরেই শ্রেণী পাঠনার অনুপুরকভাবে কার্য-সমস্যার আকারেও ইতিহাস শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়—ইতিহাসে কার্যমূলক এবং বুদ্ধিমূলক উভয় প্রকার সমস্যাই সমাধানের জন্য দেওয়া যায়।

কার্যমূলক সমস্যা ঃ—

প্রাথমিক স্তর—নানা ঐতিহাসিক জিনিষের চিত্র অঙ্কন ও আদর্শ নির্মাণ।

মধ্য স্তর—ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদির ছবি অঙ্কন ও আদর্শ নির্মাণ, সহজ সহজ ঐতিহাসিক নক্সা ও মানচিত্র অঙ্কন।

উচ্চবিদ্যালয়ের স্তর—যত বেশী সম্ভব ঐতিহাসিক নক্সা ও মানচিত্র অঙ্কন। ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও তাহার ইতিহাস সংগ্রহ ইত্যাদি।

বুদ্ধিমূলক সমস্যা ঃ—

প্রাথমিক স্তর। সহজ সহজ প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা ; যথা,—

চন্দ্রগুপ্ত কত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন ? কনিষ্কের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ? হর্ষ কিরূপ দাতা ছিলেন ?

মধ্য স্তর। জটিলতর প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা ; যথা,—

প্রাচীন হিন্দুগণের সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ? অশোক কিরূপে বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি করেন ? গুপ্ত যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি হয় ?

উচ্চবিদ্যালয়ের স্তর। এই স্তরে কঠিনতর প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিতে এবং সহজ সহজ উপাদান পরীক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে দেওয়া যায়।

প্রশ্ন। গুপ্তযুগকে ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণ যুগ বলে কেন ? তুর্কী আমলে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল ? পাঠান বা তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের কি কি কারণ দেওয়া যাইতে পারে ?

উপাদান পরীক্ষা। অশোকের বৌদ্ধধর্ম, সেবা ও জনহিতকর কার্য ; মুঘল যুগে ভারতের অবস্থা ; আকবরের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি প্রভৃতির উপাদান পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করা।

(৫) অভিনয় পদ্ধতি। ইহা প্রাথমিক ও মধ্যস্তরের উপযোগী। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরের তেমন উপযোগী নহে।

প্রাথমিক ও মধ্যস্তরে অভিনয়ের মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষাদান যেমনই আনন্দপ্রদ তেমনই ইহা শিশুদের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। শিশুরা ইতিহাসের গল্প শুনিবে, পড়িবে এবং তাহারা ঐ গল্পকে নাটকে রূপায়িত করিবে। শিক্ষক এই বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। শিশুরা শুধু নাটক অভিনয়ই করিবে না, তাহারা নাটকের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও করিবে। সাজ-পোষাক, অস্ত্র-শস্ত্র, ষ্টেজ তৈয়ারী, ষ্টেজ সাজান, নিমন্ত্রণ চিঠি লেখা, বিলি করা, দর্শনার্থীদের অভ্যর্থনা করা ইত্যাদি নানা কাজ করিয়া অভিনয়কে সার্থক করিবে। অভিনয় করাতে ইতিহাস সম্বন্ধে শিশুদের শুধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই হইবে না, তাহাদের অন্যান্য বিষয়েরই অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইবে।

(৬) যৌথমূলক পদ্ধতি। মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে এই পদ্ধতিতে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায়। যথা,—আকবরের ইতিহাসকে নিম্নলিখিত কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক দল এক এক অংশ পাঠ করিবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর শিক্ষকের অনুমোদন লাভ করিলে সকলে সারাংশগুলি লিখিয়া লইবে। আকবরের ইতিহাস— (১) আকবরের বাল্যজীবন, সিংহাসন লাভ ও পানিপথের ২য় যুদ্ধ। (২) সাম্রাজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য সীমা। (৩) শাসন-ব্যবস্থা (৪) রাজনীতি ও হিন্দুদের প্রতি ব্যবহার (৫) ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পের উৎসাহ দান (৬) চরিত্র ও শ্রেষ্ঠত্ব।

(৭) আলোচনা পদ্ধতি। (শিক্ষা ২য় ভাগ ৩৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহা উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরের উপযোগী। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীর সামনে একটা ঐতিহাসিক প্রশ্ন স্থাপন করা হয়। সকল ছাত্র মিলিয়া তাহার আলোচনা করে এবং শিক্ষকের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত করিয়া শিক্ষা করে। যথা,—আওরঙ্গজেবের রাজনীতি ও মুঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য তাঁহার দায়িত্ব।

(৮) গবেষণা পদ্ধতি (The source or research Method)। ইতিহাসের উপাদানের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত না হইয়া কেবল স্কুলপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক ধারণাই হয় না। পাঠ্য পুস্তকে ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্তই লেখা থাকে, তাহা পড়িয়া তাঁহারা কেন এবং কিরূপে কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা জানা যায় না। অবশ্য অল্প বয়স্ক ছাত্রগণ ইতিহাসের উপাদান পড়িয়া মৌলিক গবেষণা করিতে পারে না; কিন্তু তাহারাও সহজ উপাদান পাঠ করিয়া তাহার সাহায্যে ঐতিহাসিক-

গণের সিদ্ধান্তের যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারে। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলি পুস্তকে লেখা থাকিলেও যেমন পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করিয়া সেগুলি শিক্ষার প্রয়োজন হয় সেইরূপ যতটা সম্ভব উপাদানের সাহায্যে বিচার করিয়া পাঠ্য পুস্তকে প্রদত্ত ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন। ইহাতে ইতিহাসের স্বরূপ সম্বন্ধে ছাত্রগণের ভাল ধারণা হয় এবং তাহারা পরে ঐতিহাসিক গবেষণা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরের শেষের দিকেই ছাত্রগণকে এই পদ্ধতিতে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহার জন্য ছাত্রগণকে পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত একটা উপাদান পুস্তকও দেওয়া আবশ্যক (London University Matriculation পরীক্ষার্থীর জন্য ইতিহাসের একটা উপাদান পুস্তকও পাঠ্য করা হয়)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন স্তরে ইতিহাস শিক্ষাদান-পদ্ধতি

প্রাথমিক স্তর। তৃতীয় মান হইতে ইতিহাস শিক্ষাদান আরম্ভ করা যায়। ইহাকে **ছবি ও গল্পের স্তর বলে**। কেননা এই স্তরে সাধারণতঃ ছবি ও গল্পের সাহায্যেই ইাতহাস শিক্ষা দিতে হয়। ইতিহাসের প্রধান প্রধান নায়ক-নায়িকাগণের জীবনীর আকারেই এই স্তরে ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে। শিশুগণ মাতৃভাষায় কেবল নিজ দেশের ইতিহাসই শিক্ষা করিবে। এই স্তরেই বেশী খুঁটিনাটি খবর, বেশী লোকের নাম, স্থানের নাম বা তারিখ ইত্যাদি দেওয়া ভাল নহে। তবে পূর্বকালের লোকদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, পানীয়, ব্যবহার্য দ্রব্য, বাসগৃহ, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা থাকিলেই উহা শিশুদের নিকট চিত্তাকর্ষক হইবে। বর্ণনা ছাড়াও এই সমস্ত জিনিষের মডেল এবং মডেল অভাবে ছবি, শিশুদের দেখাইতে হইবে। কোন কোন মডেল শিশুরাই প্রস্তুত করিবে এবং ছবিও শিশুরা আঁকিবে। ছাত্রের জন্য বহু চিত্রপূর্ণ, সরল ভাষায় লিখিত একটা পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন করা প্রয়োজন।

পঞ্চ-সোপান প্রণালীতে গল্পের আকারে **কার্যসম্বলিত বর্ণনাত্মক পাঠই** এই স্তরের উপযোগী। বর্ণনা সরল ও প্রাঞ্জল হওয়া প্রয়োজন। নানা চিত্র ও

আদর্শ দেখাইয়া শিশুদের দ্বারা কাজ করাইয়া এবং প্রয়োজন মত মানচিত্রের ব্যবহার করিয়া তাহাকে যতটা সম্ভব আকার দিতে হইবে। **সর্ব্বদা সময় রেখার সাহায্যে** শিশুগণকে ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহের জীবন-কাল সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। যখনই সম্ভব শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত **সরল কবিতা** পড়িয়া শুনাইবার চেষ্টা করা উচিত। এক এক শীর্ষের বর্ণনার পর প্রশ্নের সাহায্যে শিশুগণের দ্বারা তাহার পুনরালোচনা করাইতে হইবে এবং তাহার পর শিক্ষক তাহার খুব **সংক্ষিপ্ত সারাংশ বোর্ডে লিখিয়া দিবেন** ও শিশুরা তাহা নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া লইবে। পরে শিশুরা এই সারাংশের সাহায্যে পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিয়া পাঠ্য বিষয় স্মরণ রাখিবে। কিন্তু তাহাদিগকে কিছুতেই পুস্তকের ভাষা মুখস্থ করিতে দেওয়া হইবে না; সর্বদা নিজ ভাষায় গুছাইয়া বলিতে বাধ্য করিতে হইবে। ইতিহাসের যে গল্প শিশুরা শিখিল তাহা অনায়াসে শিশুদের সাহায্যে নাটকে রূপায়িত করা যায়। শিশুরা সেই নাটক অভিনয় করিবে এবং অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-পোষাক ইত্যাদি তৈয়ারী করিবে।

মধ্যবিদ্যালয়ের স্তর। ইহাকে সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস শিক্ষার স্তর বলা যায়। এই স্তরে ইতিহাস, ঐতিহাসিক চরিত্র সমূহের জীবনী হইতে জাতীয় জীবনের কাহিনীতে পরিণত হইবে। সময়ানুক্রমে সজ্জিত ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণই এই স্তরে শিক্ষা দিতে হইবে। প্রধান প্রধান লোকের নাম, স্থানের নাম এবং ঘটনার তারিখও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মজীবনের এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণও শিক্ষা দিতে হইবে।

এই স্তরেও সাধারণতঃ পঞ্চ-সোপান পদ্ধতিতে বর্ণনাত্মক পাঠ দেওয়া হয়। কিন্তু কেবল পাঠ্য পুস্তকের পুনরাবৃত্তি করিলে হইবে না। প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্যও সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার জন্য শিক্ষককে নানা ইতিহাসের পুস্তক হইতে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এই স্তরেও চিত্র, নক্সা ও মানচিত্রের সাহায্যে ইতিহাসকে বাস্তব আকার দেওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে। ভৌগোলিক মানচিত্রের পরিবর্তে এইক্ষণে ঐতিহাসিক মানচিত্রের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া উচিত। যখনই সম্ভব পাঠ্য বিষয়ের ঐতিহাসিক উপাদান পড়িয়া শুনাইতে হইবে। অন্ততঃ পক্ষে সময় সময় সাহিত্য

ও বড় ইতিহাস পুস্তক হইতে বর্ণনা পড়িয়া শুনান প্রয়োজন। সময়-জ্ঞান দেওয়ার জন্য এই স্তরে সময় রেখার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে **সময়ানুক্রমিক ঐতিহাসিক ঘটনার তালিকা** (chronological chart) ব্যবহার করা যায় এবং ছাত্রছাত্রীগণকে তাহা তৈয়ার করিতেও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এই স্তরে ছাত্রছাত্রীগণকে ইতিহাস শিক্ষা কার্যে অধিকতর সহযোগিতা করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। একটা ভাল পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন করিয়া তাহাদিগকে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার শিক্ষা দিতে হইবে। এইক্ষণে পূর্বাপেক্ষা বিস্তারিত সারাংশ লিখিয়া দিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীরা এই সময় ঐতিহাসিক নক্সা ও মানচিত্র আঁকিতে আরম্ভ করিবে। সকল সময় বর্ণনাত্মক পাঠ না দিয়া সময় সময় পরিদর্শিত পাঠেরও ব্যবস্থা করা যায় এবং ছাত্রছাত্রীগণকে পুস্তক পড়িয়া সারাংশ লিখিতেও শিক্ষা দেওয়া যায়। পঞ্চসোপান পদ্ধতির শেষে সোপানে তাহাদিগকে ২।১টা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনিতে দেওয়া যায়। শ্রেণী পাঠনার অনুপূরক ভাবে তাহাদিগকে কার্য-সমস্যামূলক পদ্ধতিতেও ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহা ছাড়া এই স্তরে ড্যাল্টন প্রণালী ও সহযোগিতা প্রণালীতেও ইতিহাস শিক্ষার সূচনা করা যায়।

উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে ইতিহাস-শিক্ষাদান-পদ্ধতি

এই স্তরে ঐক্য-কেন্দ্রিক ক্রমে ভারতের ইতিহাস পুনঃ বিস্তারিতভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার অন্তবর্তী হিসাবে যুগানুক্রমে এবং বিষয়ানুক্রমেও ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে। অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করিয়া এক এক যুগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে হইবে এবং দীর্ঘকালব্যাপী প্রধান প্রধান ঘটনার বা বিষয়ের ইতিহাস একসঙ্গে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহা ছাড়া এই স্তরে দেশের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থারও ভাল জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন।

এই স্তরে ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য বর্ণনাত্মক পাঠের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে। E. L. Haslock বলেন, "বক্তৃতামূলক পাঠ কেবল সময় সময় দেওয়া হইবে, ইহা নিয়ম না হইয়া ব্যতিক্রমই হইবে।" বৎসরের প্রথমে কয়েকটি বর্ণনামূলক পাঠ দিয়া ছাত্রছাত্রীগণকে এই স্তরে ইতিহাস শিক্ষার প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। পরে সময় সময় কেবল জটিল বিষয়গুলি সম্বন্ধে বর্ণনামূলক পাঠ দিলেই যথেষ্ট হইবে। অন্য সময়ে ছাত্রছাত্রীগণকে নিজে

শিক্ষা করিবার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে এবং সাহায্য করিতে হইবে। পাঠ্য পুস্তকে বর্ণিত কাহিনী ছাত্রছাত্রী বাড়ী হইতে পড়িয়া আসিবে। শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তকের বর্ণনার পুনরাবৃত্তি না করিয়া বিষয়টি শীর্ষ ও উপশীর্ষ লিখিয়া দিবেন, অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করিবেন, বিষয়টির উপাদান পড়িয়া শুনাইবেন, বিষয়টি সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করিবেন এবং ছাত্রছাত্রীগণকে ২।১টি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনিতে দিবেন। ইহা ছাড়া সহজ সহজ অংশ ডল্টন প্রণালীতে পাঠ করিয়া তাহার সারাংশ লিখিয়া দিবেন। কোন কোন বিষয় সহযোগিতামূলক ও সমস্যামূলক প্রণালীতেও পাঠ করিতে দেওয়া উচিত; সময় সময় কোন কোন বিষয় শ্রেণীতে আলোচনা পদ্ধতিতেও শিক্ষা দিতে পারেন। এই স্তরের শেষের দুই বৎসর উপাদান পাঠ করিয়া পাঠ্য পুস্তকের বর্ণনার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করিতেও শিক্ষা দেওয়া যায়।

এই স্তরে সর্বদা কারণ ও ফল সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে এবং পূর্বজ্ঞাত সমরূপ বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া নূতন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। এই স্তরে কেবল ঐতিহাসিক বিবরণ শিক্ষা করিলেই হইবে না; বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনা করিয়া বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের অথবা বিভিন্ন সময়ে জাতির উন্নতি ও অবনতির কারণ নির্দেশ করিয়াও ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

সময় জ্ঞানের জন্য ছাত্রছাত্রীগণকে সম্পূর্ণ ইতিহাসের সময়ানুক্রমিক রাজবংশের বা শাসনকর্তার ও তাহাদের সময়ের ঘটনার তালিকা(Historical Charts) প্রস্তুত করিতে দেওয়া প্রয়োজন। সকল সময় ঐতিহাসিক মানচিত্রের সাহায্যেই ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে এবং ছাত্রছাত্রীগণকে যত বেশী সম্ভব ঐতিহাসিক মানচিত্র আঁকিতে হইবে। এই স্তরে ছাত্রেরা ভারতবর্ষের ইতিহাস শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক মানচিত্র আঁকিতে পারে:—

(১) প্রাচীন ভারতে আর্যোপনিবেশ (২) বুদ্ধের সমসাময়িক রাজ্যসমূহ (৩) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের এবং প্রত্যাবর্তনের পথ (৪) মৌর্য সাম্রাজ্য (চন্দ্রগুপ্ত বিন্দুসার ও অশোকের সাম্রাজ্য সীমা বিভিন্ন রং বা চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করিতে হইবে) (৫) কনিষ্কের সাম্রাজ্য (৬) গুপ্ত সাম্রাজ্য (৭) হর্ষের সাম্রাজ্য (৮) প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট ও পাল সাম্রাজ্য (৯) আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য (১০) শেরশাহের সাম্রাজ্য (১১) মুঘল

সাম্রাজ্য (বাবর, আকবর ও আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যের সীমা স্বতন্ত্রভাবে দেখাইতে হইবে) (১২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (ওয়ারেন হেষ্টিংস, ওয়েলেসলী ও ডালহৌসীর সময়ের সাম্রাজ্য-সীমা স্বতন্ত্র ভাবে দেখাইতে হইবে)।

জেলার মধ্যে কোন ঐতিহাসিক স্থান বা ধ্বংসাবশেষ থাকিলে ছাত্রগণকে সেই সকল স্থান দেখিতে লইয়া যাওয়া উচিত।

প্রত্যেক ছাত্রের একটা পাঠ্য পুস্তক, একটা নোটখাতা, একটা ঐতিহাসিক মানচিত্রের খাতা থাকিবে।

অন্যান্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক স্থাপন (Co-relation with other subjects)। ইতিহাস শিক্ষাদানের সময় মানচিত্রের ব্যবহারের কথা ইতিপুর্বে বর্ণিত হইয়াছে; বস্তুতঃ **দেশের ভুগোলের সহিত সম্পর্ক স্থাপন না করিয়া কোন দেশের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায় না**। কেননা প্রত্যেক দেশের ইতিহাসের উপর তাহার প্রাকৃতিক অবস্থা প্রভাব বিস্তার করে। অপর দিকে কোন দেশের রাজনৈতিক ভূগোলের জ্ঞান না থাকিলে তাহার ইতিহাস ভালভাবে অনুসরণ করাই যায় না। ইতিহাসের পাঠ দেওয়ার সময়ে সেই বিষয়ে কোন কবিতা বা সুন্দর বর্ণনা পড়িয়া শুনাইলে পাঠ চিত্তাকর্ষক হয় এবং ইহার দ্বারা **সাহিত্যের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক স্থাপিত হয়**। ইহা ছাড়া কোন দেশের ইতিহাস শিক্ষাদানের সময় তাহার শাসন-ব্যবস্থার জ্ঞান দিতে হয় এবং তাহার ফলে **নাগরিক বিজ্ঞানের (Civics) সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক স্থাপিত হয়**। বিভিন্ন যুগের মানুষের ব্যবহার্য জিনিষের ছবি অঙ্কন ও আদর্শ নির্মাণ করিতে দেওয়া হইলে **অঙ্কন-বিদ্যা ও হস্তশিল্পের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে**।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের শিক্ষক

ইতিহাস-শিক্ষকের ইতিহাস সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইতিহাস সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানের যাঁহার অভাব আছে, তিনি ইতিহাস শিক্ষাদানে উপযুক্ত ব্যক্তি নন। ইতিহাস সম্বন্ধে ইতিহাস-শিক্ষকের যথার্থ জ্ঞান থাকিতে হইবে, ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ ভাসা ভাসা তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কখনও ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদান করিবেন না। ইতিহাস-শিক্ষকের পক্ষে ইতিহাসের কোন কোন অংশ লইয়া বিশেষ পড়াশুনা করিতে হইবে। তিনি ঐতিহাসিক দলিল পত্রাদি দেখিবেন, খবরাদি সংগ্রহ করিবেন এবং খবরগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া অপক্ষপাত ইতিহাস রচনা করিবেন। তিনি যদি এইরূপে তাহার মনকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাস রচনা করিতে শিক্ষা দেন তাহা হইলে তিনি ইতিহাস শিক্ষাদান করিতে উপযুক্ত ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মন যদি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস শিক্ষাদানে উন্মুখ হয়ে উঠে তবে তিনি তাঁহার ছাত্রছাত্রীদের মনেও ঐ ধারণা অনুপ্রবেশ করাইতে পারিবেন।

ইতিহাস-শিক্ষকের বিশ্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা থাকা কর্তব্য। বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে বিশ্ব-ইতিহাস আদি যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। ভারতের ইতিহাস পড়াইতে হইলে বিশ্ব-ইতিহাস সম্পর্কে পটভূমিকা জানা দরকার। এই কারণে পাঠ্যসূচীতে বিশ্ব-ইতিহাসের স্থান থাকা অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে। আমাদের দেশেই কি ঘটিয়াছে তাহা জানা যেমন দরকার, সেইরূপ অন্যদেশের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের ইতিহাস জানাও প্রয়োজন। এই কারণে ইতিহাস-শিক্ষকের বিশ্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

ইতিহাস-শিক্ষকের নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। প্রাচীন মানুষ এবং মানুষের বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টির মধ্যে মানুষ কি ভাবে অতিক্রম করিয়া

আসিয়া বর্তমান মানুষে পরিণত হইয়াছে তাহাও জানা আবশ্যক। মানুষের ক্রমোন্নতির জ্ঞান ইতিহাস পাঠদানে শিক্ষককে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিবে।

ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষকের উপযুক্ত জ্ঞানের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। শিক্ষাদান পদ্ধতি হইতে মূল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান ইতিহাস শিক্ষাদানে বেশী মূল্যবান। শিক্ষাদান ক্ষেত্রে পদ্ধতির যে ভুল দেখা যায়, সেই ভুল উদ্ভূত হয় ইতিহাসের বিষয়বস্তুর উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব হইতে। শিক্ষক শিক্ষিকার যদি বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান থাকে এবং ঐ বিষয় শিক্ষাদানে আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে পদ্ধতির দিক হইতে যে খুব বেশী ভুল দেখা যাইবে তাহা নয়।

ইতিহাস শিক্ষক-শিক্ষিকার দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ হইবে তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন। ইতিহাস যদি বিজ্ঞান হয়, তাহা হইলে ইতিহাস শিক্ষক-শিক্ষিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাঁহার কোনরূপ বদ্ধমূল পূর্ব-ধারণা থাকা অনুচিত। জাতীয়, ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কারের উর্ধ্বে ইতিহাস-শিক্ষককে সর্বদাই থাকিতে হইবে। ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য তিনি সংগ্রহ করিবেন এবং দেখিবেন উহা সত্যের উপরে ভিত্তিগত কি না। ঐ তথ্যগুলির উপরই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তিনি সর্বদা কোন বিষয়ের দুইটি দিক পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করিবেন। প্রত্যেকটি ইতিহাসের চরিত্রের দুইটি দিক আছে, একটি ভাল অপরটি মন্দ। ভাল মন্দের অবশ্য অনুপাত ঠিক নাও হইতে পারে। ইতিহাস-শিক্ষক যখন ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন তখন তিনি তাঁহার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। ইতিহাসে কার্য এবং কারণ সম্বন্ধে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আকবর কি ভাবে তাঁহার অতীতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, এবং কি ভাবেই বা তিনি ভবিষ্যৎকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন, ইহাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। যদি তাঁহার নৈতিক গুণাবলী ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে তবে তাহা অবশ্যই ইতিহাসের বিষয়বস্তু, কিন্তু কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের নৈতিক গুণাবলী যদি ব্যক্তিগত চরিত্রকেই মাত্র বিকাশ করিয়া থাকে, তবে তাহা ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়বস্তু নয়। প্রত্যেক দেশে ও সমাজে বীর চরিত্র রহিয়াছে। ইতিহাস-শিক্ষক ঐরূপ বীর চরিত্র

সম্বন্ধে একটু আবেগের সঙ্গে আলোচনা করিবেন ইহাতে আর আপত্তি কি? কিন্তু তিনি যেন ঐরূপ আলোচনা করিতে গিয়া সত্যকে রুদ্ধ না করেন। তিনি যেন ঐ বীর চরিত্রের ঐতিহাসিক কর্মাদিকে কোন রূপেই বিকৃত না করেন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভারতীয় ইতিহাস-শিক্ষককে একটি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। অন্যান্য দেশের বীর চরিত্রদের যেভাবে আলোচনা করা যায় সেইরূপ ভারতের ঐতিহাসিক বীর চরিত্রদের আলোচনা করা অসুবিধাজনক, কারণ ভারতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি রহিয়াছে। অতএব ইতিহাস-শিক্ষককে অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস পাঠদানে অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি কখনই গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব লইয়া পাঠদান করিবেন না। তাঁহাকে ঐ বীর চরিত্রের উভয় দিকই ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দিতে হইবে। বিশেষজ্ঞগণ ঐ চরিত্র সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে এবং তাহার পরে ঐ সমস্ত তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। যদি শিক্ষক-শিক্ষিকা হিন্দু হন, তবে তিনি রাণাপ্রতাপ কিংবা অন্য হিন্দু বীরকে ছাত্রছাত্রীদিগের নিকট উপযুক্ত ভাবে উপস্থিত করুন তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তাহা করিতে গিয়া যেন তিনি মুসলমানদের চরিত্রকে বিকৃত না করেন। পক্ষান্তরে শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি মুসলমান হন, তবে তিনি ঔরঙ্গজীবের চরিত্রকে বীরোচিত ব্যাখা করিতে গিয়া ঐ সম্পর্কে তিনি যেন হিন্দুদিগকে আঘাত না দেন। মোটকথা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে রাখিতে হইবে যে বীরপূজা করা অন্যায় নয়, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়কে সেই প্রসঙ্গে আঘাত করা অন্যায়। এই সম্পর্কে আরও একটি বিশেষ কথা মনে রাখিতে হইবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা যাঁহারা আছেন, তাঁহারা হিন্দুই হউন, কিংবা মুসলমানই হউন, তাঁহারা সকলেই ভারতীয়। তাঁহারা যেন কোন কারণেই স্বীয় স্বার্থের খাতিরে সত্যকে বিকৃত না করেন। তাঁহাদের সকল সময়ই নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ইতিহাস-শিক্ষকের নানারকম গুণ থাকা উচিত। বিষয় সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান ছাড়াও তাঁহাদের মন উদার ও নিরপেক্ষ হইতে হইবে, তবেই তাঁহারা ইতিহাস শিক্ষাদান সাফল্যের সাথে সম্পাদন করিতে পারিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস-কক্ষ

বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে শ্রেণীতেই ইতিহাস শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ে যেমন শ্রেণীতে পাঠদান হইয়া থাকে, সেইরূপ ইতিহাস পাঠদানও শ্রেণীতেই হইয়া থাকে। কোন কোন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কক্ষ, ভূগোল কক্ষ, সমাজ-বিদ্যার কক্ষ আছে। সেইরূপ একটি আলাদা কক্ষ ইতিহাসের জন্যও থাকা আবশ্যক বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করিয়া থাকেন। ইতিহাস-শিক্ষক ও ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীগণ উভয়েই যদি ইতিহাসকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে চান তবে একটি ইতিহাসের কক্ষ অত্যন্তই প্রয়োজনীয়। একটি সুসজ্জিত ইতিহাসের কক্ষ ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি সুন্দর মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে। ছাত্রছাত্রীগণ ইতিহাস পড়িবে, চিন্তা করিবে এবং তাহা করিতে হইলে তথ্যাদি সম্বলিত পুস্তক পড়িতে হইবে, তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সময় জ্ঞান সম্পর্কিত তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাছাড়া তাহাদিগকে মানচিত্র দেখা ও তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহাদিগকে গ্রাফ তৈয়ারী করিতে হইবে। ইতিহাস পাঠে মূল সূত্রাদি সন্ধানও প্রয়োজন, এবং তাহার জন্য ইতিহাস কক্ষই উপযুক্ত স্থান। ইতিহাস প্রসঙ্গে নানা বিষয়ে সন্ধান কার্য একমাত্র ইতিহাস কক্ষেই চলিতে পারে, শ্রেণী কক্ষে তাহা হইতে পারে না।

শিক্ষক শিক্ষিকার পক্ষ হইতেও বিদ্যালয়ে একটি ইতিহাস কক্ষের বিশেষ প্রয়োজন। যদি তাঁহাকে শ্রেণীকক্ষই ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ ইতিহাসের পাঠ দিবার জন্য যাহা কিছু প্রদীপন প্রয়োজন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে হয়। কিন্তু পাঠদানের সময় যদি কোন মানচিত্র বা তথ্যাদি-সম্বলিত পুস্তকের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে হয় শিক্ষককে তাহা এড়াইয়া যাইতে হয়, আর না হয়, তাঁহাকে ঐসমস্ত বস্তুগুলি পাঠাগার হইতে আনাইয়া লইতে হয়। উভয় কাজই ত্রুটিপূর্ণ। এড়াইয়া গেলে শিক্ষাদান উপযুক্তরূপে হয় না,

আর পাঠাগার হইতে উহা আনিতে গেলে প্রচুর সময় অনর্থক ব্যয় হইয়া যায়। অতএব ইতিহাস পাঠদানের সময় সমস্ত প্রকার শিক্ষাসরঞ্জাম ইতিহাস-শিক্ষকের হাতের কাছে থাকা দরকার, তাহা হইলেই ইতিহাস পাঠদানের উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হইবে। সব জিনিষ হাতের কাছে রাখিতে হইলে ইতিহাস কক্ষের যে প্রয়োজন ইহা বলাই বাহুল্য।

তাহা হইলে ইতিহাস কক্ষ কি ভাবে সজ্জিত করিতে হইবে তাহাই হইল আমাদের পরবর্তী সমস্যা।

(১) ইতিহাস কক্ষে কিছু ইতিহাস সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি থাকিবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্যই বিভিন্ন মানের পুস্তকাদি থাকিবে, বহু পুস্তক এইখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, ইতিহাস সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদিপূর্ণ উপযুক্ত সংখ্যক পুস্তক এই কক্ষে থাকিবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য খ্যাতনামা লেখকদের ইতিহাস পুস্তক থাকিবে, যাহাতে শিক্ষক-শিক্ষিকা সর্বদা দেখিয়া লইতে পারেন এবং যাহা উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরাও মাঝে মাঝে দেখিতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য যেমন তথ্যপূর্ণ ইতিহাস পুস্তক থাকিবে, সেইরূপ তাঁহাদের জন্য ইতিহাস-শিক্ষা-পদ্ধতি মূলক পুস্তকও থাকিবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ইতিহাস শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি দেখিয়া লইতে পারিবেন।

ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস কক্ষের পাঠাগারে ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত ইতিহাস পুস্তকাদি থাকিবে।

(২) ইতিহাস-কক্ষে কতকগুলি বাছাই করা ঐতিহাসিক চিত্র থাকিবে। বড় এবং ছোট দুই আকারেরই ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার চিত্র ইতিহাস-কক্ষে দেওয়ালে টাঙ্গান ও কার্ডবোর্ডে সাঁটা অবস্থায় থাকিবে। অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা বিখ্যাত চিত্রকরদের দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। ঐ ছবিগুলি ছাপা হইয়াছে এবং ঐগুলি কম দরে পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অবশ্য এই ব্যবস্থা খুব কমই আছে। অবশ্য ভারতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক অট্টালিকাসমূহের ছবি ভারতেও সস্তাদরে কিনিতে পাওয়া যায়। রেলের প্রচার বিভাগের কাছেও বিদ্যালয়ের নাম করিয়া বিখ্যাত মন্দির, মসজিদ, অট্টালিকা, সমাধি স্থানের ছবি ইত্যাদি বিনা পয়সায় চাহিয়া আনা যায়। বিলাতে ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্রাদি (বিখ্যাত চিত্রকরদের

আঁকা) ছাপা অবস্থায় বিভিন্ন পুস্তক সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামও পোষ্টকার্ডের সাইজের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ছবি অত্যন্ত কম দরে বিক্রয় করিয়া থাকে। অনেক শিক্ষা পত্রিকা ও ঐতিহাসিক পত্রিকা আছে। সেই সমস্ত পত্রিকার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক ছবি পাওয়া যায়। সেগুলিও বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইতিহাস কক্ষের জন্য রাখিতে পারেন। Pictorial Education পত্রিকাটি অত্যন্ত ভাল। এই পত্রিকাতে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষার উপযুক্ত অনেক ছবি থাকে। এই পত্রিকাটিও বিদ্যালয়ের ইতিহাস কক্ষের জন্য রাখা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকা ও খবরের কাগজে অনেক ঐতিহাসিক চিত্র ছাপা হয়। ছাত্রছাত্রীরা এই সব ছবি কাটিয়া লইয়া Scrap Book তৈয়ারী করিয়া উহাতে আঁটিয়া রাখিতে পারে। শিক্ষা সরঞ্জাম হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট।

(৩) ইতিহাস-কক্ষে বিভিন্ন যুদ্ধের মানচিত্র, নক্সা, সৈন্যদের গতিপথ ইত্যাদি বড় বড় করিয়া অঙ্কিত ও টাঙান থাকিবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা ছবি দেখিয়াই যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারে।

(৪) ইতিহাস শিক্ষায় সময় সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা অত্যন্ত আবশ্যক। ছাত্রছাত্রীরা ইতিহাসের সময় কাল যাহাতে ভালভাবে বুঝিতে পারে তাহার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ইতিহাস-কক্ষের তিনটি দেওয়াল জুড়িয়া সময় রেখা অঙ্কিত থাকিবে। হয় দেওয়ালেই উহা অঙ্কিত থাকিবে, আর না হয় পেষ্ট বোর্ড কাটিয়া দেওয়ালের দুইটি লাইনের মধ্যে (২০˝ ইঞ্চির মধ্যে) দেওয়ালে বরাবর সাঁটিয়া দিতে হইবে। শতাব্দীগুলি বা তাহার অংশগুলিও এই সময়রেখার মধ্যে অঙ্কিত থাকিবে। এই সময়রেখার মধ্যে বিশেষ ঘটনা ও ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম লেখা থাকিবে। নীচু শ্রেণীতে যেখানে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনা করা হইবে, সেই শ্রেণীতে পাঠদান কালে ঐ বিখ্যাত ব্যক্তি বা ঘটনার ছবি ঐ সময় রেখার মধ্যে সাঁটিয়া দেওয়া যায়। ছাত্রছাত্রীরা, ঐ ছবি, সাঁটা অবস্থায় দেখিয়া, কখন ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পাবে। পরের ঘটনা বা বিখ্যাত ব্যক্তি হইতে পূর্বের ঘটনা বা ব্যক্তির সময়ের দূরত্ব কত, তাহা তাহারা সময়-রেখা দ্বারা বুঝিতে পারিবে। ইহা ছাড়া আরও এক প্রকার সময় রেখা তৈয়ারী করা যায়। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন সময়-রেখা উপর

হইতে নীচের দিকে অঙ্কিত থাকিবে। উহারা পাশাপাশি থাকিবে। উদ্দেশ্য এই যে বিভিন্ন দেশের সময়-রেখা হইতে সমসাময়িক ঘটনাসমূহ পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। তাহা ছাড়া ইতিহাস কক্ষে ইতিহাস সম্পর্কীয় গ্রাফ থাকিবে। এই গ্রাফের মধ্য দিয়া বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান ও পতনের হিসাব বুঝিতে পারা যাইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে চার্ট তৈয়ারী করাও চলে। বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার এই চার্টে করিতে পারা যায়। যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের তুলনা, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের তুলনা ইত্যাদি। পুনরালোচনার পক্ষে চার্ট ও গ্রাফ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। তাহা ছাড়া ইতিহাস কক্ষে একটি বড় গ্লোবও থাকিবে।

ইতিহাস কক্ষে যে সব জিনিষ থাকার প্রয়োজন তাহার উল্লেখ করা হইল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে ইতিহাস কক্ষ ২।৪ দিনের মধ্যে তৈয়ারী করা চলে না। ইহা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে, ইহাই রীতি। ইতিহাসের নানা সরঞ্জাম কিনিয়া আনিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানচিত্র চার্ট, নক্সা, সময়-রেখা ইত্যাদি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা সহযোগিতা করিয়া সম্মিলিত ভাবে তৈয়ারী করিবে। এইগুলি করিবার জন্য সময় ও পরিপক্কতার প্রয়োজন। তাই ইতিহাস-কক্ষ কয়েকদিনের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করা সম্ভব হইবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মূলসূত্র পদ্ধতি

(Source Method)

ইতিহাস রচিত হয় ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া। যে কোন সময়ের ইতিহাস রচনা করা হউক না কেন ঘটনা ছাড়া ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয় না। ইতিহাস একটি বিজ্ঞান, অতএব ইতিহাসের শিক্ষকের পক্ষে ইতিহাস শিক্ষা দিতে গিয়া কল্পনামূলক মিথ্যা গল্পের অবতারণা করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু তাহা হইলে শিক্ষককে অতীত সম্বন্ধে নিখুঁত ঘটনা কি ভাবে পাইতে হইবে? যিনি বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেছেন,

তাঁহার পক্ষে অতীতের বিষয় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। তাই যে সমস্ত তথ্য তিনি যোগাড় করিতে পারিবেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করিবেন। এই তথ্যগুলি হইল মূল উৎস। মূলসূত্রগুলি নানা প্রকারের। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সমস্ত সূত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা সাধারণতঃ মানবের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বর্তমান যুগ হইতেছে দুই হাজার বৎসর ব্যাপিয়া। এই সময়ের মধ্যে বহু লিখিত তথ্য পাওয়া গিয়াছে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস রচনা করা যায়। ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে বলা যায় যে এই যুগ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিতেছে। এই যুগের পূর্বের যুগে লিখিত তথ্য খুবই সামান্য এবং লিখিত তথ্যগুলি পুরাণ, পৌরাণিক কাহিনী ও গাথার সঙ্গে গিয়া মিশিয়া গিয়াছে। এই যুগ সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ওডিসি ও ইলিয়াডের যুগ। তাহারও পূর্বের যুগ হইতেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ। এই অন্ধকার যুগের মূল উৎস হইল তখনকার দিনের তৈয়ারী বাড়ীঘর, যন্ত্রপাতি, মৃৎশিল্প ও অন্যান্য বস্তু, মানুষের দেহাবশেষ ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকারের ইতিহাসের মূল উৎসগুলি আলোচনা করা যাইতে পারে।

১। সব চেয়ে উৎকৃষ্ট মূল উৎস হইতেছে বিভিন্ন প্রকারের লিখিত দলিল। প্রাচীন সাহিত্যে ইতিহাস গ্রন্থের প্রাচুর্য নাই, কিন্তু প্রাচীন যুগের কাহিনীর উপর কয়েকখানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচুর আলোক সম্পাত করিয়াছে, যথা—(১) **বাণভট্টের হর্ষচরিত** (২) **বিল্‌হানের বিক্রমাঙ্ক চরিত** (৩) **সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত** (৪) **কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী** (৫) **আল-বেরুনির তারিখ-ই-হিন্দ**। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানিবার আর একটি অঙ্গ বৈদেশিক সাহিত্য। ভারতের কথা বহু পর্যটক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত লেখা হইতে ভারতের ঐতিহাসিক যুগের একটি ইতিহাস রচনা করা যায়।

২। লিখিত দলিল ছাড়া অন্যান্য দলিল হইতেও ইতিহাস রচনা করা গিয়াছে। ঐরূপ দলিল হইতেছে **প্রশস্তি** ও **লিপিসমূহ**। ঐতিহাসিকগণ খুব নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের উপাদান পাইয়াছেন **প্রশস্তি** ও **লিপিসমূহে**।

সভাকবিগণ প্রভুদের তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাদের কীর্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিতেন। সময় সময় পর্বত ও স্তম্ভের গাত্রে কিংবা তাম্র প্রভৃতি ধাতুফলকে কোন বিশেষ ঘটনা বা কার্য খোদাই করা হইত।

৩। চিত্র, ভাস্কর্য, ধ্বংসস্তূপ, অট্টালিকা, খাল, রাস্তা, পুল, পরিচ্ছদ, অস্ত্র-শস্ত্র, বর্মাদি, মুদ্রা, ইতিহাস রচনার অনুরূপ মূল উৎস। ইহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া ইতিহাস রচনা করা যায়। ভারতের বিভিন্ন যুগ লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গবেষণা করিয়াছেন এবং তাঁহারা ঐ গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। মোহেন-জো-দড়ো বেশী দিন আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা বর্তমানে পাকিস্তানের সিন্ধু দেশের অন্তর্গত। পূর্বে ইহা ভারতের মধ্যেই ছিল। এইখানে মাটি খুঁড়িয়া নানা জিনিস আবিষ্কার করা হয়। তাহাদের মধ্যে ভাঙ্গা বাড়ী, রাস্তা, স্নানের ঘর, মনুষ্য-কঙ্কাল, মাটির পুতুল, মালা, সিল, মুদ্রা, অলঙ্কার, গম ও বার্লির দানা, মাছের এবং অন্যান্য প্রাণীর হাড় পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঘোড়ার হাড় পাওয়া যায় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই সমস্ত জিনিষের উপর নির্ভর করিয়াই ঐ যুগের মানুষের অর্থাৎ প্রাক্-আর্যযুগের কৃষ্টি ও সভ্যতার একটি ধারাবাহিক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। অতি প্রাচীন যুগের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ারও একটি মূল উৎস। উহার উপর নির্ভর করিয়াও ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

বিভিন্ন মূল উৎসের উপর নির্ভর করিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের লেখার উপর নির্ভর করিয়া সাধারণ ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সাধারণ লোকের বুঝিবার উপযুক্ত করিয়া, হৃদয়গ্রাহী করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ কি কি মূল উৎসের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা হয়ত ঐতিহাসিকেরা জানেনও না। এই সাধারণ ঐতিহাসিকদের লেখার উপর নির্ভর করিয়া অনেক পাঠ্য-পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এই লেখকেরা হয়ত জানেন না মূল উৎস কি? মূল দলিলই হয়ত অনেক লেখক পাঠ করিতে পারেন না। মূল উৎসের অবস্থা এই হইয়া দাঁড়ায়।

ছাত্রছাত্রী ইতিহাস শিক্ষায় একটি ভুল মত পোষণ করিবে, যদি তাহাদিগকে বিচার করিয়া ইতিহাস পাঠ করিতে না দেওয়া হয়।

পাঠ্য পুস্তকে যাহা আছে তাহা ছাত্রছাত্রীরা চোখ বুজিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রম হওয়া দরকার। যদি শিক্ষক কোন ঐতিহাসিক বিষয়কে অবলম্বন করিয়া আলোচনার স্থত্রপাত করেন, পাঠ্যপুস্তকে যাহা আছে, তাহার চেয়ে বাহিরের ও কিছু পড়ার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য কিছুতেই ব্যাহত হইবে না, বরং সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ছাত্রছাত্রীরা পড়া স্থরু করিল বলিয়া ইতিহাস পাঠ সার্থক হইল। বলা বাহুল্য যে যদি ছাত্রছাত্রীরা ইতিহাস পাঠের মধ্যে মূল দলিলপত্রাদির অনুলিপিও পাড়িতে পারে তাহা হইলে ইতিহাস পাঠে বাস্তবতা পরিলক্ষিত হইবে। ইহার মূল্য অনস্বীকার্য। এখন প্রশ্ন হইতেছে আমরা কি ভাবে ইতিহাস শিক্ষাদান কালে মূল উৎসের ব্যবহার করিব? মূল দলিল পাইলে ইতিহাস শিক্ষার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তাহাই আমাদের প্রশ্ন। মূল উৎসকে ইতিহাসের উপাদানরূপে ব্যবহার করা খুবই শক্ত কাজ। যাঁহারা এই সব দলিল, প্রশস্তি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে যান তাঁহাদের নির্দেশ অনেক সময় বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণকে মানিয়া লইতে হয়। এমত অবস্থায় মাধ্যমিক বিত্তালয়ের ছাত্রছাত্রীর হাতে ইতিহাসের মূল উৎস উপস্থিত করা খুবই যুক্তিসঙ্গত হইবে কি? কিন্তু আসলে মাধ্যমিক বিত্তালয়ের ছাত্রছাত্রীগণকে ত কোন গবেষণার কাজ করিতে দেওয়া হইতেছে না। মূল উৎস সম্বন্ধে সামান্য কিছু অবহিত হওয়া, আর পাঠ্যপুস্তকে যাহা আছে তাহা হইতে সামান্য বেশী জানার চেষ্টা করা একই কথা। বিজ্ঞানের গবেষণাগারের কথা ধরা যাউক না কেন। ছাত্রছাত্রীরা পদার্থ-বিত্তা বা রসায়ন-বিত্তা সম্পর্কিত পরীক্ষাদি গবেষণাগারে করিয়া থাকে। তাহারা নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য গবেষণা করে না। তাহাদের পুর্বে যে সব পরীক্ষাদি হইয়া গিয়াছে তাহাই পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখে। ইতিহাসের মূল স্থত্র পাঠ করাও ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একই কথা। ঐতিহাসিকগণ গবেষণা করিয়া যাহা পাইয়াছেন, ছাত্রছাত্রীরাও মূল-উৎস অনুসন্ধান করিয়া একই কথা জানিবে, নূতন কিছু গবেষণা করিয়া বাহির করিবে না। তাহারা মূল উৎস পরীক্ষা করিয়া অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিবে। ছাত্রছাত্রীদিগকে অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা করিবার জন্যই ইতিহাস পাঠে মূল উৎসর ব্যবস্থা শিক্ষক করিয়া থাকেন।

শিক্ষক ইতিহাস পাঠদানে মূল উৎস নানা কারণে ব্যবহার করেন। তিনি শ্রেণী পাঠনায় মূল উৎস অর্থাৎ দলিলপত্র, মুদ্রা, প্রশস্তি আনয়ন করিয়া অতীতের একটি পরিবেশ রচনা করেন, ইহাতে ছাত্রছাত্রীরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জানিতে বেশী উৎসাহ বোধ করিবে।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক শ্রেণীতে যখন কোন ইতিহাসের পাঠদান করেন, তখন তিনি তাঁহার বক্তব্য বুঝাইবার জন্য উৎস পুস্তক পড়িয়া ছাত্রছাত্রীদের শুনাইতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা ঐতিহাসিক সত্য জানিয়া আনন্দিত হইবে।

তৃতীয়তঃ ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সমালোচনার সময় মূল উৎস খুব প্রয়োজনে লাগে। অনেক পাঠ্যপুস্তকে কোন একটি বিষয়ের একটি দিক সম্বন্ধেই হয়ত আলোচনা হইয়াছে। শিক্ষকের পক্ষে এই ত্রুটি সংশোধন করা দরকার। এই সময়ে শিক্ষক মূল দলিল উপস্থিত করিয়া বিষয়টির একদেশদর্শিতা খণ্ডাইতে পারেন।

ইতিহাসের পাঠদানে মূল উৎসের ব্যবহার উচ্চশ্রেণীতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ নীচু শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীরা ভারতীয় ইতিহাসে মূল উৎস কি, তাহাই তাহারা বুঝিতে পারিবে না।

নবম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস শিক্ষাদানে অভিনয়

ইতিহাস শিক্ষাদানে অভিনয়ের স্থান অতিশয় উচ্চে। বর্তমান যুগে এমনই অবস্থা দেখা যায় যে আমরা যেন অতীত যুগ হইতে একান্তভাবেই বিচ্যুত। যে জিনিসের সাথে একান্তভাবে বিচ্যুত হওয়া যায়, তাহার সহিত আমাদের কোন আবেগজনিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্তমানের বিষয়বস্তুকে ভাল করিয়া জানিতে হইলেও অতীতের প্রতি আমাদের মমতাবোধ থাকিতে হইবে। এই মমতাবোধ স্থাপিত হয় অতীতকে যদি অভিনয়ের মাধ্যমে রূপায়িত করিতে পারি।

মানুষ মাত্রই অনুকরণপ্রিয়। শিশু ছোট অবস্থাতেই বয়স্কদের অনুকরণ করিয়া থাকে, সে বাবা সাজে, মা সাজে, সাজিয়া সেই ভাবে কথা বলিয়া

থাকে। সে কল্পনাতে ঘটনাসমূহকে নূতন ভাবে সাজাইয়া লয়। শিশুর এই প্রবণতাকে ইতিহাস শিক্ষাদানে কাজে লাগাইলে ইতিহাস শিক্ষাদান প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। শিশুরা যেমন নিজেরা অঙ্গভঙ্গী করিয়া অপরকে অনুকরণ করিয়া কথা বলিতে ভালবাসে, সেইরূপ তাহারা অপরের অঙ্গভঙ্গী দেখিতেও ভালবাসে। শিশুদের দৈহিক শক্তির প্রাচুর্য আছে, তাহারই প্রকাশ করিতে তাহারা ব্যস্ত। অভিনয় শিশুদের এই দৈহিক ও মানসিক প্রাচুর্যের প্রকাশ অভিনয়ের মধ্য দিয়া করিতে ভালবাসে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে শিশুরা যখন একটি অভিনয় করে, তখন তাহারা কি পরিশ্রম করিয়া থাকে। পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী, সিন তৈয়ারী, স্টেজ বাঁধা, দর্শকদের জন্য বসিবার স্থান স্থির করা ইত্যাদি শারীরিক শক্তির প্রকাশ দেখা যায়, আর তা ছাড়া মানসিক শক্তিও তাহারা প্রকাশ করে সংলাপ রচনা করিয়া এবং অভিনয়ে নিজ নিজ অংশ ভাল করিয়া বুঝিয়া অঙ্গভঙ্গীদ্বারা তাহা প্রকাশ করিবার মাধ্যমে।

অভিনয় দ্বারা ইতিহাসের ঘটনা কি ভাবে রূপায়িত করা যায় তাহা আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। অভিনয় একটি কলা, পক্ষান্তরে ইতিহাস একটি বিজ্ঞান। অতএব অভিনয়ের মাধ্যমে যখন আমরা ইতিহাসকে রূপদান করিব। তখন আমরা ভাল করিয়া দেখিব যেন অভিনয় দ্বারা বাস্তব সত্য কখনও ব্যহত না হয়। ঐতিহাসিক সত্য কিংবা ঘটনা, অভিনয় কালে কল্পনা শক্তি বলে বাড়াইয়া প্রকাশ করা হইবে না এবং ঐ সত্যকে কখনও ক্ষুণ্ণও করা হইবে না। অবশ্য এই কথা বলা হইতেছে না যে কেবল ঐতিহাসিক বাস্তবিকতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে, তাহা নয়। কল্পনা শক্তির ব্যবহারও সেইখানে থাকিবে। অভিনয়ের বিভিন্ন অংশের কথোপকথন কাল্পনিক নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু সেই কথোপকথন কাল্পনিক হইলেও বাস্তব ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া বর্ধিত হইবে, কল্পনাশক্তি বলে যাহা নয় তাহার অনুপ্রবেশ সংলাপে চলিবে না। যখন ছাত্রছাত্রীরা হর্ষবর্ধন ও রাজ্যশ্রীর চরিত্র ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা পড়িয়াছে তখনই তাহারা হর্ষবর্ধন ও রাজ্যশ্রীর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করিতে পারিবে। ঘটনাকে ও চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়াই সংলাপ রচিত হইবে, তাহার চেয়ে বেশী কথার আয়োজন চলিবে না।

বাজারে অনেক ঐতিহাসিক নাটক ও উপন্যাস পাওয়া যায়। অনেকে সেই সব বই পড়িয়া বা অভিনয় দেখিয়া ইতিহাসের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া থাকেন। যাঁহারা লেখক তাঁহাদের কাছে আমাদের কিছু বলিবার নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নাটককে ও উপন্যাসকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য ইতিহাসের মধ্যে অনেক ভেজাল মিশাইয়া থাকেন। এই সমস্ত নাটকের অভিনয় ইতিহাস পাঠের পরিবর্তে কখনও করা উচিত নয়। কারণ ঐতিহাসিক সত্য তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে। ছাত্রছাত্রীগণ যখনই অভিনয় করিবে তখনই তাহারা পুস্তকে বর্ণিত ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আরও বেশী অনুসন্ধিৎসু হইয়া মূল গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কল্পনার সাহায্যে সংলাপ রচনা করিয়া লইবে। তাহাতে ইতিহাস শিক্ষাও হইবে, কল্পনাশক্তির বিকাশও হইবে। ঐতিহাসিক নাটক ও উপন্যাস রচয়িতাদের কাছে আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নাটক ও উপন্যাস লিখেন। তাহা হইলে ভারতীয় কৃষ্টির ইতিহাস ক্ষুণ্ণ হইবার কোন ভয় থাকিবে না।

ইতিহাসের কোন ঘটনাবহুল বিষয় পাঠদান হইয়া গেলে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদিগকে উহার উপর অভিনয় করিবার ইঙ্গিত করিতে পারেন। ইঙ্গিত পাইয়া ছাত্রছাত্রীরা অগ্রণী হইয়া আসিবে আশা করা যায়।

অভিনয় করিতে হইলে কি করা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। পরিকল্পনার কাজ চলিবে। পরিকল্পনা করিয়া দেখা গেল নিম্নলিখিত জিনিষগুলি প্রয়োজন—(১) ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া সংলাপ রচনা (২) মহড়া (৩) ষ্টেজ বাঁধাই (৪) পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী ইত্যাদি।

সংলাপ রচনা হইবে শ্রেণীতে। সমস্ত ছাত্রছাত্রী ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবে। শিক্ষক ভুল ত্রুটি সংশোধন করিবেন। দুই জন ছাত্রছাত্রী উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। ইহার পরে যাহারা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিবে, তাহাদের বাছাই হইবে। এক একটি চরিত্রের জন্য অনেকে প্রতিযোগিতা করিবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই বিচারকদল কে কোন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করিবে। চরিত্র বণ্টন হইয়া গেলে শ্রেণীতে অভিনয়ের মহড়া হইবে। যাহারা অভিনয় করিতে পারিল না, তাহারা অন্য কাজ করিবে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, যদি শ্রেণীতে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে অভিনয়ে অনেক চরিত্রের

সমাবেশের সুযোগ থাকিলে ভাল হয়। অনেকেই অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। যাহারা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতে পারিল না, তাহারা সাজ-পোষাক, সিন-সিনারী তৈরী, ষ্টেজ বাঁধাই ইত্যাদি কাজ করিবে। দুই জন ছাত্রছাত্রী প্রমটর বা শ্রুতিধারকের কাজ করিবে। শেষ অভিনয়ের পূর্বে মহড়াতে একই চরিত্রের জন্য অনেকেই অভিনয় করিতে পারিবে। এবং এক দল বিচারক বসিয়া যাহাদের অভিনয় ভাল, তাহাদের দ্বারা শেষ অভিনয় করাইতে পরামর্শ দান করিবে।

অভিনয় দিনে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের অভিনয় দর্শন করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে অভিভাবকবর্গ আসিলে তাঁহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। তাহার পর হইবে অভিনয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে বিচারক দল আছে তাহারা অভিনয়ের মূল্যায়ন করিবে। কি রীতিতে মূল্যায়ন করা হইবে শিক্ষক শিক্ষিকা তাহা ছাত্রছাত্রীদের পূর্বেই বুঝাইয়া দিবেন।

ইতিহাসের পাঠটীকা

শিক্ষকের নাম.......................বিদ্যালয়ের নাম.......................
তারিখ........ শ্রেণী—ষষ্ঠ শ্রেণী
বিষয়—ইতিহাস বিশেষ পাঠ—মিশরীয় সভ্যতা
উদ্দেশ্য—প্রত্যক্ষ—মিশরীয় সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানদান
পরোক্ষ—চিন্তা, কল্পনা ও বিচার-শক্তির বিকাশ

বিশেষ পাঠ	শিক্ষোপকরণ	প্রস্তুতি	উপস্থাপন
মিশরীয় সভ্যতা	প্রাচীন সভ্যতার আবাস-ভূমি—তৎকালীন পৃথিবীর মানচিত্র, সময়রেখা, পিরামিড, স্ফিংক্স, মমি, অসিরিস, টুটআঙ্খ আমেনের ছবি, চক, ইত্যাদি।	প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশীয় সভ্যতা মোহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পা সম্পর্কীয় নানা প্রশ্ন করিয়া ছাত্রছাত্রীদের চতুর্থ শ্রেণীতে পঠিত ইতিহাসের কাহিনী সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সিন্ধু সভ্যতারও পূর্বে মিশরীর এবং সমসাময়িক সুমেরীয় চীনদেশীয় সভ্যতার কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিব।	ছাত্রছাত্রীদের কাছে মিশরীয় সভ্যতার নূতন পাঠ ঘোষণা করিব। মিশরীয় সভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা সিন্ধু দেশীয় সভ্যতার অনুরূপ। মিশর দেশের মমি, পিরামিড স্ফিংক্স ইত্যাদি সম্পর্কে বলিব। মিশরবাসীদের দেবতা অসিরিসের কথা, মিশর দেশের ফারাওদের কথা, ফারাও টুটআঙ্খ আমেনের মমির কথা ইত্যাদি ছাত্রছাত্রীদের কাছে বলিব।

পদ্ধতি	প্রয়োগ
মিশরীয় সভ্যতার প্রতিটি অংশ ছাত্রছাত্রীদের কাছে গল্পের আকারে বলিব এবং ছাত্র-ছাত্রীরা ভালভাবে বুঝিতে পারিতেছে কিনা, তাহা বুঝিবার জন্য মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিব। প্রশ্ন : (১) মিশরকে নীলনদের দান কেন বলা হয়? (২) মিশরের নেপোলিয়ন কাহাকে বলা হইত? (৩) মিশরবাসীদের কয়েকটি দেবতার নাম কর। (৪) মমি কাহাকে বলে? (৫) মমি কোথায় রাখা হইত? (৬) স্ফিংক্স দেখিতে কিরূপ ছিল? (৭) কোন্ ফারাওয়ের মমি অল্প কিছুদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। (৮) প্রাচীন মিশররাসীরা কোন্ রীতি অনুযায়ী লিখিত? (৯) ঐ লেখাগুলি কি নামে অভিহিত হয়? ছাত্রছাত্রীদিগকে সময়রেখা, ছবি ও ম্যাপের সাহায্যে মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাস বুঝাইয়া দিব। মিশর সম্বন্ধে সমস্ত বলা হইয়া গেলে আমি উহার সারাংশ বোর্ডে লিখিয়া দিব।	আমি সারাংশ লিখিয়া দিলে ছাত্রছাত্রীরা আমার লিখিত সারাংশ লিখিয়া লইবে। আমি তখন ধারাবাহিক প্রশ্ন করিয়া শিশুদের নিকট হইতে সমগ্র মিশরীয় ইতিহাস আদায় করিয়া লইব। তারপর আমি ছাত্রছাত্রীদিগকে ঐ ইতিহাসের সারাংশ নিজ ভাষায় বলিবার জন্য বলিব। ছাত্রছাত্রীরা বলিবে এবং আমি তাহাদিগকে প্রয়োজন বোধে সাহায্য করিব। এই সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সময়রেখা সম্বন্ধে এবং মানচিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের পরীক্ষা করিব। পিরামিড, স্ফিংক্স, টুটআঙ্খ আমেন, ইত্যাদির ছবি দেখিয়া তাহারা মিশরীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কতদূর জ্ঞান আহরণ করিতে পারিয়াছে তাহাও আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূগোল বলিতে কি বুঝা যায়

ভূগোল শিক্ষাদান

ভূগোল বলিতে সাধারণতঃ পৃথিবীর বিবরণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে এত সব জিনিষ আছে যে সকলেরই ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিতে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তবে কোন্‌গুলি আমরা বাদ দিব? বাদ দিবারও একটি নীতি নির্ধারণ করা দরকার।

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। অতএব ভূগোলকে যদি আরও ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হইলে দাঁড়ায়, মানুষের বাসভূমি হিসাবে পৃথিবীর সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। অর্থাৎ মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে জানাই হইতেছে ভূগোল। অতএব এই অংশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য জিনিষ যাহা মানুষের পক্ষে এ ভাবে প্রয়োজনীয় নয়, সেগুলি ভূগোলের পর্যায় হইতে বাদ যাইতে পারে। Barker ভূগোলের সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানর নামই ভূগোল। প্রাকৃতিক পরিবেশ মনুষ্য জীবনের উপর প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। গরম অথচ ভিজে সমতল ভূমিতে মানুষ ধান উৎপাদন করে এবং সমুদ্রের উপকূলে মানুষ মাছ ধরিয়া জীবন ধারণ করে। কিন্তু ইহাই সম্পূর্ণ কথা নহে। ইহার উল্টাটাও সত্য। পৃথিবীর বহু অংশে মানুষও পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মরুভূমিতে খাল কাটিয়া জল সরবরাহ করিয়া মরুভূমিকে মানুষই উৎপাদনের উপযুক্ত শস্য-শ্যামল করিয়াছে। মানুষই বৃহৎ ভূমিখণ্ডে বাড়ী ঘর, রাস্তা, রেলপথ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া সেই ভূখণ্ডকে বাসোপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, এই প্রসঙ্গ হইতে আমরা ভূগোলের আরও এক ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি, **মানুষের এবং তাহার পরিবেশের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগের পাঠই হইতেছে ভূগোল**। আমরা মানুষকে প্রত্যক্ষ করি এবং সে যে জায়গায় বাস করে তাহা ভাল করিয়া দেখি এবং দুইএর মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখি। ইহাই ভূগোল।

Fairgrieve তাঁহার Geography in School নামক পুস্তকে ভূগোলের কাজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে ভূগোলের কাজ হইতেছে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া যাহাতে তাহারা এই পৃথিবী রূপ মঞ্চের অবস্থা সঠিক ভাবে বুঝিতে পারে এবং তাহা ছাড়া পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ ভালরূপে চিন্তা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। ভূগোলের কাজকে আরও ভালভাবে বুঝিবার জন্য আমরা একটি উদাহরণের সাহায্য লইতে পারি। ধরা যাক, একটি লোকের কথা যে তাহার গ্রাম হইতে কোনও দিন বাহিরে আসে নাই। এইরূপ মানুষ কি ভারত সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নের আলোচনায় যোগদান করিতে পারিবে? না, তাহার কারণ তাহার অভিজ্ঞতা নাই, না আছে প্রত্যক্ষ, না আছে পুস্তক মারফৎ। সে যদি অন্যান্য গ্রাম এবং নিকটস্থ শহর পরিদর্শন করে, তাহা হইলে তাহার দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপকতর হইবে। সে যদি ভারতের বিভিন্ন অংশে গমন করে তাহা হইলে তাহার অভিজ্ঞতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সকল মানুষের পক্ষেও বাহিরে যাওয়া সম্ভব নয়। এই স্থানেই ভূগোলের কথা আসে এবং ভূগোল এইখানে খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। বই, চিত্র, বিবরণ ইত্যাদি হইতেই আমরা ভিন্ন দেশের খবর পাইয়া থাকি, ইহাই ভুগোল। ভ্রমণ অত্যন্ত শিক্ষামূলক। যাহারা ভ্রমণ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভূগোলের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিষয়সমূহ জানান হইয়া থাকে। ভ্রমণ যেমন দৃষ্টিভঙ্গীকে উদার করে, ভূগোল পাঠও তাহাই করিয়া থাকে।

ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্য

আমরা দেখিয়াছি, আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সেই পৃথিবী সম্বন্ধেই ভূগোল আমাদিগকে জ্ঞান দান করিয়া থাকে। এক জন শিক্ষিত লোকের সাথে এক জন লোক যে বনে জঙ্গলে বাস করে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে কি দেখিতে পাই? তাহাদের মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায়? যিনি শিক্ষিত লোক তিনি পৃথিবী সম্বন্ধে বেশী জানেন। তাঁহার জ্ঞান ব্যাপক। সাধারণ শিক্ষায় ভিত্তিগত জ্ঞানই হইতেছে ভৌগোলিক, এবং সেই কারণে ভূগোল বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভূগোল একটি বিরাট বিষয়। পূর্বে প্রথম হইতেই ভূগোলের পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হইত। বর্তমানে ভৌগোলিক জ্ঞান দান সীমাবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে আমরা ভূগোল ততটুকুই শিক্ষাদান করিব, যতটুকু শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হয়। অতএব বয়স অনুযায়ী ভূগোল শিক্ষাদান অত্যন্ত সহজ ও সরল হইবে।

আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম দুই শ্রেণীতে যে ভৌগোলিক জ্ঞান দান করি তাহা প্রধানতঃ সাধারণ জ্ঞানের অনুগত এবং তাহা প্রধানতঃ ভূগোল এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয়। এই জ্ঞান সাধারণতঃ শিক্ষার্থীর বাসস্থানকে কেন্দ্রীভূত করিয়াই হইয়া থাকে, কারণ তাহার বাসস্থানই হইতেছে তাহার পৃথিবী। প্রাথমিক স্তরের দ্বিতীয় দুই বৎসরে বাসস্থান-কেন্দ্রিক ভৌগোলিক জ্ঞান সুদৃঢ় হয়। আমরা ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান আহরণের মধ্যে একটা ধারা আনিতে চেষ্টা করি, আমরা প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করি এবং ছাত্রছাত্রীরাও বুঝিতে পারে কেন ঐগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ। অন্ন বস্ত্র ও আবাস এই তিনটিই আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আমরা সেই জিনিসগুলি কি ভাবে পাই, সেইগুলি সম্বন্ধে আমরা ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান আহরণ করিতে সুযোগ দিয়া থাকি। এই সময়ে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের সীমারেখা বর্ধিত হয়। যে জ্ঞান তাহাদের গ্রামের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল তাহার এই সীমারেখা এখন গ্রাম বা নগরকে ছাড়াইয়া জেলা বা রাজ্য পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর তাহার দেশব্যাপ্তি ঘটে, এবং তাহার পর সমগ্র পৃথিবী সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা জন্মিয়া যায়। নিজস্ব বাসস্থান বা গ্রামের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোজক জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ভূগোল একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। ছাত্রছাত্রী যে কোন জীবিকা গ্রহণ করুক না কেন, ভূগোল তাহার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যতে কৃষকের কাজই করুক বা রাজনীতিবিদই হউক বা সে স্থানীয় প্রশাসকদের মধ্যে উচ্চ পদস্থ কর্মচারীই হউক, নিজস্ব গ্রাম্য-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান, দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং দেশ এবং বাকী পৃথিবীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধ, তাহার কাছে খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। **ভূগোল ছাত্রছাত্রীকে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে সাহায্য করিতে পারে।**

বর্তমান সময় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যা পড়ানোর ব্যবস্থা রহিয়াছে। সমাজবিদ্যা পাঠদ্বারা ছাত্রছাত্রী দেশের উপযুক্ত নাগরিক হইয়া উঠিবে। এই সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তিগত আসল বিষয়টি হইতেছে ভূগোল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিশেষ শিক্ষার সময় সমাজবিদ্যা শিক্ষার যে উদ্দেশ্যটি তাহাদের মধ্যে একটি মূল বিষয়ে ঐক্য আছে। দুই-ই ছাত্রছাত্রী-দিগকে সুনাগরিক করিয়া তুলিতে চায়।

তাহা হইলে ভূগোল শিক্ষাদানের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি হইল নিম্নরূপ :—

(১) ছাত্রছাত্রীরা যে জগতে বাস করে, সেই জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দান করা।

(২) ছাত্রছাত্রীরা বুঝিতে পারে ঠিক সেই জ্ঞান ব্যবহারিক ভাবে দেওয়া।

(৩) ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের জন্য তৈয়ারী করা।

(৫) ছাত্রছাত্রীদিগকে উপযুক্ত নাগরিক তৈয়ারী করা।

এইগুলিই হইল ভূগোল শিক্ষাদানের সাধারণ উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভূগোলের প্রাকৃতিক উপাদান

বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়,—(১) বিজ্ঞানসম্মত ও (২) মানবিক। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিত ইত্যাদি বিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং পক্ষান্তরে ইতিহাস ও সাহিত্য মানবিক বিষয়ের অন্তর্গত। কিন্তু ভূগোলের কথা আলাদা, এই বিষয়টি উভয় শ্রেণীরই অন্তর্গত।

বিজ্ঞানের দিক হইতে ভূগোল প্রাকৃতিক ও প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসম্মত বিষয় যেগুলির সঙ্গে ভূগোল যুক্ত তাহা হইতেছে গ্রহবিজ্ঞান, আবহাওয়া-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, এবং সামুদ্রিক বিজ্ঞান।

প্রত্যেকটি বিষয়ই বিরাট, প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা সম্ভব নহে, কিন্তু ভৌগোলিক ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি কতখানি ভূগোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাহা আমরা দেখিব।

গ্রহবিজ্ঞান আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া থাকে। পৃথিবীও একটি গ্রহ। পৃথিবীর আকৃতি, গতি, হেলান মেরুদণ্ড, দিবারাত্রি, ঋতু, অক্ষরেখা, দ্রাঘিমাংশ সকলই গ্রহবিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং ইহারা ভূগোলের একটি বিশেষ অংশও বটে। ভূগোলের গ্রহবিজ্ঞানের অংশ সম্পর্কে পাঠদান করিতে হইলে একটি ভাল গোলকের আবশ্যক, দিবারাত্রের পাঠ দিতে হইলে একটি অন্ধকার ঘরে গোলকের নিকটে একটি বাতি রাখিয়া দেখান যায় যে গোলকের একদিকে মাত্র বাতি হইতে আলোক পড়ে। গোলক ঘুরাইলে একদিক অন্ধকার হইতে আলোক আসে, আবার অন্যদিক আলোক হইতে অন্ধকারে চলিয়া যায়। এইভাবে দিবারাত্রি বুঝান যাইয়া থাকে। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার প্রাথমিক জ্ঞান দিবার জন্য একটি চৌকা আঁকা ব্ল্যাকবোর্ড (Squared Blackboard) দরকার, সমান্তরাল দিগন্ত পর্যন্ত রেখাগুলি দেখাইয়া শিক্ষক উহাদিগকে অক্ষরেখা এবং উপরে নীচে রেখা দেখাইয়া ঐগুলিকে দ্রাঘিমা রেখা বলিয়া ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি বলিতে পারেন। ছাত্রছাত্রীদের পরে গোলকের মধ্যে রেখাগুলি দেখাইয়া অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখায় বৈশিষ্ট্যগুলি বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

আবহাওয়া-বিজ্ঞান আবহাওয়া সংক্রান্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করে। কোন স্থানের জলবায়ু ঐ স্থানের আবহাওয়ার সমষ্টির গড়। জলবায়ু পৃথিবীর সর্বত্র। সর্বদেশে যে কোন স্থানের জলবায়ু সেই স্থানের মনুষ্য জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে; অর্থাৎ মানুষের অন্ন, বস্ত্র, আবাস এবং উপজীবিকা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু যে কোন স্থানে স্বাভাবিক উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া উহা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। জলবায়ুর প্রধান প্রধান তিনটি উপাদান হইল তাপ, চাপ ও বৃষ্টিপাত। এইগুলির পরিমাপ হয় তাপমান যন্ত্র (Thermometer), চাপমান যন্ত্র (Barometer) এবং বৃষ্টিমাপক যন্ত্র (Raingauge) দ্বারা। এই সমস্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিম্ন বুনিয়াদী ও প্রাথমিক স্তরে সহজেই করা যাইতে পারে। বাতাসের দিক, রৌদ্র, বৃষ্টি, মেঘলা দিন ইত্যাদির হিসাব

প্রতিদিন অনায়াসে নিম্নশ্রেণীতে রাখা যাইতে পারে। এই হিসাবই পরবর্তী সময়ে ঐ স্থানের জলবায়ু নির্ণয়ে কাজে লাগিবে। বিদ্যালয়ের উঁচু শ্রেণীতে চাপমান যন্ত্রের সাহায্যে চাপের রেকর্ড রাখা যাইতে পারে। ছাত্রছাত্রীর ভূগোল সম্বন্ধে ধারণা যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তিগত হয়, তবে খুব ভাল। এই কারণে জলবায়ু সম্পর্কিত, তথা আবহাওয়া সম্পর্কিত সমস্ত উপাদানগুলি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইলে ভাল হয়। কোন স্থানের আবহাওয়া সম্বন্ধে যদি ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয় তাহা হইলে অন্য যে কোন দেশের জলবায়ু বোঝান শিক্ষকের পক্ষে খুব কঠিন কাজ হইবে না। ভূ-পৃষ্ঠে তাপ বণ্টন সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা হইলে ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে নিরক্ষ-রেখা হইতে দূরে সরিয়া গেলেই তাপের মাত্রা কমিতে থাকিবে। তাহা ছাড়া একটি বিষয় ছাত্রছাত্রীদের বিস্ময় উদ্রেক করে। যখন ছাত্রছাত্রীরা উপরের দিকে উঠে, তখন সূর্যের নিকটবর্তী হয়। তাহাদের আরও বেশী গরম লাগিবার কথা, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহারা ঠাণ্ডা বোধ করে। শিক্ষক শিক্ষিকা এই প্রসঙ্গে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে সূর্যের তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হয় এবং সেই উত্তাপের বিকীরণ হয় বলিয়াই আমরা গরম বোধ করি। পর্বতগাত্রে এইরূপ উত্তাপের বিকীরণ কম হয়, তাহাতেই ঠাণ্ডা বোধ হয়। তাহা ছাড়া সমুদ্রেব সান্নিধ্যে নাতি-শীতোষ্ণ জলবায়ু ইত্যাদিও ছাত্রছাত্রীগণ লক্ষ্য করিয়া থাকে। তাহারা দেখে যে স্থলভাগের বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়, তখন সমুদ্রের উপরের ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া ঐ শূন্য স্থান পুরণ করে। এই বায়ু প্রবাহের ফলে সমুদ্র সন্নিকটস্থ ভূ-ভাগ বিশেষ গরম হয় না। এই দুইটি জিনিসও জলবায়ুর উপাদান। ভারতের বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু নির্ণয় কালে এই দুইটি উপাদানেরও বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

বায়ুপ্রবাহের ক্ষেত্রে চাপের উল্লেখ বিশেষভাবে করা যাইতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা চাপ সম্পর্কিত মূল কথাটি জানে। উচ্চ চাপ বিশিষ্ট স্থান হইতে বায়ু নিম্নচাপ বিশিষ্ট স্থানের দিকে ধাবিত হয়। গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাস হইতে পাতলা; অতএব গরমের অঞ্চল নিম্ন চাপ অঞ্চল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে উচ্চ চাপ বিশিষ্ট ৩০° ডিগ্রী অক্ষ-রেখার দিক হইতে নিম্ন চাপ বিশিষ্ট নিরক্ষরেখার দিকে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। বৃষ্টিপাতও বায়ুর সঙ্গে যুক্ত, কারণ সমুদ্র হইতেই জলপুষ্ট

বায়ু ভারতের স্থলভূমির দিকে প্রবাহিত হয়। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে উড়ন্ত বায়ু জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে এবং সেই জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু যদি শীতল বায়ুর সংযোগে আসে, তাহা হইলে বৃষ্টিপাত হয়।

ভূতত্ত্ব ভূপৃষ্ঠ-সম্পর্কিত আলোচনা। যেহেতু ভূগোল ভূপ্রকৃতি লইয়া আলোচনা করে, সেই হেতু যে বিজ্ঞান ভূপৃষ্ঠকে তাহার নানা উপাদান অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকে, সেই বিজ্ঞানকে আমরা একান্তভাবে অবহেলা করিতে পারি না। কি ভাবে সমতলভূমি ব-দ্বীপ ইত্যাদি নদী হইতে সৃষ্টি হইল, কেন হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি এত উচ্চ হইল, কেন কানাডাতে এতগুলি হ্রদ অবস্থিত, ইত্যাদি আমরা ভূতত্ত্ব হইতে জানিতে পারি। অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রীদের মনে, ভূগোল পাঠ করিতে গিয়া আগ্রহের সৃষ্টি হইবে, সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভূতত্ত্ব সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিদ্যালয়ের ভূগোলে স্থান পাইতে পারে।

(১) যে সমস্ত বহিঃস্থ প্রভাব ভূপৃষ্ঠকে পরিবর্তিত করে—

ইহার মধ্যে নদীর কাজ পড়ে; নদী ক্ষয় করে, ভরাট করে। হিমবাহের কাজ—হিমবাহ পর্বতগাত্র দিয়া নামিবার সময় অনেক কিছু ভাঙ্গে ও গড়ে। বাতাস—শুষ্ক অঞ্চলে নূতন কিছু গঠন করে। সমুদ্র-নিকটবর্তী উপকূল-সমূহ সমুদ্রের প্রভাবে অনেক সময় ভাঙ্গাগড়ার কবলে পড়ে।

(২) অন্তঃস্থ প্রভাবেও ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কোন জায়গা উঁচু হয়, কোন জায়গা খাদে পরিণত হয়। ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদির ফলে ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন হইয়া থাকে।

শ্রেণীতে কিছু ভূতত্ত্ব-সম্পর্কিত কাজও করা যাইতে পারে। শ্রেণীকক্ষে ঠিক কাজ করা চলিবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা। উদাহরণস্বরূপ নদীর কাজ পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে, কিংবা স্থানীয় যত প্রকার প্রস্তরখণ্ড আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া বৈশিষ্ট্য দেখা যাইতে পারে ইত্যাদি। ছবি দেখিয়া ইহাদের তাৎপর্যও বুঝিতে পারা যাইতে পারে।

মৃত্তিকা সম্বন্ধে খুব গভীরভাবে শ্রেণীতে আলোচনা করা চলিবে না, কিন্তু সাধারণ যে সব মৃত্তিকা আছে, যথা এঁটেলমাটি, বেলেমাটি, দোআঁশ মাটি ইত্যাদির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

সমুদ্র-বিজ্ঞানের সঙ্গেও ভূগোলের যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। পৃথিবীর কত ভাগ জল, কত ভাগ স্থল তাহা জানা দরকার। জলভাগ বিভিন্ন মহাদেশগুলিকে যুক্ত করিয়াছে। এই মহাসমুদ্রগুলি কোথায়, কতটা তাহাদের বিস্তৃতি, সবই আমাদের জানিতে হইবে। মানুষ মহাসমুদ্রের সাধারণতঃ ব্যবহার করে চলাচলের জন্য, অতএব সমুদ্রপথে যত বাণিজ্য হইয়া থাকে তাহা জানিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। মেরু অঞ্চলের বরফ-সমূহ মানুষের যাওয়ার পথে যে বিঘ্ন ঘটাইতেছে তাহাও জানা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে সুয়েজ ও পানামা খাল যে যাতায়াতের কত সুবিধা করিয়াছে, কত দূরত্ব যে কমাইয়া দিয়াছে, তাহাও জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আর একটি ব্যাপারে সমুদ্র মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহা হইতেছে বৃষ্টিপাত ঘটাইয়া। তাহা ছাড়া সমুদ্র-নিকটবর্তী অঞ্চল-গুলির তাপমাত্রা সুষম, ইহাও সমুদ্রের একটি অবদান—ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। এই সম্পর্কে সমুদ্রের স্রোতগুলিও জানা দরকার, কারণ উহারও মানবজীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বিষয়ক উপাদান

স্বাভাবিক উৎপাদনের সঙ্গে যেমন প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের সম্পর্ক তেমনই ভূগোলের সাথেও সম্পর্ক বর্তমান রহিয়াছে। স্বাভাবিক উৎপাদনের বণ্টন সাধারণতঃ জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। যেখানে তাপের মাত্রা বেশী এবং সারা বৎসরই বৃষ্টিপাত থাকে, যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলে, সেইখানে চির-শ্যামল বনভূমি। যেখানে বৃক্ষ জন্মিবার মত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় না, অথচ ঘাস জন্মিবার মত বৃষ্টিপাত হয়, সেইখানে বিরাট বিরাট তৃণভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন কানাডা এবং সাইবেরিয়াতে বিরাট তৃণভূমি রহিয়াছে। যেখানে তৃণ জন্মিবার মতও বৃষ্টিপাত হয় না, সেইখানে কাঁটা গাছ জন্মে এবং বিরাট বিরাট মরুভূমি দৃষ্ট হয়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ও হিমমণ্ডলের মাঝামাঝি স্থানে মোচাকৃতি চিরসবুজ সূচাল পত্রবিশিষ্ট গাছ জন্মে।

মোচাকৃতি গাছগুলি শীতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাই এই অঞ্চলে এই সব মোচাকৃতি বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক উৎপাদনের আবার একটি রীতি আছে। একই ধরণের স্বাভাবিক উৎপাদন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষের জীবনের উপর একই রূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনে, সেটা আমাজন নদীর বা কঙ্গো নদীর অববাহিকাতেই হউক না কেন, লোকবসতি কম। নদীর ধারে ধারে খুব কম সংখ্যক লোকই বাস করিয়া থাকে। ঐখানকার অধিবাসীরা সভ্যতার মান অনুযায়ী নিম্নমানের জীবন যাপন করে এবং বনের ফলমূল আহরণ করিয়া, মাছ ধরিয়া, শিকার করিয়া এবং সামান্য ভূমিতে চাষ করিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে। মরুভূমি অঞ্চলেও খুব কম সংখ্যক লোক বাস করিয়া থাকে। বেশীর ভাগ লোকেই যাযাবর, তাহারা এক মরূদ্যান হইতে অন্য মরূদ্যানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ভারতের আয়তনের শতকরা ১৫ ভাগের এক ভাগ হইল অরণ্যাঞ্চল এবং ভারতে ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব কম নয়। ভারত একটি বিরাট দেশ এবং এই খানে নানা রকমের জলবায়ু এবং নানা রকম তাহার অরণ্যাঞ্চল। ভারতীয় অরণ্যগুলি হইতে বহুমূল্য কাঠই শুধু উৎপন্ন হয় না। তাহা ছাড়া আরও ছোট ছোট নানা ধরণের জিনিসের উৎপাদন হইয়া থাকে, যথা পশুর খাদ্য, ঘাস, ফল, বাঁশ, লাক্ষা ইত্যাদি। এইগুলি আমাদের দেশের অরণ্যাঞ্চল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইয়া থাকে। অরণ্য সংরক্ষণের জন্য সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অরণ্য আরও বৃদ্ধি পায় সেই দিকেও সরকারের দৃষ্টি আছে। অরণ্যাঞ্চলের বৃক্ষাদি যাহাতে চুরি যাইতে না পারে, তাহার জন্য সরকার বনরক্ষী নিযুক্ত করিয়াছেন। কোন কোন অরণ্যে একই রকম বৃক্ষ থাকে। এইগুলি কাটার পর উহার স্থানে ঐ জাতীয় বৃক্ষ জন্মান হয়। মিশ্র অরণ্যাঞ্চলে, যেখানে বহু প্রকারের বৃক্ষ আছে, সেখানে সরকার একটি মূল্যবান বৃক্ষ কর্তিত হইলে, সেই স্থানে যেন অনুরূপ আর একটি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করে।

চাষ করিয়া যে ফসল পাওয়া যায় সেই সব ফসলের উৎপাদন বিভিন্ন অঞ্চল, তাহার জলবায়ু ও তাহার মাটির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যেখানে **ধান** উৎপাদন হয় না, সেখানে ধানের উৎপাদনের চেষ্টা বৃথা। ধান উৎপাদন হয় যেখানে অন্ততঃ পক্ষে তাপের মাত্রা থাকে ৭০° ফারেনহাইট এবং বৃষ্টিপাত

অন্ততঃ পক্ষে ৭০ ইঞ্চির উপর। মৌসুমী অঞ্চলে ধান ভাল জন্মে। **গম** জন্মে সামান্য বৃষ্টি অঞ্চলে। রৌদ্রের তাপও এই স্থানে বেশী প্রয়োজন। **ইক্ষুর** চাষ হয় ৬০ ইঞ্চি বাৎসরিক বৃষ্টিপাত হয় যেখানে, সেইখানে। **চা** উৎপন্ন হয় ৩০০ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টিপাত হয় যে সমস্ত স্থানে সেইখানে। অর্থাৎ ভারতের আসাম, দার্জিলিং, নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলে ইত্যাদি। এই ভাবে দেখা যায় বৃষ্টিপাত, উত্তাপ, জমি ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়াই ফসল উৎপাদিত হয়। ইচ্ছা করিলেই যেখানে সেখানে যে সে ফসল ফলিবে না। ভৌগোলিক কারণে উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিতে হয়। ফসলের স্বরূপ এবং উহার উপযুক্ত জলবায়ুর কথা শিক্ষক শিক্ষাদান কালে অবশ্য স্মরণ করিবেন।

প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে ভূগোলের বিশেষ যোগাযোগ রহিয়াছে। বাঘ, সিংহ, ক্যাঙ্গারু, জিরাফ প্রভৃতি জন্তু জানোয়ার ভৌগোলিক কারণে বিভিন্ন স্থানে দেখা যাইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রাণীগুলি সম্বন্ধে বেশী আলোচনা না করিলেও চলে, যেহেতু এইগুলি মানুষের জীবনের উপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে না। হাতী কিন্তু মানুষের জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, কারণ হাতীর দাঁত মানুষ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। মোচাকৃতি বনের যে সমস্ত লোমশ প্রাণী আছে সেই সমস্ত প্রাণীর লোমও মানুষের উপকারে আসে।

মৎস ধরা একটি প্রয়োজনীয় শিল্প। মৎস্য পৃথিবীর বহু লোকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। অগভীর উত্তর সাগর, জাপানের অন্তর্বর্তী সাগর, মৎস্য ধরার উপযুক্ত স্থান। শুধু টাটকা মাছই খাওয়া হয় না, যেখানে প্রচুর মৎস পাওয়া যায় সেখানে রান্না করা মাছ টিনে করিয়া সংক্ষরণ করা হয়, তারপর সেগুলি বিদেশে চালান হইয়া থাকে। এই দিক হইতে ইহার ভৌগোলিক তাৎপর্য রহিয়াছে। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, অতএব উহাদের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যও বর্তমান। যেমন মশা; মশা অনেক স্থানে আছে এবং উহা ম্যালেরিয়া জর ঘটাইয়া থাকে।

গরু, ঘোড়া, ছাগল, মেষ ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তু, ইহাদেরও ভৌগোলিক তাৎপর্য রহিয়াছে। এইগুলি কোন্ দেশে কি রকম পাওয়া যায় তাহাও জানিতে হইবে। মানুষ বিভিন্ন দেশে গৃহপালিত জন্তুর কি ভাবে ব্যবস্থা করিয়া থাকে তাহাও জানিতে হইবে। আমাদের ভারতের মত

বৃহৎ দেশে গরুর সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও গরুগুলি নিকৃষ্ট জাতীয়। অতএব যে উপকার আমাদের ঐ জন্তুগুলি হইতে পাওয়া উচিত তাহা আমরা পাই না। প্রচুর খাদ্যের অভাবই ঐগুলির নিকৃষ্টতার অন্যতম কারণ। যে সমস্ত জন্তু যে কোন বিশেষ আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাও জানা প্রয়োজন। যেমন মরুভূমি অঞ্চলের উট। উট মরুভূমি অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত প্রাণী, ইত্যাদি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানবীয় ভূগোল

ভূগোল কেবল কতকগুলি অসম্পর্কিত বিষয়ের সমষ্টি নহে। এক রকম ভৌগোলিক তথ্যের সাথে অন্য রকম ভৌগোলিক তথ্যের খুব নিকট সম্বন্ধ বর্তমান। ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্যই হইল এই সম্বন্ধগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়া বলা। অতএব ভূগোল শিক্ষায় সর্বদা কার্য ও কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অর্থাৎ যে সমস্ত উপাদান মানুষের জীবনকে প্রভাবান্বিত করিতেছে তাহা আমাদের ভূগোল শিক্ষাকালে জানা প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া মানব-জীবনের উপরে প্রাকৃতিক এবং প্রাণী বিষয়ক যে সমস্ত প্রভাব পড়ে এবং উহা কেন পড়ে তাহা আমাদের জানিতে হইবে। যতক্ষণ আমরা এই দুইটি বিষয়কে মনুষ্য জীবনে প্রভাব বিস্তারে বিবেচনা করিয়া দেখিব, তত-ক্ষণই আমরা ভূগোলের মধ্যে কার্যকারণের সন্ধান পাইব।

আমরা যখনই মানবীয় ভূগোল আলোচনা করিব, তখনই কিছুটা সাবধানতার সঙ্গে উহা আমাদের করিতে হইবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে মানুষ যান্ত্রিক বস্তু নহে এবং মানুষ পরিবেশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীলও নহে। একদল লোক হয়ত প্রাকৃতিক উৎসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, অপর এক দল হয়ত তাহা নয়। পশ্চিমবঙ্গে যে কয়লা মাটির তলায় রহিয়াছে, সে কয়লার উপযুক্ত ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের লোক করিতেছে। কিন্তু চীনদেশে কয়লা থাকিলেও, তাহার ব্যবস্থা চীনদেশবাসী সম্পূর্ণভাবে করিতে পারিতেছে না। অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এক স্থানে

মানুষ পরিবেশকে কাজে লাগাইতেছে, অপর স্থানে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে মানুষ স্বীয় বুদ্ধি ও পরিশ্রম বলে অনেক কার্য করিয়াছে, প্রকৃতির অনেক বাধা মানুষ দূর করিয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে রেলগাড়ী প্রচলন করিয়া মানুষ পার্বত্য অঞ্চলকে আর অপ্রবেশ্য করিয়া রাখে নাই। মরু-ভূমি অঞ্চলে জল সরবরাহ করিয়া ফসলের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং যে সমুদ্র অতিক্রম করা মানুষের কাছে পূর্বে অসম্ভব ছিল, তাহা আজ সম্ভব হইয়াছে। মানুষ বিমানের সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে যতই সময় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ততই মানুষ আর পরিবেশের উপর নির্ভরশীল রহিতেছে না।

মানুষ কতকগুলি প্রাকৃতিক বাধা অপসারণ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও দেখা যায় কতকগুলি ভৌগোলিক কারণে মানুষ কতকগুলি বাধাও আবার অতিক্রম করিতে পারিতেছে না ; যেমন এক জায়গায় হয়ত গম হয়, ধান হয় না, আবার আর এক জায়গায় হয়ত ধান হয়, গম হয় না। একে-বারেই যে হয় না এমন নয়, কিন্তু যে জিনিসটি বেশী পরিমাণে হয়, তাহার অনুরূপ পরিমাণে অন্য জিনিসটি হয় না। চেষ্টা করিলেও উপযুক্ত পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। ইহার কারণ একান্তই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ জলবায়ু। এই জলবায়ুকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বলিয়াই মানুষকে জলবায়ুর উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহা ছাড়া মানুষ যে বসতি স্থাপন করে, তাহাও ভৌগোলিক কারণের উপর নির্ভর করিয়া করে। যেখানে জীবন সহজ ভাবে যাপন করা যায়, সেইখানে বসতি অত্যন্ত ঘন। নদী উপত্যকাসমূহের মাটি শস্য উৎপাদনের পক্ষে ভাল এবং সেইখানকার তাপমাত্রা ও বৃষ্টিমাত্রা যদি উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে বহু লোক সেইখানে আসিয়া বাস করিতে থাকিবে, কারণ সেইখানে প্রচুর ফসল উৎপাদতি হইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে পার্বত্য অঞ্চলে বেশী ফসলও উৎপাদন হয় না আর বেশী মানুষও আসিয়া সেই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে না। মরুভূমি অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার, এই কারণে সেইখানে লোক বসতি ঘন নয়।

মানুষের বসতির ন্যায়, মানুষের জীবিকা অর্জনও ভৌগোলিক কারণের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা যেখানে উপযুক্ত, সেইখানে শস্য উৎপাদন একটি বিশেষ উপজীবিকা।

যেখানে কয়লা, তৈল, এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ আছে এবং যেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সহজ, সেইখানে বিভিন্ন শিল্প প্রচেষ্টাও গড়িয়া উঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে লৌহের নিকটে কয়লা ছিল বলিয়াই জামসেদপুর টাটা কারখানার মত একটি বিরাট কারখানা গড়িয়া উঠা সম্ভব হইয়াছিল। ভারতের অন্যান্য স্থানে কয়লার অভাব বলিয়াই সেই সমস্ত স্থানে শিল্পোন্নতি উপযুক্ত রকম হইতে পারে নাই। যে সমস্ত শিল্পের উন্নতি হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানে স্থানে বাণিজ্যেরও উন্নতি হইয়াছে। আবার বাণিজ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা। বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন ও যাতায়াতের ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে।

মানুষের জীবন দিন দিনই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে, সরকারী প্রশাসন বিভাগও জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে। মানুষ কি ভাবে বিভিন্ন স্থানে বাস করে এবং কি ভাবে তাহারা সরকারী তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, তাহা ভালরূপে না জানিলে ভৌগোলিক শিক্ষা ভালভাবে হয় না।

মানবীয় ভূগোলের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত পর্যায়ে উহাদিগকে পরপর ভাগ করিয়া লইলে কার্য-কারণ সম্পর্ক সহজে স্থাপন করা যাইবে; যথা—লোকসংখ্যা, উপজীবিকা কৃষি ও শিল্প, শহর, যাতায়াত, সামাজিক জীবন, সরকার। অবশ্য এই রকম ধারাবাহিকতা যে সর্বক্ষেত্রেই রক্ষিত হইবে এমন নহে, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে উপরে যেভাবে সাজান হইয়াছে উহা অত্যন্ত যুক্তি-সঙ্গত ভাবে সাজান। অবশ্য অনেক সময় বিদ্যালয়ে যুক্তির চেয়ে মনস্তত্ত্ব বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে অনেক সময়ে বিশেষ করিয়া নীচু শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিক আগ্রহ আকর্ষণকারী বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে অন্য দিকে ছড়াইয়া পড়া যায়, ইহাতে ছাত্রছাত্রীরা বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে পার্বত্য অংশ সম্বন্ধে পাঠ দিতে গিয়া সকলের পূর্বে হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি দেখাইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহার পর বিশ্লেষণের দিকে পাওয়া যাইতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আঞ্চলিক ভূগোল

আঞ্চলিক ভূগোল শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে প্রাকৃতিক অঞ্চল বলিতে কি বুঝিতে পারা যায়, তাহা জানা প্রয়োজন। একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল সাধারণতঃ নিকটস্থ অপর প্রাকৃতিক অঞ্চল হইতে বিভিন্ন। যেমন দাক্ষিণাত্য একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চল। এই অঞ্চলের সঙ্গে সংলগ্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। আবার গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের সঙ্গে সংলগ্ন হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের পার্থক্য রহিয়াছে। ইহারা প্রত্যেকটিই এক একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল।

যখনই আমরা কোন একটি ভৌগোলিক অংশ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করি, তখন সেই অংশটিকে আমরা সমগ্রভাবে শিক্ষাদান করিয়া থাকি। কিন্তু বিস্তৃতভাবে যদি ঐ অংশের শিক্ষাদান প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমরা কি করি? আমরা উহাকে কয়েকটি অংশে ভাগ করিয়া লই। উহা আমরা কি নীতিতে বিভক্ত করি? কোন কোন সময় আমরা রাজনৈতিক বিভাগ হিসাবে বিভক্ত করিয়া লই, আবার কোন কোন সময়ে আমরা ঐ ইউনিটকে কতকগুলি এমন অংশে বিভক্ত করি, যাহারা প্রকৃতিগতভাবে একটি হইতে অন্যটি পৃথক। শেষোক্ত পদ্ধতিটিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ভূগোল শিক্ষাদানে যদি আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট মানুষের কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব দিতে চাই, তাহা হইলে ভূগোল শিক্ষায় প্রাকৃতিক অঞ্চলকে বিশ্লেষণ করিয়া উহা পাঠ দান করাই একান্ত প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলির ভাগ নিম্নে দেওয়া হইল :—(১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল (২) গাঙ্গেয় সমতল উপত্যকা (৩) দাক্ষিণাত্য অঞ্চল (৪) পূর্ব ও পশ্চিমের উপকূল ভাগ। কানাডার প্রাকৃতিক অঞ্চলকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) রকিপর্বতমালার এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল, (২) উত্তর ভাগের তুন্দ্রা অঞ্চল, (৩) পশুচারণ ভূমি (৪) সেন্ট লরেন্স নদীর অববাহিকা।

কোনও মহাদেশকে প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করিতে হইলে দুই ভাবে উহা করিতে পারা যায় ; এক ভাবে, ভূপ্রকৃতির উপর, অন্যভাবে, জলবায়ুর উপর। উদাহরণ স্বরূপ এশিয়া মহাদেশের অঞ্চল গুলি বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। **ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী**—(১) উত্তরের নীচু ভূমি

(২) মধ্যভাগের উচ্চভূমি

(৩) দক্ষিণের মালভূমি

(৪) বড় বড় নদীর উপত্যকাসমূহ।

জলবায়ু অনুসারেও এশিয়াকে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে তাহার বিভাগ দেওয়া হইল।

(১) তুন্দ্রা অঞ্চল (২) মোচাকৃতি অরণ্য অঞ্চল (৩) তৃণভূমি (৪) শীতল মরুভূমি (৫) উত্তপ্ত মরুভূমি (৬) নাতিশীতোষ্ণ অরণ্যসমূহ, (৭) মৌসুমী অঞ্চল (৮) নিরক্ষীয় অঞ্চল।

উত্তর আমেরিকাকেও এইরূপে দুই ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে কি ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু আঞ্চলিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার পূর্বে কি করা প্রয়োজন? অনেক শিক্ষবিদ্ বলেন যে, আঞ্চলিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিবার পূর্বে মানসিক ও অর্থনৈতিক ভূগোলের দিক হইতে পৃথিবী সম্বন্ধে একটু মোটামুটি ধারণা ছাত্রছাত্রী-দিগকে পূর্বেই দিতে হইবে, ইহা আঞ্চলিক পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিবার পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উপযুক্ত ভাবে যদি বিষয়বস্তু ছাত্রছাত্রীদের নিকটে উপস্থিত করা যায় তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহের উদ্রেক হইবে। শিক্ষাদান করিবার সময় শিক্ষক বিষয়বস্তুকে যথাসম্ভব সরস করিবেন। তিনি মানুষের জীবন কি ভাবে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল তাহার মধ্য দিয়া কিংবা পরিভ্রমণের মধ্য দিয়া কিংবা ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন খাদ্য, পোষাক আশ্রয় ইত্যাদির সাথে তুলনামূলক ভাবে বিচার করিয়া ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিবেন। খাদ্য, পোষাক আশ্রয় ইত্যাদি সমস্যা সার্বজনীন, পৃথিবীর সকল লোকেরই এ চাহিদা, অতএব এই মানবীয় চাহিদার ভিতর দিয়াই শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের অনেক কিছু শিক্ষা দিতে পারিবেন। ধীরে ধীরে আঞ্চলিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার জন্য ভিত্তি প্রস্তুত হইয়া আসিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভূগোল শিক্ষাদান-পদ্ধতি

ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা

(১) **ভূগোল পাঠে মানুষের বাসভূমি পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়।** অপর দিকে পৃথিবীর অধিবাসী, নানা জাতির মানুষ ও তাহাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়।

পৃথিবী অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। যে নিজের গ্রাম বা জেলা বা রাজ্য হইতে বাহিরে অন্যত্র কোথাও যায় নাই, তাহার পক্ষে বহির্জগতের সম্বন্ধে খবর রাখা এবং সেই ভাবে নিজেকে সময়ের গতির সঙ্গে প্রস্তুত করাও সম্ভব হয় না। কিন্তু ভূগোল পাঠ করিলে পৃথিবীর সমস্ত স্থানের খবরই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

(২) **মানুষের উপর প্রকৃতির প্রভাব এবং প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়।** অর্থাৎ প্রকৃতির প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর কি পরিবর্তন হইয়াছে এবং মানুষের চেষ্টায় পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার কি পরিবর্তন হইয়াছে জানা যায়।

উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে স্থানে খুব বেশী বৃষ্টিপাত হয় এবং যে স্থানের জমি উর্বর সেইখানের মানুষ চাষ করিয়া ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। আবার সমুদ্র-তীরবর্তী লোকেরা মাছ ধরিয়া জীবিকা অর্জন করে। পাহাড়-পর্বতে বাস এবং সমতল ভূমিতে বাসের তারতম্যে মানুষের জীবনের যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা ভূগোল পাঠের সাহায্যেই এইরূপ পরিবর্তনের বিষয়ে সম্যক জানিতে পারি।

(৩) **ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতা লাভের সাহায্য হয়।** ভূগোল পাঠেই পৃথিবীর কোন্ অংশে কি কি জিনিষ উৎপন্ন হয় বা প্রস্তুত হয় এবং কোন্ অংশে কোন্ কোন্ জিনিষের অভাব আছে জানা যায়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন স্থানের যাতায়াতের এবং সেই সকল স্থানে জিনিষ-পত্র আমদানী-রপ্তানীর উপায় সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ হয়। এই দুই বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতা লাভ করা যায় না।

(৪) **ইতিহাস, সাহিত্য** প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার সাহায্য হয়।

(৫) চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা ও বিচার-শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়।

(৬) নানা দেশের ও নানা জাতির মানুষ এবং তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের ফলে **ছাত্রের মন ও দৃষ্টি উদার হয়** এবং সে আপনাকে পৃথিবীর একজন বাসিন্দা (citizen) বলিয়া ভাবিতে শিখে।

(৭) ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে জানা যায়। কিন্তু ভ্রমণ করা ত সকলের ভাগ্যে হইয়া উঠে না। বিদেশকে মনশ্চক্ষে দেখিতে পারা যায়, যদি ভূগোলের সাহায্য লওয়া যায়। ভ্রমণ যেমন মানুষকে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন করিয়া তোলে, সেইরূপ ভূগোল পড়ার ফলেও মানুষ উদার মনোভাবাপন্ন হইয়া থাকে। মানুষ নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করিয়া বিদেশ পরিভ্রমণ করে। সেইরূপ ভূগোল পাঠের সময়েও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া ভূগোল পাঠ করা উচিত, তাহা হইলে ভূগোল পাঠ সার্থক হইবে।

(৮) সর্বশেষ সৃষ্টির নানা বৈচিত্র্য ও অপরূপ সৌন্দর্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের ফলে **স্রষ্টার প্রতি ভক্তি জন্মে।**

ভূগোল এবং উহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক ধারণা

পূর্বকালে ভূগোল বলিলে কেবল সৌরজগতের একটা উপগ্রহ হিসাবে পৃথিবীর বর্ণনা বুঝাইত। ইহার ফলে নানা মহাদেশ ও তাহার ভাগ, বিভাগ, সাগর, উপসাগর, হ্রদ, পর্বত, নদী প্রভৃতির নামের সুদীর্ঘ তালিকাকেই ভূগোল বলা হইত এবং তাহা মুখস্থ করিতে পারিলেই ভাল ভূগোল শিক্ষা হইয়াছে মনে করা হইত। **বর্তমান সময়ে মানুষের বাসভূমি হিসাবেই পৃথিবীর জ্ঞানকে ভূগোল বলা হয়।** অর্থাৎ মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী এবং মানুষের জীবনের উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞান দান করাই এখন ভূগোলের একমাত্র কাজ। অপর দিকে পূর্বকালে **যৌক্তিক** (logical) প্রণালীতে ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রথমেই পৃথিবী বা বিশ্বমণ্ডলে যাহা কিছু আছে তাহার সংজ্ঞা শিক্ষা দেওয়ার পর ভূমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ক্ষুদ্রতম ভাগ, বিভাগ পর্যন্ত সকল বিষয়ের জ্ঞান দান করা হইত। **বর্তমান সময়ে মনোবিজ্ঞান-সম্মত** (Psychological) **পদ্ধতিতেই ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয়।** নানা ভৌগোলিক বস্তু বা প্রাকৃতিক ঘটনার সংজ্ঞা শিক্ষা না দিয়া সেই সকল **বস্তু** বা **ঘটনা** বা তাহাদের **আদর্শ** ও **চিত্র** দেখাইয়া

বর্ণনার সাহায্যেই তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হয়। ছাত্রের গৃহ বা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতেই ভূগোল শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তার করিয়া সমগ্র ভূমণ্ডলের জ্ঞান দেওয়া হয়। দেশ, নগর, নদনদী, হ্রদ প্রভৃতির নামের তালিকা মুখস্থ না করিয়া **মানচিত্রের সাহায্যেই** তাহাদের নাম ও অবস্থান স্মরণ রাখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক ভূগোলের বর্ণনা মুখস্থ না করাইয়া যত দূর সম্ভব পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে তাহাদের জ্ঞান অর্জন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী, তাহাদের ব্যবহার্য প্রাকৃতিক ও শিল্পজ বস্তুর উৎপত্তি স্থান, তাহাদের ভাষা, ধর্ম, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধেও জ্ঞান দেওয়া হয়। সর্বশেষে, বর্তমান সময়ে প্রত্যেক প্রাকৃতিক অবস্থা বা কাজ, এমন কি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জিনিষের উৎপত্তি ও মানুষের জীবন-যাত্রা প্রণালীর নানা বৈচিত্র্য প্রভৃতির **কারণ নির্দেশেরও চেষ্টা করা হয়।**

ভূগোলকে প্রাকৃতিক এবং মানবীয় (Naturalistic and Humanistic) **বিষয়ের সঙ্গমস্থল বলা হয় কেন?**

প্রকৃতি বা মানব-জীবনের সহিত কোন বিষয়ের সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া তাহাকে প্রাকৃতিক বা মানবীয় বিষয় বলা হয় (শিক্ষা ২য় ভাগ ২২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। **প্রকৃতি ও মানব-জীবন এই উভয়ের সহিত ভূগোলের সম্পর্ক আছে।** কেননা মানুষের বাসভূমি হিসাবে ভূমণ্ডলের জ্ঞান দিতে হইলে **একদিকে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা, অপর দিকে তাহার অধিবাসী মানুষের জীবন-যাত্রা প্রণালী এই উভয়েরই জ্ঞান দিতে হইবে।** পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা বা প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞান দানের জন্য জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, ভূতত্ত্ব (Geology), প্রাণিতত্ত্ব (Zoology) প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়ের সাহায্য লইতে হয়। সুতরাং ইহা একটা প্রাকৃতিক বিষয়। অপর দিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূগোলকে মানবীয় বিষয় বলিতে হইবে। কেননা ইহাদের সহিত মানব-জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ভূগোল শিক্ষাদানের সময় যে কেবল এই উভয় বিষয় শিক্ষা দিতে হয় তাহা নহে, তাহাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রভাব সম্বন্ধেও জ্ঞান দিতে হয়। তাই ভূগোলকে প্রাকৃতিক ও মানবীয় বিষয়ের সঙ্গমস্থল বলা হয়।

ভূগোল শিক্ষাদানের কতিপয় বিশেষ নিয়ম

(১) নানা ভৌগোলিক জিনিষের বা কাজের, তৈয়ারী সংজ্ঞা শিক্ষা না দিয়া সেই সকল জিনিষ বা কাজ, অথবা তাহাদের আদর্শ বা ছবি দেখাইয়া তাহাদের **বর্ণনার আকারেই সংজ্ঞা শিক্ষা দিতে হইবে।** তাহা ছাড়া প্রথমেই এক সঙ্গে সমস্ত সংজ্ঞা শিক্ষা না দিয়া, যখন যেটির দরকার হয় তখন তাহা শিক্ষা দেওয়া বিধেয়।

(২) **প্রথমে শিশুকে তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূভাগের জ্ঞান দিয়া** এবং তাহাকে ভিত্তি করিয়াই অন্য স্থানের ভূগোল শিক্ষা দিতে হইবে।

(৩) **যত দূর সম্ভব মানুষের জীবনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া** ভূগোল শিক্ষা দিতে হইবে।

(৪) কোন দেশের ভূগোল শিক্ষাদানের সময় সেই দেশ ও তাহার অধিবাসিগণের জীবন-যাত্রা প্রণালীর যত বেশী সম্ভব **চিত্র দেখাইতে হইবে।** বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(৫) প্রধানতঃ **পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যেই প্রাকৃতিক ভূগোল শিক্ষা দিতে হইবে।** যে স্থলে ইহাদের কোনটার সাহায্য লওয়া সম্ভব হয় না, সে স্থলে নক্সা ও চিত্রের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যায়।

(৬) কোন দেশের ভূগোল শিক্ষা দেওয়ার সময় তাহার প্রাকৃতিক অবস্থা, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদির জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন। তাহার পরেই তাহার রাজনৈতিক ভূগোল শিক্ষা দেওয়া যায়। কেননা প্রধানতঃ প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবই রাজনৈতিক ভূগোলকে রূপ ও আকার দেয়।

(৭) **প্রধানতঃ মানচিত্রের সাহায্যেই রাজনৈতিক ভূগোল শিক্ষা দিতে হইবে।** কেননা কেবল পুস্তকের বর্ণনা পড়িয়া ছাত্রগণ কোন দেশের সঠিক ধারণা করিতে পারে না। মানচিত্রের সাহায্যেই তাহারা সেই সকল দেশের মানসিক ছবি গঠন করিতে পারে। রাজনৈতিক ভূগোল শিক্ষাদানের জন্য ছাত্রগণকে মানচিত্রের সহিত যতদূর সম্ভব সুপরিচিত করিতে হইবে, যেন তাহাদের মানসপটে মানচিত্রের ছবি অঙ্কিত হয়। খুব যত্নের সহিত তাহাদিগকে মানচিত্র অঙ্কণ শিখাইতে হইবে এবং তাহাদের দ্বারা যত বেশী সম্ভব মানচিত্র আঁকাইতে হইবে। যখনই সম্ভব ভূগোলের প্রত্যেক পাঠে প্রদত্ত জ্ঞানকে মানচিত্রের সাহায্যে চিত্রিত (Illustrated) করিতে দিতে

হইবে। এমন কি, কোন স্থানের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল শিক্ষা দানের জন্যও নানা প্রকার মানচিত্রের ব্যবহার করিতে হয়। সর্বশেষে উচ্চস্তরের ছাত্রগণকে নানা মানচিত্রের সাহায্যে এক এক দেশের ভৌগোলিক কাহিনী প্রস্তুত করিতেও দেওয়া যায়। বস্তুতঃ মানচিত্রের সাহায্য ব্যতীত ভূগোল শিক্ষা দেওয়াই সম্ভব নহে এবং আধুনিক ভূগোলের জ্ঞান ও মানচিত্রের জ্ঞান প্রায় এক বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য Sir Halford Mackider **মানচিত্রকে ভৌগোলিকের সর্বপ্রধান যন্ত্র বলিয়াছেন।**

(৮) নানা দেশ, নগর, হ্রদ, নদী, পর্বত প্রভৃতির নামের তালিকা মুখস্থ করিতে শিক্ষা না দিয়া **অঙ্কিত মানচিত্রে তাহাদের অবস্থান দেখিয়া নাম বলিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত।** তাহা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কিছু বর্ণনা দেওয়াও আবশ্যক। তাহা হইলেই ছাত্রগণ পরিচিত জিনিষের ন্যায় সেগুলি মনে রাখিতে পারিবে।

(৯) কোন অতীত বা বর্তমান ঘটনার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বিভিন্ন দেশের বা স্থানের জ্ঞান দান করিলেই ছাত্রগণ তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে ও মনে রাখিবে।

(১০) রাজনৈতিক ভূগোল সর্বদা পরিবর্তনশীল। সুতরাং সর্বাপেক্ষা **আধুনিক তথ্য সংগ্রহ করিবার এবং সর্বাপেক্ষা আধুনিক মানচিত্রের সাহায্যে** এই বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে।

(১১) **যতদূর সম্ভব কারণ ও ফল সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ভূগোল শিক্ষা দিতে হইবে।** একটা বড় সহরের কেবল বর্ণনা শিক্ষা না দিয়া তাহার বড় হওয়ার কারণও নির্দেশ করিতে হইবে। কোন দেশের জলবায়ু সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়ার সময়ে কি কি প্রাকৃতিক প্রভাবের ফলে তাহার জলবায়ু বিশেষ আকার লাভ করিয়াছে এবং তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের জ্ঞান দেওয়ার সময়ে, কিরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা কোন স্থানে সেই সকল জিনিষের উৎপত্তির সাহায্য করিয়াছে তাহাও বলিতে হইবে। বিশেষতঃ উচ্চস্তরে এইরূপ কারণ ও ফল সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই ভূগোল শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

(১২) ভূগোল শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য **যত বেশী ভৌগোলিক পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায়** ততই ভাল। অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন দেশের ভূগোল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল **দেশ ভ্রমণের কাহিনী পাঠ করিলেও** এই উদ্দেশ্য কিছু পরিমাণে সিদ্ধ হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন স্তরে ভূগোল শিক্ষাদান-পদ্ধতি

প্রাথমিক স্তর

(ক) **গল্পে ভূগোল।** শিশুগণ গল্পপ্রিয়। তাই প্রথমে গল্পের ভিতর দিয়াই তাহাদের ভূগোল শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলের অধিবাসিগণের জীবন-যাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে গল্প বলিলে তাহারা আনন্দের সহিত শুনিবে এবং সেই সকল অঞ্চলের সাধারণ ভৌগোলিক জ্ঞান লাভ করিবে। যথা,—ভারতীয় কুকী, নাগা, খাসিয়া প্রভৃতি পার্বত্য জাতি এবং অন্যান্য দেশের এস্কিমো, ল্যাপ, রেড ইণ্ডিয়ান, কাফ্রি, বেদুইন প্রভৃতি জাতির গল্প বলা যায়। এই সকল গল্প বলিবার সময়ে **যত বেশী সম্ভব ছবি দেখাইতে হইবে** এবং যখনই সম্ভব শিক্ষকের **নিজ জীবন-যাত্রা-প্রণালীর সহিত তুলনা করিয়া বর্ণনা দিতে হইবে।** কোন বৈদেশিক জাতির গল্প বলিবার সময়ে **মানচিত্রে সেই দেশ দেখানও প্রয়োজন।**

(খ) **সংজ্ঞা শিক্ষা দান।** এই স্তরে শিশুগণ যে সকল ভৌগোলিক বস্তু বা কাজের সহিত পরিচিত হওয়া সম্ভব কেবল তাহাদের সংজ্ঞা পূর্বোক্ত প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হইবে। যে সকল বস্তু প্রদর্শন সম্ভব নহে, কাদা, বালু, প্লাষ্টিসিন (Plasticine), কাগজের মণ্ড (Paper-pulp) প্রভৃতির সাহায্যে তাহাদের আদর্শ নির্মাণ করিয়াই বর্ণনার আকারে সংজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া যায়। ভৌগোলিক সংজ্ঞার মানচিত্রে এই সকল জিনিষের ছবি থাকে। তাহার সাহায্যেও ভৌগোলিক সংজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া যায়। এই স্তরে শিশুগণকে নানা ভৌগোলিক জিনিষের আদর্শ প্রস্তুত করিতেও শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহা সংজ্ঞা শিক্ষায় সাহায্য করিবে।

(গ) **পরিবেষ্টনীর জ্ঞান দান।** পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শিশুর ভূগোল শিক্ষা তাহার গৃহ বা স্কুল-প্রাঙ্গণ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথমে তাহাকে তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে হইবে। চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি সমতল না উচ্চনীচ, বৃষ্টির জল কোন্ দিকে প্রবাহিত হয়; মাটী এঁটেল, না বালুকাপূর্ণ, না কঙ্করময়, তথায় কি কি বৃক্ষলতা জন্মে;

কি কি ফসল আবাদ হয়; গ্রামে বা নগরে কি কি শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়, কোন্ কোন্ নদী পর্বত আছে, কোন্ জাতির বা বর্ণের লোকের বাস, তাহারা কি কি উপায়ে জীবন ধারণ করে; স্থানীয় হাট-বাজারে কি কি জিনিষ বিক্রয় হয় এবং সেগুলি কোথা হইতে আসে; গ্রামে বা নগরে কোন্ কোন্ হাট, বাজার, অফিস, ধর্মমন্দির প্রভৃতি আছে; স্থানীয় রাস্তা, খাল, রেলওয়ে প্রভৃতির সাহায্যে কোথায় কোথায় যাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান দিতে হইবে। শিক্ষক শ্রেণীতে মৌখিক পাঠ না দিয়া, শিশুগণকে বাহিরে লইয়া গিয়া চারি দিকের ভূভাগ দেখাইবেন এবং উপরিউক্ত বিষয়সমূহের জ্ঞান সংগ্রহ করিতে সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক শিশুর নিকট এক একটা নোট বই থাকিবে এবং শিক্ষক তাহাতে পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিখাইয়া দিবেন। পারিপার্শ্বিক ভূভাগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া শিশুগণ যে জ্ঞানলাভ করিবে তাহাকে ভিত্তি করিয়াই তাহাদিগকে পরে দূরতর ও বৃহত্তর স্থানের ভূগোল শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) **প্রাকৃতিক ভূগোল শিক্ষাদান**। এই স্তরে ছাত্রগণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে প্রাকৃতিক ভূগোলের সাধারণ জ্ঞান লাভ করিবে। চিত্রের সাহায্যেও তাহাদের জ্ঞান সঠিক ও সুস্পষ্ট করিতে হইবে। তবে তাহারা নানা প্রাকৃতিক অবস্থা ও কাজ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা করিবে মাত্র, তাহাদের কারণ শিখিতে পারিবে না।

পর্যবেক্ষণের সাহায্যে শিক্ষণীয় বিষয়:—সূর্যের উদয়-অস্ত দেখিয়া দিক্ নির্ণয়, পরে কম্পাসের সাহায্যে দিক্ নির্ণয়; দিবসের বিভিন্ন ভাগে আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখিয়া আনুমানিক সময় নির্ণয়; দিবসের বিভিন্ন ভাগে ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিয়া সময় নির্ণয় এবং ঘটিকা যন্ত্রের সাহায্যে তাহার সত্যতা নির্ধারণ বা সমর্থন, বায়ুপ্রবাহের গতি নির্ধারণ; চন্দ্রের উদয়-অস্ত, হ্রাসবৃদ্ধির সময় নির্ধারণ ও জোয়ার-ভাঁটার সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপন; পৃথিবী যে গোল তাহার সহজ সহজ প্রমাণ সংগ্রহ ইত্যাদি।

পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষণীয় বিষয়:—প্রদীপ ও ভূগোলকের সাহায্যে দিবারাত্রির কারণ নির্ণয় এবং চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের কারণ নির্ণয়, বাষ্প ও মেঘের উৎপত্তি এবং বৃষ্টিপাতের কারণ নির্ণয় ইত্যাদি।

এইরূপে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার পর চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা লিখিবে এবং পুস্তকের বর্ণনা পড়িয়া তাহা স্মরণ

রাখিবে। কিন্তু কেবল পুস্তক পড়িয়া প্রাকৃতিক ভূগোল শিক্ষা করিতে পারে না।

(ঙ) **মানচিত্রের ব্যবহার ও রাজনৈতিক ভূগোল শিক্ষাদান**। শিশুর রাজনৈতিক ভূগোল শিক্ষাও তাহার নিজ গ্রাম বা নগর হইতে আরম্ভ হইবে এবং ক্রমশঃ তাহার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া ভূমণ্ডল পর্যন্ত পৌছিবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মানচিত্র-অঙ্কন এবং মানচিত্রের ব্যবহারও শিক্ষা দিতে হইবে।

নক্সা-অঙ্কন। এই উদ্দেশ্যে তাহাকে প্রথমে শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের নক্সা আঁকিতে দেওয়া হইবে। শ্রেণীকক্ষের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপিয়াই সে বুঝিতে পারিবে যে, এত বড় আকারের নক্সা সে কাগজে আঁকিতে পারে না। তখন তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে কিরূপে বড় আকারের জিনিষ ছোট আকারে আঁকা যায়। যথা, বাস্তব আকার ১০ ফুট হইলে নক্সায় তাহাকে ১ ইঞ্চি ধরা যায় ১″=১০′। এইরূপে তাহার স্কেলের ধারণা হইবে। একই নক্সা বিভিন্ন স্কেলে আঁকিতে দিলে, স্কেল সম্বন্ধে আরও সঠিক ধারণা হইবে। ইহার পর তাহাকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের নক্সা আঁকিতে দেওয়া যায়, তাহাতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সীমা, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘর, বাগান, খেলার মাঠ ইত্যাদি দেখাইতে হইবে।

ইহার পর ছাত্রগণ তাহাদের নিজ গ্রাম বা নগরের নক্সা আঁকিবে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক প্রথমে ছাত্রগণকে লইয়া সমস্ত গ্রাম বা নগর ঘুরিয়া আসিবেন, তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিরূপণ করিবেন এবং বড় বড় বাড়ী, রাস্তা, পুকুর, বাজার, পোষ্ট-অফিস, ধর্মমন্দির প্রভৃতির অবস্থানও নির্দেশ করিয়া নোট করিতে বলিবেন। বিদ্যালয়ে ফিরিয়া ছাত্রগণের সহযোগিতায় শিক্ষক গ্রামের বা নগরের নক্সা তৈয়ার করিবেন এবং ছাত্রগণ নিজ নিজ খাতায় তাহা আঁকিয়া লইবে। (কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে বাস করিলে, তাহাদের নিজ মহল্লার নক্সা আঁকিলেই হইবে।)

এইরূপে স্থান দেখিয়া কয়েকটি নক্সা আঁকিলে ছাত্রগণ ম্যাপকে কেবল একটা ছবি মনে না করিয়া তাহা দেখিয়া বাস্তব স্থানের ধারণা করিতে পারিবে।

গ্রাম বা নগর হইতে বৃহত্তর স্থান দেখিয়া নক্সা আঁকা সম্ভব নহে। সুতরাং ইহার পর ছাত্রগণকে ছাপা ম্যাপের সহিত সুপরিচিত করিতে হইবে।

ছাপা ম্যাপ ব্যবহার করিবার পূর্বে তাহাতে ভৌগোলিক জিনিষ বা স্থানের জন্য যে সকল চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাহার সহিত ছাত্রগণকে সুপরিচিত করিতে হইবে, যেন সে সকল চিহ্ন দেখিয়া তাহারা প্রকৃত জিনিষ বা স্থানের কথা চিন্তা করে। যেমন নগর, হ্রদ, পর্বত, নদী ইত্যাদির চিহ্ন দেখিয়া তাহারা যেন প্রকৃত নগর, হ্রদ, পর্বত ইত্যাদির কথা চিন্তা করে। ইহা ছাড়া ম্যাপের স্কেলের দিকেও তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে এবং ছাপা ম্যাপ মাপিয়া স্কেলের সাহায্যে দেশের আয়তন নির্ধারণ করিতেও শিক্ষা দিতে হইবে।

রাজনৈতিক ভূগোল পাঠ

এইক্ষণে ছাপা ম্যাপের সাহায্যে তাহাদের জেলা ও প্রদেশের বিস্তারিত ভূগোল শিক্ষা দিতে হইবে। রাজনৈতিক ভূগোলের পাঠে শিক্ষক প্রথমে বড় মানচিত্রের সাহায্যে বর্ণনা দিবেন, ২।১ জন ছাত্রকেও মানচিত্রে বর্ণিত স্থানগুলি নির্দেশ করিয়া দিতে পারেন। অন্যান্য ছাত্রগণ নিজ নিজ ভূচিত্রাবলী বা পুস্তকের মানচিত্র সামনে খুলিয়া রাখিবে ও তাহার সাহায্যে শিক্ষকের বর্ণনা অনুসরণ করিবে। তাহার পর ছাত্রদের ভূচিত্রাবলী বন্ধ করিতে বলিয়া শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে পুনরালোচনা করাইবেন। ছাত্রগণ উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের মানচিত্রে নগর, নদী, পর্বত ইত্যাদির অবস্থান দেখাইবে। সর্বশেষ শিক্ষক ছাত্রগণের মধ্যে সীমা-রেখা মানচিত্র বিতরণ করিয়া বোর্ডে তাহা আঁকিবেন এবং তাহাতে সেই পাঠে বর্ণিত স্থান ইত্যাদির অবস্থান নির্দেশ করিয়া নাম লিখিয়া দিবেন, ছাত্রগণও নিজ নিজ সীমার মানচিত্রে তাহা লিখিয়া লইবে।

এই স্তরের ছাত্রগণ নিজ প্রদেশের বিস্তারিত ভূগোল ছাড়াও ভারতবর্ষের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করিবে; যথা,—বিভিন্ন প্রদেশ ও তাহাদের রাজধানী, প্রধান প্রধান নদী, পর্বত, হ্রদ প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইবে। তাহার পর ভারতবর্ষ যে এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত একটি দেশ, তাহা দেখাইয়া ভূগোলকের সাহায্যে পৃথিবীর স্থলভাগ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দিয়া এই স্তরের শিক্ষা শেষ করিতে হইবে।

মধ্য-বিদ্যালয়ের স্তর

(ক) **আবিষ্কারকগণের ভ্রমণ-কাহিনী**। ইহাই এখন গল্পের স্থান অধিকার করিবে। কলম্বাস, ফ্রান্সিস, ড্রেক, কাপ্তেন কুক, লিভিংষ্টোন, ষ্টানলী,

মঙ্গোপার্ক, নানসেন, পিয়ারী,এমাণ্ডসেন, স্কট্ প্রভৃতির আবিষ্কারকগণের ভ্রমণ-কাহিনী শিক্ষা দেওয়া যায়। এখন আর শিক্ষকের গল্প বলার প্রয়োজন নাই। এক এক ছাত্র ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিবে এবং শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রগণ তাহা অনুসরণ করিবে। শিক্ষক প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা করিয়া ও অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করিয়া তাহাদের শিক্ষাকার্যে সাহায্য করিবেন। এই স্তরের শেষের দিকে পরিদর্শিত পাঠেরও ব্যবস্থা করিতে পারেন। নির্দিষ্ট অংশ পাঠের পর শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে তাহার সারমর্ম আদায় করিবেন।

(খ) **সংজ্ঞা গঠন**। প্রাথমিক স্তরে কোন কঠিন বিষয়ের সংজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া না হইয়া থাকিলে তাহা চিত্রের সাহায্যে বর্ণনার আকারে এই স্তরে শিক্ষা দেওয়া যায়। কঠিন কঠিন আদর্শ নির্মাণের কাজও এই স্তরে শিক্ষা দেওয়া যায়।

(গ) **পরিবেষ্টনীর জ্ঞান দান**। এই স্তরে পরিবেষ্টনীর ক্ষেত্র বাড়াইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলিও তাহার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ছাত্রগণকে এক এক গ্রামে লইয়া গিয়া তাহার সম্বন্ধে পুর্ব-বর্ণিত প্রণালীতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে এবং তাহার মানচিত্র আঁকিতে দেওয়া যায়। তাহাদিগকে সময় সময় জেলার নানা স্থানেও লইয়া যাওয়া যায়। বস্তুতঃ ক্রমশঃ ইহা ভৌগোলিক ভ্রমণের (Geographical excursions) আকার ধারণ করিবে।

(ঘ) **প্রাকৃতিক ভূগোল শিক্ষাদান**। এই স্তরে প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রায় সমস্ত বিষয়ের সাধারণ ধারণা দিয়া প্রথম বারের জন্য (ঐককেন্দ্রিক প্রণালীতে) ছাত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এইক্ষণে প্রাকৃতিক ভূগোল শিক্ষার জন্য পর্যবেক্ষণ হইতে পরীক্ষার সাহায্যে অধিক লইতে হইবে। সাধারণ সাধারণ ভৌগোলিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারও শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহাদের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে হইবে, যে সকল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না তাহাদের ছবি আঁকিয়া দেখাইতে হইবে। এই স্তরে প্রাকৃতিক কাজের কারণও শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করিতে হইবে।

(ঙ) **মানচিত্র-অঙ্কন ও রাজনৈতিক ভূগোল শিক্ষাদান**

এই স্তরে ছাত্রগণকে নিজ মানচিত্র আঁকিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। (মানচিত্র-অঙ্কন-পদ্ধতি পরে বর্ণিত হইবে)। তাহারা এখন নিজেরাই সীমারেখা মানচিত্র আঁকিয়া রাখিবে এবং শ্রেণীতে পাঠদানের সময়

শিক্ষকের মানচিত্র আঁকার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পূরণ করিয়া লইবে এইরূপে তাহারা অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন বিভাগের, এক একটা প্রদেশের তিনটি (প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও উৎপন্ন দ্রব্যের) এবং ভারতবর্ষের দুইটি (রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক) মানচিত্র আঁকিবে।

এই স্তরেও রাজনৈতিক ভূগোলের পাঠ পূর্ব-বর্ণিত প্রণালীতে দিতে হইবে। তবে এখানে ছাত্রগণ নিজেরাই সীমারেখা-মানচিত্র আঁকিবে, এবং তাহাদিগকে পরে বাড়ী হইতেও মানচিত্র আঁকিয়া আনিতে দেওয়া যায়। ইহা ছাড়া যে সকল বিষয় মানচিত্রে প্রদর্শন সম্ভব নহে, তাহাদের সারমর্ম লিখিয়া লইবে। যথা,—অধিবাসীর সংখ্যা, ভাষা, ধর্ম, জীবন-যাত্রা-প্রণালী, জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদির নোট লিখিয়া লইবে।

এই স্তরে ভারতবর্ষের সাধারণ ভূগোল (প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক) শিক্ষা দিতে হইবে এবং বিভিন্ন প্রদেশের অধিকতর জ্ঞান দিতে হইবে। তাহা ছাড়া এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলির সাধারণ জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন, সর্বশেষে ভূমণ্ডলের বিভিন্ন মহাদেশ ও তাহাদের অন্তর্গত দেশগুলির সহিত সাধারণ ভাবে পরিচিত করিয়া (ঐককেন্দ্রিক প্রণালীতে) ছাত্রের জ্ঞান প্রথম বারের জন্য সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন।

দ্রষ্টব্য। মধ্যবিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক স্তরেরই অন্তর্গত এবং এই স্তরে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাই সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তর

এই স্তরে ভূগোলের শিক্ষণীয় বিষয়, ভৌগোলিক পাঠের আকার ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে। কেননা এই স্তরে ছাত্রগণকে বিভিন্ন জীবনযাত্রার জন্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের জ্ঞানও তদুপযোগী হইতে হইবে।

(ক) **ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ**। এই স্তরের ছাত্রগণকে যত বেশী সম্ভব আধুনিক ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিতে দিতে হইবে। ইহার দ্বারা ভূগোল চিত্তাকর্ষক হয়; নানা দেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য ছাত্রের আগ্রহ হয়। কিন্তু শ্রেণীতে এই বিষয়ে কোন পাঠ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ছাত্রগণ

বাড়ীতে অবসর সময়েই এই সকল ভ্রমণ-কাহিনী মানচিত্রের সাহায্যে পাঠ করিবে। শিক্ষক সময় সময় মৌখিক বা লিখিত প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তাহাদের জ্ঞান পরীক্ষা করিবেন। ইহা ছাড়া বার্ষিক পরীক্ষায়ও এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করা প্রয়োজন, নতুবা ছাত্রগণ ইহা অবহেলা করিতে পারে।

(খ) **ভৌগোলিক ভ্রমণ** (Geographical excursions)। কেবল পুস্তক পড়িয়া ভাল ভূগোল শিক্ষা হয় না। **ভৌগোলিক ভ্রমণের সময় ছাত্রগণ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে জ্ঞান অর্জন করে তাহাই ভূগোল শিক্ষার ভিত্তি**। এই ভিত্তি সুগঠিত না হইলে ছাত্রগণ পুস্তক পড়িয়া বা শিক্ষকের বর্ণনা শুনিয়া কল্পনার সাহায্যে বাস্তব জিনিষ বা স্থানের মানসিক ছবি গঠন করিতে পারে না। সুতরাং ভূগোল শিক্ষার জন্য প্রত্যেক স্তরেই যথেষ্ট ভৌগোলিক ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক ও মধ্যবিদ্যালয়ের স্তরে ইহার সাহায্যে চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগের জ্ঞান অর্জনের কথা পুর্বে বলা হইয়াছে। এই স্তরে ইহার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত করিতে হইবে। এইক্ষণে ছাত্রগণকে নিজ জেলার প্রধান নগর, প্রদেশের রাজধানী, প্রধান প্রধান বাণিজ্য-স্থান, বড় বড় কারখানা, নানা শিল্পদ্রব্যের উৎপত্তির স্থান এবং নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যপুর্ণ স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। এমন কি, সময় সময় এক একদল ছাত্রকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে লইয়া গিয়া নানা প্রসিদ্ধ স্থান দেখাইবার ব্যবস্থা করাও বাঞ্ছনীয়। ব্যয় সংক্ষেপের জন্য সময় সময় এক সঙ্গেই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

কিন্তু একটা কথা আছে যে, **এক জন পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও কিছু না দেখিতে পারে, আর এক জন অল্প কয়েকটি স্থান দেখিয়াও বেশী শিক্ষা করিতে পারে**। সুতরাং ভৌগোলিক ভ্রমণের দ্বারা ছাত্রগণ উপকৃত হইতে হইলে তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি ঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। এই জন্য সকল সময় এক জন বা বেশী শিক্ষককে তাহাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। কোন স্থানে গিয়া কি কি জিনিষ দেখিতে হইবে তাহাই প্রথমে ঠিক করিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে একটি করিয়া অনুসন্ধান-পত্র দিয়া তাহার পর এক এক দর্শনীয় স্থান বা জিনিষের নিকট উপস্থিত হইয়া শিক্ষক তাহার নানা বৈশিষ্ট্যের প্রতি ছাত্রছাত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন এবং তাহারা পর্যবেক্ষণ করিয়া নিজ নিজ খাতায় তাহাদের সম্বন্ধে নোট করিয়া লইবে। ফিরিয়া আসিয়া

এক এক ছাত্র তাহার নোট পড়িবে, অন্য ছাত্রছাত্রীগণ তাহার ভুল সংশোধন করিবে এবং নূতন তথ্য সরবরাহ করিবে। পরিশেষে শিক্ষক তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবেন।

(গ) **প্রাকৃতিক ভূগোল শিক্ষাদান**। এক্ষণে **পরীক্ষা ও চিত্রের সাহায্যে** বিভিন্ন প্রাকৃতিক **অবস্থা** ও **কাজ সম্বন্ধে অনেকটা সম্পূর্ণ জ্ঞান দিতে হইবে**। প্রত্যেক বিষয় **যখনই সম্ভব যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে হইবে**। ইহার জন্য যত বেশী সম্ভব ভৌগোলিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে হইবে। (যন্ত্রপাতির তালিকা পরে দেওয়া হইবে)। সর্বোপরি এই স্তরে **প্রত্যেক প্রাকৃতিক অবস্থার বা কাজের কারণ নির্ধারণ করিতে এবং তাহাদের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের প্রাকৃতিক অবস্থা নির্ধারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন**। অথবা কোন স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা জানা থাকিলে কি কারণে ঐরূপ অবস্থা হইল তাহা নির্ধারণ করিতে দেওয়া যায়। যথা,—প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া ও চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা দিয়া জলের বাষ্পীভবন, মেঘের উৎপত্তি, শিশির, কুয়াসা ও বৃষ্টির আকারে পতন ইত্যাদি সম্বন্ধে কারণসহ জ্ঞানদানের পর, কি কি কারণে কোন্ স্থানে বৃষ্টিপাতের তারতম্য হইতে পারে তাহা শিক্ষা দেওয়া যায়। তাহার পর মানচিত্রে কোন দেশ, প্রদেশ বা জেলার অবস্থান দেখাইয়া তথায় কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তাহা নির্ধারণ করিতে এবং কেন তাহা হয় তাহার কারণ বলিতে বলা যায়।

ইহা ছাড়া **এই স্তরে ছাত্রগণকে দৈনন্দিন আবহাওয়া ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থা এবং সেই সম্পর্কীয় কাজের দিনলিপি** (Diary) **প্রস্তুত করিতেও শিক্ষা দিতে হইবে**। ইহাতে প্রত্যেক দিবসের ঊর্ধ্বতম ও নিম্নতম তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও বেগ, আকাশের অবস্থা, বৃষ্টির পরিমাণ, মধ্যাহ্ন সূর্যের উচ্চতা ইত্যাদি লিখিয়া রাখিতে হইবে। শিক্ষকের নেতৃত্বে উচ্চশ্রেণীর কয়েক জন ছাত্রকে এই দিনলিপি তৈয়ার করিবার ভার দেওয়া যায়।

এই স্তরে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা ও সেই সম্পর্কীয় কাজের অতিরিক্ত, **সৌরমণ্ডল এবং তারকামণ্ডল সম্বন্ধেও সাধারণ ধারণা দিতে হইবে**। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বহুমূল্য বলিয়া প্রধানতঃ চিত্রের সাহায্যে ইহা শিক্ষা দিতে হয়।

(ঘ) **রাজনৈতিক ভূগোল শিক্ষাদান**। এই স্তরে নিজ দেশের ভূগোল সম্বন্ধে ছাত্রের জ্ঞান অনেকটা সম্পূর্ণ করিতে হইবে এবং সাধারণ জীবনে পৃথিবী সম্বন্ধে তাহার যতটা জ্ঞানের প্রয়োজন হইতে পারে তাহাও দিতে হইবে।

এই স্তরে ইতিহাসের ন্যায় ভূগোলের শিক্ষকের বর্ণনামূলক পাঠের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে। প্রধানতঃ মানচিত্রের সাহায্যে ছাত্রেরাই স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিবে। শিক্ষক তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবেন, তাহাদের কাজ তত্ত্বাবধান করিবেন এবং প্রয়োজন মত অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করিবেন। কোন দেশের ভূগোল শিক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্বে ছাত্রগণ তাহাদের মানচিত্রের খাতায় যতগুলি প্রয়োজন সেই দেশের সীমারেখা মানচিত্র আঁকিয়া ফেলিবে। এক এক দিন পাঠ গ্রহণের পর ছাত্রগণ এক একটা মানচিত্রে সেদিনকার পাঠ্য বিষয় লিখিয়া লইবে। এই ভাবে মানচিত্রগুলি পুরণ করিয়া সেই দেশের ভূগোল শিক্ষা শেষ করিবে। পাঠদানের সময় শিক্ষক এক এক শীর্ষ বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। এক এক জন ছাত্র দেওয়ালে ঝুলানো বড় মানচিত্রে সেই শীর্ষের অন্তর্গত জিনিষগুলি খুঁজিয়া বাহির করিবে ও পুস্তক হইতে তাহাদের বর্ণনা পাঠ করিবে, অন্যান্য ছাত্রগণ নিজ নিজ ভূচিত্রাবলীতে সেগুলি দেখিবে ও তাহাদের বর্ণনা শুনিবে। (প্রত্যেক ছাত্রের সামনে তাহার ভূচিত্রাবলী খুলিয়া রাখিতে হইবে।) তাহার পর শিক্ষক প্রয়োজনমত অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করিবেন এবং ছাত্রগণ নিজ নিজ খাতায় তাহা লিখিয়া লইবে। ইহার পর শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে পাঠ্য বিষয়ের পুনরালোচনা করাইবেন। ছাত্রগণ উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল স্থানের নাম করা হয় সেগুলি মানচিত্রে দেখাইবে। ইহার পর শিক্ষক বোর্ডে মানচিত্র আঁকিয়া সেদিনের পাঠ্য বিষয় লিখিয়া দিবেন এবং ছাত্রগণ নিজ নিজ সীমারেখা-মানচিত্রে তাহা লিখিয়া লইবে। এই স্তরের শেষের দুই শ্রেণীতে শিক্ষক সকল সময় বোর্ডে মানচিত্র আঁকিয়া দেওয়ার সময় পাইবেন না। ছাত্রগণকে বাড়ী হইতে পঠিত বিষয়ের মানচিত্র আঁকিয়া আনিতে দিবেন। যে সকল বিষয় মানচিত্রে প্রদর্শন সম্ভব নহে (যথা জলবায়ুর বর্ণনা, জীবনযাত্রার বর্ণনা ইত্যাদি) তাহাদের সারাংশ বোর্ডে লিখিয়া দিবেন এবং ছাত্রগণ নিজ নিজ খাতায় তাহা লিখিয়া লইবে। এক এক বিষয়—একক শিক্ষাদান শেষ হইলে ছাত্রগণকে বাড়ী

হইতে তাহার মানচিত্র আঁকিয়া আনিতে দিবেন। অথবা বর্ণনামূলক বিষয় হইলে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনিতে দিবেন।

ইহা ছাড়া এখানে কেবল মানচিত্র স্থান ইত্যাদি দেখাইলে ও বর্ণনা দিলেই হইবে না, **যখনই প্রয়োজন এবং সম্ভব বিভিন্ন অবস্থার কারণ দিতে হইবে**। যথা,—পর্বতের অবস্থান ও জমির ঢাল-এর সহিত নদীর গতির (Course) সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, বিভিন্ন স্থানে বড় বড় বন্দর বা নগর সৃষ্টি হওয়ার কারণ দেওয়া যায়; বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর ও বৃষ্টিপাতের কারণ দেওয়া যায়; বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য উৎপত্তির বা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের কারণ দেওয়া যায় ইত্যাদি। সর্বশেষে দুই সমরূপ অঞ্চল বা দেশের তুলনা করিয়া তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করিতেও শিক্ষা দিতে হইবে।

এই স্তরে নিজ দেশের বিস্তারিত ভূগোল শিক্ষাদানের জন্য তাহাকে নিম্নলিখিত শীর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শীর্ষ শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা বা দুইটা পাঠ দিতে হইবে এবং এক একটা মানচিত্র আঁকিতে হইবে।—

(১) দেশের অবস্থান—কত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত, সীমা, আয়তন ও সৈকত রেখা।

(২) ভূ-প্রকৃতি (Relief)

(৩) প্রাকৃতিক অঞ্চল—উহাদের বৈশিষ্ট্য—পর্বত, নদী, হ্রদ, উপত্যকা, অধিত্যকা ইত্যাদি।

(৪) জলবায়ু—বৎসরে বিভিন্ন ভাগে বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের তারতম্য সহ।

(৫) রাজনৈতিক বিভাগ—প্রদেশসমূহ, রাজ্যসমূহ এবং তাহাদের রাজধানী।

(৬) দেশের অধিবাসী ও শাসন-ব্যবস্থা—অধিবাসীর সংখ্যা, জাতি, ধর্ম, ভাষা ও ব্যবসায়। শাসন-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

(৭) উৎপন্ন দ্রব্য—বনজ, কৃষিজ, প্রাণিজ ও খনিজ; তাহাদের উৎপত্তিস্থান ও অনুকূল অবস্থা।

(৮) শিল্পদ্রব্য—তাহাদের প্রাপ্তিস্থান ও অনুকূল অবস্থা।

(৯) যাতায়াতের ব্যবস্থা বা উপায়।

(১০) অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য—আমদানী ও রপ্তানী (বন্দরের নাম সহ)।

এইরূপে নিজ দেশের সাধারণ ভূগোল শিক্ষাদানের পর প্রত্যেক রাজ্য বা প্রদেশ সম্বন্ধে অন্ততঃ দুইটা করিয়া পাঠ দিতে হইবে এবং তাহাদের অন্ততঃ ১টা করিয়া মানচিত্র আঁকিতে হইবে। ইহার পর ভূমণ্ডলের জ্ঞান দানের জন্য প্রথমে উহাকে কতকগুলি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ১টা বা ২টা পাঠ দিতে হইবে এবং প্রাকৃতিক অঞ্চল-গুলির অবস্থান দেখাইয়া ভূমণ্ডলের একখানা মানচিত্র আঁকিতে হইবে।

তাহার পর প্রত্যেক মহাদেশ সম্বন্ধে অন্ততঃ তিনটা পাঠ দিতে হইবে। যথা,—প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক এবং শিল্প-সম্বন্ধীয় (industrial) এবং অন্ততঃ দুইটা মানচিত্র আঁকিতে হইবে (প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক)। উহাদের অন্তর্গত প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধেও অন্ততঃ একটা পাঠ দিতে হইবে এবং একটা মানচিত্র আঁকিতে হইবে। গুরুত্বানুযায়ী কোন কোন দেশের পাঠের সংখ্যা ও মানচিত্রের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। যথা,—জাপান, চীন, রাশিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য। অপর দিকে খুব ছোট কয়েকটি দেশকে এক এক দলভুক্ত করিয়া এক একটা পাঠ দেওয়া যায়।

অর্থনৈতিক ভূগোল শিক্ষাদান

বিভিন্ন দেশের নানা প্রকার উৎপন্ন দ্রব্য, তাহাদের উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা ও প্রাপ্তির উপায়, আমদানী ও রপ্তানী প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থনৈতিক ভূগোলের অন্তর্গত। আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতা লাভের জন্য এই জ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয়।

প্রথমে ছাত্রগণের জীবন-যাত্রার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া এই জ্ঞান দিতে হইবে।

তাহার পর এক এক দেশের ভূগোল শিক্ষাদানের সময়েই সেই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য, আমদানী-রপ্তানী ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে হইবে। ইহার জন্য স্বতন্ত্র মানচিত্র ব্যবহার করিতে এবং স্বতন্ত্র মানচিত্র আঁকিতে হইবে।

(উৎপন্ন দ্রব্যের মানচিত্র অঙ্কন-পদ্ধতি পরে বর্ণিত হইবে।)

দ্রষ্টব্য। বিভিন্ন স্তরে প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল শিক্ষাদানের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া এই পুস্তকে তাহাদের স্বতন্ত্র আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় এক এক দেশের প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল এক সঙ্গে বা পর পর শিক্ষা দিতে হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

মানচিত্র-অঙ্কন শিক্ষাদান

গ্রাম বা নগর পরিদর্শন করিয়া তাহার নক্সা অঙ্কনের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাই শিশুর মানচিত্র অঙ্কনের সূচনা করিবে।

ইহার পর শিশুকে ছাপান মানচিত্র দেখিয়া মানচিত্র আঁকিতে দিতে হইবে।

(১) এই উদ্দেশ্যে প্রথমে শিশু ছাপান মানচিত্রের উপর পাত্‌লা কাগজ রাখিয়া পেন্সিল দিয়া সীমারেখা আঁকিবে। একটা পুরু কাগজ বা কার্ডবোর্ড মানচিত্রের আকারে কাটিয়া লইয়া তাহার (Stencil mapএর) সাহায্যেও সীমারেখা মানচিত্র আঁকিতে দেওয়া যায়; এইরূপে শিশু একই দেশের কয়েকখানি সীমারেখা মানচিত্র আঁকিবে।

(২) তাহার পর সেই **ছাপ-তোলা সীমারেখা মানচিত্রের সাহায্যেই অন্য কাগজে মানচিত্র আঁকিতে শিক্ষা দিতে হইবে।** ইহার জন্য ছাপ-তোলা ম্যাপকে বেষ্টন করিয়া একটা চতুর্ভুজ আঁকিতে হইবে এবং চতুর্ভুজটিকে পুনঃ কয়েকটি সম-চতুর্ভুজে বিভক্ত করিতে হইবে। তাহার পর অন্য একটা কাগজে ঠিক একই আকারের একটা চতুর্ভুজ আঁকিয়া উহাকেও সমসংখ্যক সম-চতুর্ভুজে বিভক্ত করিতে হইবে। এক্ষণে ছাপ-তোলা মানচিত্রের যে যে অংশ যে যে ভাবে যে যে চতুর্ভুজে পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া দেখিয়া দ্বিতীয় কাগজটিতেও সেই সেই অংশ, সেই সেই ভাবে বা আকারে, অনুরূপ চতুর্ভুজে আঁকিলেই সীমারেখা মানচিত্র অঙ্কিত হইবে।

ইহার পর চতুর্ভুজ দ্বারা বেষ্টিত ছাপ-তোলা সীমারেখা মানচিত্রটি পুনঃ ছাপা ম্যাপের উপর রাখিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ সমস্ত জিনিষগুলি আঁকিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে ছাপ-তোলা মানচিত্রে যে স্থান নদী, পর্বত, ইত্যাদি যে ভাবে যে চতুর্ভুজে পড়িয়াছে অন্য কাগজটিতে সেগুলি সেভাবে অনুরূপ চতুর্ভুজে আঁকিয়া লইলে সম্পূর্ণ মানচিত্রটি অঙ্কিত হইবে।

(৩) **দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার সাহায্যে মানচিত্র অঙ্কন।** ইহার জন্য প্রথমে ছাপা ম্যাপ দেখিয়া দেশটি পূর্ব-পশ্চিমে কত দ্রাঘিমাংশের মধ্যে এবং উত্তর-দক্ষিণে কত অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। ছাপা ম্যাপে তাহাদের মধ্যে যত ব্যবধান তাহাও মাপিয়া লইয়া

একটা কাগজে তত দূরে দূরে উক্ত দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখাগুলি আঁকা প্রয়োজন। ইহাদের অন্তর্বর্তী স্থানকে দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার সংখ্যানুযায়ী সমভাবে বিভক্ত করিয়া সম দূরে দূরে অন্তর্বর্তী দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখাগুলি আঁকিতে হইবে। এক্ষণে ছাপা মানচিত্রে বিভিন্ন দ্রাঘিমারেখা ও অক্ষরেখা হইতে দেশটির সীমা কত পূর্বে ও পশ্চিমে এবং উত্তরে ও দক্ষিণে তাহা দেখিয়া লইয়া কাগজটিতে কিছু দূরে দূরে কয়েকটি বিন্দু দিয়া তাহা নির্দেশ করিবে এবং মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিন্দুগুলি সংযুক্ত করিলেই দেশের সীমা অঙ্কিত হইবে। বিভিন্ন স্থান ইত্যাদিও ছাপা মানচিত্রে কত দ্রাঘিমারেখা ও অক্ষরেখার সংযোগস্থলে বা তাহা হইতে কত দূরে তাহা দেখিয়া লইয়া কাগজটিতে তত দ্রাঘিমারেখা ও অক্ষরেখার সংযোগস্থলে বা তত দূরে তাহাদের অবস্থান নির্দেশ করা যাইবে। এই ভাবে সম্পূর্ণ মানচিত্রটি আঁকিয়া ফেলিতে পারা সম্ভব।

(৪) **বিভিন্ন স্কেলে মানচিত্র অঙ্কন।** ইহার জন্য প্রথমে ছাপা ম্যাপের স্কেলের সাহায্যে দেশটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ধারণ করিতে হইবে। তাহার পর ছাত্রছাত্রীরা ভিন্ন স্কেলে সেই দেশটির মানচিত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত হইবে ঠিক করিয়া লইবে। যথা ১″=৫০০ মাইল স্কেলে, ২৫০০ মাইল দীর্ঘ স্থানের মানচিত্রের দৈর্ঘ্য মাত্র ৫″ হইবে। ১″=২৫০ মাইল স্কেলে তাহার দৈর্ঘ্য হইবে ১০″। এই ভাবে তাহারা একটা কাগজে বিভিন্ন স্কেলে, মানচিত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্দেশ করিয়া একটা চতুর্ভুজ আঁকিবে। তাহার অভ্যন্তরে ছাপা মানচিত্রে যতগুলি দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা থাকে সম দূরে দূরে ততগুলি দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা তাহারা আঁকিবে। তাহার পর ছাত্রছাত্রীরা পূর্ব-বর্ণিত প্রণালীতে ছাপা মানচিত্র দেখিয়া, কাগজটিতে ভিন্ন স্কেলে মানচিত্রের সীমারেখা ও অভ্যন্তরস্থ দেশ, নগর প্রভৃতির অবস্থান নির্দেশ করিয়া মানচিত্রটি আঁকিয়া ফেলিতে পারিবে।

(৫) **চাক্ষুষ বিচারের সাহায্যে মানচিত্র অঙ্কন।** প্রথমে কিছু দিন মাপিয়া মাপিয়া মানচিত্র আঁকিলে পরে দেখিয়া দেখিয়া চাক্ষুষ বিচারের (with the help of visual judgement) সাহায্যে মানচিত্র আঁকিতে পারিবে। তবে সকল সময় স্কেলের সাহায্যে মানচিত্রের আয়তন ও সীমা নির্দেশ করিতে হইবে এবং দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা আঁকিয়া তাহাদের সাহায্যে নগর, পর্বত ইত্যাদির অবস্থান নির্দেশ করিতে হইবে।

বিভিন্ন প্রকারের মানচিত্র অঙ্কন

(১) **রাজনৈতিক মানচিত্র**। ইহাতে কেবল রাজনৈতিক ভাগ-বিভাগ এবং প্রধান প্রধান নগরগুলির অবস্থান নির্দেশ করিতে হইবে। বিভিন্ন রাজ্য বা প্রদেশগুলি বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করিলে ভাল হয়।

(২) **প্রাকৃতিক মানচিত্র**। ইহাতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চল ও তাহাদের অন্তর্গত হ্রদ, নদী, পর্বত ইত্যাদির অবস্থান দেখাইতে হইবে। নদী, পর্বত ইত্যাদি যতটা সম্ভব তাহাদের স্বাভাবিক রঙে চিত্রিত করিতে পারিলে ছোট শিশুর নিকট চিত্তাকর্ষক হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলিও বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করা যায়।

(৩) **ভূ-প্রকৃতির মানচিত্র** (Relief Map)। ইহা কাগজে আঁকার চেয়ে মাটি, কাগজের মণ্ড, পুটিং প্রভৃতির দ্বারা তৈয়ার করাই ভাল, যাহাতে তাহা দেখিয়া শিশুগণ সহজে কোন দেশের ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে। কাগজে আঁকিতে হইলে বিভিন্ন উচ্চতা-নির্দেশের জন্য বিভিন্ন রং ব্যবহার করা যায়। অথবা বিভিন্ন রেখার সাহায্যেও বিভিন্ন উচ্চতা নির্দেশ করা যায় ; যথা—সমুদ্র সমতল হইতে ১০০০ ফুট উচ্চ, ২০০০ ফুট উচ্চ, ৩০০০ ফুট উচ্চ, ৬০০০ ফুট উচ্চ, ১২০০০ ফুট উচ্চ ইত্যাদি মানচিত্রের তলদেশে উচ্চতাসূচক রংএর বিভিন্ন 'সেড' দ্বারা বা চিহ্ন দ্বারা প্রদর্শিত উচ্চতা আঁকিয়া ও লিখিয়া দিতে হইবে।

(৪) **বৃষ্টিপাতের মানচিত্র**। উপরিউক্ত প্রণালীতে রং-এর বিভিন্ন 'সেড' বা রেখার সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাপ দেখাইয়া এই মানচিত্র আঁকিতে হইবে।

(৫) **তাপ-নির্দেশক মানচিত্র**। কোন ঋতুতে বা মাসে বিভিন্ন স্থানের উত্তাপ বিভিন্ন রং বা রেখার সাহায্যে দেখাইয়া এই মানচিত্র আঁকা যায়।

অথবা কোন ঋতুতে যে সকল স্থানের উত্তাপ সমান তাহাদের উপর দিয়া এক একটা রেখা টানিয়া তাহার পার্শ্বে উত্তাপের পরিমাপ লিখিয়া দেওয়া যায়।

(৬) **লোক-বসতির মানচিত্র**। দেশের বিভিন্ন স্থানে মাইল প্রতি অধিবাসীর সংখ্যা নির্দেশ করিয়া বিভিন্ন রং বা বিভিন্ন রেখার ব্যবহার করিয়া এই মানচিত্র আঁকা যায়।

(৭) **কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের মানচিত্র**। প্রাথমিক স্তরের জন্য যে স্থানে যে জিনিষ জন্মে বা পাওয়া যায় তথায় সেই জিনিষের চিত্র আঁকিয়া মানচিত্র

প্রস্তুত করাই শ্রেয়। ইহা শিশুর নিকট খুব চিত্তাকর্ষক এবং সহজে বোধগম্য হয়। কিন্তু ইহা সকল সময় সম্ভব হয় না বলিয়া জিনিষের চিত্রের পরিবর্তে তাহার নামের প্রথম অক্ষরও ব্যবহার করা যায়। যথা,—ধা=ধান, চা=চা, কা=কার্পাস, চি=চিনি, লৌ=লৌহ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। (ক) প্রথমে পেন্সিল দ্বারা ম্যাপ আঁকা ভাল, কেননা প্রয়োজন মত উহার পরিবর্তন করা যায়। পরে তাহার উপর কালি দেওয়া যাইতে পারে। (খ) সমস্ত মানচিত্রে রাজনৈতিক ভাগ-বিভাগও দেখানো উচিত। তাহা না হইলে বিভিন্ন জিনিষের সহিত স্থানের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। (গ) মানচিত্রের শীর্ষভাগে দেশের নাম ও মানচিত্রের নাম লিখিতে হইবে, নীচে স্কেল এবং ব্যবহৃত চিহ্নের অর্থ লিখিয়া দিতে হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

ভূগোল শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি

(১) **পঞ্চসোপান পদ্ধতি**। বর্ণনামূলক ভূগোল এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়।

(২) **পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি**। প্রাকৃতিক ভূগোল সাধারণতঃ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে হয়।

(৩) **ডল্টন পদ্ধতি**। ৭ম মান হইতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া ছাত্রছাত্রীগণকে স্বচেষ্টায় অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে দেওয়া যায়।

(৪) **সহযোগিতামূলক পদ্ধতি**। এক একটা বিষয়কে বিভিন্ন শীর্ষে বিভক্ত করিয়া এক এক দল ছাত্রকে এক এক শীর্ষ শিক্ষা করিতে দেওয়া যায়, পরে একত্রিত হইয়া পরস্পর সমালোচনার দ্বারা সকল শীর্ষ সকলে শিক্ষা করিতে পারে।

(৫) **সমস্যামূলক পদ্ধতি**। ছাত্রছাত্রীগণকে কতকগুলি ভৌগোলিক কার্যমূলক বা বুদ্ধিমূলক সমস্যা স্বচেষ্টায় সমাধান করিতে দেওয়া হয়।

(৬) **গবেষণা পদ্ধতি**। এক এক দেশের নানা মানচিত্র দেখিয়া তাহার ভৌগোলিক বিবরণ তৈয়ার করিতে দেওয়া যায়। অবশ্য উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষের দিকেই এইরূপ কাজ করিতে দেওয়া সম্ভব হয়।

ভূগোল বিষয় অনুসারে প্রথমতঃ প্রস্তুতি বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং অতঃপর উহা ইতিহাস এবং অর্থনীতির মত মানবতামূলক বিষয়ের সঙ্গেও যুক্ত। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ইহার শিক্ষাদানকৌশল হইবে পরীক্ষামূলক কাজ, যাহা প্রকৃতি বিজ্ঞানের পক্ষে উপযুক্ত এবং মৌখিক শ্রেণী পাঠনা যাহা মানবতামূলক বিষয়সমূহ পাঠাদানের পক্ষে উপযুক্ত এই দুইয়ের মাঝামাঝি। যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভূগোল শিক্ষাদানে মৌখিক শিক্ষাদান বা শ্রেণী পাঠনার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে, তবুও ভূগোল শিক্ষাদানে ব্যক্তিগত কাজের গুরুত্বও নেহাত কম নয়। ভূগোল শিক্ষকেরা ভূগোল শিক্ষাদানে ব্যক্তিগত কাজের সুফল সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ। অনেকেই ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের পক্ষপাতী নীচু শ্রেণী আবিষ্কারের মনোভাব লইয়াই ভূগোল শিক্ষাদান করা খুবই প্রয়োজন। তাহা হইলে শিশুরা যাহা জানিবার বিষয় তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয় নাড়াচাড়া করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে সক্ষম হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়া বাস্তবিকই ভূগোল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়। তবে ভূগোল শিক্ষাদানের একটি বৈশিষ্ট্যও আছে—মৌখিক শিক্ষাদান, পরীক্ষামূলক কাজ, আবেষ্টনী পরিদর্শন ইত্যাদির মধ্য দিয়া ভূগোল শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তবে যখন যে পদ্ধতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে, শিশুর পক্ষে মঙ্গলজনক বোধ হইবে, তাহাই তখনকার মত অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।

ভূগোল শিক্ষাদানে ব্যক্তিগত কাজ খুবই সুফলপ্রসূ হইতে দেখা গিয়াছে। এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীকে কতকগুলি প্রশ্নের সাহায্যে আগ্রহান্বিত করা হয়। কোন মানচিত্র কিংবা কোন উৎস বিষয়বস্তু থাকে। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীকে কতকগুলি প্রশ্ন দেন। ঐ প্রশ্নের মধ্যে, কি ভাবে তথ্যাদি হইতে প্রশ্নের উত্তর বাহির করিতে হইবে তাহার ইঙ্গিত থাকে, কি ভাবে তুলনামূলক বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে আসা যায়, তাহারও ইঙ্গিত থাকে। ছাত্রছাত্রী যে অঞ্চল সম্বন্ধে পাঠ করিবে সেই অঞ্চলের অবস্থান অন্যান্য মহাদেশে একই অক্ষাংশে বা দ্রাঘিমাংশে অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থান মানচিত্র দেখিয়াই জানিতে পারে। নির্দিষ্ট অঞ্চলের সীমা, নিকটস্থ প্রতিবেশী রাজ্য, ঐ রাজ্যের সঙ্গে নানা বিষয়ে তুলনা ইত্যাদি মানচিত্র হইতেই ছাত্রছাত্রীরা সংগ্রহ করিতে পারে। ব্যক্তিগত কাজ নির্ভর করিবে কি জাতীয় এ্যাটলাস

বা মানচিত্র শিক্ষক ছাত্রছাত্রীকে দিবেন তাহার উপর। মানচিত্রের উপরই তাপের মাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, পর্বতগাত্রের উচ্চতা, সমুদ্র-স্রোত ইত্যাদি দেওয়া থাকে। মানচিত্র ভাল ভাবে দেখিয়া বা পাঠ করিয়াই শিক্ষক কোন দেশের জলবায়ু সম্বন্ধে জানিতে পারে। মানবীয় ভূগোল শিক্ষাদান কালে এমন একটি মানচিত্র যদি পাওয়া যায় যেখানে লোকসংখ্যা বুঝাইবার মত নির্দেশ-গুলি রহিয়াছে, তাহা হইলে ভূগোল পাঠের উৎস হিসাবে তাহা কার্যকরী হইতে পারে। এই সমস্ত মানচিত্রের মধ্যে ভূমির উচ্চতা, জলবায়ু, উৎপাদন ইত্যাদি সম্পর্কে চিহ্নও থাকে। বলা বাহুল্য ঐ সমস্ত চিহ্ন দেখিয়াই ছাত্র-ছাত্রীরা কোন স্থানের ভৌগোলিক তথ্য জানিতে পারে। ভূগোল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ছবি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ছবি বিশেষ কার্যকরী, কারণ ছবিরও ভাষা আছে, ছবি দেখিয়া ছাত্রছাত্রী অনেক শিক্ষাগত তথ্যের সন্ধান পাইতে পারে।

আমরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ভূগোল শিক্ষার কথা সামান্য ভাবেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ভূগোল শিক্ষাদানে সব সময় ব্যক্তিগত শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষাদান চলে না। ভূগোল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দলগত শিক্ষাদানও বিশেষ কার্যকরী বলিয়া আমাদের মনে হয়।

ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি যে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী কাজ করিয়াছে। কিন্তু উহার পুর্ণ সংগঠনও সময় সাপেক্ষ। সেই কারণে দলগত শিক্ষাদান পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দলগত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইলে শ্রেণীর ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে ৫।৬টি দলে ভাগ করিতে হয়। অর্থাৎ শ্রেণীতে ৫।৬টি দল হইল। এমন ভাবে ভাগ করিতে হয় যাহাতে দলগুলি পরস্পরের সহিত পরস্পর সমান। অর্থাৎ প্রত্যেক দলেই ভাল ছাত্রছাত্রী ও অনগ্রসর ছাত্রছাত্রী দুই থাকিবে। এই ভাবে দলগুলিকে মোটামুটি একরূপ করা হইল। দলগুলি একটি বিষয়ের উপর কাজ করিতে পারে, যেমন কোন এক স্থানের জলবায়ু। দলগুলি আলাদা আলাদা ভাবে জলবায়ুর অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরে তাহাদের সিদ্ধান্তগুলি সভাপতি বা শিক্ষককে জানাইতে পারে। আবার অন্য ভাবেও কাজ চলিতে পারে। ধরা যাক, শ্রেণীর ৫।৬টি দল কোন একটি দেশের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবে; কেহ আলোচনা করিবে লোকসংখ্যা ও ভূপ্রকৃতি, কোনও

দল আলোচনা করিবে উৎপাদন ; কোনও দল আলোচনা করিবে নদ-নদী পাহাড়-পর্বত, আবার কোনও দল আলোচনা করিবে জলবায়ু, ইত্যাদি। বিভিন্ন দল বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে তাহারা আগমন করিয়াছে, সেই সিদ্ধান্তগুলি সমগ্র শ্রেণীর সামনে শিক্ষক মহাশয়ের কাছে বলিবে। এই ভাবে একটি ভৌগোলিক বিষয়ের বিভিন্ন দিক ছাত্রছাত্রীরা শুনিতে পাইবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে সহযোগিতা প্রবৃত্তির অনুশীলন হয়। দলগত ভাবে কোন কোন স্থানের মানচিত্র বা মাটির মডেলও তৈয়ারী করা যায়। আলোচনা করিয়া মূল আদর্শ দেখিয়া এই সব তৈয়ারী করার মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীরা বহু ভৌগোলিক তথ্য জানিতে পারে। ঐ সব তৈয়ারী করার পর বিভিন্ন দল বিভিন্ন মডেল বা মানচিত্র বিচারকের দৃষ্টি নিয়া দেখিবে। ফলে ভুলত্রুটি যদি কিছু থাকে তাহাও তাহাদের কাছে প্রতিভাত হইবে।

ব্যক্তিগত কাজ বা দলগত কাজের যেমন কতকগুলি সুবিধা আছে, অসুবিধাও তেমন আছে। ব্যক্তিগত কাজে বা দলগত কাজে যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা ভুল পথে না যায়, সেইজন্য শিক্ষকের সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। আবার অনেক ছাত্রছাত্রী আছে, যাহারা নিজেরা উদ্বুদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া আর একটি অসুবিধা হইল এই প্রক্রিয়ায় সময় ব্যয় হয় বেশী। এই জন্য ভূগোল শিক্ষাদানে মৌখিক শিক্ষাদান করিতেও হয়। ভূগোলের পাঠ্যসূচী বড়, অতএব পাঠ্যসূচী শেষ করিতে হইলে মৌখিক পাঠনারও প্রয়োজন বিশেষভাবে রহিয়াছে। ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের আর একটি অসুবিধা হইতেছে, প্রচুর শিক্ষা-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে হয়, এত শিক্ষা-সরঞ্জাম সাধারণ বিদ্যালয়ের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

ভূগোল শিক্ষাদানে প্রজেক্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সমগ্র আফ্রিকার প্রজেক্ট করিতে যাইয়া বিভিন্ন দল মানচিত্র, মডেল, জলবায়ুর চার্ট, রাজনৈতিক বিভাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিবে এবং প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ দলীয় ডাইরী লিখিবে। দলের নেতা সেই দিনের কাজের রিপোর্ট শিক্ষকের নিকট দাখিল করিবে। সমগ্র শ্রেণী সেই রিপোর্ট শ্রবণ করিবে। রিপোর্ট পাঠ শুনিয়া শিক্ষক কতকগুলি সমস্যা বাছিয়া লইবেন এবং সেই সমস্যাগুলির উপর

আলাদা পাঠদান করিবেন। ছাত্র-শিক্ষক সহযোগিতার ফলে পাঠ আনন্দজনক হইবে।

মৌখিক শিক্ষাদানে অনেক শিক্ষাবিদই কোন পাঠ্যপুস্তককে বিশেষ-ভাবে অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভূগোল শিক্ষককে নানা পুস্তক হইতে বহু বিষয় সংগ্রহ করিয়া শিক্ষাদান করিতে হইবে। তবে যদি এমন পুস্তক পাওয়া যায়, যাহাতে বিষয়গুলি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহা হইলে সেই পুস্তককে সাহায্যকারী মূল পুস্তক হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষক যদিও পুস্তকের সাধারণ পরিকল্পনাকে অবলম্বন করিয়া পাঠদান করিবেন, কিন্তু বিষয়বস্তু বুঝাইবার জন্য বাহির হইতে যে সমস্ত জিনিসের আমদানী করা প্রয়োজন তাহা তিনি করিবেন। যেখানে শিক্ষক বক্তৃতা পদ্ধতি বা মৌখিক পাঠদান পদ্ধতির সাহায্য লইয়া পাঠদান করিবেন, সেইখানে শিক্ষককে দেখিতে হইবে যে ছাত্রছাত্রীরা যেন নিষ্ক্রিয় শ্রোতার পর্যায়ে গিয়া না দাঁড়ায়। শিক্ষক পাঠদানের মধ্যে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া, মানচিত্র দেখিতে বলিয়া, দেওয়ালে টাঙান বড় মানচিত্রে কোন স্থান দেখাইতে বলিয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে সক্রিয় করিয়া রাখিবেন। বক্তৃতা পদ্ধতিতে কিছুক্ষণের জন্য পাঠদান করিয়া শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত ভাবে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিতে পারেন। ইহাতে কাজ ভাল হয়। বক্তৃতা পদ্ধতি যদি সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে ইহা উপরের শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ কার্যকরী। কারণ উপরের শ্রেণীতে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়বস্তু বেশী, এবং ঐ পরিমাণ বিষয়বস্তু শিক্ষা দিতে হইলে ব্যক্তিগতভাবে বা দলগত ভাবে শিক্ষা দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ে সম্ভব হয় না। অতএব উঁচু শ্রেণীতে বক্তৃতা পদ্ধতির সাহায্যে পাঠদান করিয়া তাহার সাথে ছাত্রছাত্রীদিগকে যদি ব্যক্তিগত কাজ কিছু করান যায়, তাহা হইলে সবচেয়ে ভাল হয়।

দেওয়ালে টাঙান মানচিত্র

দেওয়ালে টাঙান মানচিত্র ভূগোল শিক্ষাদানে বিশেষ কার্যকরী। দেশের সাথে দেশের তুলনা করিবার সময় ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। দেওয়ালে যদি পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের মানচিত্র স্থাপন করা যায়, তবে যেহেতু ছাত্র-ছাত্রীরা মানচিত্র দেখিয়া বুঝিতে শিখিয়াছে, অতএব তাহাদিগকে দিয়া উভয় দেশের মানচিত্রের তুলনামূলক বিচার করান যাইতে পারে। তাহা ছাড়া

বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একই দেশের মানচিত্র উপস্থাপিত করিয়া শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ঐ দেশ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দিতে পারেন। যেমন শিক্ষক যদি ভারতের ভূপ্রকৃতির, অরণ্যের উৎপাদনের, শিল্পাঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত, শীতকালীন বৃষ্টিপাত ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্র দেওয়ালে টাঙাইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দেখান, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে ভারত সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা করিয়া লইতে পারিবে। লোকসংখ্যা বণ্টনের মানচিত্র দেখিয়া ছাত্রছাত্রীরা কোন স্থানে কি রকম লোক আছে তাহা জানিয়া লইতে পারিবে।

অনেক শিক্ষক আছেন, যাঁহারা দেওয়ালের মানচিত্রের উপর উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁহারা বলেন যে দেওয়ালের মানচিত্র বড় এবং তাহাতে প্রত্যেক বিষয় বেশী বেশী করিয়া লিখিত আছে। ইহা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে শ্রেণী হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারা মুস্কিল। এই জন্য তাঁহারা ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত এ্যাটলাসের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন। এইরূপ আপত্তি খুবই যে সন্তোষজনক তাহা নহে।

গ্লোব

পৃথিবী গোল, অতএব একটি গোল জিনিসকে সমতল ক্ষেত্রে রূপায়িত করিলে তাহাতে ত্রুটি থাকিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি। যদি গোলাকার পৃথিবীকে গোলাকার জিনিসে রূপায়িত করা যায় তাহা হইলে আর তাহাতে ভুলত্রুটি প্রবেশ করিতে পারিবে না। অতএব ভূগোলের শ্রেণীতে গ্লোবের ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সরঞ্জাম। শ্রেণীতে যেমন বড় গ্লোবও থাকিবে, সেইরূপ ৪″ চার ইঞ্চি ব্যাসের ব্যক্তিগত গ্লোবও থাকা দরকার। শিক্ষক যখন বড় গ্লোব দেখিয়া বুঝাইবেন, তখন ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের ব্যক্তিগত গ্লোব দেখিয়া পড়ার বিষয়বস্তু বুঝিয়া লইতে পারিবে। ভূগোলের অঙ্ক সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু বুঝাইবার জন্য গ্লোবের বিশেষ প্রয়োজন।

এ্যাটলাস (ভূচিত্রাবলী)

যেমন ব্যক্তিগত গ্লোব থাকার কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর কাছে ব্যক্তিগত এ্যাটলাস থাকিবে। ছাত্রছাত্রীরা এ্যাটলাস দেখিয়া স্থান বিশেষসমূহ সম্বন্ধে শিক্ষা করিবে। এ্যাটলাস ব্যবহারে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়িবে।

এপিডায়োস্কোপ ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন

ভূগোল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এপিডায়োস্কোপ ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের ব্যবহার অতীব প্রয়োজনীয়। এই দুইটি সরঞ্জামের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের ছবি বড় করিয়া ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। যেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিবার সম্ভাবনা নাই, সেইখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিবর্ত হিসাবে ছবি দেখাইলে ছাত্রছাত্রীরা ঐ বিষয়ে বেশী মনোযোগী হইবে, এবং তাহাদের পক্ষে বুঝিবারও সুবিধা। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের জন্য স্লাইড তৈয়ারী করিতে হয়, ইহা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু এপিডায়োস্কোপ যদি বিদ্যালয়ে থাকে তবে উহার ভিতর দিয়া পুস্তক হইতে যে কোন ছবি বাছিয়া লইয়া দেখান যাইতে পারে।

মূলসূত্র

ভূগোল বিষয়টি জীবনকেন্দ্রিক। ভূগোলের বিষয়বস্তু আমাদের চারি দিকে ছড়াইয়া আছে। দোকানপাট, কলকারখানা, জাহাজ, এরোপ্লেন, রেলগাড়ী, সকলই ভূগোল শিক্ষার উপাদান। অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিষগুলি জীবনের সঙ্গে যুক্ত তাহার সঙ্গেই ভূগোলের সম্পর্ক রহিয়াছে। এবং সেই সম্পর্কই খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। ভূগোল শিক্ষার মূলসূত্র হিসাবে ভ্রমণ-কাহিনীগুলি খুবই প্রয়োজনীয়।

ফিল্ম্

ছবির ন্যায় ফিল্ম্ বা চলচ্চিত্রও ভূগোল শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভূগোল শিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু সকল সময় শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ সম্ভব হয় না, অথচ বক্তৃতা করিয়াও বিভিন্ন দেশের বৈশিষ্ট্যও বোঝান যায় না। সেই ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র বা ফিল্ম্ দেখানর ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে শিক্ষা ত্বরান্বিত ও কার্যকরী হয়। মৌখিক শিক্ষাদানের পরিপূরক হিসাবে ফিল্ম্ দেখানর ব্যবস্থা চলিতে পারে।

বাহিরের কাজ

ভূগোলের উপাদান শ্রেণীকক্ষের চৌহদ্দীর বাহিরে যথেষ্ট রহিয়াছে। এই জন্য ভূগোলকে বলা হয় "Geography is essentially an open-air subject." ভূগোলের পরীক্ষা-কক্ষ বা Laboratory শ্রেণী-কক্ষের বাহিরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রামের যে কোন ঢালু রাস্তায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের পরে দেখা যায় জলস্রোত। জলস্রোত ও প্লাবন কি ভাবে হয়

তাহা বোঝান শক্ত মনে হয় না। শ্রেণী-কক্ষে বৃষ্টিমাপক যন্ত্র, বায়ু-নির্দেশক যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র ইত্যাদি রাখিয়া বাহিরের আবহাওয়া-জনিত অবস্থা হাতে কলমে বুঝা যাইতে পারে। এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের কাজে যাইতে পারে। কলিকাতা শহরের ছেলেমেয়েদের যদি স্ট্র্যাণ্ড রোড হইতে খিদিরপুর ডক পর্যন্ত লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা ভৌগোলিক তথ্য অনেক কিছু সংগ্রহ করিতে পারে।

তবে শিক্ষামূলক ভৌগোলিক পরিভ্রমণের জন্য পূর্ব পরিকল্পনা ভাল-ভাবে করিতে হইবে। যেখানে ছাত্রছাত্রীরা পরিভ্রমণে যাইবে, তাহার মানচিত্র সাইক্লোষ্টাইল করিয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে দিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীরা যাহা দেখিবে তাহা ঐ মানচিত্রে বসাইয়া আনিবে। তাহা ছাড়া ঐ সমস্ত স্থানের বৃদ্ধি ও উন্নতি মানুষের সঙ্গে কতটা সম্পর্কযুক্ত তাহাও বাহির করিতে হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভূগোল-কক্ষ

ভূগোল শিক্ষাদানের জন্য একটি ভিন্ন কক্ষ থাকা উচিত। শ্রেণীকক্ষে ভূগোল শিক্ষাদান অসুবিধাজনক। কারণ যে সমস্ত শিক্ষা-সরঞ্জাম, যথা মানচিত্র, গ্লোব, ম্যাজিক ল্যানটার্ন, এপিডায়োস্কোপ ইত্যাদি ভূগোল শিক্ষা-দানে প্রয়োজন, সেই সমস্ত শিক্ষা-সরঞ্জাম সাধারণ শ্রেণীকক্ষে আনিতে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়। সময়ের এই ব্যয় অপচয় ছাড়া কিছু নয়। শুধু যে সময় ব্যয় হয় তাহা নহে, বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা-সরঞ্জামগুলি আনা-নেওয়ার ফলে জিনিষগুলি ধীরে ধীরে নষ্ট হয় এবং উহাদিগকে মেরামত করিতে খরচও বেশী বাড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া একই বিষয় যদি তিনটি শ্রেণীতে একই দিনে পড়ান হয়, তাহা হইলে শিক্ষককে তিন শ্রেণীতে যাইয়া তিন বার মানচিত্র হয়ত অঙ্কন করিতে হইতে পারে, কিন্তু যদি ভূগোল-কক্ষ থাকে তবে শিক্ষককে হয়ত এক বার সেই মানচিত্র অঙ্কন

করিলেই চলে। অতএব দেখা যাইতেছে সাধারণ শ্রেণী-কক্ষে ভূগোল শিক্ষাদান করিলে সময় ও অর্থের অপচয় হয়। আলাদা ভূগোল কক্ষের ব্যবস্থা করিবার মূলে যে শুধু অপচয় রহিয়াছে তাহা নয়। ভূগোল শিক্ষাদানের জন্যই ভূগোল-কক্ষ প্রয়োজন। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে ভূগোল ব্যক্তিগত ভাবে, দলগত ভাবে ও শ্রেণীগত ভাবে শিক্ষাদান করা চলে। অর্থাৎ ভূগোল শিক্ষাদান কর্মশালা পরিচালনা করিবার মাধ্যমে অনেক সময়ে হইয়া থাকিবে। অতএব ভূগোল-কক্ষ একটি ভূগোলের কর্মশালায় রূপান্তরিত করিয়া লইতে হইবে।

ভূগোল-কক্ষ সাধারণতঃ বিদ্যালয় গৃহের দক্ষিণ দিকে হইবে এবং উহার দক্ষিণ দিকে অনেকগুলি জানালা থাকিবে। ভূগোল-কক্ষ হইতে সোজাসুজি বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে পৌঁছা যায় এমন ভাবেই ঘরটি অবস্থিত থাকিবে। অর্থাৎ এমনভাবেই ঘরটি তৈয়ারী থাকিবে যেন সূর্য এবং আবহাওয়া সম্বন্ধে ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করা চলে। পূর্বেই বলিয়াছি ভূগোল-কক্ষ হইবে একটি কর্মশালা, সকল ছাত্রছাত্রী ভালভাবে কাজ করিবার নিমিত্ত জিনিষগুলি লইয়া ছড়াইয়া বসিতে পারে এইরূপ পরিসর যেন ভূগোল-কক্ষের থাকে। অর্থাৎ ভূগোল কক্ষটি যথেষ্ট বড় হইবে, ৩০´×২৫´ ফুট একটি আয়ত-কক্ষ ভূগোল-কক্ষ হিসাবে নির্দিষ্ট হইলে ভাল হয়। খুব বড় বিদ্যালয়ে একাধিক ভূগোল-কক্ষ থাকিতে পারে।

ভূগোল-কক্ষে আলোর ব্যবস্থা ভালরূপ থাকিবে। কক্ষের যে কোনও স্থানকে আলোকিত করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কক্ষের সমস্ত দরজা জানালাগুলিতে কালো পর্দা টাঙান থাকিবে, যাহাতে ভূগোল কক্ষটিতে এপিডায়োস্কোপে বা ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণে ছবি দেখাইবার কিংবা ফিল্ম্ দেখাইবার বন্দোবস্ত করা যায়।

দেওয়ালের কিছুটা অংশ ব্ল্যাকবোর্ড, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের স্ক্রিন, এপি-ডায়াস্কোপের স্ক্রিন এবং অন্যান্য ছবি প্রদর্শনের জন্য খালি রাখিতে হইবে। বাকী স্থানগুলি দেওয়াল-মানচিত্র, দেওয়ালের ছবি, নক্সা ইত্যাদি দেখাইবার জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে।

দেওয়ালের মধ্যেই ব্ল্যাকবোর্ড থাকিবে কিংবা আলাদা ইসেল সহ ব্ল্যাকবোর্ড, কিংবা ঘুরান ব্ল্যাকবোর্ড, কিংবা রোলার ব্ল্যাকবোর্ড অর্থাৎ উঠান নাবান যাইতে পারে এইরূপ ব্ল্যাকবোর্ড থাকিবে। দেওয়ালের

বোর্ডে অর্ধেক স্থানে লিখিবার স্থান থাকিবে, অপর অর্ধেক থাকিবে ১ ইঞ্চি বা ২ ইঞ্চি স্কোয়ার বা চৌকা আঁকা। ব্ল্যাকবোর্ডের উপর একটা কাঠের প্যানেল থাকিবে, সেই প্যানেলের মধ্যে ছবিগুলি আঁটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই প্যানেলের ভিতর পোষ্টার ও বড় ছবিও আটকান যাইতে পারে।

ভূগোল-কক্ষের চারি ধারে ফ্রিজ (Frize) করিয়া বিভিন্ন দেশের আবিষ্কারকের ছবি আটিয়া দেওয়া যায়।

বিভিন্ন দিকগুলি মেঝেতে বা মাথার উপর সিলিংএ বড় করিয়া তীর আঁকিয়া দেখান যাইতে পারে।

একদিকের দেওয়াল ব্ল্যাকবোর্ডের নীচে দেওয়ালের কাছে একটি কাবার্ড থাকিবে। ইহার উচ্চতা হইবে ৩ ফুট, লম্বা ৩½ ফুট ও পাশে হইবে ২ ফুট। এই কাবার্ডের ভিতর ছবি প্রক্ষেপ করিবার শিক্ষা-সরঞ্জামগুলি থাকিবে। দেওয়ালে ব্ল্যাকবোর্ডের অন্তদিকে আর একটি কাবার্ড থাকিবে, ইহা অপেক্ষাকৃত বড়—৩ ফুট উচ্চ, ৬ ফুট লম্বা এবং ১ ফুট চওড়া। ইহার দরজা সরান যায়। ইহাতে নানা প্রকার খনিজ পদার্থ থাকিবে।

দেওয়ালের অন্য দিকে মানচিত্রের জন্য একটি কাবার্ড (৫½´×৪½´×২½´) থাকিবে। ইহাতে অন্ততঃ পক্ষে ৪০টি মানচিত্র ধরিবে। অন্য একটি কাবার্ডে ভূগোল সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকারের ছবি থাকিবে। ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবনকে ও আবেষ্টনীকে উপলব্ধি করান। ইহা করিতে হইলে বহু ছবির প্রয়োজন। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের ছবি, এপিডায়াস্কোপ ছবি এবং ফিল্মের ছবি। অতএব ভূগোল কক্ষে ছবি দেখানর রীতিমত বন্দোবস্ত থাকিবে।

অন্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক স্থাপন

(১) **ইতিহাস**। কোন দেশের ভূগোল শিক্ষা দেওয়ার সময় তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও বলা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া কোন স্থানে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে তাহার উল্লেখ করিয়া ভূগোল শিক্ষা দেওয়া গেলেই তাহার প্রতি ছাত্রছাত্রী অধিকতর মনোযোগ দেয়।

(২) **সাহিত্য**। ভৌগোলিক বর্ণনা দানের সময় মাতৃভাষার যথেষ্ট চর্চা হইতে পারে। ইহা ছাড়া কোন স্থানের ভূগোল শিক্ষাদানের সময় তাহার

সুন্দর বর্ণনাপূর্ণ কোন কবিতা বা গদ্যাংশ পড়িয়া শুনাইলে পাঠ চিত্তাকর্ষক হয়। ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিতে দিলেও সাহিত্যের সহিত ভূগোলের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(৩) **গণিত**। প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক ভূগোল শিক্ষাদানের সময় গণিতের যথেষ্ট সাহায্য লইতে হয়।

(৪) **বিজ্ঞান**। প্রাকৃতিক ভূগোল শিক্ষাদানের সময় পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞান (Botany), প্রাণিবিজ্ঞান (Zoology), নৃতত্ত্ব (Anthropology) প্রভৃতির সাহায্য লইতে হয়। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়া প্রাকৃতিক ভূগোলের অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করা যায় না।

(৫) **অঙ্কন-বিদ্যা ও হস্তশিল্প**। প্রাথমিক স্তরে ভূগোল শিক্ষাদানের সময় অনেক জিনিষের ছবি ও আদর্শ দেখাইতে হয়। যতদূর সম্ভব ছাত্রছাত্রীগণের দ্বারা এই সকল ছবি অঙ্কন ও আদর্শ নির্মাণের ব্যবস্থা করিলে অঙ্কন-বিদ্যা ও হস্তশিল্প শিক্ষা হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরেও মানচিত্র অঙ্কন এবং রিলিফ ম্যাপ, ভূগোলক প্রভৃতি নির্মাণের কাজ ছাত্রছাত্রীগণকে করিতে দেওয়া প্রয়োজন। নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য-পূর্ণ স্থানের ছবি আঁকিতেও ছাত্রছাত্রীগণকে উৎসাহ দেওয়া হয়।

ভূগোল শিক্ষায় আন্তর্জাতিকতা-বোধ সৃষ্টি

পৃথিবী আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নানা ভাবে অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়া চলিতেছে। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি আজও মুছিয়া যায় নাই, পরন্তু সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত বিভিন্ন দেশের মধ্যে সেই ভাব সদা-জাগ্রত রহিয়াছে, কোন্ দিন যে সেই মনোভাব মূর্ত হইয়া উঠিবে কে জানে? অথচ সকল দেশের সকল শান্তিকামীই জানেন, ইহার শেষ কোথাও নাই। এই মনোভাব অপসৃত হওয়া যে সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক, ইহাও কাহারও কাছে অবিদিত নাই। অতএব শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে যদি এমন সূত্র পাওয়া যায়, যাহাতে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতামূলক সহৃদয় মনোভাব জাগ্রত করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর শান্তি হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ফিরিয়া আসিতে পারে।

নানাবিধ শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্য দিয়াই এইরূপ সহযোগিতামূলক সহৃদয় মনোভাব গড়িয়া তোলা যাইতে পারে; ভূগোল শিক্ষাদানের মধ্য দিয়া ইঁহার সম্ভাব্যতা প্রচুর। ভূগোল শিক্ষাদান সমগ্র পৃথিবী লইয়া পর্যবসিত।

ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন লোকের আচার-ব্যবহার ইত্যাদি শিক্ষা করিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের মনে যদি বিভিন্ন দেশের প্রতি সমবেদনাপূর্ণ মনোভাব জাগ্রত করিতে পারেন, তবে পৃথিবীর শান্তির দিক হইতে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মন প্রস্তুত হইয়া আসিবে। হয়ত ভবিষ্যতে ইহার সুফল ফলিবে। এই ক্ষেত্রে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীই বিশেষভাবে কার্যকরী হইতে পারে। ভূগোল শিক্ষাদানকালে তিনি বিভিন্ন দেশের মানুষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের মনে সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারেন, সেই দিকে দৃষ্টি দিবেন। বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে বৈপরীত্য আছে বটে, কিন্তু বৈপরীত্যের মধ্যেও কি এমন একটা একত্ববোধ দেখান যায় না, যাহাতে শিশুমন সেই দিকে আকৃষ্ট হয়? বিভিন্ন দেশের শিশুদের কথাই ধরা যাক না কেন। সকল দেশের শিশুদের মধ্যে কি খেলাধূলা, কাজকর্ম, আনন্দ ইত্যাদিতে প্রায় একরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না? যে একত্ববোধে শিশুরা আনন্দিত হইবে, অপরের উপর সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিবে, সেই একত্ববোধের দিক হইতে ভূগোল শিক্ষাদান করিতে শিক্ষক অগ্রসর হইলে, তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণ মানুষের অবস্থা প্রায় একই। সাধারণ শ্রেণীর লোকের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা ইত্যাদি লইয়া যদি শিশুদের সাথে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে শিশুরা আপনা-আপনিই অন্য দেশের লোকের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। আমাদের দেশের চাষীরা জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া শস্য উৎপাদন করে; আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, চীন প্রভৃতি মহাদেশেও কৃষকেরা একই রকম কষ্ট করিয়া শস্য উৎপাদন করে শুনিয়া শিশুরা কি বিদেশী লোককে নিজেদেরই এক জন বলিয়া মনে করিতে পারিবে না? শিক্ষক যদি শিশুগণকে সেই দৃষ্টিকোণ হইতে শিক্ষাদান করেন, তবে শীঘ্রই তিনি সাফল্যমণ্ডিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। শিশুদের মধ্যে যদি কেহ জাতীয়তা-বোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের প্রাধান্য প্রচার করে, তাহা হইলে শিক্ষক অপরাপর দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিবেন এবং কি ভাবে বিভিন্ন দেশগুলি বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীল তাহা বুঝাইয়া দিবেন। প্রকৃত-পক্ষে শিক্ষক ইচ্ছা করিলে ভূগোল শিক্ষাদানকালে নানা ভাবে শিশুর মনকে অন্যান্য দেশের প্রতি সহানুভূতিশীল করিয়া তুলিতে পারেন।

ভূগোল শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

(১) নানা ভৌগোলিক জিনিষের নমুনা (Specimens); যথা,—নানা প্রকারের মাটি, প্রস্তর, কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ দ্রব্য ইত্যাদি।

(২) নানা ভৌগোলিক জিনিষের আদর্শ (Model)।

(৩) বিভিন্ন দেশের পশুপক্ষী, মানুষ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, কল-কারখানা, নগর ইত্যাদির চিত্র।

(৪) বিভিন্ন স্তরের উপযোগী নানা মানচিত্র।

(৫) নানা প্রকারের ভূচিত্রাবলী।

(৬) ভূ-গোলক।

(৭) ভূগোলের নানা পাঠ্য-পুস্তক, Reference পুস্তক, নানা দেশ-ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি।

(৮) ম্যাজিক লেণ্টারন্ (Magic Lantern)।

(৯) ষ্টেরেওস্কোপ (Stereoscope)—কোন জিনিষ বড় ও বাস্তব আকারে দেখাইবার যন্ত্র।

(১০) সূর্য-ঘটিকা (Sun-dial)।

(১১) মাপিবার নানা যন্ত্র (Foot ruler, Tape box, Instrument box etc.)।

(১২) বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র; যথা,—বৃষ্টিমাপক যন্ত্র (Rain Gauge), বায়ুর গতিনির্দেশক যন্ত্র (Weather Cock), তাপমান যন্ত্র (Thermometer), চাপমান যন্ত্র (Barometer), চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি প্রদর্শক যন্ত্র ইত্যাদি।

ভৌগোলিক যাদুঘর (Geographical Museum)।

ভূগোল শিক্ষাদানের জন্য এত বেশী জিনিষ ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন যে, সেগুলি ঠিকভাবে সাজাইয়া রাখিবার জন্য বিদ্যালয়ে একটা স্বতন্ত্র যাদুঘর থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃপক্ষে উচ্চ বিদ্যালয়ে ইহা থাকা একান্ত আবশ্যক। ডল্টন প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে হইলে ভূগোল শিক্ষার জন্য অন্ততঃ একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী-কামরা রাখা প্রয়োজন। তথায় ভৌগোলিক জিনিস এবং যন্ত্রপাতি সাজাইয়া রাখা যায়।

ভূগোলের পাঠটীকা

শিক্ষক.........　　　　　　　　　　　　　　　　　　স্কুল................

তারিখ.........　　　　　　　　　　　　　　　　　　শ্রেণী—৩য় মান।

বিষয়—ভূগোল।　　　　　　　　　　　　সাধারণ পাঠ—তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসী

বিশেষ পাঠ—এস্কিমোজাতি।

উদ্দেশ্য—　　(ক) প্রত্যক্ষ—এস্কিমোদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান-দান।

(খ) পরোক্ষ—চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা-শক্তির বিকাশ।

শিক্ষা-সরঞ্জাম—পাঠ্যপুস্তক, ভূগোলক, এস্কিমো জাতির জীবন-যাত্রার নানা চিত্র ও আদর্শ।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
১ম	(ক) পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা (খ) নূতন পাঠ ঘোষণা।	প্রয়োজন মত শ্রেণী-বিন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিব ও তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নূতন পাঠ ঘোষণা করিব :— (১) এস্কিমোরা কোথায় বাস করে ? (২) তথায় শীত উত্তাপ কিরূপ ? (৩) তাহারা কিরূপ পোষাক পরে ? (৪) তাহারা কিরূপ ঘরে বাস করে ? (৫) তাহারা কি খাইয়া জীবনধারণ করে ? আজ তোমাদিগকে আর এক দেশের লোকের কথা বলিব, যে দেশ মরুভূমির ঠিক বিপরীত—সারা বৎসর বরফে ঢাকা থাকে।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
২য়	**নূতন জ্ঞান দান** বিষয়ের শীর্ষ বিভাগ ও এক এক শীর্ষের বর্ণনা :— (ক) **এস্কিমোদের দেশ, তাহাদের চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদ।** সারাংশ : আমেরিকার উত্তর প্রান্তে গ্রীনল্যাণ্ড দ্বীপে এস্কিমোদের বাস। বৃক্ষলতাহীন বরফে ঢাকা। তাহাদের রং হলদে, সুন্দর চেহারা। ভালুক ও শীল ও মৎস্যের চর্মে সর্ব শরীর ঢাকা।	(ক) ভূ-গোলকে এস্কিমোদের দেশ দেখাইব ও নানা চিত্রের সাহায্যে পার্শ্বে লিখিত এক এক শীর্ষের বিশদ বর্ণনা দিব। এস্কিমোদের ছবি দেখাইব। যখনই সম্ভব ছাত্রদের নিজ জীবনের সহিত অথবা বেদুইনদের জীবনের সহিত এস্কিমোদের জীবনের তুলনা করিব। নূতন নাম বোর্ডে লিখিয়া দিব। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া ছাত্রগণ পাঠ অনুসরণ করিতেছে কিনা দেখিব। পরিশেষে নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে সারমর্ম আদায় করিব ও বোর্ডে লিখিয়া দিব। ছাত্রগণ তাহা নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া লইবে। (১) এস্কিমোরা কোন্ দেশে বাস করে? (২) সে দেশ কিরূপ? (৩) তাহাদের চেহারা কিরূপ? (৪) তাহারা কি পরিধান করে?
	(খ) **এস্কিমোদের বাসগৃহ ও চলাচলের উপায়।** সারাংশ :—শীতকালে বরফের ঘরে (ইগ্‌লুতে) এবং গ্রীষ্মকালে চামড়ার তাঁবুতে **বাস**। বল্গা হরিণ ও কুকুরের স্লেজ গাড়ীতে এবং চামড়ার কায়াক-নৌকায় ভ্রমণ।	(খ) পদ্ধতি পূর্ববৎ। ইগলু ও স্লেজের ছবি দেখাইব। পুনরালোচনার প্রশ্ন : (১) এস্কিমোদের শীতকালের বাসগৃহ কিরূপ? (২) তাহারা গ্রীষ্মকালে কিরূপ গৃহে বাস করে? (৩) তাহারা কি উপায়ে গমনাগমন করে?
	(গ) **এস্কিমোদের খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি।** সারাংশ :—উদ্ভিজ্জ খাদ্য ও আগুনের অভাবে শীল, সিন্ধুঘোটক ও তিমির কাঁচা মাংস ভোজন; বল্গা হরিণের দুধ পান। শীলের চর্বির প্রদীপ জ্বালায়।	(গ) পদ্ধতি পূর্ববৎ। শীল মৎস্য সিন্ধুঘোটক ও তিমির ছবি দেখাইব। (১) এস্কিমোরা কি খায় ও পান করে? (২) তাহারা কেন কাঁচা মাংস খায়? (৩) তাহারা কি দিয়া প্রদীপ জ্বালায়?

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৩য়	পুনরালোচনা।	নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে সমগ্র পাঠের পুনরালোচনা করাইব। (১) এস্কিমোরা কোন্ দেশে বাস করে ? (২) সে দেশ কিরূপ ? (৩) তাহাদের চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদ কি রূপ ? (৪) তাহারা কিরূপ ঘরে বাস করে ? (৫) তাহারা কিরূপে চলাচল করে ? (৬) তাহারা কি খায় ও পান করে ?
৪র্থ	গৃহকাজ নির্দেশ।	এস্কিমোদের গল্প পড়িয়া আসিতে ও ইগলুর ছবি আঁকিয়া আনিতে বলিব।

পাঠটীকা (২)

শিক্ষক.............. **স্কুল**..................

তারিখ......... **শ্রেণী**—৫ম মান।

বিষয়—ভূগোল

সাধারণ পাঠ—পাঞ্জাব প্রদেশ।

বিশেষ পাঠ—পাঞ্জাবের সীমা, প্রাকৃতিক বিবরণ, জলবায়ু।

উদ্দেশ্য— (১) **প্রত্যক্ষ**—পাঞ্জাব প্রদেশের ভৌগোলিক বিবরণ শিক্ষাদান।

(২) **পরোক্ষ**—চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা ও বিচার-শক্তির বিকাশ।

শিক্ষা-সরঞ্জাম—পাঠ্যপুস্তক, ভারতের রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক মানচিত্র, পাঞ্জাবের মানচিত্র।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
১ম	(ক) পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা।	প্রয়োজনমত শ্রেণী-বিন্যাস ও গৃহ-কাজ সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিব :— (১) উত্তর প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্য কি কি? (২) উত্তর প্রদেশের প্রধান প্রধান নগরগুলি নাম কর এবং মানচিত্র দেখাও। (৩) উত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে কোন্ রাজ্য।
	(খ) নূতন পাঠ ঘোষণা	"আজ আমরা পাঞ্জাবের ভৌগোলিক বিবরণ শিক্ষা করিব"—বলিয়া নূতন পাঠ ঘোষণা করিব।
২য়	নূতন জ্ঞান দান। বিষয়ের শীর্ষ বিভাগ ও এক এক শীর্ষের বর্ণনা। (ক) পাঞ্জাবের চতুঃসীমা :— উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পাকিস্তান, দক্ষিণে রাজস্থান ও পূর্বে উত্তর প্রদেশ।	ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র খুলিয়া দেওয়ালে টাঙাইয়া দিব এবং ছাত্রগণকে নিজ নিজ ভূচিত্রাবলীতে বা পুস্তকে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র খুলিয়া সামনে রাখিতে বলিব। তাহার পর এক জন ছাত্রকে দেওয়ালের মানচিত্রে পাঞ্জাবের চতুঃসীমা দেখিয়া বলিতে বলিব এবং অন্য ছাত্রগণ নিজ নিজ মানচিত্রে তাহা দেখিবে। সে কোন ভুল করিলে অন্য ছাত্রদের সহযোগিতায় তাহার ভুল সংশোধন করিয়া দিব। ইহার পর পুস্তক ও মানচিত্র উল্টাইয়া রাখিতে বলিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে পুনরালোচনা করাইব। (১) পাঞ্জাবের উত্তরে কি আছে? (২) ,, পশ্চিমে ,, ,, ? (৩) ,, দক্ষিণে ,, ,, ? (৪) ,, পূর্বে ,, ,, ?

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৩য়	(খ) পাঞ্জাবের প্রাকৃতিক বিবরণ ঃ সারাংশ—উত্তর-পূর্ব অংশ পার্বত্য—হিমালয় অঞ্চল, অন্য অংশ সমতল ; সিন্ধুনদ ও তাহার পাঁচ শাখা—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা। এই জন্য ইহার নাম পাঞ্জাব, বা পঞ্চনদ। পূর্ব সীমায় যমুনা নদী। এক্ষণে পাঞ্জাব দুই ভাগে বিভক্ত—পঃ পাঞ্জাব (পাকিস্তান) ও পূঃ পাঞ্জাব (ভারত)। সিন্ধুর উপনদী হইতে জল সেচনের জন্য কাটা খাল।	(খ) ছাত্রগণের সহযোগিতায় ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্রে ও ভূপ্রকৃতির মানচিত্রে পাঞ্জাবের প্রাকৃতিক অঞ্চল, নদনদী, খাল ইত্যাদি দেখাইয়া বর্ণনা দিব। ছাত্রগণ তাহাদের নিজ নিজ ভূচিত্রাবলীতে বা পুস্তকের মানচিত্রে উহা দেখিবে। পাঞ্জাব নামের অর্থ বুঝাইয়া দিব। তাহার পর নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে পুনরালোচনা করাইব ও সারাংশ— (১) পাঞ্জাবের উত্তর অঞ্চল কিরূপ ? (২) পাঞ্জাবের অন্য অংশ কিরূপ ? (৩) পাঞ্জাবের নদীগুলির নাম কর ও মানচিত্রে দেখাও। (৪) পাঞ্জাবে জলসেচনের জন্য কি করা হইয়াছে ?
	(গ) পাঞ্জাবের জলবায়ু। সারাংশ—সমুদ্র হইতে দূরে এবং বায়ুপ্রবাহের পথে কোন পর্বত নাই বলিয়া বৃষ্টিপাত খুব কম, এবং জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন অর্থাৎ গ্রীষ্মের সময় খুব গরম এবং শীতের সময় তীব্র শীত।	(গ) ভারতবর্ষের মানচিত্রে পাঞ্জাবের অবস্থান দেখাইয়া ও কারণ নির্দেশ করিয়া তাহার বৃষ্টিপাত ও শীতোত্তাপের বর্ণনা দিব ও বঙ্গদেশের বৃষ্টিপাত ইত্যাদির সহিত তুলনা করিব। তাহার পর নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে পুনরালোচনা করাইব এবং পার্শ্বলিখিত সারাংশ বোর্ডে লিখিয়া দিব। ছাত্রগণ তাহা নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া লইবে। (১) পাঞ্জাবে কিরূপ বৃষ্টিপাত হয় ? (২) বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কারণ কি? (৩) পাঞ্জাবে শীত উত্তাপ কেমন ? (৪) তাহার কারণ কি ?

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৩য়	উত্তর প্রদেশের সহিত তুলনা।	নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে উত্তর প্রদেশের সহিত পাঞ্জাবের তুলনা করাইব :— (১) উত্তর প্রদেশের কোন্ অংশ অংশে অবস্থিত? পাঞ্জাব প্রদেশ কোন্ অংশে অবস্থিত? (২) উত্তর প্রদেশের কোন্ অংশ পার্বত্য এবং কোন্ অংশ সমতল? পাঞ্জাবের কোন্ অংশ পার্বত্য ও কোন্ অংশ সমতল? (৩) উত্তর প্রদেশের জলবায়ু কিরূপ? পাঞ্জাবের জলবায়ু কিরূপ?
৪র্থ	মানচিত্র অঙ্কন ও প্রশ্নের সাহায্যে পুনরালোচনা।	নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে সমস্ত পাঠের পুনরালোচনা করাইব :— (১) পাঞ্জাবের চতুঃসীমা বল। (২) পাঞ্জাবের নদীগুলির নাম কর ও দেখাও। (৩) পাঞ্জাবের জলবায়ু কিরূপ? তাহার পর ছাত্রগণের মধ্যে পাঞ্জাবের সীমারেখা মানচিত্র বিতরণ করিয়া আমি বোর্ডে পাঞ্জাবের মানচিত্র আঁকিব এবং তাহাতে রাজ্যের চতুঃসীমা, নদনদী, পর্বত ইত্যাদির অবস্থান দেখাইব। ছাত্রগণও সীমারেখা-মানচিত্র তাহা দেখাইবে ও লিখিয়া লইবে।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৫ম	প্রয়োগ গৃহকাজ	ছাত্রগণকে নদনদী, পর্বত ইত্যাদির অবস্থান দেখাইয়া কিছু বড় আকারে পাঞ্জাবের একখানা মানচিত্র আঁকিয়া আনিতে বলিব।

Reference

1. B. C. Wallis—Teaching of Geography.
2. Welton—Principles and Method of Teaching—Chapter X.
3. E. A. Macnee—Suggestions for the Teaching of Geography in India.
4. Dudley Stamp—How to teach Geography.
5. J. A. Adams—New Teaching.
6. Fair Grieve—Geography in Schools.
7. Kunja Bihari Har—বিশেষ পদ্ধতি।
8. E. A. Macnee and Eva D. Birdseye—The Teaching of Geography.
9. Teaching in Postwar Schools—Oxford University Press.
10. A Hand-book of Suggestions on the Teaching of Geography—Towards World Understanding—UNESCO.

দশম অধ্যায়

পাঠ্যক্রমে সমাজ-বিদ্যা

কিছু দিন হইল ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে সমাজবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সমাজবিদ্যা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকেই হইয়াছে, কিন্তু ভারতের উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে সমাজবিদ্যার অন্তর্ভুক্তি মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশে হইয়াছে। আমাদের দেশে আজ সমাজ জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন আনয়ন আবশ্যক। বিভিন্ন পাঠ্যক্রম-সম্বলিত নূতন নূতন পাঠ্যক্রম ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিকোণ প্রসারিত করিবে এবং ছাত্রছাত্রীরা ভারতের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়িয়া উঠিবে, এই আশায় পাঠ্যক্রমের মধ্যে যে বিষয় ভবিষ্যৎ ছাত্র-সমাজকে উপযুক্ত নাগরিক রূপে গড়িয়া তুলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমাজবিদ্যা এইরূপ একটি পাঠ্যক্রম যাহার মধ্যে গঠনমূলক সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। সমাজবিদ্যা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এমনই একটি বিষয় যাহাতে অতীত ও বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে বিশদরূপে ধারণা দেওয়া সম্ভব এবং সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন করা বিষয়ে উহা যথাসম্ভব সাহায্য করিবে বলিয়া মনে করা হয়। এই কারণেই বিশেষ করিয়া সমাজবিদ্যা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

সমাজবিদ্যা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এই বিষয় সম্বন্ধে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা রহিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন সমাজবিদ্যা সমাজের সমস্যা সম্বন্ধীয়, আবার কেহ কেহ মনে করেন বিজ্ঞান ভূগোল পৌর বিজ্ঞান ইত্যাদির যোগফল সমাজবিদ্যা। অনেক শিক্ষকেরও সমাজবিদ্যা বলিতে কি বুঝায় তাহা ভাল করিয়া জানা নাই। তাঁহারা মনে করেন, এক টুকরা বিজ্ঞান, কিছু ভূগোল, কিছু পৌরবিজ্ঞান, কিছু সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা করাই হইতেছে সমাজবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইত্যাদি হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহার মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবেশিত নাই। সমাজবিদ্যা হইতেছে উপরোক্ত বিষয়গুলির সমন্বয় এবং

উহা বর্তমান ও অতীতের আবেষ্টনীকে পরিপূর্ণভাবে ছাত্রছাত্রীর দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। সমাজবিদ্যাকে বলিতে পারা যায় যে উহা সমাজের সংগঠন ও ক্রমোন্নতির সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সমাজগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে যুক্ত। ইহার ভিতর ইতিহাস ভূগোল বা পৌরবিজ্ঞান বিচ্ছিন্নভাবে নাই, কিন্তু উহাদের অন্তর্নিহিত রেশ সর্বত্র বিদ্যমান। অল্প কথায় বলা যায় যে মানুষ এবং তাহার আবেষ্টনীর সঙ্গে সম্পর্কই সমাজবিদ্যা। যদি ইহা ধরা যায়, তাহা হইলে সমাজবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য বিষয় সমন্বিত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? মানুষের বস্তু উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতি এবং মানুষের নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে পৌর কর্তব্যের কথা কথা আসে; মানুষের জীবনে সাফল্য ও অসাফল্যের কথা ইতিহাস এবং মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সংস্পর্শই ভূগোল। মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মনুষ্য সমাজকে উন্নত করিয়াছে। সভ্যতার ইতিহাসে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। ভূগোল তখনই সমাজবিদ্যা যখন মানুষের সঙ্গে ঐখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পরস্পরের সক্রিয় সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে সমাজবিদ্যার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী রহিয়াছে। সমাজবিদ্যা ছাত্রছাত্রীর কাছে নূতন ভাবে দেখা দেয়, উহাদের দৃষ্টি সম্প্রসারিত করে। ছাত্র যে সময় যে স্থান বা যে সমাজে আছে, সেই সময় স্থান বা সমাজের সঙ্গে বর্তমান ও অতীতের যে সম্বন্ধ তাহা সমাজবিদ্যা বিশ্লেষণ করিয়া দেয়, স্থানীয় এবং দূরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে অন্যান্য কৃষ্টি ও সভ্যতার নরনারীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। সমাজবিদ্যা এক কথায় বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক এবং মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক। ইহা ছাড়া সমাজবিদ্যার পাঠ্যক্রম বিস্তৃত অর্থে একটী মূল জ্ঞানের অভিজ্ঞতার ও অন্তর্নিহিত দৃষ্টির খোঁজ দেয় যাহার চারিদিকে অন্যান্য বিষয়বস্তু শিক্ষাদান করা চলে।

সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু আমরা শুধু বর্তমান আবেষ্টনী হইতে সংগ্রহ করিতে পারি না, যদিও আবেষ্টনীই আমাদের শিক্ষণীয় সূত্র। যদি আবেষ্টনী বলিতে অতীত ও বর্তমানের বিষয়বস্তু বুঝায়, তাহা হইলে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু আবেষ্টনী হইতে সংগ্রহ করিতে আমাদের আপত্তি নাই। অথবা এই বিষয় পুর্বেই আলোচনা করিয়াছি। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু বিজ্ঞান

ভূগোল পৌরবিজ্ঞান অর্থনীতি সমাজ-তত্ত্ব ইত্যাদি হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে, যদিও সমস্ত জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিয়াই সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু রচিত হইবে। Encyclopeadia of Educational Research গ্রন্থের সমাজবিদ্যা সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে লিখিত আছে যে, পাঠ্যক্রম রচনাকারীরা অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, কারণ সেগুলি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন আসে না। কিন্তু শিক্ষার্থীরা যে বিষয় মনোযোগ দিয়া আগ্রহ সহকারে শিক্ষা করিবে তাহা হইতেছে জীবনকেন্দ্রিক সমস্যা, আগ্রহের কেন্দ্র ইত্যাদি। যে সমস্ত সমস্যা শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করে, সেইগুলিই শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করিতে সচেষ্ট হয়। সাধারণ ভাবে গবেষণা করিয়া জানা গিয়াছে যে পৃথক পৃথক বিষয়বস্তু হইতে যে জ্ঞান আহরণ করা যায়, সেই জ্ঞান আহরণের মধ্যে শিক্ষার্থীরা তেমন রস খুঁজিয়া পায় না, যে রস তাহারা একত্রিত এবং সমন্বিত বিষয় হইতে খুঁজিয়া পায়। তাহা ছাড়া ইহাও পরীক্ষিত হইয়াছে সে শিক্ষার্থীরা পৃথকীকৃত পাঠ গ্রহণ হইতে সমন্বিত পাঠ গ্রহণে ভাল ফল প্রদর্শন করিয়াছে। এই কারণে ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনও সমাজবিদ্যার সমন্বিত শিক্ষাদানের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

সমাজবিদ্যার সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক দিক বিচার করিতে গেলে দেখিতে হয় ইহারা মানুষের প্রয়োজনমোচনে কতটা সাহায্য করে। মনস্তত্ত্ববিদেরা বর্তমানে আর মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর সমপর্যায়ে ফেলেন না অর্থাৎ মানুষকে সহজাত প্রবৃত্তির দাস বলিয়া বলেন না। তাঁহারা মনে করেন যে মানুষের বিভিন্ন আচার ব্যবহার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি সমস্তই শিক্ষণীয়। ইহা প্রকৃতই আশার কথা, কারণ যেহেতু সকল বিষয়ই শিক্ষণীয়, সেই হেতু বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহার পাঠ্যক্রমরচনারও প্রয়োজন, যাহাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ঐ সমস্ত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিয়া মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মিটাইতে পারে এবং জীবনকে উচ্চ স্তরে লইয়া যাইতে পারে।

জীবনে প্রয়োজনের দিক হইতে সমাজ-বিদ্যার পাঠ্যক্রম রচনা করা প্রয়োজন। মানুষের জীবনে কি কি প্রয়োজন, এবং বিদ্যালয় কিভাবে

সেই সমস্ত প্রয়োজনবোধকে মিটাইতে সক্ষম তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। Flemming তাঁহার The Social Psychology of Education নামক পুস্তকে এই প্রয়োজনবোধগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—(ক) নিরাপত্তার প্রয়োজন (খ) জীবনে ঝুঁকি লইবার প্রয়োজন ও (গ) ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন।

এই প্রয়োজনগুলির মধ্যে নিরাপত্তার প্রয়োজন সর্বাধিক। মানুষ শুধু অভাব-মুক্ত হইলেই হয় না, তাহার প্রয়োজন আরও বেশী, সে নিরাপদ অবস্থায় আছে ইহাই জীবন ধারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। যে সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে সে রহিয়াছে, সেই সামাজিক আবেষ্টনী যাহাতে তাহাকে শ্রদ্ধা করে, তাহার জীবনযাপনে সাহায্য করে, সেই দিকে দৃষ্টি দিবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। নিজের সুসমঞ্জস জীবন যাপনের মধ্য দিয়াই অপরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করা সম্ভব। তাহা হইলেই তাহার জীবনে নিরাপত্তাও আসিবে, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। ঝুঁকি লইবার প্রয়োজন হইতেছে মানুষের নূতন কিছু করিবার ইচ্ছা, নূতন জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা। জীবনের এই প্রয়োজনটি নিরাপত্তার প্রয়োজনের একটি অংশ বিশেষ হইলেও ইহাকে পৃথক করিয়া দেখা হইতেছে এই কারণে যে প্রয়োজনটি মানুষের জীবনকে গতিশীল করিয়া রাখে। মানুষের জীবন স্থিতিশীল নয়। যদি স্থিতিশীল হইত তাহা হইলে তাহার জীবনের কোনই মূল্য থাকিত না। যেহেতু গতিশীল, সেইহেতু তাহার মনের অদম্য আকাজ্ক্ষা তাহাকে নূতনের পথে লইয়া চলিতেছে, তাহার কাছে নিত্য নূতন জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইতেছে। নিত্য নূতনের আকর্ষণই মানুষের অগ্রগতি সূচিত করে। তৃতীয় প্রয়োজনও মানুষের জীবনে অকিঞ্চিৎকর নয়। প্রত্যেক মানুষই তাহার জীবনের ছাপ রাখিয়া যাইতে চায়। সে যে মনুষ্যসমাজের একজন, মনুষ্যসমাজে তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে, ইহা সততই তাহার মনে হয়। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ মানুষকে সমাজের উন্নতিকল্পে কর্মে প্রেরণা দান করে। সমাজকে উন্নীত করিবার জন্য তাহার যাহা কিছু কর্তব্য তাহা সে চিন্তা করিয়া বাহির করে এবং সেই ভাবে সে কর্ম-সম্পাদনও করিয়া থাকে। মানুষ সামাজিক জীব, সে একলা বাস করিতে পারে না, বা সে তাহার একলার ভাব ও চিন্তা নিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের উন্নতির মধ্য দিয়া সে নিজের মনের সন্তোষ লাভ করে।

ব্যক্তিবিশেষের এই তিনটি প্রয়োজন অত্যন্ত বিশেষত্বপূর্ণ, একথা বলাই বাহুল্য। এই তিনটি প্রয়োজন যদি মানুষ তাহার জীবনে না মিটাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার জীবনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, এবং প্রতিক্রিয়াগুলি তাহার জীবনকে অধোগামী করিতে পারে। হয়ত সে সমাজ-জীবন হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়ায় এবং সে নির্বিরোধ জীবনের মধ্যে গুটাইয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে, কিংবা সে অসামাজিক কার্যাবলী করিয়া সমাজ-বহির্ভূত হইয়া যাইতে পারে। দুইই মনুষ্য জীবনের সুষ্ঠু জীবন যাপনের পরিপন্থী। অতএব মনুষ্য জীবনের এই প্রয়োজনগুলি সমাজ-জীবনকে যেভাবে উন্নীত করিতে পারে, সেই দিক হইতে মানুষ যাহাতে জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ এই প্রয়োজনগুলি মিটাইতে সক্ষম হইত গৃহ ও সমাজের মাধ্যমে। গৃহ এবং সমাজ ছিল শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ। পূর্বে গৃহ ছিল বিভিন্ন রূপে কর্মের কেন্দ্র, এবং উহাকে উত্তম শিক্ষালয় বলিলেও আপত্তি ছিল না। পিতা হয়ত অনেক কিছু কাজে দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন, মাতাও হয়ত অনেক কিছু কাজ জানেন। তাঁহারা সর্বদা নানারকম কাজ সম্পাদন করিতেছেন ; তাঁহাদের শিশুরা পিতামাতাকে নানা কাজ করিতে দেখিয়া সেই সমস্ত কাজ ধীরে ধীরে শিখিয়া লইতেছে তাহা ছাড়া সুষ্ঠু কর্ম-সম্পাদনের মধ্য দিয়া তাহারা তাহাদের প্রয়োজনগুলি মিটাইতে সক্ষম হইতেছে। তাহা ছাড়া তাহাদের আছে গ্রাম্য সমাজ। সমাজের বয়স্কদের জীবনযাপন-পদ্ধতি, বিভিন্ন শিশুদের আচার-আচরণ ইত্যাদি দেখিয়াও তাহারা শিক্ষা লাভ করিতেছে। গ্রামের উৎসব, আনন্দ, পূজা পার্বণ ইত্যাদিও তাহাদিগকে কম শিক্ষাদান করিতেছে না। বস্তুতঃ-পক্ষে ঐ জীবন-যাপনই ছিল তখন শিক্ষা। শিশুরা যাহা শিক্ষা করিত, তাহার সমূহ ফলও তাহারা পাইত, তাহারা পাইত অন্যের অনুমোদন ও স্বীকৃতি। দেখা যাইত যে ১২।১৪ বৎসর বয়সের পূর্বেই আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শিক্ষা না করা সত্ত্বেও নিজের আগ্রহ উৎসুক্য ইচ্ছা ইত্যাদি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে দক্ষতা ও কৌশল অর্জন করিয়াছে। সে সমাজের একটি স্থান অধিকার করিয়াছে এবং দলের মধ্যে তাহার ব্যক্তিত্ব প্রকট করিয়াছে। সে এমন একটি পটভূমিকা অর্জন

করিয়াছে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া সে নিজের ও সমাজের মধ্যে তাহার স্থান কোথায় তাহা নিরূপণ করিয়া লয়।

কিন্তু বর্তমান যুগের সঙ্গে ঐ সময়ের সম্বন্ধ কোথায়? শিশু পূর্বে নিজ গৃহ হইতেই অনেক জ্ঞান অর্জন করিত। পিতা ছিলেন তাহার শিক্ষক। কিন্তু আজ পিতা কোথায়? পিতা আজ আর গৃহে থাকিয়া তাহার শিক্ষার আবেষ্টন তৈয়ারী করিতেছেন না। পিতা অন্যত্র নানা কর্মে ব্যস্ত। পিতা এমন জায়গায় কর্ম সম্পাদন করিতেছেন, যেখানে শিশু পিতাকে অনুসরণ করিতে যাইয়া পিতার কর্ম লক্ষ্য করিতেছে না, শিক্ষাও লাভ করিতেছে না। তাহা ছাড়া শিশু সমাজের কাছেই বা শিক্ষা করিবে কি? পরিবার ও সমাজের মধ্যে ব্যবধান নিত্য নূতন রচিত হইতেছে; উৎসব, আনন্দ ইত্যাদি যাহা গ্রামের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহা আজ সমাজের বাহিরে সিনেমা, সার্কাস, থিয়েটার ইত্যাদিতে পর্যবসিত হইয়াছে। ফলে শিশু আজ সমাজ ও গৃহ হইতে বিচ্যুত; গৃহ-কেন্দ্র ও সমাজ-কেন্দ্র যাহা শিশুর কাছে ছিল শিক্ষার আধার, তাহা আজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই কারণেই শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হইয়াছে। শিশু যাহাতে বিদ্যালয় হইতে তাহার সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনগুলি মিটাইতে পারে, তাহারই জন্য বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। বিদ্যালয়ে অবস্থান কালে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিরাপত্তা-বোধ জাগরিত করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই জানিয়াছি ছাত্রছাত্রীদের সুসমঞ্জস বৃদ্ধির জন্য নিরাপত্তাবোধের প্রয়োজন কতটুকু। বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ও যোগাযোগ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি করিবে। এই নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধিকরণ হইতেই ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জন হইবে, ভালবাসা বৃদ্ধি পাইবে, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিবার ক্ষমতা জন্মিবে। আবেষ্টনী সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাহার সঙ্গে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগ ছাত্রছাত্রীদিগকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবে, তাহারা হইবে সুনাগরিক, বিশ্বনাগরিক। মানুষের মনোবৃত্তি গড়িবার এই পন্থাকে অবলম্বন করিতে হইলে যে বস্তুর দরকার তাহা হইতেছে সমাজ-বিদ্যা শুধু পঠনে নয়, হাতে কলমে তাহাকে অর্জন করিতে হইবে।

আমরা এই স্থানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্তমান ভারতীয় জীবনের আলেখ্য গ্রহণ করিয়া দেখিব যাহাতে আমাদের জীবনের সেই সমস্ত মূল্যবান বস্তু

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি যেগুলি ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমরচনায় সাহায্য করিয়া থাকে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলেই স্বীকার করেন যে শিক্ষা মানুষকে উপযুক্তভাবে জীবনধারণ করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। সমাজ-বিদ্যা মানুষের সমস্যার সহিত সম্বন্ধিত, অতএব শিক্ষার যে কোন পরিকল্পনায় সমাজ-বিদ্যার স্থান অত্যন্ত উচ্চে। বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে আর এমন একটি বিষয় নাই, যাহা সমাজ-বিদ্যার মত ব্যবহারিক জ্ঞানের মাধ্যমে জীবনের সমস্যার সমাধানের পথ প্রদর্শন করিতে পারে। সমাজ-বিদ্যার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট একটি বিষয় নয়। ইহা বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার এবং পক্ষান্তরে ইহা এমনই একটি সাধারণ মনোভাবের সৃষ্টি করে, যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের ও সমাজের উভয়েরই প্রভূত উন্নতি হয়। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী বিশেষ বিষয়—যথা ইতিহাস, ভূগোল, পৌরতত্ত্ব ইত্যাদি—শিক্ষা করে না, কিন্তু প্রত্যেক বিষয় হইতে একটা নীতি শিক্ষা করে, যে নীতির মধ্যে সকল বিষয়েরই যোগাযোগ রহিয়াছে এবং প্রয়োজনবোধে সে তাহার নিজস্ব সমস্যার সমাধানে সেই নীতি প্রয়োগ করিতে পারে। অতএব আমরা দেখিতে পাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন ঘটে। অদ্যকার যুবকের সমস্যা ভবিষ্যতে বয়স্কদের সমস্যার মতই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যাঁহারা পাঠ্যক্রম রচনা করিবেন তাঁহাদিগকে সমাজ ও সমাজের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে এবং পরিবর্তনের পটভূমিকায় পাঠ্যক্রমকে রচনাও করিতে হইবে।

আমরা বর্তমানে ভারতীয়দের জীবনধারা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, ভারতীয় জীবনে একটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য রহিয়াছে, তাহা ছাড়া রহিয়াছে সুষ্ঠু জীবনযাপনের উপযুক্ত পরিবেশের অভাব। তাহা ছাড়া আর একটি বিশেষ বিষয় হইতেছে আমাদের জনসাধারণ বর্তমান জীবনকেই ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইতেছে না। জীবন ধারণের জন্য সর্বদাই তাহাদের তাড়া ও পরিশ্রম। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ভারত বহু জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ, স্বাধীনতা-প্রাপ্তি। ভারত যুদ্ধের জন্য বহু অর্থনৈতিক অসুবিধা ভোগ করিয়াছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে নিপীড়িত হইয়াছে, ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থার চরম দুর্দশা আসিয়াছে। ক্রমে ভারত পাইয়াছে

স্বাধীনতা। স্বাধীনতা পাইয়া ভারত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে নাই। ভারতবাসী শুধু ঐ বিরাট পরিবর্তনের নীরব দ্রষ্টা নহে। ভারতকে জগৎ সভ্যতায় স্থান করিয়া লইতে হইবে। ভারত নানা দিক দিয়া অগ্রসর হইতেছে। ভারত কারিগরী ক্ষেত্রেও পিছাইয়া থাকে নাই, কৃষির ক্ষেত্রেও নয়। ভারতবাসীর দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হইতেছে। শুধু ভারতেরই নয়, পৃথিবীর নানা দেশে কতই না পরিবর্তন হইতেছে। আণবিক যুগে গত মহাযুদ্ধে আণবিক বোমার বিধ্বংসী ক্ষমতা যেমন পরিলক্ষিত হইয়াছে, তেমনই বিভিন্ন ঔষধের রোগ-উপশমকারী ক্ষমতাকেও উপেক্ষা করা হয় নাই। বিমানচালনার ফলে যে সকল স্থানগুলির মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেক, আজ সেই ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে, আজ কেহই দূরে নয়, সকলেই প্রতিবেশী। মানুষকে আজিকার নূতন ব্যবস্থার পট-ভূমিকায় নিজেকে মানাইয়া লইতে হইতেছে। ভারতবাসীকেও তাহাই করিতে হইতেছে। যে ভারত তিন দিক সমুদ্র-বেষ্টিত হইয়া এবং একদিকে উচ্চ পর্বত-বেষ্টিত হইয়া ছিল, সেই ভারতকে আজ চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইতে হইতেছে। ভারত কোন গোষ্ঠীতে যোগদান করে নাই, নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। আমাদের আদর্শে আঘাত করিতে চীনেরা উদ্যত, এই অবস্থায় আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়া আমাদের অস্তিত্ব ও সম্মান বজায় রাখিবার জন্য উদ্যোগী হইতে হইতেছে।

তাহা ছাড়া একদিকে যেমন আমাদের কৃষি-প্রধান ভারত শিল্পের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তেমনি আবার আমাদের দেশে লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভারতের বিভিন্ন সমস্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহরাঞ্চল বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্প-কাজ করিবার জন্য বহু লোক গ্রাম হইতে আসিয়া সহরে সমবেত হইয়াছে। পরিবার জীবনের মধ্যেও পরিবর্তন আসিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। কৃষি-প্রধান গ্রাম্য জীবনে পরিবারবর্গের মধ্যে একটা একত্ববোধ ছিল, পিতাকে অবলম্বন করিয়া সন্তানেরা বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু বর্তমানে শিল্পের অগ্রগতিতে পিতা পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া শিল্পকাজে যোগদান করিয়াছে, পরিবার রহিয়া গিয়াছে গ্রামে। পক্ষান্তরে শিল্পকাজে লিপ্ত শ্রমিকদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষারও প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। ফলে শুধু বিশেষ শিক্ষা পাইয়া

মানুষ সমগ্র জীবন হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। নানা প্রকার অপপ্রচার এবং জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ মানুষের জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া নিজের ও সমাজের প্রয়োজন ও সমস্যা সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করিতেছে। ফলে, নৈরাশ্য, অবিশ্বাস ও স্বার্থপরতা সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিতেছে।

বর্তমান সমাজের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকের কাছে নানারূপ প্রশ্নের উদয় হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সমাজ-বিদ্যার অবদান কি হইবে? বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান জটিল পরিবার ও সমাজের অর্থনৈতিক আদর্শে গঠিত এবং তাহারা আমাদের বৃহৎ কৃষ্টি ও সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ। তাহারা কি ভাবে আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়া আমাদের সমাজ-জীবনকে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া জীবনকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে, ইহাই হইতেছে সমাজ-বিদ্যা-শিক্ষকের নিকট সমস্যা।

দেশের বর্তমান সভ্যতার উন্নতির মাপকাঠিতে জীবনে আরও সুন্দর-ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে শিক্ষাগত কি কি উন্নতির পরিকল্পনা করা যায়, ইহাই আমাদের সমস্যা। যাঁহারাই আজ দেশের শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করিতেছেন, তাঁহাদের নিকটই ইহা সমস্যার আকারে দেখা দিয়াছে। সকলেই এই বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিতেছেন এবং সুষ্ঠু জীবন যাপনের উপযুক্ত পরিপূরক হিসাবে যাহা খুঁজিয়া বাহির করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে মিল প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। প্রয়োজনকে যদি আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখি তাহা হইলে আমাদের পাঠ্যক্রম রচনায় উহারা যথেষ্ট সাহায্য করিবে। সমাজ-বিদ্যা পাঠ্যক্রম রচনায় আমাদের প্রয়োজন, শিক্ষার্থীদিগকে নিম্নলিখিত জ্ঞান দান করা বা তাহাদের মনোভাব সৃষ্টি করা—বিশ্বনাগরিতা, পৌরকর্তব্য, অর্থনৈতিক বিচার-বুদ্ধি, সমাজগত ও পরিবারগত বন্ধন ইত্যাদি। উপরি-উক্ত বিষয়গুলি ভালভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, কি ভাবে এইগুলি সমাজ-বিদ্যা পাঠ্যক্রম রচনায় সাহায্য করিয়া থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার মধ্যে একটু অবাস্তবতা দেখা যাইতে পারে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রী নিজের আবেষ্টনী লইয়াই ব্যস্ত। সমগ্র পৃথিবীর খবর লইতে হইলে তাহাকে তাহার সরল পথের

বাহিরে যাইতে হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে নিকটতম আবেষ্টনী সব সময়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। মহাশূন্যে ভ্রমণ, আণবিক বিস্ফোরণকে আমরা আর দূরে সরাইয়া রাখিতে পারি না, অতএব নিকটতম আবেষ্টনের গণ্ডী ধীরে ধীরে বৃহত্তর হইতেছে। অতএব দূর আর আমাদের কাছে অবাস্তব নয়। ভালভাবে জীবনে বাস করিতে হইলে বর্তমানে প্রয়োজন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা। এই বুঝিতে পারার মধ্যে অপরের জন্য কিছুটা মমত্ববোধ থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ একে যেন অন্যের সভ্যতা এবং কৃষ্টিগত অভিজ্ঞতাকে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে, এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে। একের প্রতি অপরের এই সহানুভূতির মনোভাব প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও গড়িয়া উঠিতে পারে, যদি শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি ও মনে মনে উপলব্ধি করিবার শক্তি থাকে। যতই আমরা সকল লোকের মধ্যে যে সব সমস্যা সাধারণ তাহা বুঝিতে পারিব, ততই আমাদের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাইবে। আজ বিজ্ঞানের অবদানের ফলে কোন দেশই আর দূরে নয়, অতএব আমাদের মনে আন্তর্জাতিকতাবোধ বৃদ্ধি করিতে হইবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আন্তর্জাতিকতাবোধকে ঊর্দ্ধে স্থান দিতে গিয়া আমাদের জাতীয় আদর্শগত স্বার্থ যেন কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয়। সুনাগরিক হওয়াই আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য এবং পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করিতে হইলে আন্তর্জাতিক মনোভাব বৃদ্ধি করা একান্তভাবে প্রয়োজন। সমাজবিদ্যার মাধ্যমে এই জ্ঞান দুইটি আয়ত্ত করা যাইতে পারে। সমাজবিদ্যা আমাদের বর্তমান ও অতীতের আবেষ্টনীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সঙ্গে আবেষ্টনীর সম্পর্ক সম্বন্ধ সূচিত করিতেছে। অতএব এই শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের জীবনের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে পারে।

সমাজ-বিদ্যার পাঠ্যক্রম আরও একটি বিষয়ের কাছে বিশেষ ঋণী। আমরা শান্তিতে শুধু বাস করিতে চাই না, আমরা আমাদের দেশের মধ্যে সুনাগরিকরূপে বাস করিয়া নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চাই। সমাজবিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সেই মর্যাদা লাভ করিতে পারি। আমাদের আবেষ্টনী সমাজ, আমাদের আবেষ্টনী আমাদের সরকার এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ। আমাদের গণতন্ত্রে আমাদের নাগরিক হিসাবে কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। পৌর কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান বা সুনাগরিক বলিতে

আমরা ভোটাভুটি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইতে আরও বেশী বুঝিয়া থাকি। আমাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনতন্ত্র, রাজ্যশাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হয়, বুঝাইতে হয় কেন শাসনতন্ত্রগুলি এই ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে এবং কি ভাবে এইগুলি আমাদের গণতান্ত্রিক নীতি সূচনা করিয়াছে। আমাদের প্রয়োজন সমস্ত সরকারী প্রচেষ্টাগুলির সঙ্গে সমাজের কি সম্পর্ক তাহা জানা, সমাজে তাহাদের স্থান কি এবং সামাজিক প্রয়োজনে তাহাদের পরিবর্তন কি ভাবে সাধিত হইতেছে তাহা জানা। প্রত্যেক নাগরিকের জানা প্রয়োজন যে আমাদের সরকার এবং বিভিন্ন জাতীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ও ব্যক্তির প্রয়োজনেই উহা গঠিত। সমাজ-বিদ্যার পাঠে এই সমস্ত বিষয়গুলি জানা যায়; তাহা ছাড়া বর্তমান ও অতীতের আবেষ্টনীর সুসমঞ্জস বিশ্লেষণের ভিতর দিয়াই মানুষ সমাজে তাহার যথাবিহিত স্থান উপলব্ধি করিতে পারে, সে সুনাগরিক হয়।

অর্থনৈতিক বিচারবুদ্ধিও আমাদের জীবনে অত্যধিক প্রয়োজন। এই বিচার-বুদ্ধি লাভও সমাজ-বিদ্যার মাধ্যমে হইয়া থাকে। সমাজ-বিদ্যা পাঠে বিচার বিশ্লেষণ করিবার শক্তি আয়ত্ত হয়, ফলে অর্থ নৈতিক বিচার-বুদ্ধিও জাগ্রত হয়। বলা বাহুল্য, সমাজে আমাদের স্থানই অর্থনৈতিক বিচারদ্বারা প্রভাবান্বিত।

সমাজগত ও পরিবারগত বন্ধন আমাদের জীবনকে বহুলভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে। সমাজ-বিদ্যার মাধ্যমে উহার বিশ্লেষণ ভাল ভাবে করিতে পারি। কিছু দিন পূর্বেও আমাদের দেশের সমাজ ও পরিবারগত বন্ধনের জন্য সমাজ-বিদ্যার দ্বারস্থ হইতে হইত না, ভারতবাসী সমাজ ও পরিবারগত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পরিবারগত বাঁধন অত্যন্ত শক্ত ছিল। সমাজ-ব্যবস্থা কিছুদিন পূর্বেও বিকেন্দ্রীভূত ছিল। বর্তমানে কেন্দ্রীভূত সমাজে পরিবারের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা গিয়াছে, ফলে মানুষের সমাজের জীবনে বিচ্ছিন্নতার ভাব দেখা গিয়াছে। গণতান্ত্রিক জীবন যাপন করিতে হইলে সমগ্র দলের মঙ্গল সাধন প্রয়োজন। পরিবারগত সমস্যায় অংশ গ্রহণ করার ভিতর দিয়া দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়; শুধু তাহাই নয় ব্যক্তিসমূহের মানসিক স্বাস্থ্যও তাহাতে উন্নীত হয়, কারণ ঐক্যের মধ্যে আছে নিরাপত্তা। পরিবার-জীবনে যদি সন্তোষ ও আনন্দ থাকে,

তাহা হইলে অনেক মানসিক উত্তেজনার শান্তি হয় এবং অস্বাস্থ্যকর মনোবৃত্তিরও উপশম হয়। সমাজ-বিদ্যা পাঠের মধ্য দিয়া সমাজের মধ্যে এইরূপ সহযোগিতার মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারে। বর্তমান ও অতীতের আবেষ্টনীর বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া যে শিক্ষা পাওয়া যাইবে, সে শিক্ষা হইবে সহযোগিতার শিক্ষা। অতএব সমাজগত ও পরিবারগত সহযোগিতার জন্য আমাদের সমাজ-বিদ্যার কাছে ঋণী থাকিতে হয়।

সমাজ-বিদ্যা (Social Studies)

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুর জীবনে গণতান্ত্রিক নীতির বিকাশই সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার পূর্ণরূপের বিকাশ তখনই হইবে, যখন শিক্ষার ব্যবস্থাপনার মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের উপযুক্ত সমস্ত রকম মালমসলা মজুদ থাকিবে।

শিশুর মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতির বিকাশের প্রচেষ্টা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর শিক্ষাকালীন অবস্থা হইতেই আরম্ভ হয়। বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক নীতির আদর্শকে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য শিশুর বৃদ্ধি ও বয়সের পরিপক্বতার স্তরের উপর নির্ভর করিয়া নির্ধারিত। পক্ষান্তরে শিশুর আবেষ্টনীও শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। অতএব শিশুর শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে সমাজের প্রয়োজন ও শিশুর প্রয়োজন—এই দুইয়েরই সমন্বয় রহিয়াছে।

শিশুর জীবন ও শিশুর পরিবেশ—এই দুই অবস্থা হইতে শিশুর শিক্ষণীয় বহু জিনিষের উদ্ভব সম্ভব এবং যেখানে এই দুইয়ের মর্যাদা দিয়া ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলে, সেই খানেই শিশুর গণতান্ত্রিক নীতিকে জীবনে হজম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে। শিশুর পরিবেশের সঙ্গে এইরূপ ভারসাম্য স্থাপনের ক্ষেত্রে সমাজ-বিদ্যা (Social Studies) সমগ্র পাঠ্যক্রমে স্থান পাইয়াছে।

সমাজ-বিদ্যা কি ? সমাজ-বিদ্যা বলিতে কি বুঝিতে পারা যায় ? সমাজ-বিদ্যা মানুষ এবং মানুষের সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওতপ্রোত ভাবমিশ্রণ লইয়া কেন্দ্রীভূত। ইহার বিষয়বস্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি-জগতের সম্পর্ক লইয়া নিবদ্ধ। সমাজ-বিদ্যায় মনুষ্য-সমাজে সকলে মিলিয়া একত্র হইয়া কাজ করা এবং সুশৃঙ্খলায় বাস করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মানুষের মূল প্রয়োজনগুলির পরিতৃপ্তি

সাধনে পরিবেশের আচার, ব্যবহার, নীতি, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জীবনের বিভিন্ন অবস্থা, কৃষ্টিগত উত্তরাধিকার, জীবনের সমস্ত গতিশীল বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সকলই সমাজ-বিদ্যার পরিপোষক। (১)

নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সমাজ-বিদ্যা শিক্ষা সাধারণতঃ ইতিহাস, ভূগোল, পৌরশিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি হইতে শিশুর জীবনের প্রয়োজনে, মানুষের সঙ্গে তথা সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আহরণ করিয়া থাকে। এই মালমসলা আহরণ সম্পর্কে একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। শিশুদের সমাজ-বিদ্যা শিক্ষা ব্যাপারে শুধু ততটুকুই বিষয়বস্তু ও তৎসম্পর্কিত কর্ম প্রয়োজন যাহা মানব-সম্পর্কের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী শিশুকে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম। এই হিসাবে সমাজ-বিদ্যা শিক্ষা বিশেষ মর্যাদার দাবী করিতে পারে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নীতির বিকাশই শিশুর জীবনের উদ্দেশ্য। সমাজ-বিদ্যা শিক্ষাও শিশুর পূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করিয়া শিশুকে গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী নাগরিক করিতে চায়। অতএব সেই দিক হইতে সমাজ-বিদ্যা শিক্ষার মর্যাদা দাবী অসঙ্গত নয়।

সমাজ-বিজ্ঞান (Social Science), সমাজ-বিদ্যা (Social Studies) ও সমাজ-শিক্ষার (Social Education) তুলনামূলক বিচার

এইখানে সমাজ-বিজ্ঞান, সমাজ-বিদ্যা ও সমাজ-শিক্ষা—এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে। কোনটি কি বুঝাইতেছে এবং উহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

যে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হইল, ইহাদের প্রত্যেকটিই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কতটা উন্নত ধরণের হইতে পারে, তাহা নিয়াই ব্যাপ্ত। ইহাদের মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞান (Social Science) সর্বপুরাতন এবং অন্যান্য

(১) The Social Studies are the knowledge, activities and skills required of an individual to be effective as a person and as a member of groups. The Social Studies pertain to the relations of human beings—men, women, children—to one another and to the physical environment in which they live, work and play.—Teaching Guide, Social Studies, Kindergarten through grade. Sanfrancisco Public Schools.

বিষয়গুলি হালে আমদানী করা হইয়াছে। সমাজ-বিজ্ঞান বা Social Science বিভিন্ন চিরাচরিত বিষয়, যথা—রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস আইন-শাস্ত্র, নৃতত্ত্ব, ভূগোল ইত্যাদির গবেষণার স্তরের আলোচনা লইয়া নিবদ্ধ। প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে উচ্চ ধরণের বিষয়বস্তু ও গবেষণার মালমসলা আমদানী করা হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত মূল বিষয়বস্তুর গভীর গবেষণা ও আলোচনা হইতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান, মানুষের দলীয় কার্যকলাপ ও অবস্থান, এবং বিভিন্ন দলের সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নূতন সূত্রের উদ্ভাবনা করিতে চেষ্টা করা হইতেছে। সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়বস্তু আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া নূতন জ্ঞান আহরণের জন্য চেষ্টা করাই হইতেছে উদ্দেশ্য। এই নূতন জ্ঞান মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করিবে। ঐ সম্বন্ধে আলোচনা শুধু মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে হইতে পারে। সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতেছে গবেষণায়, আবিষ্কারে এবং পরীক্ষণে। সমাজবিজ্ঞানী মানুষের জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত করিতে প্রয়াসী। তাঁহার গবেষণা এবং পরীক্ষাপ্রসূত বিষয়সমূহ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে উপযোগী না হইতে পারে, কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয়সমূহের মধ্যে একটা গভীর তথ্য নিবদ্ধ থাকিবে যে তথ্যের একটা সামাজিক মূল্য এবং গুরুত্ব থাকিতে পারে। সমাজ-বিজ্ঞানীর গবেষণাপ্রসূত তথ্যগুলি জটিল হইতে পারে, এবং উহার সামাজিক মূল্য আছে বলিয়াই সমাজ-বিজ্ঞানী জটিল বিষয়সমূহকে সহজ করিয়া সকলের উপযুক্ত করিয়া পরিবেশন করিবেন না। হইতে পারে তাঁহার আবিষ্কার সমাজের উপকারে লাগিবে, কিন্তু তাই বলিয়া জটিল সমস্যাপূর্ণ বিষয়কে সকলের জন্য সহজ সরল করিবার দায়িত্ব তাঁহার নয়।

পক্ষান্তরে সমাজ-বিদ্যার (Social Studies) ক্ষেত্রে এই বিষয়ের সমস্ত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর অধিগম্য হওয়া প্রয়োজন। তাহা যদি না হয় তাহা হইলে এই শিক্ষার মূলই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, কারণ এই শিক্ষার আসল রূপই হইতেছে শিক্ষার বিকিরণে। অতএব সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে সমাজ-বিদ্যা হইবে অত্যন্ত সহজ, সরল, হৃদয়গ্রাহী এবং শিশুর গ্রহণযোগ্য।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক লইয়া সমাজ-বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিদ্যা শিক্ষা, উভয়ের ক্ষেত্র। স্তরভেদে উহাদের পার্থক্য। একটি বিশিষ্ট

শ্রেণীর বয়স্কদের জন্য সমাজ-বিজ্ঞান, কিন্তু সমাজ-বিদ্যা হইতেছে শিশুদের স্তরের জন্য শিক্ষা। অতএব দেখা যাইতেছে যে সমাজ-বিদ্যা শিক্ষা বস্তুতঃপক্ষে সমাজ-বিজ্ঞান হইতেই প্রসূত। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে Committee on Social Studies of the National Education Association সমাজ-বিদ্যা শিক্ষাকে (Social Studies) সরকারী মর্যাদা দেয় এবং তখন হইতেই এই বিষয়টি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অতএব সমাজ-বিদ্যা আর কিছুই নয়—ইহা সমাজ-বিজ্ঞানেরই সাধারণ ও সহজ সংস্করণ এবং উহা অল্প বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। (১)

তিনটি বিষয়ের মধ্যে সমাজ-শিক্ষা (Social Education) হইতেছে আরও হালের বিষয়। ইহা বর্তমানে যে রূপ নিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে সমাজ-বিজ্ঞান বা সমাজ-বিদ্যা হইতে আমরা সমাজকে উন্নত করিবার যে নীতিগুলি বিচার, গবেষণা ও পরীক্ষার পর আহরণ করিতে পারি, তাহার প্রয়োগের ক্ষেত্রই হইতেছে সমাজ-শিক্ষা। বলা বাহুল্য, সমাজকে উন্নত করিবার যে কর্মসূচী দেওয়া হইবে তাহা সবই শিক্ষামূলক কর্ম হইবে। আমাদের পরিবেশের নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উন্নত জীবনের বিকাশের দায়িত্ব আমাদের বিদ্যালয়গুলির। অতএব বিদ্যালয়-গুলির শিক্ষক ও ছাত্রসম্প্রদায় এই সমাজ-শিক্ষার গুরু দায়িত্ব বহন করিবে।

সমাজ-বিজ্ঞান, সমাজ-বিদ্যা ও সমাজ-শিক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। এইক্ষণে আমরা সামাজিক-শিক্ষা (Social Learning) সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাহিরে অর্জিত অভিজ্ঞতা হইতে শিশুর যে সামাজিক বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়, তাহাকেই শিশুর সামাজিক শিক্ষা (Social Learning) বলা হইয়া থাকে। সামাজিক-শিক্ষা সমাজ-বিদ্যা-শিক্ষার অন্তর্গত।

শিশুর প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা যাহা শিশুর সামাজিক বিকাশে সাহায্য করে তাহাই হইতেছে সামাজিক-শিক্ষা। শিশুর জীবনে বহু ক্ষেত্র আসিয়া

(১) "The social studies are the social sciences simplified and reorganised for instructional purposes. Thus the distinction between social sciences and social studies is not philosophical or even theoretical ; it is merely practical, a matter of convenience."—Welsey.

নিয়ত ঘাতপ্রতিঘাত করিয়া থাকে। প্রতিদিন সে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। তাহাকে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশিতে হয়, খেলাধূলা করিতে হয়, গৃহে খাবার-ঘরে বসিয়া খাইতে হয়, পিতামাতা ও বয়স্কদের সঙ্গে নানা কাজে লিপ্ত থাকিতে হয়, বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে বসিয়া পড়িতে হয়, কাজ করিতে হয় ইত্যাদি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে, সে একক নহে, বহুর সঙ্গে কিংবা দলের সঙ্গে তাহাকে কাজ করিতে হয়। অতএব বিদ্যালয়ে যদি শিশু দলের মধ্যে থাকিয়া, উপযুক্ত রকমে নিজের এবং অপরের মর্যাদা দিয়া কাজ করিতে শিক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে শিশুর সামাজিক শিক্ষা কার্যকরী হইবে এবং তাহার বিদ্যালয়ের বাহিরের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রেও এই শিক্ষা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে সামাজিক শিক্ষার নীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে, তাহা হইলে শিশুর জীবনের প্রতিক্ষেত্রে উহা প্রতিফলিত হইবে, শিশুর জীবনের সুষ্ঠু বৃদ্ধি হইবে।

সমাজ-বিদ্যা—আদর্শ ও উদ্দেশ্য

পাঠ্যক্রম সাধারণতঃ দুইটি বিষয়ের সূচনা করে—প্রথমতঃ ইহা কতটা মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে উহা কতটা সাহায্যকারী। এইখানে সমাজ-বিদ্যা ছাত্রছাত্রীদের বিকাশের পক্ষে কতটা কার্যকরী এবং উহার সামাজিক মূল্য কিরূপ তাহাই আলোচনা করা হইবে।

সমাজ-বিদ্যার প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে ছাত্রছাত্রীদিগকে সমাজ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা প্রদান। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেই সমাজ সম্বন্ধীয় জ্ঞান কিছুটা অর্জন করিয়াছে। গৃহে থাকাকালীন অর্থাৎ বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে তাহাদিগকে পিতামাতা, অভিভাবক, গ্রামের লোক, খেলার সাথী ইত্যাদি সকলের সঙ্গে নানা বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইয়াছে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সম্বন্ধে তাহাদের একটু ধারণা জন্মিয়াছে। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর তাহাদিগকে আরও বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতা গ্রহণের সুযোগ পাইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ ছাত্রছাত্রীদের এই যে অর্জিত অভিজ্ঞতা, ইহাকে আরও সুদূরপ্রসারী করিতে হইলে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদিগকে সমাজকে জানিবার

জন্য কতকগুলি কৌশল বা দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে। অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীর যথাযোগ্য মর্যাদা দান, বিপক্ষীয় মতামতে সহনশীলতা,—এই জাতীয় গুণার্জন ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সমাজ-বিদ্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সকল গুণার্জনে সহায়তা করিয়া থাকে। অতএব বিদ্যালয়ে যদি সমাজ-বিদ্যার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রসারিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

তৃতীয়তঃ সমাজ-বিদ্যায় মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতার সীমাও বর্ধিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইবার ফলে সমাজের উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও সচেতন হইয়া উঠে, এবং মানব সমাজের অর্জিত জ্ঞানের অধিকারী হয়। সমাজ-বিদ্যার বিশেষত্বই এই যে উহা সমাজের উত্তরাধিকারকে বিশ্লেষণ করিবার মত দৃষ্টিভঙ্গী ছাত্রছাত্রীদিগকে প্রদান করে এবং ফলে ছাত্রছাত্রীরাও ঐ উত্তরাধিকারকে দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে।

চতুর্থতঃ সমাজ-বিদ্যার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হইতেছে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের অপারকতা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রদিগকে অবহিত করা। সমাজের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইলেই এ কথা বলা চলে না যে, সমাজ যে সকল দোষে দুষ্ট সেই সব দোষত্রুটিগুলির অপসারণ করা সম্ভব। সমাজের অস্থিমজ্জাতে যে সব ত্রুটি বহু দিনের অবহেলায় দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তাহা উৎখাত করিতে হইলে ছাত্রছাত্রীদের দলগতভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। মূল সমস্যার সঙ্গে তাহারা মুখোমুখী দাঁড়াইবে, অতএব তাহাদের পক্ষেই ঐ জাতীয় সংগ্রাম সম্ভবপর। সমাজ-বিদ্যায় যে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী ছাত্রছাত্রীরা লাভ করে, সেই দৃষ্টিভঙ্গীই তাহাদিগকে সমাজকে দোষমুক্ত করিবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে।

সমাজ-বিদ্যার উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এই স্থলে মানুষের জীবনধারণের মধ্যে যে সব প্রয়োজনীয় চাহিদা আসিয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রতি মানুষ নিজের চাহিদা পূরণের দাবীর মধ্য দিয়াই সমাজের দাবী জানাইয়া থাকে। নিজস্ব ক্ষুদ্র গণ্ডী ধীরে ধীরে বৃহত্তর গণ্ডীতে যাইয়া ব্যাপ্ত হয়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মানুষ চায় খাদ্য, বস্ত্র ও আবাস, নিরাপত্তা, আনন্দ, সুখ, সাফল্য। গণ্ডী বৃহত্তর হইলে সমাজের স্তরে দাঁড়াইয়া মানুষ চায় ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার,

ব্যক্তির মর্যাদা, সাম্য, মৈত্রী, গণতন্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক চেতনা-বোধ ইত্যাদি।

মানুষের এই যে চাহিদা, ইহার পরিবর্তন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে ঘটিয়াছে ; কৃষ্টির পরিবর্তনের সাথে মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কোন চাহিদা আবার সাময়িক, এবং কোন চাহিদা যুগ-যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র, আবাস, নিরাপত্তা, সহযোগিতা, স্বাধীনতা—এইগুলি হইতেছে মানুষের মূল প্রয়োজন ও মূল চাহিদা। এই সব মূল প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং জাতীয় আদর্শের যথেষ্ট যোগাযোগ রহিয়াছে। এই মূল জিনিষগুলির উপর নির্ভর করিয়াই কোন দেশ তাহার নিম্নতম শিক্ষার উদ্দেশ্যকে স্থির করিয়া লয় এবং তাহার পর মূল প্রয়োজনও চাহিদার সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজন ও চাহিদার সমন্বয় করিয়া জাতীয় শিক্ষার আদর্শকে সমৃদ্ধ করিয়া থাকে।

সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই যে মানুষের চাহিদা রহিয়াছে তাহা নয়, জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতেও দেশের চাহিদার সৃষ্টি হইয়া থাকে। দেশের চাহিদা সাধারণতঃ হইতেছে গণতান্ত্রিক নীতির সম্প্রসারণ, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রসার, যুদ্ধ নিবারণ, শান্তি স্থাপন, আণবিক অস্ত্রাদির ব্যবহার বর্জন, দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রবর্তন, জীবনযাপনের মান বৃদ্ধিকরণ, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিকরণ, স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়ার প্রবর্তন, সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন, শিক্ষার সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

জাতীয় আদর্শের চাহিদাগুলি শিক্ষকের কাছে বিশেষ মূল্যবান। দেশ যাহা চায় তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার সূত্রধারা সুগঠিত হইবে। জাতীয় আদর্শের ধারক ও বাহক হিসাবে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রহিয়াছে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই জাতীয় আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ হইবে। শুধু বিদ্যালয়ের দায়িত্বই মুখ্য নয়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টাকে সমভাবে সাহায্য করিবে। বিদ্যালয় ব্যতিরেকে এইরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতেছে গৃহ, সমাজ, সরকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ, জনসঙ্ঘ ইত্যাদি। প্রতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই সামাজিক বা জাতীয় আদর্শ দানা বাঁধিয়া উঠিবে। সহযোগিতার কথাই ধরা যাউক না কেন। সহযোগিতা একটি সামাজিক আদর্শ, ইহার সুপ্রকাশ হইতে পারে সমাজ ও জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে

সহযোগিতার ভাবধারা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় যথেষ্ট পরিমাণে তৎপর হইতে পারে, ছাত্রছাত্রী সভা গঠন করিতে পারে, একযোগে কাজ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, কিন্তু গৃহ যদি ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতামূলক ক্রীড়ায় নিরুৎসাহিত করিয়া বা বাধাপ্রদান করিয়া থাকে কিংবা যদি সরকার, বা সঙ্ঘ বা সমাজ যদি সহযোগিতায় উৎসাহের অভাব দেখায়, তাহা হইলে সহযোগিতার ক্ষেত্রে সমাজ অগ্রণী হইতে পারিবে না। জাতীয় আদর্শের ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক নীতির সম্প্রসারণের উদাহরণ ধরা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থাপনা চলিতে পারে, কিন্তু সরকার, সঙ্ঘ, গৃহ, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি যদি উহার সম্পূর্ণ অনুমোদন না করে তাহা হইলে গণতান্ত্রিক নীতির সম্প্রসারণও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। কিন্তু এইভাবে সমস্ত বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। যদি বিদ্যালয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রের সাহায্য ব্যতিরেকে জাতীয় আদর্শকে রূপায়িত করিতে না পারে তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রগুলিও বিদ্যালয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তাহার কারণ হইতেছে বিদ্যালয়ই ভাব-সমন্বয় ও মনোগতির দানা বাঁধিবার স্থান। এইখানে মনের স্তরে দানা বাঁধিলে বহিঃক্ষেত্রে উহা অতি অবশ্য প্রভাব বিস্তার করিবে। এই কারণে বিদ্যালয় যে ভাবে পথ প্রদর্শন করিবে, সেই দিকে জনসাধারণের মনের গতি ফিরিতে বাধ্য।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যই সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য বিষয়। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের মধ্যে কতকগুলি বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকিবে। প্রথম কথা হইতেছে, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের মধ্যে সামাজিক উৎকর্ষমূলক উদ্দেশ্য নিহিত থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য এমন ভাবে রচিত হইবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা সেই উদ্দেশ্যকে সহজে অনুসরণ করিতে পারে। তৃতীয়তঃ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের কার্যকারিতা সম্বন্ধে যেন বিদ্যালয় নিঃসংশয় হইতে পারে। চতুর্থতঃ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য যেন বিদ্যালয়ের কর্মের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করা সহজ হয়। ইহা ছাড়া শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সামাজিক বা জাতীয় আদর্শ হইতে যেন কোনও প্রকারে বিচ্যুত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সমাজ-জীবন ও জাতীয়-জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-বিদ্যার উদ্দেশ্যকে কি ভাবে স্থির করা যাইবে, সেই বিষয়ে

আলোচনা প্রয়োজন। উক্ত উদ্দেশ্য ও আদর্শের পট-ভূমিকায় যে সমাজ-বিদ্যার উদ্দেশ্য রচিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক-শিক্ষিকারা সম্মিলিতভাবে সমাজ-বিদ্যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। এককভাবে ইহার উদ্দেশ্যকে বিচার করিয়া দেখিবারও অবকাশ রহিয়াছে। যেভাবেই হউক, সমাজ-বিদ্যার উদ্দেশ্যগুলি বিভিন্ন মণ্ডলের (Zone) শিক্ষক-শিক্ষিকারা কোন রূপ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মাসিকপত্রে প্রকাশ করিবেন এবং এই ভাবে বিভিন্ন মণ্ডল একে অপরের চিন্তাধারা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে। সমাজ-বিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল উদ্দেশ্য বিভিন্ন সমাজ-বিদ্যা শিক্ষক এবং বিভিন্ন শিক্ষাবিদেরা সমাজ-বিদ্যার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা মোটামুটি স্থির করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য এইগুলিকেই চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে না। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ইহার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

সমাজ-বিদ্যার আদর্শ উদ্দেশ্যগুলি হইতেছে—(ক) সমাজের বিভিন্ন দিক ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ (খ) ছাত্রছাত্রীর চরিত্রের উপযুক্ত বিকাশ, (গ) ব্যক্তিত্বের বিকাশ (ঘ) আনন্দের সঙ্গে সহযোগিতা (ঙ) সুষম ব্যবহার দ্বারা গৃহের আনন্দবর্ধন (চ) ঐরূপ ব্যবহারে সমাজে আনন্দবর্ধন (ছ) দলগত কাজে অংশগ্রহণ (জ) অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীর উপযুক্ত মর্যাদা দান (ঝ) উদার মনোভাব (ঞ) পরস্পর-নির্ভরতা (ট) দায়িত্বগ্রহণ (ঠ) সুনাগরিক হওয়া (ড) পৌরকর্তব্য পালন (ঢ) গণতান্ত্রিক নীতির সম্প্রসারণ (ণ) চারুকলার উপযুক্ত মর্যাদা দান।

পাঠ্যক্রম

সমাজ-বিদ্যার এই আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমাজ-বিদ্যার পাঠ্যক্রম রচনা করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হইলে ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ বয়ঃক্রম, উপযোগিতা, ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক প্রয়োজনীয়তা, পৌর-প্রয়োজনীয়তা, আগ্রহ উদ্রেকের ক্ষমতা, শিক্ষারম্ভের উপযুক্ততা, বিষয়ের নির্ভুলতা ইত্যাদির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তবেই পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হয়। কিন্তু এইগুলি সাধারণ নীতি। ইহা ছাড়া পাঠ্যক্রম রচনার জন্য আরও নির্দিষ্ট নির্দেশিকার প্রয়োজন। সাধারণতঃ যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া পাঠ্যক্রম রচনা

করা হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট, বিভিন্ন শিক্ষাবিদের মতামত, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সম্পর্কিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিমত, শিশুদের কর্ম, শিক্ষাগত ত্রুটি ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত নির্দেশিকার সঙ্গে, যে সাধারণ নীতিগুলি পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকিবে।

প্রথমতঃ পাঠ্যপুস্তকের কথাই ধরা যাউক না কেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করা হইবে, সেই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বহু বিষয়ের বহু বই পূর্বেই রচিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বই লিখিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে চিন্তাশীল লেখকের অভাব নাই। তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অবহেলা করার বস্তু নয়। অতএব এই সমস্ত বহু বই হইতে পাঠ্যক্রম রচনার জন্য বিষয়গত কিছু মালমসলা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। একটি উদাহরণের সাহায্য লইলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে। বর্তমানে প্রায় প্রথম শ্রেণী হইতেই (প্রথম শ্রেণীতে ছবির বই হিসাবে বহু পুস্তক অনুমোদিত রহিয়াছে। উহা পাঠ্যপুস্তক নহে) বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সাহিত্যে উপপাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা রহিয়াছে। উপপাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থার পূর্বে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের উপযোগী বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব উপপাঠ্য পুস্তকের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করিতে পাঠ্যক্রম সমিতির সভ্যবৃন্দ যে এই সময়ে প্রচলিত পুস্তক হইতে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট পাঠ্যক্রম রচনায় বিশেষ কার্যকরী। সাধারণতঃ কোন বিষয়ের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করিবার প্রয়োজন হইলে একটি উপদেষ্টা সমিতির উপর উহার রচনার ভার দেওয়া হয়। এই সমিতি সমস্ত সাধারণ নীতি ও নির্দেশিকাগুলি বিবেচনা করিয়া পরীক্ষামূলক পাঠ্যক্রম রচনা করিয়া দেন। এই পাঠ্যক্রম চালু করার পর ইহার সুবিধা-অসুবিধাগুলি বিচার করা হইয়া থাকে।

উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট ছাড়াও ঐ বিষয়ের বিভিন্ন শিক্ষাবিদের নিকট হইতে মতামত সংগ্রহ করা যায়। তাঁহাদের মতামতের উপরে নির্ভর করিয়াও পরীক্ষামূলক পাঠ্যক্রম রচনা করা চলে।

পরীক্ষামূলক পাঠ্যক্রম শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনুসরণ করিয়া থাকেন। পাঠ্যক্রমে কোথায় ফাঁক রহিয়াছে, কোন্ অংশটি ত্রুটিপূর্ণ, কোন্ অংশটি

বিশেষভাবে উপযুক্ত, তাহা তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন। তাহা ছাড়াও তাঁহারা নিজেরাও স্থানীয় সমস্যার পটভূমিকায় পাঠ্যক্রম রচনা করিয়া থাকেন। পাঠ্যক্রম রচনায় এই দুই অবস্থারই উপযুক্তরূপ গুরুত্ব দান প্রয়োজন।

শিশুরা বিভিন্ন বয়সে স্বাধীনভাবে যে সব শিক্ষামূলক কর্ম করিয়া থাকে তাহা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ ঐ কর্মগুলি শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। শিক্ষাগত ত্রুটিও পাঠ্যক্রমনির্ণয়ে বিশেষ নির্দেশিকা। অনেক সময়ে আমরা দেখিয়া থাকি যে কোন-একটি স্তরের শিশুরা কোন একটি বিষয়ে অনভিজ্ঞ। যদি বহু শিক্ষক সেই স্তরের শিশুদের ঐ বিষয়টির অজ্ঞতাকে ত্রুটি বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে ঐ বিষয়টি পাঠ্যক্রমে অনায়াসে স্থান পাইতে পারে।

সমাজ-বিদ্যা ও পাঠ্যক্রম

সাধারণ নীতি ও যে সকল নির্দেশিকার কথা আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে সমাজ-বিদ্যা বিষয়ের পাঠ্যক্রম রচনা করিবার নির্দেশ পাওয়া যাইতে পারে। শিশুকে গণতান্ত্রিক নীতিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী করা এবং তাহাকে ঐ ভাবে জীবনে চলিতে সমর্থ করাই হইতেছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমাজ-বিদ্যার উদ্দেশ্যও তাহাই, তাহা ছাড়া উহার উদ্দেশ্যগুলি আরও স্পষ্ট করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া উপরে বিবৃত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে শিশুর রহিয়াছে তাহার অর্ধপরিচিত আবেষ্টনী। আবেষ্টনী ও পরিবেশের প্রভাবও শিশুর জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত দিক্ বিচার করিয়া সমাজ-বিদ্যার পরীক্ষামূলক পাঠ্যক্রম রচনা করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞতা ও অভিমতের মাপকাঠিতে উহার রদবদল নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে।

সমাজ-বিদ্যা বিষয়টি আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অত্যন্ত অল্পদিন হইল স্থান পাইয়াছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক উহা এই বৎসর চালু করা হইয়াছে। সমাজ-বিদ্যার ভিতরে ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরশিক্ষার মূল বিষয়গুলি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রাখা হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়গুলি স্থির করিবার কালে প্রথমতঃ জীবনযাত্রা নির্বাহ, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, জীবনী শক্তি বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষা এবং স্থানীয় কাঁচামালের রপ্তানীর জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা, শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ছাত্রছাত্রীরা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অভিজ্ঞতার সীমারেখা বৃদ্ধি করিবে। ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক সমস্যাগুলির সীমারেখা বৃদ্ধিকরণই হইতেছে সমাজ-বিদ্যার কার্যক্রম। ছাত্রছাত্রীরা যতই পরিপক্ক হইবে, ততই তাহারা নূতন ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে যাইবে। তৃতীয়তঃ সমাজ-বিদ্যার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করিবার ফলে বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা, বিশ্বশান্তি, জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান, নিরাপত্তা পরিষদ প্রভৃতিও ছাত্রছাত্রীগণের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীরা নিরাপত্তা পরিষদের অনুকরণ করিয়া বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি হিসাবে কোন সমস্যা নিজেদের মান অনুযায়ী আলোচনা করিতে পারে। চতুর্থতঃ এই সকল কাজের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম করিবার প্রবণতা জন্মে এবং তাহারা গণতান্ত্রিক নীতিকে জীবনে গ্রহণ করিয়া চলিবার মত শিক্ষা পাইয়া থাকে।

সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক

বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বুনিয়াদী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর সকল বিষয় শিক্ষাদান করিবার উপযুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষাদান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হয় না। চিত্রকলা, সঙ্গীত ইত্যাদি শিক্ষাদান সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকারা উপযুক্তভাবে করিয়া উঠিতে পারেন না, তবে মোটামুটি তাঁহারা সে সমস্ত বিষয়েও কিছুটা পরিচালনা করিবেন, এইরূপও মনে করা হইয়া থাকে। সঙ্গীত ও চিত্রকলা শিক্ষাদান করিতে হইলে বিশেষ পারদর্শিতার প্রয়োজন। কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রেই যখন বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের কোন বন্দোবস্ত নাই, তখন অন্য কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের জন্য যে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। এদিকে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের যে পাঠ্যক্রমকে অতিক্রম করিয়া শিক্ষণাধীন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষণকাল সমাপ্ত করিতে হয়, সেই পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন সমস্ত বিষয়বস্তু ও মালমসলার সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে যে শিক্ষণ সমাপনান্তে তাঁহাদিগকে বুনিয়াদী বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদান করিতে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। মাতৃভাষা, অঙ্ক ইত্যাদি শিক্ষাদানে তাঁহারা যেরূপ দক্ষতা অর্জন করেন, সমাজ-পাঠনেও তাঁহাদের একইরূপ যোগ্যতা

থাকে। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, বুনিয়াদী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষককেই এবং বিশেষ করিয়া যাঁহারা সমাজ-বিদ্যা বিষয়টির শিক্ষাদান পরিচালনা করিবেন তাঁহাদের অপরাপর বিষয়গুলি ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ধারণা ও জ্ঞান রহিয়াছে। সংক্ষেপে বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ সমাজ-বিদ্যার শিক্ষককে শিশুর জীবনের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত থাকিতে হয়। তিনি শিশুদের প্রকৃতি, আগ্রহ, শক্তি, বৃদ্ধি, গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত থাকিবেন। এইগুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকার অর্থই হইতেছে যে মনস্তত্ত্ব শিক্ষার আধুনিক গতি, শিশুর বিকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষকের বিশেষ জ্ঞান থাকা।

দ্বিতীয়তঃ সমাজ-বিজ্ঞান এবং বর্তমান চলতি সমস্যা ও ঘটনাদি সম্বন্ধে শিক্ষকের অবহিত থাকা। সমাজ-বিজ্ঞানের প্রয়োজন এই জন্য যে উহাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের সমাজ-বিদ্যার কর্মাদি অনুসরণ করা সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত হয়। কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলে একমত হইলেও ঐ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের সম্যকরূপে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনার কালে লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা ও আবিষ্কারে এবং উহা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা মহাবিদ্যালয়ে অনুসৃত হইতে পারে। অতএব সাধারণতঃ যাঁহারা প্রবেশিকা পাশ করিয়া শিক্ষকতা করিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে উচ্চস্তরের সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রগুলি জানা অসুবিধাজনক। কিন্তু শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ে এক বৎসর কালীন ট্রেনিং পাওয়ার সময় কর্মের ভিতরে ও জীবনের ক্ষেত্রে সমাজ-বিজ্ঞানের যে সূত্রগুলি শিক্ষক-শিক্ষিকারা জীবনে রূপায়িত করিয়াছেন, তাহার মূল্যও কম নয়। অতএব মোটামুটি ভাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আছে। তা ছাড়া বর্তমান চলতি সমস্যা ও ঘটনাগুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের সাধারণ জ্ঞান আছে ইহা বোধ হয় স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লওয়া যায়। বর্তমান চলতি-সমস্যা ও ঘটনাবলী অধিগত থাকার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সমাজ-বিদ্যা শিক্ষাদানে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইতে সক্ষম হন।

সমাজ-বিদ্যা শিক্ষকের তৃতীয় অবশ্য-কর্ম হইতেছে পাঠ্যক্রম রচনায় সহায়তা করা। তাঁহারা কর্মক্ষেত্রে রহিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেই সমাজ-বিদ্যা

পাঠ্যক্রমের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভবপর। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ও শিক্ষা-অর্জনের ক্ষেত্রে কোন শিক্ষণীয় ইউনিট কতটা কার্যকরী, তাহা শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষেই যাচাই করিয়া দেখা সম্ভব। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রের রদবদল প্রয়োজন, স্তরভেদে উহার পুনরায় বিন্যাসেরও প্রয়োজন। এ-সব কাজ শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়া আর কে করিতে পারেন? শিক্ষকদের মুখপাত্র হিসাবে বিভিন্ন মণ্ডলে (zoneএ) যদি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সুবন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সমাজ-বিদ্যা পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনের সম্পর্কিত মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন। ফলে বিভিন্ন মতের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া কোন কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষে পাঠ্যক্রমের রদবদল সুপারিশ করা সম্ভব হইতে পারে।

চতুর্থতঃ সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক-শিক্ষিকার আরও একটি বিশেষ কাজ রহিয়াছে। আমরা সমাজ-বিদ্যা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করিবার কালে দেখিয়াছি যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক লইয়াই হইতেছে সমাজ-বিদ্যার বিষয়-বস্তু। ছাত্রছাত্রী ও ও তাহার বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে শিক্ষককে 'হাইফেন' বা যোগাযোগ-রক্ষক বলা যাইতে পারে। সমাজ-বিদ্যার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে কোন রূপ খেই না হারাইয়া ফেলিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা সর্বদা সচেতন থাকিবেন। তাহা ছাড়া মানবসম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সমাজের নিকট বিদ্যালয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা, কিংবা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সমাজকে তুলিয়া ধরা, কিংবা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের যোগাযোগ স্থাপন করা ইত্যাদি হইতেছে সমাজ-বিদ্যা শিক্ষকের অবশ্যকর্তব্য কাজ।

সমসাময়িক চলতি খবর ও সমাজ-বিদ্যা

সাধারণতঃ সমসাময়িক চলতি খবরগুলি হয় রাজনৈতিক না হয় সামাজিক, না হয় অর্থনৈতিক কিংবা ভৌগোলিক পর্যায়ে পড়ে। খবরের কাগজের পাতাগুলির খবরগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিলে সাধারণতঃ সব খবর-গুলিকেই ঐ চারিটি ভাগে বিভাগ করা যায়। এই সমসাময়িক ঘটনাগুলির বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহারা বর্তমান সময়ের ঘটনা এবং বর্তমান জীবনের সঙ্গে জড়িত। জীবনের সঙ্গে জড়িত থাকিয়া এই ঘটনাগুলি মানুষের

মনে আগ্রহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে, এবং অতীতের অনুরূপ ঘটনা হইতে উহারা মানুষের বেশী বোধগম্য হয়। বিধানসভার নির্বাচনের খবর, মন্ত্রীসভা গঠন, বিনোবা ভাবের বক্তৃতা, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা, কাশ্মীর সমস্যা, দিন-দুপুরে রাহাজানি, প্রবল ঘূর্ণিব্যাত্যা, ধর্মঘট, ইত্যাদি প্রতিদিনের খবরের কাগজের বিষয়বস্তু। এই সমস্ত ঘটনাগুলির মধ্যে কোন কোন খবর অতিশয় সাময়িক, আবার কোন কোন ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক-শিক্ষিকা অপ্রয়োজনীয় খবরগুলিকে পরিহার করিয়া যে সমস্ত খবর বা ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, সেই সমস্ত ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করিতে পারেন। কিন্তু ইহার পূর্বে এই সমসাময়িক চলতি খবরগুলি জানার উদ্দেশ্য কি হইতে পারে তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি। ছাত্রছাত্রীদের এই খবরগুলি জানিবার উদ্দেশ্য হইতেছে খবরগুলি বিচার ও যুক্তির দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা, পরস্পর-বিরোধী খবর, সামঞ্জস্যবিহীন মতবাদ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিবার মত দক্ষতা অর্জন, ঘটনা ও অভিমতের মধ্যে, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও নগণ্য ঘটনার মধ্যে, স্থায়ী নীতি ও সাময়িক ধারা ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারার মত ক্ষমতা অর্জন, উপযুক্ত মতামত ব্যক্ত করিবার মত শক্তির বিকাশ, সহনশীলতা ও সহানুভূতিশীলতার উন্নতিকরণ, গণতান্ত্রিকনীতিতে বিশ্বাস উৎপাদন, বিশ্বশান্তিতে আগ্রহ উৎপাদন ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া সমসাময়িক খবরগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের ক্ষেত্রে কাজে লাগান যাইতে পারে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ব্যাপারে সমসাময়িক ঘটনাগুলিকে কি ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। সমসাময়িক ঘটনাগুলি কি? এইগুলি কি পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয়, না উহা কতগুলি উদাহরণের ভাণ্ডার স্বরূপ, না উহা শিক্ষাদান-পদ্ধতি, না প্রেরণা যোগাইবার ক্ষেত্র, না উহা সমস্যা—কোন্‌টি? প্রত্যেকটি অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যায়।

অনেকের মতে সমসাময়িক ঘটনাসমূহ পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত একটি বিষয় হওয়া উচিত। ইতিহাস, ভূগোল, পৌরশিক্ষা, ইত্যাদি বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে যে যে বিষয় রহিয়াছে; তাহার মধ্যে সমসাময়িক ঘটনাগুলি আধুনিক সমস্যা হিসাবে যুক্ত হইবে। বিভিন্ন বিষয়ের আধুনিক গতিগুলি

যেহেতু পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ নাই, সেই হেতু শিক্ষক-শিক্ষিকাকে খবরের কাগজের সাহায্য অতি অবশ্যই লইতে হইবে। কিন্তু এইরূপ সংযোজন পূর্বপরিকল্পিত না হওয়ার দরুণ, এই ঘটনাগুলি পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত একটি ভিন্ন বিষয়ের পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে, সমসাময়িক ঘটনা ভিন্ন বিষয় নয়, উহা একটি উদাহরণের ভাণ্ডার। পাঠ্যপুস্তকে যাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহারই পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য সমসাময়িক ঘটনাগুলির সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। এই নীতি অনুসারে শিক্ষক-শিক্ষিকার সমসাময়িক ঘটনাকে অনুসরণ করিবার কোন দায়িত্ব নাই। তাঁহারা প্রয়োজন-অনুযায়ী কোন সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ করিতেও পারেন, আবার নাও করিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ অনেক শিক্ষাবিদ্ সমসাময়িক ঘটনাকে শিক্ষা-পদ্ধতির পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। ইতিহাস, ভূগোল, পৌরশিক্ষা ইত্যাদির মধ্যে অনেক কিছুই অতীতের বিষয় বা শিশুর অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। সমসাময়িক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া অনেক সময় অতীতে যাওয়া সম্ভব হয় কিংবা বর্তমান অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য দুরূহ বিশ্লেষণের কাজেও লাগাইতে পারা যায়। সেই হিসাবে সমসাময়িক ঘটনাকে শিক্ষা-পদ্ধতির পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

চতুর্থতঃ অনেক শিক্ষাবিদের মতে সমসাময়িক ঘটনাসমূহ ছাত্রছাত্রীদের প্রেরণা যোগাইবার ক্ষেত্র বলিয়া মনে করা হয়। যাহা বর্তমানে ঘটে তাহার উপর ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বেশী করিয়া কেন্দ্রীভূত হয়। ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ নির্বাচন হইতে দেখিয়াছে কিংবা অতিমাত্রায় ঝড়-বৃষ্টি হইবে জানিয়াছে বা ভূমিকম্পের সংবাদ পাইয়াছে। এই ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করিয়া ছাত্রছাত্রীদের অতীতের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঝড়বৃষ্টির কারণ কিংবা ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা সহজ হয় বলিয়া বিভিন্ন শিক্ষাবিদের মত। অতএব সমসাময়িক ঘটনা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণা যোগায় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

পঞ্চমতঃ অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে, বর্তমান ঘটনাগুলি অতীতের বিভিন্ন ঘটনার পরিণতি। এই হিসাবে বর্তমান ঘটনাগুলি পরিচিত হইলেও উহারা মোটেই সহজ নয়, উহারা অতিশয় জটিল। কাশ্মীর সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে একটি 'ঘটনা' বটে, কিন্তু ইহা ১৯৪৭ সন হইতে আরম্ভ

করিয়া বহু ঘটনার মধ্য দিয়া আজ জটিল অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সমস্ত ঘটনাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা অত্যন্ত জটিল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যে সমস্ত শিক্ষাবিদ্ সমসাময়িক ঘটনাকে 'সমস্যা' বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে এই ঘটনাগুলিকে সমস্যার রূপ দান করিয়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিলে ছাত্রছাত্রীরা অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে দেখিতে সক্ষম হইবে।

উপরের আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সমসাময়িক ঘটনাকে কোন বিশেষ পর্যায়ভুক্ত না করাই উচিত। উহা সমস্ত কিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজনবোধে চলতি ঘটনাকে যে ভাবে কাজে লাগাইলে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হয় সেই ভাবেই উহার প্রয়োগ করিবেন। যদি কোন ঘটনা পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে সেই ঘটনার আলোচনা সেইরূপ ভাবে হইবে, আবার যদি কোন ঘটনাকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত আর একটি বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করার সুবিধা হয় তবে উহার ব্যবহার সেইরূপই হইবে। অতএব সমসাময়িক ঘটনাকে কোনরূপ বাঁধাধরা নিয়ম-কানুনের অন্তর্ভুক্ত না করাই ভাল। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণভাবে প্রতিদিনকার স্থানীয় ও দেশবিদেশের বিশেষ খবরগুলির সাথে পরিচিত হইবে, একথা বলাই বাহুল্য। সমগ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সমাজের কাছে স্থানীয় ও দেশবিদেশের খবর পরিবেশন করিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নানা দিক বিচার করিয়া তবে সেই সব সংবাদ নির্বাচন করিতে হইবে।

প্রথমতঃ ছাত্রছাত্রীদের বয়স, উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যে খবরই ছাত্রছাত্রীদের কাছে বলা হউক না কেন, তাহা যেন তাহাদের বোধগম্য হয় এবং উহা যেন সংবাদ-বহুল হয়। সমালোচনা-বহুল খবর ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ আকর্ষণ করিতে পারে না, একথা সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয়তঃ খবরগুলি নির্বাচনকালে শিক্ষক-শিক্ষিকা লক্ষ করিয়া দেখিবেন যেন উহা সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। প্রচারের চিহ্নমাত্র যেন উহাতে না থাকে সেদিকে তাঁহারা লক্ষ করিবেন।

তৃতীয়তঃ খবরগুলি যেন ছাত্রছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসা মিটাইতে পারে সেদিক দিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা বিচার করিয়া দেখিবেন।

চতুর্থতঃ শিক্ষক-শিক্ষিকারা যে খবর নির্বাচন করিবেন তাহার ক্ষেত্র যেন বিস্তৃত থাকে সেদিকে তাঁহারা লক্ষ রাখিবেন।

পঞ্চমতঃ খবর-নির্বাচনকালে ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ রাখিতে হইবে। খবর নির্বাচনে উপরের নীতিগুলি পালন করিলে ছাত্রছাত্রীরা খবরগুলি দ্বারা যে সবিশেষ উপকৃত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সমাজ-বিদ্যা ও সমাজ

যে আবেষ্টনীর মধ্যে আমরা বাস করি, সেই আবেষ্টনীর সমস্ত স্ত্রীপুরুষ ও পরিবেশ লইয়াই আমাদের সমাজ। সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রও আছে বা সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রও আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গ্রামে যে চিকিৎসক বাস করেন, তিনি গ্রাম্য-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেও জেলা বা রাজ্যের চিকিৎসক-সমাজেরও তিনি এক জন। কিংবা কুম্ভকার গ্রামের সমাজের একজন সভ্য হইলেও গ্রামের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কুম্ভকার সমাজেরও সে এক জন; পক্ষান্তরে সে জেলা বা রাজ্যের কুম্ভকার সমাজেরও এক জন সভ্য। কিন্তু অত খুঁটিনাটির মধ্যে না যাইয়া আমরা বর্তমানে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমাজকে লইয়াই আলোচনা করিব।

গ্রাম্য সমাজ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, ইহা সমগ্র পৃথিবী বা দেশ বা রাজ্যের প্রতিচ্ছবি। অতীত ও বর্তমানের যত মূলগত ধারা বা প্রক্রিয়া আছে, তাহা সবই গ্রাম্য সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের পুরাতন মন্দির বা মসজিদ, ঐ স্থানের লোকদের আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের প্রচেষ্টার ফল; গ্রামের দোকানঘর পৃথিবীর অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মিলনকেন্দ্র, গ্রামের চিকিৎসক সারা পৃথিবীর চিকিৎসাবিদ্যার ধারক ও বাহক; গ্রামের পঞ্চায়েত, জটিল সমস্যা মীমাংসায় পৃথিবীর বড় বড় শাসনকেন্দ্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ; গ্রামের শিল্প প্রতিষ্ঠান অবয়বে ক্ষুদ্র হইলেও উহা বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি ইত্যাদি। গ্রামের সমাজ অতীতের ধারা বহন করিয়া আনিয়াছে এবং উহার সঙ্গে বর্তমান পৃথিবীর যোগাযোগ বিদ্যমান। অতএব গ্রাম্য সমাজের শক্তি অবহেলা করিবার মত নয়। বিদ্যালয় হইতেছে সমাজের প্রাণকেন্দ্র। এই প্রাণকেন্দ্রকে সজীব রাখিতে হইলে শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে গ্রামের সমাজকে উপযুক্ত মর্যাদা দান অবশ্যকর্তব্য কর্ম।

গ্রামের সমবেত সম্পদকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা, (১) সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থাৎ পরিবার, সঙ্ঘ, দল, সমিতি ইত্যাদি

(২) প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়, অর্থাৎ রাস্তা ঘাট, পাহাড়, পর্বত, জমি ইত্যাদি এবং (৩) গ্রামের লোকের আচার, ব্যবহার, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি। গ্রামের সম্পদের এই তিনটি দিককে ভাল করিয়া দেখা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের মত সমাজকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখা দরকার। শিক্ষক-শিক্ষিকা হয়ত এক বিদ্যালয়ে বেশীদিন শিক্ষকতা করেন না। তাঁহাদিগকে এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে বদলি হইতে হয়। এইরূপ অবস্থায় সমাজ-বিদ্যা শিক্ষক যে গ্রামের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বদলি হইয়া আসিয়াছেন, সেই গ্রাম্য সমাজ সম্বন্ধে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অতি অবশ্য অবহিত হইয়া উঠিবেন—ইহাই তাঁহার প্রাথমিক কাজ।

গ্রাম্য সমাজের সঙ্গে কি ভাবে পরিচিত হইতে হয় সে বিষয়ে কোন বিশেষ নির্দেশিকা নাই, তবে সাধারণভাবে কি ভাবে সমাজেব সঙ্গে পরিচয় করা সম্ভব, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

গ্রাম্য সমাজের সঙ্গে পরিচয়প্রার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রথমতঃ গ্রামের লোকদের সঙ্গে যাচিয়া নানা খবরাদি বলিয়া, নানা প্রশ্নাদি উত্থাপন করিয়া তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক-শিক্ষিকারা গ্রামের শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন জিনিসের মজুদস্থান, বিভিন্ন বাসোপযোগী ঘরবাড়ী এবং আশে-পাশের জায়গা-জমি ইত্যাদি ভাল করিয়া লক্ষ করিয়া দেখিবেন। এইরূপ করার ফলে তাঁহাদের গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। তৃতীয়তঃ শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রতিদিন স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করিবেন এবং সংবাদপত্র পড়িবেন। এইরূপ সংবাদপত্র পড়ার ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, লোকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া নিজের গ্রাম্যসমাজের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন। চতুর্থতঃ শিক্ষক-শিক্ষিকারা সমাজের বিভিন্ন কাজে অন্য সকলের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করিয়া গ্রামের অধিবাসীদের এক জন হইয়া পড়িবেন। পঞ্চমতঃ গ্রাম্য সমাজের যদি কোনরূপ লিখিত ইতিহাস থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উহা যোগাড় করিয়া পাঠ করা শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে অবশ্য কর্তব্যকর্ম।

সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক বা শিক্ষিকা গ্রাম্য সমাজকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া এবং প্রত্যেকটি অংশ ভাল করিয়া লক্ষ করিয়া দেখিতে,

ছাত্রছাত্রীগণকে পরিচালনা করিতে পারেন। এই বিভিন্ন দিকগুলি দেখা সম্পর্কে একটি বিশেষ নীতি পালন করা উচিত। বিশেষ নীতিটি হইতেছে এই যে, ছাত্রছাত্রীগণ যখন কোন উদ্দেশ্য লইয়া গ্রামের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিতে যাইবে, তখন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের লইয়া একটি আলোচনা সভা করিবেন। সেই আলোচনা সভায় গ্রামের প্রত্যেকটি অংশ সম্বন্ধে একটি করিয়া প্রশ্নপত্র তৈয়ারী হইবে। ঐ প্রশ্নপত্র সঙ্গে করিয়া ছাত্রছাত্রীরা সমাজের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিবে।

গ্রাম-পর্যবেক্ষণ কার্য পরিচালনা করিতে হইলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা গ্রামের নিম্নলিখিত অবস্থা বা দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য ছাত্রছাত্রীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন।

১। **লোক-সংখ্যা**—গ্রামের লোক-সংখ্যা জানিতে হইলে শিক্ষক-শিক্ষিকা একদল ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে বসিয়া একটি প্রশ্নপত্র তৈয়ারী করিবেন। প্রশ্নপত্র অনুযায়ী গ্রামের কতগুলি পরিবার, পরিবারের মধ্যে কতজন লোক ৬০ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে, কতজন ৫১ হইতে ৬০ এর মধ্যে, কতজন ৪১ হইতে ৫০ এর মধ্যে, কতজন ৩১ হইতে ৪০ এর মধ্যে, কতজন ২১ হইতে ৩০ এর মধ্যে ইত্যাদি করিয়া ১৭ হইতে ২০, ১১ হইতে ১৬, ৮ হইতে ১০, ৬ হইতে ৭, ৩ হইতে ৫, ২ হইতে ৩, ১ হইতে ২ এবং ১ এর নীচে যথাক্রমে কতজন বয়স্ক লোক, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, বালক-বালিকা বা শিশু আছে তাহা ছাত্রছাত্রীরা বাহির করিবে। পরিবারে গড়ে কতজন লোক, গ্রামে জন্ম-বৃদ্ধির হার, শিশু-মৃত্যু, বয়স্ক লোকের মৃত্যু, মৃতের হার, বিবাহ, উদ্বাস্তুদের সংখ্যা, উদ্বাস্তু আগন্তুকদের বসতি, গ্রামত্যাগীদের সংখ্যা, উপার্জনক্ষমদের সংখ্যা ইত্যাদিও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। গ্রামে প্রতি বর্গ মাইলে কতজন লোকের বাস ইত্যাদিও অঙ্ক করিয়া বাহির করা প্রয়োজন।

২। **উপজীবিকা**—গ্রামবাসীদের উপজীবিকাও ছাত্রছাত্রীদের পরিদর্শন মন্তব্যে স্থান পাইবে। যে দল লোক-সংখ্যা বাহির করিবে, সেই দলের পক্ষেই গ্রামবাসীদের উপজীবিকা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ। কিন্তু অন্য দলও এই কাজ করিতে পারিবে। সাধারণতঃ কি জাতীয় কাজের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামবাসীরা সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেছে তাহা ছাত্রছাত্রীরা বাহির করিবে। চাকুরী, ব্যবসা, বিভিন্ন শিল্পকাজ, বৃহৎশিল্পে মজুরের কাজ, নিজের

জমিতে চাষের কাজ, অন্যের জমিতে মজুরের কাজ ইত্যাদিতে নিযুক্ত গ্রামের লোকদের বিভিন্ন বিভাগে বণ্টন করিয়া দেখান যাইতে পারে। এই সম্পর্কে আয়ের হারও বাহির করা সম্ভব হইবে এবং তাহার ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমস্যার খবরও জানা সম্ভবপর হইবে।

৩। **ইতিহাস**—গ্রামের উৎপত্তির ইতিহাস, বিভিন্ন লোকের বসতি স্থাপন, বসতি বৃদ্ধির ইতিহাস, পুরাতন মন্দির ও মসজিদ, গ্রাম সম্বন্ধে কোন প্রকার কিংবদন্তী ইত্যাদিও লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

৪। **ভূগোল**—গ্রামের মানচিত্র, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, আবহাওয়া, তাপ ও বৃষ্টি, জমির স্বরূপ, ভূপ্রকৃতি, নদী, নালা ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

৫। **যানবাহন**—ভূগোলের সঙ্গে এই বিষয়টি একত্র করিয়া পর্যবেক্ষণ কাজ করা যাইতে পারে। গ্রামের সমস্ত উৎপাদন গ্রামের লোকদের মধ্যে যদি বণ্টন না হয় তাহা হইলে উদ্বৃত্ত জিনিসগুলি কোথায় যায়, কেন যায়, কি ভাবে যায় ইত্যাদি বাহির করিতে হইবে। গ্রামের নিকটে রেল-ষ্টেশন আছে কি না, থাকিলে সেই রেল-ষ্টেশন হইতে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, মোটর চলাচলের বড় ও সুদীর্ঘ রাস্তা আছে কিনা, সেই রাস্তা দিয়া কোন্ দিকে যাওয়া যায়, নিকটস্থ শহরের নাম কি, নিকটস্থ শিল্পাঞ্চলে কাঁচা মাল প্রেরণ করিতে কি কি যানবাহনের সাহায্য লইতে হয়, নৌবাহনযোগ্য নদী বা খাল আছে কিনা, ষ্টীমার বা লঞ্চ চলে কিনা ইত্যাদিও জানিতে হইবে। কাঁচা মাল নিকটস্থ শহরে বা শিল্পাঞ্চলে পাঠাইতে খরচের হারও সংগ্রহ করা এই দলের কর্তব্য।

৬। **কৃষকের গোলাবাড়ী**—কয়টি কৃষকের বাড়ী আছে, প্রতি কৃষকের জমির আয়তনের গড়, ফসল, বিঘা প্রতি ফসলের গড়, কৃষকের চাষের যন্ত্রপাতি, নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি আছে কিনা, কয়টি হাল, কয়টি বলদ, কৃষকের জমিতে কত জন লোক খাটে, তাহাদের বেতন, কৃষকের সারা বৎসরের আয়, জমিতে কি পরিমাণ সার দেওয়া হয়, কোন্ সার দেওয়া হয়, ইত্যাদি জানিতে হইবে।

৭। **শিল্পকাজ**—গ্রামের বিভিন্ন শিল্পকাজ, কুটীর শিল্পের সংখ্যা, কতজন লোক বিভিন্ন শিল্পকাজে নিযুক্ত, শিল্প কাজে মজুর, মজুরদের কাজের সর্ত,

বেতন, শিল্পকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবন-ধারণের মান ইত্যাদি ছাত্রছাত্রীরা পর্যবেক্ষণ হইতে জানিতে চেষ্টা করিবে।

৮। **ব্যবসা-বাণিজ্য**—গ্রামে কতজন লোক ব্যবসা করে, কি কি জিনিসের ব্যবসা করে, জিনিস-পত্রাদি আমদানী করিয়া যাহারা ব্যবসা করে তাহাদের সংখ্যা, যাহারা গ্রামে উৎপাদিত কাঁচা মালের ব্যবসা করে তাহাদের সংখ্যা, কত পরিমাণ কাঁচামাল চালান দেয়, ব্যবসায়ীদের জীবন-ধারণের মান, সমবায়-সমিতি আছে কিনা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৯। **জীবন-ধারণের মান**—গ্রামবাসীদের আবাসগৃহ, বাড়ীঘরের বিশদ বিবরণ, পাকাবাড়ী, কাঁচা ঘর, বস্তি, জলের জন্য নলকূপ, বিদ্যুৎসরবরাহ, খাদ্যের স্বরূপ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে লক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে। জীবনধারণের মান বৃদ্ধি করিবার জন্য গ্রামবাসীরা কিরূপভাবে সচেষ্ট, তাহাও জানা দরকার।

১০। **স্বাস্থ্য**—গ্রামের স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পুকুর, নলকূপ ইত্যাদির সংখ্যা, লোকের অনুপাতে নলকূপ, ডাক্তারের সংখ্যা, হাঁসপাতাল, স্বাস্থ্যসম্মত বিধিনিষেধ পালন, আবর্জনার ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরণের রোগ, রোগ হইতে মৃত্যুর সংখ্যা, দুর্ঘটনা হইতে মৃত্যুর সংখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

১১। **শিক্ষা**—কয়টি বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের শ্রেণী-বিভাগ, গ্রামের লোক-সংখ্যার কত অংশ বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রছাত্রী, কত জন শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে না, কত জন শিক্ষার সুযোগ (অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে) লইতেছে না, বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী কিনা, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার, বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার, পুস্তক সরবরাহের হার, বয়স্ক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, ইত্যাদির ব্যবস্থা ইত্যাদি আছে কিনা তাহা ছাত্রছাত্রীদের জানিতে হইবে।

১২। **বিনোদন**—গ্রামে বিনোদনের ব্যবস্থা, গ্রাম্য সমিতি বা সঙ্ঘের বিনোদনে উদ্যোগ, বিভিন্ন প্রকারের বিনোদন, বিভিন্ন বয়সের লোকদের জন্য বিনোদন, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য কথকতা, কীর্তন ইত্যাদি, গ্রামে রেডিওর ব্যবস্থা আছে কিনা এবং কোনও উপলক্ষে চলচ্চিত্র প্রদর্শন, কিংবা যাত্রা,

থিয়েটার দেখান হয় কিনা সে সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা বিশদভাবে তথ্যসংগ্রহ করিবে। মেয়েদের জন্য বিশেষ কোন বিনোদনের ব্যবস্থা আছে কি না তাহাও জানা দরকার।

১৩। **উৎসব ব্রতকথা**—গ্রামের বিভিন্ন উৎসব পালন,—স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে যোগদানের ব্যবস্থা। ব্রতকথা, বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ব্রতকথা, ব্রতকথা পালনের নিয়মাবলী, ব্রতপালনের উদ্দেশ্য, ব্রতপালনের শিক্ষাগত মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে ছাত্রীরা বিশেষ করিয়া গ্রামের বৃদ্ধাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিবে।

১৪। **মেলা**—গ্রামে মেলা হয় কিনা, কখন মেলা হয়, মেলায় কি কি জিনিসের আমদানী হয়, স্থানীয় শিল্পজাত দ্রব্য, স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য ইত্যাদির প্রদর্শনী হয় কিনা, কোন্ কোন্ স্থান হইতে মেলায় জিনিস আসে, স্থানীয় লোকের শিক্ষাপ্রদ এমন সব জিনিস মেলায় আসে কি না, কয়দিন ব্যাপী মেলা চলে, মেলায় বিনোদনের কি ব্যবস্থা, যাত্রা, থিয়েটার, চলচ্চিত্র ইত্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয় কিনা ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা খবর সংগ্রহ করিবে।

১৫। **ইউনিয়ন বোর্ড**—ইউনিয়ন বোর্ডের গঠন, বোর্ডের বিভিন্ন কাজ, গ্রামের গঠনমূলক কাজ, বোর্ডের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থার ক্ষমতা ও দায়িত্ব, ইউনিয়ন বোর্ডের বিচারক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ছাত্রছাত্রীরা তথ্য সংগ্রহ করিবে।

গ্রাম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য যে সমস্ত বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল, সেগুলি নির্দেশিকা হিসাবেই ব্যবহার করা শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত, কারণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা এবং সমস্যার অনুপাতে প্রশ্নপত্র রচনা করাই শ্রেয়।

ছাত্রছাত্রীরা যখন গ্রামের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে খবর লইবে তখন তাহাদের সমগ্র গ্রামের তথ্য সংগ্রহ করাই হইবে উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি দল যখন তাহাদের দলীয় বিবরণ লিখিবে, তখন যেন সমগ্র গ্রামের চিত্রটি চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে এই উদ্দেশ্য লইয়াই গ্রাম পর্যবেক্ষণের বিবরণী তাহারা লিখিবে। উপরে গ্রাম সম্পর্কে যে কয়টি দিক দেওয়া হইল তাহা সম্পূর্ণতার দাবী করিতে পারে না, প্রয়োজনবোধে শিক্ষক-শিক্ষিকা গ্রামের বিভিন্ন দিক বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারিবেন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাইতে

পারে যে, যদি কোন একটি গ্রামে বন-জঙ্গলের আধিক্য থাকে তবে তাহা পর্যবেক্ষণ করা এবং সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা একটি দলের কাজ হইবে।

বিভিন্ন দলের তথ্য সংগ্রহ কার্য শেষ হইলে ছাত্ররা তাহাদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিবে, এবং তাহাদের সংগৃহীত খবরগুলির উপর মন্তব্য প্রকাশ করিবে। বস্তুতঃপক্ষে এই মন্তব্য প্রকাশ করাটা হইবে কোন একটি বিশেষ দিক ভাল করিয়া পর্যালোচনা করার ফল। অতএব ইহার শিক্ষাগত মূল্য যে যথেষ্ট আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সমাজ-বিদ্যা ও শিক্ষা-পদ্ধতি

সমাজ-বিদ্যার মধ্যে সমাজ-পর্যবেক্ষণের যে নির্দেশ দেওয়া হইল, সেই নির্দেশকে অনুসরণ করিতে হইলে শিক্ষকের পক্ষে পদ্ধতির সহায় লইতে হইবে। সকল সময়ই যে একই পদ্ধতির সাহায্য লইতে হইবে এমন কোন কথা নাই, শিক্ষক প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণে ছাত্র-ছাত্রীদের কর্ম পরিচালনা করিতে পারিবেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রথমে দেখিবেন যে, পর্যবেক্ষণ-কার্য সময় অনুপাতে সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ যে সময়টুকু শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তাহা যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহা দেখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কাজটি সুপরিকল্পিত হইলে সময় অনুযায়ী উহা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

দ্বিতীয়তঃ, কাজ যেন ছাত্রছাত্রীদের বয়সের অনুপাতে হয়। একই কাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে দেওয়া চলে, কিন্তু কর্ম-পরিকল্পনা এবং কর্ম-পরিচালনা বিভিন্ন প্রকারের হইবে।

তৃতীয়তঃ, কর্ম-পরিচালনার সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের কাছে কর্মের উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া ধরিবেন।

চতুর্থতঃ, কার্য বণ্টনের সময় ব্যক্তিগত পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে এবং যে ছাত্রছাত্রী যে কাজের জন্য উপযুক্ত সেই কাজই তাহাকে দেওয়া হইবে।

কাজটি সুপরিকল্পিত হইলে ছাত্রছাত্রীদের কর্মে দক্ষতা জন্মিবে। ছাত্রছাত্রীরা পর্যবেক্ষণ করিবে, বাছাই করিবে, মনোনীত করিবে এবং তথ্যগুলিকে প্রয়োজনে ব্যবহার করিবে, ফলে ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণ বিকাশ হইবে।

উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিলে ছাত্রছাত্রীদের কার্যে নৈপুণ্য জন্মে, সহযোগিতার ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়,এবং আলোচনার ফলে একে অন্যের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গ্রাম পর্যবেক্ষণে সকলে সকল কাজ করে না, বিভিন্ন দলে ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদন করে, কিন্তু যখন বিভিন্ন দল বিবরণী পাঠ করে, তখন এক দল তাহাদেরই ইউনিটের অপর অংশের বিবরণী শ্রবণ করিয়া নিজের কাজেরই সার্থকতা উপলব্ধি করে। তাহা ছাড়া একটি দল যখন তাহাদের বিবরণী পেশ করে, তখন তাহাদের প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ঐ বিবরণী পেশের মধ্য দিয়া বৃদ্ধি পায় এবং পক্ষান্তরে তাহাদের বিবরণী অন্যান্য দল কিরূপভাবে গ্রহণ করিল, কতটা সমালোচনা করিল তাহা তাহারা বুঝিতে পারে ও নিজেদের সম্পর্কে যাচাই করিয়াও দেখিতে পারে।

উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণে ছাত্রছাত্রীরা সমস্যা সমাধানেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। প্রত্যক্ষ সমস্যা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সমাধানের পথে যায়। বলা বাহুল্য, ছাত্রছাত্রীরা সমালোচকের দৃষ্টি লাভ করিয়া থাকে এবং সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে।

আলোচনা সমাজ-বিদ্যা শিক্ষা-পদ্ধতির একটি বিশেষ অঙ্গ। কর্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে পরিকল্পনা করিবার সময় আলোচনা এবং কর্ম শেষে রিপোর্ট নিয়া আলোচনা—এই দুইটি দিকই শিক্ষা-পদ্ধতির দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শিক্ষা-পদ্ধতির দিক হইতে আলোচনার মতই বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতেছে **চলচ্চিত্র** বর্তমান অবস্থায় আমরা গ্রামে বসিয়া পর্যবেক্ষণের স্তরে গ্রামের পরিবেশ ও আবেষ্টনীকে জানিতে ও বুঝিতে পারি। কিন্তু আমাদের বৃহত্তর সমাজের কোন কর্মপন্থার বা ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে পারি না। চলচ্চিত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাজ না হইলেও উহা যে দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে কিছুটা সক্ষম সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিবর্তে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ খুবই বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যে ডকুমেন্টারী ফিল্ম্ (Documentary Films)গুলি প্রস্তুত করিতেছে, তাহা সমাজ-বিদ্যা শিক্ষাদানে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রতি গ্রামে কিংবা ইউনিয়নে এই সব চলচ্চিত্র দেখাইবার বন্দোবস্ত করা বর্তমানে খুবই সমীচীন

বলিয়া বোধ হয়। সর্বার্থসাধক বিত্থালয়গুলিতে Film Projector-এর ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং সেই সকল বিত্থালয়ে সমাজ-বিত্থাবিষয়ক ফিল্মও আছে। ঐসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী বিত্থালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে ফিল্ম দেখান যাইতে পারে।

সমাজ-বিত্থার শিক্ষা-পদ্ধতি হিসাবে **প্রজেক্টের** স্থানও কম নয়। ছাত্রছাত্রীরা পর্যবেক্ষণের পর যে কোন কর্মের ইউনিট স্থির করিয়া উহাকে কেন্দ্র করিয়া কাজ করিতে পারে। উহাতে ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অতি অবশ্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে উহাদের চিন্তাধারাও থিতিয়া যাইবে।

গ্রামে যেমন ছাত্রছাত্রীরা গ্রামের বিভিন্ন স্থান দেখিয়াছে, সহরাঞ্চলেও ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, ডক ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিবে। পৌরপ্রতিষ্ঠান, বিধান সভা ইত্যাদি দেখিবার সুযোগও ছাত্রছাত্রীদের দিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীরা যাহা দেখিবে, তাহার উপরই আলোচনা নিবদ্ধ করিয়া উহাদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করিতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়

গণিত শিক্ষাদান-পদ্ধতি

অঙ্ক শিক্ষার নূতন ভাবধারা

শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই সংখ্যা শিক্ষাদান ও অঙ্ক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নূতন পন্থা অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী হইয়াছেন। গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিয়া যান্ত্রিক ভাবে সংখ্যা গণনা ও অঙ্ক শিক্ষায় সংখ্যা সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা শিশুদের হয় না, সংখ্যার তাৎপর্যও শিশুরা বুঝিতে সক্ষম হয় না, ফলে শিশুরা অচিরে অঙ্ক বিষয়ে অনগ্রসর হইয়া পড়ে। বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিশুদের যে সংখ্যা-জ্ঞান হয়, তাহাতে শিশুরা সংখ্যার তাৎপর্য বুঝিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে এবং সংখ্যা সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা সুস্পষ্ট হওয়ার ফলে শিশুরা অঙ্ক করিতে সক্ষম হয়, এবং তাহা হইতে আনন্দ আহরণ করিতেও তাহারা পারে।

সামাজিক আবেষ্টনী ও পরিবেশের সমস্তার মধ্যে শিশুরা যখন সংখ্যা গণনা শিক্ষা করে, তখন তাহারা সংখ্যার তাৎপর্য বুঝিয়া শিক্ষা করিয়া থাকে। সংখ্যাগুলি শিশুর কাছে হয় অর্থপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এমন কি প্রাক্-প্রাথমিক অবস্থায়ও শিশু বিভিন্ন বস্তুর বা খেলার জিনিষসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে কম-বেশী, বড়-ছোট, ভারি-পাতলা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। তারপর শিশু বাড়ীতে মার কাছে শুনিতে পায়, খাবার জিনিষের সংখ্যা, বাবার কাছে শুনিতে পায় বাগানের গাছপালা ফলমূলাদির সংখ্যা, দাদা দিদির কাছে শুনিতে পাইয়া থাকে খেলনার সংখ্যা, দৈনন্দিন জীবনে অর্ধেক কলা, আধ সের মাছ, এক পোয়া দুধ ইত্যাদিও প্রাক্-প্রাথমিক শিশুদের অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ে খোরাক জোগাইয়া থাকে। এই অবস্থায় শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন তাহার সংখ্যা ও অঙ্ক সম্বন্ধে ধারণা, প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া বর্ধিত করিয়া গেলে শিশুর সংখ্যার ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি যান্ত্রিকভাবে শিশুকে সংখ্যার ধারণা দেওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্বের অভিজ্ঞতা যাহা শিশুমনে থিতাইয় বসিতেছিল তাহা এলোমেলো হইয়া যাইবে। তাই

শিশুর পূর্বের অভিজ্ঞতাকে যদি শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন কর্ম ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে কাজে লাগান যায়, তাহা হইলে উহা শিশুকে সংখ্যা গণনা ও অঙ্ক শিক্ষায় প্রভূতভাবে সাহায্য করিবে।

শিক্ষক যদি শ্রেণীকক্ষ, শিশুদের আগ্রহের বিষয়বস্তু, বিদ্যালয়ের বাহিরে শিশুদের বিভিন্ন কাজ, এবং তাহাদের সমাজ লক্ষ করিয়া শিশুদের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায় সংখ্যাশিক্ষার সম্ভাব্যতাকে সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলে শিশুর সংখ্য-গণনা শিক্ষা ও অঙ্ক শিক্ষা সহজ হইবে। সংখ্যা-গণনা শিক্ষা যদি শিশুর জীবনের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে তাহা শিশু-জীবনে স্থায়ী ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিবে। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষক শিশুর দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অবস্থাকে তাহার সংখ্যা-শিক্ষার কাজে লাগাইতে পারেন।

(১) শিশু ক্যালেণ্ডার দেখিবে।

(২) শিশু বইয়ের পৃষ্ঠা পড়িবে।

(৩) শ্রেণীকক্ষের দরজা-জানালার পাটে এবং অন্যান্য জিনিষেও জিনিষের ক্রমিক নম্বর থাকিবে—শিশুরা দেখিবে ও পড়িবে।

(৪) বোর্ডে প্রতিদিন শিশুরাই তারিখ লিখিবে।

(৫) শিশুরা নিজেদের খাতায় পৃষ্ঠার নম্বর দিবে।

(৬) শিশুরা-দলবিভাগ করিয়া খেলিতে যাইয়া বিভিন্ন দলের শিশুসংখ্যা গুণিয়া লইবে।

(৭) শিশুরা ছবির বই বিতরণ ও সংগ্রহ করিবে।

(৮) শ্রেণীতে প্লাইউডে আঁকা একটি ঘড়ির মুখ থাকিবে। ঘড়ির কাঁটাও সেখানে সংযুক্ত থাকিবে। শিশুরা তাহা দেখিবে।

(৯) শ্রেণীতে ব্যবহার্য্য দ্রব্য গুলির সংখ্যা প্রতিদিন শিশুরা মিলাইয়া দেখিবে ও কয়টি কম পড়িল তাহা মিলাইবে।

	ছিল	আছে	কম
যথা :—	আসন—৩০	২৮	২
	শ্লেট—৩০	২৯	১
	ঝাড়ন— ৩	২	১
			ইত্যাদি

(১০) খেলাধুলার সময় নম্বর লেখা কার্ডবোর্ড আঁটিয়া খেলোয়াড়দের নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে সংখ্যাগুলির সহিত পরিচয় হইবে।

(১১) শিশুদিগকে নিজদের ব্যবহারের জন্য ক্যালেণ্ডার তৈয়ারী করানো যায়। ইহাতে ৩১ পর্য্যন্ত সংখ্যা লিখিতে শেখে।

(১২) বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে গাছপালা থাকিলে তাহাতে নম্বর যুক্ত প্লেট আটকানো যায়, যেমন রাস্তার গাছে নম্বর থাকে সেই ভাবে।

(১৩) বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনের রাস্তাটিতে ১ মিটার পরে পরে বড় রাস্তার অনুরূপ ছোট ছোট মিটার-নম্বরযুক্ত খুঁটি লাগানো যায়

(১৪) শিশুদের বিভিন্ন খেলায় স্কোর-বোর্ড ব্যবহৃত করা যায়।

(১৫) অবসর সময়ে শিশুদিগকে বেগাটেলির মত সংখ্যায়-প্রধান খেলায় উৎসাহী করা যায়।

প্রতিদিন শিশু যদি সংখ্যা-সম্বলিত এই সমস্ত জিনিষপত্র দেখে, তাহা হইলে শিশু ঐ সমস্ত সংখ্যাগুলির ব্যবহারিক জ্ঞান অনায়াসে লাভ করিতে পারিবে। বস্তু ও সংখ্যার জ্ঞান যদি সমান্তরাল হয়, তাহা হইলে শিশুর পক্ষে সংখ্যার ধারণা স্পষ্টভাবে লাভ করিতে পারা মোটেই অসুবিধাজনক হইবে না।

গণিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা

(১) সাংসারিক জীবনে, দৈনন্দিন কার্যে সর্বদা গণিতের ব্যবহার হয়। সাধারণ হিসাব করিতে না জানিলে লোকের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য প্রায় সকল দেশেই শিশুকে প্রথমে লেখা, পড়া ও গণিত (Three R's) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। (২) বাণিজ্যে ও নানা ব্যবসায়ে সফলতা লাভের জন্য গণিতের ভাল জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। (৩) নানা শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার জন্যও গণিতের ভাল জ্ঞান থাকা আবশ্যক। (৪) ইহার দ্বারা শিশুর মানসিক বিকাশের বিশেষ সাহায্য হয়। গণিত শিক্ষার জন্য শিশুকে যথেষ্ট চিন্তা ও বিচার করিতে হয় এবং তাহার ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করিতে হয়। তাই গণিত শিক্ষার ফলে শিশুর চিন্তা, বিচার ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়। ইহা শিশুকে সূক্ষ্ম ও সঠিক ভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দেয়। ইহা শিশুর ভাব-প্রবণতা হ্রাস করে এবং সে হিসাব করিয়া কাজ করিতে শিখে। একটি কঠিন অঙ্ক করিয়া নির্ভুল উত্তর নিরূপণের মধ্যে স্বাভাবিক একটি আনন্দ রহিয়াছে। কঠিন অঙ্ক করিয়া সঠিক উত্তর নির্ধারণের সময়ে শিশুর মধ্যে যে প্রবল ইচ্ছা-শক্তির উদ্রেক হয়, তাহা শিশুর চরিত্র-গঠনে সাহায্য করে।

ওজন ও মাপ সম্বন্ধে ধারণালাভের সুযোগ প্রদান

শিশুরা যখন সংখ্যা বিষয়ে ধারণা লাভ করিবে তাহার সাথে সাথেই তাহাদিগকে ওজন ও মাপ বিষয়েও ধারণা লাভের সুযোগ দেওয়া যায়। বিশেষতঃ বর্তমানে ওজন ও মাপগুলিতেও "দশক পদ্ধতি" (Decimal System) প্রচলিত হওয়ায় উহা দশক পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখন গঠনের সহিত সঙ্গতিযুক্ত হইবে। নিম্নলিখিত কাজগুলি শিশুদের ওজন ও মাপ সংক্রান্ত ধারণা লাভের সহায়ক হইবে—

(১) শিশুদের দৈর্ঘ্য মাপা ও রেকর্ড করা—সংখ্যা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা লাভের পরই শিশুদিগকে দিয়াই তাহাদের দৈর্ঘ্য মাপিতে ও রেকর্ড করিয়া রাখিতে শেখানো যায়।

(২) শিশুদের নিজ ওজন লওয়া ও রেকর্ড রাখা।

(৩) দোকান-দোকান খেলার মধ্য দিয়া ওজন ও মাপা বিষয়ে ধারণা প্রদান করা।

(৪) বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ, টেবিল প্রভৃতির মাপ লওয়া।

(৫) বিদ্যালয়ে বাগান থাকিলে বাগানের উৎপন্ন দ্রব্যের ওজন বাহির করা ও রেকর্ড রাখা।

প্রথম শ্রেণীর শেষের দিকে ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে এই কাজগুলি করিতে দেওয়া যায়।

গণিত শিক্ষাদানের কতিপয় আধুনিক নিয়ম

(১) শিশু প্রথমে কোন না কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কিছুই শিক্ষা করিতে পারে না। তাই প্রথমে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকারে তাহার নিকট উপস্থিত করিতে হয়। সেই জন্য **বাস্তব জিনিষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া** গণিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। ছাত্রের বয়স ও পরিবেশ অনুযায়ী **ইহাদের আকার বিভিন্ন হইবে।** প্রথমে নানা রকম বীচি বা দানা, গুলি, কাঠি বা কাষ্ঠখণ্ড, মুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে শিশুকে গণনা এবং যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহার পর অন্যান্য নিয়মের অঙ্কগুলিও যথাসময়ে যথোপযুক্ত বস্তু বা চিত্রের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যায়।

(২) যতদূর সম্ভব **বাস্তব কাজের আকারে বা উহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই** বর্তমান সময়ে গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে নানা **খেলা ও কাজের ভিতর দিয়া** গণিতশিক্ষা আরম্ভ করা হয়। পরে সমস্যামূলক পদ্ধতিতে নানা কার্য-সমস্যা ছাত্রের সামনে স্থাপন করিয়া তাহাদের সমাধানের আকারে গণিত শিক্ষা দেওয়া যায়। যথা,—বাগান তৈয়ার করা, গৃহ নির্মাণ করা, বাজার করা ও তাহার হিসাব রাখা, দোকান করা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের স্তরে নাগরিক জীবনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া গণিত শিক্ষা দেওয়া যায় এবং ইহাকে "**নাগরিক গণিত**" (Arithmetic of Citizenship) বলা হয়। যথা,—ইউনিয়নবোর্ড, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা, কোন শিল্পকার্যের জমা-খরচের হিসাব রাখা; কোন যৌথ কোম্পানীর মূলধন, আয়-ব্যয়, লভ্যাংশ প্রভৃতির হিসাব করা।

(৩) বস্তুর সাহায্যে গণনা ইত্যাদি শিক্ষাদান আরম্ভ করিলেও **যত শীঘ্র সম্ভব** ছাত্রছাত্রীগণকে **সংখ্যাগুলি লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন**। মন্তেসরী প্রণালীতে লেখা **সংখ্যাগুলির উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া** এবং শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে **উচ্চারণ করিয়াই** শিশু সংখ্যাগুলি লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিবে।

(৪) শিশুরা যখন বাস্তব ভাবে সংখ্যার গণনা করিবে তখনই সংখ্যার সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণাত্মক সহজ হিসাব করিতে শিখিবে। কাজের প্রয়োজনে ঐরূপ হিসাব করিবে—খেলার সময় করিবে আবার অভ্যাস করার জন্য পৃথক ভাবে মানসাঙ্ক করিতে দেওয়া যায়। কাজের প্রয়োজনে সহজ যোগ বিয়োগ অঙ্ক করার প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন ১০টি চক ছিল, ৪টি খরচ হইয়াছে, কয়টি আছে? অথবা ১০টি ছিল ৬টি রহিয়াছে কয়টি খরচ হইয়াছে? শ্রেণীর দ্রষ্টব্যের হিসাব রাখা উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাব রাখা প্রভৃতি ব্যাপারে এইরূপ হিসাব খুবই স্বাভাবিক হইয়া উঠে। খেলার স্কোর বোর্ড প্রচলন করিলে খেলার মধ্য দিয়াও এইরূপ হিসাব আসে। ছোট ছোট যোগ-বিয়োগের উপযোগিতা যখন শিশুরা বুঝিতে শিখিবে তখনই শিশুদিগকে দিয়া বাস্তব দ্রব্য সাহায্যে যোগের নামতা তৈয়ারী করিতে ও তাহা মুখস্থ ও ব্যবহার করিতে শিখাইতে হইবে।

(৫) গণিত শিক্ষাদান ক্ষেত্রে একটি কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মনে রাখিতে হইবে যে কোনও একটি প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় শিশুরা ভালভাবে অভ্যস্ত হইলে তবেই পরবর্তী প্রক্রিয়া শিখাইতে হইবে। কারণ গণিত শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় নহে, ইহা কলা-কৌশলগত বিষয় বটে। কলা কৌশল শিক্ষার বিধি এই যে সহজ প্রক্রিয়াটি যখন অত্যন্ত সহজে করার কুশলতা অর্জিত হয় তখনই অপেক্ষাকৃত জটিল প্রক্রিয়া আরও সাধ্য হয়। এই বিধি গণিত শিক্ষায় প্রযোজ্য।

(৬) কেবল নীরস সংখ্যার অঙ্ক করিতে না দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব **প্রশ্নের বা সমস্যার** আকারে **অঙ্ক** করিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কারণ ইহাতে ছাত্রছাত্রী বেশী আনন্দ পায় এবং তাহাকে বেশী চিন্তা করিতে হয়। অধিকন্তু ইহা তাহাকে তাহার জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করিতেও শিক্ষা দেয়। অবশ্য ইহার জন্য প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি যতদূর সম্ভব প্রকৃত ও ছাত্রের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হইতে হইবে।

(৭) বিভিন্ন নিয়মের অঙ্ক শিক্ষা দেওয়ার সময় প্রথমে ব্যাকরণের সূত্রের ন্যায় **আরোহী প্রণালীতে** নিয়মগুলি ছাত্রছাত্রীর সহযোগিতায় প্রস্তুত করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা না করিয়া কেবল পুস্তকে লিখিত নিয়মগুলি শিক্ষা দেওয়া হইলে ছাত্রছাত্রীগণ তাহা ভালরূপে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করিতেপারে না।

(৮) উপরিউক্ত প্রণালীতে কোন নিয়ম শিক্ষাদানের পর **অবরোহী প্রণালীতে** তাহার প্রয়োগ করিয়া ছাত্রছাত্রীগণের সহযোগিতায় ব্ল্যাক-বোর্ডে ২।১টি অঙ্ক কষিয়া দেখাইতে হইবে। তারপর ছাত্রছাত্রীগণকে সেই নিয়মের প্রয়োগ করিয়া যত বেশী সম্ভব অঙ্ক কষিতে দেওয়া প্রয়োজন। কেননা, অনুশীলনের ফলেই ছাত্রছাত্রীগণ নিয়মটির যথার্থতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং নিয়মটি স্মরণ রাখিতে ও ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৯) গণিতের অঙ্ক কষিবার সময়ে ভালভাবে ও পরিষ্কার ভাবে প্রশ্নের অর্থ অনুসরণ করিতে, **সঠিক ভাবে** (precisely) চিন্তা করিতে, **সূক্ষ্মভাবে** (minutely) ও **শুদ্ধভাবে হিসাব করিতে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে লিখিতে** শিক্ষা দিতে হইবে। শিশু অঙ্ক ভুল করিলেও শিক্ষক উহাকে আবার কিছু ক্ষণ চেষ্টা করিতে দিবেন। তবে দেখিতে হইবে; শিশু যাহা করিতেছে তাহা সে বুঝিয়া করিতেছে কি না। শিশু নিজেই অঙ্ক করিবে। শিক্ষক শিশুকে সাহায্য করিবেন মাত্র।

(১০) একটা নিয়ম ভালরূপে শিক্ষা করার এবং যথেষ্ট অনুশীলনের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার পূর্বে ছাত্রগণকে অন্য একটা নিয়ম শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে।

(১১) **ভুল সংশোধন**। ছাত্র কোন অঙ্ক কষিতে না পারিলে কেবল অঙ্কটি করিয়া দিলেই তাহার ভুল সংশোধন হইল না। **ভুলের কারণ নির্ণয় করিয়া** প্রয়োজনমত নিম্নলিখিত কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(ক) প্রশ্ন না বুঝিবার জন্য ভুল করিলে, ছাত্রছাত্রীকে **প্রশ্নটি পুনঃ পুনঃ পড়িবার** ও **বুঝিবার** সুযোগ দিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে বুঝাইয়াও দিতে হইবে।

(খ) ঠিক পদ্ধতি অবগত না থাকার জন্য ভুল করিলে, **পদ্ধতি বা নিয়মটি পুনঃ বুঝাইয়া দিয়া** অঙ্কটি কষিতে দেওয়া প্রয়োজন। শ্রেণীর অনেক ছাত্র একই কারণে ভুল করিলে, অনুশীলনের কাজ বন্ধ রাখিয়া ব্ল্যাক-বোর্ডের সাহায্যে পুনঃ নিয়মটি ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

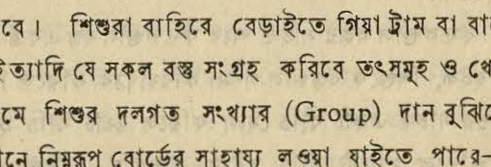
(গ) **অসতর্কতার জন্য** নিয়মের প্রয়োগ বা হিসাব ভুল করিলে, পদ্ধতি বা হিসাব ভুল হইয়াছে বলিয়া ছাত্রছাত্রীকে পুনঃ অঙ্কটি কষিতে দেওয়া প্রয়োজন।

(ঘ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে না লিখিলে, তাহা পরীক্ষা না করিয়াই ছাত্রছাত্রীকে পুনঃ তাহা **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে লিখিতে** দিতে হইবে।

(ঙ) প্রয়োজনীয় মনোযোগ বা চেষ্টার অভাবে কোন ছাত্র অঙ্ক কষিতে পারে নাই বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাহাকে এমন সমস্ত কাজ করিতে দিতে হইবে, যে কাজ করিতে সে স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করে। কাজে মনোযোগী হইলে, সেই কাজের হিসাবের মধ্য দিয়া তাহাকে অঙ্ক শিক্ষাদান করিয়া তাহাকে তারপর কতকগুলি সেই জাতীয় অঙ্ক যান্ত্রিকভাবে কষিতে বলা যাইতে পারে। আশা করা যায় যে, শিশু নিজের আগ্রহ-কেন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া স্বাভাবিকভাবে অঙ্ক শিক্ষা করিলে, সে মনোযোগী হইবে, অঙ্ক করিতে ভুল করিবে না। এক্ষণে গণিত শিক্ষাদান-কার্যে পূর্ববর্ণিত নিয়মগুলির প্রয়োগ বর্ণিত হইতেছে।

গণনা শিক্ষাদান—প্রারম্ভে বস্তুর সাহায্যেই গণনা শিক্ষা দিতে হইবে। তেঁতুল বীচি, সীমের বীচি, মাটীর গুলি, কাঠি, কাষ্ঠখণ্ড ইত্যাদি ইহার জন্য

ব্যবহার করা যাইতে পারে। শিক্ষক শিশুদের পরিবেশ-পরিচিতিতে লইয়া যাইয়া আশে-পাশে বৃক্ষাদি, বাড়ীঘর ইত্যাদি গণনা করাইতে পারেন। বাগানের নানাবিধ ফসলের সংখ্যাও শিশুরা গণনা করিতে পারে। সূতা কাটায়, সূতার তার শিশুরা গণনা করিতে পারে, ইত্যাদি। শিশুরা অনির্দেশিত কাজ করিবার পর কে কয়টি জিনিষ গড়িয়াছে বা কে কয়টি ছবি আঁকিয়াছে, তাহার সংখ্যা শিশুরা আনন্দের সঙ্গে বর্ণনা করিতে পারে। ডাঃ মন্তেসরী ইঞ্চি দাগকাটা কাঠি ব্যবহার করিতে বলেন। কেবল এক প্রকারের বস্তু ব্যবহার না করিয়া ২।৩ প্রকারের বস্তুর সাহায্যে গণনা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক এক একটা বস্তু লইয়া এক, দুই, তিন ইত্যাদি বলিবেন, ছাত্রছাত্রীরাও এক একটা বস্তু লইয়া শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে এক, দুই, তিন ইত্যাদি বলিবে। এইরূপে বার বার দশ পর্যন্ত গণনা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার পর শিক্ষকের সাহায্য না লইয়া শিশুরা এক একটি বস্তু লইয়া দশ পর্যন্ত গণনা করিতে শিখিবে। শিশুরা বাহিরে বেড়াইতে গিয়া ট্রাম বা বাসের টিকিট, নুড়ি, পাথর ইত্যাদি যে সকল বস্তু সংগ্রহ করিবে তৎসমূহ ও খেলনা প্রভৃতি গণনার মাধ্যমে শিশুর দলগত সংখ্যার (Group) দান বুঝিতে পারিবে। গণনা শিক্ষাদানে নিম্নরূপ বোর্ডের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে—এই ভাবে দশ পর্যন্ত গণনা ভাল ভাবে শিক্ষা করার পর, দশের ভিত্তিতে একশ পর্যন্ত গণনা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহার জন্য প্রথমে বস্তুগুলিকে ১০টি, ১০টি করিয়া সাজাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর প্রথম স্তূপ বা আঁটির সহিত দ্বিতীয় স্তূপ বা আঁটির এক একটা যোগ করিয়া ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের সঙ্গে



সঙ্গে বলিবে "এক দশ এক এগার, এক দশ দুই বার" ইত্যাদি। তাহার পর তৃতীয় স্তূপ হইতেও এক একটা লইয়া প্রথম দুই স্তূপের সহিত যোগ করিয়া বলিবে "দুই দশ বা বিশ এক একুশ" ইত্যাদি।

এইভাবে বস্তুর সাহায্যে মৌখিক গণনা শিক্ষা হইলে **মন্তেসরী প্রণালীতে** লেখা সংখ্যার উপর **অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া** এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের অনুকরণে সংখ্যাটি **উচ্চারণ করিয়া** সংখ্যা পড়িতে ও লিখিতে শিখিবে।

একশ হইতে বড় সংখ্যা লিখিবার সময় প্রথম-প্রথম একক, দশক, শতক ইত্যাদি লিখিয়া দিয়া তাহার নীচে যথাস্থানে সংখ্যাগুলি লিখিতে দেওয়া যায়।

সংখ্যাগুলি লিখিতে ও পড়িতে শেখার পরও কিছুকাল শিশু ভুল করিলে বস্তুর সাহায্যে তাহার ভুল সংশোধন করা প্রয়োজন হইবে।

যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ শিক্ষাদান

বস্তুর সাহায্যেই শিশুকে প্রথমে যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ বিষয়ে ধারণা দিতে হইবে।

যোগ। কতকগুলি বস্তুর সহিত আর কতকগুলি বস্তু একত্র করিলে মোট কতগুলি বস্তু হইল, শিশুকে বস্তুগুলি গণনা করিয়া ঠিক করিতে দিতে হইবে। যথা, ৫টি বীচির সহিত একটি বীচি যোগ করিলে ছয়টি বীচি হইবে; দুইটি বীচি যোগ করিলে সাতটি বীচি হইবে, ইত্যাদি। কিছুকাল এই কাজ করিতে দিলে যোগের সম্বন্ধে তাহার সঠিক ধারণা হইবে। ইহার পর বস্তুর সাহায্যেই শিশুকে যোগের নামতা গঠন করিতে দিতে হইবে। যথা—

১ বীচি	০ বীচি	১ বীচি	
১ বীচি	১ বীচি	২ বীচি	ইত্যাদি
১ ,,	২ ,,	৩ ,,	,,
১ ,,	৩ ,,	৪ ,,	,,

এইভাবে দশ পর্যন্ত যোগের নামতা গঠিত হইলে শিশুরা আবৃত্তি করিয়া তাহা মুখস্থ করিবে। এক্ষণে, শিশুরা বস্তুর সাহায্য না লইয়া **যোগের নামতার সাহায্যে** লেখা সংখ্যার যোগ করিতে পারিবে। কিন্তু বস্তুর সাহায্যে যোগের কাজে ভালভাবে অভ্যস্ত হওয়ার পূর্বে লেখা সংখ্যার যোগ শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। বস্তুর সাহায্যে ইহাও বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, নামতা-গঠনে শূন্য-কে বাদ দিলে চলিবে না। শূন্য (০) অর্থ যে কিছুই নয় তাহা কাজের ভিতর দিয়া শিশুগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। সংখ্যাগুলি এক দশ, দুই দশ ইত্যাদির যত বেশী হইবে, তাহাই এককের ঘরে লিখিতে হইবে। এককের ঘরের

অঙ্কগুলি যোগফল এক দশ, দুই দশ ইত্যাদির যত বেশী তাহা সমষ্টির এককরূপে লিখিতে হইবে। এক দুই দশ ইত্যাদি দশকের ঘরের সংখ্যাগুলির সহিত যোগ করিতে হইবে। ইহার জন্য দশ দশটি বস্তু লইয়া এক একটি বাণ্ডিল বাঁধিতে বা স্তূপ সাজাইতে হইবে। দশের দশটি বাণ্ডিল লইয়া শতের বাণ্ডিল বাঁধিতে বা স্তূপ সাজাইতে হইবে। এককের সংখ্যাগুলির যোগফল যত দশকের বেশী হয়, ততটি দশের আঁটি হইল, এবং তাহা দশের আঁটির সহিত বা দশকের ঘরের সংখ্যার সহিত যোগ করিতে হইবে। সেইরূপ দশকের ঘরের সংখ্যাগুলির যোগফল এক, দুই, তিন প্রভৃতি দশকের যত বেশী হয়, তাহাই দশকের ঘরে লিখিতে হইবে। এবং যত দশ হয় তাহা শতকের ঘরের সংখ্যার সহিত যোগ করিতে হইবে। কেননা দশকের ঘরের এক যেন একটা দশকের আঁটি, সুতরাং দশকের ঘরের দশটি আঁটি লইয়া একটা শতের আঁটি হইবে, ইত্যাদি। একক, দশক ইত্যাদি ঘরের যোগফল যত দশ হয় তাহা হাতে থাকিবে, এবং দশের কম যাহা হয় তাহাই সেই ঘরের যোগফল হিসাবে লিখিতে হইবে। যথা,—১৫, ২৩, ৩৭ ও ৪৫ যোগ করিবার সময় এককের ঘরের যোগফল ২০ হইবে। এককের ঘরের যোগফলের ঘরে ০ (শূন্য) লিখিতে হইবে এবং ২ দশক হাতে থাকিবে। তাহা দশকের ঘরের যোগফলের সহিত যোগ করিতে হইবে।

অনেক সংখ্যার যোগ করিতে হইলে এক এক ঘরের সংখ্যাগুলি যোগ করিবার পর কিয়ৎক্ষণ থামিবে, তাহা না হইলে ভুল হইবার সম্ভাবনা বেশী। যোগের বিশুদ্ধতা নির্ধারণের জন্য নিম্ন হইতে ঊর্ধ্বদিকে যোগ করিয়া দেখা যায়। যথা,—

```
 ৩৮৬৪১৬
 ───────
  ৫৯৮৭৭
  ৭৮৯৮৮
  ৯৭৮৯৭
  ৮৩৭৫৯
  ৬৫৮৯৫
 ───────
 ৩৮৬৪১৬
```

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রথম যোগ অঙ্ক শিক্ষা দিতে যাইয়া এত বড় যোগ অঙ্ক শিক্ষা দিবার দরকার নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। যোগফলের সংখ্যাগুলি কি ভাবে যোগ করার পর বসান হইবে, তাহা দেখার জন্যই এইভাবে যোগ অঙ্কটি দেওয়া হইল। শিক্ষক যখন প্রথম শ্রেণীতে যোগ অঙ্ক শিক্ষা দিবেন তখন দুইটি, তিনটি বা চারটি সংখ্যার যোগফল যাহাতে ৫০ এর উপরে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

তাছাড়া প্রথমে ৭+৮+৬+৩ এইরূপ এক এক বিশিষ্ট রাশির যোগ করিতে ভালভাবে অভ্যস্ত করার পর তবেই দুটী অঙ্ক বিশিষ্ট রাশির যোগ শিক্ষা সুরু করা হইবে।

বিয়োগ। বিয়োগও প্রথমে বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। যথা, কতকগুলি বস্তু হইতে কতকগুলি বস্তু পৃথক্ করিয়া রাখিলে কত অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা শিশু গণনা করিয়া নির্ধারণ করিবে। ইহার পর বস্তুর সাহায্যে বিয়োগের নামতা গঠন করা যায় এবং তাহার সাহায্যে লিখিত সংখ্যার বিয়োগ করা যায়। অথবা যোগের নামতার সাহায্যেও বিয়োগ করা যায়। কেননা নীচের সংখ্যার সহিত কত যোগ করিলে উপরের সংখ্যাটি হইবে তাহা যোগের নামতার সাহায্যে স্থির করা যায় এবং তাহাই দুইটি সংখ্যার বিয়োগ-ফল। যথা,—৫এর সহিত ৩ যোগ করিলে ৮ হয়। সুতরাং ৮−৫=৩।

শিশুরা যোগের নামতার সাহায্য লইয়া যখন এইভাবে এক অঙ্কের দুইটি রাশির বিয়োগফল সহজেই বলিতে পারিবে তখন তাহাদিগকে প্রথমে এমন দুই তিন রাশির বিয়োগ শিখানো হইবে যাহার উপরের রাশির সব অঙ্কগুলিই নিচের রাশির অনুরূপ অঙ্কের অপেক্ষা ছোট হয় যথা:— ৫৭৩−৪৫২। ইহার পর প্রথমে হাতে রাখা বিযোগ শিখিতে দেওয়া হইবে। প্রথম শিক্ষার্থীকে এইরূপ অঙ্ক বিষয়ে বাস্তব ধারণা দিয়া প্রক্রিয়াটির তাৎপর্য্য ঠিকমত বুঝিবার সুযোগ দিতে হইবে। এইরূপ দুইটি নিয়ম আছে, তাহা এখানে আলোচিত হইল।

প্রথম নিয়ম:—বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Method of analysis) মনে করা হউক ৮৩ হইতে ৬৯ বিয়োগ করিতে হইবে। এখানে শিশুকে দশটি করিয়া একত্রে গ্রথিত মালার পুঁতি (beads) জাতীয় দ্রব্য ও ৩টি খুচরা মালা, অথবা ১০টি করিয়া কাঠি লইয়া বাকী ৮টি আটি ও তিনটি

খুচরা আটি দেওয়া হইল। উহা হইতে ৬৯টি মালা বা কাঠি লইলে কয়টি থাকিবে ইহাই হইবে সমস্যাটির বাস্তব রূপ। প্রথমে শিশুদিগকে খুচরা মালা বা কাঠিগুলি হইতে ৮টি কাঠি লইতে বলা হইবে ও তাহারা ইহার তাৎপর্য সহজেই বুঝিবে কারণ ইতিপূর্বেই তাহারা যে বিয়োগ অঙ্কগুলি করিয়াছে তাহাতেও এইরূপ প্রক্রিয়া করিয়াছে। কিন্তু এখন তাহারা দেখিবে যে ৩টি কাঠি বা মালা হইতে ৯টি কাঠি বা মালা লওয়া যাইতেছে না। তখন তাহারা সহজেই একটি আটি ভাঙ্গিতে চাহিবে ও তাহাদিগকে তাহাই বলা হইবে। সুতরাং এখন রহিল ৭টি আটি ছড়া ও ১৩টি কাঠি বা মালা। ১৩টি কাঠি বা মালা হইতে তাহারা ৯টি কাঠি বা মালা সরাইয়া লইলে থাকিবে ৪টি। তাহার পরে ৭টি আটি বা ছড়া হইবে ৬ দশক বা ছয় আটি বা ছড়া সরাইয়া লইলে একটি আটি বা ছড়া থাকিবে। অর্থাৎ বিয়োগ ফল হইল এক দশক ও চার বা ১৪। শিশুরা এইরূপ কয়েকটি হিসাব বাস্তব দ্রব্য লইয়া করিবার পর ঐ বাস্তব কাজটিই তাহারা মনে মনে করিবে অর্থাৎ তখন তাহারা প্রক্রিয়াগত ভাবেই বিয়োগ অংশটি করিতে পারিবে— কাঠি বা মালার প্রয়োজন হইবে না। উহার যে বাস্তব প্রক্রিয়াটি দেওয়া হইল তাহাকে বিশ্লেষী পদ্ধতি বলা হয়। কারণ এখানে নিম্ন লিখিত ভাবে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হইতেছে:—

$$৮৩-৬৯=(৮\text{ দশ}+৩)-(৬\text{দশ}+৯)$$
$$=(৮০+৩)-(৬০+৯)=(\overline{৭০+১০}+৩)-(৬০+৯)$$
$$=(৭০+১৩)-(৬০+৯)=(৭০-৬০)+(১৩-৯)$$
$$=১০+৪=১৪।$$

অর্থাৎ ৮৩ সংখ্যাটি বিশ্লেষিত হইয়া ৭০+১৩ সংখ্যায় পরিণত হইতেছে। উপরের বর্ণনায় প্রক্রিয়াটি জটিল মনে হইলেও বাস্তবে শিশুরা একটি আটি ভাঙ্গিয়া খুচরা করিয়া লইতেছে মাত্র—কাজেই এখানে বাস্তব প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সহজ হইবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় অসুবিধা রহিয়াছে। মনে করা হউক শিশুরা এই প্রক্রিয়াতে অভ্যস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা বিয়োগের অঙ্কে যেখানে নিম্নের কোনও অঙ্ককে তাহার উপরের অঙ্ক অপেক্ষা বড় দেখে তখনি উপরের রাশির তাহার পরবর্তী বড় অঙ্ক এক কমাইয়া উপরের রাশির ঐ অঙ্কের সহিত ১০ যোগ করিয়া লয় ও বিয়োগটি করে। কিন্তু যখন ১০০০০-৩৬৯ এইরূপ একটি

করিবে তখন শিশুরা উপরের প্রক্রিয়ায় অঙ্কটি কষিতে খুবই অসুবিধা অনুভব করিবে না কি ?

দ্বিতীয়তঃ দেখা গিয়াছে শিশুরা উপরের রাশির অঙ্ক হইতে এক বিয়োগ ব্যাপারে অধিক অনবধানতার পরিচয় প্রদান করে। তাই এই পদ্ধতি অপেক্ষা দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই বেশী অনুসরণযোগ্য।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—সমরাশি যোগ পদ্ধতি (Equal Addition Method) এই পদ্ধতিতে ৮৩–৬৯ এই অঙ্কটি কষিতে গিয়া যখনই শিশু তিন হইতে ৯ লওয়ায় অসুবিধা অনুভব করিল তখন তাহাকে বাহির হইতে দশটি কাঠি বা মালা (beads) ধার করিতে বলা হইবে ও তাহা ও এককের সহিত যোগ করিলে ১৩টি মালা বা কাঠি হইবে। সুতরাং এখন সে ১৩–৯=৪ বাহির করিতে অসুবিধা বোধ করিবে না। তাহার পর তাহাকে বলা হইবে যে অঙ্ক অনুযায়ী ৬টি আটি বা দশক লওয়া ছাড়াও পূর্ব প্রক্রিয়াটির জন্য লওয়া ১ দশক ধার শোধ করিতে হইবে। অর্থাৎ ৮ দশক বা আটি হইতে তাহাকে (৬+১) আটি বা দশক লইতে হইবে ও তাহা হইলে ৮–৭=১ অঙ্কটি থাকিবে। বলা বাহুল্য যে এক্ষেত্রে বাস্তব প্রক্রিয়াটি কিছু জটিল ঠেকিতেছে, কিন্তু ইহাতে অভ্যস্ত হইলে শিশুরা উহার অন্তর্নিহিত যে মানসিক প্রক্রিয়াটি করিতে শিখিবে তাহা প্রথম প্রক্রিয়া অপেক্ষা অনেক দিক দিয়া সুবিধাজনক। এক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটির তাৎপর্য কি দাঁড়ায় তাহা বিবেচনা হউক।

৮৩–৬৯ = (৮০+৩) – (৬০+৯)
=(৮০+১০+৩) – (৬০+১০+৯)
=(৮০+১৩) – (৭০+৯) = (৮০–৭০) + (১৩–৯)
=১০+৪ = ১৪।

এক্ষেত্রে উপরের ও নীচের উভয় রাশিতেই ১০ যোগ করা হইতেছে বলিয়া ইহাকে সমযোগ পদ্ধতি (equal addition method) বলা হয়। ইহার সুবিধা হইবে এক্ষেত্রে শিশুদিগকে উপরের রাশির অঙ্কগুলি হইতে ১ বিয়োগের ঝুঁকি লইতে হইতেছে। নিম্নের রাশির অঙ্ক ১ যোগ করিয়াই হইতেছে। শিশুরা ঐরূপ যোগ করিতে অপেক্ষাকৃত কম ভুল করে। দ্বিতীয়তঃ ১০০০০–৩৮৪ এইরূপ বিয়োগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে কোনও অসুবিধা হইবার কারণ নাই।

ব্যালার্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত শিশুর প্রথম প্রক্রিয়ায় অভ্যস্থ শিশুদের অপেক্ষা ভুল কম করে। আমাদের দেশে দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিতেই সাধারণ অভ্যস্ত থাকায় উহা ঐ প্রক্রিয়াটিকে গ্রহণ করার বিষয়ে অধিকতর যৌক্তিকতা প্রদান করিয়াছে। সুতরাং বাস্তবীকরণ বিষয়ে একটু অসুবিধা দেখা গেলেও শিশুকে এই প্রক্রিয়াতেই অভ্যস্ত করিতে হইবে।

বিয়োগের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা ঃ—বিয়োগ অঙ্কের নীচের সংখ্যার সহিত বিয়োগ-ফল যোগ করিয়া যদি উপরের সংখ্যা পাওয়া যায় তবেই বিয়োগ শুদ্ধ হইয়াছে প্রমাণিত হয়। যথা,—

বিয়োগ	যোগ
৫ ৭ ৮ ০	বিয়োগের নীচের সংখ্যা ৩ ৮ ৭ ২
৩ ৮ ৭ ২	বিয়োগ-ফল ১ ৯ ০ ৮
১ ৯ ০ ৮	বিয়োগের উপরের সংখ্যা ৫ ৭ ৮ ০

গুণন। প্রথমে বস্তুর সাহায্যে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, **গুণন যোগেরই সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া**। যথা,—৫টা বস্তু তিনবার লইলে পনেরটা বস্তু হয়। তাই বলা হয় যে ৫ কে ৩ দিয়া গুণ করিলে ১৫ হয়।

ইহার পর **বস্তুর সাহায্যে** এক হইতে দশ পর্যন্ত সংখ্যার **গুণনের** নামতা প্রস্তুত করিতে হইবে। এবং শিশুকে যত্নের সহিত তাহা শিক্ষা দিতে হইবে। (ছোট শিশুদের পক্ষে এক হইতে দশ পর্যন্ত সংখ্যার গুণের নামতা শিক্ষা করিলেই হইবে।) যোগের ও গুণের নামতা ভালরূপে শিক্ষা না করিলে শিশু কখনও দ্রুত এবং নির্ভুল ভাবে গণিতের অঙ্ক করিতে পারিবে না। তাই নামতার জ্ঞান সঠিক ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যায়।

(১) শিশুগণের সহযোগিতায় বস্তুর সাহায্যে নামতাগুলি গঠন করা, (২) এক এক শিশুর স্বতন্ত্রভাবে তাহা বার বার আবৃত্তি করা এবং কিছু সময় পর পর পুনঃ পুনঃ শিক্ষা করা, (৩) নামতাগুলির সাহায্যে কিছুকাল মৌখিক গুণন শিক্ষা দেওয়া, (৪) সর্বশেষে ইহাদের প্রয়োগ করিয়া শিশুগণকে যতবেশী সম্ভব অঙ্ক কষিতে দেওয়া। এক জন শিশুর নেতৃত্বে অনেক শিশু সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া যোগ ও গুণনের নামতা

শিক্ষার প্রথা ভাল নহে। কেননা, (১) সকল শিশু একই গতিতে শিক্ষা করিতে পারে না, (২) ইহাতে শিশুগণ মনোযোগ না দিয়া অনেক সময় যন্ত্রের ন্যায় চীৎকার করিয়া আবৃত্তি করে এবং মনোযোগ না দিয়া আবৃত্তি করিলে কোন বিষয় শিক্ষা হইতে পারে না; (৩) ইহাতে বিদ্যালয়ে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হয় এবং অন্য শ্রেণীর কাজের ব্যাঘাত হয়।

গুণনের নামতা ভালরূপে শিক্ষা হওয়ার পরই শিশু বস্তুর সাহায্য না লইয়া **নামতার সাহায্যেই** লিখিত সংখ্যার গুণন করিতে পারিবে।

দশ বা তাহা অপেক্ষা কম দুইটি সংখ্যার গুণফল নামতা সাহায্যে শিশুরা নির্ভুলভাবে বলিতে পারিলে তখন বাস্তব দ্রব্য (মালা পুঁতি বা কাঠি) সাহায্যে ২৮×৮ এইরূপ অপেক্ষাকৃত ছোট (যাহার গুণ্য গুণক বড় নহে) অঙ্কের উত্তর নির্ণয় করিতে শেখানো হইবে। প্রথম বাস্তব ভাবে করিবার জন্য দুইটি দশকের আটি ও ৮টি করিয়া কাঠি পর পর ৮ভাগে রাখিতে হইবে। তৎপরে প্রথমে ৮টি করিয়া কাঠি ৮বার লইবে ও নামতা সাহায্যে গুনিয়া যাইবে ৮×৮=৬৪=৬ দশ ৪; ২ দশক×৮=১৬ দশক=১ শতক ৬ দশক ∴ মোট ১ শতক ৬ দশক+৬ দশক ৪ একক=২ শতক ২ দশক ৪ একক=২২৪ তৎপরে ইহা প্রক্রিয়া সাহায্যে করিবে যথা—

```
 ২৮
  ৮
────
 ৬৪
১৬০
────
২২৪
```

অনেকের মতে প্রথমে শিশুরা অপেক্ষাকৃত নির্ভুল ভাবে হিসাব করিতে পারে ও শেষের দিকে বেশী ভুল করে, এজন্য প্রথমে দশকের গুণক্রিয়ার পর এককের গুণক্রিয়া করানো ভাল। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ভাবে উহা করিবে—

```
 ২৮
  ৮
────
১৬০
 ৬৪
────
২২৪
```

পরবর্তী স্তরে ১৬০ এইরূপ লিখিবার প্রয়োজন কি বুঝাইয়া ১৬এর পরে একটি × দিয়া উহা যে ফাঁক তাহা বুঝাইতে শেখানো হইবে ও তৎপরে শিশুরা যথেষ্ট অভ্যস্ত হইলে × চিহ্নেরও আর প্রয়োজন থাকিবে না।

কোন সংখ্যাকে একাধিক অঙ্ক-বিশিষ্ট সংখ্যার দ্বারা গুণ করিতে হইলে, এককের, দশকের, শতকের অঙ্কদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ গুণ করিয়া গুণফলগুলির একটার নীচে একটা এভাবে লিখিতে হইবে যেন এককের গুণফল এককের ঘর হইতে, দশকের গুণফল দশকের ঘর হইতে, শতকের গুণফল শতকের ঘর হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পর এই গুণফলগুলি যোগ করিলেই পূর্ণ সংখ্যাটির গুণফল পাওয়া যাইবে। উদাহরণের সাহায্যেই ইহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। প্রথমেই এই সমস্ত প্রক্রিয়ার কারণ নির্দেশ করিতে গেলে তাহা শিশুর নিকট দুর্বোধ্য হইবে। তাহার আরও জ্ঞান বৃদ্ধির পরে তাহাকে ইহার কারণ বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।[১] গুণন করিবার কালে গুণকের সর্ব বামদিক্‌স্থ অঙ্ক হইতে আরম্ভ করা ভাল; ইহাতে ভুল কম হয়। নীচে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

```
  ৫৪৩২
   ২৩৪
--------
১০৮৬৪
 ১৬২৯৬
  ২১৭২৮
--------
১২৭১০৮৮
```

গুণনের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া। উদাহরণের সাহায্যে শিশুকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে ১০, ১০০, ১০০০ প্রভৃতি সংখ্যার দ্বারা গুণ করিবার জন্য গুণ্যের ডান পার্শ্বে কেবল একটা, দুইটা বা তিনটা শূন্য দিলেই হইবে। ৯, ৯৯, ৯৯৯ দিয়া গুণ করিবার জন্য গুণ্যের ডান পার্শ্বে একটা, দুইটা বা তিনটা শূন্য দিয়া তাহা হইতে গুণ্যটী বিয়োগ করিলে অথবা ১১, ১১১ ইত্যাদির দ্বারা গুণের জন্য তাহার সহিত গুণ্যটি যোগ করিলেই গুণফল পাওয়া যাইবে।

১ Welton—Principles and Methods of Teaching—page 415.

উৎপাদকের সাহায্যে গুণন। ইহার জন্য প্রথমে বস্তুর সাহায্যে উৎপাদকের জ্ঞান দিতে হইবে। একটা একটা করিয়া কোন বস্তু ৬ বার লইলে যতটা বস্তু হয়, দুইটা দুইটা করিয়া তাহা তিনবার লইলেও ততটা বস্তু হইবে। অর্থাৎ ৬=২×৩। তাই ২ ও ৩ ৬এর উৎপাদক।

সেইরূপ ৫ এবং ৭কে ৩৫এর উৎপাদক বলা যায়। সুতরাং কোন সংখ্যাকে ৩৫ দিয়া গুণ করিতে হইলে তাহাকে প্রথমে ৫ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৭ দিয়া গুণ করা যায়। ইহাকেই উৎপাদকের সাহায্যে গুণন বলে।

গুণনের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা :—

(১) গুণককে গুণ্য দিয়া গুণ করিলে গুণফল একই হইবে।

(২) গুণফলকে গুণ্য বা গুণক দিয়া ভাগ করিলে গুণক বা গুণ্য পাওয়া যাইবে। (অবশ্য ভাগ-শিক্ষার পূর্বে ইহার সাহায্য লওয়া যায় না।)

মুখে মুখে যোগ, বিয়োগ ও গুণন অঙ্ক অভ্যাস করাইবার জন্য সংখ্যা-বৃত্তের (ring of figures) সাহায্য পাওয়া যায়।

ভাগ। প্রথমে বস্তুর সাহায্যে শিশুকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, **ভাগ বিয়োগেরই সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া।** যথা,—পনেরটা বস্তু হইতে ৫টা বস্তু তিন বার লওয়া যায়। তাই বলা যায় যে, ১৫ কে ৫ দিয়া ভাগ করিলে ৩ হয়। অর্থাৎ ভাজ্য (যাহাকে ভাগ করিতে হইবে) হইতে ভাজক (যাহার দ্বারা ভাগ করিতে হইবে) যতবার বিয়োগ করা যায় তাহাই ভাগফল এবং যতবার সম্ভব বিয়োগ করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ভাগশেষ।

ইহার পর প্রথমে বস্তুর সাহায্যে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে **কোন সংখ্যা ৫ বার বিয়োগ করা এবং তাহাকে ৫ দিয়া গুণ করিয়া গুণফল বিয়োগ করা একই কথা।** পরে লিখিত সংখ্যার সাহায্যেও তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং বার বার বিয়োগ না করিয়া ভাজককে যতবার গুণ করিলে গুণফল ভাজ্য হইতে অধিক না হয় ততবার গুণ করিয়া গুণ-ফল ভাজ্য হইতে বিয়োগ করা যায়। ইহাই, গুণনের সাহায্যে ভাগ করার প্রক্রিয়া। এইরূপে বস্তু এবং লিখিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে ভাগের প্রক্রিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার পর গুণনের নামতার সাহায্যে লিখিত ভাগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহার জন্য ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় বোর্ডে কয়েকটি

ভাগের অঙ্ক করিয়া দেখাইতে হইবে। তাহার পর যথেষ্ট অনুশীলনী দিতে হইবে।

সংখ্যাবাচক যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ শিক্ষা দেওয়ার পর যতশীঘ্র সম্ভব **প্রশ্নের বা সমস্যার আকারে** ছাত্রছাত্রীগণকে সেই সকল অঙ্ক করিতে দেওয়া প্রয়োজন। ইহা না করিলে তাহারা চিন্তা করিয়া অঙ্ক করিতে শিখিবে না, যন্ত্রের ন্যায় অনুকরণ করিয়া কাজ করিবে।

ভাগের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা। ভাজককে ভাগফল দিয়া গুণ করিয়া গুণফলের সহিত ভাগশেষ যোগ করিলে যদি ভাজ্য পাওয়া যায় তাহা হইলেই ভাগ শুদ্ধ হইয়াছে অথবা ভাজ্যকে ভাগফল দিয়া ভাগ করিয়া যদি ভাজক পাওয়া যায় এবং ভাগশেষ একই থাকে তবে ভাগ শুদ্ধ হইয়াছে।

মিশ্র রাশির অঙ্ক :—

বর্তমানে দশমিক ওজন, দৈর্ঘ্য ও মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায় মিশ্ররাশির সহিত সাধারণ রাশির ব্যবধান কমিয়া গিয়াছে। শিশুরা প্রথম শ্রেণী হইতেই মিশ্র রাশির সহজ ব্যবহার শিখিবে তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

টাকা ও নয়া পয়সা বাস্তবভাবে চিনিতে ও গণনা করিতে শিখিবে ও তাহার সহিত প্রথমে নিম্নলিখিত ভাবে উহা লিখিতে শিখিবে :—৫ টাকা ১৩ নয়া পয়সা = ৫ টা ১৩ নঃ পঃ। পরবর্তী স্তরে উহা আরো সংক্ষেপে লিখিতে শিখিবে—টা ৫।১৩. এইস্তরে ৭ টাকা ৮ নয়া পয়সা লিখিতে টা ৭।৮ লেখার অসুবিধা বুঝাইতে হইবে ও দশক স্থানটিতে শূন্য দিয়া টা ৭'০৮ এইভাবে লিখিতে শেখানো হইবে। তৎপরবর্তী স্তরে উহা টা ৫'১৩, টা ৭'০৮ এইভাবে লিখিতে শিখিবে।

প্রথমে শিশুরা ঐভাবেই ৮ মিটার ১৩ সেন্টিমিটার ৮ মি ১৩ সেন্টি = মি ৮।১৩ বা মি ৮'১৩ এইভাবে লিখিতে শিখিবে। কিন্তু তাহার পরের স্তরে কিলোমিটার শিখিলে প্রথমে ১৩ কিমি ১২৪ মি ১৩ সেমি এইভাবে লিখিতে শিখিবে। ওজনের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ ১৩ কি গ্রা ১২৫ গ্রা এইভাবে লিখিবে।

মিশ্ররাশির যোগ,

২৫ নঃ প + ৪৩ নঃ প + ৫৯ নঃ প এইরূপ যোগগুলি বাস্তবভাবে দ্রব্যাদির মূল্যের হিসাব করিতে গিয়াই শিশুরা অভ্যস্ত হইতে পারিবে। এক্ষেত্রে উহা যে সাধারণ সংখ্যার যোগের সমতুল্য তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে

না। কেবল শতক অঙ্কটি যে টাকা তাহা বুঝিতে দিতে হইবে। তৎপরে ২৭ টা ১৩ নঃ প+২৫ টা ৭৮ নঃ প+১৫ টা ৩৭ নঃ প এইরূপ যোগ করার সময় নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় যোগ করিতে শেখানো হইবে:—

২৭ ·১৩
১৫ ·৭৮
১৫ ·৩৭
———
৫৮ ·২৮

অর্থাৎ যোগফলের দুইটি ডান পাশের অঙ্কের বামে (·) একটি দিতে হইবে ইহা বুঝিতে দিতে হইবে। যখন কোনও মিশ্র অঙ্কে নয়া পয়সা থাকিবে না তখন ঐস্থানে ০০ দিবার বিধিটিও বুঝাইতে হইবে।

ওজন ও দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত যোগ অঙ্কে নিম্নলিখিত ভাবে রাশিগুলি লিখিয়া যোগ করানো হইবে:—

৩ কিমি ১৭ মি ২৫ সেমি

	কিমি,	হেমি,	ডেকা মি,	মি	ডেমি	সেমি
=	৩	০	১	৭	২	৫

এইভাবে লিখিবার পর সংখ্যার যোগের মধ্যে যোগ করিয়া যোগফল পাওয়া যাইবে। উহা শিশুকে ছোট ছোট মিশ্র ওজনের পরিমাণগুলি বাস্তব ভাবে ও লিখিতভাবে যোগ করিয়া সহজেই বুঝানো যাইবে।

মিশ্র বিয়োগ:—

মিশ্র রাশিগুলি ঠিকমত লিখিতে পারিলে সাধারণ জিনিষের মত বিয়োগ দ্বারাই যে বিয়োগ ফল পাওয়া যায় তাহা বাস্তব সাহায্যে ও প্রক্রিয়া সাহায্যে বুঝিবার সুযোগ দিবার পর ঐরূপ অনেক অঙ্ক কষিতে দিয়া প্রক্রিয়াটিতে অভ্যস্ত করাইতে হইবে।

মিশ্ররাশির গুণ ও ভাগ

টাকা ও নয়া পয়সার ক্ষেত্রে এইরূপ গুণ ভাগ যে সাধারণ সংখ্যার অনুরূপ প্রক্রিয়াতেই করিতে হইবে—কেবল শেষের দুইটি অঙ্ক নয়া পয়সার পরিমাণ সূচিত করিবে—তাহা বুঝাইতে হইবে। কোন রাশিতে টাকার সহিত নয়া পয়সা না থাকিলেও · চিহ্নের পরে দুইটি ০° (নয়া পয়সার স্থানে) বসাইতে হইবে।

ওজন ও দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত মিশ্ররাশির ক্ষেত্রে রাশিগুলি পূর্বে উল্লিখিত ভাবে লিখিবার পর সাধারণ সংখ্যার মতই গুণ ভাগ করা চলিবে।

উদাহরণ ১

১৫ কিমি ২৭ মি ১৩ সেমি×৮

কিমি	হেমি	ডেকামি	মি	ডেমি	সেমি
১৫	০	২	৭	১	৩
					৮
১২০	২	১	৭	০	৪

=১২০ কিমি ২১৭ মি ৪ সেমি

উদাহরণ ২

১৫ কিগ্রা ৭৫ গ্রা ÷ ২৫

	কিগ্রা	হেগ্রা	ডেকাগ্রা	গ্রা		হেগ্রা	গ্রা
২৫)	১৫	০	৭	৫	(	৬	৩
	১৫	০					
			৭৫				

=৬ হেগ্রা ০ ডেকাগ্রা ৩ গ্রা

=৬০৩ গ্রাম।

দশমিক মিশ্ররাশির লঘুকরণ ঃ—

দশমিক মিশ্ররাশির মানগুলি দশক পদ্ধতিতে লিখিত সংখ্যার অঙ্কের মানের অনুরূপ হওয়ায় ইহার লঘুকরণ অত্যন্ত সহজ। যথা ঃ—

১৭কিমি ৩৭৫মি=১৭৩৭৫মি

৯কিমি ১৩ মি=৯কিমি ০ হেমি ১ ডেকা মি ৩মি=৯০১৩মি।

এক্ষেত্রে প্রথমে পূর্বোল্লিখিত প্রণালীতে মিশ্র রাশিটি লিখিতে হইবে। তাহার পর যে মানে উক্ত রাশিটি পরিণত করিতে হইবে তাদের পূর্ব পর্যন্ত অংশগুলি পর পর লিখিয়া গেলেই উত্তরটি পাওয়া যাইবে। যথা—

প্রশ্ন ঃ ১৫ কিমি ৭৫ মি কত সেন্টি মিটার ?

১৫ কিমি ৭৫ মি=১৫ কিমি ০ হেমি ৭ ডেকামি ৫ মি ০ ডেসিমি ০ সেমি= ১৫০৭৫০০ সেন্টিমিটার। বিপরীত লঘুকরণের অঙ্ক কষিতে শিখাইবার পূর্বে শিক্ষার্থীটিকে দশমিক অঙ্ক সম্বন্ধে বলিয়া দিতে হইবে।

দশমিক শিক্ষা :—

শিশুরা দশক পদ্ধতিতে অঙ্ক লিখিতে শিখিবার সময় একক দশক শতক প্রভৃতি শিখিয়াছে। আবার মুদ্রা ওজন প্রভৃতি শিখিয়াছে। আবার মুদ্রা ওজন প্রভৃতি লিখিবার সময় দশ দশ করিয়া কমিয়া আসা ব্যাপারেও অভ্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে চিহ্নটি যে এককের সমাপ্তিসূচক চিহ্ন ও তাহার পরে যথাক্রমে দশাংশ, শতাংশ প্রভৃতি জ্ঞাপক অঙ্কগুলি থাকে তাহা বুঝানো কঠিন নহে। প্রথমে দৈর্ঘ্য প্রভৃতি এককগুলির সাহায্যে বাস্তবভাবে উহা বুঝাইতে হইবে। যথা ১ মিটার ৭ ডেসি মিটার ৫ সেন্টিমিটার = ১ মি + ১ মিটারের দশাংশ এর ৭ গুণ + ১ মিটারের শতাংশের ৫ গুণ = ১·৭৫ মিটার এইভাবে লেখার কৌশলটি বুঝাইতে হইবে।

তৎপরে সাধারণ সংখ্যা হিসাবে ১·৭৫ এর তাৎপর্য বুঝাইতে হইবে।

দশমিক সংখ্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দিবার পর উহার যোগ বিয়োগ গুণন ও ভাগ প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত করিতে হইবে।

উর্ধ্ব-লঘুকরণ :—

১ কিমি ১৩মি ১৮সেমি = কত কিলোমিটার ?

প্রদত্ত মিশ্রসংখ্যা = ১ কিমি ০ ডেমি ১(ডেকা মি ৩ মি ১ ডেসি মি ৮ সেন্টি মি
= ১·০১৩১৮ সে মি। অর্থাৎ যে এককের উর্ধ্বগ-লঘূকরণ চাওয়া হইয়াছে তাহার পরই দশমিক বিন্দুটি বসিবে ও তৎপর পর পর অঙ্কগুলি বসাইতে হইবে।

অন্যান্য একক সংযুক্ত করিবার লঘুকরণ :—

শিশুরা এইরূপ অঙ্ক ৫ম শ্রেণীতে কষিবে এবং তখন তাহাদের যথেষ্ট গাণিতিক ধারণা পরিপক্বতা লাভ করায় প্রক্রিয়াগুলি সহজেই বুঝিবে—বাস্তব ধারণা দিবার জন্য শুধু এককগুলির পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিতে হইবে।

সাঙ্কেতিক। প্রথমে মুদ্রা, ওজন ইত্যাদির সাহায্যে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে ইহা মিশ্র গুণনেরই প্রকারান্তর। ইহাতে মিশ্র গুণনের কাজটা সহজসাধ্য হয় এবং ভুলের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। বিশেষতঃ ইহার সাহায্যে বিভিন্ন পরিমাণ জিনিষের মূল্য নিরূপণ করা সহজ হয়। সেই জন্য দোকানদারেরা ইহার বহুল ব্যবহার করে এবং তাহারা ইহাকে চলিত নিয়ম বলে।

বড় মিশ্র সংখ্যার গুণ করিতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়া তাহারা তাহাকে কতকগুলি ছোট মিশ্র সংখ্যায় পরিণত করে। স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের মূল্য বা ওজন হিসাব করিয়া এবং সেই সকলগুলি যোগ করিয়া বড় মিশ্র সংখ্যার মূল্য বা ওজন নিরূপণ করে।

একাংশের ধারণা দেওয়া হইলে বস্তুর সাহায্যে সাঙ্কেতিকের ধারণা দেওয়ার পর, বোর্ডে ২।৩টা অঙ্ক কষিয়া দেখাইতে হইবে। প্রত্যেক অংশের কারণ, এবং কি আকারে তাহা লিখিতে হইবে, ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। বিভিন্ন হারের অনুপাতও লিখিয়া দিতে হইবে। সর্বশেষে বিভিন্ন হারের মূল্য বা ওজন ইত্যাদি যোগ করিয়া সম্পূর্ণ জিনিসের ওজন বা মূল্য নিরূপণ করিয়া দেখাইতে হইবে। যথা,—

৫॥৵ মণ দরে ১৫০ মণ চাউলের মূল্য বাহির কর।

	টা.	আ.	
	১৫০	০	= ১ টাকা মণ দরে ১৫০ মণের মূল্য
		× ৫	
৮ আনা = ১ টাকার $\frac{১}{২}$	৭৫০	০	= ৫ টাকা মণ দরে ১৫০ মণের মূল্য
২ আনা = ৮ আনার $\frac{১}{৪}$	৭৫	০	= ॥০ আনা " " " "
	১৮	১২	= ৵০ " " " " "
	৮৪৩	১২	= ৫॥৵০ আনা মণ দরে ১৫০ মণের মূল্য।

ঐকিক নিয়ম। কতকগুলি জিনিষের মূল্য, ওজন, মাপ ইত্যাদি দেওয়া থাকিলে তাহা হইতে একটির মূল্য নিরূপণ করিয়া কতিপয়সংখ্যক জিনিষের মূল্য, ওজন ইত্যাদি নিরূপণ করার প্রক্রিয়াকে ঐকিক নিয়ম বলে। যথা,—
১৫টা ছাগলের মূল্য ৭৫ টাকা হইলে ১২৫টা ছাগলের মূল্য কত?

ইহার জন্য প্রথমে প্রদত্ত ছাগলের মূল্যকে ছাগলের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া একটা ছাগলের মূল্য বাহির করিতে হইবে। তাহার পর তাহাকে প্রদত্ত ছাগলের সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া তাহাদের মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। যথা,—১৫টা ছাগলের মূল্য = ৭৫ টাকা।

∴ ১টা " " = $\frac{৭৫}{১৫}$ = ৫ টাকা

∴ ১২৫টা " " = ৫ × ১২৫ = ৬২৫ টাকা

ছাত্রীছাত্রীগণের সহযোগিতায় এইরূপ কয়েকটি অঙ্ক বোর্ডে করিয়া তাহার পর অঙ্ক কষিতে দেওয়া হইলে তাহাদের নিয়মটি ভালরূপে শিক্ষা হইবে।

ভগ্নাংশ। প্রথমে বস্তু বা চিত্রের সাহায্যে ছাত্রগণকে ভগ্নাংশের ধারণা দিতে হইবে, এবং লব ও হর কাহাকে বলে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য একটা রুটী বা ফলকে কয়েক সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহা গণনা করিয়া বস্তুটি কয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে বলা যায়। অথবা বোর্ডে একটা সরল রেখা টানিয়া এবং তাহাকে কয়েকটি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াও দেখান যায়। বস্তু বা রেখাকে যত সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়, তাহার সংখ্যাকে **হর** বলে। তাহার মধ্য হইতে যত ভাগ লওয়া হয় তাহার সংখ্যাকে **লব** বলে। হর নীচে এবং লব উপরে লিখিয়া ইহা ভগ্নাংশের আকারে প্রকাশ করা হয়। যথা,—একটা বস্তু বা রেখাকে ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার তিন ভাগ লইলে হর ৪, লব ৩ এবং ভগ্নাংশ $\frac{৩}{৪}$ হইবে।

ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ। এই ভাবে ছাত্রছাত্রীকে ভগ্নাংশের ধারণা দিয়া প্রথমে বস্তুর সাহায্যে সম হর-বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া যায়। যথা,—১টা বস্তুকে ১০ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার ৫ ভাগ ও ২ ভাগ লইলে ৭ ভাগ লওয়া হয়, আরও ২ ভাগ লইলে ৯ ভাগ লওয়া হয়। অথবা $\frac{৫}{১০}+\frac{২}{১০}+\frac{২}{১০}=\frac{৯}{১০}$ ভাগ। তাহা হইতে ৬ ভাগ বাদ দিলে বা ফেরত দিলে মাত্র ৩ ভাগ থাকে। অর্থাৎ $\frac{৯}{১০}-\frac{৬}{১০}=\frac{৩}{১০}$। সুতরাং এই সূত্র গঠন করা যায় যে, হর ঠিক রাখিয়া কেবল লবগুলি যোগ বা বিয়োগ করিলেই **সম হর-বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ বা বিয়োগ** করা হইবে।

অসম হর-বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথমে ছাত্রকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কোন ভগ্নাংশের লব ও হরকে একই সংখ্যাদ্বারা গুণ করিলে তাহার মানের কোন তারতম্য হয় না। যথা, $\frac{৩}{৪}\times\frac{৩}{৩}=\frac{৯}{১২}=\frac{৩}{৪}$। বস্তু বা চিত্রের সাহায্যেও দেখান যায় যে কোন বস্তুর $\frac{৩}{৪}=\frac{৯}{১২}$। সুতরাং হর ও লবকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া অসম হর-বিশিষ্ট ভগ্নাংশকে **সম হর-বিশিষ্ট ভগ্নাংশে** পরিণত করা যায়, এবং তাহার পর তাহাদিগকে **সম হর-বিশিষ্ট ভগ্নাংশের ন্যায় যোগ-বিয়োগ** করা যায়। $\frac{৩}{৪}+\frac{১}{৫}=\frac{১৫}{২০}+\frac{৪}{২০}=\frac{১৯}{২০}$। পরে ল. সা. গু. শিক্ষা করিলে তাহার সাহায্যে হরগুলিকে সমান করিয়া লইতে শিক্ষা দেওয়া যায়।

ভগ্নাংশের গুণ ও ভাগ প্রথমে বস্তুর বা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, হর ৪কে হর ৫ দ্বারা গুণ করার অর্থ প্রত্যেক $\frac{১}{৪}$ কে পুনঃ ৫ ভাগে বিভক্ত করা। ইহার ফলে সমস্ত বস্তুটি ২০ ভাগে বিভক্ত হয়। তাই $\frac{১}{৪}\times\frac{১}{৫}=\frac{১}{২০}$। ইহার লব ৩ কে ৩ দিয়া গুণ করার অর্থ উহার ৯ ভাগ লওয়া। তাই $\frac{৩}{৪}\times\frac{৩}{৫}=\frac{৯}{২০}$ ভাগ হইবে। **সুতরাং ভগ্নাংশের গুণ করিবার জন্য হরকে হর এবং লবকে লব দিয়া গুণ করিতে হয়।**

ভগ্নাংশের ভাগ, $\frac{৬}{৮}\div\frac{৩}{৮}$ বলিলে বুঝায় যে, $\frac{৬}{৮}$ হইতে $\frac{৩}{৮}$ কতবার বাদ দেওয়া যায়। অর্থাৎ $\frac{৬}{৩}=২$ বার। বস্তুর ভাগ করিয়াও উহা প্রমাণ করা যায়। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, **ভাজককে উল্টাইয়া ভাজ্যকে গুণ করিলে ভগ্নাংশের ভাগ করা হয়।** যথা, $\frac{৬}{৮}\div\frac{৩}{৮}=\frac{৬}{৮}\times\frac{৮}{৩}=\frac{৬}{৩}=২$

দশমিক। প্রথমেই বস্তু বা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, দশমিক ও ভগ্নাংশ মূলতঃ এক। তবে ইহাতে কেবল দশ বা তাহার গুণনীয়ক দ্বারা ভাগ করিতে হয়। যথা, $\frac{১}{১০}=$ ·১ ; $\frac{১}{১০০}=$ ·০১ ইত্যাদি $\frac{২৮}{১০}=$ ২·৮ ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত আকারে লিখিতে দেওয়া হইলে দশমিক সম্বন্ধে ছাত্রদের আরও ভাল ধারণা হইবে।

শতক	দশক	একক	দশমাংশ	শতাংশ	সহস্রাংশ
১	৮	৫	৫	৩	৮

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, দশমিক বিন্দুর নীচে এক দিয়া তাহার ডান পার্শ্বের প্রত্যেক সংখ্যার নীচে ০ (শূন্য) দিলেই তাহা **সাধারণ ভগ্নাংশে** পরিণত হইবে। কেননা দশমিকের ডান পার্শ্বের এক সংখ্যার দ্বারা দশমাংশ, শতাংশ প্রভৃতি সূচিত হয়। যথা,—১৮৫·৫৩৮ $=$ ১৮৫$\frac{৫৩৮}{১০০০}$। **সাধারণ ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করিতে হইলে লবকে হর দিয়া ভাগ করিতে হইবে।** যখন লব হর হইতে ছোট হইয়া পড়ে, তখনই দশমিক বিন্দু বসিবে। যথা, $\frac{২৭}{১০}=$ ২·৭, $\frac{৬৩}{৫}=$ ১২·৬।

দশমিকের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ ইত্যাদির নিয়মে করিতে হইবে। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগফলে দশমিক বিন্দুর স্থান নির্ধারণের জন্য বিশেষ নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে। যোগ বা বিয়োগের জন্য প্রত্যেক রাশির দশমিক বিন্দু

ঠিক এক রেখায় রাখিয়া রাশিগুলি উপরে নীচে লিখিতে হইবে এবং যোগ বা বিয়োগ-ফলের দশমিক বিন্দুও সেই রেখায় বসিবে।

যথা,— যোগ ৮৫·৭৬১২ বিয়োগ ৭৬·৮৫২১

যোগ	বিয়োগ
৮৫·৭৬১২	৭৬·৮৫২১
৭·৩৮০৪	৮·৯৪৩২
·২৫	———
———	৬৭·৯০৮৯
৯৩·৩৯১৬	

দশমিকের গুণ। সাধারণ গুণের ন্যায় গুণ করিয়া গুণ্য ও গুণককে দশমিকের ডান পার্শ্বে যতটা সংখ্যা থাকে, গুণফলের ডান পার্শ্বে ততটা সংখ্যা রাখিয়া দশমিক বিন্দু স্থাপন করিতে হইবে। যথা,—

$$
\begin{array}{r}
৫·৭৮ \\
·৬ \\
\hline
৩·৪৬৮
\end{array}
$$

দশমিকের ভাগ। ভাজক পূর্ণ সংখ্যা হইলে ভাজ্যকেও পূর্ণ সংখ্যা মনে করিয়া সাধারণ ভাগের ন্যায় ভাগ করিতে হইবে। ভাজ্যে যত দশমিক স্থানের অঙ্ক থাকে ভাগফলের সকলের ডাইনের অঙ্ক হইতে তত ঘর বামে দশমিক বিন্দু বসিবে। যদি অবশিষ্ট থাকে তবে প্রথমে পূর্ব নিয়মে দশমিকের স্থান নির্ধারণ করিয়া তাহার পর সাধারণ ভাগের ন্যায় ভাগ করিয়া যাইবে। যথা,—১২·২৭÷২৫=·৪৯০৮।

ভাজ্য ও ভাজক উভয়ে দশমিক থাকিলে উভয়ের ১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদির দ্বারা গুণ করিয়া ভাজককে পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত করিতে হইবে। তাহার পর পূর্বোক্ত নিয়মে ভাগ করিতে হইবে।

ক্ষেত্রফলের অঙ্ক। প্রথমে এক ইঞ্চি দীর্ঘ এবং এক ইঞ্চি প্রস্থ একটি বর্গক্ষেত্র আঁকিয়া ছাত্রগণকে বর্গক্ষেত্রের একক (এক বর্গ ইঞ্চি ক্ষেত্র) সম্বন্ধে ধারণা দিতে হইবে। তাহার পর নির্দিষ্ট আয়তনের একটা বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র আঁকিয়া তাহার বাহুগুলিকে দাগ কাটিয়া ইঞ্চিতে বিভক্ত করিতে হইবে। তাহার পর কতকগুলি সমান্তরেখা টানিয়া বিপরীত বাহুর ইঞ্চি দাগগুলি সংযুক্ত করিলে ক্ষেত্রটি কতকগুলি ক্ষেত্র-এককে (এক বর্গ ইঞ্চি ক্ষেত্রে) বিভক্ত হইবে। তাহাদের সংখ্যা গণনা করিলে দেখা যাইবে যে, ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করিলে যত

গুণফল হয়, ক্ষেত্রটি তত এককে বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং, **আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফল = ক্ষেত্রফল।** এক্ষণে এই সূত্রের প্রয়োগ করিয়া ছাত্রগণকে ক্ষেত্রফলের অঙ্ক করিতে দেওয়া যায়।

লাভ-ক্ষতির অঙ্ক। প্রথমে মুদ্রা ও বস্তুর সাহায্যে ছাত্রগণকে মূলধন, খরিদ মূল্য, বিক্রয় মূল্য এবং লাভ ও ক্ষতি ইত্যাদির ধারণা দিতে হইবে। কোন জিনিষের দর জানা থাকিলে তাহা হইতে বস্তু ও মুদ্রার সাহায্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিষের ক্রয়-মূল্য এবং বিক্রয়-মূল্য নির্ধারণ করিতেও শিক্ষা দিতে হইবে; ইহার পর সহজ সহজ উদাহরণের সাহায্যে ছাত্রগণের সহযোগিতায় লাভ ও ক্ষতি নির্ণয়ের নিম্নলিখিত নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইবে।

বিক্রয়-মূল্য—ক্রয়-মূল্য = লাভ।

ক্রয়-মূল্য—বিক্রয়-মূল্য = ক্ষতি।

এই ক্ষণে উক্ত নিয়মের প্রয়োগ করিয়া ছাত্রগণকে কতকগুলি লাভ-ক্ষতির অঙ্ক করিতে দিতে হইবে।

জ্যামিতি শিক্ষাদান-প্রণালী

জ্যামিতি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা

(১) জিনিষের আকার, আয়তন, অবস্থান ইত্যাদি নিরূপণের জন্য জ্যামিতির জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

(২) প্রায় সমস্ত শিল্প-কার্য ও নানা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জ্যামিতির জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

(৩) ইহা ছাত্রের বিচার-শক্তির বিকাশ সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

জ্যামিতি শিক্ষাদানের সাধারণ নিয়ম

(১) প্রথমে **বাস্তব জিনিষের সাহায্যেই** শিশুকে নানা আকার সম্বন্ধে ধারণা দিতে হইবে। কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী প্রণালীতে ইহার ব্যবস্থা আছে।

কাজকর্মের মধ্য দিয়া জ্যামিতিক আকার আকৃতি এবং জ্যামিতিক ক্ষেত্র সমূহের প্রাথমিক পরিচয় লাভ করিবে। যেমন বই টেবিল বোর্ড প্রভৃতির উপরিভাগ আয়তক্ষেত্রাকার, উহার কিনারাগুলি সরল রেখা দ্বারা বেষ্টিত,

বেড়ার খুঁটিগুলি ভূমির সহিত লম্বভাবে অবস্থিত। টেবিলের পায়াগুলি পরস্পর সমান্তরাল, একটি খাতার মলাটকে কোনাকুনি কাটিলে দুইটি ত্রিভুজ পাওয়া যায় ও উহারা পরস্পর সমান হয়। বাগানের গাছপালা সজ্জিতভাবে বসাইতে গিয়া ও বাগানের পরিকল্পনা করার সময় শিশুদিগকে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বৃত্ত প্রভৃতির ধারণা দেওয়া যায়। অনুরূপভাবে খেলাধুলার কোর্ট তৈয়ারী করার সময় অনুরূপ ধারণা দেওয়া যায়। ছোটদিগকে ত্রিভুজ ও বৃত্ত সাহায্যে নানা জ্যামিতিক প্যাটার্ণ তৈয়ারী শেখানো যায়। বই বাঁধাই, কাঠের কাজ প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়া ও জ্যামিতির সাধারণ জ্ঞানগুলির প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে ও সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে সাহায্য করা যায়। পিজবোর্ড-এর কাজ এই বিষয়ে যথেষ্ট উপযোগী হইবে। তাহাদের ঐসব কাজের বিবরণ রাখা প্রসঙ্গের জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন সৃষ্টি করা চলিবে ও উহার আগ্রহে শিশুরা জ্যামিতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া জ্যামিতিক চিত্র আঁকিতে শিখিবে। প্রথমে তাহারা ব্যবহারিক জ্যামিতি সম্বন্ধে এইরূপ যথেষ্ট প্রাথমিক ধারণা লাভ করিবে। তাহার ভিত্তিতেই তাহাদিগকে পরে অপেক্ষাকৃত যুক্তিমূলক জ্যামিতিক জ্ঞান দেওয়া চলিবে।

(২) মাটি বা কাগজের দ্বারা **নানা আকারের জিনিষ** তৈয়ার করিতে এবং নানা **জিনিষের ছবি আঁকিতে** দেওয়া হইলে আকার সম্বন্ধে শিশুর ধারণা আরও সঠিক হইবে।

(৩) **সংজ্ঞা শিক্ষাদান**। পুস্তকে লিখিত সংজ্ঞা মুখস্থ করিতে না দিয়া বস্তু বা চিত্র দেখিয়া এবং যন্ত্রের সাহায্যে মাপিয়া সংজ্ঞা গঠন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। চিত্র আঁকিয়া এবং যন্ত্রের সাহায্যে মাপিয়া স্বীকার্য ও স্বতঃসিদ্ধের সত্যতা প্রমাণ করার পরেই ছাত্রেরা সেইগুলি শিক্ষা করিবে।

(৪) **ব্যবহারিক জ্যামিতি** (Practical Geometry)। প্রমাণ বা যুক্তির সাহায্যে জ্যামিতি শিক্ষাদানের পূর্বে ব্যবহারিক প্রণালীতে জ্যামিতি শিক্ষা দিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমে যন্ত্রের সাহায্যে মাপিয়া চিত্র আঁকিয়াই জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার সমাধান করিতে হইবে। ৬ষ্ঠ মান পর্যন্ত ছাত্রগণকে কেবল ব্যবহারিক জ্যামিতিই শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহার পরেও যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে জ্যামিতি শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক প্রণালীরও সাহায্য লইলে ছাত্রের জ্যামিতি শিক্ষা সহজসাধ্য হইবে।

(৫) **প্রমাণ ও যুক্তিমূলক জ্যামিতি।** সপ্তম মান হইতে যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে জ্যামিতি শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহার জন্য প্রথমেই ছাত্রগণকে বলিয়া দিতে হইবে যে, পুস্তকের ভাষা মুখস্থ না করিয়া যুক্তি অনুসরণ করিয়াই জ্যামিতি শিক্ষা করিতে হইবে। কার্যতঃ এই নিয়ম পালন করাইবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

(ক) পুস্তকে দেওয়া সম্পূর্ণ চিত্র দেখিয়া প্রতিজ্ঞার প্রমাণ শিক্ষা না করিয়া বর্ণনানুযায়ী চিত্রের এক এক অংশ আঁকিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

(খ) প্রথমে পুস্তকের চিত্রে যে সকল অক্ষর ব্যবহার করা হইয়াছে, ছাত্রও তাহার অঙ্কিত চিত্রে সে সকল অক্ষর ব্যবহার করিয়া প্রমাণ শিক্ষা করিবে। তাহার পর অন্য অক্ষর ব্যবহার করিয়া প্রমাণ করিবে। পরিশেষে কোন অক্ষরই ব্যবহার না করিয়া কেবল বাহু, কোণ ইত্যাদি দেখিয়া যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে।

(গ) কোন প্রতিজ্ঞা প্রমাণের সময় যে সমস্ত স্বীকার্য, স্বতঃসিদ্ধ, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদির উল্লেখ থাকে, সেগুলি ছাত্রের জানা আছে কি না দেখিতে হইবে। জানা না থাকিলে প্রথমে সেগুলি শিক্ষা দিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা শিক্ষা করার পর ছাত্রগণকে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি অনুশীলনী (extra) প্রমাণ করিতে দিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহাদের জ্ঞান সঠিক ও স্থায়ী হইবে।

(৬) যুক্তিমূলক জ্যামিতি শিক্ষায় বাস্তবীকরণের উপযোগিতা ও সম্ভাব্যতা :—

যদিও যুক্তিমূলক জ্যামিতির মূল উদ্দেশ্য উচ্চতর কল্পনাশক্তির বিকাশ তথাপি প্রথম হইতেই শিশুরা কল্পনার ক্ষেত্রে ঐরূপ অগ্রগতি লাভ করিতে পারে না। বোর্ডে চিত্র আঁকিয়া জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞাগুলি বুঝাইলে তাহা সকল শিশুর বোধগম্য হয় না। এইজন্য কাগজ পীজবোর্ড প্রভৃতি কাটিয়া লইয়া তাহার সাহায্যে অনেক প্রতিজ্ঞা বুঝানো সহজ হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে জিনিষটি বুঝিতে সহজ হইবে :—

(ক) ত্রিভুজদ্বয়ের সমতা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে যখন শিশুদিগকে একটি ত্রিভুজকে আর একটি ত্রিভুজর উপর স্থাপন করিতে বলা হয়, শিশুরা কল্পনায় উহা করিতে অসুবিধা অনুভব করে। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি দুইটি পীজবোর্ডের ত্রিভুজ কাটিয়া বাস্তব ভাবে প্রক্রিয়াটি বুঝানো হয় তবে শিশু সহজেই উহা বুঝে।

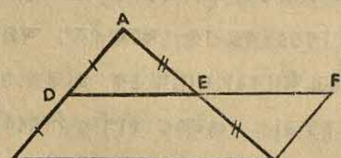
(খ) সামান্তরিকের কর্ণ সামান্তরিককে দুইটি সমান ত্রিভুজে বিভক্ত করে এইরূপ প্রতিজ্ঞা যুক্তি সাহায্যে বুঝাইবার আগে উহার সত্যতা কাগজ কাটিয়া দেখাইলে তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়।

(গ) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, $(a+b)^3=a^3+3ab\,(a+b)+b^3$, প্রভৃতি identityর জ্যামিতিক প্রমাণ মাত্র চিত্র সাহায্যে বুঝিতে অসুবিধা হয়। এক্ষেত্রে কার্ডবোর্ডের মডেল করিয়া বুঝাইলে শিশুরা সহজে বুঝিতে পারে। সুতরাং ঐসব প্রতিজ্ঞা বুঝানোর জন্য শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষোপকরণ তৈয়ারী ও ব্যবহার করিবেন।

(৭) যুক্তি ও প্রমাণ মূলক জ্যামিতি শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু জ্যামিতি পুস্তকে প্রদত্ত যুক্তিগুলি অনুসরণ নহে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজ প্রচেষ্টায় যুক্তি প্রমাণগুলি নির্বাচন ও গঠন করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এইরূপ করিতে সক্ষম হইবার জন্যে প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার সহিত অনেকগুলি exercise দেওয়া থাকে। অনেক শিক্ষক ঐগুলি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করিতে চাহেন না। ইহা ঠিক নহে। ঐগুলির সমাধানও শ্রেণীকার্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ঐরূপ সমাধানের ক্ষেত্রে শিশুদিগকে সমস্যা বিশ্লেষণ দ্বারা কি ভাবে প্রমাণ কার্যে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা বাহির করার কৌশলটি শিখিতে সাহায্য করা প্রয়োজন। একটি উদাহরণ দিয়া ঐরূপ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি বুঝিবার ব্যাপারে সাহায্য করা যাইতেছে।

সাধারণ সূত্র :—

ত্রিভুজের দুই বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোগ করিলে ঐ সংযোজক রেখাটি তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল হইবে।



বিশেষ সূত্র—

A B C একটি ত্রিভুজ। D, A B এর মধ্যবিন্দু ও E, A C এর মধ্যবিন্দু। D E যোগ করিলে তাহা তৃতীয় বাহু B C এর সমান্তরাল হইবে।

বিশ্লেষণ :— D E ∥ B C ইহা প্রমাণ করিতে হইলে একটি সামান্তরিক সৃষ্টি করিলে উহা সহজে প্রমাণ করা যায় কারণ সামান্তরিকের বিপরীত

বাহুগুলি সমান্তরাল হয়। আবার দুইটি বিপরীত বাহু সমান ও সমান্তরাল ইহা প্রমাণ করিলেই সামান্তরিক প্রমাণ করা যায়। DE // BC প্রমাণ করিতে হইবে, সুতরাং DB এর সহিত CF সমান্তরাল ধরিয়া সামান্তরিক সৃষ্টির চেষ্টা করা ভাল। CF ∥ BD আঁকিয়া ও D বৃদ্ধি করিয়া যে DBCF চতুর্ভুজ পাওয়া যাইবে তাহাকে সামান্তরিক প্রমাণ করিতে পারিলেই BC ∥ DE প্রমাণ হইবে। ইহার মধ্যে DB // CF ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ; সুতরাং এক্ষণে DB = CF ইহা প্রমাণ করিলেই চলিবে। যদি △ ADE = △ ECF প্রমাণ করা যায় তাহা হইলেই AD = CF প্রমাণিত হইবে। আর AD = DB। সুতরাং তখন BD = CF প্রমাণিত করা যাইবে।

অঙ্কন :—C বিন্দুতে BD ∥ CF সমান্তরাল টানিয়া DE কে F পর্যন্ত বর্ধিত করিয়া DBCF চতুর্ভুজ পাইলাম।

প্রমাণ :—△ ADE ও ∥ ECF মধ্যে

AE = EC প্রদত্ত হইয়াছে)

∠ AED = বিপ্রতীপ ∠F EC

∠ ADE = ∠ EFC (যেহেতু DB অর্থাৎ AD // CF ও কোণগুলি একান্তর)

∴ ঐ ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম।

∴ AD = CF

কিন্তু D, AB এর মধ্যবিন্দু ∴ AD = DB

∴ BD = CF

কিন্তু অঙ্কন অনুসারে BD // CF

দুই সমান ও সমান্তরাল রেখার প্রান্তবিন্দু সংযোগ করিয়া DBCF চতুর্ভুজটি উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং উহা একটি সামান্তরিক।

∴ উহার বিপরীত বাহু DF // BC

∴ DE // BC।

উপরের উদাহরণের মত প্রমাণটি গঠন করিবার পশ্চাতে যে বিশ্লেষণী যুক্তি আছে তাহা শিক্ষার্থীকে হৃদয়ঙ্গম করিতে দিলে তবেই সে নিজেই ঐরূপ যুক্তি সহায়ে যুক্তি প্রমাণ গঠন করিতে পারিবে।

বীজগণিত শিক্ষাদান পদ্ধতি

বীজগণিতে বীজ বা প্রতীক সমূহ ব্যবহৃত হয়। সেগুলির সংখ্যাগণিতের সংখ্যাগুলির মত নির্ধারিত মূল্য থাকে না—নানা মূল্য আরোপিত হইতে পারে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে a b c x y z প্রভৃতি এই প্রতীকগুলির উপরোক্ত তাৎপর্য বুঝিতে অসুবিধা হয়। শিক্ষকগণকে এই প্রতীক সংক্রান্ত তাৎপর্যটি ভালভাবে শিক্ষার্থীকে হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ দিতে হইবে। ইহা দিবার জন্য আমরা পরিমিত হইতে অতিরিক্ত এই সূত্র অনুসরণ করিয়া প্রথমে পাটীগণিতের সমস্যা হইতে অগ্রসর হইতে পারি। এখানে উদাহরণ দেওয়া গেল :—

একটি থলিতে ১০টি করিয়া মুদ্রা আছে এইরূপ পাঁচটি থলি ও একটি থলিতে ১২টি করিয়া মুদ্রা আছে এইরূপ ৭টি থলি একত্র করিল মোট মুদ্রার সংখ্যা কত? ১০×৫+১২×৭ উহা হইতে ৪ জনকে ৮টি করিয়া মুদ্রা দিলে কত থাকিবে? ১০×৫+১২×৭−৪×৮

উপরের ধরণের সমস্যা হইতে ধীরে ধীরে নিম্নলিখিত ধরণের সমস্যার সহিত পরিমিত করিতে পারি। প্রতিটিতে a করিয়া মুদ্রা আছে এমন bটি থলি ও x করিয়া মুদ্রা আছে এমন yটি থলি একত্র করিয়া তাহা হইতে c জনেক প্রত্যেককে dটি করিয়া মুদ্রা দিলাম। এখন কয়টি মুদ্রা রহিল?

$$a\times b+x\times y-c\times d$$

অতঃপর শিক্ষার্থীকে $a\times b$ কে ab রূপে লিখিবার বিষয়টি বুঝাইতে হইবে।

এই প্রসঙ্গত $a+b$ ও ab এর পার্থক্য ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে।

শিক্ষার্থী $2a$ এবং a^2 এর পার্থক্য বুঝিতে অনেক সময় সক্ষম হয় না। ইহা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্যও পূর্বোক্ত ভাবে পাটীগণিতের উদাহরণ হইতে বীজগণিতে প্রবেশ করানো যায়।

যথা একটি বাক্সে a টাকা থাকিলে ২টি বাক্সে $2a$ থাকে
৩ ,, $3a$,,
৪ ,, $4a$,,
aটি বাক্সে $a,a=a^2$ থাকে।

শিশুরা $5a+3b$কে অনেক সময় ভুল করিয়া $8a$ বা $8ab$ লেখে। এক্ষেত্রেও উপরোক্ত ভাবে $5a$ ও $3b$ এর অর্থ বুঝিতে দিয়া ঐরূপ ভুল সংশোধন করিতে হইবে।

বীজগণিতের অপেক্ষাকৃত কঠিন সমস্যা গুণের ফলে যে চিহ্নগুলির পরিবর্তন হয় তাহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা। সেক্ষেত্রে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে অগ্রসর হইতে পারি।

৫ জনে প্রত্যেকে ৭ টাকা করিয়া চাঁদা দিলে মোট জমে 35 টাকা

a ,, ,, b ,, ,, ,, ,, ,, ,, ab ,,

৫ জনের প্রত্যেককে ৭ টাকা করিয়া দিতে হইলে **খরচ হয়** 35 টাকা

a জনের প্রত্যেককে b টাকা করিয়া দিতে হইলে খরচ হয় ab টাকা

আমরা প্রাপ্তি বা জমাকে যদি + বলি তবে—

প্রদান বা খরচকে বলিব − কারণ উহা দুটি বিপরীত ধরণের কার্য।

সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে পাইতেছি $+a\times+b=+ab$

২য় ক্ষেত্রে $+a\times-b=-ab$

আমার নিকট 5টি দোকানের বিল জমা হইল ও প্রত্যেক দোকানে ৭টি করিয়া টাকা দিতে হইবে আমার কত টাকা দিবার মত বিল জমিল? $=5\times7$ উহা বীজগণিতের প্রশ্নে a টাকা করিয়া bটি দোকানের বিল $=-a\times b=-ab$ কারণ দেয়কে আমরা − চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করিতেছি।

এক্ষণে মনে করা যাউক ঐরূপ অনেকগুলি বিল ছিল যাহার প্রতিটিতে b টাকা দিতে হইত। কিন্তু কেহ ঐরূপ aটি বিল সরাইয়া লইলেন। তাহা হইলে আমি aটি বিলের টাকা প্রদান হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম যাহার প্রতিটির পরিমাণ b টাকা। এক্ষেত্রে আমি মোট $a\times b$ টী টাকা প্রদানের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম অর্থাৎ ab টাকা আমার লাভ হইল। সুতরাং $+ab$ হইবে। a টাকা দিবার বিল সুতরাং তাহা $-a$; b বিল সরাইয়া লওয়া হইয়াছে সুতরাং তাহা $-b$

$$-a\times-b=+ab$$

বীজগণিতের সূত্র সমূহ বুঝিতে সাহায্য করা :—

ইহার জন্য প্রথমে যদি আমরা পাটীগণিতের সমস্যা বা বাস্তব সংখ্যা দ্বারা গঠিত সমস্যা হইতে সুরু করিয়া ধীরে ধীরে বীজগণিতের সমস্যার দিকে লইয়া যাই তাহা হইলে শিক্ষার্থীরা উহার তাৎপর্য সহজে বুঝিতে পারে। যথা—প্রতি বাক্সে ১০টি করিয়া বাঁধা ৭টি প্যাকেট ও ৫০টি করিয়া ৩টি প্যাকেট এইরূপ ৪টি বাক্স

$$=(১০\times৭+৫০\times৩)\times৪$$

প্রতি বাক্সে aটি করিয়া বাঁধা b প্যাকেট ও cটি করিয়া বাঁধা d প্যাকেট এমন x টি প্যাকেট

$$= (ab+cd)\,x.$$

$$(a+b)^2, (a-b)^2, (a+b)^3, (a-b)^3$$

প্রভৃতি সূত্রগুলি জ্যামিতি সাহায্যে প্রমাণ করা শিখাইলে শিক্ষার্থীর ধারণা সুস্পষ্ট হয়।[১] তবে বীজগণিত প্রধানতঃ প্রতীকধর্মী হওয়ায় ইহার বাস্তবীকরণের প্রয়োজন বেশীদিন হইবার কথা নহে। প্রাথমিক ধারণাটি সুদৃঢ় হইলে পরে অসুবিধা দেখা দিবে না।

অষ্টম শ্রেণী

বিষয় :—জ্যামিতি

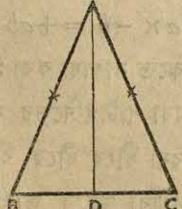
বিশেষ পাঠ :—"ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় একবিন্দুগামী" এই সিদ্ধান্তটির যুক্তিগত প্রমাণ।

উদ্দেশ্য :—প্রত্যক্ষ :—ত্রিভুজের মধ্যমা বিষয়ে বিস্তৃত ধারণালাভ।

পরোক্ষ :—যুক্তি ক্ষমতার বিকাশ ও গণিত বিষয়ে আগ্রহ ও জ্ঞানের বিকাশ।

উপকরণ :—

প্রস্তুতি :—শিক্ষার্থীদিগকে আজিকার পাঠ বিষয়ে আগ্রহী করিয়া তুলিবার জন্য ও নূতন পাঠটি হৃদয়ঙ্গম করিতে যে সব পূর্বজ্ঞানের প্রয়োজন তাহা স্মৃতিপটে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্নগুলি করা হইবে।



(১) ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু কাহাকে বলে?

(২) ত্রিভুজের একটি কোণের বিপরীত বাহু কাহাকে বলে?

(৩) $\angle$BAC কোণটি দেখাও।

(৪) উহার বিপরীত বাহু দেখাও।

(৫) BC এর মধ্য বিন্দু D। এক্ষণে AD যোগ করিলে উহাকে ত্রিভুজের কি বলা হয় জান কি? বোর্ডে লেখা হইবে "ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর সহিত বিপরীত বাহুর মধ্য বিন্দু সংযোজক রেখাকে মধ্যমা বলা হয়।"

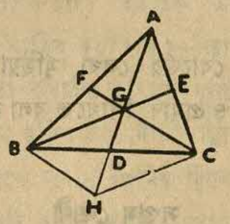
(৬) ত্রিভুজের কয়টি মধ্যমা থাকে? ABC ত্রিভুজের মধ্যমা-ত্রয় অঙ্কিত কর।

(৭) ঐ মধ্যমাগুলি একটি বিন্দুতে কাটাকাটি করিতেছে তাহা দেখিতেছ কি?

(৮) ঐভাবে প্রত্যেককে ত্রিভুজের মধ্যমা আঁকিয়া দেখাইতে বলা হইবে যে সব ক্ষেত্রে উহারা একবিন্দুতে কাটাকাটি করিতেছে কিনা?

(৯) "ত্রিভুজের মধ্যমা-ত্রয় সকল সময় এক বিন্দুতে কাটাকাটি করিতেছে—এখানে উহা যে সব সময়েই ঐরূপ করে তাহা যুক্তি সাহায্যে প্রমাণ করা হইবে।" এই বলিয়া পাঠ ঘোষণা করা হইবে।

(১০) "সামান্তরিক কাহাকে বলে?"—বোর্ডে একটি সামান্তরিক আঁকা হইবে ও তাহার বৈশিষ্ট্যগুলি বলিতে আহ্বান করা হইবে।



(১১) ঐ সামান্তরিকটির কর্ণদ্বয় আঁকিতে বলা হইবে ও উহারা যে পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে এই পূর্ব্বজ্ঞানটির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে।

অতঃপর শিশুদিগকে ABC ত্রিভুজের AB ও ACএর মধ্যবিন্দু F ও E নির্ণয় করিতে ও BE ও CF এই দুই মধ্যমা আঁকিতে দেওয়া হইবে, উহারা G বিন্দুতে ছেদ করিল। "যদি মধ্যমাত্রয় এক বিন্দুতেই ছেদ করে তার তৃতীয় মধ্যমাটি কোন বিন্দু দিয়া গমন করিলে তবে তাহারা এক বিন্দুতে ছেদ করিবে?" এই প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে দেওয়া হইবে যে সিদ্ধান্তটি সব ক্ষেত্রে সত্য হইলে AGD রেখাটিই ত্রিভুজের তৃতীয় মধ্যমা হইবে। প্রশ্ন করা হইবে AGD যে তৃতীয় মধ্যমা হইল তাহার প্রমাণ কি? যদি BD = DC হয় তাহা হইলেই AGD তৃতীয় মধ্যমা হইবে।

বিশ্লেষণ :—প্রশ্ন করা হইবে যে কি ভাবে BD = DC প্রমাণ করা যায়? এক্ষণে যে △AEC = △ADC হইবেই এমন কথা নহে তাহা বুঝিতে দেওয়া হইবে।

কারণ AB = AC না হইতে পারে।

পূর্বেই জানা গিয়াছে যে সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। এখানে সেই কৌশলে BD = DC প্রমাণ করার প্রস্তাব আনা হইবে।

যদি BD = DC হয় তাহা হইলে BD = DH টানিলে BC ও GH সামান্তরিকের কর্ণ হইবে—কারণ তাহারা পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। এক্ষণে যদি আমরা BGHCকে সামান্তরিক প্রমাণ করিতে পারি তাহা হইলেই D, BCএর মধ্যবিন্দু বলিয়া প্রমাণ করা যাইবে। তাহা করিতে গেলে △GBD = △DCH প্রমাণ করিতে হইবে ; কারণ তাহা হইলে CH//BG ও CE//BG হইবে এবং সমান ও সমান্তরাল সরলরেখার প্রান্তবিন্দু যোগ করিয়াছে বলিয়া BGHC সামান্তরিক প্রমাণিত হইবে।

এইভাবে বিশ্লেষণ করার পর পুনরায় সিদ্ধান্তটির অঙ্কন ও প্রমাণ সরাসরিভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে আদায় করিয়া বোর্ডে লেখা হইবে।

প্রয়োগ :—অতঃপর বোর্ডের লেখা মুছিয়া শিশুদিগকে নিজ নিজ খাতায় ঐ সিদ্ধান্তটির অঙ্কন ও প্রমাণ লিখিতে বলা হইবে।

সপ্তম শ্রেণী

বিষয়—বীজগণিত

বিশেষ পাঠ :—সহজ সমতা ও তাহা হইতে একটি অজানা অঙ্কের মান নির্ধারণ।

প্রস্তুতি :—শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও বর্তমান পাঠে যে সব পূর্ব্বজ্ঞানের সহায়তা থাকিবে তাহার স্মৃতি উজ্জ্বলতর করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্নাবলীর অবতারণা করা হইবে।

(১) রামের বয়স ১০ বৎসর, ৩ বৎসর পরে তাহার বয়স কত হইবে?

(২) রামের বয়স ১০ বৎসর হইলে ৪ বৎসর পূর্ব্বে তাহার বয়স কত ছিল?

(৩) দুই বৎসর পূর্ব্বে রামের বয়স x বৎসর হইলে তাহার বর্তমান বয়স কত ?

(৪) রাম অপেক্ষা হরি 10 বৎসরের বড়। হরির বয়স x হইলে রামের বয়স কত ?

(৫) মধু হরি ও রামের বয়স রামের বয়সের চার গুণ। মধু রাম অপেক্ষা 2 বৎসরের বড় ও হরি রাম অপেক্ষা 8 বৎসরের বড়। উহাদের বয়স বাহির কর।

উপস্থাপন

তৎপরে শিশুদের সাহায্য লইয়া বোর্ডে কষা হইবে :—

রামের বয়স যদি x বৎসর হয়—

তাহা হইলে মধুর বয়স $x+2$

হরির বয়স $x+8$

রামের বয়স x

৩ জনের বয়সের সমষ্টি $3x+10$

আবার ৩ জনের বয়সের সমষ্টি—

= রামের বয়সের 4 গুণ $=4x$

তাহা হইলে $4x=3x+10$। ইহাকে একটি সমতা বলে। ইহা হইতে কিভাবে x এর মূল্য বাহির করা যায় ?—তাহা আমরা শিখিব।

অতঃপর শিশুদের সমতা কথাটির তাৎপর্য বুঝিতে সাহায্য করিবার জন্য দাঁড়িপাল্লার উদাহরণ প্রদান করিব এবং দাঁড়িপাল্লার দুই পাল্লা যখন সমান আছে তখন তাহার দুই দিকে সমান জিনিষ দিলে বা দুই দিক হইতে সমান জিনিষ লইলে যেমন পাল্লা দুটি সমান থাকে এখানেও সমতার উভয় দিকে একই জিনিষ যোগ করিলে বা উভয় দিক হইতে একই জিনিষ বিয়োগ করিলে দুই দিকের সমতা ঠিকই থাকে।

উপরের সমতা $4x=3x+10$

উভয় দিক হইতে $3x$ বিয়োগ করিলে

$$4x-3x=3x+10-3x$$

অর্থাৎ $x=10$ হইবে।

তৎপর উপরের সমতাটি হইতে x এর মূল্য বাহির করার জন্য ঐরূপ বিয়োগ করার পরিবর্তে শুধু এক দিকের সহগ সহ x সংখ্যাটির চিহ্ন পাল্টাইয়া অপর দিকে নিলে একই ফল হয় তাহা দেখানো হইবে ; যথা—

$$4x=3x+10$$

এখন বাম দিকের $3x$ ডান দিকে $-3x$ করিয়া সরাইয়া লইলাম। তাহা হইলে $4x-3x=10$

বা $x=10$

অতঃপর নিম্নলিখিত কয়েকটি সমতাকে শেষোক্ত ভাবে সমাধান করিয়া বিষয়টি সুস্পষ্ট করিতে চেষ্টা করা হইবে ; যথা :—

(1) $15x+3=12x+9$

(11) $2x+4=-3x+11$

অতঃপর শিশুদিগকে পুনরায় বুঝিতে সাহায্য করা হইবে যে দাঁড়িপাল্লার দুদিক যখন সমান তখন দুদিকের সেই ওজনকে দুই, তিন, চার গুণ বা দুই, তিন, চার ভাগ করিলেও দুই দিক সমান থাকে। ঠিক তেমনি সমতার উভয় দিককে সমান সংখ্যা দিয়া গুণ বা ভাগ করিলে সমতার দুই দিক সমানই থাকে। অর্থাৎ $5x+5=25$ হইলে

$$\frac{5x+5}{5}=\frac{25}{5} \text{ হয়}$$

বা $x+1=5$ হয়।

অথবা $2x+1=7$ হইলে

$(2x+1)\times 5=7\times 5$ হইবে

অর্থাৎ $10x+5=35$ হইবে।

এখানেও আমরা দেখিতে পাই যে সমতার মধ্যে যদি কোনও সংখ্যা গুণক হিসাবে ডান দিকে থাকে তাহাকে ভাজক হিসাবে বাম দিকে আনিলে সমতা ঠিক থাকে অথবা যাহা ভাজক হিসাবে বাম দিকে আছে তাহাকে গুণক হিসাবে ডান দিকে আনা যায় ; যথা—

$$15x+5=25=5\times 5$$

$$\frac{15x+5}{5}=5 \quad \text{বা} \quad 3x+1=5$$

অনুরূপ ভাবে $2x+1=\frac{5}{3}$ হইলে

$(2x+1)\times 3=5$

বা $6x+3=5$ হইবে।

অতঃপর শিশুদিগকে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি করিতে দেওয়া হইবে—

(1) $6x+5=12$

(2) $2x=12$

(3) $8x=64$

(4) $4x-8=12$

(5) $8x+2=22$

(6) $\frac{8x+4}{2}=8$

ইত্যাদি

গণিতের পাঠটীকা

তারিখ **স্কুল**

শিক্ষক **শ্রেণী—পঞ্চম**

বিষয়—গণিত

সাধারণ পাঠ—ক্ষেত্রফল নির্ণয়।

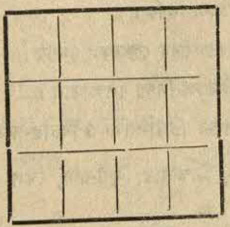
বিশেষ পাঠ—আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়।

লক্ষ্য—প্রত্যক্ষ—ক্ষেত্রফল-নির্ণয় শিক্ষাদান।

পরোক্ষ—শিশুর চিন্তা-শক্তি ও বিচার-শক্তির বিকাশ।

উপকরণ ঃ—বর্গাকার ও আয়তাকার কাগজ, টিস্কোয়ার, ফুট-রুল, স্কেল ও ফিতা।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
১ম	(ক) পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা— 	ছাত্রগণকে বর্গাকার এবং আয়তাকার কাগজ দুইটি দেখাইয়া তাহাদের আকারের নাম জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর ব্ল্যাকবোর্ডে টিস্কোয়ারের সাহায্যে পার্শ্বলিখিত ক্ষেত্র দুইটি আঁকিব ও তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিব। শ্রেণী-কামরায় বর্গাকারের ও আয়তাকারের জিনিষ থাকিলে তাহাদের নাম বলিতেও বলিব। ইহার পর বস্তুগুলি ও চিত্রগুলির ধার দেখাইয়া ও মাপিয়া দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ক্ষেত্রফল কাহাকে বলে বুঝাইয়া দিব।
	(খ) নূতন পাঠের লক্ষ্য ঘোষণা	পরিশেষে ঘোষণা করিব যে, আজ আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার পদ্ধতি শিক্ষা করিব।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
২য়	ক্ষেত্রফল-নির্ণয় শিক্ষাদান। একটা ক্ষেত্রকে ক্ষেত্র-এককে বিভক্ত করিয়া ক্ষেত্রফল নির্ণয়।  বিঃ দ্রঃ—উপযুক্ত স্থানের অভাবে এইখানে ইহা ছোট করিয়া আঁকা হইয়াছে। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে উহার দৈর্ঘ্য ৪″ এবং প্রস্থ ৩″।	ব্ল্যাকবোর্ডে ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৩ ইঞ্চি প্রস্থ একটি আয়তক্ষেত্র আঁকিব এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে সমান ৪ ও ৩ ভাগে বিভক্ত করিব। এক্ষণে দৈর্ঘ্যের ও প্রস্থের বিভাগ বিন্দুগুলি তাহাদের ঠিক বিপরীত বিন্দুগুলির সহিত সংযুক্ত করিলে ক্ষেত্রটি কতকগুলি ১″ দীর্ঘ ও ১″ প্রস্থ বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত হইবে। এরূপ একটি বর্গক্ষেত্রকে (১″×১″) ক্ষেত্রফলের একক বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিব। ইহার পর এক জন ছাত্রকে আসিয়া একক ক্ষেত্রগুলি গণনা করিতে বলিব। তাহার ফলে দেখা যাইবে যে, ক্ষেত্রটি ১২ (বারটি) ক্ষেত্র-এককে বিভক্ত হইয়াছে—সুতরাং ইহার ক্ষেত্রফল বার বর্গ ইঞ্চি।
৩য়	সূত্র গঠন। দৈর্ঘ্যের পরিমাণ-জ্ঞাপক সংখ্যাকে প্রস্থের পরিমাণ-জ্ঞাপক সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে ক্ষেত্রফল পাওয়া যাইবে।	নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের দ্বারা পার্শ্বলিখিত সূত্র গঠন করাইব:— (১) বোর্ডে অঙ্কিত আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত? (২) উহার প্রস্থ কত? (৩) উহাকে কত ক্ষেত্র-এককে বিভক্ত করা যায়? (৪) ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করিলে কত হয়? (৫) কোন আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জানা থাকিলে কিরূপে তাহার ক্ষেত্রফল বাহির করা যায়?

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৪র্থ	পূর্বোক্ত সূত্রের প্রয়োগ। (১) শ্রেণীর বোর্ডখানার দৈর্ঘ্য ৫ ফিট এবং প্রস্থ ৪ ফিট, তাহার ক্ষেত্রফল কত? (২) শ্রেণীর কামরার দৈর্ঘ্য ২০ ফিট এবং প্রস্থ ১৫ ফিট, উহার ক্ষেত্রফল কত? (৩) বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের দৈর্ঘ্য ২০০ ফিট এবং প্রস্থ ৫০ ফিট; উহার ক্ষেত্রফল কত? (৪) বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য ২০০ ফিট এবং প্রস্থ ২৫০ ফিট, উহার ক্ষেত্রফল কত?	আমি নিজে ছাত্রগণের সহ-যোগিতায় ১ম অঙ্কটি করিয়া দেখাইব। অপর অঙ্কগুলি বোর্ডে লিখিয়া দিয়া ছাত্রগণকে কষিতে বলিব এবং আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাদের কাজ তত্ত্বাবধান করিব ও প্রয়োজনমত সাহায্য করিব। অধিকাংশ ছাত্রের অঙ্কগুলি কষা হইলে এক এক জন ছাত্রকে এক এক অঙ্কের উত্তর বলিতে বলিব। শুদ্ধ হইলে তাহা বোর্ডে লিখিয়া দিব এবং কোন্ কোন্ ছাত্রের সেই উত্তর হইয়াছে তাহাদের হাত তুলিতে বলিব। অধিকাংশ ছাত্র কোন অঙ্ক কষিতে না পারিলে তাহা নিজে বা এক জন ভাল ছাত্রকে দিয়া বোর্ডে করিয়া দেখাইব।
৫ম	গৃহকাজ নির্দেশ।	ইহার পর পাঠ্য-পুস্তক হইতে বাড়ীতে কষিবার জন্য ৫টি অঙ্ক নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া শ্রেণী ত্যাগ করিব।

References

1. J. Welton—Principles and Methods of Teaching—Chapter XIII
2. E. S. Macknee—Instruction in Indian Secondary Schools. Chap. VII.
3. J. Adams—New Teaching. Chap. VI.
4. W. L. Sumner—The Teaching of Arithmetic and Elementary Mathematics.
5. কুঞ্জবিহারী হার—বিশেষ পদ্ধতি।

দ্বাদশ অধ্যায়

বস্তুপাঠ ও প্রকৃতিপাঠ শিক্ষাদান-পদ্ধতি

বর্তমান জীবনযাত্রায় বিজ্ঞানের প্রভাব

বর্তমান সময়ে মানুষ মাত্রকেই নানা রকম অব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইতেছে। ২৫।৩০ বৎসর পুর্বে কিন্তু এইরূপ কোন অব্যবস্থা ছিল না। তখন জীবন চলিয়াছে শ্লথ গতিতে, জীবনের চলার পথে কোনরূপ ঘাত-প্রতিঘাত উত্তাল তরঙ্গের রূপ ধরিয়া জীবনের চলার ছন্দকে ব্যাহত করে নাই। যে স্বাভাবিক শ্লথ গতিতে জীবন অভ্যস্ত হইয়াছিল, তাহাতে হঠাৎ লাগিল ধাক্কা, জীবনের গতি অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাইল, অথচ তাহার জন্য মানুষের মন তখনও ভালভাবে প্রস্তুত হয় নাই। ফলে আজ জীবনের প্রতি স্তরে এইরূপ অব্যবস্থা দেখা গিয়াছে। আমরা বর্তমানে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলিতেছি এবং বিভিন্ন আবেষ্টনীগত শক্তিসমূহ আমাদের জীবনের গতিকে নিরন্তর বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে।

মাত্র কয়েকটি নমুনাসূচক ঘটনার উল্লেখ করিলেই আমাদের জীবনের অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতির কথা বুঝিতে পারিব। আমরা পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেখিয়াছি, জেট-বিমান, আণবিক বোমা, টেলিভিসন প্রভৃতি মানব জীবনে অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। বিমানে ভ্রমণ অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; মোটরে অপঘাত মৃত্যু সাধারণ ঘটনা বলিয়া মনে করা হইতেছে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই সমস্ত ঘটনাসমূহ বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি এবং উহা সমাজ-জীবনকে যথেষ্টভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে।

বিদ্যালয়ের শিশুরা এবং ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কার এবং মানব-জীবনের উপর সংঘাত লক্ষ করিতেছে। বিজ্ঞান যে তাহাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে ইহা বলা বাহুল্য। অতএব শিশু যাহাতে জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই তাহার আবেষ্টনীর সমস্ত সমস্যা বুঝিতে সক্ষম হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাহাকে শিক্ষাদান করিতে হইবে। জীবনই শিক্ষা, অতএব যে সমস্ত জিনিষ মানব-জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে, তাহার বিশ্লেষণ এবং তাহার মূল সমস্যাকে

উপলব্ধি করিতে পারা শিশুর জীবনযাপনের পক্ষেই বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। শিশু যেমন সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক শিক্ষা করিবে সেইরূপ যে সমস্ত শক্তি শিশুর তথা মানবের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে সে সমস্ত বিষয়েও তাহার জ্ঞান বর্ধিত হওয়া আবশ্যক। এই কারণেই বিদ্যালয়ে আজ বিজ্ঞান শিক্ষা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে শিশুর দৃষ্টি সমালোচনা-মূলক হইবে এবং সে অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া বস্তুর তাৎপর্যকে বুঝিতে সক্ষম হইবে।

প্রথম অবস্থায় বিজ্ঞান-শিক্ষাও বস্তুপাঠ প্রভৃতি পাঠের রূপ ধারণ করে; সেই কারণে শিশুদের মন বিজ্ঞানপাঠের প্রস্তুতি হিসাবে বস্তু ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিবে। প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ হইতে শিশুরা কোন কিছুর বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করিতে যত্নবান হইয়া উঠিবে।

বস্তুপাঠ ও প্রকৃতি-পাঠের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

(১) **শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সতেজ করা ও তাহার পর্যবেক্ষণ-শক্তি বৃদ্ধি করাই** এই সকল পাঠের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন লোকের নিকট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, প্রকৃতির মুক্তক্ষেত্রই সর্বাপেক্ষা বড় পুস্তক। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি থাকিলে অতি তুচ্ছ পদার্থের মধ্য হইতেও অনেক জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব। কিন্তু সকলের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি নাই বলিয়া তাহারা এই প্রকৃতির পুস্তক হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে না। তাই কেহ অল্প স্থান দেখিয়া যথেষ্ট জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে, অন্যে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আসিলেও কিছুই শিক্ষা করে না। **শিশুকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন চক্ষু** (seeing eyes), **তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি-যুক্ত কর্ণ** (hearing ears), **প্রবল বোধশক্তি-সম্পন্ন হৃদয়** (understanding heart) **দেওয়াই বস্তুপাঠ ও প্রকৃতি-পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য।**

(২) প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বস্তু সম্বন্ধে ও প্রকৃতির রাজ্যের ঘটনাবলী ও নানা রীতি-নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিশু এই পৃথিবীতে নূতন আগন্তুক। তাহার প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী ও নানা পদার্থ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং তাহার জীবন-প্রভাতে তাহাকে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যত বেশী সম্ভব তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থের জন্য জ্ঞান লাভ করিতে

শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। বস্তুপাঠ ও প্রকৃতি-পাঠের দ্বারাই এই উদ্দেশ্য ভালরূপে সাধিত হইতে পারে।

(৩) ইহার সাহায্যে শিশুকে ভবিষ্যতে উচ্চতর **ভূগোল ও বিজ্ঞান পাঠের জন্য প্রস্তুত করা যায়।** বস্তুতঃ প্রকৃতি-পাঠ, প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics), উদ্ভিদ-বিজ্ঞান (Botany), কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি পাঠের সূচনা করে।

(৪) **ইহার দ্বারা শিশু প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জিনিষের সৌন্দর্য উপভোগ করিতেও শিক্ষা করে।** শৈশবে তাহার হৃদয়ে এই সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যানুরাগ না জাগাইলে, সে ভবিষ্যতে প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর দৃশ্য বা শিল্পের বিচিত্র কারুকার্য দেখিয়া নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না।

(৫) ইহা **শিশুর মানসিক বিকাশেরও যথেষ্ট সাহায্য করে।** প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মানুষের মানসিক জীবনের প্রধান ভিত্তি। বস্তুপাঠ ও প্রকৃতি-পাঠের সাহায্যে শিশুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া এই ভিত্তি সুগঠিত করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শিশু সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যা তাহার চিত্তকে আলোড়িত করে। এই সময় শিশুকে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে সুপরিচালিত করিলে শিশুর চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং বিচার-শক্তিরও বিকাশ হয়।

বস্তুপাঠ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি

(১) **বস্তুপাঠই শিশুর শিক্ষার সূচনা করিবে।** ৩।৪ **বৎসর বয়সেই ইহা আরম্ভ করা যায়।** বস্তুপাঠের সাহায্যে চতুষ্পার্শ্বস্থ জিনিষ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের পরেই শিশুকে লেখা ও পড়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। (কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী প্রণালীতে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে)।

(২) প্রথমতঃ শিশুর ব্যবহার্য জিনিষ এবং তাহার প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর অন্তর্গত জিনিষ সম্বন্ধেই পাঠ দিতে হইবে। ঐ প্রসঙ্গে নানা রকমের বস্তু উপস্থাপন করিয়া শিশুর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিতে হইবে।

(৩) বস্তুপাঠের জন্য **প্রকৃত বস্তু ছাত্রছাত্রীর সামনে স্থাপন করিয়া তাহাকে জ্ঞান লাভ করিতে দিতে হইবে।** ইহা না করিয়া পুস্তকে লিখিত বর্ণনার সাহায্যে বস্তুপাঠ দেওয়ার ন্যায় ভ্রমাত্মক কাজ আর কিছুই

নাই। তবে যে সকল বস্তু বা প্রাণী শ্রেণী-কক্ষে লইয়া আসা সম্ভব নহে, তাহাদের **মডেল বা চিত্রের সাহায্যে** শিশুকে তাহাদের জ্ঞান দেওয়া যায়।

(৪) বস্তুপাঠ প্রধানতঃ শিশুর কাজ। **শিশুরা নিজেরাই বস্তুটি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া তাহার জ্ঞান লাভ করিবে।** শিক্ষক বস্তুটির বিশেষ গুণাবলীর প্রতি শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবেন ও তাহাদের ভুল সংশোধন করিবেন মাত্র।

(৫) **আকৃতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং বর্ণনাই বস্তুপাঠের** প্রধান অঙ্গ; যখনই প্রয়োজন এবং সম্ভব হয় ছাত্রগণকে সিদ্ধান্ত করিতেও শিক্ষা দিতে হইবে। ইহা ছাড়া ছাত্রগণকে যতদূর সম্ভব বস্তুর ব্যবহারও শিক্ষা দিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যে বস্তুটির এক একটা **নমুনা** (specimen), **অনুকৃতি** (model) বা **ছবি** প্রত্যেক ছাত্রকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবার জন্য দিতে হইবে। যদি তাহা একান্ত সম্ভব না হয়, তবে এক এক জন বা এক এক দল ছাত্রকে আসিয়া বস্তুটি পর্যবেক্ষণ করিতে দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক বস্তুটির গঠন, বিভিন্ন অংশ, গুণাগুণ প্রভৃতির প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ তাহা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবে। বস্তুটির গুণাগুণ এবং উৎপত্তি বা প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদিও এই সময়ে শিক্ষা দিবেন। তাহার পর শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীগণ হইতে বস্তুটি, তাহার অংশ-গুলি ও তাহার গুণাগুণ প্রভৃতির বর্ণনা আদায় করিবেন, ও কেহ কোন ভুল করিলে অন্য ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় তাহা সংশোধন করিবেন; বর্ণনা সংক্ষেপে বোর্ডে লিখিয়া দিবেন এবং ছাত্রছাত্রীগণকে নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া লইতে বলিবেন। ছাত্রছাত্রীগণের পরিচিত অন্য কোন জিনিষের বা জীবের সহিত তুলনা করা সম্ভব হইলে প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীগণের দ্বারা তাহাও করাইবেন। সর্বশেষে ছাত্রছাত্রীগণকে বস্তুটির ছবি আঁকিয়া লইতে দিবেন।

পরিবেশ-পরিচিতি ও প্রকৃতি-পাঠ

বস্তুপাঠ এবং প্রকৃতি-পাঠ উভয়ই পর্যবেক্ষণমূলক পাঠ। উভয় পাঠেই পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বস্তু, প্রাণী, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। সুতরাং উভয় পাঠেরই লক্ষ্য এবং পদ্ধতি প্রায় একরূপ তবুও বস্তুপাঠ এবং প্রকৃতি-পাঠের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য আছে।

(১) বস্তুপাঠে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে কোন বস্তু, জীব, উদ্ভিদ্ প্রভৃতির গঠন, গুণাগুণ, ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। **প্রকৃতি-পাঠে, কোন উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর জীবনের ইতিহাস যথা—উৎপত্তি বিকাশ, ফুলফলোদ্গম, পরিণতি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয়।** ইহা ছাড়া **নানা প্রাকৃতিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক কাজ** ও (প্রাকৃতিক ভূগোল) প্রকৃতি-পাঠে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত। তাই **প্রকৃতি-পাঠকে প্রাকৃতিক ইতিহাস** (Nature History) ও পরিবেশ-পরিচিতি বলে।

একই পদার্থ সম্বন্ধে বস্তুপাঠও দেওয়া যায়, প্রকৃতি-পাঠও দেওয়া যায়। যথা,—একটা চারাগাছ পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মূল, কাণ্ড, ডালপালা, পত্রপুষ্প ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে দেওয়া হইলে তাহা বস্তুপাঠ হইবে। সেই গাছটির বীজ বপন করিয়া তাহার অঙ্কুরোদ্গম, পত্র, কাণ্ড, ডালপালা, ফলাফল ইত্যাদির উৎপত্তি ও বিকাশ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে দেওয়া হইলে তাহা প্রকৃতি-পাঠ, এবং পরিবেশের মধ্যে ঐ ধরণের গাছপালা, ফুলফল ও তাহাদের ব্যবহার ইত্যাদি পর্যবেক্ষণই পরিবেশ-পরিচিতি হইবে।

(২) বস্তুপাঠে পর্যবেক্ষণের বস্তু প্রাকৃতিকও হইতে পারে, তৈয়ারী বা কৃত্রিমও (manufactured) হইতে পারে। প্রকৃতি-পাঠে পর্যবেক্ষণের বস্তু প্রাকৃতিক পদার্থ (উদ্ভিদ্, বীজ প্রভৃতি) বা প্রাকৃতিক কাজই হইতে হইবে।

(৩) বস্তুপাঠে প্রদর্শন সম্ভব না হইলে তাহার আদর্শ বা চিত্র দেখাইয়াও শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতি-পাঠে প্রাকৃতিক পদার্থ বা কাজ না দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়া যায় না।

(৪) বস্তুপাঠ সাধারণতঃ শ্রেণীতেই দেওয়া যায়। কিন্তু যতদূর সম্ভব ছাত্রছাত্রীগণকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রকৃতির জ্ঞান লাভ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করিতে শিক্ষাদানই প্রকৃতি-পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য। এই পৃথিবীতে কত পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, মৎস্য প্রভৃতি আছে। কত বৃক্ষ লতা, তৃণ, গুল্ম, ফুল-ফল তাহার শোভা বর্ধন করিতেছে। উর্ধ্বে চন্দ্র-সূর্যসহ নক্ষত্ররাজি-শোভিত নীল আকাশ ইহাকে চন্দ্রাতপের ন্যায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে, নিম্নে কত নদনদী, পর্বত, হ্রদ, প্রান্তর, সবুজ শস্যক্ষেত্র, গভীর অরণ্য, বিশাল সমুদ্র ইহার বক্ষদেশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। এই পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বসবাস করিতেছে, তাহাদের আচার, ব্যবহার

জীবনযাত্রা প্রভৃতির মধ্যেও নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে। পৃথিবীর **এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য উপভোগ করিতে শিক্ষাদানই প্রকৃতিপাঠের ও পরিবেশ-পরিচিতির প্রধান কাজ।**

শিক্ষাদান-পদ্ধতি

কিছুকাল বস্তুপাঠ শিক্ষাদানের ফলে শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রয়োজনীয় বিকাশ হইলেই সে প্রকৃতি পাঠ আরম্ভ করিতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ইহা আরম্ভ করা যায়; মধ্য বাংলা স্তরই ইহা শিক্ষাদানের অধিকতর উপযোগী। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে ইহা ক্রমশঃ প্রাকৃতিক ভূগোল ও প্রাথমিক বিজ্ঞানের আকার গ্রহণ করিবে এবং প্রধানতঃ পরীক্ষামূলক (Experimental) হইবে।

ফুলবাগানকে বা **বন্য পরিবেশে ভ্রমণকে ভিত্তি করিয়াই প্রকৃতি পাঠ শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে।** বাগানে নানা চারা-গাছের বীজরোপণ করিয়া শিশুগণ তাহাদের অঙ্কুরোদ্গম, পত্র, কাণ্ড, ডালপালা, ফুলফল ইত্যাদির উৎপত্তি ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ করিবে এবং নিজ নিজ খাতায় তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখিয়া রাখিবে। শিক্ষক নানাদিকে ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া পর্যবেক্ষণের সাহায্য করিবেন, তাহার পর তাহাদিগকে মৌখিক বর্ণনা দিতে বলিবেন; তাহাদের ভুল সংশোধন এবং তাহার সারাংশ লিখিয়া রাখিতে সাহায্য করিবেন। পরে ক্রমশঃ ছাত্রগণ নিজে নিজেই এই কাজ করিবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ শিক্ষকের সাহায্যে সেই সকল গাছের বিভিন্ন বয়সের ছবি আঁকিয়া রাখিবে। বাগানের কাজের সঙ্গে সঙ্গে **ছাত্রগণ নানা কীট-পতঙ্গ, ছোট ছোট পশু পক্ষী ইত্যাদি পালনেরও ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া বর্ণনা লিখিবে** ও আঁকিয়া রাখিবে। মৎস্য ইত্যাদি জলজ জীব বড় কাঁচের জলাধারে রাখিলে পর্যবেক্ষণের সুবিধা হইবে। অন্ততঃপক্ষে জলপূর্ণ বোতলে রাখিয়া পর্যবেক্ষণ করা যায়। কীটপতঙ্গগুলিও কোন কাঁচের আধারে রাখাই ভাল। শশক, বিলাতি ইন্দুর ও নানা পাখী প্রভৃতি খাঁচায় করিয়া পালন করা যায় ও পর্যবেক্ষণ করা যায়।

এক একটা গাছ বা জীবের জীবন-ইতিহাস শিক্ষা করিবার জন্য তাহাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না। বিভিন্ন ধরণের গাছ বা জীব দেখিয়াই তাহাদের জীবন-ইতিহাস সংগ্রহ করা যাইবে।

ইহার পর বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে যে সকল উদ্ভিদ্ জন্মে ও যে সকল পশুপক্ষী বাস করে তাহাদের জীবন-ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী পাঠতালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অর্থাৎ যে স্থানে ও যে ঋতুতে যে সকল উদ্ভিদ্ জন্মে, যে যে ফুল ফোটে ও ফল ফলে, যে যে কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী দেখা যায়, সে সকল স্থানে সেই সেই ঋতুতে তাহাদের সম্বন্ধে পাঠ দিতে হইবে।

ইহার জন্য নিম্নলিখিত আকারে প্রত্যেক মাসের প্রাকৃতিক তালিকা (Nature Calendar) প্রস্তুত করিতে দেওয়া যায়।

ঋতুর নাম	মাসের নাম	বাগানের গাছ ও ফুলফল	বনজ গাছ ও ফুলফল	কীট-পতঙ্গ	পক্ষী	পশু	মন্তব্য

অপর দিকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে **প্রাকৃতিক ভূগোলের নানা বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।** প্রাথমিক স্তরে ইহার সূচনা করিতে হইবে, উচ্চতর স্তরে ক্রমশঃ ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়।

মধ্যস্তর হইতে সময় সময় প্রাকৃতিক ভ্রমণের (nature excursions) **বন্দোবস্ত করিতে হইবে।** ছাত্রছাত্রীগণকে প্রকৃতির মুক্তক্ষেত্রে লইয়া গিয়া **প্রকৃতির পুস্তক** পাঠ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহারা ইচ্ছামত বস্তু, লতাপাতা, ফুল বা প্রদর্শনীর যোগ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিবে। সেই সমস্ত জিনিষ সংরক্ষণ ও সেই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের মধ্য দিয়া জ্ঞানলাভের সহায়তা করিতে হইবে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে প্রকৃতি-পাঠ ক্রমশঃ প্রাথমিক বিজ্ঞানের পাঠে পরিণত হইবে। ইহার অনুপূরক ভাবে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান বা প্রাণী-বিজ্ঞান-ও (Zoology) শিক্ষা দেওয়া যায়।

বস্তুপাঠ ও প্রকৃতিপাঠের জন্য ছাত্রকে কোন একটি পাঠ্য পুস্তক দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে ছাত্রেরা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে জ্ঞান সংগ্রহ না করিয়া পুস্তকের বর্ণনা মুখস্থ করিবে। প্রয়োজনমত ছাত্রগণ তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করিবে।

বস্তুপাঠ ও প্রকৃতি-পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম—

(১) নানা প্রকার প্রাকৃতিক ও তৈয়ারী জিনিষের নমুনা।

(২) স্কুল-বাগান।

(৩) কাঁচের জলাধার (Aquarium) বা কাঁচের বোতল ও পাত্র।

(৪) কাঁচের ছোট ঘর (Terrarium) স্থলজ উদ্ভিদ ও ছোট ছোট প্রাণী রাখিবার জন্য।

(৫) নানা রকম জিনিষ ও প্রাণীর চিত্র এবং মডেল।

(৬) নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র।

(৭) আতস কাঁচ (magnifying glass), মাপিবার ফিতা ইত্যাদি।

প্রকৃতি পাঠের পাঠটীকা

শিক্ষক............ **স্কুল**..............

তারিখ............ **শ্রেণী**—ষষ্ঠ মান।

সময়—৩০ মিনিট

বিষয়—প্রকৃতি-পাঠ।

সাধারণ পাঠ—নানা শস্যের জন্মকথা।

বিশেষ পাঠ—ছোলার জন্মকথা।

উদ্দেশ্য—প্রত্যক্ষ—ছোলার জীবন-কাহিনী ও ব্যবহার শিক্ষাদান।

পরোক্ষ—পর্যবেক্ষণ ও বিচারশক্তির বিকাশ।

উপকরণ—সাধারণ ছোলা, অঙ্কুরিত ছোলার চারাগাছ, ছোলার ডাল, ছোলার বেসন, ছোলার ছাতু ইত্যাদি।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
	পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা ও নূতন পাঠের সূচনা	প্রয়োজন মত শ্রেণী-বিন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিব এবং নূতন পাঠের সূচনা করিব। (১) তোমরা কি কি ডাল খাও? (২) তোমরা ছোলা দেখিয়াছ? (৩) ছোলার গাছ কিরূপ বলিতে পার? আজ আমরা ছোলার জীবন-কাহিনী ও ব্যবহার শিক্ষা করিব।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
	শীর্ষ বিভাগ (ক) ছোলার আকার ও গঠন পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের ফল।—চালের ন্যায় ছোঁলাও একটা খোসার মধ্যে থাকে। ইহা গোলাকার, কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে। ছোলার ভিতরে দুই ভাগে বিভক্ত দানা থাকে।	(ক) প্রত্যেক ছাত্রকে ৪।৫টি করিয়া ছোলা দিব এবং তাহা পর্যবেক্ষণ করিতে বলিব। কয়েকটি খোসাসহ ছোলা বাহির করিয়া দেখাইব। তাহার পর ছোলার রং, আকার ও গঠন পর্যবেক্ষণ করিতে বলিব। এক্ষণে ছুরি বা নখের সাহায্যে ছোলার উপরের খোসা খুলিয়া ফেলিয়া দানা বাহির করিয়া দেখাইব। তাহার পর নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে পুনরালোচনা করাইয়া পার্শ্বলিখিত সারাংশ বোর্ডে লিখিয়া দিব এবং ছাত্রগণকে নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া লইতে বলিব। (১) ছোলা কিসের ভিতরে থাকে? (২) ছোলার রং ও আকার কিরূপ? (৩) ছোলার দানা কিরূপ?
	(খ) **অঙ্কুরিত ছোলা পর্যবেক্ষণ** সারাংশ—২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিলে ছোলার অঙ্কুর হয়। তখন জল ফেলিয়া দিয়া ছড়াইয়া রাখিলে অঙ্কুর বাড়িতে থাকে। ইহার এক অংশ পরে মাটিতে প্রবেশ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে, অন্য অংশ উপর দিকে উঠিয়া ক্রমশঃ ছোলার চারাগাছে পরিণত হয়।	(খ) প্রত্যেক ছাত্রকে ২।৩টি করিয়া অঙ্কুরিত ছোলা দিব এবং ছোলার কিরূপে অঙ্কুর নির্গম হয় তাহা বর্ণনা করিব। তাহার পর অঙ্কুরের দুই অংশ পর্যবেক্ষণ করিতে বলিব এবং তাহার বিকাশ ও কাজ বর্ণনা করিব। একটি অঙ্কুর সহ ছোলা বোর্ডে আঁকিয়া দিব এবং ছাত্রগণকে নিজ নিজ খাতায় আঁকিয়া লইতে সাহায্য করিব। পুনরালোচনার প্রশ্ন— (১) ছোলার অঙ্কুর কিরূপে হয়? (২) তাহা কয় অংশে বিভক্ত হয়? (৩) তাহাদের বিকাশ ও কাজ বর্ণনা কর।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
	(গ) ছোলাগাছ পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের ফল :— ছোলার গাছ প্রায় এক হাত উচ্চ হয়। তাহার ছোট মূল মাটির সহিত লাগিয়া থাকে। মূল হইতে কাণ্ড কিছু উপরে উঠিয়া কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং সেগুলি সবুজ পত্রে ঢাকিয়া থাকে। পাতাগুলি খুব ছোট ছোট, বাদামি আকারের, ধানের শীষের মত লম্বা নহে। ২।৩ মাসের মধ্যে এক একটা গাছে অনেক ছোলা ফলে। ছোলা এক একটা ফলে, ধানের বা গমের ন্যায় ছড়া হয় না।	(গ) ছোলার একটা চারাগাছ টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া ও ছাত্রগণকে পর্যবেক্ষণ করিতে বলিব (বেশী গাছ সংগ্রহ করিতে পারিলে এক এক বেঞ্চের ছাত্রগণকে এক একটা গাছ দেওয়া যায়। ছোলা গাছের মূল, কাণ্ড, ডালপালা ও পাতার প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করিব এবং সেগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া বর্ণনা করিতে বলিব। ছোলা সহ গাছ না পাইলে, খোসাসহ কয়েকটি ছোলা গাছে বাঁধিয়া দিব এবং সেগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে বলিব। পুনরালোচনার প্রশ্ন :— (১) ছোলা গাছের মূল কিরূপ ? (২) কাণ্ড কত বড় ? (৩) ডালপালা কত বড় ও কতগুলি থাকে ? (৪) গাছে ছোলা কিরূপে ফলে ?
	(ঘ) ছোলার ব্যবহার :— সারাংশ :—ছোলা বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে প্রোটীন থাকে। কাঁচা ছোলা বেশ সুখাদ্য। ইহাতে ভিটামিনও থাকে। পাকা ছোলা ভাজিয়াও খায়। কিন্তু তাহাতে তাহার সারাংশ নষ্ট হইয়া যায়। ভিজাইয়া রাখিয়া গুড় দিয়া খাওয়াই ভাল। খই-মুড়ির পরিবর্তে ছেলে-মেয়েদের ইহা খাইতে দেওয়া উচিত। অঙ্কুরিত ছোলাই সবচেয়ে উপকারী। ভাত বা রুটির সঙ্গে ছোলার দাল খাওয়া যায়। ছোলা গুঁড়া করিয়া বেসন বা ছাতুর আকারেও খাওয়া যায়।	(ঘ) ছাত্রগণের সহযোগিতায় ছোলা কিরূপ পুষ্টিকর খাদ্য এবং কি কি আকারে তাহা খাওয়া যায়, বর্ণনা করিব) পুনরালোচনার প্রশ্ন :— (১) ছোলা কি রকম খাদ্য এবং তাহাতে কি কি পুষ্টিকর উপাদান থাকে ? (২) ছোলা কি আকারে খাওয়া ভাল ? (৩) উহা আর কি কি আকারে খাওয়া যায় ?

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
৩য়	সমগ্র পাঠের পুনরালোচনা	নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে সমগ্র পাঠের পুনরালোচনা করাইব। (১) ছোলার রং এবং আকার কিরূপ ? (২) ছোলার অঙ্কুর কিরূপে হয় এবং তাহা কিরূপে চারাগাছে পরিণত হয় ? (৩) একটি ছোলা গাছের বর্ণনা দাও। (৫) ছোলা কিরূপ খাদ্য এবং কি কি আকারে তাহা খাওয়া যায় ?
৪র্থ	গৃহকার্য নির্দেশ।	ছাত্রগণকে বাড়ী হইতে সংক্ষেপে ছোলার জীবন-কাহিনী এবং ব্যবহার লিখিয়া আনিতে বলিব।

References

1. Welton—Principles and Method of Teaching—Chapter XII.
2. Macknee—Instruction in Indian Secondary Schools. Chap. XI.
3. Percival R. Cole—The Method and Technique of Teaching, Chap. XXI.
4. Mc. Murry—Nature Study Lessons.
5. John Duncan—The Education of the Ordinary Child.
6. Saucier—Theory and Practice in Elementary School.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিজ্ঞান শিক্ষাদান পদ্ধতি

বিজ্ঞান কি ? বিজ্ঞান পরীক্ষাসিদ্ধ জ্ঞান। ইহা অনুমানভিত্তিক নহে বাস্তব-নিরীক্ষা-ভিত্তিক। বিজ্ঞানের পশ্চাতে একটি মূল বিশ্বাস কার্য করে। তাহা হইতেছে প্রতি ঘটনার পশ্চাতে এক বা একাধিক কারণ থাকে এবং একই কারণসমূহের সংযোগ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। বিজ্ঞান ঘটনা-সমূহের অন্তর্নিহিত কারণগুলি প্রথমে অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করে। তৎপরে প্রতিটি কারণের উপস্থিতি অনুপস্থিতি ও মাত্রার তারতম্য ঘটনার উপর কি প্রভাব বিস্তার করে তাহা পরিমাণগত ভাবে নির্ভর করে। এইভাবে ঘটনা ও তাহার কারণসমূহের গুণগত ও পরিমাণগত সম্বন্ধ নির্ধারণ করা হয়। ঐরূপ সম্বন্ধ নির্ধারিত হইলে তাহার নির্ভুলতা অন্যান্য বিভিন্ন ঘটনার উপর পরীক্ষা করা হয়। যখন ঐভাবে কোনও কারণ ও তাহার ফলাফলের সার্বিক সম্বন্ধ নিরূপিত হয়, তখন বিজ্ঞান তাহাকে প্রকৃতির কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বিধি বলিয়া গণ্য করে ও উহার সার্বিকতায় বিশ্বাস করে। কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্রসমূহে যদি ঐ বিধির ব্যত্যয় পরিদৃষ্ট হয় তখন মনে করা হয় ঐ ব্যত্যয় ভিন্ন কারণ বা কারণসমূহের জন্য ঘটিয়াছে এবং সেই কারণ অনুসন্ধান করা হয়। শুধু এই ভাবে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের কারণ অনুসন্ধান করিয়াই তৃপ্ত হয় না। ঐ কার্য-কারণ-সম্বন্ধনিচয়কে সংযুক্ত করিয়া ও বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃতির স্বরূপ অনুধাবন করিবার প্রয়াসও বিজ্ঞানের আর একটি অন্যতম প্রচেষ্টা। বিজ্ঞানের এই প্রচেষ্টার সহিত দর্শন-শাস্ত্রের সম্পর্ক আসিয়া যায় কারণ দর্শন-শাস্ত্রও বিশ্ব প্রকৃতির স্বরূপ উন্মোচনে আগ্রহী। কিন্তু এই দুইটি জ্ঞানের শাখার কার্য-প্রকরণ ভিন্ন প্রকৃতির। যুক্তিযুক্ত অনুমানই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান উপজীব্য। বিজ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণের ধারায় জ্ঞান আহরণ করিতে চেষ্টা করে। দর্শন যুক্তি ও অনুমানের ভিত্তিতে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পরে বিশেষ সিদ্ধান্তগুলি তাহার ভিত্তিতে গঠন করে। বিজ্ঞান নিরীক্ষা ও প্রয়োগ-সিদ্ধ বিধিসমূহ আবিষ্কার করিবার পর যুক্তিসঙ্গত ভাবে সেইগুলির সামগ্রিক তাৎপর্য আরোপে প্রয়াসী

হয়। এইজন্য দর্শনশাস্ত্রে বিভিন্ন বিচার ধারা জন্মলাভ করিয়াছে ও তাহারা অপরিবর্তিতই থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞান যে বিশ্বস্বরূপের উপলব্ধিতে একবার পৌঁছিয়াছে তাহাই পরবর্তী উন্নততর উপলব্ধির ভিত্তি হইয়া উঠিয়াছে,—ব্যর্থ ও পরিত্যক্ত হয় নাই। বর্তমান দর্শন বিজ্ঞানকে তাহার বিকাশের অন্যতম সহায়রূপেই গ্রহণ করায় ক্রমে এই দুই জ্ঞানের শাখার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগিতা

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। ইহার কারণ গত দুই শতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুলভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাষ্পীয় শক্তিকে শ্রমসাধ্য কাজে ব্যবহারের কৌশল আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে এই যুগ স্বরু হইয়াছে। যাতায়াত ব্যবস্থায় ও নানা উৎপাদনের কাজে বাষ্পীয় ও পরে খনিজতৈল-পরিচালিত ইঞ্জিন-সমূহ ব্যবহৃত হওয়ায় সভ্যতার দ্রুত বিস্তার ঘটিতে থাকে ও ঐ দ্রুতি ক্রমশঃ অধিকতর গতিলাভ করিতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি অভূতপূর্বরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। আজ আমাদের অধিকাংশ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য যন্ত্রের সাহায্যে ও নানা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে উৎপন্ন হয়। রেডিও, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি যন্ত্র বিদ্যুৎশক্তি সাহায্যে আলোক ও অন্যান্য উৎপাদন কৌশল ও যন্ত্রসমূহ ক্রমেই সর্ব-সাধারণের ব্যবহার সীমার মধ্যে আসিতেছে। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে উপযুক্ত জ্ঞান ও তৎপ্রসূত আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হওয়া। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যখন প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের প্রযুক্তির দিকটি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে, তখন ঐগুলি সম্বন্ধে ধারণা প্রদান শিক্ষার অন্যতম বিষয় হওয়া উচিত। তাই জীবন-সচেতনাকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে মানিয়া লইলে সাধারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে শিক্ষার আবশ্যিক অংশ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। তাই বর্তমান পাঠ্য-তালিকায় বিজ্ঞানকে আবশ্যিক বিষয় বলিয়া গণ্য করা হইতেছে।

কিন্তু বাস্তব জীবন সম্বন্ধে সচেতনা প্রদান ছাড়াও বিজ্ঞান শিক্ষার অন্য কতকগুলি উপযোগিতাও উপেক্ষণীয় নহে। সেইগুলি সম্বন্ধেও আমাদিগকে সচেতন থাকিতে হইবে—কারণ বিজ্ঞান-শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও

পাঠদানের সুষ্ঠু পদ্ধতি অনুসরণ করিবার জন্য ঐ সব উপযোগিতাগুলি কতটুকু সার্থকতা লাভ করিতেছে তাহা অন্যতম বিচার্য হইবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম উপযোগিতা ইহা আমাদিগকে বিচারশীল ও সুষম দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বাস্তব-ভিত্তিক। পূর্বধারণা অনুমান প্রভৃতি এই জ্ঞানার্জনে গৌণ অংশ গ্রহণ করে। তাই এইরূপ জ্ঞান অর্জন করিতে করিতে আমরা ক্রমে সত্যানুসন্ধানী ও বিচারশীল হইয়া উঠি। সংস্কার, অনুমান প্রভৃতি বিষয়-বিচ্যুত ও বিশ্বাস-সর্বস্ব প্রবণতাগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা ও বুদ্ধিকে পরিচ্ছন্ন করে। বিজ্ঞান কোনও কিছুকে পূর্ব হইতে বিশ্বাস করিতে বা অবিশ্বাস করিতে চাহে না—বিশ্বাস ও অবিশ্বাসকে পরিষ্কার করিয়া যুক্তি ও তথ্যকে জ্ঞানার্জনের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করাই বিজ্ঞানের মূল কথা। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বস্তুর বৈশিষ্ট্য-গুলিই জ্ঞাতব্য, কোন বস্তু আমাদের জীবনে কি বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে, তাহা গৌণ ব্যাপার। বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলির সম্যক ধারণা থাকিলে সকল বস্তুই বিশেষ ক্ষেত্রে উপযোগী গণ্য হইতে পারে। এই ভাবে জাগতিক ঘটনাবলীকে আত্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিলে মানুষ অনেক বেশী সুখী হইতে পারে—কারণ আত্মসাপেক্ষ বিচার মানুষকে অহেতুক উত্তেজিত করে ও অসুখী করে। এইরূপ আত্মনিরপেক্ষ বিচারশীল দৃষ্টি-ভঙ্গীই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। ইহা যে হিতকারী তাহা পূর্বেই দার্শনিক ও ধর্মগুরুগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান-শিক্ষা আমাদিগকে সহজে ঐরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী করিয়া তোলে।

জ্ঞানস্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করার ব্যাপারে বিজ্ঞান শিক্ষা অত্যন্ত সহায়ক। জানার আকাঙ্ক্ষা—রহস্যের উদ্ঘাটনস্পৃহা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। আবার জীব হিসাবে মানুষ নিজ পরিবেশ সম্বন্ধেই সর্বাপেক্ষা সচেতন। মানুষের প্রথম জ্ঞানের উন্মেষে জ্ঞান ছিল পরিবেশভিত্তিক। তাহার জ্ঞানার্জনের প্রেরণা ছিল প্রথমতঃ জীবনের প্রয়োজনে নিজ পরিবেশকে ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয়তঃ পরিবেশ সম্বন্ধে নিছক কৌতূহল চরিতার্থ করা। কিন্তু পূর্বে মানুষ পরিবেশ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জনের কৌশল জানিত না—অনুমানের উপরই তাহাকে অধিক নির্ভর করিতে হইত। যদিও অনুমানসমূহের ভিত্তি হিসাবে প্রথমে বাস্তব অভিজ্ঞতাসমূহ কাজ করিয়াছিল কিন্তু ক্রমেই সে অধিকতর অনুমান ও কল্পনাভিত্তিক জ্ঞানে ঝুঁকিয়া পড়ে।

এই ভাবে সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি বিষয় গুলিই জ্ঞানের রাজ্যে গুরুত্ব পাইতে থাকে। বাস্তব পরিবেশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার গুরুত্ব কমিয়া যাওয়ায় ঐ বিষয়গুলি অধিকতর কল্পনাশ্রয়ী হইয়া পড়ে ও জীবনে প্রয়োগসিদ্ধি হারায়। ফলে জ্ঞানার্জন ব্যাপারটাই সৌখীন ব্যাপার বলিয়া গণ্য হয়—কারণ তাহার সহিত জ্ঞানার্জনের প্রধান প্রেরণাদ্বয়—পরিবেশকে কাজে লাগানো ও পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তি—বিযুক্ত হয়।

বিজ্ঞান-শিক্ষা পুনরায় জ্ঞানার্জনের উক্ত দুই মূল প্রেরণাকে শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। তাই ইহা জনগণের মধ্যে শিক্ষা লাভের নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা নূতন অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করিয়াছে।

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রয়োগধর্মিতা। যে শিক্ষার জীবনে প্রয়োগ নাই তাহা প্রয়োজনীয় নহে। সত্য বটে সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি বিষয়েরও প্রয়োগধর্মিতা আছে কিন্তু তাহার প্রয়োগ তেমন সাক্ষাৎ ভাবে ঘটে না। এইজন্যই তাহা সকলের বাস্তব জীবনকে প্রভাবিত করিতে সক্ষম হয় না। বিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইতেছে প্রয়োগ-ধর্মিতা—কারণ প্রয়োগ ধর্মিতাই বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটাইয়া চলিয়াছে। প্রয়োগশিক্ষা ব্যতিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জনের পথে অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব। এইজন্য বিজ্ঞান-শিক্ষা শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের প্রেরণা সঞ্চার করে ও ইহার দ্বারা শিক্ষার সার্থকতা সম্পাদনে সহায়ক হয়।

বিজ্ঞান শিক্ষার উপরোক্ত উপযোগিতাগুলি স্মরণ রাখিয়া আমরা বিজ্ঞান-শিক্ষাকে বর্তমান শিক্ষাক্রমে গুরুত্ব দিয়াছি। কিন্তু শুধু তাহাই যথেষ্ট নহে—বিজ্ঞানের পাঠ্য পুর্ব নির্ণয়নে ও পাঠদান-পদ্ধতি নির্বাচনেও ঐ উপযোগীতাগুলির সার্থকতা সম্পাদনকেই অন্যতম নিরিখ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম রচনা :—

পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে বিষয়টি শিক্ষাদানের উপযোগিতা অর্থাৎ উদ্দেশ্য স্মরণে রাখিতে হয়। শুধু তাহাই নহে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ ও গ্রহণ ক্ষমতাও বিচার্য হইবে ও তাহার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমকে শ্রেণীগত ভাবে বিভক্ত করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ পাঠ্যক্রম রচনাতেই পাঠদান পদ্ধতিরও কিছু ইঙ্গিত থাকিবে—বিশেষতঃ বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসিদ্ধ জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রে।

কারণ এইরূপ বিষয়ে জ্ঞান লাভই উদ্দেশ্য বৃত্তির ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে না—জ্ঞান লাভ প্রক্রিয়াটি সেক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে। সুতরাং পাঠ্যক্রমে পাঠদান পদ্ধতির কিছু ইঙ্গিত প্রদান করা প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষার নিম্নলিখিত স্তর গুলি প্রচলিত রহিয়াছে (১) প্রাথমিক স্তর (২) মাধ্যমিক স্তর (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর। ইহার মধ্যে বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্তরে বিশষ বিশেষ বিষয়ের শিক্ষা দিয়া বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই সাধারণ বিজ্ঞান হিসাবে বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই অনুসৃত হয় না। সুতরাং সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম রচনায় আমরা প্রধানতঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মধ্যেই আলোচনা সীমিত রাখি।

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাকে উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতি ক্ষেত্র হিসাবেও দেখা হইতেছে। এই জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় দুই রূপ বিষয় রাখা হইতেছে—একটি সকলের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য বিষয়াবলী, আর একটি বিশেষ বিশেষ ধারায় শিক্ষালাভ করিয়া উচ্চতর শিক্ষা বা বৃত্তিনির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে নির্বাচনসাপেক্ষ বিষয়াবলী। সাধারণ বিজ্ঞান প্রথমোক্ত সাধারণ বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং পদার্থবিদ্যা, রাসায়নবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় বিভক্ত বৈজ্ঞানিক শাখাগুলি দ্বিতীয় ধরণের বিষয়াবলী রূপে গণ্য হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে সাধারণ বিজ্ঞান তো উপরোক্ত পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের সম্মিলিত জ্ঞান মাত্র সুতরাং একই বিষয়কে দুইটি বিভিন্ন খাতে রাখা হইতেছে নাকি? সেক্ষেত্রে স্মরণীয় যে সাধারণ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান প্রদান করা। তাই সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় বিভক্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ভাবেই ভিন্নরূপে থাকিবে এবং উক্ত বিভক্ত বিষয়াবলীর পরস্পর সম্বন্ধের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদত্ত হইবে—যেমন হইবে বাস্তব জীবনে ঐ সমস্ত বিষয়াবলীর সম্মিলিত প্রয়োগ বিষয়ে।

প্রাথমিক স্তরে সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম :—

প্রাথমিক স্তরে সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম রচনায় এই স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যটি স্মরণে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পূর্বেই আলোচিত

হইয়াছে যে বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য (১) অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত করা (২) পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সত্য উদ্ঘাটনের অভ্যাস গঠন করা (৩) আত্মবোধনিরপেক্ষ বিচারশক্তির বিকাশ সাধন (৪) পরিবেশ সম্বন্ধে জানিয়া জীবনে তাহার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতে উৎসাহী করা (৫) উচ্চতর বিজ্ঞানে প্রবেশের উপযোগিতা প্রদান। প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রথম তিনটি লক্ষ্যে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হইবে—চতুর্থটিতেও কিছুটা গুরুত্ব প্রদান করা হইবে—কিন্তু ৫মটির উপর গুরুত্ব প্রদান করা সম্ভব হইবে না। তাহার বিশেষ প্রয়োজনও প্রাথমিক শিক্ষায় নাই। প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞানের বেশী তথ্য তত্ব দ্বারা পাঠ্যক্রম ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শিশুরা যেন পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য আহরণে আগ্রহী হয় ও ইন্দ্রিয়নিচয়কে যথাযথ ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সত্য আহরণে উৎসাহী হয় এবং ঐ তথ্যগুলির যথাযথ ব্যবহারে উদ্যোগী হয়, সেই দিকেই অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে। তাই এই পর্যায়ের বিজ্ঞান-শিক্ষার পদ্ধতি বিষয়বস্তু অপেক্ষাও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

পাঠ্যক্রমরচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ ও গ্রহণক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়। ছোট শিশু পরিবেশের সকল বিষয়ে সমান আগ্রহী হয় না। তাহাদের বয়স ও গ্রহণক্ষমতার পরিমাণ বুঝিয়াই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা তাই প্রয়োজন।

শিক্ষার মূলগত বিধিগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শিক্ষা হইবে নিকটবর্তী বিষয়বস্তু হইতে দূরবর্তী বিষয়বস্তুর দিকে—সহজতর বিষয়বস্তু হইতে কঠিনতর বিষয়বস্তুর দিকে এবং বাস্তব বিষয়বস্তু হইতে কল্পনার বিষয়বস্তুর দিকে। বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমনির্বাচনেও এই মূল বিধিত্রয় স্মরণে রাখিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ৬+ বৎসরে। প্রথম দুই বৎসর শিশুরা প্রধানতঃ উদ্ভিদ ও জীবরাজ্যের প্রতিই আগ্রহ প্রদর্শন করে—কারণ জীবগুলির বৃদ্ধি ও গতিশীলতা ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও অন্যান্য পরিবর্তনশীলতা শিশুদের ইন্দ্রিয় নিচয়কে সহজেই আকৃষ্ট করে। এইজন্য এই বয়সে উদ্ভিদ ও জীব প্রকৃতি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ-মূলক জ্ঞান আহরণের শিক্ষাই হইবে সাধারণ বিজ্ঞানের প্রধান পাঠ্যক্রম। এই বয়সে শিশুরা কোনও প্রশ্নের

কোন দিকটিকে তেমন গুরুত্ব প্রদান করে না—কি ভাবে কোনও কার্য বা পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহা জানিয়াই তাহাদের কৌতূহল তৃপ্তিলাভ করে। যেমন বেঙ কি ভাবে খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষণ করে প্রভৃতি জানিয়াই তাহারা তৃপ্তিলাভ করে—কেন বেঙ ঐ ভাবে খাদ্য গিলিয়া খায় তাহা জানার ধৈর্য তাহাদের হয় না। এই জন্য এই বয়সে পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া সংগৃহীত বিবরণী রচনা করিতে শিক্ষাদানই হইবে পাঠ্যক্রমের প্রধান ধারা। তৃতীয় শ্রেণীতে শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনেকটা বিকশিত হইবে আশা করা যায় সুতরাং এই সময় হইতে উদ্ভিদ ও জীব ছাড়াও অপেক্ষাকৃত ধীরে পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক ঘটনাবলী—যেমন দিন রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি—আকাশের চন্দ্রের কলার ক্রমবৃদ্ধি—ঋতু পরিবর্তনের সহিত উদ্ভিদ ও জীব জগতের পরিবর্তনের সম্পর্ক—বিভিন্ন উদ্ভিদ, জীব ও উদ্ভিদ জীবের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করা হইবে। উচ্চতর শ্রেণীদ্বয়ে তাহাদের নিজ পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সহিত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও কিছু কিছু সন্নিবেশিত করা যায় যেমন—ফুল হইতে ফল হইবার প্রক্রিয়া—উদ্ভিদের রসশোষণ প্রক্রিয়া, উদ্ভিদের খাদ্য আহরণ প্রক্রিয়া—বৃষ্টিচক্র। এইরূপ জ্ঞান প্রদানের ভিত্তিতে শিশুদের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ অবশ্যই ভিত্তিরূপে থাকিবে—কিন্তু তাহার সহিত চিত্রাদি সহায়ে তাহাদের পক্ষে পরীক্ষণীয় নহে কিন্তু তাহাদের বোধগম্য পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় ও তাহাদের বোধগম্য তথ্যগত বিষয় সংযুক্ত হইতে থাকিবে। প্রথম শ্রেণী গুলিতে শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া নিজেদের প্রচেষ্টাতেই জ্ঞান সংগ্রহ করিতে বেশী উৎসাহ দেওয়া হইবে—উচ্চ শ্রেণীদ্বয়ে আগে সিদ্ধান্তটি বুঝাইয়া তাহা পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করিয়া দেখিতে দেওয়া যাইতে পারে। এই জন্য নিম্নশ্রেণীগুলিতে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। উচ্চ শ্রেণীকক্ষে শিশু-দিগকে ল্যাবরেটরী পদ্ধতিতে পরীক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত যাচাই করিবার কাজে বেশী লিপ্ত করা যায়। এই সব পদ্ধতির কথা পরে আলোচিত হইবে।

মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম

এই স্তরে শিশুদের আগ্রহ বহিঃপরিবেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং তাহাদের যুক্তি-তর্ক-ক্ষমতা (Power of reasoning) দ্রুত বিকাশ লাভ

করে। সুতরাং এই স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষায় ক্রমে ক্রমে মনোবৈজ্ঞানিক (Psychological) পর্যায়ের ধাপ অতিক্রম করিয়া যুক্তিসঙ্গত পর্যায় (logical order) অনুসরণ করা হইবে। প্রথমের দিকে প্রচলিত বিষয় বিভক্ত করার অপেক্ষা জীবন ভিত্তিক বিষয় বিভক্ত করা অধিকতর বাস্তব সম্মত, সুতরাং আগ্রহ বৃদ্ধির সহায়ক হয়। এই জন্য পদার্থ বিদ্যা, রাসায়নিক বিদ্যা প্রভৃতি প্রচলিত বিভাগগুলিতে বিষয়বস্তুকে বিভক্ত না করিয়া গাছ, জল, হাওয়া, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা এইরূপ জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া (Topics method) বিষয় বস্তু ভাগ করা ভাল। মাধ্যমিক স্তরের শেষের দিকে বিষয় বস্তুকে প্রচলিত বিষয়-অনুযায়ী বিভক্ত করা ভাল। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাদানে শিশুকে শ্রেণীতে প্রথামত শিক্ষা (formal teaching) অবশ্য দিতে হইবে—কিন্তু ইহার সাথে শিশুদের স্বেচ্ছাকাজ, দলগত কাজ, ঝোঁক (Hobby) প্রভৃতির মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার পথও খোলা রাখা বিধেয় ও ঐ ভাবে তাহারা যে শিক্ষা পায় তাহাতে উৎসাহ প্রদান ও তাহাকে অভীষ্ট খাতে নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা রাখা উচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এইরূপ informal method শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিশেষ ঝোঁক সৃষ্টির বিশেষ সহায়ক হয়। বর্তমানে বিজ্ঞান সংঘ বা science club সংগঠন ও পরিচালন দ্বারা আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কিশোরদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জনে আগ্রহ সৃষ্টির কাজে খুবই আশাপ্রদ ফল দেখা গিয়াছে। মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে কলেজের মত বক্তৃতা পদ্ধতি উপযোগী হয় না। তৎপরিবর্তে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা জ্ঞানার্জন অথবা অর্জিত জ্ঞানকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিবার ব্যাপারের প্রতিই বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বর্তমানে সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রথামত যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপেক্ষা শিক্ষার্থীর উদ্ভাবিত নানা কৌশলে ও সাধারণ সহজলভ্য উপকরণ সাহায্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইহার কারণ সব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব বা দুর্মূল্যতা নহে—ঐরূপ সহজপ্রাপ্য যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মধ্য দিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীর বিষয়-জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ই অধিক পরিশীমিত হইবার সুযোগ লাভ করে। কেটলীর মুখে নল লাগাইয়া ষ্টিমকে বদ্ধস্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহার সাহায্যে ষ্টীম সংক্রান্ত পরীক্ষা করার মধ্যে শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশ লাভ

করে এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ সরাসরি জীবনের প্রয়োগক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবার অনুপ্রেরণাও পায়। এই জন্য বর্তমানে U. N. E. S. C. O. কর্তৃক উপরোক্ত রূপ সহজলভ্য দ্রব্যাদি সহায়ে মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার একটি নির্দেশ পুস্তিকা (Source Book) বাহির হইয়াছে। উহা এদেশের মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান-শিক্ষার খুবই সহায়ক হইবে। ইহা শিক্ষার্থীকে নিজের প্রচেষ্টাতেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে উদ্বুদ্ধ করিবে। সম্প্রতি প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক হলডেন ভারতবর্ষে সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের মধ্য দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে উদ্ভিদ ও জীব-বিদ্যা শিক্ষার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ খুবই প্রচুর। এই জন্য মাধ্যমিক স্তরে ঐ বিষয়গুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা উচিত এবং শিক্ষার্থীকে ঐ সব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংগ্রহের উপযোগী পরীক্ষা-নিরীক্ষার উৎসাহ প্রদর্শন করা উচিত। মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম রচনায় উপরোক্ত বিষয়গুলি মনে রাখা খুবই প্রয়োজন। অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে বিজ্ঞানের সুশৃঙ্খল জ্ঞান (systematic knowledge) প্রদানের দিকটিও যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিতে হইবে—কিন্তু তাহা যেন শুষ্ক তথ্য আহরণের প্রবণতা সৃষ্টি না করিয়া পাঠ্যক্রম অনুসরণে যথেষ্ট সজীবতা ও সৃজনশীলতার অবকাশ থাকে তাহাও পাঠ্যক্রম রচনাকালে দেখিতে হইবে। অবশ্য এই বিষয়ে সার্থকতা শুধু পাঠ্যক্রম রচনা দ্বারা সম্ভব নহে—বিজ্ঞান শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ইহার রূপদানে অত্যন্ত কার্যকরী অংশ গ্রহণ করে।

বিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয়সমূহের পাঠদান পরিকল্পনার পরিকেন্দ্রী সজ্জা অথবা পরিকেন্দ্রী পাঠদান পরিকল্পনা (concentric planning)।

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে প্রাথমিক স্তরে এবং মাধ্যমিক স্তরের প্রথমাংশে বিজ্ঞান শিক্ষাকে অপেক্ষাকৃত জীবনাশ্রয়ী করা কর্তব্য। প্রাথমিক স্তরের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতির মাধ্যমেই অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রম শিখিবে ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম স্তরে তাহারা জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গ বা Topic পদ্ধতিতে শিখিবে। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রমকে একটি বিশেষ কৌশলে সাজাইয়া লইতে হয়। ইহাকেই পরিকেন্দ্রী পরিকল্পনা বা concentric planning বলে।

এই পরিকল্পনায় পর্যবেক্ষণের ভিত্তি বা আলোচনার বিষয়বস্তুকে বলা হয় আগ্রহ কেন্দ্র। যেমন প্রাথমিক স্তরে পুকুর পর্যবেক্ষণ, বাগান পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি এবং মাধ্যমিক স্তরে বায়ু, জল, সূর্য প্রভৃতি। এই আগ্রহকেন্দ্র গুলিকে অবলম্বন করিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধিত ভাবে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু-গুলিকে সাজানো হয়। শিশুর বয়স ও গ্রহণ ক্ষমতা যেমন বাড়ে, ঐ একই আগ্রহকেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া অধিকতর নূতন ও গভীরতর বিষয়গুলিতে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। যেমন ১ম ও ২য় শ্রেণীতে শিশুরা পুকুর পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়া নানা জলজ উদ্ভিদ ও জীবজন্তু চিনিতে ও তাহাদের আকার প্রকারের সাদৃশ্য পার্থক্য লক্ষ্য করিতে শিখিল। তৃতীয় শ্রেণীতে ঐগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে শিখিল। চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীতে বিভিন্ন জলজ প্রাণীর জীবনেতিহাস অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে শিখিল। এখানে ঐ সকল শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সবই একই আগ্রহ কেন্দ্র পুকুর পর্যবেক্ষণকে কেন্দ্রে রাখিয়া ক্রমশঃ বিস্তারিত পদ্ধতিতে সজ্জিত করা হইয়াছে। Topic পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে জলের পদার্থগত (Physical) ধর্ম জানিল—৭ম শ্রেণীতে জলের রসায়নগত ও ব্যবহারগত ধর্ম জানিল। ৮ম শ্রেণীতে বৃষ্টি যন্ত্র, water circle, ও ভূনিম্নের জল বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিল।

এই ভাবে পাঠ্যক্রমকে সাজাইয়া লইলে পাঠ্যক্রমকে জীবনকেন্দ্রী ভাবে শিক্ষা প্রদান করা সহজ হয় ও ঐ বয়সের শিশুরা পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর প্রতি অধিকতর আগ্রহ অনুভব করে।

প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের স্থান

প্রকৃতির শিক্ষাদান ক্ষমতা বহু পূর্ব হইতেই বহু জন স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ উন্মুক্ত উদার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ঘটনা নিচয়ের নিয়মবদ্ধতা ও সৌন্দর্যময় শৃঙ্খলা শিশুর মনে অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এ কথা জানিতেন। ইন্দ্রিয় নিচয়ই শিক্ষার প্রবেশদ্বার স্বরূপ—প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকিলে ইন্দ্রিয় নিচয় বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির মধ্যে ঘটনার যে শৃঙ্খলা বর্তমান তাহা মানুষকে শৃঙ্খলা-নুরাগী করে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকরণ তাৎপর্য বৈজ্ঞানিক অনু-সন্ধিৎসা জাগ্রত করে। উন্মুক্ত উদার বহিঃপ্রকৃতির সংস্পর্শে থাকিলে

মানুষের চিত্ত উদার হয়। এইগুলি প্রাচীন ঋষিদের সিদ্ধান্ত ছিল। ঋষি গৌতম সত্যকামকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করিবার পর তাহাকে এক শত গরু দিয়া উহার সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। ঐ ভাবে গোধন সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার পর যখন সত্যকাম গুরুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন গুরু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই দীর্ঘকাল প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকিয়া কি শিক্ষা করিয়াছ? সত্যকাম তাঁহার প্রকৃতির নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার একটি দীর্ঘ বিবরণী প্রদান করার পর গুরু তুষ্ট হইয়া বলিলেন "হে বৎস—তোমার দৃষ্টিশক্তি আছে—তুমি ইন্দ্রিয় নিচয়কে যথাযথ ব্যবহার করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছ—তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিব।" এই ঘটনাটি হইতে দেখা যায় যে তৎকালে ঋষিগণ শিক্ষার একটি মহৎ সূত্র অবগত ছিলেন। শিক্ষা পড়াইয়া দেওয়া যায় না—শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা বিকাশ করাই তাই শিক্ষার প্রধান কথা। প্রকৃতি এই ব্যাপারে সাহায্য প্রদান করে। রুশো প্রকৃতির এই অবদান-টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়াছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার কল্পিত লুসির মাধ্যমে এই সত্যই অনুপম কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে শুধু সৎ-শিক্ষক হিসাবেই দেখেন নাই—তিনি ইহাকে আধ্যাত্মিকতার গুরু রূপেও দেখিয়াছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ তাই শুধু বিকল্প শিক্ষার আধার মাত্র নহে—ইহা শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অন্যতম সহায়ক। কিন্তু এক্ষণে আমরা বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তিরচনায় ইহার উপযোগিতা আলোচনা করিব।

(১) শিশু সহজেই প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি আগ্রহ অনুভব করে। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ অবলম্বনে শিক্ষা দিলে তাহা শিশুর পক্ষে আনন্দ-দায়ক ও সহজগ্রাহ্য হইবে।

(২) শিশুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা পূর্ণ বিকশিত হয় না ও দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ধৈর্য থাকে না। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ সহজ ও তাহার জন্য দীর্ঘ ধৈর্য প্রয়োজন হয় না। তাই শিশু সহজে পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক শিক্ষা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লইতে পারে।

(৩) পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক শিক্ষায় হাতে হাতে পরীক্ষার যথেষ্ট সুযোগ থাকা চাই। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ শিশুরা পাইতে পারে।

(৪) শিশুরা জটিল প্রক্রিয়া বুঝিতে সক্ষম নহে। সেই জন্য বিজ্ঞানের সহজ বিধিগুলিই তাহাদের পক্ষে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আরম্ভ করা সম্ভব। উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর পরিবর্তন সংক্রান্ত বিধিগুলি সহজ ও সরল। তাই উহা শিশুরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

(৫) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর ইন্দ্রিয়নিচয়ের যথেষ্ট বিকাশ ঘটে।

(৬) শ্রেণীবদ্ধকরণ, পৃথকীকরণ, সাধারণীকরণ প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত্তি। প্রকৃতির বস্তুনিচয় হইতে সহজেই তাহারা এই-গুলিতে অভ্যস্ত হইতে পারে। উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ, পত্রের শ্রেণী-বিভাগ, ফলের শ্রেণী বিভাগ, জীবজন্তুর শ্রেণী বিভাগ, বিভিন্ন শ্রেণীর আকার আকৃতি প্রভৃতি সাধারণ পার্থক্য ও সকল শ্রেণীর সাধারণ গুণ—এইগুলির মধ্য দিয়া শিশুরা এই জ্ঞানগুলি আহরণ করিতে পারে।

(৭) বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার প্রয়োগধর্মিতা। যে জ্ঞান লাভ করা গেল তাহা প্রয়োগ করার মধ্য দিয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বাগানের কাজ, জীবজন্তু পালনের কাজ প্রভৃতি কাজ শিশুরা করিতে পারে। ঐগুলির মধ্য দিয়া শিশুরা প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান-গুলির প্রয়োগ ঘটাইতে পারে।

(৮) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশসমূহে ভ্রমণের দ্বারা শিশুর স্বাস্থ্য, তৎপরতা, শৃঙ্খলাবোধ সহযোগিতা প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ ঘটার সুযোগ পায়।

(৯) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ফলে সহজেই সংগ্রহবৃত্তি, কৌতূহলবৃত্তি প্রভৃতি কতকগুলি বৃত্তি গঠনাত্মক খাতে প্রবাহিত করা যায়। ঐ প্রবৃত্তি-গুলি বিপথে চালিত হইলে শিশুর বিকাশ অনভীপ্সিত হয়। সুতরাং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিশুর চরিত্র গঠনে সহায়ক।

(১০) প্রকৃতির সৌন্দর্য শিশুকে সৌন্দর্যপ্রিয় করে ও তাহার ফলে সে বিদ্যালয় ও গৃহপ্রাঙ্গণকে প্রাকৃতিক উদ্ভিদরাজিতে সাজাইতে চাহে। ইহা পুনরায় তাহাকে প্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ দেয়। এই ভাবে শিশু নিজে নিজেই শিক্ষালাভে ব্রতী হইবার সুযোগ পায়।

(১১) ইহা শিশুকে শিক্ষা ও আনন্দ লাভের একটি নূতন জগতের সন্ধান প্রদান করে যাহা হইতে শিশু সারা জীবন শিক্ষা ও আনন্দ পাইতে পারে।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের প্রকার-ভেদ

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ দুই প্রকারে হইতে পারে—(১) **অনির্দেশিত** (২) **নির্দেশিত।** অনির্দেশিত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে শিশু নিজে নিজেই পর্যবেক্ষণ করিবে, শিক্ষক তাহার পর্যবেক্ষিত জ্ঞানকে সজ্জিত করণে সাহায্য করিবেন মাত্র। ইহা ছোট শিশুর পক্ষে উপযোগী কারণ তাহারা নির্দেশ মানিয়া চলিতে আনন্দ পায় না। অবশ্য এক্ষেত্রে তাহাদের পর্যবেক্ষণের লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলি প্রশ্ন সাহায্যে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া পর্যবেক্ষণ ফলকে লিপিবদ্ধ করিতে উৎসাহ দিয়া ও তাহাকে বিশেষ লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতে ইঙ্গিত দিয়া শিক্ষক পর্যবেক্ষণকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। উহা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পর্যবেক্ষণের উৎসাহ যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য তিনি প্রত্যক্ষ নির্দেশদান হইতে বিরত থাকিবেন।

অনির্দেশিত প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের উপযোগী পরিবেশ নির্বাচন ও সৃজন

যদিও অনির্দেশিত পর্যবেক্ষণে শিশুদিগকে নির্দেশ দেওয়া হয় না তাহা হইলেও ঐ ধরণের পর্যবেক্ষণ যেন শিশুর বিশেষ বিশেষ জ্ঞানার্জন সহায়ক হয়, তাহাও শিক্ষকের উদ্দেশ্য রূপে নির্ধারিত থাকে। সুতরাং শিক্ষক এইরূপ স্থানে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে লইয়া যাইবেন অথবা বিদ্যালয় পরিবেশে এমন ব্যবস্থা রাখিবেন যাহাতে নির্দেশনা ব্যতিতই তাঁহার উদ্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রতিই শিশুর কৌতূহল নিবদ্ধ হয়। শিক্ষক তাঁহার উদ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার মত কথাবার্তাও পর্যবেক্ষণ কালে বলিতে পারেন—অথবা শিশুদের পর্যবেক্ষিত বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্য হইতে তাঁহার উদ্দিষ্ট বিষয়টি লইয়া বিশেষ ভাবে পুনরায় পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করিতে পারেন। শিশুরা বাগানে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে গিয়া ফুল ফল পাতা প্রভৃতি দেখিতে ও চিনিতে আগ্রহী হইল। শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন কিন্তু যেহেতু তাঁহার সেই দিনের পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য ফুল সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি করা ও ফুলের গঠনাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণমূলক জ্ঞানদান, তাই তিনি ফুলের সম্বন্ধে আলোচনাগুলি সমগ্র শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকিলেন। ইহাতে স্বভাবতঃই তাহাদের বিশেষ আগ্রহ ফুল বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইবে। তখন তিনি অন্যান্য শিশুদিগকে বিভিন্ন ফুল দেখিতে ও সংগ্রহ করিতে উৎসাহ দিবার জন্য নিজেই কিছু ফুল

আনিতে পারেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত অন্য শিশুকে প্রভাবিত করিবে ও তাহারাও ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিবে। তৎপরে শ্রেণীতে আসিয়া তিনি প্রত্যেক শিশুকে কিছু কিছু বিভিন্ন ধরণের ফুল দিয়া ফুলের বিভিন্ন অংশ, সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল প্রভৃতি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ভিত্তিতে শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য করিতে পারেন। অর্থাৎ অনির্দেশিত পর্যবেক্ষণেও শিক্ষকের প্রভাবন (suggestion) কার্যকরী থাকে। ফুল সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণমূলক জ্ঞান দিবার উদ্দেশ্যে অনির্দেশিত পর্যবেক্ষণ তখনই সাফল্য লাভ করিবে যখন শিক্ষক শিশুদিগকে এমন পরিবেশে লইয়া যাইবেন যেখানে নানা রকম ফুল পর্যবেক্ষণের সুযোগ আছে। সুতরাং অনির্দেশিত পর্যবেক্ষণমূলক পাঠের জন্য পর্যবেক্ষণের পক্ষে উপযোগী পরিবেশ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই কাজটি আর এক ভাবে সহজে করা যায়। বিদ্যালয়েরই একটি কোণকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখা হইল। উহাকে প্রকৃতি কোণ বা Nature Corner বলা হইল। শিশুরা তাহাদের স্বাভাবিক কৌতূহল-বশে যাহাই কৌতূহলোদ্দীপক মনে করিবে তাহাই ঐ প্রকৃতি কোণে আনিয়া রাখিবে এবং শিক্ষক সংক্ষিপ্ত ভাবে বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য শিশুকে বলিয়া দিবেন বা সহজ ভাষায় লিখিত বিবরণ দ্রব্যটির সহিত সংযুক্ত করিবেন। এই কাজ সংগ্রহকারী শিশুও করিতে পারে। যে বিষয়টি অধিকতর জ্ঞাতব্য মনে হইবে তাহার বিষয়ে শিক্ষক অধিক আলোচনা করিবেন। তিনি যদি কোনও বিশেষ বিষয়ে শিশুদিগকে আগ্রহী করিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি নিজেই ঐরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন ভাবে ঐ প্রকৃতি কোণে রাখিতে পারেন। তাহা হইলে শিশুদের ঐ দ্রব্যটি পর্যবেক্ষণ ও উহার সম্বন্ধে জানার বিশেষ আগ্রহ অবশ্যই জন্মিবে। শিক্ষক তাহাদের এই আগ্রহের সুযোগ লইয়া তাঁহার উদ্দিষ্ট পর্যবেক্ষণমূলক জ্ঞান শ্রেণীগত-ভাবে দিবেন। প্রকৃতি কোণে সংগ্রহীত দ্রব্যগুলির মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করা যায় ও যাহার শিক্ষাগত মূল্য অধিক সেইগুলি প্রাকৃতিক সংগ্রহশালায় রাখা চলিবে। বিজ্ঞান-শিক্ষায় এইরূপ সংগ্রহ শালা অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। ইহার বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

নির্দেশিত পর্যবেক্ষণ

যখন কোনও একটি বিষয়ে পর্যবেক্ষণের পূর্বে শিশুদের উক্ত পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা প্রদানের পর পর্যবেক্ষণ

করিতে দেওয়া হয় তখন তাহাকে নির্দেশিত (Directed) পর্যবেক্ষণ বলা হয়। নির্দেশিত পর্যবেক্ষণ হইলেই যে আগ্রহ কম হইবে তাহা নহে। পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতে আগ্রহী হইলে নির্দেশনার জন্য শিশুরই আগ্রহ জন্মিবে। সুতরাং তখন নির্দেশনায় পর্যবেক্ষণের আগ্রহ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইবে। কিছু বেশী বয়সের শিশুর পক্ষেই উদ্দেশ্য লইয়া পর্যবেক্ষণ করার আগ্রহ জন্মে তাই উচ্চতর শ্রেণীর পক্ষে নির্দেশিত পর্যবেক্ষণ উপযোগী।

নির্দেশিত পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। যেমন একটি পর্যবেক্ষণ হইতে উদ্ভূত বিশেষ প্রকারের জ্ঞাতব্য বিষয়ে পর্যবেক্ষণমূলক নূতন জ্ঞান আহরণের আগ্রহ দেখা দিতে পারে। শিশুরা লক্ষ্য করিয়াছে যে তাহাদের বাগানের কতকগুলি গাছের পাতা খুব ফ্যাকাসে হইয়াছে। শিক্ষক উহার কারণ হিসাবে বলিলেন যে ঐ চারা গাছগুলি সূর্য্যালোক পাইতেছে না বলিয়া ঐরূপ হইয়াছে। তিনি এই সিদ্ধান্ত সত্য কিনা দেখিবার জন্য তাহাদিগকে অন্য গাছের পাতা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার কয়েক দিন পরে দেখিতে বলিলেন। এইভাবে একটি পর্যবেক্ষণ হইতে পরবর্তী নির্দেশিত পর্যবেক্ষণটির উদ্ভব হইল।

আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতিতে পাঠ দানের জন্য আংশিক নির্দেশিত পর্যবেক্ষণের প্রয়োগ ঘটে। যেমন দেখা গেল বিদ্যালয়ের বাগানের যে অংশটি কর্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল তাহাতে শিয়ালকাঁটার গাছ জন্মিয়াছে। শিক্ষক প্রশ্ন করিয়া জানিলেন কেহই ঐ ক্ষেত্রে শিয়ালকাঁটার বীজ ছড়ায় নাই। কি ভাবে শিয়ালকাঁটার বীজ ঐ ক্ষেত্রে আসিল তাহা অনুসন্ধান করিতে তিনি নির্দেশ দিলেন। তিনি বলিয়া দিলেন যে বিদ্যালয়ের নিকটে কোথায় শিয়ালকাঁটার গাছ আছে তাহা দেখিতে হইবে এবং ঐ গাছের বীজ কি ভাবে ক্ষেতে পড়িতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। শিশুরা বিদ্যালয় হইতে কিছু দূরে শিয়ালকাঁটার সন্ধান পাইল ও তাহার বীজ দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে উহা সহজেই কোনও জীবের শরীরে লাগিয়া বিদ্যালয়ে আসিতে পারে। ইহার পরে শিক্ষক আর কোন কোন গাছ অনুরূপ বা অন্যান্য কৌশলে নিজেদের বীজ ছড়াইয়া দেয়—তাহা পর্যবেক্ষণ সাহায্যে বাহির করার নির্দেশ দিতে পারেন। এই ভাবে শিশুরা নিজেরাই প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ জগতের একটি বৈশিষ্ট্য—নানা কৌশলে বংশ

বিস্তার কৌশল—আবিষ্কার করিবে। ইহা আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি (Heuristic Method)। বলা বাহুল্য শিশুরা নির্দেশনা ব্যতীত মাত্র নিজ প্রচেষ্টায় এইরূপ একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত স্বাধীন পর্যবেক্ষণের দ্বারা আবিষ্কার করিবে তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহারা আবিষ্কার করার মতই আনন্দ পাইবে এবং বৈজ্ঞানিক সত্য কি ভাবে আবিষ্কৃত হয় তাহাও বুঝিতে সক্ষম হইবে।

উচ্চতর শ্রেণীতে নির্দেশিত পর্যবেক্ষণ কার্য সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য বিদ্যালয়ের সন্নিকটেই যেন পর্যবেক্ষণ কার্য চালাইতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা রাখা দরকার। কারণ এইরূপ পর্যবেক্ষণ দীর্ঘ দিন ধরিয়া ও বারে বারে করার প্রয়োজন। এইজন্য জলাধার, জীবজন্তু রাখার খাঁচা, টব, কাঁচের পাত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপকরণেরও আবশ্যক হইবে। বিদ্যালয়ে বাগানের কাজ, মৌমাছি পালন, মৎস্য পালন প্রভৃতি কাজ রাখিলে পর্যবেক্ষণ অপেক্ষাকৃত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও নিয়মিত হয়; বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি কর্মকেন্দ্রী সুতরাং সেইগুলিতেও উপরের ধরণের কর্ম ব্যবস্থা রাখা ভাল।

দলগত কাজ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর শিশুদের বয়স ১১+ সুতরাং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে কিছুটা গঠন প্রবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। ঐ প্রবৃত্তির সাহায্য লইয়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দলগত কাজ রাখিলে তাহাতে শিশুরা উৎসাহী হয় ও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণাদি অপেক্ষা অধিকতর অগ্রগতি প্রদর্শন করে। বিভিন্ন দলের কাজের বিবরণাদি শ্রেণীতে পেশ করার প্রেরণা হইতে বিবরণাদি রাখার ব্যাপারে অধিকতর সচেতন ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন হইয়া উঠে। যেমন আবহাওয়া পর্যবেক্ষক দল, স্বাস্থ্যবন্ধুর দল, কৃষিবন্ধুর দল, জীববিজ্ঞানীর দল, উদ্ভিদবিজ্ঞানীর দল প্রভৃতি। আবহাওয়া পর্যবেক্ষকের দল প্রতিদিনের সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন উষ্ণতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, আর্দ্রতা প্রভৃতির পরিমাপ রাখিবে ও অন্যান্য বৎসরের সহিত তাহার তুলনা করিবে ও তাহাদের পর্যবেক্ষণ ফল বিদ্যালয়ে ঘোষণা করিবে। কৃষি বন্ধুর দল কৃষির অবস্থা, আসন্ন ঋতুর উপযোগী ফসলের নাম, কৃষকদের আশু কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে। স্বাস্থ্য বন্ধুর দল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর, কোনও সংক্রামক রোগ হইলে তাহার প্রতিবিধান, বিভিন্ন ঋতুতে স্বাস্থ্যরক্ষা

সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অবহিতি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে কোনও জ্ঞাতব্য পাইলে তাহা প্রচার করিবে ও বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালন করিবে। ইহারা মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রদর্শনী করিতে পারে। জীববিজ্ঞানী দল আশেপাশের জীবজন্তুর তথ্য সংগ্রহ, নমুনা সংগ্রহ, নূতন কোনও জীবের পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা সকলের নিকট প্রচার করিবার জন্য প্রচারপত্র, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবে ও বিদ্যালয়ে কোনও জীবজন্তু রক্ষিত হইলে তাহার তত্ত্বাবধান করিবে। ইহারা মাঝে মাঝে বিভিন্ন শিশু ও গ্রামবাসীর নিকট জীবজন্তুর প্রদর্শনী করিতে পারে। অনুরূপভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞানী দল পরিবেশের বৈচিত্র্যযুক্ত উদ্ভিদসমূহ ও তাহাদের তথ্য সংগ্রহ করিবে—বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে ঐরূপ বৈচিত্র্য-যুক্ত উদ্ভিদের "বিচিত্র উদ্যান" রচনা করিবে এবং মাঝে মাঝে পুষ্প ফল প্রভৃতির প্রদর্শনী করিবে। ঋতু উৎসবগুলিতে ইহারা বিভিন্ন ঋতুর বৈশিষ্ট্যময় ফুল ফল প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে। এই দলগত কাজগুলির বিবরণাদি সমগ্র শ্রেণীতে ও অন্যান্য শ্রেণীতে পরিবেশিত হইবে। এই ভাবে শিশুরা নিজ প্রচেষ্টাতেই বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক জ্ঞান সংগ্রহ করিবে ও অনুসন্ধিৎসু হইবে—শিক্ষক উৎসাহদাতা সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। যদি গ্রামে কোনও যোগ্য ব্যক্তি থাকেন তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতেও উৎসাহ দেওয়া হইবে এবং পাঠাগারে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট পুস্তকাবলীর সহায়তাও লইতে শেখানো হইবে। শিশু-উপযোগী সাময়িক পত্র, দৈনিক কাগজের শিশু ও কিশোরদের ক্রোড় পত্র প্রভৃতিও ঐরূপ শিক্ষা অর্জনের সহায়ক হইবে।

বিজ্ঞান-সংঘ বা Science Club। ইহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মাধ্যমিক স্তরে ইহার প্রবর্তন বিষয়ে খুবই আন্দোলন দেখা দিয়াছে। প্রাথমিক স্তরেও ইহার কিছুটা উপযোগিতা আছে। আমরা উপরে লিখিত বিভিন্ন দলের সম্মিলিত দল হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়েও বিজ্ঞান-সংঘ গঠন করিতে পারি। মাধ্যমিক স্তরে ইহাকে সুসংগঠিত রূপ দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে শ্রেণীগতভাবে নহে বা বাধ্যতামূলকভাবে নহে—ঐচ্ছিক ভাবে শিক্ষার্থীগণ সভ্যপদ গ্রহণ করে। সামান্য হইলেও কিছু চাঁদা থাকে। মাঝে মাঝে অধিবেশন বসে ও তাহাতে সভ্যগণ যোগদান করে। সভ্যদের ঐরূপ সভায় নির্দিষ্ট সংখ্যক উপস্থিতি বাধ্যতা-

মূলক করা যায়। অন্য পক্ষ শ্রোতা হিসাবে বা নিমন্ত্রিত হিসাবে যোগদান করে। বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা সভা, আলোকচিত্রাদি প্রদর্শনী, সংগ্রহ-প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা বিজ্ঞান-সংঘ হইতে হইতে পারে। সঙ্ঘের যে কোনও সভ্য ব্যক্তিগত অথবা দলগত ভাবে তথ্য সংগ্রহ, যন্ত্রাদি প্রস্তুত, বিশেষ বিশেষ সম্পাদ্য পরীক্ষার ফল বিবরণী আকারে সংঘে পেশ করিতে বা সভ্যদের সমক্ষে প্রদর্শন করিতে পারে। সংঘ কর্তৃক বিজ্ঞান-বিষয়ক হস্তলিখিত পত্রিকা বাহির করা যাইতে পারে—যাহাতে সভ্যদের কাজের বিবরণী ইত্যাদি থাকিবে। সংঘের সংগ্রহশালা থাকিলে ভাল হয়। সংঘের বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকাদির একটি পাঠাগার গড়িয়া তোলা ভাল। প্রশ্নের বাক্স রাখিয়া সংঘকর্তৃক বিজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন আহ্বান করা যায়। প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর সংগ্রহ করিয়া সংঘ মাঝে মাঝে প্রশ্নোত্তরিকা প্রকাশ করিলে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করিবার ব্যাপারে এইরূপ সংঘ খুবই উপযোগী। বিজ্ঞান-শিক্ষক এইরূপ সংঘ সংগঠন ও পরিচালনে তৎপরতা ও উদ্যোগের পরিচয় দিবেন। কিন্তু তাঁহাকে গণতান্ত্রিক মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে সংঘের সভ্যগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে ও সংঘের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। তাহাদিগের মধ্যে সক্রিয় উৎসাহ সৃষ্টিই এইরূপ সংঘের প্রধান কথা।

বিজ্ঞান শিক্ষায় শ্রেণী-পাঠনা ঃ—

আমরা এতক্ষণ শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নিজ পর্যবেক্ষণ ও তথ্যানুসন্ধান প্রভৃতির ভিত্তিতে বিজ্ঞানসংক্রান্ত জ্ঞানার্জনে সাহায্য করার বিষয়েই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই ভাবে বিজ্ঞানের পাঠ্যতালিকাভুক্ত সকল অংশ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় না—বিশেষতঃ আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে যেখানে ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষক ও সহায়ক উপকরণাদির পরিমাণ খুবই অল্প। এই জন্য বিজ্ঞানের শ্রেণী-পাঠনার ব্যবস্থাও অবশ্যই রাখিতে হইবে। কিন্তু শ্রেণী-পাঠনা অর্থে শিক্ষক শুধু বোর্ড, পাঠ্যপুস্তক ও বক্তৃতা সাহায্যে বিজ্ঞানের পাঠদান করিবেন, এইরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। বিজ্ঞান শিক্ষার মূল কথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা এবং শ্রেণী-পাঠনাতেও

তাহার আয়োজন অবশ্যই কিছু না কিছু থাকিবে। ঐরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষায়-সিদ্ধ জ্ঞান প্রদানের কতখানি আয়োজন করা যাইবে, তাহারই উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া অনেকগুলি বিজ্ঞান শিক্ষাদান-পদ্ধতি বহু দিন হইতেই সুপ্রচলিত হইয়াছে। এখানে সেইগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

পরীক্ষাগার পদ্ধতি :—

ইহাতে নানা যন্ত্রসংযুক্ত পরীক্ষাগারে বিভিন্ন পরীক্ষার টেবিলে প্রতি ছাত্র সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহ নির্ধারণ করে। বিভিন্ন পরীক্ষার ইঙ্গিতসম্বলিত কার্য শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয়—তাহারা তদনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় ও তাহার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাহারা প্রয়োজন বুঝিলে শিক্ষকের সাহায্য অবশ্যই পায়। পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তগুলির ব্যাখ্যা করা ও তাৎপর্য অনুধাবনে সহায়তা প্রদান জন্য মাঝে মাঝে বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকে—কিন্তু শিক্ষাকার্য প্রধানতঃ হাতে কলমে পরীক্ষার ভিত্তিতে চলে। Heuristic বা আবিষ্ক্রিয়া-পদ্ধতির মত এ ক্ষেত্রে পরীক্ষা পরিচালন পদ্ধতিতেও শিক্ষার্থীকে উদ্ভাবন করার দায়িত্ব দেওয়া হয় না বলিয়া ইহা ঐ পদ্ধতি অপেক্ষা সহজ ও অনুসরণযোগ্য। কিন্তু ইহার জন্য সুসজ্জিত পরীক্ষাগার, অনেক যন্ত্রপাতি, অধিকসংখ্যক উপদেষ্টা ইত্যাদি লাগে। শিক্ষার্থীর মানসিক মান ও শিক্ষাগত অগ্রগতিও আশানুযায়ী হওয়া প্রযোজন—নতুবা সে বিফল হইবে। ইহার দ্বারা পাঠ্য বিষয়ে দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয় না। কিন্তু ইহা বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত্তি রচনার খুবই উপযোগী। আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষায় ঠিক এইরূপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। এখানে প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstrative method) এ পাঠদান করিয়া শিক্ষার্থীকে ঐ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানকালে শিক্ষক যে পরীক্ষা সম্পাদন করিয়াছেন তাহা পুনঃ সম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হয়। এইরূপ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ও ইহাতে উক্ত পদ্ধতির পূর্ণ সুফল পাওয়া না গেলেও অনেকখানি সুফল লাভ করা যায়। কিন্তু ইহা শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও বৈজ্ঞানিক আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে পূর্ণমান কখনোই সৃষ্টি করিতে পারে না।

প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstrative Method)

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বিশেষ বৈজ্ঞানিক সমস্যাটি সংগঠিত করিয়া শ্রেণীগতভাবেই তাহা সমাধানে ব্রতী হন (Presentation

of the Problem)। তৎপরে ঐ সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় বিশ্লেষণ পূর্বক তাহা কি ভাবে পরীক্ষিত হইতে ও সমাধানে পৌছিতে পারা যায় তাহার পদ্ধতিটি বাহির করেন। পরে তিনি শ্রেণীর সম্মুখে পরীক্ষাগুলি করেন ও শিশুদের সহায়ে নিরীক্ষণ ও সিদ্ধান্তসমূহ গঠন করিয়া সমস্যাটির সমাধানে পৌছান। শিক্ষক নিপুণ হইলে এই পদ্ধতি খুব ফলপ্রদ হয়। কিন্তু সমস্যাবিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইতে সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যাপারে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ ও যুক্তি অনুসরণ ক্ষমতার বিকাশ সাধনের প্রতি দৃষ্টি না দিলে শিক্ষার্থী লাভবান হয় না। এই জন্য শিক্ষকের খুবই ধৈর্যশীল হওয়া প্রয়োজন। যদি শিক্ষার্থীদের মানের খুব বেশী পার্থক্য থাকে তাহা হইলে দলগত পরীক্ষণ-নিরীক্ষণে ও যুক্তিগঠনে সকলের সমান কুশলতা না থাকায় সকলে লাভবান হইতে পারে না—অর্থাৎ শ্রেণীগত শিক্ষার মূল ত্রুটিটি এখানেও থাকিয়া যায়। তথাপি পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করার বিষয় ও যথেষ্ট যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অভাবের কথা মনে রাখিলে এই পদ্ধতির প্রয়োগের উপরই বিজ্ঞান-শিক্ষককে বেশী নির্ভর করিতে হয়। ইহার সহিত যদি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পৃথকভাবে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের কিছু সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া যায়, তবে এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শিক্ষাদান অনেকাংশেই সফল হইবে মনে হয়।

নূতন পদ্ধতিসমূহ

বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষাকে নিছক তাত্ত্বিক শিক্ষারূপে না দিয়া ব্যক্তির ও সমাজের জীবনের সহিত যুক্ত প্রয়োগশীল বিষয় হিসাবে শিক্ষা দিবার প্রবণতা দেখা দিয়াছে। প্রাথমিক স্তরে ঐ ভাবে শিক্ষাদান করার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। প্রাথমিক স্তরের শিশুর কাছে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিষয় বিভক্ত জ্ঞানের কোনও তাৎপর্যই নাই—কারণ এই ভাগগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। এইজন্য তাহাদের জীবনে ও কাজকর্মে যে সব বাস্তব সমস্যা ও উপলব্ধি দেখা দেয়, তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষাসিদ্ধ জ্ঞান প্রদানকেই প্রাথমিক স্তরের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলা হইয়াছে। মাটির কথা, চাষের কথা, জলের কথা, আকাশের কথা এই ভাবে তাহারা এক একটি জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত বিষয়ের সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন শাখার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই একত্রে শিখিবে।

জলের ধর্ম নিম্নগামিতা ইহাও যেমন জল সম্বন্ধে জানিতে গিয়া শিখিবে, সাধারণতঃ জলে দ্রবীভূত ও ভাসমান ময়লা থাকে তাহাও তেমনি শিখিবে এবং সংরক্ষিত পুষ্করিণীতে কি ভাবে স্বাস্থ্য-সম্মত জল সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা যায় তাহাও ঐ প্রকারে শিখিবে। অথচ ইহার একটি পদার্থ-বিদ্যার বিষয়, পরেরটি রসায়ন শাস্ত্রের বিষয় ও শেষেরটি স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতির পার্থক্য বুঝে না—জল তাহাদের নিকট অনেক বেশী বাস্তব, সুতরাং জল সম্বন্ধে এই জ্ঞাতব্য তাহারা সানন্দে জানিতে বুঝিতে আগ্রহী হইবে।

মাধ্যমিক স্তরে কতকগুলি সাধারণ বৈজ্ঞানিক তথ্য শিক্ষা দিবার প্রতিই এত দিন বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। যেমন উপরের উদাহরণে তাহারা জলের নিম্নগামিতা এই ভাবে বিষয়টি না দেখিয়া তরল পদার্থের নিম্নগামিতা ও তাহার কারণ এবং ধর্মের বিভিন্ন প্রয়োগাদি বিষয়ে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান অর্জন করিবে, ইহাই পাঠ্য নির্বাচনের লক্ষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছিল। অর্থাৎ এখানে বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের নির্বাচনে মনোবৈজ্ঞানিক অথবা জীবনে উপযোগিতামূলক ভিত্তির পরিবর্তে যুক্তিমূলক ভিত্তি (Logical basis instead of Psychological or utilitarian basis) গ্রহণ করা হইত। বর্তমানে যদিও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে logical basisকে একেবারে উপেক্ষা করা হয় নাই, তথাপি পাঠ্য বিষয়গুলিকে কিছুটা Psychological & utilitarian basisএ সাজাইয়া উপস্থাপিত করার প্রতি গুরুত্ব প্রদত্ত হইতেছে—কারণ তাহা শিক্ষণীয় বিষয়টিকে অনেক বেশী আকর্ষণীয় করে—বিশেষতঃ মাধ্যমিক স্তরে; নিম্নে ঐরূপ পাঠ্যক্রম সংযুক্তির কয়েকটি বিভিন্ন পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে যদিও, ঐগুলি বিষয়ে পূর্বেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে।

Topics Method বা আলোচ্য নির্বাচন-পদ্ধতি

এই পদ্ধতির বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এখানে কতকগুলি জীবনভিত্তিক আলোচ্য বিষয় ধরিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন জল, বায়ু, ফসল, গাছ, রোগ ও রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা, নাগরিক স্বাস্থ্য, রন্ধন প্রভৃতি।

একক সমস্যা পদ্ধতি বা Unit Problem Method

এই পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি মূল ও সাধারণ সমস্যারূপে উপস্থাপিত করা হয়। যথা :—

(১) গৃহে আলোকের ব্যবস্থা কি ভাবে করা হয় ?

(২) আমরা খাদ্য ব্যাপারে উদ্ভিদের নিকট কি ভাবে নির্ভরশীল ?

(৩) কি ভাবে তাপশক্তিকে দিয়া কাজ করানো যায় ?

(৪) আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য হাতিয়ারগুলির কার্যকারিতা কি কি বিধির উপর নির্ভরশীল।

এই পদ্ধতিতে Logical Orderকে খুব বেশী পরিবর্তন করিতে হয় না, অথচ বিষয়টি অনেক বেশী আকর্ষণীয় হয় বলিয়া অধুনা ইহার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিজ্ঞান শিক্ষাদান সহায়ক উপকরণসমূহ :—

বিজ্ঞান হইতেছে পর্যবেক্ষণভিত্তিক জ্ঞান। পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে ভিত্তি করিয়া এই জ্ঞান আহরণ করা হয়। সুতরাং বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের সহায়ক নানা যন্ত্রপাতির একান্ত প্রয়োজন আছে। আবার টুকরা টুকরা ভাবে অর্জিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানগুলিকে একটি পূর্ণ জ্ঞানে পরিণতঃ করার ব্যাপারে চার্ট ড্রইং প্রভৃতি প্রদীপনেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বাস্তব দ্রব্যসমূহের চিত্র, আলোকচিত্র প্রভৃতিও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জন সহায়ক, কারণ আলোচ্য সকল বিষয়ের বাস্তব নমুনা সংগ্রহ করা বা দেখিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় বুঝিতে মডেল অত্যন্ত সহায়ক হয়, যেমন শারীরবিদ্যা প্রভৃতি। অনুরূপভাবে কোনও ঘটনার বিভিন্ন পর্যায়গুলি ঠিকমত বুঝিতে ল্যাণ্টার্ন চিত্র বা চলচ্চিত্র অত্যন্ত সহায়ক হয়। বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য একটি সু-ব্যবস্থিত পরীক্ষাগারে এই সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষাদান-সহায়ক উপকরণ রাখা উচিত এবং দ্রব্যগুলি যাহাতে সকলে ঠিকমত দেখিতে ও অনুকরণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা রাখা উচিত। এই জন্য প্রদর্শন টেবিল, ধৌতাধার (wash basin) প্রভৃতি ল্যাবরেটরী সরঞ্জামযুক্ত পৃথক বিজ্ঞান-শ্রেণীগৃহ থাকা ভাল—বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষায় পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে, কিন্তু সম্পাদ্য পরীক্ষণ খুব বেশী থাকিবে না, সুতরাং পৃথক বিজ্ঞান-শ্রেণীগৃহের প্রয়োজন নাই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহ যত দূর সরল ও সুপরিচিত হইবে ততই ভাল। যে পরীক্ষা সাধারণ কাঁচের গ্লাসে দেখানো যায় তাহার জন্য রসায়নাগারের ফ্লাস্ক প্রভৃতি সরঞ্জামের ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কারণ ঐ রূপ অপরিচিত উপকরণাদি শিক্ষার্থীর কৌতুহলকে আংশিক প্রভাবিত করে এবং বিষয়বস্তু হইতে মনোযোগ ঐগুলির দিকে যায়। অনেক সময় সাধারণ ব্যবহার্য ও পুরাতন বাতিল (scrap) উপকরণাদিকে নানা সহজ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায়। অবশ্য সূক্ষ্ম তারতম্য বুঝিবার ও জানিবার মত কিছু কিছু উপকরণ রাখার প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকিবে। যেমন তুলাদণ্ড, ব্যারোমিটার প্রভৃতি। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর পক্ষে সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির (conventional equipments) সহিত পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাই এই স্তরে improvised apparatus যেমন থাকিবে, তেমনি conventional equipments and apparatus থাকিবে। দ্বিতীয় প্রকার apparatus দেখিয়া তবেই শিক্ষার্থী improvised apparatus প্রস্তুত করার অনুপ্রেরণা ও কল্পনা অর্জন করিবে। বিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যহের আবহাওয়ার তথ্য-পরিমাপ ও বিবরণ রাখার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলির উপযুক্ত ব্যবহার ও ব্যবহারান্তে উপযুক্ত সংরক্ষণও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার একটি বিশেষ দিক। তাই এই কার্যে ছাত্রদিগকে স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাই ল্যাবরেটরীর রক্ষণাবেক্ষণে পৃথক মাহিনা করা লোকের সংখ্যা যত দূর কমে পারা যায়, তাহা করিতে চেষ্টা করা শিক্ষার দিক হইতেই ভাল। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক ও ছাত্রগণ মিলিয়াই এই কাজ করিতে পারেন ও এই বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ছাত্রকে দায়িত্ব বণ্টন করিয়া দিলে তাহারা ঐ বিষয়ে অনেক কিছু শিখিতে ও অনেক সু-অভ্যাস গঠন করার সুযোগ পাইতে পারে।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী-গৃহ :—

ইহা বিজ্ঞান শিক্ষার অত্যন্ত সহায়ক ব্যবস্থা। শিশুরা পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে যে সব জ্ঞান অর্জন করিবে ও যে সব বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করিবে, তাহা বিবরণ-সহ এখানে রাখিলে সকল শিশু আগ্রহান্বিত ও উপকৃত বইবে। তাহা ছাড়া বিজ্ঞানের নানা অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদীপনাদি ঈক্ষণসহায়ক উপকরণ

সহায়ে শিখিবার ব্যবস্থা প্রদর্শনীগৃহে রাখা যায়। Display tableএ জীবজন্তুর দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন, জলের কৈশিক ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় সাজাইয়া রাখিলে ও আগ্রহী ছাত্রকে বুঝাইয়া দিলে তাহাদের শিক্ষার আগ্রহ জন্মে ও অনেক ধারণাও জন্মে। যদি স্থায়ী প্রদর্শনীগৃহ না থাকে, মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিলেও সুফল পাওয়া যায়।

Hobbies (সখ):—

Hobbies (সখ বা ঝোঁক) প্রায় সব মানুষেরই থাকে। নানা প্রকারের Hobby হইতে পারে—যেমন তাসখেলা প্রভৃতি ব্যসন, খেলোয়াড় প্রভৃতির চিত্র ও জীবনী সংগ্রহ, মুদ্রা, ডাকটিকিট প্রভৃতি বস্তু সংগ্রহ, উপকথা সংগ্রহ, শারীরিক কসরতি শিক্ষা। নানা রকম বৈজ্ঞানিক বিষয়েও Hobby সৃষ্টি করা যায়। যেমন অনেকের বিভিন্ন রকমের পাখী সংক্রান্ত তথ্য ও নমুনাদি সংগ্রহের Hobby থাকে। Photography একটি আধুনিক Hobby। এইরূপ Hobbyকে সহজেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে লাগানো যায়। ভূতত্ত্বের সঙ্গে বস্তু সংগ্রহের Hobbyকে যুক্ত করা সহজ। তেমনি নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী লাভবান হয় বিভিন্ন প্রথা উপকথা প্রভৃতির সংগ্রহ হইতে। শিশুকাল হইতে সংগ্রহাদি Hobby বা Photography প্রভৃতি Hobbyকে বিজ্ঞানের জ্ঞান সঞ্চয়ের উপায়রূপে সংগঠিত করার দিকে পরিচালিত করিলে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফল প্রত্যাশা করা যায়। ইহা দ্বারা ব্যক্তিগত শিক্ষার্থীও যেমন লাভবান হইবে, বিদ্যালয়ও তাহাদের সংগ্রহ হইতে লাভবান হইতে পারিবে।

আলোচনা ও বিতর্ক-সভা :—

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বৈজ্ঞানিক বিষয়েও আগ্রহ সৃষ্টি ও আগ্রহের ও তথ্যের পরিসর বৃদ্ধি বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তথ্যসমূহের ব্যবহারের অভ্যাস গঠন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক-সভার ব্যবস্থা খুবই উপযোগী হইবে। বিতর্কদ্বারা বিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষা কি ভাবে হইতে পারে এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। কিন্তু কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিতর্ক চলিতে পারে। যেমন উদ্ভিদ ও জীব ইহারা কে অপরের উপর বেশী নির্ভরশীল? উদ্ভিদ ও জীব ইহাদের মধ্যে কাহার পরিবেশের সহিত অভিযোজন ক্ষমতা বেশী? ইত্যাদি।

শিক্ষা-ভ্রমণ :—

বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষাভ্রমণের উপযোগিতা ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষায় ইহার উপযোগিতা অপেক্ষা কম নহে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে নদীর ধারে পুষ্করিণীতে পাহাড়ে বনে গাছপালা জীবজন্তু পাখী শিলা শামুক মাছ প্রভৃতির স্বাভাবিক অবস্থান ও পরিবর্তনাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পাঠ লইবে, ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, রাসায়নিক কারখানা, টাকশাল প্রভৃতিতে গিয়া শিক্ষার্থীগণ নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কলাকৌশল প্রভৃতি বিষয়ে বাস্তব ধারণা পাইতে পারে। ভ্রমণে লইয়া যাইবার পূর্বে শিক্ষক ভ্রমণের স্থানে সম্ভাব্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে পূর্বজ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিবেন এবং কি ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয় তাহা বুঝাইয়া দিবেন কিংবা তালিকা করিয়া দিবেন। নতুবা ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হইতে পারে। শুধু বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই নহে, ভ্রমণ-শিক্ষার্থীর নানা দিকের বিকাশ সহায়ক হয়। এখানে আমরা বিজ্ঞান শিক্ষার দিকটিতেই আলোচনা নিবদ্ধ রাখিলাম।

বিজ্ঞানের পাঠদান পরিকল্পনা :—

যে কোনও কাজ পরিকল্পিত আকারে করিলে অধিক সুফল পাওয়া যায়—পাঠদানের ক্ষেত্রে এই সত্যটি আরো বেশী করিয়া প্রযোজ্য। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইহা আরও বেশী প্রযোজ্য। কারণ বিজ্ঞানের পাঠদানের অনেক পদ্ধতি রহিয়াছে এবং এক একটি বিষয় এক এক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে অধিক সুফল পাওয়া যায়। পাঠ্যক্রম ও তাহা সমাপ্তির জন্য সম্ভাব্য সময় এবং উপকরণাদির উপর ভিত্তি করিয়া সর্বাপেক্ষা সুফল পাওয়া যাইবার উদ্দেশ্যে প্রথমেই সমগ্র বৎসরের একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা করা ভাল। নিম্ন তালিকায় তাহা করা যাইতে পারে।

পাঠ্য বিষয়	বৎসরের কোন্ সময়ে পাঠ দেওয়া সুবিধার	কি পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে	প্রয়োজনীয় সময়
(১)			
(২)			
(৩)			

বৎসরের যে কোন সময়ে যে কোনও বিষয়ে পাঠদান সুবিধার না হইতে পারে। যেমন নক্ষত্র আবিষ্কার জন্য বর্ষাকাল অসুবিধাজনক। শরতের শেষ অথবা চৈত্র মাসে ইহা সুবিধার।

ফল সম্বন্ধে পাঠদানে বসন্ত ঋতু সুবিধার। সূর্যের অয়ন গতি বিষয়ে পাঠদান জন্য ডিসেম্বর জানুয়ারী সুবিধার।

অনেক বিষয় শিক্ষার্থীকে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে শিক্ষা দিলে সুফল পাওয়া যায়। যেমন অয়নগতি বিষয়ে ধারণা দিবার জন্য এক মাস ধরিয়া ছায়া পর্যবেক্ষণ করাইলে ভাল হয়। বিভিন্ন দিনের সন্ধ্যা-আকাশে কোনও পরিচিত তারকামণ্ডলীর অবস্থান লক্ষ্য করিতে বলিয়া অন্ততঃ এক মাস পরে পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান সম্ভব হয়। ঐ সব পাঠে পাঠদানের অনেক পূর্ব হইতেই শিক্ষার্থীকে ব্যক্তি-গতভাবে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণগুলি চালাইয়া যাইতে উৎসাহ দিতে হয়। আবহাওয়া সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হইলে বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে সারা বৎসরই যেন সর্বদা সর্বনিম্ন উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বায়ুচাপ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বায়ুর গতি প্রভৃতি বিষয়ে রেকর্ড রাখা হয়, তাহার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। সুতরাং ঐরূপ কাজগুলির জন্যও শিক্ষকের পরিকল্পনা থাকিবে।

পরীক্ষাগার ও প্রদর্শন পদ্ধতি ইত্যাদিতে পাঠ দিবার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা প্রয়োজন। তাই কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্ধতি সহায়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা বৎসরের প্রথমেই নির্ধারিত হওয়া ভাল ও পাঠ-দানের পূর্ব হইতেই উহার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ অথবা improvise করিয়া রাখা প্রয়োজন।

পাঠটীকা :—

সকল বিষয়ের মতই বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পাঠটীকা (Lesson Plan) পূর্বাহ্ণে প্রস্তুত করিয়া তৎপরে পাঠদান করা পাঠদানের সাফল্যলাভকে অনেকখানি সুনিশ্চিত করে। কি ভাবে পাঠটীকা লিখিত হইবে তাহার কিছু ইঙ্গিত এখানে দেওয়া যাইতেছে।

দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ হার্বার্ট অনেক আগে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদানের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—

তাহা হার্বার্ট-এর পঞ্চ-সোপান-পদ্ধতি নামে পরিচিত। ঐ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা হয় ও ঐ ভাবে নূতন জ্ঞানের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয় প্রথম স্তরে। তারপর দ্বিতীয় স্তরে নূতন জ্ঞান প্রদান করা হয়। তৃতীয় স্তরে নূতন জ্ঞানটির সহিত পুরাতন জ্ঞানের তুলনা করা হয়। চতুর্থ স্তরে নূতন ও পুরাতন জ্ঞানের মিলিত সূত্র গঠন করা হয়। পঞ্চম স্তরে ঐ সূত্রটির প্রয়োগ করা হয়। এই পঞ্চসোপান পদ্ধতিটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনাদি ঘটাইয়া সকল বিষয়ের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আজিও প্রয়োগ করার অনেক সুবিধা দেখা যায়। তাই পরিবর্তনসাপেক্ষ বিজ্ঞান শিক্ষাতেও ঐ পদ্ধতিটির কাঠামোটিই শ্রেণী-শিক্ষায় অনুসরণ করা হয়। অবশ্য পর্যবেক্ষণ সাহায্যে শিক্ষায় যখন শিশুরাই শিক্ষাকার্যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, তখন এই ভাবে সোপান বিভাগ করিয়া শিক্ষাদান গৌণ ব্যাপার হইয়া পড়ে। যখন শিক্ষক শিক্ষাদান কার্যে অপেক্ষাকৃত অধিক সক্রিয়তার ভূমিকা গ্রহণ করেন, তখন এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী হয়। বিজ্ঞান শিক্ষায় এই পদ্ধতিগুলি কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা এক্ষণে আলোচনা করা যাক।

প্রথম সোপান :—

আগ্রহ সৃষ্টি করা ও যে জ্ঞানটি প্রদত্ত হইবে তাহার সহায়ক যে যে পূর্বজ্ঞানগুলি উদ্দিষ্ট পাঠ অনুসরণে প্রয়োজন হইবে, সেইগুলিও প্রাথমিক ভাবে স্মরণে আনা। এই ভাবে কি আগ্রহের দিকে কি গ্রহণ-ক্ষমতার দিকে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা হয় বলিয়া এই স্তরটিকে প্রস্তুতির স্তর বলা হয়।

দ্বিতীয় সোপান :—

এই সোপানে নূতন জ্ঞান দেওয়া হইবে। বিজ্ঞান শিক্ষায় এই স্তরে প্রশ্ন বা সমস্যাটি তুলিয়া ধরা হইবে ও তৎপরে শিক্ষার্থীর সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হইবে। তৎপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সমস্যাটির বিভিন্ন দিক বিষয়ে পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হইবে ও ঐ তথ্যগুলি হইতে সমস্যাটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

তৃতীয় সোপান :—

ঐ ভাবে যে পরীক্ষিত সিদ্ধান্তটি পাওয়া গেল তাহার সহিত পূর্ব পূর্ব সিদ্ধান্ত বা জ্ঞানের সঙ্গতি বিচার করা হইবে ও সিদ্ধান্তটির নির্ভুলতা

বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য উহাকে নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেখা হইবে। একটি উদাহরণ হইতে এই স্তরগুলি স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করা গেল।

বিশেষ পাঠ :—

দোলকের দোলন কালের সহিত দোলকের দৈর্ঘ্যের সম্বন্ধ নির্ধারণ।

প্রস্তুতি :—

শিক্ষার্থীদিগের সমস্যাটি জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা ও তাহাদের ঐ সমস্যা বুঝিবার উপযোগী পূর্বজ্ঞানগুলিকে সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রকার প্রশ্নের অবতারণা করা হইবে।

(১) ক্লকগুলিতে একটি করিয়া দোলক থাকে। ঐ দোলক কেন থাকে ?

(২) উষ্ণতা বাড়িলে পদার্থের আয়তনের কি পরিবর্তন হয় ?

(৩) গ্রীষ্মের উত্তাপ বৃদ্ধি হেতু দোলকগুলির দৈর্ঘ্যের কিরূপ পরিবর্তন হইবে ?

(৪) দোলকের দৈর্ঘ্য বাড়িলেও তাহার দোলন-কাল একই থাকে কি ?

উপস্থাপন :—

শেষোক্ত সমস্যাটির সঠিক সমাধান জন্য দোলক লইয়া পরীক্ষার প্রস্তাব আনা হইবে ও কি ভাবে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের দোলকের দোলনকাল নির্ণয় করা সম্ভব তাহা বুঝিতে সাহায্য করা হইবে।

তৎপরে শিক্ষক ছাত্রদের সাহায্যে উপরোক্ত পরীক্ষা করিবেন ও পর্যবেক্ষণ-ফল তালিকা আকারে বোর্ডে লিখিবেন। পরীক্ষার জন্য একটি বব ও সিল্কের দড়িযুক্ত দোলক—যাহার দৈর্ঘ্য বাড়ানো কমানো যায়, একটি stop clock লাগিবে। দোলনকাল নির্ধারণের জন্য কোন্ স্থান হইতে দোলন কাল ধরা ও কোন্ স্থানে আসিলে শেষ করা সুবিধার তাহা বলিয়া দিবেন। একবার দোলনকাল নির্ধারণের পরিবর্তে অনেক বারের কাল হইতে এক বারের গড় বাহির করার সুবিধা বুঝাইবেন। তৎপরে পরীক্ষাটি সম্পন্ন করিবেন।

পরীক্ষার ফল

দোলকের দৈর্ঘ্য	২০ বারের দোলন সময়	১ বারের দোলন সময়	সিদ্ধান্ত
(১)			দোলকের দৈর্ঘ্য বাড়িলে দোলন কাল বাড়ে।
(২)			

সূত্র আবিষ্কার :—

ইহা শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্ভব নহে। শিক্ষক সূত্রটি (দোলন কাল দৈর্ঘ্যের বর্গমূল অনুসারে বাড়ে) বলিয়া দিবেন ও পূর্বোক্ত পরীক্ষালব্ধ পরিমাণগুলি হইতে শিশুরা লক্ষ্য করিবে। যথা—

দোলকের দৈর্ঘ্যের বর্গমূল	দোলন কাল	দৈর্ঘ্যের বর্গ / দোলন কাল	সিদ্ধান্ত
(১)			দোলকের দৈর্ঘ্য ও দোলন কালের অনুপাত সকল ক্ষেত্রে সমান
(২)			

তৃতীয় স্তর :—

উপরোক্ত নিয়মটি জানার পর সাধারণ ঘড়িতে শীত-গ্রীষ্মে দোলকের যে তারতম্য ঘটে তাহা যাচাই করিতে সাহায্য করা হইবে। যে প্রশ্নগুলি ইহার সহায়ক হইবে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) শীতকালে উষ্ণতা বাড়ে না কমে ?

(২) উষ্ণতা কমিলে পদার্থের আয়তনের কি পরিবর্তন হয় ?

(৩) শীতকালে দোলকের দৈর্ঘ্যের কিরূপ পরিবর্তন হইবে ?

(৪) উপরের সূত্র অনুসারে ইহার ফলে দোলকের দোলনকাল বাড়িবে না কমিবে ?

(৫) দোলনকাল কমিলে ঐ দোলকযুক্ত ঘড়ি দ্রুত চলিবে না ধীরে চলিবে ?

(৬) গ্রীষ্মকালে ঐ দোলকযুক্ত ঘড়িটি কিরূপ সময় দিবে ?

অতঃপর ঘড়িতে ইহার প্রতিকার কি ভাবে করা যায় এই সমস্যাটি তুলিয়া পরবর্তী দিনে ইহা আলোচিত হইবে বলিয়া এই পাঠ শেষ করা হইবে।

পাঠ-টীকা

বিদ্যালয় :
শ্রেণী :
ছাত্রসংখ্যা :
গড় বয়স :
শিক্ষক :
তারিখ :

বিষয়—প্রকৃতিবিজ্ঞান।
বিশেষ বিষয়—স্থানীয় আবহাওয়া।
আজকের পাঠ : বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্ধে "প্রাথমিক ধারণা প্রদান—মেঘ-বৃষ্টি বিষয়ে ধারণা প্রদান—আর্দ্রতা বুঝিবার জন্য 'আবহাওয়া ছবি' নির্মাণ কৌশল শিক্ষাদান।

উদ্দেশ্য : **প্রত্যক্ষ**—শিশুদিগকে আবহাওয়া সম্বন্ধে আগ্রহী করতে সাহায্য করা। বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সাহায্য করা।

পরোক্ষ—অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি করা—যুক্তি ও প্রয়োগ শক্তির বিকাশ সাধন।

উপকরণ—টেষ্ট টিউব, স্পীরিট ল্যাম্প, কোবাল্ট ক্লোরাইড ও লবণ জল, ব্লটিং, ছবি (আকাশযুক্ত) ব্লেড, আঠা, বরফ অথবা সোডিয়াম থায়োসালফেট দানা, পাথুরে চুনের টুকরো। চক, ডাষ্টার, খবরের কাগজের আবহাওয়া-সংবাদ।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
	"আগ্রহ সৃষ্টি"	নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির দ্বারা শিশুদিগকে আজকের দিনের আবহাওয়া বিশেষ করে বিকালের দিকে যে খুবই অনিশ্চিত থাকে সে বিষয়ে অবহিত করে খবরের কাগজে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া থাকে তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করানো হবে। আমরা কি আবহাওয়া সম্বন্ধে কিছু পূর্বাভাস নিজেরা পেতে পারি এই প্রশ্নও আনা হবে। শিশুদিগকে নিম্নধরণের প্রশ্ন করা হবে। ১। গত মঙ্গলবারের সন্ধ্যার কথা তোমাদের মনে আছে? কি হয়েছিল বলতো? ২। এখন বিকালের দিকে বেড়ানো নিরাপদ কি? নয় কেন? ৩। বৈশাখ মাসের এইরূপ ঝড় বৃষ্টিকে কি বলা হয়? ৪। বিকালে ঝড়বৃষ্টি হবে কিনা সে খবর কি হতে জানা যায়? খবরের কাগজে ঐ খবর ছাপানো হয় দেখেছ কি? ৫। আমরা নিজেরা ঐ খবর আগে থেকে জানতে পারি এমন কৌশল তোমরা জানো কি?

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
	"পাঠ ঘোষণা" বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা প্রদান—	তারপর ঘোষণা করবো আমি তোমাদের আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানার একটা সহজ কৌশল শিখিয়ে দেব। কিন্তু তোমাদের বেশ ধৈর্য্য ধরে বুঝতে হবে।
উপস্থাপন	মেঘ কিরূপে সৃষ্টি হয়ঃ সূর্য্যের তাপে সমুদ্র নদী খালবিল হইতে জল জলীয় বাষ্পরূপে প্রতিনিয়ত উপরে উঠিতেছে। এই জলীয় বাষ্প উপরে উঠিয়া শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিণত হইতেছে।	ছাত্রদের সাহায্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির দ্বারা মেঘের উৎপত্তির কারণ জানাতে চেষ্টা করব। ১। মেঘ থেকে যে জল বৃষ্টি আকারে মাটিতে নামে, সেই জল মেঘ কোথা থেকে পায়? ২। মেঘ হবার আগে ঐ জল কোথায় কি ভাবে থাকে? ৩। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কি সব সময় একই থাকে? ছাত্ররা আলোচনার পর যখন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবে তখন বোর্ডে লিখবঃ বাতাসে সব সময় কিছু জলীয় বাষ্প থাকে। বাতাসের পক্ষে জলকণার পরিমাণ বেশী হলেই মেঘ শিশির অথবা কুয়াশা হয়।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
	বাতাসে জলীয় বাষ্পের অস্তিত্বের প্রমাণ।	পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সাহায্যে বাতাসে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহা নিম্নের পরীক্ষা-গুলির দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করা হবে। ১। এক খণ্ড চূণ বাতাসের জলীয় বাষ্প টেনে ছ্যাকড়া হয়ে যায়। ২। বাতাসের জল টেনে নুন গলে যায়। ৩। কাঁচের পাত্রে বরফ রাখলে পাত্রের গায়ে যে জলকণা জমে তাহা বাতাসের জলীয় বাষ্পের ঘনীভূত অবস্থা।
	বায়ুর আদ্রতা বাড়িলে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।	এর পর বলা হবে বাতাসে যখন জলীয় বাষ্প বেশী থাকে তখনই মেঘ ঝড়ের সম্ভাবনা বেশী। এই রকম বাতাসকে ভিজা বা আদ্রতা যুক্ত বাতাস বলা হয়। যদি চুন তাড়াতাড়ি ছ্যাকড়া হয়ে যায় বা নুন তাড়াতাড়ি গলে যায় তবে বুঝতে হবে বাতাস ভিজে বা আদ্র ভাব বেশী। এই রকম অবস্থায় একটু ঠাণ্ডা পড়লেই যেমন কাঁচের পাত্রের গায়ে জল জমেছে তেমনি বায়ুমণ্ডলে জলকণা জমবে ও মেঘ অথবা শিশির কিংবা কুয়াশা হবে। তা হলেই বাতাসের ভিজে ভাব বেশী কিনা জানা গেলেই বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা জানা যাবে।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
	২ ভাগ কোবাল্ট ক্লোরাইড ও ১ ভাগ নুন গোলা জলে ব্লটিং পেপার ভিজিয়ে বায়ুর আদ্রতা পরীক্ষা :— উক্ত দ্রবণে ভিজা ব্লটিং পেপারটি যখন স্পীরিট ল্যাম্পের কাছের শুকনো বাতাসে ধরা হবে তখন ব্লটিং পেপারটির রং নীল হবে। আবার যখন বীকারে ফুটন্ত বাষ্পের কাছে এই নীল ব্লটিংটি রাখা হবে তখন ব্লটিংটির রং ক্রমশঃ নীল থেকে লাল হয়ে যাবে।	এরপর কোবাল্ট ক্লোরাইড ও নুন (২ : ১) গোলা জলে ব্লটিং ভিজিয়ে তার দ্বারা আদ্রতার পরিমাণ নির্ণয় করার কৌশল শিখিয়ে দেব ও ছাত্রদিগকে ঐ দ্রবণের সাহায্যে ব্লটিং ভিজিয়ে প্রত্যেককে করতে দেব। ছাত্রদেব হাতে কলমে পরীক্ষা করে বুঝিয়ে দেব যে বাতাসে যখন জলীয় বাষ্প থাকবে অর্থাৎ বায়ুর আদ্রতা যখন বেশী হবে তখন ব্লটিং কাগজটির রং লাল হবে এবং যখন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব কম হয় তখন ব্লটিং কাগজটির রং নীল হবে। এর পর একটা ছড়ার সাহায্যে বিষয়টিকে তাদের আনন্দদায়ক করব। ছড়া :—কোবাল্ট ক্লোরাইড দুই ভাগ নিয়ে, এক ভাগ নুন তায় দাও মিশাইয়ে। জলে গুলে নিয়ে তায় ব্লটিং ভেজাও, আবহাওয়া খবর তাতে আগেভাগে পাও। আদ্রতা কম হলে রঙ হবে নীল, আবহাওয়া ভালো যাবে খুস রাখো দিল। নীলাভ হলেই হতে পারে গোলমাল, ঝড় জল হবে বলে দাওরে সামাল।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
প্রয়োগ		শিশুদিগকে অতঃপর নিম্নলিখিত প্রয়োগ মূলক প্রশ্ন করা হবে। ১। বাতাসের ভিজা ভাব কোথা হতে আসে? ২। বাতাস কিরূপ হলে চুণ তাড়াতাড়ি ছ্যাকড়া হয়ে যায়? ৩। বাতাসে জলীয় বাষ্প আছে তাহা কি ভাবে প্রমাণ পাবো? ৪। কোন ঋতুতে বাতাসের আর্দ্রতা বেশী থাকে? কেন? ৫। তোমরা ব্লটিংটিকে যে দ্রবণে ভিজিয়ে নিলে তাতে কি কি আছে।
	"গৃহকাজ"	অতঃপর ছাত্রদের আগামী সপ্তাহের কোন দিনটি কেমন যাবে তার পূর্বাভাস প্রতিদিন সকালে বিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন বোর্ডে লিখবার জন্য ও প্রতিদিন সেটা পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে দৈনিক কার্যভার দেওয়া হবে।
	"মূল্যায়ন"	

বিদ্যালয় পাঠটীকা

শ্রেণী—৭ম শ্রেণী

বিষয় :—প্রকৃতি-বিজ্ঞান

বিশেষ পাঠ :—বায়ুচলাচল ও বাসগৃহে বায়ুচলাচল ব্যবস্থা

পূর্বজ্ঞান :—বায়ুর উপাদান, দহন ও শ্বাসকার্যে বায়ুর বিশেষ উপাদানের ভূমিকা, বায়ুচাপ।

যে সব অভিজ্ঞতাকে বর্তমান পাঠের সহায়করূপে গণ্য করা হইবে :—জলে অধিকক্ষণ ডুবিয়া থাকায় অসুবিধা, ঝড়, উনুনের গঠন ইত্যাদি—

পাঠের জন্য ব্যবহৃত উপকরণসমূহ :—টেবিল-ল্যাম্প, চিমনী বেলুন, বুনসেন বার্ণার বাতি।

পাঠের উদ্দেশ্য :—**প্রত্যক্ষ**—বায়ুর সঞ্চরণশীলতা ও প্রবলতা এবং বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ বিষয়ে ধারণা প্রদান।

পাঠ-পরিকল্পনা :—

পরোক্ষ :—প্রাকৃতিক পরিবেশ সচেতনা ও ঘটনাবলীর বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন।

১ম স্তর :—পূর্বজ্ঞান ও পূর্বঅভিজ্ঞতা স্মরণে আনিয়া নূতন পাঠের অবতারণা।

পদ্ধতি :—আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্নাবলীর অবতারণা করিয়া পাঠ্য বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা হইবে :—

(১) তোমরা স্নান করিবার সময় জলে ডুব দিয়া কত ক্ষণ থাকিতে পার? বেশী ক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে মানুষ বা ইঁদুরের কি হয়?

(২) মাছ জলের ভিতরেই বাস করে—সে মরে না কেন?

(৩) আমরা যে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি তাহার দ্বারা বায়ুর কোন্ উপাদান গ্রহণ করি ও প্রশ্বাসের সাহায্যে কোন্ উপাদান অধিক পরিমাণে ত্যাগ করি?

(৪) যে বায়ু প্রশ্বাস হিসাবে ত্যাগ করি তাহাই যদি বার বার গ্রহণ করা হয় তবে তাহাতে অক্সিজেনের পরিমাণ কি সমান ভাবেই পাওয়া যাইবে?

(৫) আমরা একটি স্থানেই বার বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে কি ভাবে দীর্ঘকাল অক্সিজেন পাইব—উহার অক্সিজেন ফুরাইয়া যায় না কি?

(৬) তোমরা মঙ্গলবারের ঝড়ে গাছের ডাল-পালা ভাঙ্গিতে দেখিয়াছ—কি বস্তুর শক্তি ঐ ডাল-পালা ভাঙ্গিয়াছে? ব্যায়াম কি ভাবে ঐ শক্তি লাভ করিয়াছে?

(৭) শুধু ঝড়ের সময়েই কি বাতাসের ঐরূপ গতিবেগ থাকে?

বোর্ডের কাজঃ—বায়ু সর্বদাই গতিশীল—ঐ গতিবেগ বৃদ্ধি পাইলে তাহাকে আমরা ঝড় বলি। গতিশীলতা আছে বলিয়া আমাদের শ্বাসবায়ু শুদ্ধ থাকে।

অতঃপর প্রশ্ন করা হইবে, বাতাস কেন ঐরূপ গতিশীল হয়?

২য় স্তরঃ—ইহার উদ্দেশ্য বাতাসের গতিশীলতার কারণ ও ঐ গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণের উপায় বুঝিতে সাহায্য করা।

পদ্ধতিঃ—প্রথমে নিম্ন পরীক্ষাটি দেখানো হইবে ঃ—

পরীক্ষাঃ—একটি জলন্ত চিমনি (অভাবে একটি বুনসেন ল্যাম্পের কিছু উপরে একটি পিজবোর্ডের দু'মুখ খোলা সিলিণ্ডার) লইয়া তাহার উপরে ধূপের ধোঁয়া ও তৎপরে ছোট ছোট কাগজ খণ্ড ধরা হইবে।

নিরীক্ষাঃ—ধূপের ধোঁয়া ও হালকা কাগজ টুকরা উপরের দিকে উঠিতেছে।

বিশ্লেষণঃ—উপরের দিকে উত্থিত বায়ু তাড়িত হইয়াই উহারা উপরে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে

সিদ্ধান্তঃ—তপ্ত বায়ু উপরের দিকে উঠে।

প্রশ্নঃ—উত্তপ্ত বায়ু উপরের দিকে উঠে কেন?

ইহার কারণ অনুসন্ধানার্থ দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ—

একটি বেলুন ঈষৎ ফোলাইয়া তাহাতে তাপ প্রয়োগ করা হইল।

নিরীক্ষাঃ—বেলুনটির আয়তন বাড়িল।

সিদ্ধান্তঃ—বায়ু উত্তপ্ত হইলে তাহার আয়তন বাড়ে।

পূর্ব সিদ্ধান্তের সহিত শেষোক্ত সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধন

বায়ু উত্তপ্ত হইলে তাহার আয়তন বাড়ে—আয়তন বাড়িলে তাহা আশ-পাশের বায়ু অপেক্ষা হাল্কা হয় ও হাল্কা বস্তু মাত্র উপরের দিকে ভাসিয়া উঠিতে চাহে।

শেষোক্ত প্রক্রিয়ার উদাহরণঃ—কাঠ জলে ডুবাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিলে উপরের দিকে ভাসিয়া উঠে, কারণ কাঠ জল অপেক্ষা হালকা।

নূতন প্রশ্ন (বা সমস্যা) অবতারণা ঃ—হাল্কা হইয়া যে বায়ু উপরে উঠিল তাহার স্থানটি কি ভাবে পূর্ণ হইবে ? উহাকে শূন্য রাখিয়া ঐ স্থানের বায়ু উপরে উঠিতে পারে কি ? আশ-পাশের বায়ু ঐ স্থান পুর্ণ করিবার জন্য চাপ দিলে দেখি চাপেই ঐ বায়ু উপরে উঠিতে পারে নতুবা পারে না। যদি আশপাশ হইতে বায়ু আসার পথ না থাকে তাহা হইলে উত্তপ্ত বায়ু উপরে উঠিবে কি ?'

পরীক্ষা ঃ—একটি চিমনী একটি জ্বলন্ত মোমবাতির উপরে এমন ভাবে ধরা হইল যেন তলদেশে ফাঁক না থাকে ।

নিরীক্ষা ঃ—বাতি নিবিয়া গেল—ইহার কারণ অক্সিজেন ফুরাইল—বায়ু চলাচল অভাবেই অক্সিজেন ফুরাইল ।

সিদ্ধান্ত—বায়ু চলাচলের জন্য শুধু বায়ু উত্তপ্ত করিলেই হইবে না— উত্তপ্ত বায়ুর স্থান দখলের জন্য আকাশপথের (শীতল) বায়ু আসার জন্য পথ রাখা দরকার।

পরীক্ষা :—পুর্বে পরীক্ষার চিমনীটির মাথা দুভাগ করিয়া দেওয়া হইল, এখন বাতি জ্বলিতে থাকিবে। দেখা যাইবে, এক মুখ দিয়া ধূপের ধোয়া প্রবেশ করিতেছে ও অন্য মুখ দিয়া বাহির হইতেছে।

সিদ্ধান্ত :—বায়ু প্রবেশ ও বায়ু নির্গমনের দুইটি পৃথক পথ রাখিলে বায়ু চলাচল বাধাহীন হয়।

সমগ্র অভিজ্ঞতাটির সারাংশ রচনা :—

বায়ু-মণ্ডলের বিভিন্ন অংশ অসমান ভাবে উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত বায়ু উপরে উঠে ও তাহা অপেক্ষা শীতল বায়ু ঐ শূন্য স্থান দখল করে। কোনও বদ্ধ স্থানের বায়ুর আগমন ও নির্গমন পথ থাকিলে সেই বায়ু চলাচল করিতে পারে। অন্যথা নহে। বদ্ধঘরে বায়ু চলাচল করিতে পারে না। বায়ু চলাচল না করিলে আমাদের শ্বাস কার্যের অক্সিজেন ফুরাইতে থাকে—আমরা অস্বস্তি অনুভব করি ও পরিশেষে মৃত্যু ঘটিতে পারে। কোনও স্থানের বায়ু আশপাশের বায়ু অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইলে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এই জন্য অগ্নিকাণ্ডের ফলে ঝড়ের সৃষ্টি হয়।

২য় স্তর :—এই স্তরে শিশুদিগকে লব্ধজ্ঞান পরীক্ষার সুযোগ দিবার জন্য প্রয়োগমূলক প্রশ্ন করা হইবে। যথা :—

বায়ু চলাচলের ব্যবস্থার উপযোগিতা আছে এইরূপ কয়েকটি দৈনন্দিন ব্যবহার্য উপকরণের সহিত পরিচিতি :—

(১) গৃহের দরজা-জানালাগুলি সামনা-সামনি রাখা হয় কেন ?

উঃ—বায়ু চলাচলের সুবিধার জন্য প্রয়োজন হইবে (শিক্ষক বুঝাইয়া দিবেন)।

(২) ছাদের নিচে ঘুলঘুলি রাখা হয় কেন ?

(৩) হারিকেন আলোর নিম্নে ও উপরে ছোট ছোট ছিদ্র রাখা হয় কেন ?

(৪) তোমার চিমনির আলো ভাল জ্বলিতেছে না। ইহার কি কারণ হইতে পারে ?

(৫) গৃহস্থ উনানের আঁচ কমাইবার জন্য উনানের নিম্নের ছিদ্রটি চাপা দেয়। উহাতে আঁচ কমে কি ? কেন কমে ?

(৬) ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকার ফলে এক গৃহস্থের লোকজনের মৃত্যু হইয়াছে। ঐ ঘরে কি ব্যবস্থা থাকিলে দুর্ঘটনা নিবারিত হইতে পারিত ?

(৭) ফুঁ বা চাপা না দিয়া কি কৌশলে তোমার চিমনিটি নিভাইয়া ফেলিতে পার ?

চতুর্দশ অধ্যায়

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদান-পদ্ধতি

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা

শরীর সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখাই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠ করিলেই আমরা জানিতে পারি যে, কি রকম খাদ্য পানীয় গ্রহণ করিলে এবং কি রকম স্থানে ও কি রকম গৃহে বাস করিলে এবং কি রকম জীবন যাপন করিলে আমাদের শরীর সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম থাকিবে। তাহা ছাড়া স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠ করিলে আমরা উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অনেক কঠিন রোগের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারি, এমন কি সাধারণ শারীরিক অসুস্থতার প্রাথমিক চিকিৎসাও করিতে পারি এবং নানা সংক্রামক রোগের বিস্তার বন্ধ করিতে পারি। এক কথায় বলিতে গেলে স্বাস্থ্যরক্ষাই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠের একমাত্র উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মগুলির সম্বন্ধে অজ্ঞতাই যে আমাদের দেশবাসীর স্বাস্থ্যহানির ও অনেক রোগ ভোগের প্রধানতম কারণ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। এই অজ্ঞতার জন্যই আমরা অনেক সময় সুলভ পুষ্টিকর খাদ্য না খাইয়া, মুখরোচক দুষ্পাচ্য ও স্বাস্থ্য-হানিকর খাদ্য খাইতে ভালবাসি, দূষিত খাদ্য পানীয় গ্রহণ করিয়া রোগাক্রান্ত হই, আমাদের বাসের জন্য বহু ব্যয়ে অস্বাস্থ্যকর গৃহ নির্মাণ করি, বাসস্থানের চারি দিকে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করি, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া নানা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হই এবং এক এক মহামারীর আক্রমণে সহস্র সহস্র লোক মারা যায়, শত শত প্রসূতি ও শিশু অকালে ধরাধাম ত্যাগ করে, এবং শতকরা আশি জনেরও অধিক স্বাস্থ্যহারা হইয়া শক্তিহীন, উদ্যমহীন, আনন্দহীন, জীবন্মৃত জীবন কাটায়। সুতরাং আমাদের দেশেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের কতিপয় সাধারণ নিয়ম

১। **সকল সময় বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া** স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা না করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে কেবল পুস্তকের সাহায্যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া ইহা ফলদায়ক হয় না। শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য আমাদের কি কি নিয়ম পালন করা উচিত, শরীর পোষণের জন্য আমাদের কি রকম খাদ্য খাওয়া উচিত, বিভিন্ন রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত ইত্যাদি বিষয় বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে।

২। **যত দূর সম্ভব বস্তু, কাজ বা অবস্থা দেখাইয়া স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা** দেওয়া প্রয়োজন। যথা,—কাঁচের গ্লাসে দূষিত ও পরিষ্কার জল রাখিয়া জলের পার্থক্য প্রদর্শন; লেন্স বা আতসী কাঁচের সাহায্যে দূষিত জলের কীটাণু ইত্যাদি প্রদর্শন; গ্রাম্য বা সহরের পুষ্করিণীর নিকট লইয়া গিয়া তাহার জল দূষিত হওয়ার কারণ শিক্ষাদান; দূষিত জল পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া প্রদর্শন; গ্রাম বা সহরের বিভিন্ন স্থানের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখাইয়া তাহার অপকারিতা ও তাহা নিবারণের উপায় শিক্ষাদান ইত্যাদি।

৩। যে সকল বিষয় কার্যতঃ প্রদর্শন সম্ভব নহে, **অন্ততঃ তাহাদের ছবি** দেখাইয়া বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। ম্যাজিক-লেন্টার্নের সাহায্যে বর্ণনা দেওয়া গেলে ছাত্রদের আরও ভাল শিক্ষা হয়।

৪। অল্পবয়স্ক ছাত্রগণকে **গল্পের সাহায্যেও নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়**। যথা,—এক ছেলে যেখানে যাহা পাইত তাহাই খাইত। একবার দূষিত খাদ্য খাইয়া সে কলেরায় আক্রান্ত হয় ও মরণাপন্ন হয়। অন্য এক ছেলে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকার ফলে পাঁচড়ায় আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল কষ্ট পায় এবং সকলের নিকট ঘৃণার্হ হয় ইত্যাদি।

৫। **যে সময়ে যে সকল নিয়ম পালন করা** প্রয়োজন সে সময়ে সে সকল নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণ তাহা মনোযোগের সহিত শিক্ষা করে। যথা,—বিভিন্ন ঋতুতে যে সকল রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা তখন তাহাদের নিবারণের উপায়, রোগী শুশ্রূষার নিয়ম ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া উচিত।

৬। **নিম্ন শ্রেণীতে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি ব্যাখ্যা ও বর্ণনার সাহায্যে** শিক্ষা দেওয়া যায়, প্রথমেই তাহাদের কারণ শিক্ষা দেওয়া যায় না। পরে উচ্চ শ্রেণীতে তাহাদের কারণও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

৭। **উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে শরীরের গঠন ও কাজ** সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন। চিত্র ও মডেলের সাহায্যেই এই জ্ঞান দেওয়া যায়।

৮। **স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠন**। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালনের ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রগণের যত বেশী সম্ভব স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠন করিয়া দিতে হইবে। ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনে তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন করিতেছে কি না তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহাদের খাদ্য, পানীয় ও জীবন-যাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে কোন দোষ পরিলক্ষিত হইলে, অভিভাবকদের সহযোগিতায় তাহা সংশোধন করিয়া দিতে হইবে। **বস্তুতঃ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-অনুমোদিত জীবন যাপন করিতে** অভ্যস্ত করাই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রধান উপায় ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৯। **সময় সময় ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার** ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন এবং তাহাদের কোন শারীরিক দোষ (defect) বা রোগ ধরা পড়িলে তাহার প্রতি অভিভাবকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত।

১০। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা করার জন্য কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রকে লইয়া একটা **স্বাস্থ্য-পরিষদ গঠন** করা যায় এবং পরিষদকে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া যায়। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে শিক্ষক ও ছাত্রগণ গ্রামে বা নগরের স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় রাখার জন্য সাহায্য করিতে পারে।

বিভিন্ন স্তরে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদান

প্রাথমিক স্তর। এই স্তরে প্রথমে **শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কতকগুলি দৈনন্দিন কার্য করিতে**

শিক্ষা দিতে হইবে। যথা,—প্রাতে হাত-মুখ প্রক্ষালন, দন্ত-মার্জন, নির্দিষ্ট সময়ে মল-মূত্র ত্যাগ ; ঠিক ভাবে বসা ও হাঁটা ; নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজন মত চর্বণ করিয়া খাদ্য গ্রহণ ; কেবল বিশুদ্ধ জল পান ; জামা-কাপড় পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। ইহার পর **ছবির সাহায্যে বর্ণনা দিয়া এবং গল্প বলিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি শিক্ষা দিতে হইবে।** বর্ণনা দেওয়ার ও গল্প বলার পর ছোট ছোট ছড়ার আকারে নিয়মগুলি শিক্ষা দিলে শিশুগণ সহজে মনে রাখিতে পারিবে। নিয়মগুলি কাগজে বড় বড় অক্ষরে সুন্দর ভাবে লিখিয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া যায়। সময় সময় ছাত্রগণকে স্বাস্থ্য-রক্ষার সহিত সম্পর্কযুক্ত নানা বস্তু ইত্যাদি সাজিয়া অভিনয় করিতেও দেওয়া যায়। সর্বোপরি শিশুগণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি দৈনন্দিন জীবনে পালন করিতেছে কিনা তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রকৃতপক্ষে শিশু বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পর হইতেই যাহাতে সে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে অভ্যাসগুলি নিজের জীবনে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে এইরূপ অবস্থার ও পরিবেশের সৃষ্টি প্রথম হইতেই করিতে হইবে। শিশুরা প্রথমে কিছু দিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সমবেত প্রার্থনা হইয়া যাইবার পরই নিজেদের নির্বাচিত শিশু-ডাক্তার দ্বারা প্রতিদিন দাঁত, মুখ, নখ, হাত, পা ইত্যাদি পরীক্ষা করাইবে। শিশু-ডাক্তার প্রতিদিন বদল করা যায়, বা এক সপ্তাহের জন্যই সে এইরূপ পরীক্ষা করিবার দায়িত্ব লইয়া থাকিতে পারে। ইহাতে সকলেরই দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। সকলেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা করিলেই স্বাস্থ্যরক্ষা করা চলে না যদি সমাজগত স্বাস্থ্যরক্ষার কথা চিন্তা না করা যায়। এই কারণেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 'সাফাইয়ের' উপর প্রথম হইতেই খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। শিশুরা নিজেদের শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয়ের সমস্ত স্থান আশপাশ ইত্যাদি পরিষ্কার করিবে। সাফাই তাহাদের জীবনের একটি অংশবিশেষ এই হিসাবেই তাহারা ঐরূপ কাজ করিবে। শুধু তাহাই নয়, শিশুরা প্রথম হইতেই বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বৎসরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে 'গ্রাম সাফাই' করিতে যাইবে। এই সাফাইয়ের মধ্য দিয়াই তাহারা হাতে-কলমে নানা ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার তাৎপর্য বুঝিতে পারিবে।

মধ্য স্তর। প্রাথমিক স্তরের ন্যায়, এই স্তরের ছাত্রগণও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অভ্যাসসমূহ গঠন করিবে। এই স্তরের ছাত্রগণ বিভিন্ন খাদ্যের

গুণাগুণ, জল দূষিত হইবার কারণ ও পরিষ্কার করিবার উপায়, নানা রোগের কারণ এবং তাহাদের নিবারণের উপায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা করিবে ; শিক্ষক সাহায্য করিবেন। তাহা ছাড়া এক্ষণে বাড়ী, বিদ্যালয় ও গ্রামে স্বাস্থ্যকর অবস্থা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং উপায়ও শিক্ষা দিতে হইবে। নানা ছবি ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে বর্ণনা, পরীক্ষা ও প্রদর্শন (demonstration), স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা পর্যবেক্ষণ প্রভৃতিই এই স্তরে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রধান প্রধান উপায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ অধিকতর যত্নের সহিত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন করিতেছে কিনা তাহার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সময় হইতে ছাত্রদের দ্বারা রোগের সেবার কাজ করিতে উৎসাহ দান করা উচিত। নিজের রোগের প্রতিষেধক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া (যথা টীকা, ইনজেকসন লইয়া) রোগীর সেবার কাজ করিতে অগ্রসর হইতে পারে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তর। এই স্তরে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অধিকতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন। **পরীক্ষা, প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ** এবং **সেবামূলক কাজই** ইহার প্রধান উপায়। প্রত্যেক বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া কারণসহ শিক্ষা দিতে হইবে। যথন সম্ভব হয় কার্যতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে হইবে। অন্ততঃপক্ষে ছাত্রগণকে নিজে পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং হাতে-কলমে কাজ করিয়া শিক্ষা করিতে দিতে হইবে। যথা,—বাষ্পে পরিণত করিয়া জল বিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়া প্রদর্শন। অনুবীক্ষণ বা আতসী কাচের সাহায্যে দূষিত জল বা খাদ্যের কীটাণু ও নানা রোগের কীটাণু প্রদর্শন ; চিত্র ও মডেলের সাহায্যে শরীরের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান দান ; নানা খাদ্য-পানিয়ের উপাদান এবং শরীরে তাহাদের কাজ ; নানা রোগের কারণ ও তাহাদের আক্রমণে শরীরের ক্ষতি ; ম্যালেরিয়া বিস্তারকারী মশার উৎপত্তি ও আকৃতি এবং তাহাদের বিনাশের প্রয়োজনীয়তা ; বায়ু দূষিত হওয়ার কারণ ও দূষিত বায়ু সেবনের অপকারিতা, বিদ্যালয়ের চারি পার্শ্বে, গ্রামে বা নগরে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সৃষ্টির কারণ ও প্রতিকার এই স্তরে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর প্রধান প্রধান বিষয়। ইহা ছাড়া গ্রামে বা নগরে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং তথায় স্বাস্থ্যকর অবস্থা রক্ষার কাজে সাহায্য করাও এই স্তরের ছাত্রের কর্তব্য। এই স্তরে ছাত্রেরা অতি অবশ্য গ্রামে কাহারও রোগ হইলে, তাহার সেবা করিতে পালা করিয়া অগ্রসর হইবে।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের পাঠটীকা

তারিখ— **বিদ্যালয়—**

শিক্ষক— **শ্রেণী—**৫ম।

বিষয়—স্বাস্থ্যরক্ষা। **সময়—**৪০ মিনিট।

সাধারণ পাঠ—সংক্রামক রোগ।

বিশেষ পাঠ—ওলাউঠা রোগ।

উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ—ওলাউঠা রোগ ও তাহা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান দান।

পরোক্ষ—শরীর রোগমুক্ত রাখার উপায় শিক্ষাদান, চিন্তা ও বিচারশক্তির বিকাশ।

উপকরণ—কলেরা রোগীর চিত্র, আহারের উপর মাছি বসিবার চিত্র, আতস কাঁচ, পরিষ্কার ও অপরিষ্কার জলের গ্লাস ইত্যাদি।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
১ম	(ক) পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা। (খ) নূতন পাঠের সূচনা ও লক্ষ্য ঘোষণা।	প্রয়োজন মত শ্রেণীবিন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিব এবং তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নূতন পাঠের সূচনা করিব :— (১) সংক্রামক রোগ কাহাকে বলে ? (২) কয়েকটি সংক্রামক রোগের নাম বল। (৩) ওলাউঠা রোগীকে কি দেখিয়াছ ? (৪) কেন এ রোগ হয় ? (ইহার উত্তর দিতে না পারিলেও ইহাতে তাহাদের তাহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিবে)। আজ আমরা ওলাউঠা রোগের আক্রমণের কারণ ও তাহা নিবারণের উপায় শিক্ষা করিব।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
২য়	শীর্ষ বিভাগ ও এক শীর্ষের বর্ণনা। (ক) **ওলাউঠা রোগের লক্ষণ।** সারাংশ :—ঘন ঘন পাতলা বাহ্য ও বমন হওয়া, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, প্রচুর ঘাম, দ্রুত অবসন্নতা ও অনেক স্থলে মৃত্যু। এক জনের শরীর হইতে অন্যের শরীরে এই রোগ যায় এবং ইহাতে অনেক লোকের মৃত্যু ঘটে বলিয়া ইহাকে সংক্রামক মারাত্মক রোগ বলে।	বিষয়টি পার্শ্বলিখিত ৩ শীর্ষে বিভক্ত করিব ও এক এক শীর্ষের বর্ণনা দিব প্রথমে একটা কলেরা রোগীর চিত্র দেখাইয়া রোগের লক্ষণগুলি বর্ণনা করিব। যে সকল ছাত্র কলেরা রোগী দেখিয়াছে, তাহাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া তাহাদিগকে সহ-যোগিতা করিতে উৎসাহ দিব। ইহাকে সংক্রামক ও মারাত্মক কেন বলে বুঝাইয়া দিব। অবশেষে নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে পুনরালোচনা করাইয়া ছাত্রগণের সহযোগিতায় সারাংশ তৈয়ার করিব এবং বোর্ডে তাহা লিখিয়া দিব। ছাত্রগণকে তাহা নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া লইতে বলিব এবং তাহারা লিখিয়া লইতেছে কিনা দেখিব :— পুনরালোচনার প্রশ্ন :— (১) ওলাউঠা রোগের লক্ষণ কি কি ? (২) কিরূপে রোগীর মৃত্যু ঘটে ? (৩) ইহাকে সংক্রামক ও মারাত্মক রোগ বলে কেন ?
	(খ) **রোগাক্রমণের কারণ।** সারাংশ :—এক প্রকার জীবাণুর দ্বারা মানুষের এই রোগ হয়। সাধারণতঃ খাদ্য-পানীয়ের দ্বারাই এই জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে এবং ওলাউঠা রোগের সৃষ্টি করে। ওলাউঠা রোগীর ঘাম এবং মলমূত্রে ইহার বেশী জীবাণু থাকে এবং তাহার দ্বারাও রোগ বিস্তার লাভ করে।	(খ) পদ্ধতি পূর্ববৎ। (১) কলেরা রোগাক্রমণের কারণ কি ? (২) সাধারণতঃ কিরূপে এই রোগের জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে ? (৩) আর কিরূপে এই রোগ বিস্তার লাভ করিতে পারে ?

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি
	(গ) রোগ নিবারণের উপায়। সারাংশ :—বিশুদ্ধ খাদ্য খাওয়া বিশুদ্ধ জল পান করা। পটাশ পার্মাঙ্গেনেট দিয়া পুকুর বা কুপের জল বিশুদ্ধ করা। পানীয় জল অন্ততঃ আধ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লওয়া। খাদ্য পানীয় অনাবৃত না রাখা এবং তাহাতে মাছি বসিতে না দেওয়া। কাঁচা ফল, পচা মাছ-মাংস, দূষিত বা গুরু পাচ্য খাদ্য না খাওয়া, খালি পেটে না থাকা, খাওয়ার পূর্বে হাত-মুখ ভালরূপে ধুইয়া ফেলা। কাহারও এই রোগ হইলে তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা, বাড়ীর অন্যান্য সকলকে কলেরার টীকা দেওয়া। রোগীর কাপড় ও বিছানা পটাশ-পার্মাঙ্গেনেটের জলে ধুইয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া বা পুড়িয়া ফেলা, মলমূত্রে পটাশ পার্মাঙ্গেনেট বা কার্বলিক এসিড দিয়া মাটিতে পুতিয়া ফেলা।	(গ) পদ্ধতি পূর্ববৎ। আতসী কাঁচের সাহায্যে বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ জলের পার্থক্য প্রদর্শন, এবং খাদ্যে মাছি বসিবার চিত্র প্রদর্শন। পুনরালোচনার প্রশ্ন :— (১) পানীয় জল বিশুদ্ধ করার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়? (২) মাছির দ্বারা কিরূপে কলেরা রোগের বিস্তার হয় এবং তাহার প্রতিকারের জন্য কি করা উচিত? (৩) কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে কি কি খাওয়া উচিত নহে? (৪) রোগীর কাপড় বিছানা কিরূপে জীবাণুমুক্ত করা যায়? (৫) রোগীর মলমূত্র দ্বারা রোগ বিস্তার কিরূপে বন্ধ করা যায়?
৩য়	পুনরালোচনা।	নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে সমস্ত পাঠের পুনরালোচনা করাইব :— (১) ওলাউঠা রোগীর অবস্থা বর্ণনা কর। (২) কিরূপে এই রোগের আক্রমণ হয় ও বিস্তার হয়? (৩) এই রোগের আক্রমণ ও বিস্তার নিবারণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়?
৪র্থ	গৃহকাজ নির্দেশ	কলেরা রোগ নিবারণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যায় তাহার বিস্তারিত বর্ণনা লিখিয়া আনিতে বলিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়

হাতের কাজ ও শিল্প শিক্ষা

হাতের কাজ ও শিল্প এই উভয় শব্দের অর্থ এক নহে। প্রতি শিল্পেরই শিক্ষা দিবার বিশেষ বিশেষ ধারা বা কৌশল আছে। হাতের কাজ বলিতে শিল্পকাজ সহ যে কোন শারীরিক পরিশ্রমজনিত কাজের কথা বুঝিতে পারা যায়। হাতের কাজ যে শুধু শিল্পতেই নিবদ্ধ থাকিবে তাহা নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কার্ডবোর্ডের অনেক কাজ, সূচীর অনেক কাজ ইত্যাদি শিল্পকাজ নহে, ইহারা হাতের কাজ। কিন্তু কার্ডবোর্ডের কাজ, ও সূচীর কাজ সাধারণভাবে শিল্পকাজ। কতকগুলি হাতের কাজ, হস্তচালনে দক্ষতা অর্জন করিতে সাহায্য করিলেও উহাদের প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণীয় মূল্য খুবই কম। কিন্তু তবুও শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজের বিশেষ স্থান আছে। শিশুরা যখন কোনও প্রকার কর্ম করিতে আগ্রহ বোধ করে, তখন তাহারা শিল্প শিক্ষাকালে যে ভাবে প্রত্যেকটি স্তর আয়ত্ত করিয়া অগ্রসর হয়, সেইরূপে কোন দক্ষতা অর্জন করিবার সুযোগ এখানে তাহারা পায় না, অথচ কর্মের মধ্যে কোন রূপ হাতের কাজ বা Handwork থাকিলে তাহা সুসম্পন্ন না করিলে কার্যের গতিও ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব কোন একটি কাজ করিতে অগ্রসর হইলে শিশুরা যে-সব হাতের কাজ করিবে তাহাতে তাহাদের অঙ্গুলী সঞ্চালনে সম্বন্ধীয় দক্ষতা অর্জন করা কিছু পরিমাণে সম্ভব হইবে।

শিল্প শিক্ষাদান-পদ্ধতি

পূর্বকালে কেবল শিল্পী বা শ্রমিকগণের ছেলেমেয়েরাই হস্তশিল্প শিক্ষা করিত। ইংরেজ দার্শনিক **লকই** (Lock) প্রথমে সকল ছেলেমেয়েদের হস্তশিল্প শিক্ষা দিতে বলেন। মনস্বী **রুশো** শ্রমিকদিগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন করিবার জন্যই সকল ছাত্রকে হস্তশিল্প শিক্ষাদানের পরামর্শ দেন। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ **পেষ্টালজিই** সর্বপ্রথম সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে, বিশেষতঃ শিশুর মানসিক বিকাশের সাহায্য করিবার জন্য শিল্পশিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। **ফ্রোয়েবেল** শিশুকে হাত ও চক্ষুর

ব্যবহারের দক্ষতা দানের জন্য তাঁহার কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে হস্তশিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। বর্তমান সময়ে প্রধানতঃ পেষ্টালজি ও ফ্রোয়েবেল বর্ণিত উদ্দেশ্যই সমস্ত উন্নত দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। **মহাত্মা গান্ধী** ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় কোন কোন শিল্পকে কেন্দ্র করিয়াই প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।

শিল্প শিক্ষাদানের প্রধান প্রধান লক্ষ্য

(১) **হস্ত ও চক্ষুর ব্যবহারে দক্ষতা দান।** প্রত্যেক শিল্পের কাজে শিশুকে সেই শিল্পের প্রত্যেকটি বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও হাতে কলমে কাজ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। শিল্প কাজে কর্মের প্রত্যেকটি স্তরকে শিশু আয়ত্ত করিবে, তবেই হইবে শিশুর শিল্পশিক্ষা। কর্মের ফলে হস্ত ও চক্ষুর ব্যবহারে দক্ষতা লাভ হয় এবং তাহা বাস্তব জীবনের অনেক কাজে সাহায্য করে।

(২) **ইহা শিশুর মানসিক বিকাশে অত্যধিক সাহায্য করে।** বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পের কাজ করিলে চিন্তা, কল্পনা ও বিচারশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হয় এবং ফলে তাহাদের বিকাশ হয়। ইহা ছাড়া মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রগুলির বিকাশ (development of the higher brain centres) যে সকল সঞ্চালক কেন্দ্র (motor centres) কাজ নিয়ন্ত্রিত করে তাহাদের বিকাশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং শিল্প কাজের দ্বারা সঞ্চালক কেন্দ্রগুলির বিকাশ হয় বলিয়া, ইহার দ্বারা মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রগুলির বিকাশেরও সাহায্য হয়। এই জন্য অল্পবয়সে শিশুগণকে শিল্প কাজ শিক্ষা দেওয়া হইলে, তাহার দ্বারা তাহার মানসিক বিকাশেরও অত্যধিক সাহায্য হয়। সুতরাং কেবল ইহার জন্যও শিশুগণকে কোন শিল্প শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্তব্য।

(৩) **ইহা ছাত্রকে প্রয়োজন হইলে পরে কোন শিল্পের সাহায্যে জীবিকার্জনের জন্যও প্রস্তুত করে।** অবশ্য বিশেষ ব্যবস্থা না করিয়া সাধারণ বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক শিশুকে এরূপ দক্ষতার সহিত কোন শিল্প শিক্ষা দেওয়া যায় না, যাহার সাহায্যে সে জীবিকার্জন করিতে পারে। কিন্তু এই স্তরে কোন শিল্প শিক্ষার ফলে তাহার প্রতি ছাত্রের একটা স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মে এবং পরে (মধ্য বিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষা-লাভের পরে ১৩।১৪

বৎসর বয়সে) সে সামান্য চেষ্টায় তাহা অধিকতর দক্ষতার সহিত শিক্ষা করিতে পারে এবং জীবিকার্জনের জন্য অবলম্বন করিতে পারে।

(৪) **ইহার দ্বারা শারীরিক পরিশ্রমের মর্যাদাও শিক্ষা হয়।**

(৫) ইহা **ছাত্রকে অধিকতর কাজের লোক করে** এবং তাহার চঞ্চলতা হ্রাস করে।

(৬) যাহারা প্রায় সকল সময় লেখাপড়ার কাজ বা মানসিক কাজ করে তাহাদের পক্ষে **শিল্পকাজ একটা আনন্দদায়ক ও মঙ্গলজনক পরিবর্তন হয়।**

(৭) ইহা **শিশুকে সৃষ্টির আনন্দ দান করে।**

(৮) ইহা **বস্তুপাঠ, প্রকৃতিপাঠ, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার সাহায্য করে।**

এই সকল উপকারের জন্য প্রায় সমস্ত উন্নত দেশের বিদ্যালয়সমূহে শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

শিল্প শিক্ষাদানের কতিপয় নিয়ম

(১) **প্রথম হইতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সহিত হাতের কাজ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে** এবং দেখিতে হইবে যে শিল্প কাজ করিবার সময়ে শিশু যেন তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ বা শরীর ময়লা না করে। হাফপ্যাণ্ট এবং হাফসার্ট পরিয়াই শিল্প কাজ করিতে দেওয়া ভাল। হাফপ্যাণ্ট না থাকিলে কাপড় মালকোচা দিয়া পরিতে পারে।

(২) শিল্প কাজের জন্য যে সকল জিনিষ ব্যবহৃত হয় তাহাদের **অপচয় নিবারণের দিকেও সর্বদা দৃষ্টি** রাখিতে হইবে। প্রথম হইতে ছাত্রগণকে মালমসলার মিতব্যয়িতা শিক্ষা না দিলে তাহারা কখনও কোন শিল্প-কার্য করিয়া লাভবান হইতে পারিবে না।

(৩) কোন যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া **কেবল হাতের দ্বারা যে সকল** জিনিষ প্রস্তুত করা যায় প্রথমে কেবল সেই সকল জিনিষ প্রস্তুত করিতে দিতে হইবে। যথা,—মাটির জিনিষ, কাগজ কাটিয়া বা ভাজ করিয়া বা কার্ডবোর্ডের সাহায্যে নানা জিনিষ, বেতের ও বাঁশের জিনিষ প্রস্তুত করা ইত্যাদি। হাতের ব্যবহারে কিছু দক্ষতা অর্জনের পর যন্ত্রের ঠিক ব্যবহার শিক্ষা দিয়া তাহার সাহায্যে নানা জিনিষ প্রস্তুত করিতে দেওয়া যায়।

(৪) **প্রথমে কোন শিল্পকার্যে** দক্ষতা লাভ হইলে দক্ষতার সহিত হাত ও চক্ষুর ব্যবহার শিক্ষার দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিয়া হস্তশিল্প শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার পর ভাল জিনিষ প্রস্তুত করার বা কোন শিল্পকার্যে দক্ষতা লাভের দিকেও লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে দেওয়া প্রয়োজন। তাহা না করিলে ছাত্রের নিকট কাজটি উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া পড়িবে। শিশু হাত ও চক্ষুর ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন, মানসিক বিকাশ প্রভৃতি লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে না। ভাল জিনিষ প্রস্তুত করার লক্ষ্য সামনে রাখিয়াই সে কাজ করিতে পারে এবং তাহাকে তাহা করিতে দেওয়া উচিত। এমন কি, তাহার জন্য ছাত্রগণের মধ্যে সহানুভূতিসূচক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা কর্তব্য। তাহা হইলেই ছাত্রগণ অধিকতর উৎসাহের সহিত শিল্পকার্য শিক্ষা করিবে।

(৫) **যাহাতে বিভিন্ন আকার সম্বন্ধে** ছাত্রের পরিষ্কার ও সঠিক ধারণা জন্মে এবং বিভিন্ন জিনিষে সেই আকার দানের শক্তি লাভ হয় সেই ভাবে শিল্প শিক্ষা দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে ছাত্রকে ধাপে ধাপে ভালরূপে আদর্শ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এবং নির্মাণ-কৌশল শিক্ষা করিতে দেওয়া প্রয়োজন। তাহার আকার, আয়তন, বিভিন্ন অংশের অনুপাত প্রভৃতি বিশেষ ভাবে স্তরে স্তরে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে দিতে হইবে। তাহার পর আদর্শের সহিত পদে পদে তুলনা করিয়া তাহার প্রতিকৃতি তৈয়ার করিবে। ছাত্রগণ যতই সূক্ষ্মভাবে আদর্শ পর্যবেক্ষণ করিতে শিখিবে তাহারা ততই ভাল প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতে পারিবে।

(৬) **প্রথম প্রথম আদর্শের অনুকরণ** করিয়াই জিনিষ প্রস্তুত করিবে। তাহার পর ছাত্র শিল্পকাজে দক্ষতা অর্জন করিলে ক্রমশঃ চিন্তা করিয়া, বিচার করিয়া ও কল্পনার সাহায্যে জিনিষ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিবে। কেননা কেবল অনুকরণ করিয়া ভাল জিনিষ প্রস্তুত করিলেও তাহার দ্বারা শিশুর মানসিক বিকাশের সাহায্য হইবে না।

(৭) যত শীঘ্র সম্ভব **অঙ্কন বিদ্যার সহিত শিল্পকার্যের সম্পর্ক** স্থাপন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে কোন জিনিষের চিত্র আঁকিয়া তাহার পর তাহার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতে দেওয়া যায়। সে কোন জিনিষ প্রস্তুত করার পূর্বে তাহার নক্সা বা রেখাচিত্র আঁকিতে দেওয়া কর্তব্য।

(৮) যে সকল জিনিষের সহিত ছাত্রগণ **সুপরিচিত** সেই সকল জিনিষ, বা তাহার শ্রেণীয় অন্যান্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত জিনিষই তাহাদিগকে প্রস্তুত

করিতে দেওয়া উচিত। যে স্থানে যে শিল্পের কাজ বেশী হয় তথাকার বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে সেই শিল্প শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

(৯) **শিল্প শিক্ষাদানকালে বিভিন্ন বিষয়সমূহ সমবায় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হইবে।**

বিভিন্ন স্তরের উপযুক্ত কাজ

প্রাথমিক স্তর। এই স্তরে প্রথমে ভূমিতে বা বড় কাষ্ঠপাত্রে কতকগুলি বালু রাখিয়া শিশুগণকে তাহাদের ইচ্ছামত আকার তৈয়ার করিতে দেওয়া যায়। তাহার পর আদর্শ দেখিয়া কাদা মাটির দ্বারা সাধারণ জিনিষ তৈয়ার করিতে দেওয়া যায়; ইহা ছাড়া কাগজ কাটিয়া বা ভাঁজ করিয়া বিভিন্ন জিনিষ তৈয়ার করিতে, তকলিতে সূতা কাটিতে আরম্ভ করিতে, কার্ডবোর্ডের বা কাঠের টুকরার সাহায্যে নানা জিনিষ তৈয়ার করিতে দেওয়া যায়। এই স্তরের শেষের দিকে সাধারণ বেতের জিনিষ, বাঁশের জিনিষ তৈয়ার করিতে দেওয়া যায় এবং বাগানের কাজও আরম্ভ করা যায়।

মধ্য বাংলা স্তর। এই স্তরেই বেতের কাজ বা বাঁশের কাজ ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়। কার্ডবোর্ডের কাজ এবং কাঠের কাজও এই স্তরে আরম্ভ করা যায়। ইহা ছাড়া এই স্তরে ভাল করিয়া সূতা কাটা এবং বয়ন কাজ শিক্ষা দেওয়া যায় এবং বাগানের কাজ করিতে দেওয়া যায়। কোন কোন ধাতুর কাজও এই স্তরে আরম্ভ করা যায়। যাহাদের পাঠ্য-জীবন এই স্তরে শেষ হইবে, তাহাদিগকে এক বৎসর অতিরিক্ত রাখিয়া একটা শিল্পে বিশেষ শিক্ষা (special training) দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলে তাহারা পরে তাহা অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তর। এই স্তরের বিদ্যালয়ে স্থানীয় ২।৩টা শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়। কাঠের কাজ খুব শিক্ষাপ্রদ বলিয়া সকল বিদ্যালয়ে ইহা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। ইহা ছাড়া সকল গ্রাম্য বিদ্যালয়ে কৃষিকার্য শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে সকল ছাত্রকে বাগানের কাজ বা কৃষি-কাজ শিক্ষা দেওয়া এবং কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বয়ন কাজ, সেলাই কাজ, এবং নানা ধাতুশিল্পও এই স্তরের ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া যায়। মেয়েদের জন্য এ স্তরে সেলাই কাজ, কাপড়ের উপর ফুল তোলা, কাঠির সাহায্যে জামা

বুনন, তাঁতের কাজ প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায় এবং সকল মেয়েদের রন্ধন-কার্য শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

এই স্তরে প্রত্যেক ছেলেকে কৃষিকার্যের অতিরিক্ত একটা শিল্প-কাজ এবং প্রত্যেক মেয়েকে রন্ধন কার্যের অতিরিক্ত একটা শিল্প-কাজ বাছিয়া লইতে দেওয়া যায়।

শিল্প-কার্যে দক্ষতা দেখাইতে পারিলে ছাত্রেরা ১১+বয়সে নিম্ন শিল্প স্কুল এবং ১৪+বয়সে উচ্চ শিল্প স্কুলে যাইয়া ইচ্ছা করিলে ভর্তি হইতে পারিবে। সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় ইহার ব্যবস্থা থাকিলেও ইহা এখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

শিল্প-শিক্ষক। অনেক সময় সাধারণ কাঠের মিস্ত্রি, ধাতুর মিস্ত্রি, তন্তুবায় প্রভৃতির উপর ছাত্রগণকে শিল্পগুলি শিক্ষাদানের ভার দেওয়া হয়। ইহা মোটেই সমীচীন নহে। কেননা, তাহারা শিক্ষাপ্রদভাবে ছাত্রের মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিল্প-শিক্ষা দিতে পারে না। তাহা ছাড়া শিল্প-শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধিত শিক্ষাও তাহারা দিতে সক্ষম হয় না। ইহার ফলে বিদ্যালয়ের হস্তশিল্প শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। সুতরাং ফলপ্রদভাবে হস্তশিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইলে ট্রেনিং কলেজ ও স্কুলসমূহেই শিক্ষকগণকে এক একটা হস্তশিল্প শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন এবং তাহাদের উপরেই বিদ্যালয়ে এক এক শিল্প শিক্ষাদানের ভার দেওয়া প্রয়োজন। [১]

References

1. E. A. Macnee—Instruction in Indian Secondary School Chapter XIII
2. Percival R. Cole—Principles and Methods and Technique of Teaching, Chapter XXV.
3. J. Welton—Principles and Methods of Teaching—Chap. XIV
4. J. Adams—New Teaching, Chap XI
5. Kunja Behari Har—বিশেষ পদ্ধতি।
6. The Education of the Ordinary Child by John Duncan.

১ New Teaching by J. Adams. p. 354

ষোড়শ অধ্যায়

অঙ্কন (Drawing) শিক্ষাদান-পদ্ধতি

চিত্রাঙ্কণ ও নয়া শিক্ষা

চিত্রাঙ্কন শিক্ষা ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দশক হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু উহা শিক্ষা দিবার রূপ ছিল আদিষ্ট কর্মের অনুরূপ। শিক্ষক যে মডেল বা আদর্শ, কিংবা ছবি বা বস্তু শিশুর নিকট বা ছাত্রছাত্রীর নিকট স্থাপন করিতেন, সেই মডেল বা ছবি বা বস্তু শিশুকে হুবহু নকল করিয়া অঙ্কন করিতে হইত। সামান্য ভুলত্রুটিরও কোন মাপ ছিল না। আদিষ্ট কর্মের মধ্যে যেরূপ চাপ বর্তমান, সেইরূপ চাপ অঙ্কন শিক্ষায় ছিল বলিয়া শিশুরা চিত্রাঙ্কন হইতে কোনরূপ আনন্দ আহরণ করিতে পারিত না। ভারতবর্ষ ছাড়া ইউরোপীয় দেশসমূহেও কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনভাবে চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়া যে শিশুর জীবনের আবেগ-সমূহকে স্থিত করা যায়, কিংবা শিশুর কল্পনা-শক্তিকে সুদূরপ্রসারী করা যায়, কিংবা তাহার অঙ্কন-সম্পর্কিত অঙ্গুলী চালনা দ্বারা শিশুর মাংসপেশীসমূহ নিয়ন্ত্রিত করা যায়, সেই দিকে শিক্ষাবিদ্‌গণ মোটেই দৃষ্টি দান করেন নাই। কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষাবিদ্‌গণ দেখিতে পাইলেন যে, শিশুদের যদি চিত্রাঙ্কনে স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি তাহাদিগকে অবাধে রং, তুলি, ক্রেয়ন ইত্যাদি ব্যবহার করিবার সুযোগ দেওয়া যায় তাহা হইলে শিশুর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ একটা ভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। শিক্ষাবিদ্‌গণ গবেষণা করিয়া ইহার কার্যকারিতা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, ফলে আজ চিত্রাঙ্কন শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইউরোপীয় দেশসমূহে চিত্রাঙ্কন বহু পূর্ব হইতেই সমাদৃত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিয়াছে অনেক পরে। ১৯৩৭ সনে Wood and Abbott Report-এ চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষার জন্য আরও উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য সুপারিশ জানান হইয়াছে। কিন্তু সুপারিশ করা হইলেও, তাহা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। আজ মাত্র অল্প কিছুদিন হইল স্বাধীন

ভারতবর্ষে চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কথা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহাও ব্যাপকভাবে কার্যকরী হয় নাই।

চিত্রাঙ্কন শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই ত গেল চিত্রাঙ্কন শিক্ষাদানের ইতিহাসের দিকের কথা। এখন, কি উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, এবং কি উদ্দেশ্যেই বা তাহা দেওয়া হয়, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

W. G. Whitfod তাঁহার "A Functional Approach to Art—Education in the Elmentary School" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, একদল শিক্ষাবিদের মতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে 'স্বাধীন সৃজনাত্মক প্রকাশ'। পক্ষান্তরে অন্য একদল শিক্ষাবিদ্ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, চিত্রাঙ্কন বা চারুশিল্প হইতেছে একটি শিক্ষণীয় বিষয় যাহা বহুল পরিমাণে উপাদান সরবরাহ করিয়া সমাজ ও কর্মজীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তোলে।

যে দুইটি মত ব্যক্ত করা হইল, তাহারা উভয়েই সম-মূল্যবান। একের মূল্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া অপর মতকে খর্ব করা কখনই সঙ্গত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে একটি মত অপরটির পরিপূরক ছাড়া আর কিছুই নয়। চারুকলার দ্বিতীয় মতটিকে অনেকে অবশ্য বেশী মূল্য দিয়া থাকেন, তাহার কারণ এই যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারুকলা প্রকৃতপক্ষে পাঠ্যক্রমকে সমৃদ্ধ করে এবং শিশু-গণকে সৃজনাত্মক অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করিয়া থাকে। পূর্বে এই দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের ছিল না বলিয়াই মানুষ চারুকলাকে সমাদর করে নাই। আজ মানুষের দৃষ্টি হইয়াছে উদার, তাই চারুকলা মানুষের কাছে অত সমাদর লাভ করিতেছে। পক্ষান্তরে বর্তমান সময়েও জনসাধারণের কাছে চারুকলার জন্যই চারুকলা শিল্পের সমাদর না হইলেও, অধিক সংখ্যক লোকেই বর্তমানে নিজ নিজ বৃত্তি বা পেশার চিত্রাঙ্কন ও চারুশিল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছে। বস্তুতঃপক্ষে চারুকলা শিল্পের সমস্যা চিত্রাঙ্কনে বা অন্য কোন কাজের উপাদান হিসাবে সন্নিবেশিত নয়, উহার ক্ষেত্র বর্তমানে দাঁড়াইয়াছে নির্বাচনে ও গ্রহণে। বলা বাহুল্য নির্বাচন ও গ্রহণ করিবার মত মনোবৃত্তি জাগ্রত করিতে হইলে সাধারণ বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিবার মত শক্তি অর্জন করা আবশ্যক। অবশ্য বলা নিষ্প্রয়োজন যে, চারুকলার সৌন্দর্য সাধনায়, সৃজন ও উৎপাদনকে আমরা মোটেই অগ্রাহ্য করিতেছি না। তাহা

হইলে দেখা যাইতেছে যে, J. L. Mursellএর মত আমরাও মত পোষণ করি যে, চারুকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে উহা মানবজীবনের সাধারণ কর্মের মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজিয়া বাহির করে।

চারুকলা আয়ত্ত করিবার পন্থা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। শিশুর কর্ম যদি শিশুর অভিজ্ঞতাপ্রসূত না হয়, তাহা হইলে শিশু চিত্রাঙ্কন-সম্পর্কীয় সৃজনাত্মক কর্মে উৎসাহ বোধ করিতে পারিবে না। শিশুর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা হইতেই পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, চারুকলা শিক্ষাদান সম্পর্কে অভিজ্ঞতার মূল্য কতখানি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পল্লীর শিশুরা কৃষিসম্পর্কীয় জীবজন্তু অঙ্কন করিতে সহরের শিশুদের হইতে অনেক বেশী পারদর্শী। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র যার যতটা পরিবর্ধিত চারুকলা শিল্পের সম্ভাব্যতা তাহার মধ্যে ততই বেশী সম্প্রসারিত।

চারুকলা শিক্ষার নূতন পদ্ধতি। পূর্বে যে ভাবে অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। উহার বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই, কারণ ঐ জাতীয় শিক্ষা বর্তমান শিক্ষিত বয়স্কগণ পূর্বেই পাইয়া আসিয়াছেন। সে যাহা হউক এখন কি ভাবে চারুকলা শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা যাইতে পারে। চারুকলা শিক্ষাদানের নূতন পদ্ধতির মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতি পর্যবসতি রহিয়াছে, ইহা স্পষ্টই বলা যাইতে পারা যায়। এই শিক্ষাদান-পদ্ধতির মধ্যে আছে অভিজ্ঞতা, স্বাধীনতা, পরীক্ষা, নমনীয়তা, নির্বাচন, মনন, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্যমূলক কর্ম, বিচার। এই ভাবে শিক্ষা হয় খুবই ঘরোয়া, অর্থপূর্ণ এবং সমগ্রতাপূর্ণ। শিক্ষকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, শিশুদের স্বাধীনতা দিলে তাহারা বাস্তবিক বেশ মনোযোগী হইয়া ভাল শিখিতে পারে, কিন্তু পূর্বে ত চিত্রাঙ্কন শিক্ষা বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে নাই।

অঙ্কন শিক্ষার উদ্দেশ্য

(১) **ভাব প্রকাশের একটা প্রকৃষ্ট উপায় শিক্ষা দান**। প্রথমতঃ মানুষ আকার ইঙ্গিতে এবং তাহার পরে মৌখিক ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে শিখে। আরও উন্নত হওয়ার পর সে লেখার সাহায্যে ভাব প্রকাশ করিতে

আরম্ভ করে। মৌখিক ভাষায় লিখিয়া যেমন ভাব প্রকাশ করা যায় চিত্র আঁকিয়াও সেইরূপ ভাব প্রকাশ করা যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বর্ণ লিখিতে শিক্ষার পূর্বে মানুষ চিত্ররেখার সাহায্যেই ভাব প্রকাশ করিত। মৌখিক বা লিখিত ভাষার সাহায্যে ভাব প্রকাশ করা অপেক্ষা চিত্র আঁকিয়া ভাব প্রকাশ করার দুইটা সুবিধা আছে। চিত্র আঁকিয়া কোন বস্তুর যেরূপ সঠিক ও জীবন্ত (graphic) ধারণা দেওয়া যায়, মৌখিক বা লেখ্য ভাষায় তাহা দেওয়া যায় না। এমন কি কয়েকটি রেখা টানিয়া বা বুলাইয়া মনের ভাবও মুখে ফুটাইয়া তোলা যায় এবং তাহা ভাষার বর্ণনা হইতে সহজবোধগম্য হয়। ইহা ছাড়া মৌখিক বা লিখিত ভাষা হইতে চিত্রের ভাষা অধিকতর সার্বজনীন। একটা ভাষায় বর্ণনা করিলে সেই ভাষা-ভাষী ভিন্ন অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু কোন বস্তু, অবস্থা, ঘটনা বা মনের ভাব চিত্রে ফুটাইয়া তুলিলে সকল লোকেই তাহা বুঝিতে পারে।

(২) **চক্ষু ও হস্তের ভাল ব্যবহার শিক্ষাদান**। কোন বস্তু ইত্যাদির ছবি আঁকিতে দিলে প্রথমে তাহা সঠিক ও সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং **তাহার পর নিপুণতার সহিত** (skilfully) **হস্তের ব্যবহার করিয়াই** তাহা চিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

(ক) **মনের বিকাশ সাধন**। চিত্রাঙ্কনের সময় চক্ষু ও হস্তের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট মনের কাজও হয়। বিশেষতঃ বিচার ও কল্পনাশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হয়। ইহার ফলে চিত্রাঙ্কনের দ্বারা শিশুর মানসিক বিকাশেও যথেষ্ট সাহায্য হয়।

(৪) **সৃষ্টির আনন্দ দান**। **শিশুর অনুকরণ ও সৃষ্টি** করার প্রবৃত্তি প্রবল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ-প্রবৃত্তি হ্রাস পাইলেও সৃষ্টি করার প্রবৃত্তি কখনও যায় না, লোপ পায় না। চিত্রাঙ্কন কার্যে এই উভয় প্রবৃত্তির যথেষ্ট ব্যবহার হয় এবং সৃষ্টির অতুল আনন্দ লাভ হয়।

(৫) **সৌন্দর্য-জ্ঞান ও সৌন্দর্য-তৃষ্ণা বৃদ্ধি করা**। নানা **কৃত্রিম** ও প্রাকৃতিক বস্তু ও দৃশ্য ইত্যাদি দেখিয়া তাহাদের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে ও ভালবাসিতে শিক্ষা না করিলে, **কেহই ভাল চিত্রকর হইতে পারে না।**

(৬) **সাংসারিক জীবনে** নানা কার্যে অঙ্কন বিদ্যার **সাহায্য** লইতে হয়। ভাল ভাবে একটা গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে প্রথমে তাহার একটা নক্সা

আঁকিতে হয়। নানা ব্যবহার্য জিনিষ, অলঙ্কার প্রভৃতি প্রস্তুত করার পূর্বে তাহাদের চিত্র আঁকা প্রয়োজন। এমন কি ভাল ভাবে একটা বাসন তৈয়ার করিতে হইলে প্রথমে তাহার একটা নক্সা আঁকা প্রয়োজন।

(৭) **প্রায় সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের সময় অঙ্কন বিত্তার সাহায্য** লইতে হয়। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের সময় বর্ণিত বিষয়ের চিত্র আঁকিয়া দেখাইলে প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহায্য হয় বলিয়া শিশু তাহা সহজে অনুসরণ করিতে পারে। বিভিন্ন বস্তুর ছবি না আঁকিয়া শিশু বস্তুপাঠ, প্রকৃতিপাঠ, হস্তশিল্প, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি ভালরূপে শিক্ষা করিতে পারে না। এমন কি লিখিত শিক্ষাদানের সময় চিত্রের সাহায্যে তাহা শিশুর নিকট সহজে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক করা যায়। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিশুমাত্রেই ছবি দেখিতে ভালবাসে। সুতরাং শিশুর নিকট যে-কোন বিষয়ের পাঠ চিত্তাকর্ষক করার জন্য অঙ্কন-বিত্তার সাহায্য লইতে হইবে। এই জন্যই শিক্ষকমাত্রেরই অঙ্কন-বিত্তা শিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য।

বিভিন্ন প্রকারের অঙ্কন

(১) Mass Drawing—সীমারেখা না টানিয়া চক বা কয়লা ঘষিয়া ঘষিয়া কোন জিনিষের ছবি আঁকাকে মাস ড্রইং বলে। একটা বস্তু সামনে স্থাপন করিয়া তাহা দেখিয়া দেখিয়া বোর্ডে রঙীন চক ঘষিয়া তাহার ছবি আঁকা যায়। প্রথমে একটা দাগ বা বিন্দু দিয়া চক ঘষিয়া ঘষিয়া তাহা বাড়াইয়া একটা বস্তুর চিত্রে পরিণত করা যায়।

(২) **সীমারেখা চিত্র অঙ্কন।** মাঝখানে খালি রাখিয়া কেবল সীমারেখা টানিয়াও কোন জিনিষের ছবি আঁকা যায়।

(৩) Free-hand Drawing and Instrumental Drawing,

অঙ্কনের বা পরিমাপের কোন যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া কেবল পেন্সিল বা চক দিয়া ছবি বা বস্তু দেখিয়া দেখিয়া চাক্ষুষ বিচারের (Visual Judgement) সাহায্যে ছবি আঁকা যায়, ইহাকে ফ্রি-হ্যাণ্ড ড্রইং বলে। পরিমাপের যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুটি মাপিয়া রুল, কম্পাস ইত্যাদি অঙ্কনের যন্ত্র ব্যবহার করিয়া যে ছবি আঁকা হয়, তাহাকে Instrumental Drawing বলে।

(৪) **ছবি দেখিয়া ছবি অঙ্কন।** পূর্বে সাধারণতঃ চিত্র-পুস্তকের নানা চিত্র দেখিয়া চিত্র-অঙ্কন করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। আমাদের দেশে এখনও তাহা

প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার দ্বারা অঙ্কন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা হয় না। কারণ ইহাতে কেবল অনুকরণের কাজ হয়; চিন্তা, বিচার, কল্পনা ইত্যাদি মানসিক শক্তির ব্যবহার হয় না। সৃষ্টির আনন্দও উপভোগ করা যায় না। তাই অন্যান্য দেশে ইহা প্রায় পরিত্যাগ করা হইয়াছে। তবে চিত্র আঁকিবার পর অন্যের অঙ্কিত চিত্রের তুলনা করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে।

(৫) **মডেল ড্রইং**। কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক বস্তু, প্রাণী বা তাহাদের আদর্শ বা ছবি দেখিয়া অঙ্কন করাকে মডেল ড্রইং বলে। ইহার দ্বারাই অঙ্কন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া বর্তমান সময়ে সকল দেশে ইহার বহুল প্রচলন হইয়াছে।

(৬) **স্মৃতির সাহায্যে চিত্রাঙ্কন** (Memory Drawing)। বস্তু বা আদর্শ দেখিয়া চিত্র আঁকিতে কিছু অভ্যস্ত হইলে ছাত্রগণকে না দেখিয়া কোন পরিচিত জিনিষের বা প্রাণীর ছবি আঁকিতে দেওয়া যায়। ইহাতে বস্তু বা প্রাণীটি চোখের সামনে উপস্থিত নাই বলিয়া তাহার মানসিক ছবি জাগ্রত করিয়াই তাহার ছবি আঁকিতে হয়।

(৭) **বর্ণনামূলক চিত্রাঙ্কন** (Descriptive Drawing)। কোন জিনিষের, দৃশ্যের বা ঘটনার বর্ণনা পড়িয়া বা শুনিয়া তাহার ছবি আঁকিতে বলা যায়। ইহার জন্য ছাত্রগণকে প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহায্যে বর্ণনার অনুকরণ করিতে হয় এবং বর্ণিত বিষয়ের মানসিক ছবি গঠন করিতে হয়। তাহার পর সেই মানসিক ছবির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বর্ণিত বিষয়ের ছবি আঁকা যায়।

(৮) **কাল্পনিক ছবি অঙ্কন**। ইহাই মৌলিক চিত্রাঙ্কন। অবশ্য ইহাতেও ছাত্রকে পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু তাহার উপরে ভিত্তি করিয়া কল্পনার সাহায্যে সে এমন চিত্র আঁকিতে পারে, যাহা কোন বাস্তব জিনিষের অবিকল প্রতিকৃতি নহে। উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষের দিকে ইহার সূচনা করা যায় মাত্র। তাহার পরও বহু দিন চর্চা না করিলে ইহাতে দক্ষতা লাভ করা যায় না।

চিত্রাঙ্কন শিক্ষাদান-পদ্ধতি

১। প্রথম হইতেই বস্তু বা আদর্শ দেখিয়াই ছবি আঁকিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। একটা চিত্র দেখিয়া চিত্র আঁকিতে দেওয়া ঠিক নহে।

২। শিশু প্রথমে **পেন্সিল বা তুলির সাহায্যে** আঁকিতে পারে না। তাহাকে প্রথমে কয়লা বা খড়ির সাহায্যে Mass drawing করিতে দেওয়া যায়। প্রথমে একটা দাগ বা বিন্দু দিয়া চক বা কয়লা ঘষিয়া ঘষিয়া তাহা বাড়াইয়া একটা বস্তুর সম্পূর্ণ চিত্রে পরিণত করিবে।

৩। কিছুকাল Mass drawing করার পর শিশুকে সীমারেখা-চিত্র আঁকিতে দেওয়া যায়। ইহার জন্য প্রথমে কিছুদিন বস্তু (যথা একটা পাতা) বা আদর্শ, শ্লেট বা কাগজ বোর্ডের উপর বসাইয়া তাহার সীমা নির্দেশ করিয়া বরাবর দাগ দিয়া যাইবে। পরে বস্তুটির সীমারেখা দেখিয়াই তাহার রেখা-চিত্র আঁকিতে হইবে।

৪। প্রথমে Free-hand drawing আঁকিবে। চাক্ষুষ বিচারের সাহায্যেই ইহা করিতে হইবে। অঙ্কন-কার্যে চাক্ষুষ বিচার অতীব প্রয়োজনীয়। ইহা ছাত্রগণকে খুব যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়ার পরেই শিশুকে যন্ত্রের সাহায্যে আঁকিতে দেওয়া যায়।

৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত কেবল Free-hand drawingই শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার উপরের শ্রেণীতে যন্ত্রের সাহায্যে ছবি আঁকিতে দেওয়া যায়। মধ্য বাংলা স্তর হইতে যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবহারিক জ্যামিতির চিত্র আঁকিতে দেওয়া যায়। কোন বস্তুর চিত্র আঁকিবার পূর্বে তাহা মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। ইহার জন্য শিক্ষক বস্তু বা আদর্শটির বিভিন্ন দিকে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন। বিভিন্ন অংশের অনুপাতও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে বলিবেন, কেননা বস্তুর বিভিন্ন অংশের অনুপাত স্বাভাবিক না হইলে ভাল চিত্র হইতে পারে না। সর্বশেষে ঠিকমত বস্তুটি পর্যবেক্ষণ করিয়াছে কিনা প্রশ্নের স হায্যে তাহা পরীক্ষা করিবার পরেই চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করিতে দিবেন।

৬। প্রথম প্রথম ছাত্রকে কোন বস্তু বা প্রাণীর চিত্রাঙ্কন করিতে দেওয়ার পূর্বে শিক্ষক বোর্ডে তাহার এক এক অংশের চিত্র আঁকিয়া দেখাইবেন। কিন্তু ছাত্রগণকে তাহা নকল করিতে দিবেন না। বস্তুটির বিভিন্ন অংশ আঁকিয়া দেখাইবার পর তাহা মুছিয়া ফেলিয়াই ছাত্রগণকে আঁকিতে দিবেন।

৭। প্রথম প্রথম শিক্ষককে ব্যক্তিগতভাবেই ছাত্রের অঙ্কিত চিত্রের ভুল সংশোধন করিয়া দিতে হইবে। পরে বোর্ডে বস্তুর ছবিটি আঁকিয়া দিয়া ছাত্রগণকে তাহা দেখিয়া নিজ নিজ ভুল সংশোধন করিতে দেওয়া

যায়। অবশ্য তখনও শিক্ষক ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছাত্রদের কাজ তত্ত্বাবধান করিবেন এবং ভুল সংশোধনে প্রয়োজন মত সাহায্য করিবেন।

৮। চিত্রাঙ্কনের সময় ছাত্রছাত্রী পেন্সিল হেলানভাবে ধরিবে, প্রথমে বেশী জোরে দাগ দিবে না, খুব সরু রেখা টানিবে। ঠিক আঁকা হইলে পরে তাহা বড় ও স্পষ্ট করা যায়। **তুলি দিয়া আঁকার সময়েও প্রথমে পাতলা করিয়া রং দিতে হইবে। ঠিক হইলে পরে তাহা গাঢ় করা যায়।**

৯। প্রথম ঘণ্টায় বা খেলাধূলার পর ড্রইং শিক্ষা দেওয়া ভাল নহে। কারণ তখন ছাত্রদের শরীর চঞ্চল থাকে ও হাত কাঁপে বলিয়া ভাল ভাবে আঁকিতে পারে না।

১০। Perspective এবং Model Drawing। বিভিন্ন দিক হইতে যে একই বস্তুর অংশ দেখা যায় এবং নিকটের বস্তু হইতে দূরের বস্তু যে ছোট দেখা যায়, ইহাই Perspectiveএর মূল কথা। ছাত্রগণকে কোন রেল লাইনের নিকটে, সোজা রাস্তা বা বৃহৎ নদীর ধার বা প্রান্তরে লইয়া দিয়া Perspective সম্বন্ধে ধারণা দিতে হইবে। তাহারা দেখিবে যে, দুইটি সমান্তরাল রেল লাইন বহু দূরে গিয়া যেন পরস্পর মিলিত হইয়াছে; দূরের বৃক্ষগুলি কাছের বৃক্ষগুলি হইতে ছোট দেখাইতেছে। বিভিন্ন স্থান হইতে একই প্রাকৃতির দৃশ্য বিভিন্ন রূপ দেখা যাইতেছে।

Model Drawing শিক্ষা দেওয়ার সময় এই Perspectiveএর জ্ঞানের ব্যবহার করিতে হইবে। কেননা বস্তুমাত্রেরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে। এই তিন পরিমাপ (dimensions) বিশিষ্ট বস্তু আমাদের চোখের সামনে থাকিলেও আমরা যুগপৎ সম্পূর্ণ বস্তুটি দেখিতে পারি না। উহার কিছু অংশ মাত্র আমরা দেখিতে পারি। অন্য স্থান হইতে উহার ভিন্ন অংশ দেখা যায়। চক্ষু হইতে কোন বস্তুর দূরত্ব এবং অবস্থানভেদে তাহার এক অংশই ভিন্ন ভিন্ন আকার ও পরিমাণ-বিশিষ্ট দেখায়। যথা,—একই বস্তু চক্ষুর নিকটে ও চক্ষু হইতে দূরে, চক্ষুতলের উপরে বা নীচে, চক্ষুর ঠিক সামনে, ডান পার্শ্বে বা বাম পার্শ্বে স্থাপন করিলে তাহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রূপ দেখাইবে। সুতরাং Model Drawing করিবার সময়ে কোন বস্তুর যে যে অংশ যে ভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহা ঠিক সেই ভাবে অঙ্কন করিতে হইবে, এবং বিভিন্ন স্থানে উপবিষ্ট ছাত্রের অঙ্কিত একই বস্তুর চিত্র বিভিন্ন হইবে।

আলোকিত ও অনালোকিত অংশ (Light and Shade)। ইহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কক্ষের এক দিকের জানালা-দরজাগুলি খোলা রাখিয়া অন্য দিকের দরজা-জানালা বন্ধ রাখিতে হইবে। ছাত্রদিগের বাম দিকের দরজা-জানালা খোলা রাখাই ভাল। তাহা হইলে মডেলের এক দিকে আলো পড়িবে, অন্য অংশ অনালোকিত থাকিবে। সেই ভাবে চিত্রও আঁকিতে হইবে। আলোর ছায়া দেখাইবার জন্য কয়লা, রঙ্গিন চক্ বা বিভিন্ন রং ব্যবহার করা যায়।

অন্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক স্থাপন। প্রত্যেক স্তরে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া অঙ্কন শিক্ষা দিতে হইবে। যথা,—বস্তুপাঠ ও প্রকৃতিপাঠে যে সকল জিনিষের জ্ঞান দেওয়া হয় তাহাদের ছবি আঁকিতে দেওয়া যায়। সাহিত্য বা ইতিহাসের বর্ণনানুসরণ করিয়া ছবি আঁকিতে দেওয়া যায়। ভূগোল শিক্ষার সময় যে সকল প্রাকৃতিক বস্তু বা দৃশ্যের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাদের ছবি আঁকিতে দেওয়া যায় ইত্যাদি।

সৌন্দর্যজ্ঞান বৃদ্ধি ও সৌন্দর্যানুরাগ সৃষ্টি। ইহা অঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা-দানের একটা প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য শিশুকে প্রথমে নানা সুন্দর সুন্দর বস্তু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইয়া তাহাদের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাহার পর শিক্ষক নিজে তাহাদের চিত্র আঁকিয়া দেখাইবেন ও তাহাদের বিভিন্ন দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাদের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে সাহায্য করিবেন। ইহা ছাড়া বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সুন্দর সুন্দর চিত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা প্রয়োজন। তাহা দেখাইয়া শিক্ষার্থীর মনে চিত্রের প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং তাহাদের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে।

References

1. E. A. Macnee—Instruction in Indian Secondary Schools. Chap XII.
2. J. Adams—New Teaching. Chap X.
3. Saucier—Theory and Practice in the Elementary school.
4. John Duncan—The Education of the Ordinary Child.

সপ্তদশ অধ্যায়

শারীরিক শিক্ষা (Physical Education)

শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিশুর শারীরিক বিকাশই তাহার শারীরিক শিক্ষা। ইহা তাহার সর্বতোমুখী বিকাশের একটা একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শরীরকে অবহেলা করিয়া কেবল মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা, শিথিল ভিত্তির উপর আকাশচুম্বী বহুমূল্য অট্টালিকা নির্মাণের ন্যায় নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ। কারণ, ইহার ফলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন, স্বপ্নবিলাসী দার্শনিকদলের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনীয় জীবনীশক্তির অভাবে তাহারা তাহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া কোন কাজ করিতে পারে না, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না ; তাহারা প্রতিকূল অবস্থার সহিত প্রথম সংঘর্ষে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচারশক্তি ও প্রবল কল্পনাশক্তি শ্মশানের চিতাভস্মে বা কবরের ধূলিরেণুতে মিশাইয়া দিয়া অকালে ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বস্তুতঃ উপযুক্ত শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে আমরা সুস্থ, সবল, উদ্যমশীল, কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী জাতি গঠন করিতে এবং ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারিব না।

কিন্তু শিশুর শারীরিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও তাহার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কিনা সন্দেহ থাকিতেও পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শিশুকে প্রয়োজনমত পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হইলেই অন্যান্য পশুপক্ষী-শাবকের ন্যায় স্বভাবতই তাহার শারীরিক বিকাশ হইবে। তাহার জন্য কোন স্বতন্ত্র শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে অন্য পশুপক্ষী-শাবকের ন্যায় মানব-শিশু জন্মের পরই বা অল্প সময়ের মধ্যে স্বাবলম্বী হইতে পারে না, নিজ পায়ে দাঁড়াইয়া নিজের চেষ্টায় খাদ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ইহা ছাড়া বর্তমান মানব-সভ্যতার দিনে মানবশিশুকে ঠিক প্রকৃতির জীব বলা চলে না। তাহার খাদ্য, পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ ও জীবন-যাত্রা-প্রণালী

প্রায় সকলই কৃত্রিম। এমন কি, সে অনেক সময় প্রকৃতির মুক্ত আলো বাতাস পর্যন্ত উপভোগ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া তাহাকে যে শৈশব হইতে এত বেশী মানসিক কাজ করিতে হয় তাহাও প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং তাহাদ্বারাও তাহার শারীরিক বিকাশের বাধা হয়। সুতরাং তাহার বিকাশের জন্য কেবল প্রকৃতির উপর নির্ভর করা যায় না, তাহার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। তবে প্রকৃতির সহিত যতটা সম্ভব মিল রাখিয়াই এই শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিশুর শারীরিক বিকাশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন :—

(১) শিশুকে প্রয়োজন মত পুষ্টিকর খাদ্য দান। (২) স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী জীবনযাপনের ব্যবস্থা। (৩) বিভিন্ন বয়সের উপযোগী ব্যায়ামের ব্যবস্থা। (৪) শরীরের পরিমাপ ও ওজন গ্রহণ এবং চিকিৎসকের দ্বারা শরীর পরীক্ষার ব্যবস্থা। (৫) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর অবস্থা সৃষ্টি। (৬) স্বাস্থ্যের যেন ক্ষতি না হয় সেইরূপ মানসিক কাজের ব্যবস্থা। (৭) ব্রহ্মচর্য পালন।

(১) শিশুকে প্রয়োজন মত পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা। শৈশবে এবং বাল্যেই দ্রুত শারীরিক বিকাশ হয়। সুতরাং এই সময়ে শিশুকে প্রয়োজনমত পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। শিশুকে প্রয়োজনমত পুষ্টিকর খাদ্য না দিয়া কেবল ব্যায়ামের সাহায্যে তাহার বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা, কয়লা না দিয়া ইঞ্জিন চালাইবার চেষ্টার ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে।

অবশ্য শিক্ষক তাহাকে সমস্ত খাদ্য সরবরাহ করিতে পারেন না। কিন্তু তাহাকে কোন্ বয়সে কি কি খাদ্য কি পরিমাণে দেওয়া প্রয়োজন, তাহা অভিভাবককে জানাইয়া দিতে পারেন এবং তাহা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও অভিভাবকদের বুঝাইয়া দিতে পারেন। কেননা সকল সময় যে অর্থাভাবেই আমাদের শিশুগণকে প্রয়োজন মত পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয় না তাহা নহে। শিশুর পুষ্টির ও বিকাশের জন্য কোন্ বয়সে কি কি জিনিষের প্রয়োজন এবং সেই সকল জিনিষ কোন্ কোন্ খাদ্যে ও পানীয়ে আছে তাহা না জানায় অনেকে সঙ্গতি থাকিলেও তাহাদের শিশুগণকে প্রয়োজন মত পুষ্টিকর খাদ্য দেয় না। সুতরাং শিক্ষকগণকে এই বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া অভিভাবকগণকে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দিতে হইবে। তাহাদিগকে ইহাও

বুঝাইয়া দিতে হইবে যে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করা অপেক্ষা শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য দান বেশী প্রয়োজনীয়। এমন কি, কোন কোন অভিভাবক অর্থের অভাবে তাহার শিশুকে প্রয়োজন মত পুষ্টিকর খাদ্য দিতে না পারিলে জনসাধারণকে বা গভর্নমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগকে তাহা জানাইয়া শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেননা শিশু কেবল তাহার পিতা-মাতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, জাতির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ (asset)। তাহার ঠিকমত বিকাশের উপরেই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

ইহা ছাড়া অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণকে দৈনিক ৪.৫ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে আটক করিয়া রাখিতে হইলে, বিদ্যালয়েও তাহাদের কিছু খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। ৪.৫ ঘণ্টা কিছু না খাইয়া মানসিক কার্য করিলে তাহারা অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় মানসিক কাজ করিলে তাহাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইবে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকার পক্ষে দুধই সর্বাপেক্ষা উপযোগী খাদ্য এবং বিদ্যালয়ে সহজে তাহা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার অতিরিক্ত অন্য পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়াও প্রয়োজন হয়। ইহার জন্য ছাত্রদের নিকট হইতে প্রয়োজনমত কিছু ফি আদায় করা যায়। কিন্তু সকল অভিভাবক এই অতিরিক্ত ফি দিতে পারিবেন না। সুতরাং গভর্নমেণ্টকেও ইহার জন্য অতিরিক্ত সাহায্য মঞ্জুর করিতে হইবে।

(২) স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী জীবন যাপন করিতে শিক্ষা-দান।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীগণকে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি পালন করিয়া স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানানুমোদিত জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দেওয়া না হইলে শারীরিক শিক্ষাদানের কোন ফল হইবে না এবং ছাত্রগণ অটুট স্বাস্থ্য সম্পদের অধিকারী হইতে পারিবে না। তাহাদের যতই পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হউক এবং তাহারা যতই শারীরিক ব্যায়াম করুক না কেন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি পালন না করিয়া চলিলে তাহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে না।

ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে, ঠিক সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করিতে, ঠিক সময়ে প্রয়োজনমত খাদ্য খাইতে, ঠিক ভাবে ভ্রমণ করিতে,

ঠিক সময়ে নিদ্রা যাইতে ও শয্যা ত্যাগ করিতে শিক্ষা না দিলে, তাহাদের শরীরে মুক্ত আলো-বাতাস লাগিতে না দিলে, তাহাদের খাদ্য পানীয় বিশুদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা না করিলে তাহারা কিছুতেই স্বাস্থ্যবান হইতে পারে না।

(৩) বিভিন্ন বয়সের উপযোগী ব্যায়ামের ব্যবস্থা।

জীব-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের (Biologists) মতে মানবদেহের স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিকাশের জন্য যথেষ্ট ব্যয়ামের প্রয়োজন। বিবর্তনবাদীদের (Evolutionists) মতে শরীরের যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপযুক্ত ব্যবহার না হইলে তাহা ক্রমশঃ দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এমন কি কিছুকাল পরে লোপ পাইতেও পারে। সুতরাং বিভিন্ন বয়সের উপযোগী যথেষ্ট ব্যায়ামের ব্যবস্থা না করিলে খুব পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়াও ছেলেমেয়েদের শরীর সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে না এবং তাহাদের সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। তবে বিভিন্ন বয়সে ব্যায়ামের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন হইবে। নবজাত শিশু যে হাত-পা নাড়িয়া খেলা করে তাহাই তাহার উপযোগী ব্যায়াম। তাহাকে সর্বদা ক্রোড়ে না রাখিয়া শয্যায় শোয়াইয়া রাখিয়া হাত-পা নাড়িয়া খেলিতে দেওয়া উচিত। হাঁটিতে শেখার পর যে সর্বদা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করিতে থাকে তাহা তাহার শারীরিক বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং তাহাতে কিছুমাত্র বাধা দেওয়া উচিত নহে। তবে এই সময় হইতে তাহাকে ঠিকভাবে বসিতে, দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন এবং যৌবনোন্মুখ বয়স পর্যন্ত তাহা ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। কেননা আমাদের ছেলে-মেয়েরা ঠিক ভাবে বসিতে, দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে শিখে না বলিয়া তাহাদের শারীরিক বিকাশ দোষযুক্ত (defective) হয়। ৫।৬ বৎসর বয়স হইতে বালক-বালিকাদের জন্য নিম্নলিখিত ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন—

(ক) নৃত্য (খ) খেলা (গ) ড্রিল (ঘ) জিম্‌নাষ্টিক।

(ক) **নৃত্য।** পাঁচ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকাদিগকে নানা প্রকার নৃত্য করিতে শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহাদের শরীর দ্রুতগতিশীল (nimble) ও নমনীয় থাকিবে এবং তাহাদের অঙ্গের সৌষ্ঠব-পূর্ণ (symmetrical) বিকাশের সাহায্য হইবে। ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ফ্রোয়েবেলের কর্মসঙ্গীত এবং সঙ্গীত সহ দলবদ্ধ নৃত্য বিশেষ উপযোগী। ব্রতচারি নৃত্যগুলি যৌবনোন্মুখ বয়স পর্যন্তই উপযোগী। ইহা ছাড়া আরও নানা প্রকার নৃত্যের

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মেয়েদের পক্ষে নৃত্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ও উপকারী, তবে ১০।১১ বৎসরের পর তাহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে নৃত্য শিক্ষা দিতে হইবে। শরীর সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখিতে হইলে যৌবনকাল পর্যন্ত মেয়েদের দৈনিক কিছু সময় নৃত্য করা উচিত। অবশ্য তখন তাহারা কেবল নিজ নিজ গৃহাভ্যন্তরেই নৃত্যের আকারে ব্যায়াম্ করিতে পারে।

(খ) **খেলা**। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের পক্ষে খেলাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী ব্যায়াম। কারণ ইহা যেমন একদিকে তাহাদের শারীরিক বিকাশের সাহায্য করে, তেমন অপরদিকে তাহাদিগকে যথেষ্ট আনন্দ দেয়। সেইজন্য বালক-বালিকামাত্রেই খেলা করিতে ভালবাসে। অনেক খেলায় শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট ব্যবহার হয় বলিয়া ইহা তাহার মানসিক বিকাশেরও সাহায্য করে। ইহা ছাড়া অনেক ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে খেলা করে বলিয়া, ইহার দ্বারা তাহাদের সামাজিকতা শিক্ষা হয় এবং তাহারা পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া দলবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে শিক্ষা করে। খেলায় কাহারও নেতৃত্বে চলিতে হয় এবং নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কাজ করিতে হয় বলিয়া ইহা তাহাদের চরিত্র গঠনেও সাহায্য করে। সর্বোপরি প্রকৃত খেলোয়াড়ের মনোভাব (শিক্ষা পৃঃ ২৪০ দ্রষ্টব্য) লইয়া কাজ করিতে শিক্ষা করিলে জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে সফলতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। সুতরাং অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য যথেষ্ট খেলার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বয়স ও বিকাশের অনুযায়ী বালক বালিকাগণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের খেলার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রথমে শিশুর খেলা অবাধ হইবে অর্থাৎ তাহারা ইচ্ছামত ছুটাছুটি লাফালাফি করিয়া খেলিবে। ৫ বৎসর হইতে ৭।৮ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাগণের পক্ষে পশুপক্ষী মানুষ ইত্যাদি সাজিয়া নানা অভিনয়মূলক খেলা বিশেষ উপযোগী ও আনন্দদায়ক। ৯।১০ বৎসর হইতে ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাগণ সহজ সহজ নিয়ম-পরিচালিত অল্পশ্রম-সাধ্য নানা খেলা যথা,—হাডুডু, কপাটি, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলিতে পারে। ১৪ বৎসর হইতে ঊর্ধ্ব বয়স্ক বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতী নানা সুনিয়ন্ত্রিত শ্রম-সাধ্য, প্রতিযোগিতামূলক খেলা—টেনিস্, ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলিতে পারে। (বিদ্যালয়ে খেলার ব্যবস্থা—'শিক্ষা'র ৩য় অধ্যায় ৮ম পরিচ্ছেদ ২৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

(গ) **ড্রিল।** শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্য যথেষ্ট খেলার ব্যবস্থা করিলে কেবল খেলার দ্বারা তাহার শরীর সুবিকশিত ও সুগঠিত হইতে পারে না। কেননা খেলার সময় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমান ব্যবহার হয় না। ইহার ফলে কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিক বিকাশ হইতে পারে, অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অবিকশিত থাকিয়া যাইতে পারে। খেলার এই অভাব পূরণের জন্য ৭।৮ বৎসর হইতে বালক-বালিকাগণকে ড্রিল শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার হয় এরূপ সহজ সহজ ড্রিল শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু পরে ক্রমশঃ ইহার পরিমাণ ও কাঠিন্য বৃদ্ধি করিয়া এবং ইহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া ১৬-১৭ বৎসর বয়স হইতে সামরিক ড্রিল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। ইহা করিলে কেবল যে বালক-বালিকাগণের শরীর সুবিকশিত ও সুগঠিত হইবে তাহা নহে, তাহাদের নিয়মানুগামিতাও (discipline) শিক্ষা হইবে এবং তাহারা ভবিষ্যতে দেশে শান্তিরক্ষা ও দেশরক্ষার কাজে নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করিয়া নাগরিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(ঘ) **জিম্‌নাষ্টিকস্ বা যান্ত্রিক ব্যায়াম।** বালক-বালিকাগণের শারীরিক বিকাশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদিগকে উপযুক্ত বয়সে জিম্‌নাষ্টিকস্ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। কেননা অল্পবয়সে খেলা এবং ড্রিলের দ্বারা তাহাদের দেহ বিকশিত এবং সুগঠিত হইবে। জিম্‌নাষ্টিকসের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের দেহ পূর্ণায়তন এবং সুদৃঢ় হইবে না। বিশেষতঃ তাহাদিগকে মাংসপেশীর সম্পদ দানের জন্য জিম্‌নাষ্টিক্‌স্ শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ১৬-১৭ বৎসর বয়সের পূর্বে তাহাদিগকে জিম্‌নাষ্টিক্‌স্ শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। কেননা অল্পবয়সে জিম্‌নাষ্টিক্‌সের ন্যায় কষ্টসাধ্য বা পরিশ্রমজনক ব্যায়াম করার ফলে তাহাদের মাংসপেশী শক্ত হইয়া গেলে তাহাদের শারীরিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত (Stunted) হইবে। জিম্‌নাষ্টিক্‌স্ বা যান্ত্রিক ব্যায়াম ছাড়া ছোট ছোট খেলা (Minor games), বড় খেলা (Major games), শৈত্য খেলা (Winter games), সাঁতার (Swimming), কুস্তি (Wrestling), ঘুষাঘুষি (Boxing), আত্মরক্ষামূলক ব্যায়াম (লাঠি, যুযুৎসু), নৃত্য ও ছন্দময় ব্যায়াম শিক্ষার কার্যসূচীতে সন্নিবেশিত হইবে।

(৪) **শরীরের পরিমাপ ও শরীর-পরীক্ষা**

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসে একবার বালক-বালিকাগণের শরীরের মাপ ও ওজন লইয়া তাহা লিখিয়া রাখা দরকার। কেননা ইহার দ্বারাই তাহাদের

শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হইতেছে কিনা বুঝা যাইবে। এই শারীরিক বিকাশের বয়সে (growing age) মাসের পর মাস তাহাদের আয়তন এবং ওজন বৃদ্ধি না হইলেই মনে করিতে হইবে যে ইহাদের শারীরিক বিকাশের কোন বাধা হইতেছে। সম্ভবতঃ দেখা যাইবে যে, প্রয়োজনমত পুষ্টিকর খাদ্যের ও ব্যায়ামের অভাব, বা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়ম পালন অবহেলায় তাহাদের স্বাভাবিক বিকাশ হইতেছে না। এই অভাব দূর করিলে বা দোষ সংশোধন করিলে পুনঃ তাহাদের আয়তন ও ওজন বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা বৎসরে দুইবার বালক-বালিকাগণের শরীর পরীক্ষা করাও প্রয়োজন। কেননা তাহাদের শরীর গঠনের কোন দোষ থাকিলে বা কোন রোগের জন্য শারীরিক যন্ত্রগুলি (Organs) ঠিকভাবে কাজ না করিলে তাহাদের শারীরিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, বাহ্যতঃ কোন রোগের লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও অনেক বালক-বালিকার বয়সোপযোগী সজীবতা থাকে না এবং তাহাদের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না। উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করাইলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের শরীর গঠনের কোন দোষ আছে অথবা তাহাদের শরীরের কোন রোগের বীজ অবিকশিত অবস্থায় (incipient) আছে। অল্পবয়সে তাহা নির্ধারণ করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে তাহাদের শরীরের স্বাভাবিক বিকাশ হইতে পারে না। বেশী বয়সে খুব ভাল চিকিৎসার দ্বারাও তাহাদের শারীরিক গঠনের প্রতিকার বা রোগ আরোগ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে।

(৫) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর অবস্থা সৃষ্টি

শিক্ষালাভের জন্য অনেক অল্পবয়স্ক ছাত্রকে দীর্ঘ সময় একসঙ্গে থাকিতে হয়। তাহাদের শরীর কোমল এবং রোগ আক্রমণে বাধাদানের শক্তি (resisting power) কম। সুতরাং বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা যদি স্বাস্থ্যকর না হয়, তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি অপরিহার্য।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর অবস্থা সৃষ্টির জন্য শুষ্ক উচ্চ ভূমিতে খোলা জায়গায় বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে। বিদ্যালয়-গৃহে আলো প্রবেশের ও বায়ু চলাচলের ভাল ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়-গৃহ এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে, স্কুল-প্রাঙ্গণের জল নিকাশের ভাল

ব্যবস্থা করিতে হইবে, ছাত্রগণকে বসিবার জন্য প্রয়োজন মত (ছাত্র প্রতি ১০ বর্গ ফুট) স্থান ও উপযুক্ত আসন (শিক্ষা ১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) দিতে হইবে। তাহাদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংক্রামক রোগাক্রান্ত কোন ছাত্র যেন অন্য ছাত্রদের সহিত মিশিতে না পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে কোনটা অবহেলা করিলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানিরও আশঙ্কা থাকিবে।

(৬) **স্বাস্থ্যের যেন ক্ষতি না হয় সেই ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।** আমাদের বিদ্যালয়সমূহে বর্তমান শিক্ষাদান-ব্যবস্থায় এমন কতকগুলি দোষত্রুটি আছে যাহার জন্য ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। যথা,—

(ক) **অতিরিক্ত মানসিক কাজ**। ছাত্রগণের কার্যশক্তি সীমাবদ্ধ। তাহাদিগকে অতিরিক্ত মানসিক কাজ করিতে বাধ্য করিলে তাহারা অবসাদগ্রস্ত হইবে এবং তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হইবে। স্থতরাং ছাত্রের বয়স এবং তাহার স্বাস্থ্য বিবেচনা করিয়া তাহার দৈনিক মানসিক কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ বা কেবল একটানা মানসিক শিক্ষাই দেওয়া হয়। তাহার ফলে ও প্রকৃতির নিয়মে ছাত্রদের শারীরিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কেবল একঘেয়ে মানসিক কাজ না করাইয়া তাহাদিগকে মাঝে মাঝে হাতের কাজ ও শারীরিক ব্যায়াম করিতে দেওয়া প্রয়োজন। প্রতিদিন প্রতি শ্রেণীতে ব্যায়াম-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, অন্ততঃ ২০ মিনিট ব্যাপী পাঁচটি পিরিয়ড সাপ্তাহিক সময়-পত্রিকায় সংযোজিত হইবে।—উহার মধ্যে তিন পিরিয়ড আনুষ্ঠানিক ব্যায়াম-শিক্ষায় অতিবাহিত হইবে এবং অবশিষ্ট দুই পিরিয়ডে খেলা, সন্তরণ, নৃত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া ব্যায়াম-শিক্ষার ব্যবস্থা ঋতুভেদে সকাল ও বিকাল দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। সকালে শ্রেণীগুলি কিছুটা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হইবে; কারণ উহার মধ্যে technique আয়ত্ত করিবার ব্যবস্থা থাকিবে—এই পিরিয়ডগুলিকে Teaching period আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। বিকালের খেলা-ধূলা ইত্যাদি ছাত্রগণ বেশীর ভাগ নিজেরা পরিচালিত করিবে এবং উহা practice period বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(খ) ছাত্রগণের **মানসিক অবসাদের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া** এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিয়া শিক্ষাদানের ফলেও তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। (শিক্ষার ২য় অধ্যায় ১৮শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অতিরিক্ত পরিশ্রমের

জন্য বা অন্য কারণে কার্যশক্তি হ্রাস পাওয়াকেই অবসাদ বলে। তখনও ছাত্রকে কাজ করিতে বাধ্য করিলে ছাত্রের কার্যশক্তি প্রথমে হ্রাস পাইবে এবং পরে একেবারে লোপ পাইবে এবং তাহার শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

(গ) **বিদ্যালয়ে ছাত্রদের খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা।** কোন পুষ্টিকর খাদ্য না দিয়া দীর্ঘ সময় মানসিক কাজ করিতে বাধ্য করার দরুণও ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। আমরা যে খাদ্য খাই তাহা হজম হইয়া কর্মশক্তি-দায়ক এক প্রকার মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি হয়। পরিশ্রমের ফলে তাহা খরচ হইয়া যাওয়ার পরও কোন খাদ্য না দিয়া ছাত্রগণকে কাজ করিতে বাধ্য করিলে তাহাদের অনিবার্য স্বাস্থ্যহানি হইবে।

(ঘ) বার্ষিক পরীক্ষা ও বিভিন্ন স্তরের শেষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সময়ে **অতিরিক্ত পরিশ্রমে** ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। পরীক্ষা পাশই আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। সারা বৎসর ছাত্রগণ নিয়মিত পড়াশুনা করিতেছে কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বৎসরের শেষে বা এক এক স্তরের শেষ পরীক্ষার ফলানুযায়ী তাহাদিগকে প্রমোশন দেওয়া হয়; এই জন্য ছাত্রগণ শেষ পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত খাটিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে।

(ঙ) অল্পবয়স্ক অনেকগুলি বালক-বালিকাকে **দীর্ঘকাল এক ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া মানসিক কাজ করিতে দেওয়া** হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি না হইয়া পারে না। স্থতরাং ২।৩ ঘণ্টা শ্রেণী পাঠনার পরই ছাত্রগণকে বাহিরে খোলা বাতাসে ঘুরিয়া আসিতে দেওয়া বা কোন প্রকার খেলা বা ব্যায়াম করিতে দেওয়া উচিত।

(চ) ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, **গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরে** অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণকে মানসিক কাজ করিতে বাধ্য করিলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হইবে। স্থতরাং এই দেশে বিদ্যালয়গুলি গ্রীষ্মকালে দুই মাস (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস) বন্ধ রাখা উচিত। শীতকালে ছুটি কমাইয়া গ্রীষ্মের ছুটি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

(ছ) **ব্রহ্মচর্য পালন।** ব্রহ্মচর্য পালনের অভাবেই যে আমাদের বালক-বালিকাগণের মধ্যে অনেকে যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্বেই ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া পড়ে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বীর্য-ধারণকেই ব্রহ্মচর্য বলে। বালকের বা বালিকাগণের শরীর ও মনের পূর্ণ বিকাশের পূর্বে বীর্যক্ষয় হইলে, তাহাদের শরীরের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাহারা কখনও পূর্ণ যৌবন লাভ

করিতে পারে না। সুতরাং যৌবনোন্মুখ বয়সে তাহারা যাহাতে কোনরূপে বীর্যক্ষয় না করে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য এই বয়সের বালক-বালিকাগণকে অনুত্তেজক খাদ্য খাইতে ও প্রয়োজন মত ব্যায়াম করিতে দিতে হইবে, ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপক কোন প্রকার নাটক উপন্যাস ইত্যাদি পড়া বন্ধ করিতে হইবে। মন্দ চরিত্র লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। যতটা সম্ভব সর্বক্ষণ আত্মীয়-স্বজন বা শিক্ষকের সঙ্গে শিশুকে নানা কাজে ব্যাপৃত রাখিতে হইবে। ইহার পরও যদি দেখা যায় যে, বিনা কারণে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, মুখ-চোখ জ্যোতিহীন হইয়া পড়িতেছে, তখন জানিতে হইবে যে তাহারা যে কোন ভাবে বীর্যক্ষয় করিতেছে। তখন পিতামাতা বা বয়স্ক শিক্ষক তাহাদিগকে অপরিণত বয়সে বীর্যক্ষয়ের কুফল সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে এই আত্মহত্যাকারী কু-অভ্যাসের হাত হইতে রক্ষা করিবেন।

ব্যায়াম শিক্ষা-প্রণালী

১। শ্রেণী-বিন্যাস প্রণালীর উপর বিশেষ নজর রাখিতে হইবে।

২। ব্যাখ্যা—শিক্ষক মহাশয় যে যে কাজ করাইতে চাহিবেন প্রথমেই স্বল্পকথায় সরলভাবে ছাত্রদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন।

৩। প্রদর্শনী—শিক্ষক মহাশয় নিজে বা শ্রেণীর মধ্যে কোন ছাত্রকে লইয়া সকলের সম্মুখে খেলাটি ভাল করিয়া দেখাইয়া দিবেন।

৪। আদেশ—শিক্ষক মহাশয় সংযত এবং দৃঢ়ভাবে আদেশ প্রদান অভ্যাস করিবেন।

প্রত্যেক আদেশের তিনটি অংশ—ব্যাখ্যা (Explanation), বিরতি (Pause), আদেশ (Execution)।

৫। কার্য-সম্পাদন—আদেশ দিবার পর ছাত্রগণ কি ভাবে কার্য সম্পন্ন করে শিক্ষক মহাশয় তাহা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিবেন।

৬। ভ্রম-সংশোধন—কার্য সম্পাদনে যাহা ভুল থাকিবে তাহা স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষক মহাশয়কে সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

৭। পুনরাবৃত্তি (Repetition)—এক একটি অঙ্গ সঞ্চালন বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিবার জন্য একটি ব্যায়ামকে একাধিক বার করাইবেন।

References

1. J. Adams—New Teaching, Chapter XII
2. E. A. Macnee—Instruction in Indian Secondary Schools Chap. XIV
3. খেলার ছলে ব্যায়াম—জেম্‌স্ বুকানন।
4. খেলা ও হাসি—শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়।
5. Play in Education—Renay.
6. Techniques of Physical Education—Edmundson.

পরিশিষ্ট

শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও ডিউই

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী উভয়েই ভারতবর্ষের চিন্তা-জগতে মৌলিক অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও ইহাদের দান সামান্য নয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি এবং গান্ধীজী প্রধানতঃ রাজনীতিজ্ঞ, তথাপি তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহাই সত্য কথা যে, সমগ্র জীবনকে **সুস্থ, সুন্দর ও পরিপূর্ণ করিয়া** তুলিবার কথা বলিতেই ইহারা আসিয়াছিলেন।* সেই জন্যই দুই জনের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকিলেও সাদৃশ্য রহিয়াছে প্রচুর। শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্ব দিয়া গিয়াছিলেন, গান্ধীজীর মূল কথাও তাহাই ছিল, **তবে শিল্পমাধ্যমে শিক্ষার প্রবর্তন গান্ধীজীর বিশেষ দান।** শিক্ষাতত্ত্ব

---

* 1. "Tagore and Gandhi have undoubtedly been the two outstanding and dominating figures of India in the first half of the twentieth century. It is instructive to compare and contrast them. No two persons could be so different from one another in their make-up or temperaments. Tagore, the aristocratic artist, turned democrat with proletarian sympathies represented essentially the cultural tradition of India, the tradition of accepting life in the fulness thereof and going through it with song and dance. Gandhi, more a man of the people, almost the embodiment of Indian peasant, represented the other ancient tradition of India, that of renunciation and asceticism. And yet Tagore was primarily the man of thought, Gandhi of concentrated and ceaseless activity. Both, in their different ways had a world outlook and both were at the same time wholly Indian. They seemed to represent different but harmonious aspects of India and to complement one another." —Discovery of India—Jawaharlal Nehru.

2. "No one welcomed Gandhiji's return to India more eagerly than Tagore, and the two were always united by a link of personal affection but in their attitude to life these men were poles apart.................the leader of the Bengali literary renaissance a poet in two languages, novelist, painter and musician, beauty was for him what truth was for Gandhi.........In a spirit that resembled Goethe's, he was a cosmopolitan and one of his chief aims was to build up at Santiniketan an International College of Research. His ambition was to bring about a true marriage between the cultures of East and West."

—Mahatma Gandhi : Middle Years
by H. N. Brailsford

হিসাবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শন অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। সমস্ত দেশের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার না থাকার ফলে দেশের নিদারুণ দুরবস্থার কথাও রবীন্দ্রনাথ সম্যক অবগত ছিলেন এবং ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তাকেও তিনি পুনঃ পুনঃ দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এত বড় একটা দরিদ্র দেশের জনসাধারণের দুয়ারে শিক্ষাকে পৌছাইয়া দিবার যে ব্যবস্থা গান্ধীজী দিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথ বলিয়া যান নাই, যদিও কর্মকে শিক্ষার সঙ্গে তিনিও জুড়িতে চাহিয়াছিলেন।

সমগ্র জীবনকে বিকশিত করিয়া তোলাই যে শিক্ষার প্রাথমিক ও প্রধান উদ্দেশ্য, কেবল বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করা নহে—ইহা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী উভয়েই বলিয়াছেন। প্রচলিত শিক্ষার অসারতা প্রমাণ করিয়া গান্ধীজী একস্থলে বলিয়াছেন, "...an intelligent use of bodily organs in a child provides the best and quickest way of developing his intellect."

জীবনের স্পর্শেই যে চরিত্র গঠন হয় এবং সেই জন্য শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষকের হৃদয়ের সম্পর্কটাই যে বড় কথা, একথা উভয়েরই কথা। গান্ধীজী বলিতেছেন—"I do not believe that this (education) can be imparted through books. It can only be done through the living touch of the leader".

শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চাপকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'রাজচক্রের শনির দৃষ্টি', আর গান্ধীজী বাহিরের যে কোন চাপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করিবার পথ দেখাইয়াছেন।

শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী উভয়েই একমত। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; গান্ধীজী লিখিলেন, "The foreign medium has caused brain fag lay an undue strain upon the nerves of children, made them dreamers and imitators, unfitted them for original work and thought and disabled them from filtering to their family or the masses."

শিশুশিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে দুই জনের মধ্যে সাদৃশ্য সত্ত্বেও কিছু **মত-দ্বৈধ** পাওয়া যায়। গৃহই এবং পিতামাতার কোলই শিশু-শিক্ষার উত্তম

স্থান একথা মানিয়া লইয়াও রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, যেহেতু তেমন গৃহ পাওয়া যায় না, এবং পিতামাতার শিক্ষা, দৃষ্টি ও শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব শিশুকে বিকৃত করিয়া তোলে, **সেই জন্য পারিবারিক প্রভাব-মুক্ত আশ্রম-জাতীয় স্থানেই শিশুর শিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়।** পারিবারিক প্রভাব যদি খুব ব্যাপক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তাহা শিশুকে সেই অল্প বয়সেই বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত করিয়া তোলে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। তাই তিনি বলেন যে ধনীর সন্তান মানুষ হইবার পূর্বে ধনীর সন্তান হইয়া উঠে। কিন্তু গান্ধীজী বলেন গৃহকে বদলান যাইবে না। একদিন শিশু যখন গৃহে ফিরিবে, তখন দেখা যাইবে **শিশুর সহিত গৃহের এক প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। ইহাতে শিশু, পরিবার ও সমাজ প্রত্যেকেরই ক্ষতি।** অতএব গৃহকে বদলাইবার মনোবৃত্তি লইয়া গৃহের পাশেই শিক্ষার পরিবেশ রচনা করিয়া তুলিতে হইবে। আশ্রম গড়িয়া সমস্ত দেশের জন্য ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

শিক্ষার উপকরণ-বাহুল্যকে বর্জন সম্বন্ধে উভয়েই একমত। চেয়ার টেবিল বেঞ্চি আর সাজ-সরঞ্জামকে না বাড়াইবার কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, আর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন করিতে বলিয়া গান্ধীজী দেখাইলেন কত স্বল্প উপকরণে শিশুকে শিক্ষিত করিয়া তোলা যায়।

ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মতের সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই শিশুদিগের আনুষ্ঠানিক ধর্মশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উদার সামাজিক পরিবেশ শিশুর মধ্যে **উচ্চতর ভাবধারাসমূহ** জাগ্রত ও পুষ্ট করে এবং উহাই তাহার ধর্মীয় জীবনের ভিত্তিরূপে গড়িয়া উঠে এবং তথাকথিত ধর্মের নামে গোঁড়ামীর পরিবর্তে সত্যকার ধর্ম চিনিতে শেখায়। গান্ধীজী শিশুকে বিশেষ ধরণের ধর্মীয় আচার-আচরণ শেখানোর পরিবর্তে সকল ধর্মের **মহাপুরুষগণের মহত্ত্বের সহিত পরিচয়, পরস্পরের প্রতি উদার সম্পর্ক স্থাপন, সৎ চিন্তন, সত্য ভাষণ, সেবাপরায়ণতা ও ঈশ্বর নির্ভরশীলতাকেই** শিক্ষণীয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই ধর্মের বিশ্বজনীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ **বিশ্বসংস্কৃতির একজন সার্থক পূজারী** ছিলেন ও তাঁহার বিশ্বভারতীকে পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্ররূপে গড়িতে চাহিয়া-

ছিলেন। তথাপি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি। বিশেষতঃ উপনিষদের গম্ভীর সত্যানুসন্ধিৎসার সহিত সহজ সরল জীবন-যাপন-পদ্ধতি তাঁহাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা হইতে জ্ঞান ও তত্ত্ব আহরণ করিতে তাঁহার কুণ্ঠা সংকোচ না থাকিলেও তিনি পাশ্চাত্ত্যের বস্তুসর্বস্বতাকে স্বীকার করেন নাই। গান্ধীজীর অধিকতর **জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী** হেতু তিনি **সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির** অনুরাগী ছিলেন—কিন্তু তিনিও পাশ্চাত্ত্যের মহৎ ভাবরাজিকে **শ্রদ্ধার** সহিত অনুধাবন করিতে ও আপন সংস্কৃতিকে সেই সমস্ত ভাবধারা সিঞ্চনে পুষ্ট করিতে যত্নশীল ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাববাদী এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রথম পাদক্ষেপ হিসাবে ভাবগত পরিবর্তনকেই তিনি অধিক প্রাধান্য দিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদর্শের মধ্যেও এই **ভাববাদী** প্রভাব খুব বেশী প্রকটিত। গান্ধীজীর মতই রবীন্দ্রনাথ ধনীর ভোগ-বিলাসময় কর্মহীন জীবনের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন ও ইহার পরিবর্তন সাধন প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যর্থতা বুঝিয়াছিলেন, তথাপি তিনি যে গান্ধীজীর মত শিক্ষার **কর্ম-কেন্দ্রিকতায়** ততখানি গুরুত্ব দেন নাই, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার এই ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী।

গান্ধীজীও ভাববাদী ছিলেন বটে, কিন্তু যথেষ্ট **বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্নও** ছিলেন এবং এই জন্য পুরাতন শিক্ষার ত্রুটি সংশোধন করার জন্য শুধু ভাবগত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের উপর নির্ভর না করিয়া শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রী ও উৎপাদন-ধর্মী রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। **পরন্তু ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি সুকুমার সৃজন-বৃত্তিসমূহের শিক্ষাক্ষেত্রে** অবদান সম্বন্ধে যেরূপ অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, গান্ধীজী ঐগুলির প্রতি তাদৃশ অবহিত ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই মহান জ্যোতিষ্করূপে নবভারতকে সুদীর্ঘ কাল পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। শিক্ষা জাতি-গঠনের একটি প্রধান দিক—এবং সেই দিকটিতেও ইহাদের ধ্যান ও সাধনা উদ্ভাসিত হইয়া আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারা বর্তমান শিক্ষার ধারাকে প্রভাবিত করিয়াছে ও করিতেছে তাহাদের মধ্যে **ডিউইর** অবদান অন্যতম

বলা চলে। ডিউইর শিক্ষা-নীতির সহিত গান্ধীজীর শিক্ষা-নীতির যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। গান্ধীজী পুঁথিগত শিক্ষাকে শিক্ষা বলিতে সংকোচ বোধ করিতেন, জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকেই শিক্ষা বলিতেন। All-round development of the Childই শিক্ষা। লেখাপড়া শিক্ষা নহে—শিক্ষালাভের **একটি উপায় মাত্র** এবং এই **উপায়কে উদ্দেশ্যরূপে দেখার ফলেই** শিক্ষা-জগতে বর্তমান বিভ্রান্তি আসিয়াছে, ইহাই গান্ধীজীর অভিমত। ডিউইর চিন্তাতেও আমরা অনুরূপ চিন্তারই ভিন্ন প্রকাশ দেখি। তাঁহার মতে Education is not for life—it is life itself। ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগাইবার জন্য কতকগুলি জ্ঞানের পুঁজি সংগ্রহ করা শিক্ষা নহে, বর্তমান জীবনকে পূর্ণতর ও মহত্তর রূপে উদ্‌যাপনই শিক্ষা। এই ভাবে জীবনযাপনের মধ্য দিয়াই ভবিষ্যতের পূর্ণতর জীবনের প্রস্তুতি আসিবে এবং সমগ্র জীবনেই শিক্ষা পরিব্যাপ্ত হইবে। তাঁহার জীবনকেন্দ্রী শিক্ষাদর্শই কার্য-সমস্যা-সমাধান-পদ্ধতিতে বাস্তব রূপ পাইয়াছে। ডিউই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং গণতন্ত্রের শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য শিক্ষালয়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করার কথা বলিয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষায় গান্ধীজী বিদ্যালয় পরিচালনে **স্বাবলম্বনের যে ভাবধারা প্রবর্তন করিয়াছেন** তাহার সহিত ডিউইর **গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা** সমান অর্থ বহন করে। সুতরাং **গান্ধীজীর কর্মকেন্দ্রী স্বাবলম্বী বুনিয়াদী শিক্ষা ও ডিউইর জীবনকেন্দ্রী শিক্ষা, এই দুইটির মধ্যে খুবই সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।** গান্ধীজীর সমাজ-দর্শন-সংক্রান্ত বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গী, অহিংসা ও সমাজবিপ্লবের বিশেষ মতবাদ তাঁহার শিক্ষাদর্শকে কিছু বেশী বিপ্লবধর্মী ও অধিকতর উৎপাদনাত্মক শিক্ষাকেন্দ্রী রূপ দিয়াছে। ডিউই গণতন্ত্রকে যথেষ্ট উচ্চে স্থান দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার শিক্ষার মধ্যে কোনও অর্থনৈতিক সমাজবিপ্লব-চিন্তা প্রভাব বিস্তার করে নাই এবং উৎপাদনাত্মক সৃষ্টির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয় নাই। কর্ম ও জীবনকেন্দ্রী শিশু-শিক্ষার তত্ত্ব বুঝিতে হইলে ডিউইর শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বর্তমান শিশু-শিক্ষায় এই মনীষীর চিন্তাধারা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও করিবে।

কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন শিক্ষাবিদের বিভিন্ন শিক্ষার নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা হইতে আমরা কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের প্রকৃত রূপকে একবার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পর তত্ত্ব ও ব্যবহারিক দিক—এই উভয় দিক হইতেই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে দুইটি জিনিষ বিশেষভাবে পরিস্ফুট। প্রথম হইতেছে এই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় ঠিক এক জন শিক্ষাবিদ্ কিংবা একই দলীয় কয়েক জন শিক্ষাবিদের চিন্তাপ্রসূত নয়, পক্ষান্তরে উহা বহু দিন ধরিয়া বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌দের শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। শিক্ষা ও কর্ম এই পর্যায়ে উঁহাদের বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী মতবাদের সমন্বয়ের ফলেই এই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের সূচনা দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ তাঁহাদের নিজস্ব শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কর্ম অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিগত শিক্ষাদর্শে পৌঁছিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। এই সব নিজস্ব শিক্ষানীতির অনুসরণের ফলে Activity School-এর এক-একটি বিশিষ্ট দিক হয়ত বিশেষভাবে দানা বাঁধিয়া উঠে, আবার অপর দিক হয়ত তেমন সুষ্ঠুভাবে বিকাশলাভ করে না। এই কারণে বর্তমানে আমাদের কর্তব্য হইতেছে, ঐ সকল শিক্ষাবিদ্‌দের নীতিগুলির মধ্য হইতে সঠিক অবস্থাকে বিচার করিয়া বাহির করা।

শিক্ষামূলক কর্ম-পদ্ধতি শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলির চাহিদা মিটাইতে পারে সত্য, কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের সমস্যা সেইখানেই শেষ নয়। শিশুরা শিক্ষামূলক কর্মে নিযুক্ত থাকিতে পারে এবং সেই কর্মের উদ্দেশ্য যে শুধু শারীরিক সুসম্বদ্ধ বৃদ্ধিরই সহায়ক তাহা নয়। তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমাজগত শিক্ষার উদ্দেশ্যই যে ঐরূপ শিক্ষামূলক কর্মের দ্বারা সাধিত হয় তাহাও নহে। এসকল উদ্দেশ্যই একমুখী। অতএব কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার একটা ব্যাপকতর মহান উদ্দেশ্যের প্রয়োজন, যাহার ভিতরে সমস্ত আদর্শই আসিয়া স্থান পাইতে পারে। এই কারণে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের কর্মসমূহ 'আদর্শ মানবত্ব' লাভের সহায়ক হইবে ইহাই যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের কর্মের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া বলা যাইতে পারা যায়।

কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের যথার্থ রূপ কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলিবার পূর্বে আমাদের প্রথমেই বিচার করা প্রয়োজন যে শিক্ষামূলক

কর্মশিক্ষার অনুসরণ গৃহে হইবে, না বিদ্যালয়ে হইবে? কেহ কেহ বলেন যে শিক্ষামূলক কর্মানুসরণ প্রথমাবস্থায় হইবে গৃহে এবং শিশুরা পড়াশুনার জন্য বিদ্যালয়ে আসিবে মাত্র দুই ঘণ্টা বা আড়াই ঘণ্টার জন্য। কিন্তু যেহেতু শিক্ষামূলক কর্মপদ্ধতি অনুসরণের মধ্যে কৃষ্টিগত ও অর্থনৈতিক মূল্য বর্তমান, সেই হেতু আমরা বিদ্যালয় হইতে কর্মানুসরণকে একেবারে বাদ দিতে পারি যদি আমরা শিক্ষামূলক কর্মের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের বাহিরে অন্যত্র কোথাও করিতে পারি। অতএব গৃহে যদি এইরূপ শিক্ষামূলক কর্মের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে গৃহে শিক্ষালাভের দিক হইতে ত্রুটির আর কিছু থাকে না। সেই কারণে গৃহের সমস্ত কর্মানুসরণকে কখনই তুচ্ছ বিবেচনা করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে গৃহে কখনও শিক্ষামূলক কর্মের পরিচালন বা নিয়ন্ত্রণ হইতে পারে না, এবং শিশুরা প্রথম হইতেই শিক্ষামূলক কর্মের প্রকৃত রূপকে হারাইয়া ফেলে। তাহা ছাড়া গৃহের সামাজিক পরিবেশও বর্তমান সময়ে অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, ফলে গৃহকে শিক্ষালাভের কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা অত্যন্ত বিপদ্‌জনক বলিয়া মনে হয়। এই কারণে বর্তমান সময়ে শিক্ষামূলক কর্মানুসরণের স্থান হিসাবে বিদ্যালয়কেই শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া মনে করিতে পারা যায়।

এই পর্যন্ত আলোচনার পর প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে শিক্ষামূলক কর্ম-পদ্ধতি বা Activity Pedagogy বলিতে কি বোঝা যায় তাহা সংক্ষেপে ও স্পষ্টভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা। Activity Pedagogy বলিতে বুঝিতে পারা যায় কতকগুলি শিক্ষামূলক কর্ম এবং তাহা করার পদ্ধতি। কর্মকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথম হস্তশিল্প-বিষয়ক কাজ এবং দ্বিতীয় তত্ত্ববিষয়ক। দ্বিতীয় পর্যায়ে সাহিত্যিক শিক্ষা-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলিই অন্তর্ভুক্ত। হস্তশিল্প বিষয়ক কাজকেও পুনরায় দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম হইতেছে প্রধানতঃ হাতের কাজ এবং উহার সহিত যুক্ত অন্যান্য তত্ত্বমূলক বিষয়সমূহ। এই বিষয়গুলি উদ্ভূত হয় এই জাতীয় হাতের কাজ হইতে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিভিন্ন শিল্প-কাজ যথা সুতাকাটা, কৃষি কার্ডবোর্ড ও কাঠের কাজ, বাঁশবেত, ইত্যাদি হইতে প্রথমে কর্মশিক্ষা এবং তারপর বিভিন্ন তত্ত্বমূলক বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে আর এক রকম হাতের কাজ আছে যেগুলি কোন তত্ত্বমূলক বিষয়কে শুধু বুঝাইতে হইলে অবতারণা করা যায়।

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে শিক্ষামূলক কর্ম-পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত সারিবদ্ধভাবে সাজাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

শিক্ষামূলক কর্মপদ্ধতি

- কর্ম
  - হস্তশিল্প-বিষয়ক
    - শিল্পকাজ উদ্ভূত অন্যান্য তত্ত্বমূলক শিক্ষা
    - তত্ত্বমূলক বিষয়ান্তর্গত কর্ম
  - তত্ত্ববিষয়ক
- পদ্ধতি (Heuristics)

কোন কর্ম যখন কোন বিদ্যালয় সংস্থার মুখ্য স্থান অধিকার করে তখন সেই কাজকে কোন শিল্পের অন্তর্গত হিসাবে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করাই হয় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। শিল্প হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হইলে সেই কর্মের প্রতিটি স্তর শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, ফলে কর্মের প্রতি স্তরের শিক্ষার সঙ্গে বাহিরের বিভিন্ন তত্ত্বমূলক বিষয়ের পক্ষে সংযোগ স্থাপন করা অত্যন্ত সহজ হয়। অনেকে একথা স্বীকার করেন না, তাঁহারা মনে করেন যে শিল্পকাজ যদি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শিল্পের দিকেই শিশুর উন্নতি হইবে, বিদ্যালয়ের অন্যান্য তত্ত্বমূলক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে উহার সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু বহু সংখ্যক শিক্ষাবিদের অভিজ্ঞতাকে যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, হস্তশিল্পের সঙ্গে অন্যান্য তত্ত্বমূলক বিষয়ের যে পরিমাণ সংযোগ স্থাপন করা যায়, ততখানি সংযোগ স্থাপন বিভিন্ন তত্ত্বমূলক বিষয়ের মধ্যেও করা সম্ভব হয় না।

নিম্নে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় কতকগুলি শিল্প সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হইল। সমস্ত শিল্প প্রতিটি কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে অনুসরণ করা সম্ভব নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রতিটি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্থির করিবেন কোন্ কোন্ শিল্প তাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচন করিবেন। এই নির্বাচনের মধ্যে অবশ্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ, সংশ্লিষ্ট সমাজের প্রয়োজন, শিশুদের অনুরাগ এবং শিক্ষকদের পারদর্শিতা এই চারিটি বিষয় বিশেষভাবে

বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। নিম্নে যে শিল্পগুলির উল্লেখ করা হইল, সেই শিল্পগুলি দেশে ও বিদেশে সমস্ত স্থানেই শিশুদের প্রয়োজন ও শক্তির দিক হইতে বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদেরা প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন। শিল্পগুলি হইতেছে সূতা কাটা ও বয়ন শিল্প, কৃষিকাজ, কার্ডবোর্ডের কাজ ও দারুশিল্প, বেতবাঁশ শিল্প, চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প, সঙ্গীতশিল্প, পুস্তক বাঁধাই শিল্প, কাগজ তৈরী শিল্প ইত্যাদি। মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য শিল্প, রন্ধনশিল্প, সূচীশিল্প প্রভৃতি শিল্পের বন্দোবস্ত থাকিতে পারে।

শিল্পকাজ ব্যতীত অন্যান্য কর্মের মধ্যে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে কার্যসমস্যা-পদ্ধতি বা Project Method-এর স্থান অতিশয় উচ্চে। কারণ শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারিত হইতে পারে এবং সেই আগ্রহের কেন্দ্র হইতে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়া বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষামূলক হাতের কাজ এবং তত্ত্বমূলক বিষয়ের শিক্ষাদান সম্ভব হয়। ইহার দ্বারা পাঠ্যক্রমের বহু বিষয় শিক্ষাদান করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, আগ্রহের কেন্দ্রটি শিশুদের বয়স ও শিক্ষার ভিত্তি অনুযায়ী স্থিরীকৃত হইবে।

তত্ত্বমূলক বিষয়ান্তর্গত হাতের কাজের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এমন অনেক তত্ত্বমূলক বিষয় আছে যেগুলি শিল্পের বা কার্যসমস্যা পদ্ধতির সাহায্যে অভিজ্ঞতা দান করা যায় না। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তত্ত্বমূলক বিষয়কে যদি কর্মের সাহায্য লইয়া তথ্যপূর্ণ ও সহজ করিয়া তুলিতে পারা যায় তাহা হইলে তত্ত্বমূলক বিষয়টি শিশুদের নিকট আনন্দের সূত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

এই পর্যন্ত শিক্ষামূলক কর্মপদ্ধতি বলিতে হস্তশিল্প সম্পর্কীয় যাবতীয় কর্মকে এই শিল্পপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া চিন্তা করা হইয়াছে। এই সমস্ত কর্মের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রম সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে 'কর্ম' বলিতে শুধু শারীরিক পরিশ্রম সঞ্জাত কর্মকেই বুঝিতে পারা যায় না। শারীরিক পরিশ্রম সঞ্জাত নয় এমন অনেক বিষয়কেই 'কর্মের' অধীন করা হইয়াছে। শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক শিক্ষাবিদই শারীরিক পরিশ্রম সঞ্জাত কর্মের অনেক উর্ধ্বে উঠিয়া অন্যান্য বিষয়কেও 'কর্মের' অধীনে স্থান দিয়াছেন। এইরূপ দিতে হইয়াছে, কারণ শুধু শারীরিক পরিশ্রম-সঞ্জাত কর্ম অনুসরণ দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য 'আদর্শ মানবত্ব' লাভ সম্ভব হয় না।

বর্তমানে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় কোন একটি বিশেষ অসুবিধা দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ কোন্ স্তরে কিরূপ কর্মের বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহার বিশেষ কোন নির্দেশ নাই। শিল্পের ক্ষেত্রে নির্দেশ থাকিলেও কার্যসমস্যা পদ্ধতির কিংবা তত্ত্ব অন্তর্গত কর্মানুসরণের ক্ষেত্রে কতটা কাজ করিতে হইবে তাহারও ইঙ্গিত নাই। এক্ষেত্রে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়া বলিতে পারেন যে 'কার্যসমস্যা' অথবা Project শিশুদের অনুভূত প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া পরিচালিত হইবে, সেখানেও নির্দেশের কোন প্রশ্ন আসিতে পারে না। কথাটা সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, শিশুদের প্রতিটি অনুভূত প্রয়োজনের জন্য 'কার্যসমস্যা-পদ্ধতির' প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, কিংবা প্রতিটি তত্ত্বমূলক বিষয়কে activise করাও যাইতে পারে না। অতএব এই সমস্ত কর্মানুসরণের মধ্যে কিছুটা নির্দেশ থাকিবেই, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহা না হইলে বিদ্যালয়ের কাজ সমস্তই কর্মপ্রধান হইয়া যাইবে, কর্ম ও তত্ত্বের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হইবে, দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় আর হইতে পারিবে না।

এবার শিক্ষামূলক কর্মপদ্ধতির অন্তর্নিহিত নীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা-করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্বে শিক্ষামূলক কর্মপদ্ধতির সংজ্ঞাটি কি তাহা জানা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। Schoenchen Activity pedagogy বা শিক্ষামূলক কর্মপদ্ধতির একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। সেই সংজ্ঞাটি এইখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে। "Pedagogical activity is every purposeful application of human power, mental or physical, through which cultural values are created," (শিক্ষামূলক কর্মপদ্ধতি হইতেছে মানুষের প্রতিটি মানসিক বা দৈহিক শক্তির উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগ, যাহার মাধ্যমে কর্মের একটি কৃষ্টিগত মূল্য নির্ধারিত হইতেছে)।

এইবার শিক্ষামূলক কর্মপদ্ধতির নীতি আলোচনা করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতির নীতি হইতেছে স্বয়ংকর্ম। শিশু স্বয়ংকর্মের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শুধু তাহাই নয়, স্বয়ং-কর্মের মধ্য দিয়া শিশুর কতকগুলি পর পর অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে, যাহার সাহায্যে শিশু জীবনের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারে। স্বয়ংকর্মের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে 'জানার' ইচ্ছা ও 'করার' প্রেরণা; 'কাজ করিবার শক্তি এবং 'কাজ করিবার ইচ্ছা'। ইহাদের প্রেরণার ফলেই হয় শিশুদের মনে আত্মবিকাশের উদগ্র ইচ্ছা।

শিক্ষামূলক কর্মের পদ্ধতির আর একটি হইতেছে যে শিক্ষাদানের জন্য সাধারণ গতানুগতিক বিদ্যালয়ের যেমন শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন হয়, এখানে সেইরূপ কোন শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন হয় না; মুক্ত আকাশতলে উপযুক্ত শিক্ষণীয় পরিবেশই হইতেছে শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্র। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, শিশুদের সমস্ত কার্যে অগ্রণী হইয়া আসাকে মর্যাদা দিয়াছে, শিশুদের প্রশ্ন করিবার আলোচনা অধিকার দিয়াছে এবং দিয়াছে শিশুদের বিদ্যালয়-সমাজের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন। শিশুদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কর্ম ও ভাবের উদ্ভব হয়, তাহার মর্যাদা দিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। এইরূপ কর্মের ফলে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী-দের মধ্যে প্রীতিমূলক সহযোগিতার ভাব গড়িয়া উঠে।

শিক্ষামূলক কর্ম একটি পদ্ধতি এবং এই বিষয়ে এইক্ষণে আলোচনা চলিতে পারে। পূর্বেই শিক্ষামূলক কর্ম-পদ্ধতিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছিল যে, ইহার এক ভাগে রহিয়াছিল কর্ম অপর দিকে ছিল পদ্ধতি। পদ্ধতি অর্থে পাঠ্যক্রমের যাবতীয় বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের শিক্ষাদান-প্রণালী এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

পূর্বেই স্বয়ংকর্মের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, স্বয়ংকর্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে অনুসন্ধান করা ও খুঁজে পাওয়ার প্রেরণাবোধ। অতএব শিক্ষাদান সম্পর্কিত পদ্ধতির গোড়ার কথাই হইতেছে শিশুর অনুসন্ধান প্রবৃত্তিকে জাগরিত করে দেওয়া। এই প্রবৃত্তির জাগরণ হইলে শিশুরা শিক্ষা-পদ্ধতির সদররাস্তায় পৌছিয়া গিয়াছে বলিয়া ধারণা করিয়া লইতে পারা যায়। এই প্রকার অনুসন্ধান করিয়া, গবেষণা করিয়া, ইঙ্গিত দিয়া সাহায্য করিয়া শিশুকে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে পরিচালনা করার এই পদ্ধতিকে বলা হয় Heuristics. Heuristics পদ্ধতি সম্বন্ধে Schoenchen যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"Heutistics is the antithesis and complement of technical instruction; it stimulates the people to self-discovery, self-invention, and self-effort, instead of telling him facts, which the teacher thinks he ought to know."

সামাজিক শিক্ষা

যুদ্ধোত্তর কালে বিশেষ করিয়া স্বাধীনতার প্রাপ্তির পর সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করিয়া অনুভূত হইতেছে। সামাজিক শিক্ষা বর্তমানে নিরক্ষরকে সাক্ষর করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, ইহা যে-কোন জাতির যে-কোন শিক্ষার স্তরের জন্য প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের মত দেশ, যেখানে শতকরা প্রায় ৭৬ জন অশিক্ষিত, সেখানে আক্ষরিক শিক্ষার গুরুত্ব অবশ্যই আছে কিন্তু বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখিলে সামাজিক শিক্ষা আক্ষরিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, উহা জীবনকেন্দ্রিক। সামাজিক শিক্ষার উপাদান দেশকাল-পাত্রভেদে বিভিন্নমুখী হইলেও উহা মানুষকে কতকগুলি বিষয়ে দক্ষতা (skill) লাভের অধিকারী করে, যেমন—

১। চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের দক্ষতা (লেখা, পড়া, বলা বা হিসাব-কিতাবের মাধ্যমে)।

২। কারিগরী দক্ষতা (কৃষি, পশুপালন, গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য শিল্পকাজ, ইহা ভিন্ন বাণিজ্য ও ব্যবসায়গত দক্ষতা যাহা অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক)।

৩। শিল্পকলার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশের দক্ষতা।

৪। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষা।

৫। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নৈসর্গিক পরিবর্তন ও সাধারণ ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা।

৬। জাগতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আইন ও শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ ও তাহাদের সম্পর্কে ধারণা।

৭। বর্তমান জগতে বসবাস করিবার পক্ষে অনুকূল নৈতিক গুণানুশীলন (যেমন ব্যক্তিগত বিচারশক্তি, ভয় ও কুসংস্কার মুক্ত উদারমন ও অন্যের মতবাদগ্রহণ ও বিচার করিবার ধৈর্য)।

৮। আর্থিক ও নৈতিক শক্তি অর্জন। একদিকে কতকগুলি নীতি মানিয়া চলার অভ্যাস, অন্যদিকে চিরাচরিত প্রথাগুলিকে বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করিবার ক্ষমতা।

সামাজিক শিক্ষা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে—বিলাতে উহা **বয়স্ক-শিক্ষা** বা Adult Education, চীন দেশে উহা **গণশিক্ষা** বা Mass Education, বিশ্বসঙ্ঘের পরিকল্পনায় উহা **মূল-শিক্ষা** বা Fundamental

Education। অধুনা ভারতের শিক্ষা সংগঠনে **সামাজিক বয়স্ক শিক্ষা** বা Social Adult Education নামে পরিচিত।

১৯৩৭ সনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আমলে ইহার প্রয়োজনীয়তা কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে বিশেষ করিয়া অনুভূত হয় এবং সীমাবদ্ধ সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টায় উহার কাজ কিছু কিছু চলিতে থাকে এবং ঐ কাজে ছাত্রসমাজ কিছুটা সাড়া দেয়।* তখন বয়স্ক শিক্ষার মটো বা নীতি ছিল "Each one Teach one"। এই বাণীটি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের Frank Lowbuck কর্তৃক উচ্চারিত হইয়াছিল। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪০ সনের মধ্যে Lowbuck ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস শাসকদিগকে বয়স্ক-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে তিনি পর্যটন করিয়া বয়স্ক-শিক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হন। ইহার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের অবসান হওয়ায় বয়স্ক-শিক্ষার কাজ স্তিমিত হইয়া আসে।

যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনায় সার জন সার্জেন্ট অন্যান্য স্তরের শিক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদের জন্যও একটি শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেন। কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য যখন কার্যকরী পরিকল্পনা তৈয়ারী করা হইল তখন দেখা গেল যে, উহা সম্পূর্ণভাবে সুফলপ্রসূ করিতে হইলে ২৫ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া যায়। কিন্তু ১৯৫০ সনের ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ১০ বৎসরের মধ্যে নিরক্ষর জনসাধারণকে অশিক্ষার অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসিবার জন্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক বনাম বয়স্ক শিক্ষাকে জীবনের জন্যও নাগরিকতা-বোধ জাগ্রত করিবার জন্য সর্বাধিকার দেওয়া হয়। পঞ্চবার্ষিকী

---

* এই প্রসঙ্গে বে-সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে গান্ধীজীর গঠনমূলক সংস্থাগুলির ১৮ দফা কার্যসূচী উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক শিক্ষাসম্বন্ধে গান্ধীজী ও নেহরুজীর মত :—

"Adult Education of my conception must make men & women better citizens all round. It should include the education of every stage of life"—Mahatma Gandhi.

"Social Education in its wider sense is perhaps most necessary than any other kind of education, but this will only be so if the terms are not interpreted in a narrow way."—Nehru.

পরিকল্পনার রচয়িতাগণ মনে করেন যে, এই ব্যবস্থাদ্বারা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার সার্থক হইবে এবং ভারতের গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারতবর্ষের শতকরা ৭৪ জন লোক গ্রামে বাস করে এবং কৃষি ও তৎজাতীয় পেশাই তাহাদের উপজীবিকা, সেই কারণে ভারতবর্ষের সামাজিক শিক্ষার সমস্যা প্রধানতঃ গ্রামীন। ভারতীয় বয়স্ক বনাম সামাজিক শিক্ষা আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিম্নমান উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রচেষ্টাগুলির সহিত ওতোপ্রোত ভাবে যুক্ত। সেইজন্য বয়স্ক-শিক্ষার পরিকল্পনাগুলি কেন্দ্রীয়ও রাজ্যসরকারের অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত অঙ্গীভূত।

সামাজিক শিক্ষার সাধারণ নীতি

বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনার কতকগুলি সাধারণ নীতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

(১) শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের প্রচেষ্টা।

(২) স্বাস্থ্যসম্মত বসবাস ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা।

(৩) অবসর বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা।

উপরে উক্ত তিনটি বিষয়ের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহার কারণ বয়স্করা যদি তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইতেছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে না পারে, কিংবা উহারা যদি স্বাস্থ্যসম্মত জীবনের অধিকারী না হয়, কিংবা তাহাদের গতানুগতিক জীবনের মধ্যে কোন রূপ আনন্দের স্পন্দন অনুভব না করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা কোন রূপ নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ঔৎসুক্য বোধ করিবে না। সেই কারণেই নীতি হিসাবে উপরি-উক্ত বিধানগুলিকে বয়স্ক-শিক্ষায় ঐরূপ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ মনস্তত্ত্বের দিক হইতে প্রীতিকর অভিজ্ঞতার সহিত (Pleasurable Association) সংযুক্ত না হইলে, আক্ষরিক পাঠদান বা ব্যাপক শিক্ষার অন্য কোনও কার্যক্রম ফলপ্রসূ হইবে না। বয়স্করা শিশু নহে, অতএব শিক্ষা-পদ্ধতি বয়স্কদের জন্য বিভিন্নরূপ হইবে। বয়স্কদের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া উহাদের জন্য শিক্ষা-পদ্ধতি সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইবে। সংক্ষেপে বয়স্কদের শিক্ষা, বয়স্ক লোকের দৈনন্দিন জীবন, তাহার সামাজিক পরিবেশ ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিবে।

বয়স্ক শিক্ষা ও সমাজ-মিলন কেন্দ্র (Community Centre)

সামাজিক শিক্ষার সংজ্ঞা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রসারে যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা যৌথ কল্যাণ (community uplift through community action) সামাজিক শিক্ষার সাধারণ পদ্ধতি হিসাবে প্রয়োগ করা হইতেছে। এই নীতির বাস্তব রূপায়ণে দেশব্যাপী সমাজ-মিলন কেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। আমাদের দেশে আক্ষরিক জ্ঞান আপামর সাধারণের মধ্যে কতটা ছিল সে সম্বন্ধে মতানৈক্য দেখা দিলেও ইহা সর্ববাদী স্বীকৃত যে, আমাদের দেশে সামাজিক মেলামেশার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। দেশে শতাব্দির পর শতাব্দি রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু গ্রাম্য জীবনে ফাটল ধরে নাই। ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে বৃটিশ শাসনে। শাসক শ্রেণীর অনুসৃত নীতিতে শিক্ষার সঙ্গে দেশের সংস্কৃতির বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় আপামর জনসাধারণ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাই বর্তমানে দেশের লোকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানকল্পে একসাথে মেলামেশা, আলাপ-আলোচনা, অবসর সময় বিনোদন ইত্যাদি ব্যাপারে অন্যান্য শিক্ষায় অগ্রসর দেশগুলির মত আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের যৌথ জীবনের উন্নয়নের জন্য নানা স্থানে সমাজ-মিলন কেন্দ্র স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে। এইরূপ সমাজ-মিলন সংস্থার গঠনের পরিকল্পনায় আমরা বিলাতের Village Colleges এবং Denmarkএর Folk Schools গুলোর কাঠামো আমরা সম্মুখে রাখিয়াছি। এইরূপ সমাজ-কেন্দ্রগুলি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনসাধারণের মেলামেশার স্থান নয়, পক্ষান্তরে উহা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে তিনটি বিষয়ের বিকাশ সাধন—১। আক্ষরিক শিক্ষার প্রসার, যেহেতু এখনও দেশের একটা মোটা অংশ উহা হইতে বঞ্চিত। ২। নাগরিক শিক্ষার প্রসার এবং ৩। সমাজে বসবাস করিবার জন্য যে সকল গুণ আয়ত্ত করা প্রয়োজন, তাহার জন্য বিভিন্ন কার্যসূচীর ভিতর দিয়া, উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার জন্য যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার ফলে প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে যেমন একদিকে শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ শিক্ষকদের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করিবার পরিকল্পনাও এই বিদ্যালয় কেন্দ্রগুলি গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষক যেমন শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে

শিক্ষক, তেমন সমাজের দিক হইতে তিনি সমাজ-সেবক। ইহা বিচার করিলে যেখানে সম্ভব প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিশেষ করিয়া—প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সমাজ-মিলন-কেন্দ্রে পরিণত করা বিধেয়। অবশ্য প্রথমতঃ বিভিন্ন অঞ্চলে সব দিক বিবেচনা করিয়া কতকগুলি বিদ্যালয়কে পরীক্ষামূলক ভাবে সমাজ-মিলন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে এবং উহাতে সাফল্য লাভ করিলে ঐ কেন্দ্রগুলির সংখ্যা আরও বাড়ান যাইতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে সমাজ-মিলন কেন্দ্রে পরিণত করিবার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। এই বিদ্যালয়গুলি কর্মকেন্দ্রিক এবং উহার স্থাপনের জন্য পর্য্যাপ্ত জমি, ভাল ঘরবাড়ী ও আসবাবাদির ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যাপারে গ্রামবাসীদের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক যোগাযোগ থাকে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসব, খেলাধূলা শিক্ষা ও শিল্পপ্রদর্শনী গ্রামের লোকের সমবায়ে সংগঠিত হয়, ফলে উহা সমাজ-মিলন কেন্দ্র স্থাপনের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সমাজ-মিলন কেন্দ্র স্থাপনের আবহাওয়া অনুকূল হয় এবং গ্রামবাসীরা অনায়াসে ঐ কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে এবং সেই অনুসারে কাজ করে। এই সকল কারণে বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহে সমাজ-মিলন কেন্দ্র স্থাপনের যৌক্তিকতা আছে।

সমাজ-কেন্দ্র যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হইতে পারে। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেই ঐরূপ কেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য উপযুক্ত বলিয়া নির্বাচিত কেন করা হইবে সে সম্বন্ধে অনেকে আপত্তি তুলিতে পারেন; কিন্তু ইহার পক্ষে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির যখন শিক্ষাপ্রসারই উদ্দেশ্য, তখন ব্যাপকতর ক্ষেত্রে উহা আরও কার্যকরী হইতে পারিবে বলিয়া অনেকের ধারণা। যাহা হউক যেখানেই এই কেন্দ্র স্থাপিত হউক না কেন, ইহার একটি বাস্তব কার্যসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। এই কার্যসূচীর একটি পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) পরিবেশে যে-সকল লোক অশিক্ষিত তাহাদের আক্ষরিক জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা।

(২) বয়স্ক শিক্ষার অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত করা।

(৩) উৎসবগুলিতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলিত হওয়া।

(৪) গ্রামবাসীরা যাহাতে দেখিয়া ও শুনিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ Audio-visual শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৫) যাহারা শিক্ষিত তাহাদের আরও উন্নততর গঠনমূলক কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া, যাহাতে যাহারা সাধারণ অশিক্ষিত লোক উহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

(৬) অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা যেমন—নাটক, যাত্রা ও খেলাধূলার আয়োজন করা।

(৭) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সপ্তাহ পালন করা।

এই সমস্ত কাজের ব্যাপকতর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য গ্রীষ্মের ও পূজার অবকাশ উপযুক্ত সময়। এই দুইটি অবকাশে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই গ্রামে ফিরিয়া আসে এবং তাহাদের অবসর সময় তাহারা গ্রামের উন্নতিকল্পে অনায়াসে ব্যয় করিতে পারে।

বিদ্যালয়ে অনগ্রসর শিশু

আমাদের দেশে অনগ্রসর শিশুর সংখ্যা মোটেই কম নয়। আমাদের দেশে কেন, প্রত্যেক দেশেই অনগ্রসর শিশু আছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার শতকরা সকলেই সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না। সাধারণ শিশুর মোটামুটি শতকরা সংখ্যা থাকে ৬৬টি থেকে ৭০ পর্যন্ত। বাকী ৩৪ হইতে ৩০ জনকে যদি দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে এক অর্ধেক সাধারণের উপর আর বাকী অর্ধেক সাধারণের নীচে। এই দুই ভাগকেও আবার নানা ভাগে বিভক্ত করা যায়। আমরা সাধারণের নীচে যাহারা তাহাদেরই একটি অংশের মধ্যে আমাদের আলোচনাকে নিবদ্ধ রাখিব।

বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার পরে যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক **৭০ হইতে ৮৫র মধ্যে** তাহাদের বলা হয় অনগ্রসর বা পিছনে-পড়া শিশু বা Backward Child। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের সংখ্যা মোটামুটি কত তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানিতে ইচ্ছা হয়। একটা হিসাব করিলেই ইহার সংখ্যা জানা যাইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের সংখ্যা যদি রাজ্যের লোকসংখ্যার শতকরা দশ জন ধরা যায়—তাহা হইলে পশ্চিমবাংলায় ৩½ কোটি লোকের মধ্যে

৩৫ লক্ষ শিশু সাধারণতঃ **প্রাথমিক বিত্যালয়ে** যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ৩৫ লক্ষের শতকরা দশ জন হইতেছে অনগ্রসর শিশু, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৩½ **লক্ষ শিশু** পড়ালেখায় অনগ্রসর। এই ৩½ লক্ষ শিশুদের যদি পড়ালেখার জন্য ভাল ব্যবস্থা না করা যায়, তবে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় সম্পদ কতখানি ও কি পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইবে, তাহা বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অনগ্রসর শিশু বলিতে শুধু ৭০ হইতে ৮৫র মধ্যে যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাহাদেরই বুঝা যাইতেছে। বুদ্ধ্যঙ্ক যাহাদের ঐ বুদ্ধ্যঙ্ক সীমারও নীচে, তাহারা বোকা, মূর্খ, জড়বুদ্ধি ইত্যাদির পর্যায়ে পড়ে এবং তাহাদের দ্বারা কোনও রকম সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষা সম্ভব হয় না। অতএব তাহাদিগকে অনগ্রসর শিশুর পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মূর্খ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর সংখ্যাও সারা পশ্চিমবঙ্গে কম নহে। উহাদের জীবনধারণের উপযোগী বিভিন্ন পেশা ও কর্ম শিক্ষাদানের প্রশ্ন অন্যত্র আলোচনা হইতে পারে। এখানে শুধু যাহারা ঠিক সাধারণের নীচে, তাহাদের জন্য লেখাপড়ার ও অঙ্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, হয়ত জাতীয় জীবনের সমস্ত বড় সমস্যার সমাধান করা যাইবে। যাহারা সাধারণের চেয়ে সামান্য নীচে, তাহারা অনগ্রসর ও মোটাবুদ্ধি। তাহাদের বুঝিতে হয়ত একটু সময় লাগিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যদি তাহাদের অবহেলা করা যায়, তাহা হইলে তাহারা হয়ত ব্যক্তিগত সাহায্যের সুযোগ পাইলে যতটুকুও করিতে পারিত, তাহাও তাহারা সাধারণ শিশুর শ্রেণীগত হইয়া কিছুই করিতে পারিবে না। **বলা বাহুল্য, তাহাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা, যথা—ব্যক্তিগত শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে পারা গেলে, তবে তাহারা সমাজের প্রয়োজনে আসিতে পারিবে।**

এই **সাধারণ অনগ্রসর শিশু ছাড়াও বিশেষ বিষয়ে অনগ্রসর শিশুদের দেখা পাওয়া যায়।** তাহারা হয়ত সাধারণ পর্যায়ভুক্ত শিশু কিংবা হয়ত তাহারা সাধারণেরও উপরে, কিন্তু তাহারা **হয়ত অঙ্ক বা বাংলায় বা অন্য কোন বিষয়ে অনগ্রসর।** ইহার কারণ হয়ত **আবেগ-জনিত। ঐ আবেগ-জনিত কারণ অপসারণ করিতে পারিলেই শিশুর শিক্ষা হয়ত সহজ হইয়া আসিবে।**

বিভিন্ন প্রকারের অনগ্রসর শিশু

সাধারণ অনগ্রসর শিশুকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(১) যাহারা **শারীরিক অসুস্থতার** জন্য কোনও কারণে অনগ্রসর হয়—যথা, যাহাদের দৃষ্টিশক্তি কম, যাহারা কানে কম শোনে, দাঁত যাহাদের খারাপ, যাহাদের টনসিল ও এড্রিনয়েড গ্রন্থি খারাপ কিংবা যাহাদের কথা বলার ত্রুটি আছে। এই সমস্ত শারীরিক অসুবিধা দূর করিতে পারিলে শিশুরা অনেকটা সহজভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(খ) অনেক শিশু আছে যাহারা **রীতিমত বিদ্যালয়ে যায় না বলিয়া** অনগ্রসর হইয়া পড়ে। অনেক সময় দারিদ্র্যও বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহার প্রতিকারও অনেক সময় সম্ভব।

(২) দ্বিতীয়তঃ অনেক শিশু আছে যাহারা সাধারণতঃ বুদ্ধিতে একটু খাট, তাহাদের লইয়াই সমস্যা।

অনগ্রসরতার কারণ

বিদ্যালয়ে "অনগ্রসর" বা "পিছিয়ে-পড়া" ছাত্রদিগকে শিক্ষক যে এই শ্রেণীভুক্ত করেন, তাহাদিগের একটু গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, তাহাদের এই অক্ষমতার পিছনে একাধিক বিষয় সক্রিয় রহিয়াছে। অনগ্রসরতার কারণগুলিকে তালিকাভুক্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে, তবে ইহাদিগকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) বিদ্যালয় পরিবেশ, (২) গৃহ পরিবেশ ও (৩) পারিপার্শ্বিক পরিবেশ।

(১) **বিদ্যালয় পরিবেশ** শিশুর অনগ্রসরতার জন্য কিছু কম দায়ী নহে। শিশু দিনের পর দিন অনিয়মিতভাবে অনুপস্থিত হইতে আরম্ভ করে। ফলে শ্রেণীর কাজকর্ম সকলের সঙ্গে সমান গতিতে করিতে শিশু অক্ষম হইয়া পড়ে। অনিয়মিত অনুপস্থিতি হইতে অনগ্রসরতার উদ্ভব হয়। আর অপর দিকে অনগ্রসরতা হইতে অনিয়মিত অনুপস্থিতির অভ্যাস গড়িয়া উঠে। বিদ্যালয় জীবনে শুধুমাত্র অকৃতকার্যতা ও ব্যর্থতার গ্লানি শিশুকে পোহাইতে হয় বলিয়া বিদ্যালয় জীবন হইতে পলায়নের মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে। ইহার পিছনে আর একটি কারণও রহিয়াছে। ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্যও অনেক ক্ষেত্রে শিশু অনগ্রসর হইয়া পড়ে।

(২) কিন্তু শিশুর বিদ্যালয় জীবনের কাটে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। বেশীর ভাগ সময়ই সে গৃহে থাকে। এই **গৃহ পরিবেশ** অনুকূল না হইলে শিশুর শিক্ষাগত জীবনে তাহা গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আর্থিক সঙ্গতি-হীন পরিবারে অভাব অনটনের সমস্যা এবং তাহার ফলে লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধার অভাবেও অনেক ক্ষেত্রে শিশুর অনগ্রসরতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কেননা দারিদ্র্য একদিকে শিশুর স্বাস্থ্যের উপর কুপ্রভাব বিস্তার করে ও অন্য দিকে সমবয়সীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিশুকে পৌছাইতে বাধা প্রদান করে। তাহাদের জ্ঞানের সীমাও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাহা ছাড়াও গৃহের অস্বাস্থ্যকর নৈতিক পরিবেশও কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর পিছিয়ে পড়ার জন্য দায়ী থাকতে দেখা যায়।

(৩) শিশু সব সময় তো গৃহে থাকে না। তাহার **আশেপাশেও** একটা **পরিবেশ** রহিয়াছে এবং শিশুর শিক্ষাগত জীবনে তাহার প্রভাব কম নহে। শিশুর সঙ্গী সাথীরা এবং **আঞ্চলিক পরিবেশ** শিশুর চরিত্রগঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। বিদ্যালয় পরিবেশে শিশু যদি সুখকর অভিজ্ঞতা লাভ না করে, আর গৃহ পরিবেশও যদি তার মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল না হয় এবং একই সঙ্গে শিশুর যদি পারিপার্শ্বিক সুখকর না হয় ও আনন্দানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রভাব অনিবার্য ভাবে শিশুর মানসিক জীবনে আসিয়া পড়িবে। ইহা হইতে বিদ্যালয় জীবনের উপর, বিষয়গুলির উপর এবং সর্বোপরি শিক্ষকদিগের উপর ইহার কুপ্রভাব আসিয়া পড়ে। তাহা ছাড়া কুসংস্পর্শে আসিয়া অনেক শিশু অনগ্রসর হইয়া পড়ে। ইহার চরম পরিণতি হয় পলায়ন-মনোবৃত্তিতে।

শিশু অবসর সময় যেখানে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা যদি অস্বাস্থ্যকর ও বদ্ধ হয় তাহা হইলে তার প্রভাব শিশুর মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়ে। শিশুর দিক থেকে শিক্ষকের প্রতি ও সর্বোপরি বিদ্যালয় জীবনের ওপর তাহার মনোভাবকে ইহা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে।

শিশুর চরিত্রগঠনে পরিবেশ যেমনি ভাবে দায়ী থাকে তেমন **বংশগতির প্রভাবও** অনেকখানি রহিয়াছে। এই দিক হইতে হইতে শিশুর অনগ্রসরতার পিছনে তিনটি কারণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। দৈহিক সাংগঠনিক ত্রুটি, শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের ত্রুটিও অনগ্রসরতার একটি কারণ হইতে পারে।

তা'ছাড়া কথনজনিত ত্রুটি হইলে কিংবা ছাত্র বেয়ে (left-handed) হইলেও তাহা শিক্ষাগত ক্ষমতাকে প্রভাবান্বিত করে।

দৈহিক অক্ষমতা ছাত্রের অনগ্রসরতার জন্য যেমন অনেকখানি দায়ী থাকিতে পারে, আবার বৌদ্ধিক অক্ষমতাও অনগ্রসরতার পিছনে বহুলাংশে কার্যকরী থাকে। জন্মগতভাবে ছাত্রের সাধারণ বুদ্ধি কম থাকিলে শিক্ষাগত জীবনে তার প্রভাব গভীর ভাবে অনেক ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতে দেখিতে পাওয়া যায়। ছাত্রের বুদ্ধি সাধারণের স্তর অপেক্ষা কম হইলে কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা কার্যকরী না ও হইতে দেখা যায়।

দৈহিক ও বৌদ্ধিক অক্ষমতা ছাড়াও আরও একটি শক্তি ছাত্রের অনগ্রসরতার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে দায়ী থাকে। ইহা হইল তাহার আবেগময় জীবন। ছাত্রের আবেগময় জীবন সুসংগত না হইলে কিংবা কোন প্রকার জটিলতা থাকিলে তাহার শিক্ষাগত জীবনে সরাসরি গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে ছাত্রের অনগ্রসরতা জটিলতর রূপ লয়।

উপরোক্ত তিনটি কারণ ছাত্রের অনগ্রসরতার বিশেষ কতকগুলি কারণ হইলেও এইগুলির প্রভাব হইতে যে কোন ক্ষেত্রে ছাত্রকে মুক্ত করা যায়, তাহার উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ দৈহিক অক্ষমতা দূরীকরণ অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসা-সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া আবেগময় জীবনের প্রভাব হইতে ছাত্রকে মুক্ত করিতে শিক্ষকের সদিচ্ছা, ধৈর্য ও শ্রম অনেকখানি ফলপ্রসূ হইতে দেখা গিয়াছে। অনগ্রসরতার সমস্যা হইতেছে একটা মূলতঃ মানবিক সমস্যা (human problem) যাহার উৎপত্তিস্থল সামঞ্জস্য বিধানের অভাবের মধ্যে পাওয়া যায়।

অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষাদান

শিশুর অনগ্রসরতা দূরীকরণ শিক্ষকদিগের সম্মুখে একটা বিরাট সমস্যা। কেননা নিজ নিজ শ্রেণীর নির্দিষ্ট মান সকলের সঙ্গে সমান গতিতে অনুসরণ করিতে পারে না বলিয়াই তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত হয়। ইহার জন্য প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখিয়া সুচিন্তিত ও বিশেষ পদ্ধতিতে তাহাদের শিক্ষা দিবার প্রশ্ন উঠে। কিন্তু পূর্ব হইতেই পদ্ধতি ঠিক করিয়া লওয়া এইখানে চলে না। এই প্রতিবিধানমূলক শিক্ষাদান-কালে প্রতি পদক্ষেপেই

শিশুর অনগ্রসরতার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষককে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। শিক্ষককে তাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিশুর মনের অবস্থা, অনগ্রসরতার প্রকৃতি ও পরিমাণ, শিক্ষাগত ও শিক্ষাবহির্ভূত ক্ষেত্রে তাহার আগ্রহের কেন্দ্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে হয়। মূলতঃ এই অনুসন্ধান-লব্ধ বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়াই যথোপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হয়। এই দিক হইতে পিছিয়ে-পড়া শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ কয়েকটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রণয়ন করা যাইতে পারে।—

(ক) ব্যক্তিগত সাহচর্য দান (Individual attention)

(খ) শিক্ষকের উপযুক্ত মনোভাব (Correct attitude of a teacher).

(গ) শিশুর আগ্রহের মূল কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু পরিবেশন (Use of materials related to the dominant interests and motives of the child)

(ঘ) শিশুর অসুবিধাগুলি দূরীকরণের সহায়ক যথোপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন

(ঙ) সংক্ষিপ্ত ও সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক পাঠদান (Short, continuous lessons of systematic kind).

ব্যক্তিগত সাহচর্য দান—শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের দিক হইতেই ব্যক্তিগত সাহচর্যদানের যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে। কারণ, ইহার ফলে এক-দিকে শিক্ষক ছাত্রকে ভালভাবে জানিবার সুযোগ পান, তাহার অসুবিধাগুলি সম্পর্কে সম্যক্‌রূপে ধারণা হয়। আবার ছাত্রও তাহার নিজস্ব গতি অনুসারে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে পারে। প্রতিবিধানমূলক শিক্ষাদানের ফলাফল কয়েকটি ক্ষেত্রে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে অনগ্রসর ছাত্ররা সবচাইতে বেশী যাহা পাইতে চায় তাহা হইল ব্যক্তিগত সাহচর্য। শিক্ষাদান-ব্যবস্থার ত্রুটি এবং যথোপযুক্ত পদ্ধতির অভাবে অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রের অনগ্রসরতা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ছাত্র যখন কিছুমাত্র ব্যক্তিগত সাহচর্যের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, তখন দিনের পর দিন সে ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য দিক হইতে দেখা যায় যে, শিক্ষকের নিকট হইতে ব্যক্তিগত ও সহানুভূতিপূর্ণ সাহায্য, উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়া ছাত্র কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসিয়া ছাত্র

নিজের অসুবিধাগুলি তুলিয়া ধরিতে পারে ও তাহার সহায়তায় আপন আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতে আরম্ভ করে।

কাজেই ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষাদানের সার কথা হইল শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রকে জানা তাহাদের মানসিক, দৈহিকও শিক্ষাগত অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কিন্তু ছাত্রকে জানিতে হইলে ধারাবাহিক ও সুসংগত ভাবে জানিতে হইবে। ছাত্রকে ব্যক্তিগত ও যথাযথ ভাবে জানিতে হইলে শিক্ষক শুধু তাহার বর্তমান অবস্থারই অনুসন্ধান করিবেন না, অতীতের সমস্ত বিবরণও সংগ্রহ করিবেন। এই অনুসন্ধানের কার্যে নিম্নরূপ পরিকল্পনা লওয়া যাইতে পারে।—

(১) এই অনুসন্ধান-কার্যের প্রাথমিক পর্ব হইবে ছাত্রের বুদ্ধিপরিমাপন (measurement of intelligence)

(২) দ্বিতীয় পর্যায় হইবে কৃত্যভীক্ষা প্রয়োগ (applications of achievement test)

(৩) প্রতিবিধানমূলক অভীক্ষা প্রয়োজনমত প্রয়োগ করা হইবে। (application of diagnostic tests)

(৪) ইন্দ্রিয়ের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে (sensory test)

(৫) আগ্রহের ক্ষেত্র নির্ণয় করা হইবে (recording of interests)

(৬) ছাত্রের জীবন ইতিহাসের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে নেওয়া হইবে (brief enquiry into personal history)

(৭) শিক্ষাগত ইতিহাসের বিবরণ নেওয়া হইবে (enquiry into educational history)

(৮) ব্যক্তিগত ভাবে ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাহার মানসিক দ্বন্দ্ব ও চিন্তা ভাবনা ও উৎকণ্ঠার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হইবে

(Personal interviews-possible anxieties and conflicts of the pupil)

ছাত্রের সম্পর্কে সমস্ত খবরাদি বিশদভাবে সংগ্রহ করার পরই প্রশ্ন উঠে, শিক্ষকের দিক হইতে করণীয় কি আছে? অনগ্রসর শিশুদিগের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় কথা হইল শিক্ষকের যথোপযুক্ত মনোভাব অবলম্বন।

শিক্ষকের কাছ হইতে উৎসাহ ও আশার বাণী শুনিয়া ছাত্ররা লেখাপড়ায় অনেকখানি মনোনিবেশ করিতে পারে। কাজেই শুধু লেখাপড়া শিখাইলেই চলিবে না, শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে যে, এই শ্রেণীভুক্ত ছাত্রদিগের নিয়া প্রধান সমস্যা হইল এই যে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের অভাবেই যত সমস্যা দেখা যায়। তাই শিক্ষককে সব সময় ছাত্রদিগের পারস্পরিক পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; ছাত্রদের মনে অকৃতকার্যতার মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন থাকিতে হইবে, সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ও উৎসাহ প্রদানের দ্বারা তিনি যে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদিগের আচরণে সামঞ্জস্য আনয়ন উল্লেখযোগ্য ভাবে করিতে পারেন, এই কথা তাহাকে সবিশেষ মনে রাখিতে হইবে।

অনগ্রসর ছাত্রদিগের শিক্ষাদান ব্যবহারিকক্ষেত্রে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে ছাত্র সম্পর্কে সমুদয় বিবরণ লইতে হইবে ও যথোপযুক্ত মনোভাব লইয়া কাজ করিতে হইবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপযোগী করিয়া বিশেষ পদ্ধতিতে প্রয়োজনমত বিষয়বস্তু পরিবেশন করিতে হইবে। কাজেই শিক্ষাদান-প্রণালীতে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করিয়া গঠন করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। নূতন পদ্ধতির মূলকথা হইবে খেলা ও কার্যের মাধ্যমে ছাত্রদের উপযোগী বিষয়বস্তু ক্রম-অনুসারে তাহাদের পরিবেশন করা। কেননা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিশুদের হাতের কাজের দক্ষতা যদি বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের মানসিক শক্তিরও কিছুটা দক্ষতা বৃদ্ধি হইবে। হাতের কাজদ্বারা সঞ্চালক কেন্দ্রগুলির বিকাশ হয় বলিয়া ইহারদ্বারা মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রগুলির বিকাশের সাহায্য হয়। অতএব সকল রকমের হাতের কাজ যথা,—অঙ্কন, মাটির কাজ, কাগজ কাটা, বাগানের কাজ ইত্যাদি ব্যবস্থা করা অনগ্রসর শিশুদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। পক্ষান্তরে নৃত্যগীত, খেলা, অঙ্গচালন প্রভৃতি আনন্দদায়ক কার্যের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে লেখাপড়া তাহাদের কাছে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে, ফলে তাহারা বাইরে হইতে চাপানো বলিয়া আর ইহাকে দেখিবে না। শিশু যাহা করিতে চায়, সেই কাজে যাহাতে সে মনঃসংযোগ করিতে পারে, সে দিকে শিক্ষকের দৃষ্টি দিতে হইবে। তিনি সর্বদা শিশুকে কার্যে আগ্রহান্বিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

সাধারণ শিশুদের কার্যক্রম বা তাহাদের কার্যের স্তর অনগ্রসর শিশুদের হইতে ভিন্নরূপ হইবে। সহজতর পাঠদানের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রতি-বিধান-মূলক শিক্ষা দেওয়া শুরু করিতে হইবে। তাহারা যত দূর পর্যন্ত গিয়া আর অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়াছিল তাহারও নিম্নের স্তর হইতে কাজ শুরু করিতে হইবে। কারণ প্রথম হইতে কঠিনতম পথে অগ্রসর হইতে হইলে, তাহারা হতোদ্যম হইয়া পড়িবে। কিন্তু প্রথম হইতে সফলতার আনন্দ আস্বাদন করিতে পারিলে তাহারা একটু একটু করিয়া লেখাপড়ায় আগ্রহ অনুভব করিবে, সুপরিকল্পিত ও ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত ধারাবাহিক পাঠ প্রত্যেক ছাত্রকে পৃথক পৃথক ভাবে দিলে সে নিজ গতি অনুসারে কিছু না কিছু শিখিতে আগ্রহান্বিত বোধ করিবে।

শিক্ষক পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদিগের জন্য পদ্ধতি স্থির করিবার সময় সেই সব পদ্ধতিই নিবেন যাহা বেশীর ভাগ ছাত্রদের অসুবিধা দূর করিতে সহায়তা করিবে। কারণ অনগ্রসর ছাত্রদিগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাহাদের কৃত ভুলের মধ্যে বিশেষ ধরণের ভুলের চাইতে সাধারণ প্রকৃতির ভুলের সংখ্যাই অধিক তাই এমন পদ্ধতি নেওয়া হইবে যাহা ছাত্রদের বিশেষ ধরণের ভুলের সংশোধনের যেমন সহায়তা করিবে, তেমনি সাধারণ ভুলের সংশোধনে বিশেষ সহায়তা করিবে। কাজেই এই ধরণের শিক্ষাদানকালে শিক্ষকের বিশেষ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে, গোড়া হইতেই ছাত্রকে আপন কৃতকার্যতার ফল আস্বাদনে সহায়তা করিয়া উৎসাহ ও সাহস দিয়া সতত তাহাকে সহায়তা করিয়া এবং তাহার অসুবিধাগুলির প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া ও তাহার প্রতি গভীর ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষক ছাত্রের মনে অকৃতকার্যতা-জনিত আবেগের জট ভাঙ্গিতে চেষ্ট করিবেন।

এই জন্য শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে এক একটা বিশেষ বিষয়ে ছাত্রদিগের কর্মক্ষমতার স্তর অনুযায়ী পরিবর্তন সাপেক্ষ দল গঠন করিবেন শ্রেণীর আয়তন বড় হইলেও পরিবর্তন-সাপেক্ষ দল গঠন করিয়া বিশেষ বিষয়ে অনগ্রসর কিংবা একাধিক বিষয়ে অনগ্রসর ছাত্রদিগের জন্য শিক্ষক যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিবিধানমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যেও এই ব্যবস্থা করা কিছু অসম্ভব নহে। কোন কোন জুনিয়র স্কুলে আমরা দেখি যে সমস্ত পঠমে অনগ্রসর ছাত্রদের দ্বারা দল গঠন করিয়া তাহাদের পক্ষে উপযোগী বিষয়বস্তুকে নিয়া সকাল-বিকালে পঠনের উপর

পাঠদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই ধরণের পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রকারে ছাত্রবিশেষের সমস্যার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের অনেকেই শ্রেণীর সকল ছাত্রের কার্যক্ষমতার স্তরের অনেক খানি কাছাকাছি চলিয়া আসিয়াছে। কাজেই অনগ্রসর ছাত্রদিগের শিক্ষাদানে যথেষ্ট ধৈর্যের প্রয়োজন হইলেও শিক্ষকের সময় ও পরিশ্রম একটু বেশী পরিমাণে ব্যয়িত হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার অপচয় হয় না।

লেখাপড়ায় অনগ্রসরতা

লেখাপড়ায় অনগ্রসর শিশুর কি কি অবস্থা দেখা যায়, তাহা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

(ক) শিশু একেবারেই লিখিতে ও পড়িতে পারে না।

(খ) শিশু লিখিতে ও পড়িতে পারে, কিন্তু আংশিক বা সম্পূর্ণ উল্টা করিয়া শব্দ পড়ে বা পড়িবার সময় শব্দ ছাড়িয়া যায়।

(গ) অনেক সময় দেখা যায় যে, অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও শিশু পড়িতে পারে না। ভাষা শিক্ষার নূতন পদ্ধতি দ্বারাও সে কোন রূপ উপকৃত হইতে পারে নাই। এইরূপ অবস্থায় কতকগুলি পরিচিত নামবাচক শব্দের ছবি আঁকিয়া যদি ঐ ছবির পরিচায়ক শব্দটি তাহার সঙ্গে লিখিয়া দেওয়া যায় এবং সেই শব্দগুলি হইতে শিশুকে বাছিয়া শব্দ লইতে বলা হয়, তাহা হইলে সে হয়ত নিজের আগ্রহানুযায়ী একটি ছবি-সম্বলিত শব্দ বাছিয়া লইতে পারে। ছবির আকৃতি তাহার কাছে অপরিচিত নয়, অতএব শব্দটা চিনিতে শিশু না পারিলেও শব্দটি সে জানে। শব্দটির উপর যদি শিশু শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী প্যাটার্নে আঙ্গুল ঘুরাইতে থাকে এবং মুখে মুখে শব্দটি উচ্চারণ করে, তাহা হইলে শিশু কিছুক্ষণ পরে যান্ত্রিকভাবে সেই শব্দটি পড়িতে ও লিখিতে পারিবে। এইরূপ ভাবে যান্ত্রিকতা অবলম্বন করিয়া শিশু অনেক শব্দ লিখিয়া ফেলিতে পারে। অনেকগুলি শব্দ শেখার পর প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রিয়াবাচক শব্দ পূর্বের শব্দের সঙ্গে সংযোগ করিয়া উহা বাক্যে পরিণত করা যায়। শিশু ক্রমে লিখা ও পড়া শিক্ষা করে।

(ঘ) অনেক সময় শিশুরা শব্দ আংশিক বা সম্পূর্ণ উল্টা পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় শিশুর নিজস্ব সৃজনাত্মক লিখা সংশোধন করিয়া বড় টাইপে যদি

একটি সিটে লিখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে শিশুর পরিচিত লেখাকেই শিশু Drill করিয়া বারে বারে পড়িতে পারে। বারে বারে পড়ার দরুণ শব্দ উল্টা করিয়া শিশু পড়িবে না, শিশু পড়ায় অভ্যস্ত হইয়া আসিবে এবং শিশুর দৃষ্টি-বাকসীমা (Eye Voice Span) ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, শিশু ঠেকিয়া ঠেকিয়া পড়িবে না। এইরূপ কয়েকটি সৃজনাত্মক লেখা শিশুদের দিয়া লিখাইলে ও পড়াইলে শিশু পড়ায় অভ্যস্ত হইয়া আসিবে, সে হয়ত উল্টা করিয়া আর পড়িবে না।

অনগ্রসর শিশুদের অঙ্ক শিক্ষা

নানা কারণে শিশুরা অঙ্ক কষায় অনেক সময়ে অত্যন্ত কাঁচা থাকে। ইহার কয়েকটি কারণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) কম বুদ্ধি, (খ) পড়ায় অসামার্থ্য (গ) সংখ্যার ধারণা প্রয়োজনমত না হওয়া এবং (ঘ) আবেগজনিত বাধা।

(ক) **নির্বুদ্ধিতা**—যাহারা বুদ্ধিতে একটু খাট, তাহাদের অঙ্ক শিক্ষা করা একটু মুস্কিল সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনও প্রকারে তাহাদের যদি মনোযোগ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে তাহারা সমস্যামূলক অঙ্ক না করিতে পারিলেও যান্ত্রিকভাবে অনেক অঙ্ক করিতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনোযোগ বৃদ্ধি করাইতে হইলে অনগ্রসর শিশুদের হাতের কাজ দিয়া তাহাদের কর্মের প্রতি অনুরাগ ও মনোযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে।

(খ) **পড়ায় অসামর্থ্য**—যদি শিশু অঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে পড়ায়ও অক্ষম হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে সমস্যামূলক অঙ্ক অনুসরণ করা শক্ত। এই ক্ষেত্রে প্রথম শিশুর পড়ায় দক্ষতা অর্জন করিতে শিখিতে হইবে।

(গ) সংখ্যার তাৎপর্য বুঝিবার পূর্বেই যদি শিশু অঙ্ক করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে শিশু যান্ত্রিকভাবে অঙ্ক করিতে গেলেও ভুল করিবে। এই কারণে শিশুর অঙ্ক শিক্ষার প্রারম্ভে জীবনের সঙ্গে যুক্ত সমস্যার সঙ্গে সংখ্যাগণনাকে যুক্ত করিয়া যদি শিশুকে শিক্ষাদান করা যায়, তাহা হইলে শিশুর অঙ্কের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে।

(ঘ) কোনও আবেগজনিত কারণে শিশু অঙ্ক করিতে না চাহিলে শিক্ষক সেই আবেগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা অপসারণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহা হইলে শিশুর অঙ্ক শিক্ষাও সহজ হইয়া আসিবে।

ইংরাজী ভাষা শিক্ষা-পদ্ধতি

ভারতে ইংরাজীর স্থান

(Position of English in India)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। এই জন্যই তাহার পক্ষে অপরের সহিত ভাবের আদান-প্রদান ব্যতিরেকে সমাজে চলা অসম্ভব বলা যাইতে পারে। এই ভাবের বিনিময় সম্ভব হয় ভাষার মাধ্যমে, কেননা ভাষা হইল ভাবের বাহন। ভাষার প্রকাশ আবার নানা ভাবে হয়—যেমন, বলা, শোনা, লেখা ও পড়ার মধ্য দিয়া। এইগুলি আবার বোধের উপর নির্ভর করে। মাতৃভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়া একই সমাজের মধ্যেকার আদান-প্রদানের ব্যাপার সহজেই মিটিয়া যায়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় অন্য সামাজিক গোষ্ঠীর সহিত ভাবের বিনিময়ের ব্যাপারে। এই সমস্যার সমাধান অবশ্য অনেক দিন আগেই হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী ভাষা আজ **আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা** পাইয়াছে যাহার মধ্য দিয়া যে-কেহ যে-কোনও জাতির লোকের সঙ্গে ভাববিনিময় করিতে পারে। এই জন্যই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরাজী এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তবে পাঠক্রমে মাতৃভাষার পাশে ইংরাজীকে স্থান দেওয়ার আগে সুচিন্তিত ও সুসংহতভাবে আমাদের চিন্তা করিতে হইবে।

আজ আমাদের চিন্তার প্রধান বিষয় হইল ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরাজীর স্থান কি ? প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে ইংরাজী ছিল (১) নির্দেশ দানের পন্থাবিশেষ, (২) একটি মিশ্রিত ভাষা এবং (৩) পাশ্চাত্যের সহিত যোগসূত্র রক্ষার উপায়। বর্তমানে অবশ্য তৃতীয় উদ্দেশ্যটির অস্তিত্ব রহিয়াছে। ইংরাজী সম্বন্ধে আজ নানা কথা শোনা যাইতেছে। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরাজীর জন্য কোন স্থানই নির্ধারণ করিতে চাহেন না। আবার অনেকে আছেন যাঁহারা একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত ইংরাজীকে পাঠক্রমে স্থান দিতে আপত্তি করেন না। আবার এই ধরণের কথাও বলা হইয়াছে যে, ১৯৬৫ সাল হইতে সর্বক্ষেত্রে ইংরাজী বর্জন করিতে হইবে। তবে এই কাজ কত দূর সফল হইবে তাহা বলা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। কেননা এমন কোন ভাষাও আমাদের জানা নাই যাহা ইংরাজীর স্থান গ্রহণ করিতে পারে।

পরাধীনতার যুগেও আমরা দেখি ভারতে ইংরাজী ভাষার যথেষ্ট সমাদর ছিল। আজ এটা মোটেই কাম্য নহে যে ইংরাজী ভাষার শিক্ষাদানের মানের অবনতি ঘটাইতে হইবে। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদও এই মত পোষণ করিতেন। কেননা এই প্রকার পরিবর্তন আনিতে গেলেই ভারতের শিক্ষাখাতে তীব্র আঘাত আসিবে। পরন্তু ইংরাজী শিক্ষাদানের মান যথাসম্ভব উন্নত করিবারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

ব্রিটিশ শাসন নিঃসন্দেহে আমাদের মনের উপর যথেষ্ট অশুভ ছাপ রাখিয়া গেলেও এই কথা অনস্বীকার্য যে আমাদের **জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরাজীর দান সুপ্রচুর।** **শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে** ইংরাজী যে আমাদের কর্ম, চিন্তা ও মননের মধ্যে **সংহতি** আনিয়াছে, ইহার সাক্ষী ইতিহাসের পাতা পর্যালোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব।

যে কোনও ভাষা তাহা মাতৃভাষাই হউক অথবা বিদেশী ভাষাই হউক, একমাত্র **অভ্যাসের মধ্য দিয়া** আয়ত্ত করা যায়। শিশুকে প্রথম হইতে যে ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হউক না কেন, সে তাহা ভালভাবেই শিখিতে পারে। যদি তাহাই হয় তবে আমরা নীতিগত ভাবে এই কথা বলিতে পারি না কেন আমরা অন্য যে-কোনও প্রাদেশিক ভাষার তুলনায় ইংরাজীকে প্রাধান্য দিব না। আমরা জানি ভারতীয় সংবিধানে ১৪টি আঞ্চলিক ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে এইগুলির মাধ্যমে অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এই দিক হইতে **ইংরাজীর দাবী** অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাই ইংরাজী সর্বসম্মতিক্রমে সব চাইতে **সমৃদ্ধ ভাষার মর্যাদা** পাইয়াছে।

এই স্তরে আমরা একটি সমস্যার সম্মুখীন হই। আজিকার দিনে আমরা শিক্ষার মাধ্যমের ক্ষেত্রে দুইটি সুর শুনিতে পাই—একটি **হিন্দী ভাষার পক্ষে** এবং অপরটি **ইংরাজীর পক্ষে**। আমাদের দেশে এক দল আছেন যাঁহারা হিন্দী ছাড়া অন্য কোনও ভাষার কথা চিন্তাই করিতে পারেন না। আবার আরেক দল আছেন যাঁহারা তাহাদের ছেলেমেয়েদের ইংরাজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। এই সমস্ত দিক ভাল ভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইংরাজী অন্য যে কোনও ভাষার চাইতে বেশী সমৃদ্ধ। কাজেই ইংরাজীকে রাখিতেই হইবে, তবে আমাদের চিন্তা করিতে হইবে এই ইংরাজী কতখানি রাখা হইবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক

স্তরে ইংরাজীর মাধ্যমে পড়ানো কোন ক্রমেই সমর্থন করা চলে না। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই কথা বলা যাইতে পারে যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে (বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে) ইংরাজীর মাধ্যমে পড়ানো আরও কিছুদিন চালানো যাইতে পারে।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইংরাজীকে কখনই ভারতের একমাত্র সর্বজনব্যবহৃত ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা চলে না, এ স্থান অবশ্য হিন্দীকে কিছুটা দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রশ্ন হইল, ইংরাজী এবং হিন্দীর স্থান কি হইবে? এই কথা পরিস্ফুট যে মাতৃভাষাকে পাঠ-ক্রমে প্রথম স্থান দিতে হইবে বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়সমূহে। হিন্দী হইবে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা এবং ইংরাজী তৃতীয় শিক্ষণীয় ভাষা। তবে মাতৃভাষা ও হিন্দীভাষাকে সমৃদ্ধতর করার জন্য আমাদের সব সময়ই সাহায্য করিতে হইবে যাহাতে তাহারা ইংরাজীর সমান মর্যাদা পাইতে পারে—ইহাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

দ্বৈভাষিক সমস্যা (Bi-lingual Problem)—ভারতবর্ষ একটি দ্বৈভাষিক দেশ। কারণ এইখানকার অধিবাসীরা দুইটি ভাষার মধ্য দিয়া নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে—ইহাদের একটি হইল ইংরাজী, অপরটি তাহাদের মাতৃভাষা। জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা এবং ইংরাজীর উপর দখল লাভের প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয় ভাষাগুলি অবহেলিত হইয়াছে। দ্বৈভাষিক সমস্যার দ্বারা উভয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা হইয়াছে। ডাঃ ওয়েষ্টের মতে ভারতীয় ভাষাগুলিকে এমন ভাবে উন্নত করিতে হইবে যাহাতে এইগুলি সর্বোৎকৃষ্ট হয় এবং ভাব প্রকাশের উৎকৃষ্ট বাহন হইতে পারে। পাশ্চাত্যের জ্ঞান আহরণের লক্ষ্য সামনে রাখিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে হইবে, বিদ্যালয়ের কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার দ্বারা পড়ার ক্ষমতা বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

ইংরাজী শিক্ষাদানের লক্ষ্য (Aims of teaching English)—আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের যাহাই শিখাইবার চেষ্টা করি না কেন তাহার পশ্চাতে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। ইংরাজী শিক্ষাদানের পিছনেও এই প্রকার কতকগুলি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে, সাধারণ ভাবে ইহা ধরিয়া নেওয়া যায় যে একটি শিশু তাহার ইংরাজী পাঠ আরম্ভ করে আট বৎসর বয়সে

এবং তাহা ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত চলে। ইংরাজীর শিক্ষার লক্ষ্য মোটামুটি চারিটি। সেইগুলি নিম্নরূপ :—

(১) **কথ্য ইংরাজী বুঝিতে** সক্ষম করিয়া তোলা ;

(২) **পঠিত ইংরাজী বুঝিতে** সক্ষম করিয়া তোলা ;

(৩) **ইংরাজীতে বলার** মাধ্যমে নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সক্ষম করিয়া তোলা ;

(৪) **ইংরেজীতে লেখার** মধ্য দিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া বুঝিতে সক্ষম করা।

এই সবের জন্য **শ্রবণ, পঠন, কথন** ও **লিখন**—এই চারিটি গুণের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন হয়।

মৌখিক ইংরাজী বুঝিতে পারা অন্যান্যগুলির তুলনায় কিছুটা দুরূহ—কারণ হইল এইগুলি উচ্চারণ, স্বরভঙ্গী, দ্রুতি ও ব্যবহার ইত্যাদি। এই অসুবিধা দূরীকরণের একমাত্র উপায় হইল বিশেষভাবে অভ্যাস করা।

লেখ্য ইংরাজী দুই প্রকার—**চলতি** ইংরাজী ও **সাহিত্যিক** ইংরাজী। ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে চল্‌তি ইংরাজী রপ্ত করিতে শিখিবে—ইহাই তাহাদের সাহিত্যিক ইংরাজী শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিবে।

ইংরাজী বলার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের দৈনিক কথোপকথনে যে ইংরাজী ব্যবহৃত হয় তাহা জানা থাকিলেই চলিবে।

উচ্চ-বিদ্যালয় পরিত্যাগের পূর্বে ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে সহজ এবং শুদ্ধ ইংরেজী লিখিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কোন্ সময় হইতে ইংরাজী শিক্ষাদান সুরু হইবে (When to begin English) :—

নিঃসন্দেহে এইটি একটি বড় সমস্যা যে, কখন আমরা বিদ্যালয়ে ইংরাজী পড়ানো আরম্ভ করিব। এই সম্পর্কে কোথাও কোন সুনির্দিষ্ট নীতি প্রতিপালিত হয় না। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে ও বয়সে ইংরাজী শেখানো আরম্ভ হয়। স্বাধীনতার পূর্বে অধিকাংশ রাজ্যে সাত বৎসর-ব্যাপী ইংরাজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল, তখন শিশুরা দশ বৎসর বয়সে ইংরাজী আরম্ভ করিত। কোন কোন জায়গায় ছয় বৎসরে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই সব কারণের জন্য সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিষদ ছয় বৎসরব্যাপী

ইংরাজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। মনে হয়, এই অনুমোদন ভারতের অধিকাংশ রাষ্ট্রই সানন্দে গ্রহণ করিবেন।

শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মস্তিষ্কে এমন কতকগুলি কথনের এলাকার (speech area) সৃষ্টি হয়, যেগুলি একবারে পরিষ্কার শ্লেটের মত থাকে, যাহার উপর অতি সহজেই আঁচড় পড়িতে পারে। এইখানেই মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর পার্থক্য।

শিশুর জীবনে এমন একটা বয়স থাকে যখন সে অত্যন্ত সহজে নতুন জিনিষ গ্রহণ করিতে পারে—এই সময়ে এক সঙ্গে অনেক ভাষা সে আরম্ভ করিতে পারে একই ভাষার মত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষমতা দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই নমনীয় ও সহজ গ্রহণযোগ্য ক্ষমতার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাষা শিক্ষাদান আরম্ভ করা উচিত। ১০ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত এই ক্ষমতার কার্যকারিতা খুব সুস্পষ্ট হয়। এই জন্য এই সময়ের মধ্যে ভাষা শিক্ষাদান আরম্ভ করা উচিত।

ইংরাজী একটি বিদেশী ভাষা, কাজেই ইহার শিক্ষাদান ব্যাপারে 'যথেষ্ট' যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। তৃতীয় শ্রেণী হইতেই ইংরেজী শিক্ষাদান সুরু হওয়া প্রয়োজন—এই স্তরে লেখার উপর খুব বেশী জোর না দেওয়াই উচিত। শোনা এবং বলার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হইবে। একটি জিনিষ বার বার বলাইতে হইবে।

কেন কোন নতুন জিনিষ অথবা কোন নতুন ভাষা শিশুদের কাছে বোঝাস্বরূপ মনে হয়, তাহার কারণ হইল শিক্ষকেরা লেখা দিয়া নতুন ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন বলিয়া। যদি শিক্ষকেরা মৌখিক কাজের ভিতর দিয়া বুঝিবার ও বলিবার ক্ষমতার উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারেন তবেই ভাষা শিক্ষার কাজটি একটি আনন্দদায়ক ও সুখপ্রদ কাজে পরিণত হইতে পারিবে। আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি, শ্রেণীতে শিশুরা একটি নতুন ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করিতে কত দূর আনন্দ লাভ করে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শোনা এবং বলার প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সর্বাপেক্ষা সুফল পাওয়া যাইতে পারে। শিশুরা ১০ হইতে ১১ বৎসর বয়সে ইংরাজী পাঠ আরম্ভ করিবে এবং ছয় বৎসর যাবৎ ইহা শিক্ষা করিবে। তবে এই প্রচেষ্টা আরোও সুফল হইতে পারে যদি তৃতীয় শ্রেণীতে কিছুটা মুখে মুখে বলার অভ্যাস করানো হয়।

ইংরাজী শিক্ষাদানের পদ্ধতিসমূহ :—

অনুবাদ পদ্ধতি (Translation Method)—

ভারতে ইংরাজী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রথম হইতেই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। এই পদ্ধতিতে ইংরাজী প্রতিটি শব্দকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া শিক্ষার্থীকে শিখানো হইত। ইহাতে ব্যাকরণ এবং অনুবাদ উভয়ই প্রাধান্য লাভ করিত। ব্যাকরণকে সাম্‌নে রাখিয়া চলা হইত বলিয়া ইহাকে **ব্যাকরণ-অনুবাদ পদ্ধতিও** (Grammar-Translation Method) বলা হইত। আজ এই পদ্ধতির অসারত্ব আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

এমন অসংখ্য ইংরাজী শব্দ আছে যেগুলির কোনো ভারতীয় প্রতিশব্দ নাই। পাঠের ব্যাকরণগত গঠনগুলি যদিও যুক্তিসঙ্গত, তবুও সেইগুলি নূতন শিক্ষার্থীর আগ্রহের বিরোধীই বলা যাইতে পারে। শিশুরা অনুকরণের দ্বারা একটি ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে।

ছাত্রছাত্রীরা কেবলমাত্র ইংরাজী পড়িতে এবং লিখিতে শিখিলেই চলিবে না, তাহারা যেন ইংরাজী বলিতে পারে এবং অনুবাদ ব্যতিরেকে ইংরাজী লিখিতে পারে। তাহাদের ইংরাজীতে চিন্তা করিতে হইবে—কিন্তু অনুবাদ এ পথ রোধ করিয়া দেয়—ইংরাজীতে নিজেকে ব্যক্ত করিতে বাধা দেয়। কাজেই রচনার সাধারণ পদ্ধতি হিসাবে ইংরাজীকে বাদ দেওয়া যাইতে পারিলেও একথা ঠিকই যে, অনুবাদ শিশুর কোনো একটি নূতন ভাষা বোঝা এবং তাহার মাধ্যমে নিজকে প্রকাশ করার পরিপন্থী নহে।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct Method)—যে-কোনও ভাষাই ভাবের আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজন হয় আর এই ধারণাই একটি ভাষা শিখিবার প্রত্যক্ষ পদ্ধতির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে।

"প্রত্যক্ষ পদ্ধতির" প্রচলন প্রথম ফরাসীদেশে হয় এবং ইহার নীতিগুলি আসিয়াছে জার্মানী হইতে এবং ইহার ব্যাপক প্রচলন সম্ভব হইয়াছে আন্তর্জাতিক ধ্বনিতত্ত্ব সংস্থা (International Phonetic Association) কর্তৃক।

প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতির মতই প্রত্যক্ষ পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে একটি বিদেশী ভাষাকে ভাল ভাবে রপ্ত করার জন্য। যেমন ভাবে স্বাভাবিক পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছিল মাতৃভাষার শিক্ষার জন্য, অনুরূপভাবে একটি বিদেশী ভাষা "স্বাভাবিক" ভাবে শিখিবার জন্য প্রত্যক্ষ পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিকে পূর্বের প্রচলিত পদ্ধতিগুলির চাইতে অনেক বেশী সংস্কারের মধ্য দিয়া আগাইতে হইয়াছে এবং এই কারণেই ইহাকে অনেক বেশী সুসংহত বলা যাইতে পারে। এই পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষার সক্রিয় দিকের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মনে করা যায় যে, যত স্পষ্টভাবে ইহা পড়িতে এবং লিখিতে শিখা যায়, তত স্পষ্টভাবে ইহা বলাও যায়। যেহেতু একটি ভাষা অভ্যাস এবং বলার মধ্য দিয়াই ভাল ভাবে আয়ত্ত করা যায়, সেই জন্য প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে শুদ্ধ উচ্চারণভঙ্গী শিক্ষার জন্য ধ্বনিতত্ত্ব শিক্ষাদানের গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ভাষা যেহেতু "অভিজ্ঞতার অনুবাদস্বরূপ" সেই জন্য এই পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা এবং উহার প্রকাশের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে (১) বিদেশী শব্দ ও তার প্রতিরূপ ভাব বা বস্তুর প্রকাশের মাধ্যমে এবং (২) মাতৃভাষার যত দূর সম্ভব কম ব্যবহারের মাধ্যমে। ইহার পিছনের উদ্দেশ্য হইল ছাত্রছাত্রীদের যত দূর সম্ভব ইংরাজীতে চিন্তা করিবার অভ্যাস গঠন করানো। এই পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহাতে বাক্যকে ভাব প্রকাশের একটি একক হিসাবে ধরা হইয়াছে।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে ব্যাকরণের স্থান স্পষ্ট না হইলেও বলা যাইতে পারে ব্যাকরণ ছোঁওয়া ইহাতে কিছুটা আছে, কেননা ভাষার বিষয়বস্তুগুলি ব্যাকরণগত ক্রম অনুসারে সাজানো হইয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ব্যাকরণকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয় নাই।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিকে অন্যান্য পদ্ধতিগুলির সহিত যুক্ত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। কেননা এটি একটি "পদ্ধতি" নহে—এটিকে একটি নীতি বলা যাইতে পারে—যে নীতি সহজেই শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করা যায়। ইহার সূত্রগুলি অন্যান্য পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হইয়া ছাত্রছাত্রীর আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া এবং পরিতৃপ্তি ঘটাইয়া শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতির প্রণেতারা যদিও দাবী করেন যে, এটি বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি, তথাপি বহু লোক আছেন যাহারা মনে করেন যে শিক্ষাদানের সকল দিকের সন্ধান ইহার মধ্যে মিলে না। এই পদ্ধতির দুর্বলতা ইহার ব্যবহারের মাধ্যমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

ভাষা রপ্ত করিবার সক্রিয় অংশের উপর সকল গুরুত্ব আরোপ করাই এই পদ্ধতির ত্রুটি বলা যাইতে পারে। কারণ সকল শিশুই যে ভাষাগতপ্রাণ

নহে সমান ভাবে এই কথা ইহাতে অস্বীকার করা হইয়াছে। ফল হইয়াছে এই যে, ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটি আরোও জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং একমাত্র চতুর ছাত্রছাত্রীরাই এই পদ্ধতির দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে।

ডঃ ওয়েস্টের নবপদ্ধতি (Dr. West's New Method)–

বাচনের উপর অপ্রাপনীয় গুরুত্ব আরোপ করা ভারতে বিদেশী ভাষা বিশেষ করিয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদানের একটি বিশেষত্ব। ভাষার সক্রিয় দখল লাভের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে ইহার শিক্ষালাভের ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল করিয়া তোলা হইয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ডঃ ওয়েস্ট তাঁহার নব পদ্ধতির উদ্ভাবন করিলেন যাহাতে তিনি বাচনের পরিবর্তে পঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীয় বালকদের প্রথমে পড়িতে শিখাইতে হইবে, তারপর তাহারা লিখিতে শিখিবে এবং সর্বশেষে বলিতে এবং বুঝিতে শিখিবে। পড়িতে শেখা বলিতে তিনি মৌখিক পাঠের কথা বোঝান নাই, উদ্দেশ্যমূলক নীরব পঠনের কথা বুঝাইয়াছেন এবং এটিই শিখানো শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য হইবে।

স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে যাহাতে শিশুরা চিন্তার সুযোগ লাভের জন্য পড়িতে পারে, তাহার জন্য ওয়েস্ট **নিয়ন্ত্রিত শব্দভাণ্ডার সহযোগে একটি নূতন ধরণের পঠন পুস্তকের** নির্দেশ দিয়াছেন। যখনই কোনো একটি নূতন শব্দ উত্থাপিত হইবে, তখনই এটি বার কয়েক **পুনরাবৃত্তি** করাইতে হইবে অর্থোপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত; এই উদ্দেশ্যে নানাবিধ **ছবিও ব্যবহার** করা যাইতে পারে এবং ইহার জন্য যতটুকু প্রয়োজন **মাতৃভাষার সাহায্য** লওয়া যাইতে পারে।

ওয়েস্ট-এর মতে একটি ভাষা পড়িতে শেখা আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহা বলা এবং লেখাও সহজ হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই ভাষাটির উপর তাহার দখলও ততখানি ভাল হয়।

ডঃ ওয়েস্ট পঠনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ভাষাটি উপলব্ধি করা যদি একটি উদ্দেশ্য হয়, তবে মৌখিক অভ্যাস করানো দরকার। শব্দভাণ্ডারের দিক দিয়া ওয়েস্টের উদ্‌যোগের বিষয় হইল শব্দগুলি নিয়া—ছাত্ররা পঠনের সময় যেগুলি পাইবে। আবার ভাষাশিক্ষার মূলকথা যে বলার অভ্যাস সেই ক্ষেত্রে তাহা হইল ভাব যাহার মধ্য দিয়া ছাত্ররা নিজেদের ব্যক্ত করিতে চাহিবে।

ইংরাজী পাঠের ক্ষেত্রে ওয়েস্টের মতে পঠনই হইল সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। যদি আমরা ভারতে ইংরাজী শিক্ষার যে সমস্ত উদ্দেশ্য সর্বজন-স্বীকৃত হইয়া আছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইহার আলোচনা করি, তবে তাহাতে মতবাদের সমর্থন খুব কমই পাওয়া যাইবে।

ইংরাজী শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান (Mother-tongue in teaching English)—পাঠক্রমে ইংরাজী একটি পাঠ্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হইবার ফলে পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় ইংরাজী গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে এবং বিষয়টির উপর একটি অহেতুক গুরুত্ব আরোপ হয়। ইহার ফল হয় এই যে, মাতৃভাষা দারুণভাবে অবহেলিত হইতে থাকে এবং দুইটির মধ্যে একটি ভুল বৈপরীত্য গড়িয়া উঠে। মোট ফলাফল হইল এই যে, ছাত্রছাত্রী দুইটির কোনটিই শিখিতে পারিল না।

আমাদের দেশের বহু শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্ ইংলণ্ডে শিক্ষিত হইয়াছেন এবং তাহারা ভালোভাবেই লক্ষ্য করিয়াছেন কি ভাবে ইংরাজ শিশুদের ইংরাজী শিখানো হয়। তাহারা এই পদ্ধতিগুলি আমাদের মাতৃভাষা শিখানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার না করিয়া ইংরাজী শিখানোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহারা লক্ষ্যও করিলেন না কি ভাবে একটি চেক্ ছাত্র বা পোলিশ ছাত্র মাতৃভাষায় সুদৃঢ় ভিত্তি থাকার দরুণ মাত্র তিন মাসের মধ্যেই ইংরাজী আয়ত্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ক্লাসে ভর্তি হইয়া অনায়াসে সফলতা লাভ করিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

আজ পর্যন্তও আমরা মোটেই দাবী করিতে পারি না যে ইংরাজী এবং মাতৃভাষা উভয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে। যখনই আমরা কোন ভাষা শিক্ষা দিই না কেন মাতৃভাষা বা বিদেশীভাষা—এইগুলির মধ্যে পদ্ধতিগত ভাবে অনেকটা সাদৃশ্য থাকিবেই এবং অন্তর্নিহিত নীতি একই হইবে। যদি মাতৃভাষা ভালো ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ইহা একটি নূতন ভাষা শিখিতে সহায়তা করিবে এবং বিদেশী ভাষা যদি সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়, তবে ইহা মাতৃভাষাকে ভালো ভাবে বুঝিতে ও প্রয়োগ করিতে সহায়তা করিবে।

মাতৃভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতির মান উন্নত করিতে হইবে যাহাতে শিক্ষার্থী সহজ, সরল ও শুদ্ধভাবে নিজকে ব্যক্ত করিতে পারে।

ব্যাকরণগত শুদ্ধির ক্ষেত্রেও দেখা যায় মাতৃভাষার ব্যাকরণ ভালো ভাবে শিখিতে পারিলে শিক্ষার্থী অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণও ভালো ভাবে শিখিতে

পারিবে। নিজের ভাষায় সাবলীল গতিতে কথা বলিতে পারিলে অল্প দিনের মধ্যেই অন্য ভাষায়ও সহজভাবে কথা বলিতে পারিবে। তবে এই পরিবর্তনের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষণের প্রয়োজন।

পড়িতে শেখার ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, শিশুদের যাহাদের মাতৃভাষা পড়িতে শিখানো হয় তাহারা অতি সত্বর মৌখিক ইংরাজী শিখার অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজী পড়িতে পারে।

কোন বিষয় সংক্ষেপে এবং স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে পারা, কোন ঘটনাকে সংক্ষেপে বিবৃত করা, গল্প বলা, একটি পৃষ্ঠা অথবা একটি পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ করা ইত্যাদি গুণগুলি মাতৃভাষায় সব চাইতে ভালভাবে রপ্ত করা যায় এবং এটিকে ভাবিতে নতুন ভাষার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়।

একটি কবিতা বা অনুচ্ছেদ পড়ানোর সময় মাতৃভাষায় অনুরূপ দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিতে হইবে—কেননা ইংরাজী ভাষায় অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিতে গেলে বিষয়টি আরোও জটিল হইয়া উঠিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৭-১৯) সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন যে "a severe training in the use of the mother-tongue is not a rival but a necessary preliminary in the use of English."

শিশুদের শিক্ষাদানের কতকগুলি প্রাথমিক পদ্ধতি আছে। সেইগুলির বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।—

দেখা ও বলা পদ্ধতি (Look & Say Method)—

শিশুকে প্রথমে একটি বস্তু বা ছবি দেখানো হয় এবং ইহার নামের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো হয়। শিশুও প্রাণের আনন্দে ছবিও দেখে নামও শিখে। এই প্রাথমিক স্তরের পর শিক্ষক নামবাচক শব্দগুলির এমন ভাবে উচ্চারণ করিবেন যাহাতে বর্ণগুলি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয়। শিশুও তাঁহার অনুকরণ করিয়া সেই ভাবে উচ্চারণ করিবে। যেমন—কলার ছবি দেখাইয়া শিক্ষক বলিবেন ক-লা। তাঁহার অনুকরণ করিয়া শিশুও ক-লা বলিবে। শিশু এই ভাবে নামবাচক শব্দ উচ্চারণ করিতে শিক্ষার পর শিক্ষক মহাশয় কৃষ্ণফলকে শব্দ লিখিয়া দিবেন ও ধীরে ধীরে আগের মতো উচ্চারণ করিবেন। শিশুর সামনেও বড় বড় অক্ষরে সেই সকল শব্দ লেখা কাগজ দিতে হইবে। শিশু সেইগুলির উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিবে ও মুখে মুখে

উচ্চারণ করিবে। ইহার দ্বারা শিশুর দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহার হয় বলিয়া সে অল্প সময়ের মধ্যে শব্দগুলি ও তাহার অন্তর্গত বর্ণগুলি পড়িতে শিখিবে।

তারপর তাহার সামনে রঙ্গিন কাগজের বর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া ও তাহাকে সেইগুলি হইতে এক একটি নামের অন্তর্গত বর্ণ খুঁজিয়া শব্দগুলি তৈরী করিতে হয়। এই পদ্ধতিতে তাহাদের শিক্ষা নির্ভুল হয়।

নিজে করা এবং বলা পদ্ধতি (Do & Say Method)—

শিক্ষক মহাশয় প্রথমে কতকগুলি কাজ নিজে করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখে কি করিলেন তাহা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন। তারপর তিনি ছাত্রদের এক এক জনকে এক একটি কাজ করিতে বলেন এবং মুলে তাঁহার অনুরূপ ভাবে কাজটি বাক্যের মাধ্যমে উচ্চারণ করিতে শিখান। বার বার এই ভাবে অভ্যাস করাইতে হয়। ইহার ফলে শিশুরা তাহাদের অজানিত কাজের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের সঙ্গেও পরিচিত হয়। যেমন :—শ্রেণীতে শিক্ষক প্রবেশ করিয়া দরজাটি নিজে বন্ধ করেন ও মুখে স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করেন— "আমি দরজাটি বন্ধ করিতেছি"—এই ভাবে কতকগুলি কাজ নিজে করিবেন। তারপর ছাত্রদের এক জনকে জানালাটি বন্ধ করিতে বলেন—ছাত্রটি জানালা বন্ধ করে এবং মুখে স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করে— "আমি জানালা বন্ধ করিতেছি"—এইভাবে কয়েক বার করার পর তাহারা কাজের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের সঙ্গেও ভালো ভাবে পরিচিত হয়। শিক্ষক মহাশয় সর্বশেষে কৃষ্ণফলকে বাক্যগুলি লিখিয়া দিবেন ও ছাত্ররা তাহা নিজেরা উচ্চারণ করিবে।

একথা বলা যাইতে পারে যে, দেখা ও বলা পদ্ধতির সাহায্যে সব জিনিষ শিখানো সম্ভব হয় না এবং শ্রেণী পাঠনায় ইহার পরিমাণ খুব বেশী হয় না— প্রতিদিন অতি অল্প পরিমাণেই শিখানো সম্ভব হয়। আর নীচু শ্রেণীতে এই পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়।

নিজে করা ও বলা পদ্ধতি একটু যাহারা বলিতে পারে তাহাদের ক্ষেত্রে সুফল প্রদান করে। যাহারা একেবারে নূতন শিক্ষার্থী তাহাদের পক্ষে এই পদ্ধতিতে শেখা সম্ভব হয় না। কাজের সঙ্গে তাহারা ভালো ভাবে পরিচিত হইতে পারিলেও বাক্যের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারে না।

বাক্যক্রমিক পদ্ধতি (Sentence Method)—

এক একটি শব্দ বলিতে শেখার পর শিশুর পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে ছোট ছোট বাক্য বলিতে পারে। লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করার পূর্বেই সে ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে কথা বলিতে শিখিয়াছে। এই জন্য কোন কোন শিক্ষাবিদ্ শিশুকে প্রথমে এক একটি ছোট বাক্য শিক্ষা দিয়া পরে তাহার অন্তর্গত শব্দগুলি ও শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলি শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেন।

তাহাদের মতে শিশু যে মুহূর্তে কথা বলিতে আরম্ভ করে, সেই সময় সে বাক্যের অর্থ-প্রকাশক শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করে। যে জিনিষে শিশুরা আনন্দ পায় সেই জিনিষ শিশুর পক্ষে আয়ত্ত করা অতিশয় সহজ হয়। শিশুদের জন্য রচিত পাঠ দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইবে—কর্ম ও আবেষ্টনী। শিশুর কর্ম সে নিজেই সম্পাদন করিয়াছে। সেই জন্য কর্ম উদ্ভূত পাঠ শিশু পড়িতে না পারিলেও, সেই পাঠের বাক্যের প্রতিটি শব্দ শিশুর জানা আছে এবং বাক্যের অর্থও শিশুর অজানা নয়। এই অবস্থায় বাক্যের অর্থ শিশু সহজেই বুঝিতে পারিবে, কিন্তু অসুবিধা হইবে বাক্যটি পড়ায় ও লেখায়। শিশুর আবেষ্টনী শিশুর পরিচিত, অতএব পাঠের অর্থ বুঝিতে শিশুর কষ্ট হইবে না। এই ভাবে রচিত বাক্যগুলির সব শব্দ শিশুর পরিচিত হইতে হইবে এবং শব্দের অর্থও বোধগম্য হইতে হইবে, শব্দগুলি বার বার ব্যবহার করিতে হইবে। পাঠের বাক্যগুলির মধ্যে অর্থের ধারাবাহিকতা থাকিবে।

বাক্যক্রমিক পদ্ধতির একটি সুবিধা হইল এই যে শিশু একটি সমগ্র জিনিষ আয়ত্ত করিতে পারে বলিয়া আনন্দ পায়, পড়িবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সাবলীল ভঙ্গীতে পড়িতে পারে এবং পড়ায় শিশুর দৃষ্টি ও বাচনের প্রসার হয়।

ভাষা সম্বন্ধীয় পদ্ধতি (Linguistic Method)—

ভাষা সম্বন্ধীয় পদ্ধতি বা Structural-Linguistic পদ্ধতি বা সাধারণ ভাবে Structural Approach নামে পরিচিত, ইহা ভাষা-বিজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার্থীর দেশীয় ভাষা এবং যে ভাষার প্রতি লক্ষ্য স্থিরীকৃত রহিয়াছে, তাহার একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই দুই ভাষার মধ্যকার পার্থক্যই আমাদের সরবরাহ করে ইহার বিষয়বস্তু ও প্রবেশদ্বার।

১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের যে সমস্ত সৈন্য সারা পৃথিবীব্যাপী কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাহাদের কাজের সুবিধার জন্য বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অনুভূত হইয়াছিল।

পদ্ধতিটিকে এমন ভাবে রূপদান করা হইয়াছিল যাহাতে শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত গুণগুলি অর্জন করিতে পারে—(১) একটি যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক উচ্চারণভঙ্গী; (২) ভালো কথ্য জ্ঞান; এবং (৩) বিদেশী ভাষার ভালো শ্রাব্য বোধ।

এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত নীতিগুলি হইল নিম্নরূপ :—

(১) দেশী ও বিদেশী ভাষার শব্দভাণ্ডার, ধ্বনি ও ব্যাকরণগত পঠনের একটি বৈজ্ঞানিক বর্ণনা।

(২) দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য নির্ধারণ।

(৩) সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের ক্রম-অনুযায়ী শিক্ষাদানের বিষয়বস্তুগুলিকে সাজানো।

(৪) নিয়মিত উচ্চারণাভ্যাস।

(৫) বিদেশী ভাষার পঠন বার বার অভ্যাস করানো।

(৬) বৈসাদৃশ্যের বিষয়গুলির ব্যাখ্যা ও প্রতিপাদন।

(৭) ভাষার কাজ বুঝাইবার জন্য প্রয়োজনমত শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার ব্যবহার করা।

(৮) প্রাথমিক স্তরে শব্দভাণ্ডারের চাইতে পঠন শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

ভাষাভিত্তিক পদ্ধতিতে বিদেশী ভাষার শিক্ষার প্রতি একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী রহিয়াছে এবং ভাষার পঠন সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা রহিয়াছে। ভাষার অর্থের চাইতে গঠনের বিশ্লেষণের উপর এই পদ্ধতিতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্যান্য পদ্ধতিতে হয় নাই। পদ্ধতিতে ব্যাকরণগত বৈমূর্তন শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নাই। "কাঠামোগত ব্যাকরণ" বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এই পদ্ধটিতে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। এইরূপ কাঠামোগত অভ্যাসের ফলে চিন্তাশক্তি উদ্দীপিত হয়, আগ্রহ পুষ্ট করে এবং পাঠে শিক্ষার্থীরা বেশী পরিমাণে অংশ গ্রহণ করে।

ভারতে এই পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইলে ভারতের এক বৃহৎ সংখ্যক ভাষার গঠনের সঙ্গে ইংরাজীর গঠনের বৈজ্ঞানিক তুলনা

করিতে হইবে। এটি একটি বিরাট কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কাজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এই পদ্ধতিতে পড়াইতে গেলে এমন শিক্ষকের প্রয়োজন যিনি এক জন অভিজ্ঞ ভাষাবিদ্ হইবেন এবং যে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে সেই দেশীয় হইবেন ও বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদজ্ঞাপক হইবেন। আমাদের পক্ষে এইগুলির যে-কোন একটিকে কার্যে রূপায়িত করা শক্ত ব্যাপার। এই ভাবে আগাইয়া যাওয়ার জন্য যে ধরণের বিষয়ের প্রয়োজন তাহার পরিমাণ অত্যন্ত কম—আর্থিক ব্যয়ের কথা বাদই দিলাম। এই পদ্ধতির অনুযায়ী পুস্তক প্রণয়ন করার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

Structural পদ্ধতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ও নতুন পদ্ধতির (Direct method & New method-এর) যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই পদ্ধতিতে মৌখিক কাজ ও শ্রেণীতে ইংরাজীর ব্যবহারের দিক দিয়া অনেকখানি প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সহিত মিলে। সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে যে সমস্ত শব্দ রহিয়াছে সেইগুলি বারবার অভ্যাস করানো এবং ক্রমানুযায়ী পুস্তক প্রণয়নের দিক দিয়া ডঃ ওয়েস্টের নতুন পদ্ধতির সঙ্গে ইহার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে পুরাতন পদ্ধতি হইতে উন্নত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ইংরাজী শিক্ষাদানকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইহা পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে ব্যাকরণ ও রচনাকে সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত করিয়াছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ঔৎসুক্য, মনোযোগ ও কর্মতৎপরতা একসঙ্গে পাওয়া যায়। এই দিক দিয়া নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতি হইতে যথেষ্ট উন্নত পদ্ধতি।

এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল এই যে, ইহাতে পঠনের উপর সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, অথচ অর্থবোধ, শব্দভাণ্ডার নির্বাচন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে অবহেলা করা হইয়াছে। পঠনের ও লিখনের অভ্যাস করার জন্য ইহাতে অতি অল্প সুযোগই দেওয়া হইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সর্বভারতীর পরিষদ এই দিকে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এখানে ওখানে অল্প পরিমাণে অদলবদল করিলেই এই ভাষাভিত্তিক পদ্ধতির একটি পরীক্ষা করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে অপরাপর পদ্ধতি হইতে উন্নত ধরণের।

লেখার কাজ : বাড়ীর কাজ : অনুশীলন শুদ্ধীকরণ : শ্রেণীতে অথবা বাড়ীতে কিছু কাজ করিতে দেওয়া এবং শুদ্ধীকরণের জন্য প্রয়োজন হয় পরিকল্পনা, ধৈর্য এবং কল্পনার। ছাত্রছাত্রীদের কাজে ব্যাপৃত রাখা এবং প্রধান শিক্ষকের সন্তুষ্টি বিধান এই কাজের মূল লক্ষ্য নহে। মিলিত কাজ একটি উদ্দেশ্যের পথে উপায়স্বরূপ বলা যাইতে পারে এবং উদ্দেশ্যটি হইল ছাত্রছাত্রী শ্রেণীতে যাহা শিক্ষালাভ করিল তাহা তাহাদের মনে দৃঢ় করিয়া রাখা। কোন একটি পর্বের প্রথমে প্রচুর বৈচিত্র্য সহযোগে সুচিন্তিত ভাবে ও ক্রম অনুযায়ী অনুশীলন তৈরী করিতে হইবে।

লিখিত কাজ সব সময়ই সত্বর শুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং ইহার উদ্দেশ্য মোটেই এই নয় যে ছাত্রছাত্রীকে হেয় প্রতিপন্ন করা। পরন্তু ইহার উদ্দেশ্য হইল সহানুভূতি ও উপদেশের দ্বারা তাদের সৃজনাত্মক প্রবণতার উন্মেষ সাধন করা। শিক্ষক মহাশয় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী যে সকল ভুল করিয়াছে সেগুলির একটি তালিকা তৈরী করিবেন এবং শ্রেণীতে সেইগুলি লইয়া আলোচনা করিতে পারেন।

বাড়ীর কাজের উদ্দেশ্য হইবে দুইটি—শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ। শিক্ষক মহাশয় ভুলত্রুটি শুদ্ধ করার জন্য কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারেন এবং ছাত্রছাত্রীদেরও সেইগুলি নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে বলিতে পারেন (ক=বিশেষ ধরণের ভুল, খ=বাদ দেওয়া, গ= খারাপ ইংরাজী লেখা; ঘ=খারাপ ব্যাকরণ ব্যবহার করা ইত্যাদি)। তবে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা কেবল মাত্র ভুলগুলি বাহির করা যায় মাত্র, কিন্তু প্রকৃত ভুলের সংশোধন করা হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে সংশোধন করার মধ্যে ভুলত্রুটি থাকিয়া যায়।

সময় সময় শিক্ষক মহাশয় রচনাগুলি সংশোধন করিয়া দিবেন। সংশোধন করার সময় মুখ্য বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিবে।

মোটামুটি ভাবে সংশোধিত অংশ যদি শিক্ষার্থীর মনে কোন ছাপ না রাখিতে পারে, তবে ইহাতে কেবলমাত্র সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হয় না।

ব্যাকরণ শিক্ষাদান পদ্ধতি (Teaching of Grammar)

ব্যাকরণ নিজে পূর্ণাঙ্গ নহে, ইহা একটি উপায়মাত্র, কোন ভাষা শিক্ষার এবং ব্যবহারে অভ্যস্ত হইতে হয়। অভ্যাসের দ্বারাই পূর্ণতা-প্রাপ্তি সম্ভব।

অভ্যাস ব্যতিরেকে নীতি, সংজ্ঞা, ব্যবহার ইত্যাদি জানার কোন অর্থই হয় না।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাকরণ কখনই অসাধারণ ভাবে পড়ানো হইবে না।

পরোক্ষ পদ্ধতিই ব্যাকরণ শিক্ষাদানের উপযুক্ত পদ্ধতি। ইহাতে শিক্ষক কতকগুলি ঘটনা হইতে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

মাতৃভাষা শিক্ষাদানের সঙ্গে যত দূর সম্ভব ব্যাকরণকে যুক্ত করিতে হইবে। কেননা বাংলা এবং ইংরাজী উভয়ই ইন্দ-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাকরণ অনেক সময় অনুকরণ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা শেখা যায়।

নতুন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ব্যাকরণ তাহার ব্যবহারের মধ্য দিয়া শিখাইতে হইবে এবং যত দূর প্রয়োজন হইবে তত দূরই ব্যাকরণ শিখানো হইবে।

বানান—অনেক ইংরাজী শব্দের বানান সাধারণতঃ ধ্বনিসংক্রান্ত। সেই জন্য ভাষার উপাদানসহ পাঠ্যবিষয়ের মধ্য দিয়া নিয়মাবলী সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে ধাপে ধাপে পরিচিত করানো যাইতে পারে। ফ্লাশ কার্ড ইত্যাদির ব্যবহারের দ্বারা বিষয়টিকে সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত করানো যাইতে পারে।

এক সঙ্গে কতকগুলি শব্দের বানান শিখিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। তবে বানান শিক্ষাদানের সময় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে শব্দের শুদ্ধ গঠন শেখান যায়।

উচ্চারণ (Pronunciation)—শুদ্ধ উচ্চারণ শিখিবার জন্য প্রয়োজন হইল অনেক দিন ধরিয়া শুদ্ধ উচ্চারণ শোনার এবং সেগুলি বলার মধ্য দিয়া ব্যবহারের। তবে এইগুলি শোনার এবং বার বার অভ্যাস করার সময় অনেক সময় পাওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই প্রয়োজন হইলে দুইটি উচ্চারণ শেখার।

শোনা এবং অনুকরণ করা উচ্চারণ শিখিবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। ধ্বনি সম্বন্ধে শিক্ষকের স্পষ্ট এবং বাস্তব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শব্দগুলি পৃথক পৃথক ভাবে কাটা কাটা ভাবে এবং এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। মুখের অবস্থা কোন শব্দের ক্ষেত্রে কি রকম হয় তাহা শিক্ষার্থীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

ছন্দ এবং উচ্চারণ যদি ইংরাজীর মত হয় তবেই ভাষাটিকে ইংরাজী মনে হয়। কাজেই শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা বলার অভ্যাস বন্ধ করিতে হইবে।

ইংরাজী এবং মাতৃভাষার উচ্চারণে মুখ গহ্বরের অবস্থানের যে পার্থক্য তাহা শিক্ষার্থীদের ভাল ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

শিক্ষক মহাশয় নূতন উচ্চারণ শিখিয়া রাখিবেন এবং শিক্ষার্থীদের দিয়া বারংবার অভ্যাস করাইতে হইবে।

বানানের অশুদ্ধি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুদ্ধ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

উচ্চারণ শিক্ষাদানের উপায়সমূহ (Apparatus for teaching sound):

(১) ধ্বনি প্রতীকের চার্ট (Sound chart with phonetic symbols)

(২) স্বরযন্ত্রের অবস্থানের চার্ট (Wall charts of position of vocal organs)

(৩) মাথা ও গলার মডেল (Model of head and throat)

(৪) হস্ত আরশি (Hand Mirrors)

(৫) গ্রামোফোন—উচ্চারণমূলক রেকর্ড ব্যবহার।

সম্বন্ধিত পাঠদান পদ্ধতি (Correlation)

বিষয়ের সহিত বিষয়ান্তরের সাদৃশ্য থাকিলে একটি বিষয় পড়াইতে যাইয়া অন্য বিষয়ের অবতারণা করা স্বাভাবিক এবং এইরূপে তুলনামূলক বিচারদ্বারাই জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটে। সুতরাং পাঠদান-পদ্ধতি হিসাবে এরূপ সম্বন্ধিত করিয়া পাঠদান মনোবিজ্ঞান-সম্মত। বস্তুতঃ তুলনা (comparison) সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার স্বাভাবিক শক্তি আছে বলিয়াই মানব-শিশুর পক্ষে ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়।

এইরূপ সম্বন্ধিত পাঠদানের নীতি যেখানে অনুসৃত হয় সেখানে কোন একটি পাঠকে নানা বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া পাঠদান করার রীতিও লক্ষিত হয়। অশোক সম্বন্ধে পড়াইতে যাইয়া ইহাকে শুধু ঐতিহাসিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া ভূগোলের শিক্ষক অশোকের সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিধি, বিস্তৃতি প্রভৃতি দেখাইবেন, সাহিত্যের শিক্ষক অশোকের জীবনকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যের পাঠ দিবেন, সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষক অশোকের কালের মানুষের জীবনচর্যা, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে পাঠ দিতে পারেন। এই ভাবে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচিত হওয়ার ফলে অশোক সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান সমৃদ্ধতর হইবার সম্ভাবনা।

আবার সংক্ষিপ্ত গণ্ডীর মধ্যে পাঠকে সম্বন্ধিত করিবার জন্য একই বিষয়ের নানা অংশের সঙ্গে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাহার দিকে ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। কবিতা পড়াইতে অনুরূপ পংক্তির (parallel passage)এর উল্লেখ, বীজগণিতের সূত্রকে প্রাঞ্জল করার জন্য অঙ্কের উল্লেখ অথবা অঙ্কের সমস্যা সমাধানে বীজগণিতের সূত্রের সাহায্য গ্রহণও সম্বন্ধিত পাঠদানের পর্যায়েই পড়ে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে উভয় বিষয়ের এই সম্বন্ধ যেন জোর করিয়া টানিয়া আনা না হয়। উহাদের সম্বন্ধ যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়।

কাজকে অবলম্বন করিয়া যেখানে শিক্ষাদানের নীতি অনুসৃত হয়, সেখানে এইরূপ সম্বন্ধিত পাঠদানের ক্ষেত্র খুবই বিস্তৃত। কাজ করার মধ্যেই সবটুকু শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকিবে না। কাজের কৌশল, নৈপুণ্য, নিয়মানুগতা শিক্ষা করার পরও ঐ কাজকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের নীতি বিশেষ করিয়া বুনিয়াদী শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যে কোন কাজকে কেন্দ্র করিয়া কিছু অঙ্ক, কিছু ভৌগোলিক তথ্য, কিছু সাহিত্য, অঙ্কন প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাবেই আসিবে। শ্রেণী অনুসারে অবশ্য তথ্য পরিবেশনের কমবেশী হইবে, কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীতেই কাজের কৌশল শেখানর সাথে সাথে কিছু কিছু তথ্যের পরিবেশন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। মাপ-জোক, ওজন, পরিমাপ, ব্যবহৃত জিনিষের প্রাপ্তিস্থান, তাহার মূল্য, প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ, ঐ শিল্পে নিযুক্ত শিল্পীদের জীবন ও জীবিকা প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বন্ধে কাজকে অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিতে হয়; সুতরাং বিষয়ানুক্রমিক ভাবে না হইলেও কিছু অঙ্ক, কিছু ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের সহিত শিল্পশিক্ষাও অপরিহার্যরূপেই সম্বন্ধযুক্ত হইয়া যায়।

শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া যেরূপ সম্বন্ধিত শিক্ষাদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, তেমনি সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করিয়া ঐ ক্ষেত্র বিস্তৃততর হইতে থাকে। বুনিয়াদী শিক্ষার এই ত্রিধারাকে অবলম্বন করিয়া সম্বন্ধিত শিক্ষাদানের বহু উপাদান আসিয়া পড়ে; কৌশলী শিক্ষক উহার যে কোনটিকে অবলম্বন করিয়া সার্থক পাঠদান করিতে পারেন।

এখানেও একই সতর্কবাণী—শিল্প কিংবা সামাজিক-প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে উদ্ভূত সমস্যাটি যেন স্বাভাবিক হয়, জোর করিয়া যেন উহাদের

সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা না হয়। 'আমরা মাটির কাজ করিয়াছি,' এতএব এস আমরা এখন কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের সম্বন্ধে আলোচনা করি', এরূপ পাঠদান শুধু নিরর্থক নয়, অনেক সময় হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়। কাজ করিতে গেলে স্বাভাবিক ভাবে যে সকল সমস্যা আসে তাহাদের লইয়াই পাঠদান করিতে হইবে এবং পাঠদানকালে শ্রেণীর গ্রহণ-ক্ষমতানুযায়ী নূতন তথ্য কিছু কিছু পরিবেশ করিলেই সম্বন্ধিত পাঠদান সার্থক হইবে।

একীকরণ (Fusion) পদ্ধতি

ইহাকে একটি পূর্ণাবয়ব পদ্ধতি বলা যায় কিনা সন্দেহ। ইহার মূলে কয়েকটি সম্বন্ধযুক্ত বিষয়কে একই সাথে পড়াইবার কথা বলা হয়; একটি বিষয়কে পড়াইতে যাইয়া অন্য একটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত অবতারণা করিয়া বিষয়টি আরও প্রাঞ্জল করার উদ্দেশ্যেই এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ইতিহাস পাঠদান কালে ভূগোলের সংক্ষিপ্ত উল্লেখদ্বারা যদি কোন ঐতিহাসিক বিষয়কে স্পষ্টতর করিয়া তোলা যায়, তাহা অবশ্যই কর্তব্য এবং মোটেই দোষণীয় নয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের একটি কারণ হিসাবে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিকেই একটি কারণ হিসাবে বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে রাজধানী দিল্লী, দিল্লী হইতে পূর্বাঞ্চলের ঢাকা, দক্ষিণাঞ্চলের দেবগিরি, পশ্চিমের সুরাট প্রভৃতি স্থানের দূরত্ব, দুরধিগম্যতা এবং যাতায়াত ব্যবস্থার কথা না বলিলে 'বিস্তৃতির' ধারণাটি অসম্পূর্ণ থাকিবার সম্ভাবনা। আবার বীজগণিত ও অঙ্ক, অঙ্ক ও জ্যামিতি, জ্যামিতি ও বীজগণিতের পরস্পর সম্বন্ধকে স্পষ্টতর করিবার জন্য এই Fusionএর প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়। বীজগণিতের প্রাথমিক প্রতীকগুলি বুঝাইতে অঙ্কের উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়, উল্লেখ না করিলেই বরং ঐ প্রতীকগুলি বোঝানো প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। $(a+b)^2$ কিংবা $(a-b)^2$কে জ্যামিতিক ক্ষেত্রফল হিসাবেও প্রমাণ করিয়া দেখানো যায়। ইহাতে ঐ বিমূর্ত ধারণাগুলি স্পষ্টতর হয়।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষককে একটি সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। আসল বিষয়বস্তুকে স্পষ্টতর উদ্দেশ্যে অন্য বিষয়টির উল্লেখ যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই করিবেন। তাহার বেশী করিতে গেলে আসল উদ্দেশ্য হইতে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে থাকিবেন, ফলে পাঠদানের

আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। অনেক শিক্ষক এই সংযম রক্ষা করিতে পারেন না বলিয়া পাঠদান আশানুরূপ সাফল্যযুক্ত হয় না।

Fusion Method সম্বন্ধে এইটুকু পড়িবার পর অনেকের ধারণা হইতে পারে যে, স্বাঙ্গীকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধিত পদ্ধতি প্রভৃতির সহিত প্রচলিত পদ্ধতির পার্থক্য কোথায়। পূর্বেই বলিয়াছি, এই পদ্ধতিকে একটি পূর্ণাবয়ব পৃথক পদ্ধতি বলা যায় কিনা সন্দেহ। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, এটি বিষয়কেন্দ্রিক পদ্ধতি হইতে ভিন্ন; Integration এর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষাকর্মের স্বাঙ্গীকরণের যে নীতি স্বীকৃত হয়, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ততটা স্বাধীনতা নাই। যে বিষয়গুলি স্বাভাবিকভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত তাহাদের উল্লেখ দ্বারা বিষয়গুলি আরও অর্থপূর্ণ এবং আরও সঙ্গতিপূর্ণ করার দায়িত্ব এখানে শিক্ষকের। তিনি ছাত্রের পূর্বার্জিত জ্ঞানের আলোকে যেমন নূতন তথ্যকে উদ্ভাসিত করিতে সাহায্য করিবেন, সেইরূপ বিষয়ান্তরের সহিত পাঠ্যবিষয়ের যোগসূত্র রচনা করিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিতেও শিখাইবেন।

স্বাঙ্গীকৃত (Intergrated) পদ্ধতি

এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর স্বকীয় প্রয়োজনে শিক্ষালাভের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাও বিষয়-কেন্দ্রিক এবং গতানুগতিক শিক্ষাদান-পদ্ধতির ব্যতিক্রম। শিক্ষক যেখানে শিক্ষাদানকার্যের নিয়ামক হিসাবে থাকিবেন, সেখানে এই পদ্ধতি অচল। শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োজনানুসারে শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগই এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থী নিজস্ব প্রয়োজনে শিক্ষালাভ করিতে চাহিলেও শিক্ষকের কিছু করণীয় নাই, এমন নয়। শিক্ষক ছাত্রকে তাহার কৌতূহল নিবৃত্তিতে সহায়তা করিবেন, উত্থাপিত সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিবেন, কোন্ পুস্তকে সমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত আছে বলিয়া দিবেন।

সুতরাং এই পদ্ধতিতে পাঠদান কোন কাজ, অভিজ্ঞতা কিংবা কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। শ্রেণীতে ৩০।৪০ জন ছাত্রের বহু সমস্যাই থাকিতে পারে। শিক্ষক কিন্তু প্রত্যেকটি সমস্যা লইয়া সমগ্র শ্রেণীতে পাঠদানের চেষ্টা করিবেন না, প্রত্যেক ছাত্রের ছোটখাট সমস্যার সমাধান পৃথক ভাবেই দিবেন। এ পদ্ধতিতে ৭।৮ জনকে লইয়া একটি দল স্থির করিয়া দিলে কাজের সুবিধা হয়। বহু ছোটখাট সমস্যা সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই

সহজ হইয়া যায়; যেখানে তাহা হয় না, সেখানেই শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন দলের যদি সাধারণ কোন সমস্যা থাকে, তবে সেটিকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষক সমগ্র শ্রেণীর জন্য পাঠদান করিবেন।

এই প্রকার পাঠদানের সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। সুবিধার মধ্যে বলা যায় যে ছাত্র স্বচেষ্টায় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে বলিয়া শিক্ষার ফল স্থায়ী হয়, আগ্রহ জাগরূক থাকে এবং অর্জিত বিদ্যার প্রয়োগ হয়। কোন একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যেই এইরূপ শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকে না বলিয়া জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সম্মিলিত চেষ্টাদ্বারা অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জিত হয় বলিয়া প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একটি সহযোগিতার মনোভাব বাল্যকাল হইতেই গড়িয়া ওঠে।

এই পদ্ধতির অসুবিধাও কম নয়।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে গেলে শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াও কোন কোন বিষয়ে পাঠ দিতে হয়, অথবা ছাত্রের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হয়। অভিজ্ঞ শিক্ষকও অনেক সময় এরূপ ক্ষেত্রে বিব্রত বোধ করেন। আবার কোন একটি বিশেষ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া পাঠ দেওয়া হয় না বলিয়া কোন বিষয়েরই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। ফলে একটি বিষয়ের মধ্যেও অনেকখানি ফাঁক থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। দলগত ভাবে কাজ করার ফলে যাহারা ফাঁকি দিতে চায় তাহাদের পক্ষে ফাঁকি দেওয়া সহজ হয়।

তবে উপরের শ্রেণীতে যেখানে ক্রমশঃ বিষয়ানুক্রমিক শিক্ষার সুশৃঙ্খলতা এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, সেখানে না হইলেও নীচের শ্রেণীগুলিতে এইরূপ স্বাঙ্গীকৃত শিক্ষার ও পাঠদানের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। নীচের শ্রেণীতে বিষয়গুলি তাহাদের পৃথক সত্তা লইয়া ছাত্রদের কাছে উপস্থিত হয় না। বরং ঐরূপ বিষয়ানুক্রমিক ভাগ মনস্তত্ত্ববিরোধী। জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাহাদের অখণ্ডসত্তা লইয়াই শিশুর কাছে উপস্থিত হয়, ইতিহাস, ভূগোল, মাতৃভাষা কিংবা অঙ্কের আকারে নয়। সুতরাং নীচের দিকে এইরূপ স্বাঙ্গীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত ও মনস্তত্ত্বসম্মত।

Lan

Ma

Soc

Sci

Art

Cra

Mu

Phy

Pra

Oth

es in this school record are to be

1. HEALT

General health rating.			Any d
Good.	Average.	Poor.	

ON OF RESPONSIBILITY HELD

of responsibility means a position like that
hips, etc.

৭৬০ made *once*,at the *end of each academic year*).

সহজ H RECORD

প্রয়ো

অবলম্

physical defect.	Serious illnesses.	Any special remark.
... .	....	....
.. ..	....	....

কো

অভি

এক

বিষ N SCHOOL AND AWARDS, ETC., OBTAINED

মধ্যে

কর

এব ....

শ্রে

নী ....

হয়

তা

মা of a monitor, a captain, etc., and awards include prizes,

স্বা